# ফররুখ আহমদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

মুহম্মদ মতিউর রহমান
সম্পাদিত

# ফররুখ আহমদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

## প্রথম খণ্ড

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান
সম্পাদিত

কবি ফররুখ আহমদঃ জন্ম ১০ জুন ১৯১৮, মৃত্যু ১৯ অক্টোবর ১৯৭৪

# ফররুখ আহমদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

## প্রথম খণ্ড

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান
সম্পাদিত

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা-চট্টগ্রাম

# ফররুখ আহমদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

প্রথম খণ্ড

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান
সম্পাদিত

প্রকাশক
এস. এম. রইসউদ্দিন
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ



প্রধান কার্যালয়
নিয়াজ মঞ্জিল ৯২২ জুবিলি রোড চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩, মোবাইল : ০১৭১১-৮১৬০০২

মতিঝিল কার্যালয়
১২৫ মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স : ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪
মোবাইল : ০১৭১১-৮১৬০০২

রিভিউ
মাহবুবুল হক

প্রচ্ছদ : মোঃ নাসির উদ্দিন

প্রকাশকাল
প্রকাশকাল : ১ জুন ২০১৫

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫ মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০।
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

মূল্য : ৫০০/- (পাঁচশত টাকা)

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল ৯২২ জুবিলি রোড চট্টগ্রাম-৪০০০
ফোন- ৬৩৭৫২৩, মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০২
১২৫ মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০
ফোন- ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪, মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০১
১৫০-১৫২ গভ. নিউমার্কেট আজিমপুর ঢাকা-১২০৫ ফোন-৯৬৬৩৮৬৩
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা) বাংলাবাজার নঢাকা-১১০০-ফোন -৯৫৭৪৫৯০

---

**Farrukh Ahmeder Satantra O Boisista**, Edited by: Muhammad Matiur Rahman, Published by: S.M. Raisuddin, Director, Publication, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A Dhaka-1000.

Price: Tk.500/- US $ 12 .00 **ISBN. 984-70241-0086-3**

## উৎসর্গ

প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী
মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌
ড. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়
শাহাবুদ্দিন আহ্‌মদ
আব্দুল মান্নান সৈয়দ
*ফররুখ চর্চার ক্ষেত্রে যাঁদের অবদান অসামান্য।*

# প্রসঙ্গ কথা

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক প্রতিভাধর কবি ফররুখ আহমদ। ভাব-ভাষা-বিষয়-ঐতিহ্যবোধ ও শিল্প-নৈপুণ্যের ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যে তিনি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন। নিঃসন্দেহে তিনি সনাক্তযোগ্য একজন শক্তিমান কবি। কবি হিসাবে তাঁর বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য সর্বজনস্বীকৃত। তাঁর প্রতিভা বহুমুখী। কাব্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নানাভাবে আলোচিত-সমালোচিত হয়ে এসেছেন। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক ইত্যাদি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর বিচরণ ঘটলেও তিনি প্রধানত কবি। তাঁর কবি-খ্যাতি বিরল, কাব্যকলার বিভিন্ন রূপ-রীতি ও আঙ্গিকেও তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্যের প্রকাশ ঘটেছে। গীতিকবিতা, সনেট, গান, শিশুতোষ কাব্য, ব্যঙ্গকবিতা, কাব্যনাট্য, গীতিনাট্য, বঙ্গনাট্য, মহাকাব্য ইত্যাদি বিচিত্র রূপ-রীতিতে তাঁর মূল্যবান অবদান রয়েছে।

বিশেষ ভাবাদর্শের কারণে কবি বিরুদ্ধবাদীদের নিকট অনেক সময় সমালোচিত হয়েছেন, কেউ কেউ তাঁকে উপেক্ষা করার বা 'অনতিবড়' কবি বলারও চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কেউ কখনও তাঁর অসাধারণ কবি-প্রতিভাকে উপেক্ষা বা অস্বীকার করেন নি। বিংশ শতাব্দীর মধ্য-তিরিশে তাঁর আবির্ভাব ঘটলেও চল্লিশ দশকের শুরু থেকে পরবর্তী প্রায় সাড়ে তিন দশক কাল বাংলা কাব্যের মূলধারায় তিনিই ছিলেন সর্বাধিক আলোচিত, সর্বজনগ্রাহ্য এবং সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি। ঐ সময় জাতীয় জীবনের মূলধারায় তাঁর অবস্থান যেমন ছিল সুদৃঢ় তেমনি জাতীয় পর্যায়ের সর্বোচ্চ পুরস্কারসমূহও অবলীলায় তাঁর ভাগ্যে জুটেছে। অথচ আজ একশ্রেণীর স্বার্থান্ধ ও ভিন্ন মতাবলম্বীদের চক্রান্তে তিনি অনেকটাই উপেক্ষিত। কবি হিসাবে তাঁকে অবমূল্যায়িত করার কোন সঙ্গত কারণ তাঁর উপেক্ষাকারীরাও খুঁজে পায়নি।

শুধুমাত্র ভাবাদর্শের কারণে কখনও কোন কবি বা শিল্পীকে উপেক্ষা করা যায় না। শিল্প বা সাহিত্যের একটি মানদণ্ড রয়েছে। সে মানদণ্ডে যখন কেউ উৎরে যায়, তখন তাঁকে আর কখনই উপেক্ষা করা যায় না। পৃথিবীর কোন কবি বা শিল্পীকে শুধু তাঁর নিজস্ব ভাবাদর্শ দিয়ে বিচার করা হয় না, তাঁর সৃষ্টি-নৈপুণ্যই তাঁর বিচারের প্রধান মানদণ্ড। ভাবাদর্শ ব্যক্তিগত বিষয়, এক্ষেত্রে প্রত্যেক সৃজনশীল প্রতিভারই একটি নিজস্বতা বা ভিন্নতা রয়েছে। কাব্যের শৈল্পিক মানদণ্ডে কেউ উৎরে যায়, তিনি সফল। সেক্ষেত্রে ভাবাদর্শ গৌণ হয়ে দেখা দেয়।

ফররুখ আহমদের ক্ষেত্রে এ কথাগুলো বলতে হলো এজন্য যে, বর্তমানে তাঁকে তাঁর কবিতার শিল্পোত্তীর্ণতা দিয়ে নয়, বরং তাঁর ভাবাদর্শ দিয়ে কেউ কেউ তাঁকে বিচার করার প্রয়াস পাচ্ছেন। দুর্ভাগ্যবশত এ অপপ্রয়াসের সাথে যারা লিপ্ত, তারা

বাংলাদেশের অতি নগণ্য সংখ্যক ব্যক্তি এবং সত্য কথা এই যে, ফররুখ আহমদের ভাবাদর্শ যদিও তাঁর নিজস্ব কিন্তু বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সাথে সে ভাবাদর্শের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণেই তিনি একসময় জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন এবং অধঃপতিত, নিগৃহীত, পরাধীন বাঙালি মুসলমানের জাগরণ ও উজ্জীবনের কবি হিসাবে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সৌভাগ্যবশত তাঁর সে জাগরণমূলক কাব্য-কবিতা এখনও নিপীড়িত-নিগৃহীত মুসলিম জনতাকে জেগে ওঠার উজ্জীবনী শক্তিতে প্রাণচঞ্চল করে তোলে। বাঙালি মুসলিমের স্বাধীনতা অর্জন ও স্বাধীনতা সংরক্ষণে তা এখনও অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করে। তাই ফররুখ আহমদকে যে মতলবেই উপেক্ষা করা হোক না কেন, জনগণের হৃদয়ের গভীরে ও অন্তরের নিভৃত কোণে তিনি সর্বদা জাগরূক রয়েছেন এবং থাকবেন।

এজন্য ফররুখ-চর্চার গুরুত্ব রয়েছে। ফররুখ-চর্চার ক্ষেত্রও প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। তাঁর কাব্যের প্রকাশ, পুনঃমুদ্রণ ও প্রচার একান্ত প্রয়োজন। আমি ফররুখ আহমদের একজন অনুরক্ত পাঠক। শৈশব থেকে যে সকল কবির কবিতা পড়ে আমি মুগ্ধ ও অভিভূত তাঁদের মধ্যে ফররুখ অন্যতম। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সাথে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাঁর কাব্যের প্রতি আমার অনুরাগের ফলেই তাঁর শেষ জীবনে আমার প্রায় প্রতিটি সন্ধ্যাবেলা কেটেছে তাঁর ইস্কাটনের সরকারি বাসভবনের ড্রইং রুমে। ১৯৭৭ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত আমি বিদেশে কর্মরত ছিলাম। সেখানে বসেই আমি 'ফররুখ প্রতিভা' (প্রথম সংস্করণ, ১৯৯১, প্রকাশক-বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা) নামে গ্রন্থটি রচনা করি। বিদেশে আমি সর্বপ্রথম ফররুখ আহমদের জন্ম ও মৃত্যু দিবস উপলক্ষে প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিয়ে সভা-সেমিনারের আয়োজন করি। ১৯৯৭ সালে আমি বাংলাদেশে এসে প্রথম ফররুখ চর্চার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান কায়েমের উদ্দেশ্যে যুক্তিসহ একটি প্রস্তাব পত্রিকায় প্রকাশ করি। কিন্তু তাতে বিশেষ সাড়া না পাওয়ায় পরবর্তী বছর অনুরূপ আরেকটি প্রস্তাব পত্রিকায় প্রকাশ করি। এবারে অনেকের কাছ থেকেই আন্তরিক সাড়া পাই। ফলে আগ্রহী ব্যক্তিদের নিয়ে ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বরে 'ফররুখ একাডেমী' নামে একটি প্রতিষ্ঠান কায়েম করি। আমাকে এর সভাপতি করা হয়। উল্লেখ্য যে, ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠানটি 'ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন' নামে সরকারী নথিভুক্ত হয়। ১৯৯৮ সালের অক্টোবর মাস থেকে এ যাবৎ প্রতিবছর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমার সম্পাদনায় 'ফররুখ একাডেমী পত্রিকা' নামে একটি ফররুখ বিষয়ক গবেষণামূলক সংকলন প্রকাশিত হয়ে আসছে। এযাবৎ এর ছাব্বিশটি সংখ্যা (জুন ২০১৪ পর্যন্ত) প্রকাশিত হয়েছে।

ফররুখ চর্চাকে ব্যাপকতর করা এবং ফররুখ একাডেমী পত্রিকা মানসম্মতরূপে প্রকাশের উদ্দেশ্যে আমি দেশের প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিক-গবেষকদের শরণাপন্ন হই। এ ব্যাপারে অনেক খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিক-গবেষক ও ফররুখ-অনুরাগীর সাথে

আমি যোগাযোগ করি। প্রত্যেকেই আমার অনুরোধে সাড়া দিয়ে ফররুখ আহমদের উপরে লিখেছেন এবং তা যথারীতি 'ফররুখ একাডেমী পত্রিকা'র প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আমি ব্যক্তিগতভাবে উপরোক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজনকে- যেমন সৈয়দ আলী আহসান, ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ, ডক্টর সদরুদ্দিন আহমেদ, মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌, ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, শাহাবুদ্দীন আহমদ- ফররুখ আহমদের উপর পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার অনুরোধ জানিয়েছিলাম। অনেকেই তাতে সম্মত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ ও শাহবুদ্দীন আহমদ রচিত দু'টি গ্রন্থ আমি উদ্যোগী হয়ে ফররুখ একাডেমীর পক্ষ থেকে প্রকাশ করি। সে দু'টি গ্রন্থ প্রকাশের পর তাঁরা ফররুখ আহমদ সম্পর্কে যে সব প্রবন্ধ লিখেছেন এবং ফররুখ একাডেমী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলো অত্র গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। ডক্টর সদরুদ্দিন আহমদ রচিত প্রবন্ধসমূহ নিয়ে তিনি নিজেই একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কিন্তু সে গ্রন্থটি প্রকাশের পরেও তিনি আমাদের অনুরোধে আরো যেসব প্রবন্ধ লেখেন এবং পরবর্তীতে ফররুখ একাডেমী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তা এগ্রন্থে সংকলিত হলো। প্রখ্যাত সাংবাদিক ও ভাষাসৈনিক সানাউল্লাহ নূরী মাত্র একটি প্রবন্ধ লেখার পর ইন্তিকাল করেন। সৈয়দ আলী আহসান এবং ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানও তাঁদের গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করার পূর্বেই ইন্তিকাল করেন। তাই তাঁদের রচিত সবগুলো প্রবন্ধ-যা ফররুখ একাডেমী পত্রিকায় যথারীতি প্রকাশিত হয়েছে-তা এ গ্রন্থে সংকলিত হলো। এছাড়া, ফররুখ আহমদের উপর লেখা আমার প্রবন্ধের একটি সংকলন প্রকাশিত হয় ২০০৮ সালে। হেরা পাবলিকেশন্সের স্বত্বাধিকারী মরহুম মিজানুর রহমান ৪১৬ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থ প্রকাশের পর আমি আরও যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখেছি এবং যথারীতি 'ফররুখ একাডেমী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছে, তা এ গ্রন্থে সংকলিত হলো। অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রচনাসমূহ, যা ফররুখ একাডেমী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, সেগুলোও এ গ্রন্থে সংকলিত হলো। অবশ্য কিছু কিছু রচনা যা অন্যত্র- বিশেষত শাহাবুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত 'ফররুখ আহমদ ঃ ব্যক্তি ও কবি' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে কয়েকটি প্রবন্ধ 'ফররুখ একাডেমী পত্রিকা'য় পুনঃমুদ্রণ ও পরবর্তীতে এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে ফররুখ আহমদের মূল্যায়নে পাঠক বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

ফররুখ আহমদের উপর রচিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ ছাড়াও ফররুখের উপর রচিত নিবেদিত কবিতা, ফররুখের উপর প্রদত্ত সাক্ষাৎকার এবং ফররুখ চর্চা বিষয়ক আরো কিছু বিষয় এ গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে। এতে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পেলেও ফররুখ আহমদকে জানা এবং তাঁর সম্পর্কে যথাযথ মূল্যায়ন করা সহজতর হবে। তবে এক্ষেত্রে একটি কথা না বললেই নয় যে, প্রাথমিকভাবে আমার নির্বাচিত

লেখার সংকলনের কলেবর অতিশয় বৃদ্ধি পাওয়ায় অপেক্ষাকৃত তরুণদের লেখা বাদ দিয়ে বর্তমান সংকলনটি প্রকাশ করা হলো। বাকি লেখা এবং পরবর্তীতে 'ফররুখ একাডেমী পত্রিকা'য় আরও যে সমস্ত লেখা প্রকাশিত হবে, তা থেকে নির্বাচিত লেখা নিয়ে পরবর্তীতে গ্রন্থ প্রকাশের আশা রাখি। মূলত এটা হতে পারে ক্রমাগ্রসরমান একটি প্রক্রিয়া। এর ফলে ফররুখ চর্চার ব্যাপ্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে।

মূলত এ সংকলনটি আমার দীর্ঘ দেড় দশক কালের নিরলস প্রচেষ্টার ফল। এ কাজে আমাকে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি, ফররুখের গুণগ্রাহী ও অনেক প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষত 'ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন'-এর নির্বাহী পরিচালক মুহাম্মদ আব্দুল হান্নান এর বিশেষ সহযোগিতা পেয়েছি। এ জন্য আমি তাঁদের সকলের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাঁদের সহযোগিতা ব্যতীত এ বিরাট কাজের আনজাম দেওয়া কারো একার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমি আমার পরম শ্রদ্ধেয় অগ্রজতুল্য মরহুম মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্‌র সাথে পরামর্শক্রমে এ সংকলিত গ্রন্থের নাম নির্বাচন করেছি। তাই প্রসঙ্গত এখানে তাঁকে স্মরণ করছি ও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

এ কাজটি যথারীতি সম্পন্ন করতে পেরে আমি মহামহিম আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শোকরগোজার করে আগামীতে এ ধারা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে তাঁর অপরিসীম রহমত কামনা করছি।

**মুহম্মদ মতিউর রহমান**
সভাপতি, ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

# প্রকাশকের কথা

ফররুখ আহমদ বাংলা সাহিত্যের এক মৌলিক প্রতিভাধর কালজয়ী কবি। বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে তাঁর বর্ণাঢ্য আবির্ভাবের সাথে সাথে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। বাংলা সাহিত্যে তিনি এক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত স্বতন্ত্র কবি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। ভাব-ভাষা, ছন্দ, রূপক উপমা প্রতীকের নৈপুণ্যময় ব্যবহারে তিনি এ স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছেন।

ফররুখ আহমদের সমকালে এবং পরবর্তীকালেও তাঁর সম্পর্কে অনেকেই আলোচনা করেছেন। এ পর্যন্ত ফররুখ সম্পর্কে যাঁরা চর্চা করেছেন, গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁদের সবিস্তার বর্ণনা এ গ্রন্থের পরিশিষ্টে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ থেকে ফররুখ আহমদ কতটা জনপ্রিয় এবং তাঁর সৃষ্টিকর্ম সুধীমহলে কী পরিমাণ আগ্রহ সৃষ্টি করেছে, সে সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা করা চলে।

এ গ্রন্থের সম্পাদক অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান একজন খ্যাতনামা লেখক এবং ফররুখ গবেষক। ১৯৬২ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত তিনি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। ১৯৯১ সালে তাঁর রচিত 'ফররুখ প্রতিভা' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ২০০৮ সালে বৃহৎ কলেবরে 'ফররুখ প্রতিভা'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাঁর ব্যক্তিগত চেষ্টায় ১৯৯৮ সালে 'ফররুখ একাডেমী' (২০০৩ সালে 'ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন' নামে রেজিস্ট্রিকৃত) প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রকাশিত নিয়মিত ষান্মাসিক পত্রিকা 'ফররুখ একাডেমী পত্রিকা'র সম্পাদক। উক্ত প্রতিষ্ঠান ও পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ফররুখ আহমদের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার সূত্রপাত ঘটে। অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান মতিউর রহমান নিরন্তর নিজেকে যেমন ফররুখ-চর্চায় নিয়োজিত রেখেছেন, তেমনি অন্যদেরকেও ফররুখ-চর্চায় যথারীতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। এ গ্রন্থটি ফররুখ আহমদের উপর সে প্রাতিষ্ঠানিক চর্চারই ফসল। 'ফররুখ একাডেমী পত্রিকা'য় প্রকাশিত বাছাইকৃত প্রবন্ধের সংকলন হলো 'ফররুখ আহমদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য'। তবে এছাড়াও আরো কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ সম্পাদক এ গ্রন্থে সংকলন করেছেন, গ্রন্থের মান বৃদ্ধি ও ফররুখ সম্পর্কে অধিকতর তথ্যাদি প্রদানের উদ্দেশ্যে। আশা করি, ফররুখ চর্চার ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটি অত্যন্ত মূল্যবান ও উপকারী হিসাবে বিবেচিত হবে। বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা পণ্ডিত ও গবেষকদের লেখায় সমৃদ্ধ এ গ্রন্থ ফররুখ-অনুরাগীদের নিকটও একটি আকরগ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ-এর পক্ষ থেকে কবি ফররুখ আহমদের উপর সংকলিত এরূপ একটি বৃহৎ কলেবরে সমৃদ্ধ ও মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করতে পেরে আমরা গভীরভাবে আনন্দিত এবং এজন্য মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট শুকরিয়া আদায় করছি।

(এস.এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

## সূচিপত্র ----------

# ফররুখের হাতেম তা'য়ী

## আবুল কালাম শামসুদ্দীন

"হাতেম তা'য়ী" কবি ফররুখ আহমদের লেখা প্রায় সোয়া তিন-শত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এক বিরাট মহাকাব্য। এ আখ্যায়িকা কাব্যটি যখন সাময়িক পত্রিকা মাসিক 'পূবালী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখনই কবি আবদুল কাদির, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক প্রমুখ সাহিত্য-সমালোচকগণ একে মহাকাব্য বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। আমি মনে করি, সব দিক দিয়ে বিবেচনা করে একে মহাকাব্য বলে আখ্যায়িত করলে ভুল তো কিছু করা হবেই না, বরং তাতে এর যথার্থ মূল্যায়ন হবে।

প্রাচীন মহাকাব্যগুলির আঙ্গিক, গাম্ভীর্য, **sublimity** স্বর্গ-নরক বর্ণনা, যুদ্ধ-বিদ্রোহের জমকালো বিবরণ এতে নাই বলে কেউ কেউ একে 'মহাকাব্য' বলতে আপত্তি উত্থাপন করতে পারেন, কিন্তু মহাকাব্যের প্রাচীন রূপকেই যদি তার একমাত্র সনাতন অনড় রূপ ভেবে এ -ধরনের আপত্তি উত্থাপিত হয়, তাহলে তা কতটা যুক্তিসহ হবে, তা-ই বিবেচ্য। দুনিয়ার কোনো কিছুই অচল-অনড় নয়-পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় মহাকাব্যের বিষয়বস্তু এবং ফর্মও অচল-অনড় অচলায়তনে সীমায়িত হয়ে থাকবে, এটাও প্রগতিশীল চিন্তার লক্ষণ নয়।

তা'ছাড়া প্রাচীনকালে মহাকাব্য লেখা হত পৌরাণিক বিষয়বস্তু নিয়ে। কিন্তু একমাত্র পৌরাণিক বিষয়বস্তু ছাড়া অন্য কোন বিষয় নিয়ে মহাকাব্য লেখা চলবে না, মহাকাব্য রচনার ক্ষেত্রে এমন একটি বিধি-নিষেধের কোনোরূপ যৌক্তিকতা আছে বা থাকতে পারে বলে আমি মনে করি না। অবশ্য হোমার, ভার্জিল, দান্তে, মিল্টন, গ্যেটে-এমন কি আমাদের মাইকেল মুধুসূদন পৌরাণিক বিষয়বস্তু নিয়েই তাঁদের মহাকাব্যগুলি লিখেছেন, একথা ঠিক। কিন্তু ঠিক পৌরাণিক কাহিনী নয়, ইতিহাসের পর্যায়েই পড়ে এমন বিষয়বস্তু নিয়েও মহাকাব্য রচিত হয়েছে, তেমন দৃষ্টান্তেরও তো অভাব নাই। ইরানের মহাকবি ফেরদৌসীর 'শাহনামা'কে মহাকাব্যই বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এর বিষয়বস্তু ঠিক পৌরাণিক বিষয়ের পর্যায়ে পড়ে না-পড়ে ইতিহাসের পর্যায়ে, এ-কথা সম্ভবত কেউই অস্বীকার করবেন না। 'শাহনামা'কে নিশ্চয়ই প্রাচীন ইরানের ধারাবাহিক ইতিহাস বলে অভিহিত করা যায়। 'শাহনামা'য় যুদ্ধ-বিদ্রোহের বর্ণনা আছে বটে, কিন্তু স্বর্গ-নরকের বিবরণ তাতে নাই। তবু এই বিশাল ঐতিহাসিক কাব্য বিশ্বসাহিত্যে মহাকাব্যের মর্যাদা পেয়েছে বলেই জানি। তেমনি আমাদের বাংলা সাহিত্যে যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'শিবাজী' ও 'পৃথ্বিরাজ' কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান' ও 'মহরম শরীফ' প্রভৃতি রচনাকেও অনেক সাহিত্যরসিক মহাকাব্যের মর্যাদা দিয়েছেন। তাতে তাঁরা অন্যায় করেছেন বলে আমি মনে করি না। মহাকাব্য সম্পর্কে প্রাচীন **Convention** তাঁরা ভেঙ্গেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগও খুব যুক্তিনির্ভর নয় এই কারণে যে প্রাচীন **Convention** আঁকড়ে থাকা প্রতিক্রিয়াশীলতারই নজীর মাত্র-এ চলমান বিশ্বে প্রতিক্রিয়াশীলতার কোন স্থান নাই।

ফররুখ আহমদের 'হাতেম তা'য়ী'কে প্রাচীনকালের পৌরাণিক মহাকাব্যগুলির নিরিখে মহাকাব্য হয়ত বলা চলে না। এতেই স্বর্গ-নরকের বর্ণনা নাই, আর প্রাচীন মহাকাব্যগুলির আঙ্গিকের বিশ্বস্ত অনুসরণও তেমন দেখতে পাওয়া যায় না। কাজেই পৌরাণিক মহাকাব্যগুলির নিরিখে যাঁরা এর বিচার করবেন, তাঁদের পক্ষে 'হাতেম তা'য়ী'কে মহাকাব্যের মর্যাদা দেওয়া হয়ত সম্ভব নয়। কিন্তু আমি আগেই বলেছি, কালে কালে যুগে যুগে অন্য সব-কিছুর মতো সাহিত্যে কাব্য-মহাকাব্যের ধারণাও বদলেছে—বদলে যেতে বাধ্য।

গ্যেটের এপিক-ড্রামা 'ফাউস্ট'-এর আঙ্গিকে আমরা হোমারের 'ইলিয়াড' বা মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট'-এর আঙ্গিকের অনুসরণ দেখতে পাই না। একই ছন্দে এটা লিখিত হয় নাই, রসের দিক দিয়েও আগেরকার মহাকাব্যগুলির সাথে 'ফাউস্ট'-এর পার্থক্য অত্যন্ত বেশী। তা'ছাড়া লিরিকধর্মী রচনাও এতে আছে। প্রতীকধর্মী চরিত্র—সৃষ্টির দিক দিয়েও 'ফাউস্ট'-এর একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তবু 'ফাউস্ট'-কে মহাকাব্যের মর্যাদাই দিয়েছেন সাহিত্য-সমালোচকগণ।

ফররুখ আহমদের 'হাতেম তা'য়ী'-র সাথে 'ফাউস্ট'-এর কতগুলি বিষয়ে মিল আছে। একই ছন্দে এটা রচিত নয় 'ফাউস্ট'-এর মতো এতেও নানা ছন্দের পরীক্ষা—নিরীক্ষার নিদর্শন আছে। তা'ছাড়া প্রতীকধর্মী চরিত্রসৃষ্টি 'হাতেম তা'য়ী'তে সুপ্রচুর। মানবতা হচ্ছে 'হাতেম তা'য়ী'র মূল সুর। এ গ্রন্থের নায়ক বা হিরো হাতেম তা'য়ী একটি গগনস্পর্শী মহান চরিত্র। তিনি ঢাল—তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ তেমন করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁর জীবন—রহস্যের সন্ধান দুর্বার অভিযানের চাইতে কম সাহসিকতাপূর্ণ নয়। এই কারণে প্রাচীন মহাকাব্যগুলির হুবহু অনুসরণ নাই বলে 'হাতেম তা'য়ী' মহাকাব্য নয়, এ-ধরনের রায় আমাদের মতে প্রতিক্রিয়াশীলতারই পরিচায়ক হবে।

বাংলা সাহিত্যে ফররুখ আহমদের এ-এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। প্রাচীন পুঁথির অনুসরণে কাব্য রচনার চেষ্টা অবশ্য নতুন নয়। এ প্রচেষ্টা ইতিপূর্বে কিছু কিছু দেখা গেছে বটে, কিন্তু পুঁথিকে অবলম্বন করে একটা আস্ত মহাকাব্য রচনার প্রয়াস বাংলা সাহিত্যে আর দেখা যায় নাই। তাছাড়া পুঁথি-সাহিত্যের বিষয়বস্তুই শুধু তিনি গ্রহণ করেন নাই, তাঁর ভাষার বিবর্তিত রূপ আধুনিক যুগে কিরূপ হতে পারে, তারও পরীক্ষা—নিরীক্ষা তিনি এ-কাব্যে করেছেন। নজরুল ইসলামের হাতেই এ-ভাষা সর্বপ্রথম সুষ্ঠু রূপ পায় বটে, কিন্তু পরবর্তীকালে একমাত্র ফররুখ আহমদ ছাড়া আর কারুর হাতেই এর সুষ্ঠুরূপ পরিপূর্ণভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায় নাই। এ-ভাষায় একটা মহাকাব্য লেখার প্রয়াস ফররুখ আহমদই প্রথম করেছেন এবং তাঁর চেষ্টা সফলও হয়েছে, এ-কথা বলতে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার কারণ দেখি না।

পুঁথিকাব্য 'হাতেম তা'য়ী'র আধুনিক কাব্যরূপ দানের জন্যে যে এ ভাষাই সুন্দর ও সুসঙ্গত তাতে আমার সন্দেহ নাই, সংস্কৃত-ঘেঁষা ভাষায় এ-কাব্য এত সুন্দর হতে পারত না। আমাদের যেসব উন্নাসিক সাহিত্যকর্মী ফররুখ আহমদের এ-কাব্য রচনায় নাক সিট্‌কাবার দুঃসাহস করবেন, তাদের আমি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্প্রতি-প্রকাশিত উপন্যাস 'গন্না বেগম' পড়তে অনুরোধ জানাব। পূর্ব-পাকিস্তানের কোনো

সাহিত্যিক এ-ভাষায় কোনো শিল্পসৃষ্টির কাজে হাত দিলে পূর্ব-পাকিস্তানেরই একশ্রেণীর সাহিত্য-মহলে যেখানে নাক-সিটকাতে দেখা গেছে, পশ্চিম বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সেখানে এই ভাষায় উপন্যাস লিখতে দুঃসাহসী হবেন, এটা কে ভাবতে পেরেছিল? কিন্তু তারাশঙ্কর যেহেতু অত্যন্ত শক্তিশালী বাস্তববাদী কথা-সাহিত্যিক, তাই তিনি সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, বিষয়বস্তু বিচার করে উপযুক্ত ভাষা নির্মাণ করতে না পারলে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনা করা সম্ভব নয়। সম্রাট আওরঙ্গজেবের পরবর্তী বাদশাহী আমলের ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু নিয়ে লিখেছেন তিনি তাঁর এই উপন্যাস 'গন্না বেগম'। সত্যিকার কথা-সাহিত্যিকের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সে যুগের ঐতিহাসিক ঘটনাবলি নিয়ে লিখিত উপন্যাসে সে যুগের সার্থক চিত্র ফুটাতে হলে উপযুক্ত ভাষা প্রয়োগ ব্যতিরেকে তা সম্ভব নয়। এই কারণে আদ্যোপান্ত এই উপন্যাসটি লিখেছেন, যা আমাদের পুঁথি-সাহিত্যের ভাষার অত্যন্ত নিকটবর্তী এমন কি, পুঁথি-সাহিত্যের এতটা সন্নিহিত ভাষায় কোনো মুসলমান লেখকও এত বড় একটা বই লিখেছেন বলে আমার মনে পড়ে না। এজন্যে তাঁর উপন্যাসখানা বিন্দুমাত্র অসুন্দর তো হয়ই নাই, বরং মনে হয়, এর চাইতে সার্থক সুন্দর রচনা বাংলা সাহিত্যে খুবই কম লিখিত হয়েছে। তবে সত্যের অনুরোধে আমাকে এখানে বলতেই হচ্ছে যে, লেখকের আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ কোনো কেনো ক্ষেত্রে সুষ্ঠু হয় নাই-এমন কি ভুলও হয়েছে।

তারাশঙ্করের এই দুঃসাহসী প্রচেষ্টা আমাদের পূর্ব-পাকিস্তানী উন্নাসিক সাহিত্যিকদের, এমন কি পশ্চিম বাংলার সাহিত্যিকদেরও, বিষয়বস্তু অনুসারে যোগ্যভাষা নির্মাণে সচেতন করতে পারলে সত্যিই সুখের বিষয় হবে।

মহাকাব্য হিসাবে ফররুখ আহমদ রচিত 'হাতেম তা'য়ী'র নতুনত্ব সম্পর্কে আরো একটি কথা বলা যায় যে, এতে অমিত্রাক্ষর ছন্দের যে রূপ দেখা গেছে, তা মাইকেলের অমিত্রাক্ষর থেকে বেশ কিছুটা পৃথক। মাইকেল থেকে শুরু করে এ-যাবত বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের রচনায় চৌদ্দ অক্ষরের পদ দেখা গেছে। ফররুখ আহমদ অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনার এই কনভেনশন ভেঙেছেন। অবশ্য এর সূচনা তাঁর 'নৌফেল ও হাতেম' কাব্যনাট্য থেকেই। তিনি এর প্রতি পদে আঠারো অক্ষর ব্যবহার করেছেন। তাতে এ-ছন্দের ধ্বনি-গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে আমার মনে হয় নাই। বরং মনে হয়েছে, ফররুখ আহমদের অমিত্রাক্ষর ছন্দ নিয়ে এই নতুন এক্সপেরিমেন্ট তাঁর রচনার বিষয়বস্তুর সাথে এমন খাপ খেয়েছে যে, চৌদ্দ অক্ষরের পদ যেনো তা এমন সুন্দর হতে পারতো না। এখানে একটুখানি নমুনা দিচ্ছিঃ

> যখন রক্তিম চাঁদ অন্ধকার তাজীতে সওয়ার
> উঠে আসে দিগ্বলয়ে, ওয়েসিস নিস্তব্ধ নির্জন,
> দূরে পাহাড়ের চূড়া ধ্যান-মৌন; অজানা ইঙ্গিতে
> তখনি ঘুমন্ত প্রাণ জেগে ওঠে। তখনি এ মনে
> মরু প্রশ্বাসের সাথে জেনে ওঠে বিগত দিনের
> দীর্ঘশ্বাস। আধো-আলো-অন্ধকারে দেখি আমি চেয়ে

বিস্মৃতির দ্বার খুলে উঠে আসে ঘুমন্ত স্মৃতিরা।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের গাম্ভীর্য এতে অটুট আছে এবং যতি প্রয়োগের নিপুণতার জন্যে রচনার কাব্যময়তা পাঠক-চিত্তে আনন্দের শিহরণ তোলে।

উপমা প্রয়োগের দিক দিয়ে ফররুখ আহমদ হোমার বা মাইকেলের মতো দক্ষতা বা শক্তির পরিচয় দিতে পেরেছেন, একথা বলি না। বিশেষ করে হোমারের উপমায় তাঁর সমসাময়িককালের সমাজ ব্যবস্থার যে পূর্ণায়ত চিত্র পাওয়া যায়, ফররুখ আহমদ উপমা রচনায় সে-দিক দিয়ে যান নাই। ফররুখ আহমদের উপমা চিত্রধর্মী তেমন নয়, যতটা বর্ণনাধর্মী। যেমন :

রয়েছে অজানা তবু জীবনের রহস্য বিপুল
—শীতের প্রথম সূর্য কুহেলিতে আচ্ছন্ন যেমন।

কিংবাঃ

—শস্যদানা ওষ্ঠপুটে যেমন জালালী কবুতর
দূর দারাজের রাহা পাড়ি দিয়ে ফিরে আসে তার
পরিচিত নীড়ে, ফিরিল হাতেম তা'য়ী শাহাবাদে
প্রশ্নের উত্তর নিয়ে বক্ষপুটে।

পূর্ণায়ত চিত্র না হলেও এ-উপমাগুলি কম উপভোগ্য নয়, এবং এর কাব্যমূল্যও যথেষ্ট বলেই আমার ধারণা। আগেই বলেছি, শুধু অমিত্রাক্ষর ছন্দেই ফররুখ আহমদ এ-মহাকাব্য লেখেন নাই। তিনি নানা সমিল ছন্দও এ-কাব্যে ব্যবহার করেছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর "মেঘনাদবধ কাব্য"-এ অমিত্রাক্ষর ছাড়া অন্য কোনো ছন্দ ব্যবহার করেন নাই বটে, তবে আমাদের অন্যান্য মহাকাব্য-লেখক কবিদের এ ধরনের রচনায় বিভিন্ন সমিল ছন্দের ব্যবহার দেখা গেছে। একই ছন্দের একঘেয়েমি কাটাবার উদ্দেশ্যেই সম্ভবত তিনি এ পন্থা অবলম্বন করেছেন। ফররুখ আহমদও তাঁর পূর্ববর্তী মহাজনদের এ-পন্থা অনুসরণে দ্বিধাগ্রস্ত হন নাই। তবে এ-সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত ধারণা এই যে, মহাকাব্যে এ-পন্থা অনুসরণের ফলে এর ভাষার একঘেয়েমি যত দূরই হয়ে যাক না কেন, মহাকাব্যের গাম্ভীর্য ও **Sublimity** যেনো এর ফলে কিছুটা ক্ষুণ্ন না হয়ে পারে নাই। সমিল চটুল ছন্দ যত উপভোগ্যই হোক, মহাকাব্যের জন্য অপরিহার্য গাম্ভীর্য ও **Sublimity** রক্ষার তেমন অনুকূল হতে পারে নাই।

তবে 'হাতেম তা'য়ী'র বিষয়বস্তু এমন বিচিত্র, চমকপ্রদ ও রহস্যময় যে, শুধু এক অমিত্রাক্ষর ছন্দে এর রসঘন রূপায়ণ সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। এবং সম্ভবত এই কারণেই ফররুখ আহমদ অমিত্রাক্ষর ছন্দের সাথে বিভিন্ন ছন্দও এ কাব্যে আমদানি করেছেন। তাতে মহাকাব্য হিসাবে এর গাম্ভীর্য ও **Sublimity** হয়ত কিছুটা ক্ষুণ্ন হয়েও থাকতে পারে, কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এর সার্থক রূপায়ণ সম্ভব হয়েছে। **(সংকলিত)**

# আমার ছাত্র ফররুখ

## আবুল হাশেম

১৯৩৬ সালে বদলি হলাম খুলনা জেলা স্কুলে। সেখানে অজানা মুখের মধ্যে দেখতে পেলাম একমাত্র চেনা মুখ বন্ধু আবুল ফজলের। ইতিপূর্বেই তাঁর সংগে আলাপ হয়েছিল। খুলনা জেলা স্কুলের ম্যাগাজিনখানার ভার তাঁর উপরেই ন্যস্ত ছিল। আমি সে স্কুলে যোগ দিতেই সে ভারটা তিনি আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে এম. এ. পরীক্ষা দেবার জন্য তোড়জোড় শুরু করলেন।

ভারটা নিয়ে দেখি কাজটা তত সোজা নয়। একে তো পাঠ্য ছাড়া আর কিছু খোকাদের কলমের মুখে আসতেই চায় না, তার উপর আবার টোকাই বাছার বিপদ। ভারি ঝামেলায় পড়েছিলাম। এর মধ্যে একটা ছেলে এসে একটা লেখা হাতে দিল। ছেলেটাকে দেখতাম ক্লাসের অন্য ছেলেরা যখন মাস্টার সাহেবদের জব্দ করবার জন্য ফন্দি আঁটতে থাকতো, তখন সে বসে থাকতো নির্বাক মুখে, বই মেলে তার ডাগর চোখ দু'টি ঢেকে। লেখাটা পড়ে দেখলাম। চমৎকার লাগল। একটু ঘষামাজা করে সেটা প্রেসে পাঠিয়ে দিলাম।

এই ছেলেটিই হ'ল ফররুখ আহমদ। সে সেই বছরেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে খুলনা ছেড়ে চলে গেল। এর বন্ধুরা বলতো, কলকাতার বড় পরিবেশে গিয়ে সে নাকি কবিতার তীর ছুঁড়বার স্থান পেয়েছিল। এর
বেশী আর কোন খবর তার সম্বন্ধে রাখতে পারি নি।

তারপর দশ বছর কেটে গেল। অসহ্য পেটের বেদনায় অস্থির হয়ে নাড়ি কাটাবার জন্য ছুটে গিয়েছিলাম কলকাতায়। আশ্রয় নিয়েছিলাম ধর্মতলাতে আমার স্ত্রীর অগ্রজের বাসায়। সেখানে গিয়ে দেখি প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁও কয়েকদিন হ'ল অতিথি হয়ে আছেন অনুরূপ আত্মীয়তা সূত্রে। প্রিন্সিপাল সাহেব সে বছর এ্যাসেমব্লিতে আসন নেবার জন্য আয়োজন করছিলেন।

একদিন প্রিন্সিপাল সাহেব বাইরে থেকে ঘর্মাক্ত কলেবরে ঘরে এসে দু'খানা বই টেবিলের উপর রাখলেন। সেই বই দু'খানির একখানি ছিল 'সাত সাগরের মাঝি'। প্রিন্সিপাল সাহেব বললেন, 'কবি ফররুখ আহমদ আপনাকে সালাম জানিয়েছেন'। খবরটা শুনে খুশী হলাম। ফররুখ আমার প্রতি স্বাভাবিক সৌজন্যটুকু দেখাতে ভোলে নি বলে। হাত বাড়িয়ে 'সাত সাগরের মাঝি'খানা তুলে নিলাম। আগাগোড়া তুলট কাগজে ছাপা। তখন তুলট ছাড়া আর কাগজ মিলত না কলকাতা শহরে। বইখানা কবিতায় সাজানো। খুলতেই চোখে পড়ল 'সিন্দবাদ'। তার শুরুতে আছে–

"কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ,
শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ,

পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ ব'য়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক;"

পড়েই কেমন যেন একটা নতুন আমেজ অনুভব করলাম। একটা নতুন ছবি চোখের ওপর ভেসে উঠল। নতুন ছন্দের কাঁপন লাগল মনে। এ ঘটনার বেশ কয়েক বছর পরে যখন মুসলিম লীগের জয়জয়কার ধ্বনিত হচ্ছিল সারা দেশ জুড়ে, তখন একটা গান প্রায়শঃ কানের কাছে ড্রাম বাজাতো 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' বলে। কিছুদিন পরে শুনতে পেলাম, বিরাট ব্যক্তিত্বশালী স্বয়ং আকরাম খাঁ সাহেবের সঙ্গে নাকি ঝগড়া বেঁধেছে ফররুখের ঐ গানটির রচনা-স্বত্ব নিয়ে। আরো নাকি একজন প্রকাশকের সাথে তার মামলা হয়েছিল কোন পাঠ্য বইয়ের গ্রন্থস্বত্ব নিয়ে। মামলায় কি হয়েছিল জানি না। দরিদ্র গ্রন্থকারদের কয়জনই বা পেয়েছে প্রবল প্রতাপ প্রকাশকদের সংগে মামলা করে। সে সব কথা যাক।

তারপর বহু পানি গড়িয়ে গেছে পদ্মা-মেঘনা দিয়ে। এর মধ্যে দেশ হয়েছে ভাগাভাগি– জেগে উঠেছে পূর্ব পাকিস্তান।

সেগুনবাগিচায় তখন 'মাহেনও'-এর অফিস খোলা হয়েছিল। আমি মাঝে মাঝে সুযোগ পেলেই আবদুল কাদির সাহেবের দরবারে গিয়ে বসতাম। আরো কেউ কেউ আসতেন, আবদুল কাদির সাহেবের সরস রহস্যে দিনটি বেশ কেটে যেত। এর মধ্যে একদিন দেখতে পেলাম কোমল শ্মশ্রুমণ্ডিত একখানি সুন্দর মুখ। আবদুল কাদির সাহেব পরিচয় করে দিয়ে বললেন, 'কবি ফররুখ আহমদ'। ফররুখ বলল, 'আস্‌সালামু আলাইকুম, স্যার'। আমি তো চিনতেই পারি নি তাকে। আবদুল কাদির সাহেবের সাথে তার আলাপ-আলোচনা শুনে বুঝতে পারলাম, সেই খুলনা স্কুলে যে ফররুখকে আমি দেখেছিলাম এ সে ফররুখ নয়, এখন সুদূরপ্রসারী তার কর্মবলয়।

এরপরে আর একদিন তার সংগে দেখা হয়েছিল, কবি জসীমউদ্‌দীন-এর বাড়ী যেতে রাস্তার উপরে। রাস্তায় দাঁড়িয়েই সে অনেকক্ষণ আলাপ করল। আমাকে সে জিজ্ঞেস করল, "আপনার 'হাতেম তা'য়ী' কোথায় পাওয়া যাবে, স্যার ?" আমি বললাম, 'হাতেম তা'য়ী বলে আমার কোন স্বতন্ত্র বই নেই, একটা কবিতা আছে আমার 'কথিকা'য়। সে জানতে চাইল যে আমি তখন কোথায় যাচ্ছিলাম। আমি বললাম, 'কবি জসীমউদ্‌দীনের সংগে দেখা করে আসি, চলো না যাই।' কিন্তু তার অনীহা দেখে মনে হয়, নিজের স্বাতন্ত্র্য আচ্ছন্ন করতে সে ইচ্ছুক নয়। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই প্রকাশিত হয়েছিল তার কাব্য-নাটিকা 'নৌফেল ও হাতেম'।

দারিদ্র্যের যষ্টি-আঘাত কবি নজরুল ইসলামকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল হিজ মাস্টার্স ভয়েসে। ফররুখ আহমদকেও আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিল রেডিও পাকিস্তান, ঢাকায়। সেখানে একদিন সে আমাকে পেয়ে জোর করে নাশতা খাইয়ে দিয়েছিল। আরো একদিন সেখানে তার দেখা পেয়েছিলাম। সেই আমাদের শেষ দেখা। সে আমাকে বলল, 'আপনার জীবনীটা লিখুন না, স্যার।' আমি বললাম, 'সেটা কে পড়বে, বলো ?' সে উত্তর দিয়েছিল, 'কেউ  পড়ুন আর নাই পড়ুন, আপনি তো কালের পাতায় রেখে গেলেন আপনার কর্মের কিছু চিহ্ন।'

তখন তার কথাটায় তেমন আমল দিই নি। কিন্তু তার মৃত্যুর পর কেমন যেন নিসপিস করে উঠলো আমার হাতটা। সেই কথাটা আমি উল্লেখ করেছি আমার 'কাহিনী ও কিংবদন্তী'র (সচিত্র বাংলাদেশ, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৮২) গোড়াতেই।

ফররুখ আহমদের স্মৃতির টুকরোগুলো আমার মনে যে প্রভাব কেটেছিল, তার ফলে পরবর্তীকালে আমি একটা কবিতাই লিখে ফেলেছিলাম। কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম ঃ

### আমার গর্ব

"ধর্মতলার স্ট্রীটে একদিন গুমোট সন্ধ্যাবেলা,
তালপাখা নিয়ে গ্রীষ্মের সাথে হচ্ছিল মোকাবেলা।
এমন সময় হাতে এসে গেল 'সাত সাগরের মাঝি'
তুলোট কাগজে নিখুঁত সাজানো যেন কবিতার সাজি।
হাতে নিয়ে দেখি, এ কি অদ্ভুত সাগরের গর্জন !
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ওঠে ক্ষুদ্র মনের কি এক আস্ফালন।
তুচ্ছ করে সে ঝঞ্ঝা-ঝাপটা অশনির সংঘাত
ক্ষিপ্ত সাগরে পাল তুলে ছোটে বাহ্‌রী সিন্দবাদ।
দশ বছরের স্মৃতির ফলক পলকেই গেল খুলে
মন চলে গেল খুলনা শহরে রূপসা নদীর কূলে।
জেলা স্কুলের ম্যাগাজিনখানা সম্পাদনার তাড়া
আমার মগজে গজগজ ক'রে দিচ্ছিল বেশ নাড়া।
এমন সময় কিশোর বালক চোখ দুটো টানা টানা,
টেবিলের কোণে রেখে গেল তার ক্ষুদ্র কবিতাখানা।
ক্ষুদ্র হলেও পড়ে দেখি, এ কি ! নতুন ছন্দদোলা
দোলাইয়া গেল নিভৃত মনের অনুভূতি চঞ্চলা !
ভাবলাম মনে কোথা হতে হবে হয়তো পাচার করা

অনেকেই করে সে শুভ কাজের কয়জন পড়ে ধরা !
এই ভেবে অবশেষে

কবিতাটি তার পাঠিয়ে দিলাম প্রেসে !
এতদিন পরে কানে এল সেই সিন্ধুর গর্জন
বাহ্‌রী ছুটেছে লক্ষ্য যে তার হেরার রাজতোরণ।
রক পাখি যেন উড়ে চলে যায় শোনে না সে কারো মানা,
সাইমুম যেন মনসুন সাথে জড়ায়ে নিয়েছে ডানা।
দিজলা যেন রে পদ্মার সাথে এ দেশে নহর তোলে

দিলরুবা আর সেতার বীণায় বাংলার নদী দোলে।
গর্বে আমার বুকখানা ওঠে ফুলে
সেই পথিকের প্রথম তোরণ আমিই দিয়াছি খুলে।"

আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আর একবার হাতে নিলাম 'সাত সাগরের মাঝি'। বইটিতে কোন নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধানের আনন্দ অনুভব করি নি, যা করেছি সেটা হলো তার যাদুকরী ছন্দের দোলা। যেমন ঃ

"কত যে আঁধার পর্দা পারায়ে ভোর হ'ল জানি না তা'।
নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা।"

নারঙ্গী বনের দৃশ্য কখনো চোখে দেখিনি, কিন্তু কবিতাটি পড়তেই যেন সেই সবুজ পাতার কাঁপন মনের কোণে নাচন তুলে দেয়।

ফররুখ আহমদের কবিতার গায়ে এমন সব চুমকির কাজ চোখে পড়ে যা সমগ্র কবিতা-বস্ত্রটিকেই অপরূপ রূপে ঝলমলে করে তোলে। যেমন ঃ 'নীল আকাশে চমকায় তলোয়ার' (বার দরিয়ায়), 'নিকষ-আকিক বিছানো' (সিন্দবাদ), 'মখমল দিন' (ঐ), 'জীবনের তাজা ঘ্রাণ' (ঐ), 'রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী ?' (পাঞ্জেরী), 'প্রবাল দ্বীপের নারিকেল শাখা বাতাসে উঠিছে বাজি' (সাত সাগরের মাঝি), 'তবু দেখা যায় দূরে বহুদূরে হেরার রাজতোরণ' (সাত সাগরের মাঝি) প্রভৃতি। অদ্ভুত তার রচনাশৈলী। পড়বার সংগে সংগেই মনের চোখে ফুটে ওঠে তরুরাজিনীলা মসলাদ্বীপের ছবি–তার সামনে নেমে পড়েছে বিরাট পাখা মেলে সিন্ধু-ঈগল। এ ছবি অপূর্ব ! সুদূর সিন্ধুপারে হেরার রাজতোরণ অভিমুখে সিন্দবাদের অভিযাত্রা যেন জীবন্ত আমেজে অভিষিক্ত করে পাঠকের মন।

আরবি-ফারসি শব্দ মিশিয়ে লেখা কবিতায় যে অপরূপ মাধুর্য ফুটে উঠতে পারে বাংলা কবিতার গায়ে তার নমুনা আমরা পেয়েছি সত্যেন দত্ত, কাজী নজরুল ইসলাম ও মোহিতলালের কবিতায়। অবশেষে ফররুখ আহমদের কবিতায় ফুটেছে যে বর্ণালী, তা যেন আর কারো সংগে মেলে না– অথচ তা সুন্দর। **(সংকলিত)**

---

**(ফররুখ একাডেমী পত্রিকা একাদশ সংখ্যা জুন-২০০৫)**

# কবি ফররুখ আহমদ

**আবুল ফজল**

কবি ফররুখ আহমদের অকালমৃত্যুতে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের যে ক্ষতি হলো তা সহজে পূরণ হওয়ার নয়। তিনি এক বিশেষ কাব্য-ধারার অনুসারী এবং নিজস্ব একটা আদর্শ আর ভাব-কল্পে ছিলেন বিশ্বাসী, তাঁর কাব্য-দেহে এসবের প্রতিফলন অসন্দিগ্ধ। আমরা যারা কিছুটা বিপরীতপন্থী তারাও তাঁর কবিতায় ধর্মীয় চেতনা ও ঐতিহ্যের একটা অনাবিল স্বাদ পেয়ে থাকি। তাঁর বিশ্বাস আর উপলব্ধি অকৃত্রিম আর একান্ত আন্তরিক বলে, এ ধরনের ভাবাদর্শে রচিত বহু কবিতা হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল, উচ্ছল ও হৃদয়স্পর্শী। অনড় বিশ্বাস আর আবেগের তোড়ে তিনি খাঁটি কবিতার সীমা লঙ্ঘন করেননি, বক্তব্যের উচ্চরোল অনেক সময় কবিতাকে বিঘাত করে, ফররুখ আহমদের বেলায় তা ঘটেনি, কবিতার মূল্যে কণ্ঠস্বরের দাম বাড়াবার কোশিস করেননি তিনি। খাঁটি কবির এসব লক্ষণ তাঁর কবি-সত্তার মর্মমূলে সব সময় সক্রিয় ছিল বলে তাঁর কবিতা কখনো হয়ে পড়েনি স্রেফ প্রচারসর্বস্ব, তাঁর পাঠকদের পক্ষে এটি পরম সৌভাগ্যের কথা।

তাঁর সমসাময়িক কবি-কুলের মধ্যে তিনি এতখানি বিশিষ্ট, স্বতন্ত্র ও একক ছিলেন যে তাঁকে সহজে কাতার-বন্দী করা যায় না। তাই তাঁর তিরোধানে এমন এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে যার জন্য আমরা বিপরীত-মনারাও বেদনাবোধ না করে পারি না। ...কবি ফররুখ আহমদ শুধু যে এক বিশেষ ঐতিহ্যানুসারী ছিলেন তা নয়, সে সঙ্গে ঐতিহ্যসন্ধানীও ছিলেন। চেয়েছিলেন বাংলা কাব্যে নতুন ঐতিহ্য নির্মাণ করতে। তাই ইসলামের হারানো ইতিহাস আর নানা কাব্য ও কল্পকাহিনীতে তিনি তাঁর ধ্যান আর কবিতার উপজীব্য খুঁজেছেন এবং তাঁর সৃজনশীলতাকে তাতেই রেখেছিলেন অনেকখানি সীমিত। সিন্দাবাদ, হাতেম ও নৌফেল ইত্যাদি নাম-চরিত্র এ কারণেই তাঁর কাব্যের অনুষঙ্গ হয়েছে বারবার। মনে হয় কবি আরব্যোপন্যাসের মুগ্ধ পাঠক ছিলেন। ফলে 'হাজার এক রজনী'র বহু ঘটনা ও চরিত্র এ কবির হাতে পেয়েছে নতুন প্রাণ। 'শাহেরজাদী' আর শাহরেজাদীর মুখে মুখে রচিত বহু কল্প-চিত্র ও চরিত্র তাঁর রচনাগুণে হয়ে উঠেছে 'কাব্যের সত্য'। ফররুখ আহমদের এ কবি-কীর্তি বাংলা কাব্য-রসিকদের কাছে দীর্ঘকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ইংরেজ যুগ, পাকিস্তান আমল, পরিশেষে স্বাধীন বাংলাদেশ-এ তিন সংঘাত-মুখর যুগের অনেক ঝড়-ঝাপটায় আরো অনেকের মতো, এ কবির জীবনও কেটেছে। এ ঝড়-ঝাপটায় অনেকে বিচলিত হয়েছেন, হয়েছেন লক্ষ্যভ্রষ্ট। অনেক কবি সাহিত্যিক শিল্পীও এ পরিণতি এড়াতে পারেননি। অনেকের মন-মানস নোঙর-হীন নৌকোর

মতো বারবার দোলা খেয়েছে, হয়েছে একাৎ ওকাৎ। কিন্তু কবি ফররুখ আহমদ অবিচল থেকেছেন সর্ব অবস্থায় নিজের লক্ষ্য ও আদর্শে। চরম দুঃখ-দুর্দিনেও 'হেরার রাজ-তোরণ' থেকে চোখ ফেরাননি তিনি ডানে কি বাঁয়ে। এ অস্থির যুগে একনিষ্ঠার এমন নজীর বিরল বললেই চলে।

এর বাইরে স্বদেশের প্রকৃতিও তাঁকে আকর্ষণ করেছে এবং চারিদিকের মানুষের দুঃখ-দুর্দশায় তাঁর মন হয়েছে আলোড়িত। তাঁর বহু কবিতা আর সনেটে এ সবের আশ্চর্য প্রতিফলন পাঠকের নজরে না পড়ার কথা নয়। তবে আমৃত্যু তাঁর কবি-দৃষ্টির সামনে ধ্রুবতারা হয়েছিল ইসলাম আর ইসলামী ঐতিহ্য এবং যা কিছু তার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

সংখ্যাতীত অক্ষর-জানা লোক এখন কবিতা লিখে থাকেন, কিন্তু তাঁদের অনেকে মোটেই কবি নন। কবিতাকে সহজতম সাহিত্যকর্ম মনে করে এরা অহরহ অজস্র অপাঠ্য পদ্য লিখে থাকেন। দীর্ঘ প্রস্তুতি, কবি-মানস আর কবি-দৃষ্টির অধিকারী না হলে যেন তেন প্রকারে পদ্য একটা দাঁড় করানো যায় না যে তা নয় কিন্তু তা কবিতা হয় না। একটা সুনির্দিষ্ট মতাদর্শে প্রবলভাবে বিশ্বাসী থেকেও ফররুখ আহমদ বিশুদ্ধ কবি ছিলেন। এ কারণে আপন লক্ষ্যে এতখানি স্বনিষ্ঠ থেকেও কবিতার নানা স্রোতে বিচরণ তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছে। আদর্শনিষ্ঠ কবিরা সাধারণত একচোখা তথা এক-স্রোতা হয়ে থাকেন। সুখের বিষয় ফররুখ আহমদ তা হননি। রচনার অজস্রতায়, আঙ্গিক আর ভাবের বৈচিত্র্যে, নতুন আমদানিকরা শব্দসম্ভারে এ কবি নিশ্চিতভাবে আমাদের সাহিত্যের সম্পদ বাড়িয়েছেন। তাঁর এসব অবদান মূল্যবান ও স্বীকৃতির দাবী রাখে।

তাঁর মতো একজন শক্তিমান, একনিষ্ঠ আর বিচিত্র-মনা কবি যদি মৃত্যুর সাথে সাথে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যান, তাঁর বর্ণাঢ্য সৃষ্টি যদি আমাদের সাহিত্যাঙ্গণ থেকে হারিয়ে যায়, তা হলে তা হবে খুবই দুঃখের বিষয় এবং সাহিত্যের দিক থেকে ক্ষতিকর। এবং সে সঙ্গে আমাদের চরম ঔদাসীন্য, কবি ও কবিতার প্রতি সামাজিকভাবে আমাদের অনীহারও এ হয়ে থাকবে এক সুনিশ্চিত দিগদর্শন। এ লজ্জাকর অবস্থার হাত থেকে বাঁচার জন্য আমাদেরকে ফররুখ আহমদের মূল্যায়নে যথাযোগ্য ভূমিকা পালন অপরিহার্য। **(আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত 'ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা'-এর 'প্রসঙ্গ কথা'র অংশবিশেষ)।**

# অনমনীয় ফররুখ

## দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

আমি কবি ফররুখ আহমদের প্রথম খোঁজ পেলাম সিলেটে আমার আত্মীয় আমীনূর রশীদ চৌধুরীর নিকটে। তিনি আমায় বললেন, –তাঁরই আত্মীয়া বেগম সুফিয়া হোসেনের (কলকাতাস্থিত) বাড়ীতে ফররুখ আহমদকে তিনি দেখেছেন। কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে ফিলোসফিতে অনার্স পড়ে, –একটা নিতান্ত ছেলে-মানুষ। সুফিয়া আপাকে আম্মা ব'লে সম্বোধন করে।

ইতিমধ্যে ফররুখ আহমদের অনেকগুলো কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, এবং ফররুখ ক্রমেই প্রতিষ্ঠা লাভ করছেন। তিনি যতই প্রতিষ্ঠিত হতে লাগলেন, তাঁকে দেখার জন্য আগ্রহ তত বেড়েই চলল। কলকাতাতে ঘনঘন যাতায়াত করলেও ফররুখ আহমদের কোন ঠিকানা কেউ দিতে পারেন নি। তাই আগ্রহ থাকলেও তা চেপেই যেতে হল। ভারত বিভাগের পরে কলকাতা থেকে প্রায় সকল মুসলিম সাহিত্যিকই ঢাকায় এসে জড়ো হলেন। পত্র-পত্রিকায় তাঁদের লেখা ছাপা হওয়ার পর, স্পষ্ট বোঝা গেল তাঁরা খোশহালে ও বহাল তবিয়তে ঢাকায় আছেন। ১৯৪৭ সালে, অধ্যাপক আবুল কাসেমের কর্মতৎপরতার ফলে ঢাকায় 'পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় বৎসর কাল পরে, আমি সে মজলিসের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ি। ১৯৪৯ সালে সে মজলিসের উদ্যোক্তাগণ আমাকে তার সভাপতি নির্বাচিত করেন। তখন আমার কর্মক্ষেত্র সুনামগঞ্জ হ'লেও মজলিসের সেক্রেটারি অধ্যাপক আবুল কাসেমের আহ্বানে আমাকে ঘনঘন ঢাকায় আসতে হত এবং সে সংগঠনের নানা সভায় যোগদান করতে হত। অধ্যাপক আবুল কাসেম হঠাৎ সংকল্প করে বসলেন 'বিপ্লবী উমর' নামে একখানা সংকলন বের করে হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর অতুলনীয় জীবনকে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকসাধারণের সামনে তুলে ধরতে হবে। এজন্য আমায় হযরত উমর ফারুক (রাঃ) সম্বন্ধে একটা গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখতে হবে। অধ্যাপক আবুল কাসেম তথা তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 'সৈনিক' পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক তরুণ ছাত্র আবদুল গফুর। কোনরূপ দেরী না করেই আমার প্রবন্ধটা আমি পাঠিয়ে দিলাম এবং মাসখানেকের মধ্যেই স্বয়ং ঢাকায় চলে এলাম।

তখন অধ্যাপক আবুল কাসেম থাকতেন ১৯ আজিমপুর রোডে। তিনি 'সৈনিক' পত্রিকাকে সুচারুরূপে সম্পাদনা করে প্রকাশের উদ্দেশ্যে একটা প্রেস বসিয়েছেন –তাঁর বাড়ির ঠিক পাশেই। তাতে পশ্চিমদিকে অতিথি-অভ্যাগত এলে তাদের থাকারও বন্দোবস্ত করা হত। আমি সেখানে যেয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই অধ্যাপক আবুল কাসেমের পাশে উপবিষ্ট একজন সৌম্যদর্শন যুবককে দেখে বুঝতে পারলাম –ইনি সাধারণ লোক নন। কি এক অপূর্ব জ্যোতি তাঁর মুখমণ্ডলে, এবং চোখ দু'টোতে কী স্বপ্নিল আবেশ ! আমাকে দেখেই আবুল কাসেম সাহেব বললেন, "এই যে আজরফ

সাহেব এসে গেছেন, আপনার আর চিন্তার কোন কারণ নেই।" তারপরে উক্ত যুবকের দিকে ইংগিত ক'রে বললেন, "ইনি হচ্ছে কবি ফররুখ আহমদ –"সাত সাগরের মাঝি"র কবি। আপনি ঢাকায় আসবেন জেনে আমার এখানে এসে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।" তাঁর মত একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি কেন আমার মত একজন অখ্যাতনামা লোককে খুঁজছেন, এ প্রশ্ন ভাষায় না করলেও, আবুল কাসেম সাহেব আমার অব্যক্ত জিজ্ঞাসার মর্ম বুঝতে পেরে বললেন, "তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ–'সাত সাগরের মাঝি'র দ্বিতীয় সংস্করণ হয়েছে, তার উপর তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সিরাজাম মুনীরা'ও প্রকাশিত হয়েছে। তিনি চান, যেন দু'খানা কাব্যেরই সমালোচনা আপনি করেন।" একথা বলার সংগে সংগেই ফররুখ আহমদ তাঁর কাব্যগ্রন্থ দুটি আমার হাতে দিয়ে বললেন, "অনেকেই এ দু'খানা বই সমালোচনা করতে চেয়েছিলেন, আমি তাতে রাজি হই নি, –তাই আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি। আপনি ছাড়া অন্য কাউকে দিয়ে আমি এ পুস্তকগুলোর কোন সমালোচনা করাতে চাইনে।" এরূপ উক্তিও এক তাজ্জবের ব্যাপার। তিনি কি 'পূর্ব-পাকিস্তানে'র মধ্যে আমাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক বলে গণ্য করেন ? যাক, অত্যন্ত সংকোচের সংগেই তাঁর এ দু'খানা কাব্য গ্রহণ করে আমার সুটকেসে পুরে নিলাম।

সে সময় তমদ্দুন মজলিস কর্তৃক 'দ্যুতি' নামক একখানা মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। ফররুখ আগ্রহ সহকারে বললেন, "আপনি 'দ্যুতি'তে কাব্য দুটির সমালোচনা করলে খুশী হব।" আমি তথাস্তু বলে তাতে সম্মতি প্রকাশ করলাম। তারপরে দীর্ঘকাল যাবৎ যতবার ঢাকায় এসেছি, কোন কোন সময় ১৯ আজিমপুরাতে, না হয় অন্য কোথাও ফররুখ আহমদের সংগে আমার দেখা হয়েছে। দেখা হলেই তখনকার দিনের মুসলিম সমাজের অবস্থা, আমাদের সাহিত্যিকদের মানসিকতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হত। –আমি লক্ষ্য করতাম, মাওলানা আকরাম খাঁ, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডঃ মোতাহার হোসেন ইসলাম সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করতেন, ফররুখ তার সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শকেই ইসলামের প্রকৃত রূপ বলে দৃঢ়মত প্রকাশ করতেন।

পরবর্তীকালের কথা। ফররুখ আহমদ তখন থাকতেন পশ্চিম মালিবাগে, – আর আমার পরিবারের লোকেরা থাকতো পূর্ব মালিবাগে। তখন আমি সুনামগঞ্জ থেকে নরসিংদি কলেজের প্রিন্সিপাল হয়ে চলে এসেছি। আমি প্রত্যেক শুক্রবারে ঢাকা আসতাম এবং পশ্চিম মালিবাগে গিয়ে ফররুখ আহমদের সংগে দেখা করতাম। স্পষ্ট বুঝতে পারতাম, তাঁর মন ইসলামী সংস্কৃতিতে লালিত ও পালিত, এবং এতে বিজাতীয় বা বিদেশী কোন কিছু নেই। ১৯৬০-৬৪ সাল পর্যন্ত রেডিও পাকিস্তানের আমন্ত্রণক্রমে আমি প্রত্যেক মাসেই রেডিওতে এক-একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম। এ সময়ে ইসলামী নীতি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তবায়িত করার সম্ভাবনা নিয়ে ফররুখের সংগে আমার আলোচনা হত। প্রথমে তিনি খুবই উৎসাহিত ছিলেন। তবে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের কার্যকলাপ দেখে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন।

কিছুদিন পরে ফররুখ কমলাপুরের এক বাড়ীতে চলে যান। সেখানেও তাঁর সংগে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। দেখেছি, তাঁর মনের ভালো লাগার বিরুদ্ধে কোন

কিছু দেখলে তিনি ক্ষুব্ধ হতেন। একবার আমরা কয়েকজন তাঁর সংগে দেখা করতে গিয়ে একটি তরুণের প্রতি তাঁকে ক্ষুব্ধ হতে দেখি। রাজশাহীতে তরুণটি তাঁর 'সাত সাগরের মাঝি' পড়ে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁকে অভিনন্দন জানাতে এবং কাব্য সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে কিছু অজানা বিষয়ে আলোচনা করতে ঢাকায় আসে। ফররুখ নিজের প্রশংসা শোনা পছন্দ করতেন না। ছেলেটির প্রশংসা শুনে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে কোন কিছু আলোচনা করতেই অস্বীকার করলেন। হতাশ হয়ে ছেলেটি চলে যায়। আমরা ফররুখের ঘরে ঢুকে দেখি তিনি রাগে ফুঁসছেন এবং বলছেন, "আমি এ-সব শস্তা প্রশংসা শোনা পসন্দ করি না। আমি এ-ধরনের প্রশংসার জন্যে কলম ধরি নি। আমি লিখেছি আল্লাহর উদ্দেশ্যে, তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্যে। কোন মানুষের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা পাওয়া তো আমার কাম্য নয়। আমায় কত প্রতিষ্ঠান থেকে সম্বর্ধনা দেবার জন্য প্রস্তাব করেছে, আমি তাতে সম্মত হই নি। যারা সম্বর্ধনা গ্রহণ করে, তারা প্রকারান্তরে ফেরাউনের দলে মিশে যায়।" আমি কিছু বলতে চেয়েছিলাম –কিন্তু আমার সঙ্গীদের মধ্যে একজন আমাকে বারণ করলেন।

তারপরে ফররুখ আহমদ চলে এলেন শান্তিনগর। তিনি ও মাওলানা মুহিউদ্দীন খান পাশাপাশি বাসাতেই থাকতেন। বোধ হয় উভয় বাসার মালিক ছিলেন সাহিত্যিক চৌধুরী শামসুর রহমান। সেখানেও তাঁর সঙ্গে কয়েকবার মিলিত হয়ে, আলাপ-আলোচনার সুযোগ হয়েছে। ইসলামের রীতিনীতিকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যদি কোন কিছু করা যায় তা'হলে তা করবো, নাহলে উপোস করে মরে যেতে প্রস্তুত আছি, তবুও কোন গায়ের-ইসলামী কাজ করবো না, এই ছিল ফররুখ আহমদের জীবন-নীতি। তাঁর জীবনের দ্বিতীয় নীতি ছিল, একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই হাত পাতবো, এ দুনিয়ার কোন মানুষের কাছেই হাত পাততে পারি না, অপরের কাছে কোন সাহায্যও চাইতে পারি না। আমার মাথা একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছে নত করতে পারি।

মরহুম ডঃ হাসান জামান ছিলেন আমার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁর কাছে শুনতে পেলাম, ফররুখ অত্যন্ত অর্থকষ্টের মধ্যে দিন-গুজরান করছেন। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে, দু'শ টাকা নিয়ে গেলাম তাঁকে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করতে। হাসান জামান বলেছিলেন, "সাহায্যের প্রস্তাব করার আগে এ সম্বন্ধে তাঁর মানসিক প্রস্তুতি সম্বন্ধে একটু অবগত হবেন এবং তাঁর মেজাজ বুঝেই প্রস্তাব করবেন।" ফররুখ তখন থাকতেন ইসকাটন রোডে মসজিদের পাশের এক সরকারী দালানের দো'তলায়। সেখানে যেয়ে একথা-সেকথার পরে তার আর্থিক অবস্থার বিষয় জানতে চাইলে, তিনি হঠাৎ যেন ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত সটান হয়ে নিতান্ত তিরিক্ষি সুরে বলতে লাগলেন, "দেখুন, আমাকে নিয়ে ঢাকা শহরে নানা গল্প-গুজব রচিত হচ্ছে। আমি নাকি রোজই উপোস করি, রোজই পান্তা খেয়ে অফিসে যাই ইত্যাদি। কী আশ্চর্য ব্যাপার ! আমার তো কোন অসুবিধাই হচ্ছে না ! অথচ ইনি আসেন আমার সাহায্য করতে, উনি আসেন আমার সাহায্য করতে। আমার তো কারো সাহায্যের দরকার নেই। আমি তো কোন লোকের কাছে কোন সাহায্যই চাই নে।" বুঝতে পারলাম, কথাগুলো যেন আমাকে সাবধান করার উদ্দেশ্যেই বলা হচ্ছে। কাজেই সাহায্যের

কথা বলার মত দুঃসাহস আর হল না। উল্টো তাঁর ছেলেদের দ্বারা পরিবেশিত ফিরনী খেয়ে বাসায় চলে এলাম।

এ জীবনে যে ক'জন নিষ্ঠাবান সাহিত্যিক দেখেছি, তার মধ্যে ফররুখ আহমদ সর্বকনিষ্ঠ। এঁদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ কাজী আবদুল ওদুদ, দ্বিতীয় মোহিতলাল মজুমদার এবং তৃতীয় ফররুখ আহমদ। কাজী আবদুল ওদুদ আজীবন ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশের উদাহরণ অন্বেষণে রত ছিলেন। তিনি প্রথমে সে উদাহরণ পেয়ে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে, পরে রামমোহনের মধ্যে, তারপরে গ্যেটের মধ্যে এবং সর্বশেষে হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর মধ্যে। মোহিতলাল মজুমদার ছিলেন আজীবন সনাতন হিন্দু ধর্মের উপাসক। তিনি বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও অরবিন্দের সে ধারাকে আবার প্রবাহিত করতে চেয়েছিলেন। ফররুখের একান্ত কামনা ছিলো, বাংলার আউশ ধানের ক্ষেতে আবর মদীনার সৌরভ নিয়ে আসা। এঁরা তিনজন ছিলেন নিষ্ঠাবান সাহিত্যিক, এবং এজন্য এঁদের তিনজনকেই নানা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। তবে এঁদের মধ্যে চিন্তাগত আদর্শে বেশী সহিষ্ণু ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ। তিনি তাঁর প্রত্যয়ের বিপরীতমুখীন ধারণাকে সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। অপরদিকে মোহিতলাল মজুমদার ও ফররুখ ছিলেন এককেন্দ্রিক। তাঁদের এককেন্দ্রিকতার মূলে রয়েছে তাঁদের প্রত্যয়ের প্রতি অটুট শ্রদ্ধা ও সর্বতোভাবে জীবনকে সুসমঞ্জস করার প্রতি অত্যুগ্র আগ্রহ। এরা আমেরিকার কবি ওয়াল্ট্ হুইটম্যানের শৈলীর আদর্শের সম্পূর্ণ ভিন্নমুখীন আদর্শের অনুসারী ছিলেন। হুইটম্যানের কাব্যে নানা অসঙ্গতি রয়েছে, এবং এক পর্যায়ের কাব্যের সংগে অপর পর্যায়ের কাব্যের কোন সঙ্গতি নেই। তাঁকে এ সম্বন্ধে অবহিত করা হলে তিনি খুবই আনন্দ প্রকাশ করে বললেন, "যদি তা'ই হয় তাহলে নিজেকে আমি একজন সার্থক কবি বলেই জ্ঞান করব। কারণ জীবনেও তো কোন সঙ্গতি নেই। যদি আমার কাব্যে কোন সঙ্গতি না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, আমার কাব্য জীবনধর্মী।"

মোহিতলাল বা ফররুখ আহমদকে যদি বলা হ'ত, "আপনাদের কাব্য এক রৈখিক," তাহলে তাঁরা বোধ হয় এ মন্তব্যকে অত্যন্ত আনন্দের সংগে গ্রহণ করতেন এবং বলতেন, "তা'হলে বুঝতে হবে আমাদের কাব্যে বহুরূপীর খেয়ালীপনা প্রকাশ পায় নি। আমরা সংস্কৃতি-জগতের বহুরূপী নই।" তবে একথা স্বীকার্য, জীবন চলেছে তার আপনার ছন্দে ও তালে কখনও ভৈরবী, কখনও বা পূরবী, আবার কখনও বা বেদনা-বেহাগ রাগিণী গেয়ে। তাতে সহ অনুধ্যান, অথবা আরোহ-অবরোহ পদ্ধতির কার্যকারিতা সাময়িকভাবে দেখা দিতে পারে, তবে তা চিরস্থায়ী নয়।

কবি ফররুখ আহমদের এ স্বল্প-পরিসর জীবনে তিনি আমাদের সামনে যে আদর্শনিষ্ঠার আলোক-বর্তিকা জ্বেলেছেন, তা বহুদিন পর্যন্ত জ্বলন্ত থাকবে। তাঁর সংগে অনেকেরই মতের মিল নাও হতে পারে, তবে তাঁর নিষ্কলঙ্ক চারিত্রগৌরব ও আদর্শের প্রতি অটুট শ্রদ্ধার জন্য তিনি বাংলাদেশের কাব্য-গগনে ভাস্বর হয়ে বিরাজ করবেন। **(সংকলিত)**

# নৌফেল ও হাতেম

## আবদুল কাদির

বিশ্ববিশ্রুত মহাকাব্য হিসাবে হোমারের 'ইলিয়াদ' (**Iliad**), ব্যাসদেবের 'মহাভারত', ভার্জিলের 'ইনেয়িদ' (**Aeneid**), ফিরদৌসীর 'শাহ্‌নামা' ও **Tasso**-র **'Gerusalemme Liberata'** যেমন উল্লেখনীয়, কাব্যনাটক হিসাবে তেমনই মর্যাদার দাবি রাখে ইস্কাইলাসের **'Agamemnon'**, সফোক্লসের **'Three Taeban play'**, কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম', শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' ও গ্যেটের 'ফাউস্ট'। বাঙলা ভাষার গীতি-কবিতা ও আখ্যানকাব্য প্রথমাবধি থাকলেও কাব্যনাটক একালের সৃষ্টি; সেকালের যাত্রাওয়ালারা কখনো কখনো সংলাপে পদ্যরীতি ব্যবহার করলেও দৃশ্যকাব্য ঊনবিংশ শতকের উদ্ভাবনা। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র নাট্যরূপ প্রদান করতে গিয়েই নাটকে মুক্তবন্ধ কাব্যরীতি প্রয়োগের সার্থকতা লক্ষ্য করা হয়। রাজকৃষ্ণ রায়ের 'হরধনুর্ভঙ্গ' ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'রাবণ বধ' নাটকদ্বয়ে এই রীতির প্রবর্তনা নবযুগের সূচনা ঘটে। দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী', গিরিশচন্দ্রের 'চণ্ড', রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন', দ্বিজেন্দ্রলালের 'ভীষণ', ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নরনারায়ণ' প্রভৃতি নাটক প্রধানত অমিত্রাক্ষর পয়াররীতিতে রচিত– তাদের কোন কোন দৃশ্য গদ্যরীতি ব্যবহৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' সম্পূর্ণত অমিল পয়ারে রচিত নাট্যকাব্য। বাঙলা নাটকে অমিল দীর্ঘ পয়ার প্রথম ব্যবহার করেন জৌতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' ও 'চণ্ডকোশিক' নাটক দু'টির কয়েকটি দৃশ্যে। একটু নমুনা–

"বিধবা করিয়া সব অসুর-বধরে, প্রভু ওগো–
তাদের সীমন্ত হ'তে সিন্দুর করিয়া অপনীত
লেপন করিলে তাহা সূর্য দেহে; তাই
সে গো এবে লোহিতবরণ।
লক্ষ্মী আলিঙ্গিলা তোমা ভুজ–পাশে,
সেই আলিঙ্গন– ভরে পীনস্তন পত্রাবলীচিহ্ন
পড়ে ওই বক্ষঃস্থলে– এবে যাহে মুক্তামালা।"
**(প্রবোধচন্দ্রাদয় নাটক, চতুর্থ অঙ্ক)**

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'আয়ুষ্মতী' সম্পূর্ণত অমিল দীর্ঘ পয়ারে রচিত কাব্যনাটিকা। কয়েকটি চরণ দেখুন–

"আশীর্বাদ করে তুমি আমারে ও আমার প্রিয়ারে
অস্তাচল-চূড়া হ'তে। কাল পুন ভাস্কর প্রভাতে
–সুবর্ণে রঞ্জিব যবে তরঙ্গিত উদর-সাগর,
আমাদের দু'জনের পরে বরষিয়ো রশ্মিচ্ছটা

মৌন মহিমায়, অপরূপ,–লাবণ্যের লাজাঞ্জলি।"

এই পাঁচ ছত্র নমুনা থেকেও মনে হয় যে, 'আয়ুষ্মতী; যতখানি নাটক তার চাইতে অনেক বেশি কাব্য। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' সম্বন্ধেও এরূপ উক্তি করা চলে। 'চিত্রাঙ্গদা' অপেক্ষা তাঁর 'সতী' অথবা 'মালিনী' নাট্যগুণে অধিকতর প্রদীপ্ত। ফররুখ আহমদের 'নৌফেল ও হাতেম' সম্বন্ধেও প্রশ্ন ওঠে : তার কোন্ গুণ শ্রেষ্ঠতর– কাব্যগুণ না নাট্যগুণ?

আগেই বলেছি, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'আয়ুষ্মতী' নাটকের ছন্দের আদলে ফররুখ আহমদের 'নৌফেল ও হাতেম' সংরচিত। কিন্তু ছন্দ অনুরূপ হলেও নাটকীয়তা গুণে 'নৌফেল ও হাতেম' অনেক বেশি উত্তীর্ণ। আর 'নৌফেল ও হাতেম' ছাড়া আয়ুষ্মতী'র পরে এই ছাঁচে আর কোনো নাট্যগ্রন্থ রচিত হয়েছে কিনা, আমার জানা নেই। ইতালীয় কবি **Horace** (খ্রিস্টপূর্ব ৬৫ অব্দে জন্ম) তাঁর 'দি আর্ট অফ পোয়েট্রি'তে বলেছেন ঃ

**"If you would have your play deserve success,**
**Give of five acts complete; nor more, nor less;"**

নাটকে পঞ্চাঙ্ক যোজনা এদেশেও সুপ্রচলিত রীতি। কিন্তু গ্রিসে 'ট্রিলোজি' **(Trilogy)** হয় জনপ্রিয়। কালক্রমে 'ট্রিলোজি' সংক্ষিপ্ত হয়ে নাট্যকাব্যে তিন-অঙ্ক হয়েছে কিনা, তা বিশেষজ্ঞেরা বলতে পারেন। আলোচ্য 'নৌফেল ও হাতেম' তিন অঙ্কের কাব্যনাটিকা। প্রথম অঙ্কে পাঁচ দৃশ্য।

এই কাব্যনাটিকার নায়ক 'নৌফেল' ও নায়িকা 'বেগম'। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে নৌফেল-চরিত্রের বিকাশ হয়েছে স্বাভাবিক; কিন্তু বেগম চরিত্র সংঘাতের আবর্তে প'ড়ে গ'ড়ে ওঠেনি–তা মুর্শিদ-চরিত্রের প্রতিধ্বনি মাত্র হয়েছে। মুর্শিদ-চরিত্রের মতোই হাতেম চরিত্রও গোড়া থেকেই আপন বৈশিষ্ট্যে সম্পূর্ণ অবিচল– বিচিত্র ঘটনার টানাপোড়ন প'ড়ে বিকাশের অপেক্ষা রাখেনি। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই হাতেম সম্বন্ধে নৌফেল রাজ্যের '৩য় দর্শক' বলছে–

"একবার করে যে পুরা, সাখাওতি করে যে জাহানে,
সঠিক জবান যার, তা'য়ী-পুত্র– সে দরাজ-দিল্"

হাতেম চরিত্রের এ-সব বিশিষ্ট গুণ যদি গোড়াতেই বর্ণনার মারফত না হয়ে ঘটনা-সংঘাতের মাধ্যমে প্রকাশ পেত (যেমন প্রকাশ পেয়েছে তৃতীয় অঙ্কে), তবে তার প্রভাব হতো অধিক কার্যকরী। অবশ্য Horace বলেছেন–

**"The business of the drama must appear**
**In action or description what we hear**
**With weaker passion will affect the heart,**
**Than when the faithful eye beholds the part."**

ঘটনার সমধিক বিন্যাসে মার্জিতরুচি দর্শকের মনের ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়ে যেতে পারে, এই আশংকাতেই বর্ণনার বিকল্প নাটকে স্বীকৃত হয়েছে। বিশেষত কাব্যনাটকে বর্ণনার অবকাশ সমধিক,–রূপ বা গুণের ব্যাখানেই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বেশি ফুটে ওঠে। আলোচ্য নাটকে এরূপ বর্ণনা আনন্দপ্রদ। হাতেম তার নিজের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিয়ে বলেছে :

"খ্যাতির সংঘর্ষে আমি দেখি নাই মর্দমী কখনো।"

অন্যত্র বলছে :

"সামান্য খাদিম আমি
ইন্‌সানের, তবু বলি, এলাহির রেজামন্দি চেয়ে
যে হয় খিদমতগার মানুষের কিম্বা মখলুকের,
হয় না সে কোনদিন খ্যাতির পূজারী।"

হাতেম চরিত্রের বর্ণনা দিয়ে সরাই-মালিক বলেছে

"স্বার্থের সংগ্রামে তাকে পাবে না কখনো
মৃত্যু-মাঠে, –জঙ্গের ময়দানে। কিন্তু অন্যায়ের মুখে
আল্‌ বোর্‌জের মতো শিলা-দৃঢ় তার প্রতিরোধ।
তুর পাহাড়ের মতো দগ্ধ সে আল্লার মুহব্বতে,
ভালবাসে স্রষ্টার সৃষ্টিকে।"

শায়ের বলছে :

"এ মাটিতে,
যেখানে দুর্লভ জানি মনুষ্যত্ব, মর্দমী, সেখানে
হাতেম তা'য়ীর ত্যাগ অন্তহীন দরিয়ার মতো,
হাতেম তা'য়ীর শির পর্বতের মতো মহীয়ান
সুব্‌হে উম্মীদের মতো মুখ তার উজ্জ্বল রওশন।"

এসব বর্ণনায় যে চরিত্র-মাহাত্ম্য ফুটে উঠেছে, তা শুধু আনন্দের আস্বাদই দেয় না, মনুষ্যত্বের প্রেরণাও দেয়। সফোক্লেসের **'Antigone'** নাটকে প্রদর্শিত হয়েছে : রাষ্ট্র বনাম ব্যক্তির বিবেকের দ্বন্দ্ব **(the state versus the consciene of the odicisual)**; আর 'নৌফেল ও হাতেম' নাটকে দেখানো হয়েছে : ব্যক্তির খ্যাতির লিপ্সা বনাম মানবিকতার দ্বন্দ্ব। শুধু মনুষ্যপ্রীতি নয়, মনুষ্যত্বপ্রীতিও এই কাব্যনাটিকার অন্তর্নিহিত আদর্শ। এই মহৎ আদর্শের প্রচারণা কাব্য সৌন্দর্যের আবহে ও নাটকীয় ঘটনার আবর্তে এমন রসমহিমামণ্ডিত হয়েছে যে, আমাদের নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে তার স্থান হবে সংশয়াতীত। **(বিশিষ্ট কবি-সমালোচক আবদুল কাদিরের 'নৌফেল ও হাতেম' শীর্ষক এ লেখাটি ১৯৬৪ সালে 'পূবালী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। – সম্পাদক)।**

---

**ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ত্রয়োদশ সংখ্যা, জুন-২০০৬**

# প্রেমিক ফররুখ

## আবদুল আহাদ

সময়টা ছিল ১৯৪৬ সাল। আমি ও ফতেহ লোহানী প্রায়ই সিকান্দার আবু জাফরের পার্ল রোডের বাসায় আড্ডা জমাতাম। পার্ল রোড ছিল পার্ক সার্কাসে। আমরা সবাই পার্ক সার্কাসেই থাকতাম। একদিন জাফরের বাসায় ফররুখ আহমদের সঙ্গে জাফর আমাকে পরিচয় করিয়ে দিল। ফররুখ তখন মাঝে মধ্যে জাফরের বাসায় আসত। পাতলা ছিপছিপে ছিল সে তখন। রং ছিল ফর্সা, মুখে দাড়ি ছিল না। এই আমার প্রথম পরিচয় ফররুখের সাথে। এরপর আরো দু'একবার জাফরের বাসায় দেখা হয়েছে, তবে তেমন ঘনিষ্ঠতা হয়নি।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল আমার সাথে যখন ফররুখের প্রথম দেখা, তার বেশ আগেই সে অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছিল। মানসিক দিক দিয়ে যেমন, বেশভূষার দিক দিয়েও তেমন একটি পরিবর্তন হয়েছিল। মানসিক দিক দিয়ে যেমন, বেশভূষার দিক দিয়েও তেমন একটি পরিবর্তন তার এসেছিল। একথা অবশ্য পরবর্তীকালে ফতেহ লোহানী আমাকে জানিয়েছে। সে আরো বলেছে, ফররুখ যে সময়ে স্কটিশে পড়ে, তখন সে খুবই রোমান্টিক ছিল। তার শরীরে তখন শোভা পেত লম্বা আদ্দির পাঞ্জাবী। ধুতি মাটিতে লুটাতো। উল্টিয়ে আঁচড়ানো বড় বড় চুল কিছুটা এলোমেলোই থাকত।

প্রথম সাক্ষাতের কিছু দিন পরেই শুরু হ'ল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সে কী ভয়াবহ সময়! আর ফর্রুখের সাথে দেখা হয় নি। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ হয়ে গেল। ফতেহ লোহানি চলে এল ঢাকায় খবর পাঠক হিসেবে। আমি কিছুদিন পরে ১৯৪৮-এ ঢাকা এসে বেতারে যোগ দিলাম। আমি চলে আসার অল্পদিনের মধ্যেই সিকান্দার আবু জাফরও চলে এল। ফররুখ আমাদের কিছু আগেই চলে এসেছিল এবং ঢাকা বেতারে স্ক্রীপ্ট রাইটার হিসেবে যোগ দিয়েছিল। জাফরও তাই ছিল।

সেই সময় ঢাকা বেতারের বড় করুণ অবস্থা। শিল্পী নেই ভাল গান নেই। তখন এই কবিদের অনুরোধ করা হ'ল বেতারের প্রয়োজনে গান লেখার জন্যে।

ঢাকায় আসার প্রথম থেকেই আমি ফররুখকে নাম ধরে ডাকতাম। ফররুখও আমাকে নাম ধরে ডাকত। গান লেখার মধ্য দিয়েই ফররুখের সাথে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে।

তখন ঢাকা বেতারে একটি সুন্দর পরিবেশ ছিল। আমি, ফতেহ্ লোহানী, নাজির আহমদ ও ফররুখ আহমদ। আমরা একত্রে বসে কত না গল্পই করেছি। তবে আমার

সাথে ফররুখের অন্য সময়েও দীর্ঘক্ষণ গল্প চলত, রাস্তার ওপারে আবনের চায়ের দোকানে বসে।

ঢাকা বেতার তখন নাজিমুদ্দীন রোডে ছিল। ফররুখকে দিয়ে আমি জোর করে কত ধরনের গানই লিখিয়ে নিয়েছি। ফররুখ প্রথম দিকে লিখতে চাইত না। তবু আমার পীড়াপীড়িতে অনেক গানই সে লিখেছিল। আমি যতটুকু অনুভব করেছি, ফররুখ যেন তার প্রেমিক মনকে স্তব্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করেছে। সত্যি কথা বলতে কি, ফররুখের মনটা ছিল প্রেমিকের। এই ফররুখের হাত থেকে একদিন 'ডাহুক' কবিতা বেরিয়েছে।

ফর্‌রুখের কাছে তখন ধর্ম এবং নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান এইটিই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। তবু পীড়াপীড়ি করে ফররুখকে দিয়ে আমি অনেক প্রেমের গান লিখিয়ে নিয়েছি। সে গানগুলি কাব্যের দিক থেকে খুবই উন্নতমানের ছিল। ফররুখ আগে কখনো গান লেখে নি। কিন্তু গান লিখতে যখন আরম্ভ করল, দেখলাম, গান লেখার ব্যাপারে ফররুখের দক্ষতা রয়েছে। কেননা, মূলত সে তো কবি। ফররুখের কয়েকটি প্রেমের গানের অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি:

যে বসন্ত ফিরে যায়/জীবনে সে ফিরবে না হায়/শেষ হবে তার সাথে/ এ দিনের সব গান।/ এদিনের সব সুর/ হয়ে যাবে অবসান।/ এ দিনের সব আলো/ মুছে যাবে নিশি-ছায়।

আর একটি গান–

ঝরে যায় শবনম ভোরের হাওয়ায়
বেদনার সব রাতি বুঝি না ফুরায়!

.....................................

অভিশাপসম জাগিব তোমার প্রাণে
তোমার ব্যথায়, তোমার ছন্দ গানে।

.....................................

আকাশের আলো আকাশে মিলালো
ধরণীর ছায়া ম্লান
হের পিঙ্গল মোর নভতল
শোনে মরণের গান ॥

.....................................

জ্বলি শামাদানে,
জ্বলি বেদনার দাহে
শত জ্বালা সয়ে
এ হৃদয় থাকে
পড়িয়া তোমার রাহে।

....................................

হায়রে বসন্ত যায়
বনেরও ফুলদল কাঁদিয়া লুটায়।
জীবনের সুর অম্লান
বুঝি সে হল অবসান।
চঞ্চল ফাল্গুন-দিন সুদূরে হারায়।
হৃদয়ের মণিদীপ জ্বালি
এতদিন সাজায়েছি ডালি
ফাল্গুন শেষে আজি হায় কোথা সে মিলায় ॥
শুক্তি বক্ষে রেখেছে মুক্তা।
সিন্ধুর প্রাণকণা
এতটুকু মিলিল না।
ঊর্মি-উতল জীবনে তোমার
খোলে না দুয়ার মেলে না তো পাখা
নিশীথ আঁধারে হারায়ে দু'ধারে
বিরল সম্ভাবনা।

....................................

আমার শেষ হল না আশা
আমার মিটল না পিপাসা

....................................

উঠলো যদি আঁখির পলক
একটি নিমেষ অনন্তকাল।

এমনিভাবে আরো অনেক প্রেমের গান ফররুখকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছি। ফররুখের অন্য ধরনের গানও আছে। যেমন—

দূর দিগন্তের ডাক এল, চল বীর চল নির্ভয়,
বুনিয়াদ হল নব সৃষ্টির শুরু,

ইত্যাদি গানগুলো ফররুখ আমার জন্য লিখেছিল। ফররুখকে তখন বেশ গানের নেশায় পেয়েছিল এবং সে নেশা আমি ধরিয়ে দিয়েছিলাম। এ ছাড়া ফররুখ কবি ইকবালের বেশ কিছু কবিতা অনুবাদ করে। এই অনুবাদ অনেক জায়গায় ইকবালের মূল কবিতাকে হার মানিয়েছে বলে আমার ধারণা। এ অনুবাদের একটিতে আমি সূরারোপ করেছিলাম। কবি ইকবালের লেখা ছিল:

ফির চেরাগে লা'লা সে/রওশন হুয়ে কোহো দমন

যার তর্জমা ফররুখ করেছিল এইভাবে:

রঙিন লালার দীপশিখাতে/হল উজল শিলা কানন।

ফর্‌রুখের চরিত্রের সবচেয়ে বড় গুণ যেটা ছিল, সেটা হ'ল সত্যকে সে নির্ভীকভাবে প্রকাশ করত। ফররুখ প্রায়ই আমাকে নানা কথার মাঝে বলত, "কবিতায় আমরা পশ্চিম বাংলার চেয়ে পিছিয়ে নেই, কিন্তু গদ্যে আমরা বেশ পিছিয়ে আছি। আমাদের গদ্যে ঐ সাবলীল ভঙ্গী আসতে দীর্ঘ সময় লাগবে।"

সাহিত্যের আলোচনা যখন করতাম, ফররুখ বঙ্কিমের প্রশংসা করত, বলত, "আমাদের জন্য হয়ত বঙ্কিম ভাল নন, কিন্তু বঙ্কিমের একটি গান কিভাবে সমস্ত হিন্দু জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং স্বদেশী আন্দোলনকে প্রেরণা যুগিয়েছিল, তার নজীর নেই।" 'বন্দে মাতরম' নামক সে গানটি অনেকেই জানেন।

একটা কথা ফররুখ আমাকে বলত, "আমাকে অনেকেই গোঁড়া মনে করে, কিন্তু জানো, আমার বিছানার একপাশে রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা' থাকে এবং অন্যপাশে থাকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ কাব্য'।"

ফররুখ যে জিনিসটাকে বিশ্বাস করেছিল, সে বিশ্বাসে সে অটল ছিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। তাঁর মত এই ধরনের বিশ্বাসী মানুষ আমাদের সমাজে বিরল। (সংকলিত)

# ঐতিহ্যের রূপকার ফররুখ

## মনিরউদ্দীন ইউসুফ

১.

ফররুখ আহমদের সংগে আমার ব্যক্তিগত জানাশোনা খুব বেশী দিনের নয়; সম্ভবত ১৯৬২ সালের কোন এক সময়ে তাঁকে প্রথমে দেখি। আকস্মিকভাবে এই পরিচয় অবশ্য হৃদ্যতার দিক দিয়ে নিবিড় হয়ে উঠতে সময় নেয় নি। তাঁর কবিতার শক্তিমত্তা, সেই সংগে তাঁর ব্যক্তি-জীবনের সততা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা-শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্যে এ তিনটিই যথেষ্ট ছিল।

কবির মানবিক বৈশিষ্ট্য ধরেই কবিতার জাত নির্ণয় সহজ হয়। ফররুখ আহমদের মানসিক বৈশিষ্ট্য স্বাধীনতা ও সাহসিকতাসূচক ছিল বলে, প্রথম থেকেই তাঁর কবিতায় রোমান্টিক ভাব প্রবল হয়ে উঠতে দেখা যায় এবং তার প্রকাশ ভাষা, ছন্দ ও রূপকল্প-মহিমায় বলিষ্ঠ হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ফররুখ আহমদকে তাঁর বাইশ-তেইশ বছর বয়সে, অর্থাৎ চল্লিশের দশকের শুরু থেকেই রবীন্দ্র-প্রভাব কাটিয়ে উঠতে দেখা যায়। এমন কি, যে নজরুল ইসলাম তখন কবিতায় বাঙালী মুসলমানদের অবিসংবাদিত নেতা, ফররুখ আহমদ তাঁর অনুসরণ থেকেও নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন।

নজরুল ইসলামের জনপ্রিয়তা ও সমকালিনতার ভিত্তি যে নিপীড়িত জনতার সংগে একাত্মতা, তা তখন ভারতবর্ষে ইংরেজবিরোধী জাতীয়তার মূলমন্ত্রকে জনগণের উদ্দেশ্যে এমনভাবে উৎসর্গ করে চলেছিলেন যে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতিভূ বলে ঘোষিত সংস্কৃতিই তাঁর কবিতার অন্তঃস্রোত হয়ে তার গতি নিয়ন্ত্রণ করছিল। ফলে, মানবতার পরিচয় তুলে ধরতে যেয়ে যেসব মুসলিম মহাপুরুষ ও মনীষীকে তিনি তাঁর কবিতায় এনেছিলেন, তাঁরা নজরুলকে নির্বিশেষ মানবতায় স্থির রাখতে পারেন নি। জাতীয়তাবাদের প্রতি এহেন নিষ্ঠা নজরুলের সাংস্কৃতিক পরিচয়কে দ্বিধা-বিভক্ত করে দিয়েছিল। ফররুখ-প্রতিভা কিন্তু তেমনভাবে স্বীয় ঐতিহ্য-তরুর শিকড় থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নি। জনপ্রিয়তা ও সমকালিনতার অভিধার পরিচয় হতে তিনি প্রলুব্ধ ছিলেন না। এটি ফররুখের কবিতার বলিষ্ঠতা ও নিজস্বতার পরিচায়ক।

বলা আবশ্যক যে, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু আজীবন স্বীয় ঐতিহ্য-তরুর সংগে সংলগ্ন ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন, সেই সংস্কৃতির ফলশ্রুতি হিসাবে বেদান্ত-উপনিষদের আনন্দবাদকে তিনি ছন্দের সুষমায়, রূপকের রহস্যময়তায় ও ইঙ্গিতের মহার্ঘতায় সারা জীবন পরিবেশন করে গেছেন, এমন কি জীবনের প্রথম পর্বের কবিতায়ও সে পরিচয় নির্ভুলভাবে অঙ্কিত রয়েছে। নিরুদ্দেশ যাত্রায় কবি যে সোনার তরীর যাত্রী তার কর্ণধারকে জিজ্ঞাসা করতে ভোলেন না যে, নিরুদ্দেশের সে

লক্ষ্যপথে তরী চালানো হয়েছে, তা কি কালাপানির পাড়ে 'শান্তি ও সুপ্তিতা'র দেশে গিয়ে পৌঁছবে? কর্ণধার জীবন-দেবতা বা দেবী তখন রহস্যময় স্মিত হাসির দ্বারা কবিকে আশ্বস্ত করেন যে, সেই শান্তি ও সুপ্তিত দেশে সব আছে। এই শান্তি ও সুপ্তির দেশই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকর্ষের ভূমি। মানবাত্মার উপজীবিকা সেখানেই আছে।

তবে কি ঐতিহ্যের সঙ্গে সংলগ্ন থেকে সংস্কৃতির ফলশ্রুতিকে তুলে ধরাই কবির মাহাত্মের পরিচায়ক? কবির সামাজিক দায়িত্ব বলতে কিছু নেই?

কবি ও রাজনীতিকের সমাজ চর্চা এক নয়। সমাজ থেকে অবশ্য কবিকে বিচ্ছিন্ন হলেও চলে না। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কবির কবিতা কাগজের ফুল; প্রাণের সজীবতা তাতে অনুপস্থিত থাকে। রাজনীতিকের যে সমাজ চর্চা পরিবেশের তাৎক্ষণিকতাকে অবলম্বন করে, কবি সেই সমাজের সংগে লগ্ন থাকার জন্যেই ঐতিহ্যকে ধরে থাকেন, তাই কবির ঐতিহ্যপ্রীতি জীবন-নিরপেক্ষ অতীতের কাহিনী-বিলাস নয়। জীবনের প্রয়োজনেই কবিকে ঐতিহ্য-লগ্ন হতে হয়। রাজনীতিকের সমাজ চর্চা আশু কার্যসিদ্ধির সত্তরতা, কিংবা ধর্মগুরুর বৃত্তাবদ্ধ নীতি-নিয়মের চাপের কাছে আত্মসমর্পিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করলেও, কবির কাছে তেমন কার্যাসিদ্ধি তুচ্ছ ব্যাপার।

সামাজিক হিসাবে কবির নিয়তি-নির্দেশিত দায়িত্ব হলো জীবনকে বহু দূর পর্যন্ত নিয়ে যাবার জন্যে আত্মিক বা মানসিক শক্তির উদ্বোধন। এই শক্তিই একদিন মানব-পরিবেশকে তার সমুচ্চ বাসনার অনুকূল করে তুলবে। প্রাণ-শক্তির সেই উদ্বোধনের সপক্ষে কবিকে ঐতিহ্য-নির্দেশিত সংস্কৃতির পথ ধরে ইতিহাস, কিংবদন্তী কিংবা কোন সমুচ্চ তত্ত্বজ্ঞানকে সমাজ-মনের সামনে ধ্রুবতারার মতো প্রতিষ্ঠা করার কাজ করে যেতে হয়। ফলে, কবির মতো সহৃদয় সামাজিকের বাণী দেশ ও ভাষার সীমারেখা অতিক্রম করে সকল মানুষের হৃদয়-তারেই সমভাবে অনুরণিত হতে থাকে।

এই সামাজিক দায়িত্ব আমাদের আলোচ্য কবি ফররুখ আহমদ কতটুকু পালন করেছিলেন? নিঃসঙ্গ-নির্জনতার মধ্যেই কি তাঁকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল?

না। ফররুখ সত্যার্থে নিঃসঙ্গ-নির্জন ছিলেন না। কারণ, স্বীয় ঐতিহ্যের সংগে তিনি ছিলেন পুরোপুরি সম্পর্কিত। এই ঐতিজ্য সংলগ্নতাই তাঁর কবিতাকে এমন বলিষ্ঠ করেছে ও কবির সামাজিক দায়িত্ব পালনে তাঁকে করেছে ঐকান্তিক।

কবিতা এক ধরনের নয়। কোন কোন কবিতা পরিবেশকে ছবির মতো ধরে রাখে। কোন কবিতা তাৎপর্যপূর্ণ অতীতকে ব্যঞ্জনাময় ভাষায় মনের সীমাহীন আগ্রহের সাথে তুলে ধরে। ফররুখ আহমদ তাৎক্ষণিক পরিবেশের ছবি আঁকার পক্ষপাতী ছিলেন না বলেই, তাঁকে নিঃসঙ্গ নির্জন বলা ঠিক হবে না। বরং ঐতিহ্যের রূপকার হওয়ার কারণে তিনি কবির সামাজিক দায়িত্বকে যথেষ্ট সহৃদয়তা ও স্বকীয়তার সংগে পালন করেছেন।

এই ঐতিহ্যকে নির্ভুলভাবে লাভ করেছিলেন বলেই তিনি স্বীয় সংস্কৃতিকে তিনটি মহাদেশ জুড়ে বিস্তৃত বিস্তৃত দেখেছিলেন, এবং কাব্যিকভাবে সর্বত্র তা উপস্থাপিত করে

গেছেন। ঐতিহ্যর পথ ধরে কালের উজানেও প্রাক-ইসলামী যুগের হাতেম তায়ী পর্যন্ত তিনি পৌঁছেছিলেন। দীর্ঘ সেই মানবিক ঐতিহ্যকে তিনি স্থান ও কালের বুকে কীভাবে বিস্তৃত দেখেছিলাম, তার এক সুন্দর কাব্যিক নিদর্শন রয়েছে 'কিস্‌সাখানির বাজার' নামক কবিতায় :

... এই কিস্‌সাখানির বাজার
এ-ও এক পণ্যশালা। ... শেষহীন আলিফ লায়লার
অশেষ কাহিনী নিয়ে পড়ে আছে যুগ-যুগান্তর।
মরু গিরি পাড়ি দিয়ে আসে যায় যত সওদাগর
তারাই সাজায়ে রাখে এ বাজার ... দু'দিনের ঘর,
বলে যায় একে একে সেই সব সওদাগর
অন্তহীন জীবনের কথা।
কথক হারায়ে গেলে নতুন কথক টানে
কাহিনীর ধারাবাহিকতা ॥

এই কবিতায় স্বীয় ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার সংগে অন্তহীন জীবনের কাহিনীর ইঙ্গিতটুকুও ফুটিয়ে তলেছেন ফররুখ আহমদ। ঐতিহ্যের অনবদ্য রূপকার এই কবি, বাংলা ভাষার এক রূপদক্ষ কবি হিসাবে বেঁচে থাকবেন বলে আমরা মনে করি।

কিন্তু সামাজিক হিসাবে কবির দায়িত্ব শুধু পরিবেশের প্রতিচ্ছবি অঙ্কনে কিংবা ঐতিহ্যের রূপায়ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের অমর অংশের জন্যে উপদেয় উপজীবিকা সরবরাহ করাই বরং তার শ্রেষ্ঠ করণীয়। বাংলাভাষায় রবীন্দ্র-কবি ভারতীয় সংস্কৃতির আনন্দ ও শান্তিকে পরিবেশন করে সেই সামাজিক দায়িত্ব পালন করে গেছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির এই প্রকট সম্ভাবনাকেই তিনি নৈবেদ্যরূপে বিশ্বচেতনার দ্বারে উপঢৌকন হিসাবে পেশ করেছিলেন।

এ যুগের অন্য এক উপ-মহাদেশীয় কবি ইকবালও ইসলামী সংস্কৃতির সারাংশকে 'খুদী' বা 'মানবাত্মার' জাগরণের পরিভাষায় অত্যন্ত সংবেদনশীল উপায়ে কবিকে উপাদানে সমৃদ্ধ করে মানবাত্মার সিংহদ্বার পর্যন্ত নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন, যাকে লাভ করে বিশ্ব মানুষ সফলতার সম্ভাবনাময় এক ভবিষ্যৎকে তাদের সামনে উন্মুক্ত দেখতে পেয়েছিল।

২.

প্রবন্ধের প্রথমাংশে বলেছি যে সৈয়দ আলী আহসান ও কবি আবুল হোসেনের সংগে শুরু করলেও, ইকবালের কবিতার প্রতি ফররুখ আহমদ সারা জীবনই অনুরক্ত ছিলেন এবং প্রবীণ বয়সেও তিনি ইকবালের কবিতার অনুবাদ সমান আগ্রহেই করছিলেন।

সৈয়দ আলী আহসান দেশের এক প্রখ্যাত কবি। কবি-জীবনের শুরুতে তিনি হয়তো ঐতিহ্যের পাঠ গ্রহণের জন্যে দার্শনিক কবি ইকবালের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। আবুল হোসেন ও ফররুখ আহমদের উদ্দেশ্য তখন অন্য রকম ছিল না।

তাঁরা ইসলাম ধর্মের মূল্যবোধ ও বিভিন্ন যুগে তার রূপায়ণকেই নিজেদের ঐতিহ্য বলে গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু এ শতকের চল্লিশের দশকে ইসলাম বাহ্যত কোথাও শ্রদ্ধার আসনে আসীন ছিল না। তুরস্কের যে-মুস্তফা কামালকে নিয়ে মুসলমান তখন গর্ববোধ করতো, তিনিও ইসলাম নয় বরং ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদেরই পুরোপুরি অনুসারী ছিলেন, আর সে জন্যই ইকবাল তাঁর উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছিলেন।

ইউরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাবশত এবং জাতীয়তাবাদের অনুসরণে দুনিয়ার গোটা আধুনিক পরিবেশকেই ঐতিহ্যরূপে বরণ করার আগ্রহে সৈয়দ আলী আহসান ও কবি আবুল হোসেন ইকবালের প্রতি সেই পূর্ব-আকর্ষণ অব্যাহত রাখতে পারেননি। অন্যদিকে, ফররুখ আহমদ ইকবালের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁরই আচরিত মানবিক আদর্শের রূপকারকে। ইকবালের ইসলাম-তত্ত্ব জীবনের যে-সত্যকে ক্রমোন্মোচিত করে চলেছিল, তার প্রতি ফররুখ ছিলেন নির্ণিমেষ। যে ঐতিহ্যকে বাংলা ভাষার কবি নিজের মানস-দিগন্তে প্রলম্বিত প্রেক্ষাপটরূপে পেয়েছিলেন, উর্দু-ফারসির ইকবাল-কবির পেছনেও সেই ঐতিহ্যেরই প্রেক্ষাপট প্রলম্বিত ছিল। ইকবাল তাঁর সূক্ষ্ম চিন্তা-অনুভূতিকে যেভাবে ভাষার কারুকর্মে মূর্ত করে তুলেছিলেন, সম-মনা ফররুখও সেগুলিকে অনুবাদের মাধ্যমে বাংলায় অনবদ্যভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। ঐতিহ্য-সূত্রে গ্রথিত পূর্ববর্তীর প্রতি এই শ্রদ্ধা বাংলা-ভাষার এই অনুবাদগুলোর মধ্যে এক অমর স্থায়িত্ব লাভ করলো। **(সংকলিত)**

---

**ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ষোড়শ সংখ্যা, জুন ও অক্টোবর, ২০০৮**

# ফররুখ আহমদের বৈশিষ্ট্য

## সৈয়দ আলী আহসান

শব্দ ও ধ্বনির সম্পৃক্ততা বিষয়ে ফররুখ অবগত ছিলেন। সেই সম্পৃক্ততার ফলে যে অর্থবহতা নির্মিত হয় তাও তিনি জানতেন। ব্যাপক পড়াশুনা তাঁর ছিল, বিশেষ করে 'হাতেম তায়ী' পাঠ করলে তা বোঝা যায়। অনেক দোভাষী পুঁথি তিনি পড়েছেন, বিশেষ করে বিভিন্ন কাহিনীর গতিধারা অনুসন্ধানের জন্য। তিনি যে সমস্ত দোভাষী পাঠ করতেন তাহলো হাতেম তাঈ, কাসাসুল আম্বিয়া, আলেফ লায়লা ইত্যাদি। সেগুলো অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পড়তেন। শুধুমাত্র কাহিনীর গতিধারা নির্ণয়ের জন্য নয়, অধিকন্তু শব্দের বৈচিত্র্য এবং প্রবাহের জন্য। আমি অনেকবার তাকে বলেছি যে, দোভাষী পুঁথিতে একমাত্র কাহিনী বিন্যাসই লক্ষ্যযোগ্য। দোভাষী পুঁথির শব্দ ব্যবহার এবং সেখানকার অর্থবহতা আমাদের আলোচ্য বিষয় হতে পারে না। তার কারণ শব্দের অর্থ নির্ণয় তাদের লক্ষ্য ছিল না। পুঁথিকারগণ তাদের কাহিনী বর্ণনার ব্যস্ততায় নিমগ্ন ছিলেন। ফররুখ আমার কথা মানতেন না। তিনি মন্তব্য করতেন যে, পুঁথিকারগণ বাংলা শব্দের ধ্বনির সঙ্গে আরবি-ফারসি-উর্দু ধ্বনির ব্যাপকভাবে সম্পৃক্তি ঘটিয়েছেন। এটা অত্যন্ত সাহসের কথা। এই মিশ্রণের ফলে যে রকম ধ্বনি-ব্যঞ্জনা গড়ে উঠেছে তা নতুন।

দুঃখের বিষয়, বাংলা কাব্যে এর অনুসৃতি আর কখনও হল না। ভারতচন্দ্রের সময়কালে এবং তার পরে ভুরশুট পরগণায় দোভাষী পুঁথির কবিগণের বসবাস ছিল। মনে হয় এই অঞ্চলে সেই মিশ্রিত ভাষার প্রচলন ছিল। প্রচলন থাকুক বা না থাকুক এই ভাষার বিকাশ যে ছিল তা বোঝা যায়। ভারতছন্দ্র নিজেই লিখেছেন :

না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল
অতএব কহি ভাষা যাবনী-মিশাল।
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে
যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যরস লয়ে॥

অর্থাৎ কবিতায় প্রসাদগুণ তৈরি করতে হলে আরবি-ফারসি শব্দের মিশ্রণ অত্যন্ত প্রয়োজন। ফররুখ সেই প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেছিলেন এবং নিজের কবিতায় তা অর্থবহতায় ব্যবহার করেছিলেন। কবিতার সৌন্দর্যের জন্য তিনি যে ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন তা কিন্তু দোভাষী পুঁথির ছন্দ নয়। বাংলা ছন্দের প্রচলিত ধারার মধ্যে তিনি আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োজনগত যে সমীক্ষা চালিয়েছিলেন তা আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নতুন। ফররুখের কবিতার বলিষ্ঠতা, সাবলীলতা, গীতিধর্মিতা এবং আবেগের অনুশীলন আশ্চর্যজনকভাবে অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং শ্রুতিমধুর। মূলত ফররুখ বাংলা কাব্য-ক্ষেত্রে অনুশীলনের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং তা তাঁর কাব্য

প্রবাহে নতুন ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছিল। তাঁর কবিতার রূপকল্পে একটি প্রশান্ত বরাভয় ছিল। 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো পাঠ করলেই তা বোঝা যায়।

ফররুখ ইসলামী কবি ছিলেন, না শুধু কবি ছিলেন এ আলোচনা নিরর্থক। তার কারণ ফররুখের কবিতা সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছেই গ্রহণযোগ্য ছিল। তাঁর বিষয়বস্তু ছিল একটি বলিষ্ঠ আবেগ যে আবেগের আবেদন ছিল অত্যন্ত গভীর এবং অত্যন্ত প্রাণবন্ত। তার বন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায় একবার আমাকে বলেছিরেন, ফররুখ কোন বিষয়ে লিখছে তা আমার বিচার্য বিষয় নয়। কোন তাৎপর্যে তার শব্দগুলো বিভিন্ন চরণ-বিন্যাসে দোলায়িত হচ্ছে তাই আমি দেখব। এভাবে আমরা ফররুখকে সকল শ্রেণীর পাঠকের কবি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। 'সাত-সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থে সমুদ্র-যাত্রা পথে যে বিভিন্ন অনুষঙ্গ এসেছে তাদের রূপ-লাবণ্য অত্যন্ত মধুর। তিনি যে সমস্ত কবিতা লিখেছেন তার মধ্যে ইসলাম ধর্মের শক্তি এবং বিনয় প্রকাশিত হয়েছে কিনা অনেকের কাছে তা বিচার্য বিষয় হতে পারে এবং তা অন্যায়ও নয়।

আমি কিন্তু ফররুখকে অন্যভাবে দেখি। যৌবনের উদ্বেলিত আনন্দের একজন গতিমান কবি হিসেবেই আমি তাঁকে বিচার করি। 'সাত-সাগরের মাঝি'তে একটি যাত্রার বর্ণনা আছে। জেমস এলোবি ফেলকার যে ধরনের কবিতা লিখেছেন, ফররুখের কবিতার সঙ্গে তার মিল রয়েছে। ফ্রেকার বলেছিলেন, আমরা স্বর্ণখচিত পথ ধরে সমরখন্দ ভূ-খণ্ডের দিকে যাত্রা করছি। ফররুখ লিখেছেন, আমি সাত সাগর পার হয়ে হেবার রাজতোরণের দিকে যাচ্ছি। প্রায় একই রকমের আবেগ দু'জনের কবিতায় আছে। তফাৎ শুধু এটুকুই ফ্রেকারের কবিতায় শুধুমাত্র একটি সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে, ফররুখের কবিতায় সত্য ও বিশ্বাসের অনুষঙ্গ হিসেবে সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হয়েছে।

ফররুখের সকল কবিতার মধ্যে দীর্ঘ পথযাত্রার বিবরণ আছে। যেমন সাত সাগরের মাঝিতে দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রা আছে, তেমনি হাতেম তা'য়ী কাব্যগ্রন্থে বিভিন্ন দুর্গম পথযাত্রা আছে। এই পথযাত্রা অথবা সমুদ্র-যাত্রা প্রাধান্য পেয়েছে এবং সমুদ্র-পথের বিভিন্ন সংকট অতিক্রম করে অবশেষে ইউলিসিস নিজ গৃহে ফিরে আসছেন, তেমনি ফররুখ আহমদ বিভিন্ন যাত্রার শেষে শান্তি এবং আশ্বাসের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করছেন। আমি এভাবেই ফররুখকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ করতে দেখি। এই বিচরণের কারণ হল সে সর্বপ্রকার সংক্ষুব্ধতা অতিক্রম করতে চায়, বিপর্যয় অতিক্রম করতে চায় এবং অবশেষে শান্তির রাজ্যে গমন করতে চায়।

আমার ধারণায় ফররুখ একজন পর্যবেক্ষণকারী দুর্গম পথযাত্রার কবি। আমি তাঁকে শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মের আবহে গ্রহণ করতে চাই না। আমি তাঁকে গ্রহণ করতে চাই সত্য, শৃংখলা এবং সৌন্দর্যের আবহে। এই আবহ তাঁর কবিতায় একটি সুকুমার ছন্দ এবং সৌন্দর্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল। এভাবেই ফররুখ আমাদের কাছে একজন প্রশান্ত আবেগের কবি, সৌন্দর্যের কবি এবং সৌন্দর্যের মহিমাময় নিদর্শনের কবি। এভাবেই তাঁকে বিচার করতে হবে এবং গ্রহণ করতে হবে।

---

**[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ৯ম সংখ্যা, জুন, ২০০৪]**

# কলকাতায় ফররুখ এবং আমি

## সৈয়দ আলী আহ্সান

একেকটি সময় থাকে যা স্মৃতিতে কখনো হারায় না। সময় পার হয়, সমস্যা আসে, সমস্যা আমরা অতিক্রমও করি, আবার জটিল কর্মব্যস্ততায় আমরা নতুন সময়ের কাছে দায়গ্রস্ত হই কিন্তু তবু পুরাতন কয়েকটি ঘটনা মনের মধ্যে কখনো কখনো জেগে ওঠে এবং ব্যাকুল করে। সময় কখনো ধারাক্রম মেনে অগ্রসর হয় না, সময় সামনের দিকে যায়, আবার পিছনেও যায়। সময় আবর্তিত হয় কিন্তু সময় কখনো থমকে থাকে না। সময়ের আচরণটি বড় বিচিত্র। গান গাওয়া হলে গানের রেশ যেমন থেকে যায়, তেমনি কোন বিশেষ সময়কে অতিক্রম করে এলেও সে সময় বার বার আমাদের চেতনাকে নাড়া দেয়। দেগা একজন অসাধারণ চিত্রশিল্পী ছিলেন, কিন্তু তাঁর জীবনের একটি সময় জুড়ে ছিল নৃত্যের উন্মাদনা। তিনি নৃত্য জানতেন, নৃত্য বুঝতেন। তাই সব সময় তাঁর মনের মধ্যে একটি ছবি জেগে থাকত। সেটি হচ্ছে একটি ভূমির ছবি, যে ভূমির উপর নর্তকীরা তাদের পায়ের প্রতাপ রাখত। এই পায়ের প্রতাপের কথা তাঁর মনের দৃশ্য থেকে কখনো হারিয়ে যায়নি। তিনি চিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে তাঁর নৃত্যের অভিজ্ঞতাকে সবসময় তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন।

আমার জীবনের একটি সময়ে ফররুখ বড় প্রচণ্ডভাবে আমাকে গ্রাস করেছিল। আমার প্রতিদিন ফররুখের আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করত এবং আমার মুহূর্তগুলো ফররুখের কলকণ্ঠে মুখর থাকত। বিকেল বেলা অপেক্ষা করতাম কখন ফররুখ আসে। বড় রাস্তার পাড়ে থাকতাম না, থাকতাম একটি গলির মধ্যে। সেখানেও গাড়ি যেত তবে খুব প্রবলভাবে না। মানুষের শব্দ শুনতাম, তবে তা অনেক নয় এবং জমাট নয়। ঠিক এরকম মুহূর্তে ফররুখ আসত একটি আবির্ভাবের মতো। মাথা উঁচু করে, চুল এলোমেলো করে, একটি কৌতুক ওষ্ঠে স্পষ্ট করে ফররুখ আমার সামনে আসত। এ দৃশ্যটা আজো আমার চোখে ভাসে। কলকাতার ওয়েলেসলির বাঁ দিক দিয়ে যে রাস্তাটি কিছুদূর গিয়ে একটি গলির ভিতর গিয়ে হারিয়ে গেছে, সে গলি দিয়ে এগিয়ে গেলেই গার্ডনার লেইনে আমার মেস ছিল। মেসে আমরা যারা থাকতাম সবাই একে অন্যের আত্মীয়। সবাইকে বেশি রাত ছাড়া একসঙ্গে কখনো পাওয়া যেত না। একেকজনের একেক ধরনের চাকরি। কেউ রাত আটটার আগে বাসায় ফিরত না। একমাত্র আমি সাধারণত বিকেল ৫টার মধ্যে মেসে ফিরে আসতাম। যেদিন আমার রাতের ডিউটি থাকত সেদিন রাত এগারটায় ফিরতাম। যেদিন ফররুখ আসত সেদিন যেন একটি উৎসবের কলগুঞ্জন শুরু হতো। মতিউল ইসলাম আসত, পীযূষ বন্দোপাধ্যায় আসত, কাজী আফসার উদ্দিন আসত। কিন্তু কাজী আফসার উদ্দিন

অথবা পীযূষ নিয়মিত আসত না। তেমনি কখনো কখনো আসতেন আবুল মনসুর আহমদ আবেং আবদুল কাদির। এদের আগমনটা ছিল আকস্মিক। এরা যেতেন আমাদের গলির মুখের সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী'র অফিসে। যাওয়ার পথে মেসের বারান্দায় আমাকে দেখলে উঠে আসতেন। এরা তৎকালীন সময়ের মুসলমানদের রাজনীতি নিয়ে কথা বলতেন। আবুল মনসুর আহমদের কথা শুনে মনে হতো তিনি কোথাও কোন বিতর্কে অংশ নিতে যাচ্ছেন, মাঝপথে আমাকে পেয়ে তাঁর বক্তব্যের যুক্তিগুলো আমার সঙ্গে আলোচনা করে শাণিত করে নিতেন। পীযূষ মাঝে মাঝে আসত তার নতুন কোন কবিতা শোনাতে, মতিউল ইসলামও তাই। কিন্তু ফররুখ আসত অকারণ আনন্দে কথা বলতে।

আমাদের মেসের পাশেই একটি ডালপুরীর দোকান ছিল। এখানে কখনো কখনো ফররুখ গিয়ে বসত। সঙ্গে আমি থাকতাম এবং মতিউল ইসলাম। তখন সাধারণ ডালপুরীর দাম ছিল চার পয়সা। ফররুখ অর্ডার দিতো চার আনা দামের একেকটি ডালপুরী করে দেবার জন্য। প্রচুর ডাল, কাচালংকা, পেয়াজ এবং জিরের গুঁড়ো দিয়ে সে তার ডালপুরীর স্বাদ বাড়াতে বলত। সত্যিই এভাবে ডালপুরীগুলো খুব স্বাদের হতো। ডালপুরীর দোকানে যেসব লোকজন আসত তাদের সম্বন্ধে ফররুখ নানারকম কৌতুককর মন্তব্য করতো। বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রকম চলনভঙ্গি দেখে সে তাদের নামকরণ করত। এই নাম ধরে সে অপরিচিত লোকটি সম্পর্কে রসালো মন্তব্য করত এবং আমরা প্রাণভরে হাসতাম। মানুষের জীবনে অনাবিল হাসির সময়টি খুব বেশি থাকে না। ফররুখের চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ ছিল যে একটি উচ্ছলতায় সে পরিপূর্ণ ছিল। বেদনা অথবা যন্ত্রণা কি সে যেন জানতই না এবং সে কাউকে জানতেও দিতে চাইত না। একটি বিপুল বিশুদ্ধ পরিতৃপ্তি তাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল।

আমাদের মেসের দোতলায় একটি মাত্র ঘর ছিল এবং ঘরের একটি খোলা ছাদ। ছাদের চারদিকের দেয়ালগুলো বেশ উঁচু কিন্তু দেয়ালের মধ্যে অনেকগুলো ফুটো ছিল। যেখান দিয়ে পাশের বাড়ির ছাদের সবকিছু দেখা যেত। মেসের বাড়িটির উত্তরে প্রায় গায়ে গা লাগা আরেকটি বাড়ি ছিল। সে বাড়ির ছাদে একটি বড় খাঁচা ছিল। খাঁচাটিতে একটি সুন্দর টিয়াপাখি ছিল। টিয়াটির গায়ের রং যেমনটি হয়ে থাকে তেমনি অর্থাৎ হাল্কা সোনালী সবুজ, গলায় ছিল লাল রঙের বেষ্টনী। চোখ দুটো চকচকে কালো। আমি প্রায়ই এই টিয়াটিকে দেখতাম। একটি যুবতী ছাদে উঠে টিয়াটিকে খাবার দিতো। একটি বাটিতে ভেজা ছোলা, আরেকটি বাটিতে পানি। মেয়েটি এলেই টিয়াটি চঞ্চল হতো এবং যতক্ষণ মেয়েটি খাবার দিতো ততক্ষণ সে মনোযোগের সঙ্গে তা দেখত। মেয়েটির পিছনে পিছনে কোন কোন দিন একটি যুবকও আসত। যুবকটির এক পা ছিল খোঁড়া। যুবকটি মেয়েটির কোনরূপ আত্মীয় ছিল বলে মনে হতো না। মেয়েটির কপালে সিঁদুর দেখে জানতাম যে মেয়েটি

বিবাহিতা। যুবকটি ছিল পাড়ায় বহিরাগত এবং মেয়েটির সঙ্গে সে এক ধরনের প্রেমের সম্পর্ক করবার চেষ্টা করত তা বুঝতে পারতাম। ছেলেটিকে দেখলে টিয়াটি শব্দ করত। টিয়ার ডাকটি বেশ কর্কশ, মনে মতো সে প্রতিবাদ করছে।

ফররুখকে এ কাহিনী বলতে একদিন সে আমার সঙ্গে ছাদে উঠে টিয়াটিকে খুব ভালো করে দেখলো। পরে আমাকে বলল, "টিয়াটি পুরুষ। পুরুষ টিয়ার গলায় লাল দাগ থাকে এবং পুরুষ টিয়া বলেই সে খঞ্জ প্রেমিকটাকে সহ্য করতে পারছে না।" একদিন আমরা ডালপুরীর দোকানে বসে ডালপুরী খাচ্ছিলাম। তখন ফররুখের ভাষায় সে 'খঞ্জ সাহেব' ভিতরে ঢুকল। তাকে দেখে ডালপুরীওয়ালা খুব বিরক্ত হলো মনে হলো। সে বলল, "বাবু আজ কিন্তু পয়সা না দিলে ডালপুরী দেবো না। আগেই অনেক ডালপুরী খেয়েছেন। কিন্তু পয়সা দেননি। লোকটি উত্তরে বলল, "তোমার কয়টিই বা পয়সা বাকী পড়েছে। সব শোধ করে দেবো। বকশিসও দেবো।" ডালপুরী খেয়ে লোকটি চলে যেতে ডালপুরীওয়ালা বলল, "বাবু এই লোকটি একটি খারাপ লোক। অন্য পাড়া থেকে আসে, এ পাড়ার একটি মেয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে।" ফররুখ বলল "খুব বদমাইশ তো! ওর আরেকটি পা ভেঙ্গে দেয়া যায় না?" ডালপুরীওয়ালা বলল, "এ পাড়ার ছেলেরা খেপলে একদিন ওর অন্য ঠ্যাংটাও যাবে।"

মতিউল ইসলাম তখন তাঁর 'ফরিয়াদ' নামক বইটি ছাপছিল। একেকদিন সে তার প্রুফ নিয়ে আসত এবং আমি ও ফররুখ মিলে তার কবিতার রদবদল করতাম। একদিন এক বড় কবিতা দেখে ফররুখ স্কেল দিয়ে মেপে তার প্রথম বার ইঞ্চি রেখে পরের অংশটুকু কেটে দিল। মতিউল ইসলাম প্রতিবাদ করতেই বলল, "ঘাবড়াচ্ছেন কেন? হিসেব করে দেখুন চৌদ্দ লাইনের সনেট হয়ে গেছে।" বইটি যখন ছাপা প্রায় শেষ তখন মতিউল ইসলাম উৎসর্গপত্র নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করল। সে বলল, "আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেব আমার কবিতা পছন্দ করেন না। আমি তাই ঠিক করেছি তাঁর নামে এই বইটি উৎসর্গ করব। একটি 'নোবল রিভেঞ্জ' হবে।"

যাই হোক মতিউল ইসলাম উৎসর্গ পত্রের প্রুফ যখন এনেছে তখন ফররুখ তাতে একটি সংশোধনী জুড়ে দিল। শামসুদ্দীন সাহেব তখন প্রভিন্সিয়াল অ্যাসেম্বলির মেম্বার। যাকে বলা হয় এম. এল. এ। ফররুখ করল কি আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেবের নামের পাশে এম. এল. এ কথাটি জুড়ে দিল। এর ফলে হিতে বিপরীত হয়েছিল। শামসুদ্দীন সাহেব তাঁর নামের শেষে এম, এল, এ দেখে খুব রেগে গিয়েছিলেন এবং ধারণা করেছিলেন যে মতিউল ইসলাম তার সঙ্গে পরিহাস করেছে। এর ফলে 'মোহাম্মদী' অথবা 'আজাদ'-এ মতিউল ইসলামের কবিতা ছাপানো দুরূহ হয়ে পড়েছিল। ফররুখের এ ধরনের মানসিকতা মতিউল ইসলামের জন্যও ক্ষতিকর হয়েছিল। কিন্তু ফররুখ তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিল, "আপনি ঘাবড়াচ্ছেন কেন? কবিতা ছাপাবার জন্য অন্যরকম ঘুষ দিতে হয়, সেটারই ব্যবস্থা করুন। এই দেখুন

না, অদ্বৈত মল্লবর্মনকে আলী রসগোল্লা খাইয়ে তার গল্প ছাপিয়েছে।" মতিউল ইসলাম আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'তাই নাকি?' কথাটি অবশ্য মিথ্যা, তবুও আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম। আসলে ঘটনাটা হয়েছে কি, অদ্বৈত মল্লবর্মনকে তার নিরীহ স্বভাব এবং বিনয়ের জন্য আমরা সবাই পছন্দ করতাম এবং কোন কোন দিন আমরা তাকে নিয়ে চায়ের দোকানে গিয়ে বসতাম। আমরা শুধু চা খেতাম কিন্তু তাকে কিছু খাবারও দিতাম যেমন টোস্ট, ডিমপোচ ইত্যাদি। এটাকে ফররুখ একটু অন্যভাবে ঘুরিয়ে বলেছিল। অদ্বৈত বাবু অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। তিনি সকাল বেলা অফিসে কিছু না খেয়েই আসতেন। এটা আমরা জানতাম বলে তাকে মাঝে মাঝে খাওয়াতাম। কিন্তু সেটা লেখা ছাপাবার জন্য ঘুষ ছিল না।

অদ্বৈত মল্লবর্মন মাসিক 'মোহাম্মদী'তে অল্প বেতনে চাকরি করতেন। ছাপাবার জন্য যে সমস্ত গল্প এবং উপন্যাস আসত সেগুলো তিনি বাছাই করতেন। আমি একবার 'বুদ্বুদ' নামে একটি গল্প তার হাতে দিয়েছিলাম। ফররুখ তখন সেখানে উপস্থিত ছিল। এ নামটি তার পছন্দ হল না। সে বলল, "বুদ্বুদ কোন নাম হয় না কি? এ নাম দেখলে কেউ গল্পটা পড়বেও না।" অদ্বৈত বাবু বললেন, "গল্পটা আগে পড়ে দেখি, তারপর নাম ঠিক করা যাবে।" অদ্বৈত বাবু নাম ঠিক করেছিলেন 'দি পাইপার এন্ড ডাঙ্গার।' আমি নামটি মেনে নেইনি। শেষ পর্যন্ত 'বুদ্বুদ' নামেই গল্পটি ছাপা হয়। ফররুখ গল্পটি পড়ে মন্তব্য করেছিল আমার ভবিষ্যতে গল্প লিখতে যাওয়া ঠিক হবে না। আমি অবশ্য পরে আর গল্প লেখায় হাত দেইনি।

ফররুখ সব সময় ভাবত যে নজরুল ইসলামকে অতিক্রম করতে না পারলে সে বাংলা কাব্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। সে আমাকে প্রায়ই বলতো, শুধু উদ্দীপনা ও গানে নজরুল ইসলাম মানুষকে বশীভূত করে রেখেছেন। সে একদিন নজরুল ইসলামের কাছে গিয়ে বলেছিল, 'আমি আপনার চেয়েও বড় কবি হব।'

নজরুল ইসলাম প্রচণ্ড অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বলেছিলেন, 'তুই কি লাফাতে পারিস, গান গাইতে পারিস?

ফররুখ তখন বলেছিল, 'আপনাকে ছাড়িয়ে যেতে হলে লাফাতে হবে কেন?'

নজরুল ইসলাম আবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছিলেন, বলেছিলেন, 'গান ছাড়া কবিতা হয় না, বাংলা কবিতা গানেরই রাজ্য।'

নজরুল ইসলাম ঠিকই বলেছিলেন; সেই প্রাচীনকাল থেকে আরম্ভ করে নজরুল ইসলাম পর্যন্ত বাংলা কবিতা মূলত সুরেরই ইন্দ্রজাল। চর্যাগীতিগুলো রাগ-রাগিণী ভিত্তিক, মধ্যযুগের কবিতাও সুরে গাওয়া হতো, মাইকেল মধুসূদন দত্তও সুরের প্রতাপ অগ্রাহ্য করতে পারেননি। তাই দেখি তিনি মহাকাব্যের পাশাপাশি 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য রচনা করেছেন। 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যগ্রন্থটি কীর্তনের সুরে রচিত। আধুনিককালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুল প্রসাদ সেনগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নজরুল ইসলাম

সুরের রাজ্যে বিচরণ করেছেন। তবে ত্রিশের দশক থেকে বাংলা কবিতায় সুরের ইন্দ্রজাল ক্রমশ নষ্ট হয়েছে। যেহেতু আধুনিককালে শব্দের বিচরণ ভূমি হচ্ছে বিজ্ঞান এবং কর্মচঞ্চল পৃথিবী, তাই আধুনিক কবিরা সুরের সম্মোহন ছেড়ে দিয়ে গদ্যের প্রত্যয়কে অবলম্বন করেছিলেন। এই পরিবর্তনটি নজরুল ইসলাম অনুভব করে যেতে পারেননি। ফররুখ আহমদ কিছু গান লিখবার চেষ্টা করেছিল এক সময়ে। কিন্তু রাগ-রাগিণী সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকায় সে এক্ষেত্রে বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেনি। এখনকার দিনে যেসব কবি গান রচনা করে তারা সুরকারের ওপর নির্ভরশীল। অনেক সময় সুরকারের নির্দেশেই বাণী-ভঙ্গিটি তৈরি হয়। নজরুল ইসলামের ক্ষেত্রে এটা ছিল না। ফররুখ আহমদ যে নজরুলকে অতিক্রম করতে চেয়েছিল সেটা নজরুল ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল বলেই বলেছিল। সে জানত এবং অনুভব করত যে নজরুল ইসলামের মধ্যে এমন একটি বিশেষ প্রাণ-চৈতন্য রয়েছে যাকে শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

কলকাতায় কখনও কখনও আমি, ফররুখ ও মতিউল ইসলাম ছুটির দিনে পুরনো অঞ্চলগুলো ঘুরে বেড়াতাম। অতীতকে খোঁজা আমাদের তেমন উদ্দেশ্য ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল সময় কাটানো। এক ছুটির দিনে জব চার্নকের স্মৃতিচিহ্ন খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু একটি সাধারণ কবর ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছুই খুঁজে পাইনি। ফররুখ তখন বলেছিল, "চার্নকের আত্মা নিশ্চয়ই ভূত হয়েছে, কিন্তু কলকাতায় মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ভূতটি নিশ্চয়ই শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেছে।" সারাদিন ঘুরে দুপুরে আমরা আমজাদিয়ায় খেতে বসেছিলাম। আমাদের খাবার বিল পরিশোধ করেছিল মতিউল ইসলাম। ফররুখ আর আমি খেয়েছিলাম পরোটা-কাবাব, আর মতিউল খেয়েছিল বিরিয়ানি। ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা নিউ মার্কেটের ভেতরে গিয়েছিলাম যেটাকে লোকেরা 'হগ সাহেবের বাজার' বলে। কলকাতায় লোকজনের কোলাহলে প্রায় পথই কেমন যেন যন্ত্রণাদায়ক পথ, তবু সে পথে রহস্য ছিল এবং চলতি পথে নতুন আবিষ্কারের আনন্দ ছিল।

আমি যখন অল ইন্ডিয়া রেডিওতে চাকরি করতাম তখন আমার সঙ্গে স্টাফ আর্টিস্ট ছিলেন আহসান হাবীব। ফররুখকে আমি কবিতা পাঠে ডাকতাম। রোববার সকালে সাহিত্য বাসর বলে একটি অনুষ্ঠান হত। সে অনুষ্ঠানের দায়িত্ব ছিল আমার। সে অনুষ্ঠানে আসতেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, মোহিতলাল মজুমদার এবং আরও অনেকে। আমি এ অনুষ্ঠানে একদিন ফররুখকে কবিতা পাঠের জন্য ডেকেছিলাম। সেদিনকার অনুষ্ঠানে ছিলেন অজিত দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং একজন গল্প লেখক যার নাম আজ আর মনে করতে পারছি না। যারা সেদিনকার অনুষ্ঠানে ছিলেন তারা প্রত্যেকে ফররুখকে জানতেন এবং কবিতা পাঠ শেষে ফররুখের খুব প্রশংসা করেছিলেন। অজিত দত্ত একটু ধীর-স্থির প্রকৃতির লোক

ছিলেন। তিনি ফররুখকে প্রশ্ন করেছিলেন, "আপনি ধর্মকে কবিতায় আনেন কেন? এখনকার সময় হচ্ছে মানুষের সময়। এখন কি মধ্যযুগের ধর্মের সময় আছে?" ফররুখ সেদিন খুব সুন্দর একটি উত্তর দিয়েছিল, "আমি তো ধর্ম নিয়ে কবিতা লিখি না, আমি কবিতা লিখি ইসলাম নিয়ে এবং ইসলাম তো হচ্ছে চিরন্তন মানব ধর্ম।"

আমি অল ইন্ডিয়া রেডিও-কলকাতায় ধারাবাহিকভাবে আধুনিক কবিতা নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করেছিলাম। এ আলোচনায় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাস, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র এদের সকলের কবিতা নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচ্য কবিদের তালিকায় সর্বশেষ কবি ছিল ফররুখ আহমদ। ফররুখ আহমদের ওপর আলোচনা করতে দিয়েছিলাম আবদুল কাদিরকে। কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান সকলের মধ্যে বিশিষ্ট ও ব্যাপকভাবে ফররুখের এটাই প্রথম স্বীকৃতি। আবদুল কাদির প্রথমে ফররুখের ওপর বলতে চাননি, কিন্তু আমি যখন বললাম যে তাকে অন্য কোন প্রোগ্রাম দেয়া হবে না, তখন তিনি আর আপত্তি করেননি।

অল ইন্ডিয়া রেডিওতে রেজাউল করিম বলে এক ভদ্রলোক মাঝে মাঝে কথিকা পাঠ করতেন। আমি যোগ দেবার পর এ ভদ্রলোককে আর কোন অনুষ্ঠানে ডাকিনি। ভদ্রলোক ছিলেন 'আনন্দ বাজার' পত্রিকার ভাড়াটে লেখক। তিনি মুসলমানদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিরুদ্ধে লিখতেন। তখন সারা ভারতব্যাপী পাকিস্তান আন্দোলন চলছে। রেজাউল করিম কংগ্রেসের সপক্ষে বক্তব্য রাখতেন, আবার কখনও কখনও সাহিত্যের অঙ্গনে এসে বঙ্কিমচন্দ্রকে অসাম্প্রদায়িক বানাবার চেষ্টা করতেন। রেডিওর প্রোগ্রাম পাওয়া বন্ধ হলে ভদ্রলোক একদিন বিকেলে আমার তালতলার মেসে এলেন। ভদ্রলোকের পরনে ছিল ধুতি, পায়ে মোজা এবং ইংলিশ সু এবং মুখে বিরাট চাপদাড়ি। ভদ্রলোক রেডিওর কোন আমন্ত্রণ পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করলেন। আমি বললাম, "রেডিওতে নতুন নতুন মুখ আবিষ্কার করা আমাদের কর্তব্য। আপনি তো অনেকদিন করেছেন। বর্তমানে আমরা নতুন কিছু লোককে সুযোগ দিচ্ছি।" ফররুখ হঠাৎ বলে বসল, "আপনি তো এদ্দিন হিন্দুদের কাছ থেকে প্রোগ্রাম পেতেন। এখন মুসলমানের কাছ থেকে প্রোগ্রাম পেতে হলে আপনাকে ঠিক ঠিক মুসলমান হতে হবে।" ভদ্রলোক ফররুখকে চিনতে পারেননি, জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কে?' ফররুখ শুধু বলল, 'আমি কবিতার ব্যবসা করি?' ভদ্রলোক ফররুখের কথা বুঝতে না পেরে বোকার মত তাকিয়ে রইলেন। আমি তখন ফররুখের পরিচয় দিলাম।

ফররুখের একটি অভ্যাস ছিল মানুষের নানা রকম নামকরণ করা। এ ব্যাপারে তাঁর দক্ষতা ছিল অপরিসীম। কাজী আফসার উদ্দিন আহমদের নামের আদ্যক্ষরগুলো একত্র করলে দাঁড়ায় 'কাউয়া' ফররুখ তাকে 'কাউয়া' বলে ডাকত। আফসার উদ্দিন এতে কিছু মনে করত না। সিকান্দার আবু জাফরকে বলত 'আল সিকান্দার'। সিকান্দারের একটি প্রতাপী ভঙ্গি ছিল। সেজন্য এ নামটি মানানসই হয়েছিল। গোলাম কুদ্দুসকে নাম দিয়েছিল 'গদাই কদু'। কুদ্দুস আমাদের মধ্যে একটু বেশি মেদবহুল ছিল। আবুল হোসেনকে বলতো 'আবাল হোসেন'। এরা দু'জন ফররুখের

দেয়া নামে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। কিন্তু আহসান হাবিবের নামকরণ ছিল সবচেয়ে খারাপ। আহসান হাবীবকে সে বলত 'উর্ধ্বলিঙ্গ শিব'। হাবীব লজ্জিত হয়ে প্রতিবাদ করত, কিন্তু ক্রুদ্ধ হত না। এই প্রবণতা ফররুখের অনেক দিন ছিল। ঢাকায় এসে আবদুল হাই মাশরেকীর নামকরণ সেই করেছিল। আবদুল হাই তার নাম নিয়ে বিব্রত ছিল। সে ফররুখকে বলল, "আমার আবদুল হাই নামটি খুব কমন নাম, অনেকেরই আছে। এ নামটি আমার ভাল লাগে না।" ফররুখ বলল, "তোর নামের সঙ্গে 'মাশরেকী' জুড়ে দিলাম। এখন থেকে তুই "আবদুল হাই মাশরেকী"। এ নামটি বেশ চালু হয়ে গিয়েছিল।

কলকাতা থাকতে ফররুখ তার পূর্ব পুরুষের জীবনের ঘটনা নিয়ে উপন্যাস লেখা শুরু করেছিল। উপন্যাসটির নাম ছিল 'রুস্তম শাহ্‌র ঘোড়া'।[১] উপন্যাসটি কাজী আফসার উদ্দিনের পত্রিকা 'মৃত্তিকা'য় ধারাবাহিকভাবে কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। উপন্যাসটি সে শেষ করেনি। কিন্তু যতটুকু প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে গতিবেগ ছিল, ভাষার একটি উজ্জ্বল দীপ্তি ছিল এবং কাহিনীর একটি সুন্দর কৌশল ছিল। 'মৃত্তিকা'র এ সংখ্যাগুলো পেলে ঔপন্যাসিক হিসেবে ফররুখের কেমন সম্ভাবনা ছিল পরীক্ষা করা যেত। নগরীর উপকণ্ঠে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামের একটি সম্ভ্রান্ত মুসলমানের কাহিনী সে লিখবার চেষ্টা করেছিল। আমি এক সময় 'গল্প সংগ্রহ' নামে দুখণ্ডে বাংলা ভাষায় মুসলমানদের লেখা গল্পের একটি সংকলন বের করেছিলাম। সেখানে ফররুখের একটি সুন্দর গল্প ছিল। বইটি এখন আমার সংগ্রহে নেই। তাই ফররুখের গল্পের নামটি কি ছিল তা বলতে পারছি না। যদ্দুর মনে পড়ে গল্পটির মধ্যে এককালের প্রতাপী একজন সম্ভ্রান্ত মুলমানের জীর্ণতা এবং গ্লানির একটি চিত্র আঁকা হয়েছিল।

ফররুখ একবার আমাকে বলেছিল যে রাসূলে খোদার জন্মকে কেন্দ্র করে একটি নাট্যকবিতা সে লিখবে যেখানে ফেরেশতাদের উল্লাসের কথা থাকবে, পৌত্তলিকদের ভয়ের কথা থাকবে এবং অগ্নিপূজকদের আগুন নিভে যাবার কথা থাকবে। শেষ পর্যন্ত এ পরিকল্পনাটি সে বাদ দেয় এবং তার পরিবর্তে 'সিরাজাম মুনীরা' নামক একটি কবিতায় রাসূলের একটি সুন্দর প্রশস্তি রচনা করে।

কলকাতায় আমার জীবনে ফররুখ ছিল আমার জন্য আশ্বাসের মত। একটি প্রশান্ত মধুর সময় আমরা তখন নির্মাণ করেছিলাম। তখন আমাদের সামনে পরীক্ষা ছিল এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে অনেক প্রতিবন্ধকতা ছিল। তখন আমাদের বিপরীতে ছিল বিত্তবান, রুচিশীল এবং সর্বপ্রকার প্রচার মাধ্যমের অধিকারী হিন্দুরা। তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতিভায় ছায়াচ্ছন্ন না হয়ে আমরা যে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলাম তা একটি ইতিহাস। এখনও আমার সেসব কথা মনে পড়ে, বিশেষ করে উজ্জ্বল দীপ্তিময়, এবং উন্নত শির ফররুখকে দৃষ্টির সামনে প্রবলভাবে দেখি। আমার স্মৃতিতে সে কখনও হারিয়ে যাবে না। ◻

---

১. প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসটির নাম ছিল : 'সিকান্দার শা'র ঘোড়া'। অসম্পূর্ণ উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে 'মৃত্তিকা' পত্রিকায় শ্রাবণ, ১৩৫৩ সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হয়। – সম্পাদক।

# ফররুখ সম্পর্কে

## সৈয়দ আলী আহসান

শব্দ ও ধ্বনির সম্পৃক্ততা বিষয়ে ফররুখ অবগত ছিলেন। সে সম্পৃক্ততার ফলে যে অর্থবহতা নির্মিত হয় তাও তিনি জানতেন। ব্যাপক পড়াশুনা তাঁর ছিল, বিশেষ করে 'হাতেম তা'য়ী' পাঠ করলে তা বোঝা যায়। অনেক দোভাষী পুঁথি তিনি পড়েছেন, বিশেষ করে বিভিন্ন কাহিনীর গতিধারা অনুসন্ধানের জন্য। তিনি যে সমস্ত দোভাষী পাঠ করতেন তাহলো হাতেম তা'য়ী, কাসাসুল আম্বিয়া, আলেফ লায়লা ইত্যাদি। সেগুলো অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পড়তেন। শুধুমাত্র কাহিনীর গতিধারা নির্ণয়ের জন্য নয়, অধিকন্তু শব্দের শাসন বৈচিত্র্য এবং প্রবাহের জন্য। আমি অনেকবার তাঁকে বলেছি যে, দোভাষী পুঁথিতে একমাত্র কাহিনী বিন্যাসই লক্ষ্যযোগ্য। দোভাষী পুঁথির শব্দ ব্যবহার এবং সেখানকার অর্থবহতা আমাদের আলোচ্য বিষয় হতে পারে না। তার কারণ শব্দের অর্থ নির্ণয় তাদের লক্ষ্য ছিল না। পুঁথিকারগণ তাদের কাহিনী বর্ণনার ব্যস্ততায় নিমগ্ন ছিলেন।

ফররুখ আমার কথা মানতেন না। তিনি মন্তব্য করতেন যে, পুঁথিকারগণ বাংলা শব্দের ধ্বনির সঙ্গে আরবি-ফারসি-উর্দু ধ্বনির ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ততা ঘটিয়েছেন। এটা অত্যন্ত সাহসের কথা। এই মিশ্রণের ফলে যে রকম ধ্বনি ব্যঞ্জনা গড়ে উঠেছে তা নতুন। দুঃখের বিষয় বাংলা কাব্যে এ অনুসৃতি আর কখনও হল না। ভারতচন্দ্রের সময়কালে এবং তার পরে ভুরশুট পরগণায় দোভাষী পুঁথির কবিগণের বসবাস ছিল। মনে হয় এই অঞ্চলে এই মিশ্রিত ভাষার প্রচলন ছিল। প্রচলন থাকুক বা না থাকুক এই ভাষার বিকাশ যে ছিল তা বোঝা যায়। ভারতচন্দ্র নিজেই লিখেছেন, "না রবে প্রসাদগুণ, না হবে বসাল। তাই কহি ভাষা আমি যাবনী মিশাল।"

অর্থাৎ কবিতায় প্রসাদগুণ তৈরি করতে হলে আরবি-ফারসি শব্দের মিশ্রণ অত্যন্ত প্রয়োজন। ফররুখ সে প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেছিলেন এবং নিজের কবিতায় তা অর্থবহতায় ব্যবহার করেছিলেন। কবিতার সৌন্দর্যের জন্য তিনি যে ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন তা কিন্তু দোভাষী পুঁথির ছন্দ নয়। বাংলা ছন্দের প্রচলিত ধারার মধ্যে তিনি আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োজনগত যে সমীক্ষা চালিয়েছিলেন তা আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নতুন। ফররুখের কবিতার ক্ষেত্রেও নতুন। ফররুখের কবিতার বলিষ্ঠতা, সাবলীলতা, গীতিধর্মিতা এবং আবেগের অনুশীলন আশ্চর্যজনকভাবে অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং শ্রুতিমধুর। মূলত ফররুখ বাংলা কাব্য ক্ষেত্রে অনুশীলনের পরিচয় দিয়েছিলেন তা তাঁর কাব্য- প্রবাহে নতুন ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছিল। তাঁর কবিতার রূপকল্পে একটি প্রশান্ত বরাভয় ছিল। 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো পাঠ করলেই তা বোঝা যায়।

ফররুখ ইসলামী কবি ছিলেন, না শুধুই কবি ছিলেন এ আলোচনা নিরর্থক। তার কারণ ফররুখের কবিতা সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছেই গ্রহণযোগ্য ছিল। তাঁর বিষয়বস্তু ছিল একটি বলিষ্ঠ আবেগ' যে আবেগের আবেদন ছিল অত্যন্ত গভীর এবং অত্যন্ত প্রাণবন্ত। তাঁর বন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায় একবার আমাকে বলেছিলেন, ফররুখ কোন বিষয়ে লিখছে তা আমার বিচার্য বিষয় নয়। কোন তাৎপর্যে তার শব্দগুলো বিভিন্ন চরণ বিন্যাসে দোলায়িত হচ্ছে তাই আমি দেখব। এভাবে আমরা ফররুখকে সকল শ্রেণীর পাঠকের কবি হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থে সমুদ্র যাত্রাপথে যে বিভিন্ন অনুষঙ্গ উপস্থিত হয়েছে তাদের রূপ-লাবণ্য অত্যন্ত মধুর। তিনি যে সমস্ত কবিতা লিখেছেন তার মধ্যে ইসলাম ধর্মের শক্তি ও বিনয় প্রকাশিত হয়েছে কিনা অনেকের কাছে তা বিচার্য বিষয় হতে পারে এবং তা অন্যায়ও নয়।

আমি কিন্তু ফররুখকে অন্যভাবে দেখি। যৌবনের উদ্বেলিত আনন্দের একজন গতিমান কবি হিসাবেই আমি তাঁকে বিচার করি। 'সাত সাগরের মাঝি'তে একটি যাত্রার বর্ণনা আছে। জেমস এলোবি ফ্লেকার যে ধরনের কবিতা লিখেছেন, ফররুখের কবিতার সঙ্গে তার মিল। ফ্লেকার বলেছিলেন, 'আমরা স্বর্ণখচিত পথ ধরে সমরখন্দ ভূ-খণ্ডের দিকে যাত্রা করছি।' ফররুখ লিখেছেন, 'আমি সাত সাগর পার হয়ে হেরার রাজতোরণের দিকে যাচ্ছি।' প্রায় একই রকমের আবেগ দু'জনের কবিতায় আছে। তফাৎ শুধু এটুকুই ফ্লেকারের কবিতায় শুধুমাত্র একটি সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে, ফররুখের কবিতায় সত্য ও বিশ্বাসের অনুষঙ্গ হিসাবে সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হয়েছে।

ফররুখের সকল কবিতার মধ্যে দীর্ঘ পথযাত্রার বিবরণ আছে। যেমন 'সাত সাগরের মাঝি'তে দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রা আছে, তেমনি 'হাতেম তা'য়ী' কাব্যগ্রন্থে বিভিন্ন দুর্গম পথযাত্রা আছে। এই পথযাত্রা অথবা সমুদ্র যাত্রা ফররুখের কবিতার একটি মৌলিক বিষয়। হোমারের ওডিসি মহাকাব্যে যেমন সমুদ্র যাত্রা প্রাধান্য পেয়েছে এবং সমুদ্র পথের বিভিন্ন সংকট অতিক্রম করে অবশেষে ইউলিসিস নিজ গৃহে আসছেন, তেমনি ফররুখ আহমদ বিভিন্ন যাত্রার শেষে শান্তি এবং আশ্বাসের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করছেন। আমি এভাবেই ফররুখকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ করতে দেখি। এই বিচরণের কারণ হল সে সর্বপ্রকার সংক্ষুব্ধতা অতিক্রম করতে চায়, বিপর্যয় অতিক্রম করতে চায় এবং অবশেষে শান্তির রাজ্যে গমন করতে চায়।

আমার ধারণা ফররুখ একজন পর্যবেক্ষণকারী দুর্গম পথযাত্রার কবি। আমি তাঁকে শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মের আবহে গ্রহণ করতে চাই না। আমি তাঁকে গ্রহণ করতে চাই সত্য, শৃঙ্খলা এবং সৌন্দর্যের আবহে। এই আবহ তাঁর কবিতায় একটি সুকুমার ছন্দ এবং সৌন্দর্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল। এভাবেই ফররুখ আমাদের কাছে একটি প্রশান্ত আবেগের কবি, সৌন্দর্যের কবি এবং সৌন্দর্যের মহিমায় নিদর্শনের কবি। এভাবেই তাঁকে বিচার করতে হবে এবং গ্রহণ করতে হবে। ■

---

**ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, বিশেষ সংখ্যা, অক্টোবর ২০১০-জুন ২০১১**

# ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি'

## সৈয়দ আলী আহসান

ফররুখ আহমদ সম্পর্কে কোন কিছু বলার আগে সকলকে একটি কথা জানানোর একান্ত প্রয়োজন যে, জীবিতকালে সে আমার একান্ত ছিল। দেশ বিভাগের পর পূর্ব বাংলায় আসার অব্যবহিত পূর্বে আমরা প্রায় প্রতিদিন এক জায়গায় মিলিত হতাম। আমি থাকতাম তালতলা গার্ডেন লেইনের একটি মেসে। মেসে থাকতেন আমার এক ভগ্নিপতি এবং তাঁর কয়জন ভাই। আমি নিচের তলাতেই প্রথম ঘরে থাকতাম। ফররুখ সেখানে প্রতিদিন বিকেলে বা সন্ধ্যার সময় আসতো। সেই সঙ্গে আসতো কখনও কখনও মতিউল ইসলাম, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী আফসার উদ্দীন আহমদ এবং বয়স্কদের মধ্যে আসতেন আব্দুল কাদের এবং আবুল মনসুর আহমদ। এঁরা নিয়মিত আসতেন না, কখনও আমার মেসের সামনে দিয়ে কোথাও যাচ্ছেন সেই সময় একটু উঁকি দিয়ে যেতেন। নানা বিষয়ে আমরা আলোচনা করতাম। প্রধান আলোচনাটা ছিল ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে আমাদের অবস্থিতি নিয়ে। ফররুখ এবং আমি কখনও কখনও বাইরে বেড়াতে বেরুতাম। আমাদের গাড়ি ছিল না কিন্তু দুটি পা ছিল। আমরা হেঁটেই কোলকাতার শহর ঘুরে বেড়াতাম। আমাদের আর্থিক উপার্জন কারোও খুব বেশি ছিল না। তাই আমাদের পায়ে হেঁটে পথ চলতে হত এবং চতুর্দিকের শোভা উপলব্ধি করতে হত। সে এক বিস্ময়কর সময় গেছে। আমরা উভয়ে জানতাম যে, আমরা আছি এবং বেশ প্রসন্নভাবেই আছি। আজ দীর্ঘকাল পরে একখনও যখন বাড়িতে কেউ আসেন এবং ঘণ্টা ধ্বনি করে নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করেন তখন আমার হঠাৎ মনে হয়, এই বুঝি ফররুখ আমার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু অল্পক্ষণে সচেতন হয়ে বুঝতে পারি যে, এ সময় তাঁর আর আসার কথা নয়। পুরনো দিনের প্রত্যাশা শুধু স্মৃতি হয়ে আমার মনে জেগে উঠেছে। কোলকাতায় আমাদের আরও বন্ধু ছিল। যেমন সিকান্দার আবু জাফর, আবু রুশদ, আহসান হাবীব, আবুল হোসেন এবং গোলাম কুদ্দুস। কিন্তু তাঁদের নিয়ে তেমন আড্ডা নিয়মিত কখনও বসতো না। ফররুখের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল। বোধ হয় আমাদের মধ্যে বিশ্বাসগত একটা অঙ্গীকার ছিল। আমরা আছি এবং একে অন্যের সান্নিধ্যে আছি। এই প্রত্যয় নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলব। আমরা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতাম, রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতাম এবং অনেক তুচ্ছ বিষয় নিয়েও এভাবেই সময় কাটাতো। চা আসত, ডালপুরি আসত এবং আমাদের সময় সামনের দিকে অগ্রসর হত। আজ অনেকদিন পর মনে হয় এখন আমি বড় অসহায় এবং একাকী হয়ে পড়েছি। আমার পরিবেশ আমাকে নির্জনতার দিকে ঠেলে

দিয়েছে। ফররুখ এক সময় এই নির্জনতাকে ভেঙ্গে দিত। এখন নির্জনতা ভাঙ্গার কোন লোক নেই।

সেই চল্লিশের দশকে যখন আমাদের বিচরণ তখন আমাদের পশ্চাদে ছিল বিপুল নাস্তি। ইংরেজী সাহিত্যের কয়েকজন অধ্যাপক বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে এসে ইউরোপের অনিশ্চয়তা এবং সংকটকে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করবার চেষ্টা করেছিল। তাঁরা ছিলেন অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ। এঁদের একমাত্র কাম্য ছিল ইউরোপের জীবনধারার হতাশা এবং দুঃখবোধকে বাংলা কাব্যে একটি বিশিষ্টতায় প্রকাশ করা। এই বিশিষ্টতাকে প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁরা ধর্মবিশ্বাস থেকে স্খলিত হয়ে পড়েছিল। এভাবে একটি ভাঙচুরের খেলা কবিতার অঙ্গনে এসেছিল। এর মধ্যে প্রধান ছিল অবিশ্বাসের একটি কলরব। জীব ও সৃষ্টিকে তাঁরা আজন্ম অনাথ বলেছেন। এই নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরে হবে। কিন্তু এখানে বলতে চাই যে, এদের পরপরই আমরা কয়েকজন এসেছিলাম বিশ্বাসকে বরণীয় করে। এক্ষেত্রে সত্য ও আনন্দের নির্দেশনা এনেছিল ফররুখ আহমদ। ফররুখ কিন্তু প্রথমেই এই বিশ্বাসের মধ্যে জেগে উঠেনি। কিন্তু ঐ শহর এবং যৌবনের সন্ধিক্ষণে তাঁর মনে একটি পরিবর্তন আসে। সেই পরিবর্তনটি হচ্ছে ইসলামের মধ্যে নতুন করে প্রবেশ করা। সে তাঁর কাব্যগ্রন্থ "সাত সাগরের মাঝি" দিয়ে একটি দুনির্বার যাত্রার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে। তার মধ্যে রোমান্টিকতা ছিল এবং এই রোমান্টিকতা ছিল সর্বপ্রকার ভীতি এবং সম্পদে থেকে মুক্ত হবার রোমান্টিকতা। আমিও সেই সময় ফররুখের মত কবিতা লিখতাম। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে ফররুখের বলয় থেকে বেরিয়ে এবং আমার বিশ্বাসকে অন্যভাবে পাবার চেষ্টা করলাম। সেই সময়ের কথা মনে পড়লে আজও অবাক লাগে যে, কি করে আমরা আমাদের কাব্যগ্রন্থকে ভাগ করে নিয়েছিলাম। নাস্তিকতা আমাদের কাছে অপরাজেয় হতে পারে। শোভনতা, সংহতি এবং বিশ্বাসের বিভূতিকে আমরা স্পর্শ করে নিতে চেয়েছিলাম। তখন মনে হত একটি বিষয় যেন আমাদের জীবন, চিন্তা এবং চৈতন্যকে আশ্রয় করে উঠেছিল এবং সে হচ্ছে আমি আমার বিশ্বাসের মধ্যে আছি এই বিশ্বাসটুকু।

ফররুখ সৈয়দ বংশের ছেলে এবং আমিও তাই। আমি পারিবারিক সূত্রে সৈয়দ উপাধিটি ব্যবহার করি। এতে আমার আনন্দ এবং অহমিকা জাগে। সৈয়দ উপাধিটি ধারণ করলে মনে হয় আমি একটি বিরাট চৈতন্যের অংশ বিশেষ। আমাদের পারিবারিক ধারার মধ্যে সূফী মতবাদটি প্রবল ছিল এবং এখনও আছে। ফররুখের পরিবারের মধ্যে বংশ পরম্পরাক্রমে তাঁরা সৈয়দ কিন্তু তাঁর পূর্বপুরুষ সূফী ধারায় দীক্ষিত ছিল না। তাঁর পিতা বৃটিশ আমলে জাদরেল পুলিশ ইন্সপেকটর ছিলেন। বেশ প্রতাপী পুরুষ হিসাবে তাঁর একটা পরিচয় ছিল। ফররুখ কিন্তু এতে গর্ববোধ করত

না। তাঁর কাছে সৈয়দ এবং প্রতাপ দুটি ছিল পরস্পর বিরীতধর্মী। তাই ফররুখ জীবনে কখনও সৈয়দ উপাধিটি ধারণ করেনি। কোলতাকায় থাকতে আমি একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, কেন সে সৈয়দ উপাধিটি ব্যবহার করে না। ফররুখ উত্তরে বলেছিল, যে তাৎপর্য নিয়ে আমি রসূলের বংশধর হিসাবে দাবী করব সে তাৎপর্যের কোন কিছু আমার মধ্যে নেই। তাছাড়া আমি উত্তরাধিকার সূত্রে সৈয়দ উপাধিটি পেয়েছি। এটা আমার কর্মলব্ধ নয়। সুতরাং আমি সৈয়দ ব্যবহার করি না। ফররুখ এক সময় তাঁর পিতার এবং তাঁর পারিবারিক জীবন-তথ্য অবলম্বন করে একটি উপন্যাস লেখায় হাত দিয়েছিল। উপন্যাসটির নাম 'রুস্তম শাহের ঘোড়া'। কাজী আফসার উদ্দীন আহমদের 'মৃত্তিকা' নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকায় এর কিছু অংশ ছাপা হয়েছিল। উপন্যাসটি ফররুখ শেষ করতে পারেনি। প্রথম দিকে ফররুখ কিছু গল্প লিখেছিল। বেশ বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে গল্পগুলি লিখেছিল। কিন্তু ক্রমশ: ফররুখের মধ্যে পরিবর্তন আসতে থাকে এবং ধর্মীয় চিন্তায় সে উদ্বুদ্ধ হতে থাকে। কোলকাতায় মাওলানা আবদুল খালেকের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং তাঁর উপর ফররুখ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। মাওলানা আবদুল খালেক ফররুখের জীবনকে আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। এ পরিবর্তনটা আমরা বুঝতে পারতাম। কিন্তু এ নিয়ে ফররুখ আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতো না। ফররুখ খ্রিস্টান কলেজে পড়েছে। কলেজে তাঁর সহপাঠী ছিল সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সেই সময় ফররুখ ধর্মবিরোধী একটি নাস্তিকতার দিকে চলে যেতে পারতো, কিন্তু সে যায়নি। নতুন এক ধরনের বিশ্বাসের সাম্রাজ্যের মধ্যে ফররুখ চলে আসে। এই সময় কোলকাতায় কবি বেনজীর আহমদ ফররুখকে নিয়ে পথে পথে ঘুরতেন। আমার এখনও মনে আছে ফররুখের 'সাত সাগরের মাঝি' বইটি যখন বের হয় তখন কবি বেনজীর আহমদ ফররুখকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন লেখকের বাড়িতে গিয়েছেন এবং পুস্তকটি বিতরণ করেছেন। বেনজীর আহমদ সুখে-দুঃখে ফররুখের সঙ্গে সর্বদাই যুক্ত থাকেন।

ফররুখের পিতার সঙ্গে ফররুখের সখ্যতা কখনও গড়ে উঠেনি। একটি বয়সে পুত্র পিতার মিত্র হন কিন্তু ফররুখের বেলায় তা ঘটেনি। তাঁর পিতা প্রতাপী পুলিশ অফিসার ছিলেন এবং সেই প্রতাপ তিনি নানাভাবে প্রদর্শন করতেন। এটা ফররুখের কখনো মনঃপুত হয়নি। তাই দেখতে পাই, অল্প বয়সে ফররুখ গ্রামের বাড়ি ছেড়ে শহরে চলে আসে। স্কুলের পড়াশুনাও গ্রামে হয়নি। খুলনা শহর থেকে তিনি মেট্রিক পরীক্ষা দেন। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামের পাঠশালায় হয়। সেখান থেকে কোলকাতায় চলে আসেন। কোলকাতায় বালিগঞ্জ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু কেন তিনি খুলনায় গিয়ে জেলা স্কুলে পরীক্ষা দিলেন তার কারণ স্পষ্ট নয়। তাঁর পিতার প্রতাপে গ্রামে তাঁর জন্য একটি বৈরী পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। সে জন্য তাঁকে কোলকাতায় চলে আসতে হয়েছিল। পিতা পুত্রের ক্ষুব্ধ মানসিকতার বিরুদ্ধে

দাঁড়াননি। এরপর থেকেই ফররুখের নাগরিক জীবন আরম্ভ। নাগরিক জীবনের কোলাহল, ক্ষুব্ধতা এবং বিশৃঙ্খলা ফররুখকে বিচলিত করেনি কখনও। কোলকাতায় যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সাড়া পড়ে গিয়েছে সেই সময় দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশ জরাজীর্ণ হয়ে যায়। ফররুখ একটি কবিতায় লিখেছে যে, পৃথিবী অত্যন্ত অশান্ত। মানুষের মনে শান্তি নেই এবং সে মন বাধাগ্রস্ত। মৃত্যু মানুষের জীবনে একটি কদর্যতা ও কলুষতা লেপন করেছে। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ছাপ 'লাশ' কবিতায় ধরা পড়েছে। বাংলা ১৩৫০ সালকে উপলক্ষ্য করে এই কবিতা লেখা হয়েছিল। কোলকাতার পথে পথে কত লোক যে মরে পড়ে থাকত তার ইয়ত্তা নেই এবং ফররুখের ভাষায় ক্ষুধার্ত মানুষ অসাড় হয়ে পথে পড়ে থাকত। কিন্তু সন্ধ্যাকালে এই যে মানুষ বাড়ি ফিরত কাজ থেকে, তাঁরা কোনদিন এই মৃত মানুষের খবর রাখতো না।

ফররুখ গ্রাম থেকে চলে এলেও গ্রামকে ভুলেনি। তাঁর গ্রামের বাড়িতে প্রচুর গাছ ছিল। তখন যশোর অঞ্চলে গাছপালার মহিমা দেখা যেত। এখনও আছে। তবে আগের মত নেই। প্রচুর নারিকেল গাছ, খেজুর গাছ এবং আম গাছ ফররুখের গ্রামের বাড়িতে ছিল। তাঁর কবিতায় বারবার খেজুর গাছের কথা এসেছে। শহরের কোলাহলেও গ্রামের খেজুর গাছের কথা সে বিস্মৃত হয়নি। খেজুর গাছের কথার সঙ্গে সঙ্গে নারিকেল গাছের কথাও এসেছে। আমি এসব কথা ফররুখকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

ফররুখ তার কলেজের পাঠ্যাবস্থায় যাদবপুরে থাকত। কিন্তু সহজে বাড়ি ফিরত না। কোলকাতা শহর তন্ন তন্ন করে ঘুরে সে সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরত। তার বন্ধুবান্ধব গড়ে উঠেছিল কোলকাতা শহরে। তাদের বাড়িতে আড্ডা দেয়া ছিল তার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কোলকাতার শহরে কবি বেনজীর আহমদ একজন পরিচিত ব্যক্তিত্ব। কবি হিসাবে, রাজনীতিবিদ হিসাবে এবং দুর্ধর্ষ ডাকাত হিসাবে বেনজীর আহমদ ফররুখকে নিয়ে কোলকাতায় ঘোরাফেরা করতেন। বেনজীর আহমদের সঙ্গে ফররুখের আবার মাঝে মাঝে বিরোধও হয়েছে। ফররুখ স্বাধীনচেতা ছিলেন। সে বেনজীর আহমদের নির্দেশে গড়ে উঠতে চায়নি। তাই বেনজীরকে সে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। কিন্তু বেনজীর ফররুখকে কখনও ভুলতে পারেননি। ফররুখ ছিল তাঁর একান্ত স্নেহভাজন কিন্তু বেনজীরের রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি ফররুখের ছিল না। তাই ফররুখ তাঁর নিজস্ব পথ বেছে নিয়েছিল। প্রশ্ন উঠে এই নিজস্ব পথটা কি? এই প্রশ্নের উত্তর সহজে পাওয়া যাবে না। নজরুল ইসলামের মত নিজস্বতা তাঁর ছিল না। নজরুল ইসলাম নিজে বলেছেন যে, তাঁর মন যা চায় তাই করেন। কিন্তু ফররুখ সে রকম ছিলো না। ফররুখ একটি নিজস্ব ধারা নির্মাণ করে তুলেছিলো। আগেই বলেছি, মাওলানা আবদুল খালেকের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্র ধরে জীবন ক্ষেত্রে ফররুখের নতুন গতিবিধি তৈরি হয়েছিল। তার প্রমাণস্বরূপ আমরা 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্যগ্রন্থটি পাই। এই কাব্যগ্রন্থটি পুরোপুরি

মাওলানা আবদুল খালেকের প্রেরণাতে লেখা। ঢাকার বনানী বাজারে মাওলানা আবদুল খালেক থাকতেন। ফররুখ সময় পেলেই সেখানে যেত। সিরাজাম মুনীরা প্রথম প্রকাশের পর ফররুখ এই জ্ঞান-তাপসের হাতেই গ্রন্থটি উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেন। আমি নিজে ফররুখের সঙ্গে কয়েকবার মাওলানা আবদুল খালেকের বাসায় গিয়েছি। আমি দেখেছি মাওলানা সাহেব ফররুখকে নিয়ে আলাদা বসতেন এবং নীচু কণ্ঠে কিছু কথা বলতেন, যেগুলো আমি শুনতে পেতাম না। মাওলানা আবদুল খালেকের প্রভাব তাঁর উপর যে কত প্রবল ছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। সূফীতত্ত্বের একটা নিগূঢ় রহস্য আছে, যারা এই তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেননি তারা এই রহস্য উদঘাটনে সক্ষম হবেন না। ফররুখ কতটা সফলকাম হয়েছিল সেটা আমার জানা নেই। কিন্তু এইটুকু আমরা জানি যে, ফররুখ একটা অকুণ্ঠ বিশ্বাসের রাজ্যে বাস করতো। আমি কখনও তাকে তার এই বিশ্বাসের পরিমণ্ডল নিয়ে প্রশ্ন করিনি। ফররুখের কবিতা বিশ্লেষণ করতে হলে তার জীবনের সকল প্রকার ব্যক্তিগত দিক অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। যেহেতু ফররুখের নানা শ্রেণীর বন্ধুবান্ধব ছিল, তাই কারো পক্ষে নিঃসঙ্কচিত্তে ফররুখের অন্তরঙ্গ পরিচয় খুঁজে বের করা সম্ভব ছিল না। সে নাস্তিকের সাথেও মিশতে পারত এবং পরিহাস রসিকতায় নাস্তিকের বিচার-বিবেচনাকে উড়িয়ে দিতে পারত। আবার একজন বিশ্বাসীকে সে নানা প্রশ্নে নাস্তানাবুদ করে ফেলত। মনে হত ফররুখ নিজেকে নিয়েই সদা ব্যস্ত। সে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হত না। আমাকে সে প্রভাবিত করবার চেষ্টা করেছিল নানাভাবে। কিন্তু কেন জানি আমি আমার কবিতার জন্য ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছিলাম। বর্তমান নিবন্ধে আমি ফররুখের কাব্যধারা বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করব এবং তার কাব্যগ্রন্থের অন্তর্লীন রহস্যকে উদঘাটন করবার চেষ্টা করব। কতটা সফলকাম হব জানি না। কিন্তু ফররুখকে জানবার অদম্য কৌতূহল আমার সবসময় ছিল। সেই কৌতূহলের প্রচেষ্টায় এই রচনা।

'সাত সাগরের মাঝি' ফররুখের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটি ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হয়। প্রকাশ করেন বেনজীর আহমদ। আমার মনে আছে আমি কখন কোলকাতায় এবং একদিন দ্বিপ্রহরে ওয়েলিলিস স্ট্রীটে সওগাত অফিসে ছিলাম। সে সময় বেনজীর আহমদের সঙ্গে ফররুখ আহমদ সওগাত অফিসে প্রবেশ করে। তার বগলে একটি বইয়ের প্যাকেট ছিল। ফররুখ চেয়ারে বসে টেবিলের উপর বইগুলো রাখলো এবং একটি বইয়ের উৎসর্গ পত্রে লিখল 'সৈয়দ আলী আহসান কল্যাণায়েষু'। তার নিচে নাম স্বাক্ষর করল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি রকম হল? কল্যাণায়েষু তো কেউ লেখে না, লেখে করকমলেষু। ফররুখ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, দেবীর করকমলে হিন্দুরা অর্ঘ্য অর্পণ করে অথবা চরণ কমলেও করে। আমি তাই করকমলেষু গ্রহণ করি না। কল্যাণায়েষূ বললে ইরানকে বোঝায় এবং মুসলমানদের জীবন চর্চা বোঝাবে। শওকত ওসমান তখন সেখানেই ছিল। ফররুখ তাঁকে কোন বই দিল না। আমি তখন বললাম, শওকতকে বই দিলে না? ফররুখ বলল, পরে দেব।

এখন ওর সঙ্গে কথা বলার সময় আমার নেই। ফররুখ চলে যাবার পর শওকত ওসমান আমাকে বলল, 'আলী, তুমি ফররুখের চোখ দুটো দেখেছো? কি রকম অসাধারণ দৃঢ় এবং তীক্ষ্ণ মনে হয় না?' আমি বললাম, 'তোমার কথায় মনে হচ্ছে সত্যিই তাই। আমি আগে ভাল করে লক্ষ্য করিনি।' 'সাত সাগরের মাঝি' যখন প্রকাশিত হয় তখন ফররুখ আই জি প্রিজন অফিসে কেরানীগিরি করতেন। তারপর যোগ দিয়েছিলেন কোলকাতার সিভিল সাপ্লায়ার অফিসে। 'সাত সাগরের মাঝি' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফররুখ অত্যন্ত পরিচিত হয়ে উঠলেন সকল মহলেই। গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় ফররুখের কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৪৩ সাল থেকেই ফররুখের কবিতা মাসিক 'মোহাম্মদী', 'সওগাত' এবং 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। সে সময় আমারও একই ধাঁচের কিছু কবিতা মাসিক 'মদিনা'তে প্রকাশিত হয়। আমাদের উভয়ের রচনাভঙ্গি তখন প্রায় একই রকমের ছিল। ফররুখ চেয়েছিল আমি যেন এ ধারাটি বজায় রাখি। কিন্তু ফররুখের তাপমান আরো অনেক উর্ধ্বে। আমি তাই নিজস্ব ধারা খোঁজ করতে আরম্ভ করলাম। সেই সময়কার 'সওগাত' পত্রিকায় আমার কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলো ছিল সমাজতান্ত্রিক। এই সময় টি এস এলিয়টের কিছু কবিতা সওগাতে প্রকাশ করেছিলাম। তখন আমাদের কাব্য জগতে যাওয়াই ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। বাংলা কাব্য ক্ষেত্রে ফররুখ যে পরিবর্তনটা আনল তা এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

ত্রিশের দশকের বিশিষ্ট কবিরা প্রায় সকলেই ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র এবং শিক্ষক। বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দেব, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং জীবনানন্দ দাশ সকলেই ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের মনোজ্ঞ পাঠক এবং ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক। তাঁদের কবিতায় আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব পড়ে। আবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজতন্ত্রীয় মানুষের একটি প্রত্যয়ও তাঁদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। এঁরা সকলে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ছিলেন। তবে সুস্পষ্টভাবে বলেননি কিন্তু সংশয় প্রকাশ করেছেন। এ সময়কার কবিদের পরের প্রজন্মে ফররুখই প্রথম কবি, যিনি বিশ্বাসকে কবিতার বিষয়বস্তু করলেন। এই বিশ্বাসটা হচ্ছে ইসলামের উপর নির্ভরশীলতা এবং ইসলামী আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাস। নজরুল ইসলাম তাঁর কাব্যে যেভাবে বিশ্বাসকে সমাদৃত করেছেন, ফররুখ সেভাবে করেননি। নজরুল ইসলাম হিন্দু ধারার সাধনা এবং মুসলমানদের ধারার সাধনা উভয়ই সমর্থন করেছেন। কিন্তু ফররুখ একমাত্র ইসলামী বিশ্বাসেরই উজ্জীবন ঘটিয়েছেন। কিন্তু বিস্ময়ের কথা হচ্ছে এই, সেই সময়কার প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কবিরাও ফররুখের বাণীভঙ্গিতে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আমি নিজে জানি যে, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং সুধীন দত্ত ফররুখের কবিতার প্রশংসা করতেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র অবশ্য বলেছিলেন যে, মোহিতলাল মজুমদারের ছন্দভঙ্গি আয়ত্ত করে ফররুখ সুন্দর কবিতা লিখে থাকেন। অর্থাৎ একটি কথা বলা যায় যে, ১৯৪৩ এবং ১৯৪৫ সালের মধ্যে ফররুখের খ্যাতি এবং পরিচিতি সর্বত্র ছড়িয়ে

পড়ে। আমরা যে কয়েকজন কবিতা লিখতাম যেমন ফররুখ, আবুল হোসেন, আহসান হাবীব এবং আমি। আমাদের মধ্যে ফররুখ এবং আবুল হোসেনের কবিখ্যাতি সেই সময় আমাদের সকলের চেয়ে বেশি ছিল। আরেকজন কবি ছিলেন। তাঁর নাম 'গোলাম কুদ্দুস'। মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তিনি একটি গোত্রের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরও একটি পরিচিতি ছিল। সেটি তথাকথিত সমাজতান্ত্রিকতার কারণে। আবুল হোসেনেরও প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছিল প্রায় একই সময়ে। সেটির নাম ছিল 'নব বসন্ত'। আবুল হোসেন কবিতায় গদ্যভঙ্গির অনুসরণ করেছিলেন। অনেকটা বুদ্ধদেব বসুর 'নতুন পাতা' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোর মত। আবুল হোসেনও ফররুখের মত বিশ্বাসী ছিলেন। তবে তাঁর মধ্যে বিশ্বাসের কোন প্রতাপ বা প্রকাশ্য ব্যঞ্জনা ছিল না।

ফররুখের 'সাত সাগরের মাঝি'তে সমুদ্রের কথা বারবার এসেছে। তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলোতে বিশেষ করে 'হাতেম তায়ী' গ্রন্থে সমুদ্রের বর্ণনা এসেছে। মহাসমুদ্রের প্রতি ফররুখের একটি আকর্ষণ ছিল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ফররুখ যে সমুদ্রের বর্ণনা দিয়েছে তা কতটা যথাযথ? ফররুখ কি সমুদ্র দেখেছিল? আমি জানি সে কখনও সমুদ্র দেখেনি। কোলকাতায় থাকতে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে ডায়মন্ড হারবারে গিয়েছিলাম সমুদ্র দেখতে। এ দলের মধ্যে আমিও ছিলাম। মাহবুবুর রহমান খান ছিলেন। মতিউল ইসলাম ছিলেন। ফররুখের থাকার কথা ছিল। কিন্তু কেন যেন ফররুখ শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে যেতে পারেনি। দেশ বিভাগের পর ফররুখ ঢাকায় চলে আসলো এবং আমৃত্যু ঢাকাতেই অবস্থান করে। ঢাকার বাইরে সে কখনও যায়নি। চট্টগ্রামে যাবার আমন্ত্রণ সে পেয়েছিল। কিন্তু যায়নি। আমি গিয়েছিলাম চট্টগ্রাম। পাকিস্তান যাবার আগে একবার করাচি যাই। সে আমন্ত্রণ পায় কিন্তু করাচি সে যায়নি। রাইটার্স গিল্ডের একটি আমন্ত্রণ সে পেয়েছিল কিন্তু এই আমন্ত্রণ সে রক্ষা করেনি। ১৯৬১ সালে দিল্লীতে একটি কালচারাল ডেলিগেশনে আমরা অনেকে গিয়েছিলাম। কিন্তু ফররুখ আমন্ত্রিত হয়েও যায়নি। সুতরাং ফররুখ সমুদ্র দেখার সুযোগ কখনও পায়নি।

বাংলা কাবিতায় সমুদ্র এসেছে অনেক সময় অনেকভাবে। মধ্যযুগেও সমুদ্রের কথা কাব্যে আমরা পেয়েছি। কিন্তু মধ্যযুগের কাব্য বিবরণটা ছিল সম্পূর্ণ কাল্পনিক। মধ্যযুগের কবিরা কেউ সমুদ্র দেখেননি। তাই কাব্যে সমুদ্রের বিবরণ তাঁদের অন্তঃসারশূন্য। সমুদ্রের উপর তাঁরা দেবত্ব আরোপ করেছেন এবং কল্পনা করেছেন যে, সমুদ্রের তলদেশে একটি বিরাট বর্ণাঢ্য জনপদ আছে। সেখানে সদাসর্বদা আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হয়। আলাওল এর 'পদ্মাবতী' কাব্যে সমুদ্রের বিবরণ আছে। অবশ্য আলাওল এই বিবরণটা পেয়েছিলেন মালিক মোহাম্মদ জায়সির কাব্য থেকে। অবশ্য জায়সিও সমুদ্র দেখেননি। তাঁর জীবনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা এটা জানতে পারি। বিখ্যাত হিন্দী কবি তুলশী দাশের 'রামচরিত্র মানস' কাব্যে সমুদ্রের বিবরণ এসেছে। কিন্তু সেখানেও বিবরণটা কাল্পনিক। তুলশী দাশও

জীবনে কখনও সমুদ্র দেখেননি। দু'ভাষাবিদদের মধ্যেও অনেক সমুদ্রের কাল্পনিক বিবরণ এসেছে এবং সেগুলোর কোনটা গ্রহণযোগ্য নয়। উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত সমুদ্র পথে বিলেতে গিয়েছিলেন। তখন সমুদ্রগামী জাহাজই বিদেশে যাবার একমাত্র অবলম্বন ছিল। সুতরাং মধুসূদন দীর্ঘ এক মাস জাহাজে থেকে সমুদ্র দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর সমুদ্রের বর্ণনা অনবদ্য এবং যথার্থ।

'মেঘনাদ বধ কাব্যে' সমুদ্রের বর্ণনা আছে। সমুদ্র দর্শন করে রাবণের ক্ষেদোক্তি আমরা পরীক্ষা করে দেখতে পারি। নবীন সেনের কাব্যে সমুদ্রের কথা এসেছে। তিনি অবশ্য বিস্তৃতভাবে সমুদ্রের বর্ণনা দেননি কিন্তু সুন্দরভাবে সমুদ্রের তরঙ্গ-বিক্ষোভের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথও বহুবার বিদেশে গিয়েছেন। জলপথে জাহাজে করেই তাঁকে যেতে হয়েছে। তিনি প্রথম যৌবনে জাহাজে করে ইউরোপ গিয়েছেন। পরিণত বয়সে জাপানে গিয়েছেন। জাভা, সুমাত্রায় গিয়েছেন। সব জায়গায় তাঁকে যেতে হয়েছে জাহাজে করে। সুতরাং সমুদ্রের বিশালতা তিনি দেখেছেন, তার বিস্তার দেখেছেন এবং তার স্রোতের বিক্ষুব্ধতা তিনি লক্ষ্য করেছেন। সমুদ্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কবিতা আছে। যদিও তা খুব ব্যাপকভাবে নয়। আমি আমার জীবনে সমুদ্র দেখেছি বহুবার। চট্টগ্রামে যতদিন ছিলাম সমুদ্র সৈকতে প্রায় যেতাম। ইংল্যান্ডের এক্সজেটার অঞ্চলে গিয়েছি এবং সেখানেও সমুদ্রের দর্শন ঘটেছে। ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরো শহরে সমুদ্রের তীরে সময় কাটিয়েছি। সমুদ্রের প্রতি আমার একটা মহা প্রশস্ততা আছে। আমার অনেক কবিতায় সমুদ্র এসেছে। সে সমস্ত চিত্রের মধ্যে যে কোন পাঠক প্রত্যক্ষ সমুদ্র দেখবার অনুভূতি পাবে। কিন্তু ফররুখ কখনও সমুদ্র দেখেনি। কিন্তু সমুদ্র নিয়ে তাঁর স্বপ্ন ছিল বোঝা যায়। সে কল্পনায় যতটা পারে ততটা সমুদ্রকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছে। সে যেভাবে সমুদ্রকে নির্মাণ করেছে, তা সত্যিই অসাধারণ। সে সমুদ্রের বিস্তার, স্থবিরতা এবং তরঙ্গ ক্ষুব্ধতার কথা বলেছে। অবশ্য বহুবার দিগন্তের কথা বলেছে যে, দিগন্তে গাছপালা দেখা যায়। কিন্তু সমুদ্রে তো কোন দিগন্ত নেই। দৃষ্টি যেখানে শেষ হয়ে যায় সেখানে আমরা অনন্ত বিনিঃশেষকে দেখি। ফররুখ দ্বীপের কথাও বারবার বলেছে। আবার বন্দরের কথাও বলেছে, যেখানে জাহাজ নোঙ্গর ফেলে। এই বর্ণনাগুলো যথাযথভাবে মহাসমুদ্রের নয়। এগুলো সুদূরপ্রসারী দরিয়ার অর্থাৎ নদীর। ফররুখের বর্ণনায় উদ্দাম ঢেউয়ের কথা আছে, স্রোতের কথা আছে, তীর বেগে জাহাজ ছুটে চলার কথা আছে। এগুলো সবই সমুদ্র বিষয়ক ফররুখের কল্পনা। এই কল্পনার সুন্দর একটি বর্ণনা 'সিন্দবাদ'কবিতায় এসেছে-

"রাত জেগে শুনি খোদার আলমে বিচিত্র কল্লোল
তারা ছিটে পরে মধ্যসাগরে জাহাজ জাগায় দোল,
আমরা নাবিক জঙ্গী জোয়ান ইশারা পেয়েছি কত
মউজের মুখে তাই ভেসে যায় টুকরো খড়ের মত।

বজ্র আওয়াজ থামায়ে গভীরে দরিয়ায় উঠে চাঁদ
দিলের দুয়ারে মাথা ঠুকে মরে নাবিক সিন্দবাদ।"

'বার দরিয়া' কবিতার শুরুতেই সমুদ্রের বর্ণনা থাকে। যেমন-

"সমুদ্র থেকে সমুদ্র ঘোরে দরিয়ার সাদা তাজী
খুরের হালকা, ধারালো দাঁড়ের আঘাতে ফুলকি জ্বলে
সমুদ্র থেকে সমুদ্র ঘোরে দরিয়ার সাদা তাজী
কেশর ফোলানো পালে লাগে হাওয়া, মাস্তুলে দোলে চাঁদ,
তারার আগুনে পথ বেছে নেয় স্বপ্নেরা সারা রাত,
তাজী ছুটে চলে দুরন্ত গতি দুর্বার উচ্ছল,
সারা রাত ভরি তোলপাড় করি দরিয়ার নোনাজল।

'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' কবিতায় সমুদ্রের আরেকটি পরিচয় তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন এ সমস্ত বর্ণনা সবই এক রকম। অনেকটা পুনরুক্তির মতো।

ফররুখ আহমদ সমুদ্র যাত্রায় সিন্দবাদকে সাক্ষী মেনেছেন। আরব্য উপন্যাসে যে সিন্দবাদের বিবরণ পাই, সে ছিল ব্যবসায়ী। সে সমুদ্রপথে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেত। এইভাবে যাত্রাপথে অনেক দ্বীপাঞ্চলে তাকে নামতে হয়েছে এবং সে দ্বীপে সে অনেক বৃক্ষ দেখেছে এবং অনেক আশ্চর্য ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে। ফররুখ আহমদ তার সমুদ্রের বর্ণনায় প্রায়ই দ্বীপের কথা বলেছে। বন্দরের কথাও বলেছে। এগুলো সবই সিন্দবাদের অনুষঙ্গী। অনেক সময় মনে হয়, ফররুখ ঠিক সমুদ্রের বর্ণনা করছে না। সে বারে বারেই মাটিতে প্রত্যাবর্তনের কথা বলেছে। সিন্দবাদ কবিতাটি এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিন্দবাদ কখনও পিপুল বনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন আবার কখনও নারিকেল শাকের হাওয়া এসে তাঁর গায়ে লাগছে। এই নারিকেল শাখের কথা 'বার দারিয়া'র কবিতাটিতেও আছে। আবার 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' কবিতাটিতে নতুন দ্বীপের পত্তনের কথা আছে। এভাবেই আমরা লক্ষ্য করি যে, সিন্দবাদের চোখে রয়েছে দ্বীপাঞ্চলের মোহ। সে অনবরত দ্বীপ খুঁজছে এবং আশ্রয় খুঁজছে। যেহেতু সে বণিক সুতরাং পণ্য বিক্রির জন্য তাকে পোতাশ্রয় খুঁজতেই হবে অথবা মৃত্তিকা অঞ্চল খুঁজতেই হবে।

ফররুখ আহমদ সমুদ্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে ঢেউয়ের বর্ণনা এনেছে বারবার। ঢেউ কখনও অশ্বের মত ছুটে চলে, কখনও অজগরের মত সামনে এগিয়ে চলে। তাঁর সম্পূর্ণ বর্ণনাটা কাল্পনিক কিন্তু বিস্ময়ের কথা হচ্ছে যে, কল্পনার অধিক গ্রহণের মধ্য দিয়ে তিনি একটি আশ্চর্য সাবলীল গতি মূর্ছনার সৃষ্টি করেছেন। যখন এই কবিতাগুলো ফররুখ লিখেছিলো সেই সময় সে পাঠ করতো দোভাষীর পুঁথি হাতেম তাঈ, গোলেবাকাওলি এবং আলিফ লায়লা। ফররুখের হাতে দোভাষীর পুস্তিকাটি আশ্চর্য সজীবতা পেয়েছে। সমুদ্রের যে কাল্পনিক চিত্র সে নির্মাণ করেছে, তাতে আমরা অভিভূত হই।

যেহেতু ফররুখ সিন্দবাদকে তার নায়ক করেছে; সুতরাং সিন্দবাদের জন্য আশ্রয় সন্ধান করা সে কর্তব্য মনে করেছে। সিন্দবাদ তাঁর সফরে সমুদ্রস্রোত অতিক্রম করে নতুন বন্দর অথবা নতুন অবস্থানের সন্ধান করেছেন। সেই কারণে ফররুখ বারবার নোনা দরিয়ার কথা বললেও বিভিন্ন দ্বীপের কথাও তাকে বলতে হয়েছে। বনাঞ্চলের কথা বলতে হয়েছে এবং সফলকাম অবস্থানের কথা বলতে হয়েছে। 'সাত সাগরের মাঝি'র প্রথম কবিতা সিন্দবাদ। কবিতাটি সাত সাগরের মাঝি কাব্যগ্রন্থের মূল সুরটি আমাদের ধরিয়ে দেয়। যেহেতু সিন্দবাদ একজন বণিক; সুতরাং সমুদ্র পথে গিয়ে বারবার জাহাজ বন্দরে এসে থেমেছে। এই চিন্তা তাকে করতেই হচ্ছে। ফররুখের বর্ণনাটি মহাসমুদ্রের নয়। যে সমুদ্রের কোন দিগন্ত নেই এবং যে সমুদ্র শুধুই অনন্ত পথে সম্মুখ যাত্রী। ফররুখ সিন্ধু ঈগলের কথা বলেছে কিন্তু সিন্ধু ঈগল দেখা যাবে বন্দরের কাছে। মহাসমুদ্রের কাছে নয়। তাঁর 'বার দরিয়া' কবিতাটিতে ফররুখের কল্পনায় সমুদ্রের একটা পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। সে জাহাজকে বলেছে, জাহাজকে অশ্বের সাথে তুলনা করেছে। মৃত্তিকা প্রান্তরে অশ্ব যেমন তীব্র বেগে ছুটে চলে, তেমনি আরব্য পথে সেই অশ্বের মত তীব্র বেগে সমুদ্র থেকে সমুদ্রে ছুটে জাহাজের পালে যখন হাওয়া লাগে তখন সেই অবস্থাকে সে তুলনা করেছে অশ্বের কেশর ফুলানোর সঙ্গে। সে এই জাহাজের কথা বলেছে যে, এই জাহাজের গতি হচ্ছে দুরন্ত, দুর্বার ও উচ্ছল।

অন্য একটি কবিতার নাম 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি'। এই কবিতাটি সিন্দবাদকে ঘিরে লিখিত। মূল লক্ষ্য হচ্ছে একটি কাহিনীর আমেজ উপস্থিত করা। এই কাহিনীর আমেজের মধ্যে সমুদ্রের ঝড়ের একটি বর্ণনা আছে। এখানেও ঝড়ের বর্ণনার মধ্য দিয়ে মৃত্তিকার প্রতি আকর্ষণ ব্যক্ত হয়েছে। মাল্লারা ঝড়ের কারণে বিভ্রান্ত হয়ে সমুদ্র থেকে দেশে ফিরে যাবার প্রস্তাব করছে। তার উত্তরে সিন্দবাদ বলেছেন যে, দেশে তিনি ফিরবেন না। তিনি সমুদ্রের আমন্ত্রণে সম্মুখে ছুটে চলেছেন এবং তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, মৃত্যুর মুখোমুখি হলেও মৃত্যুকে অতিক্রম করতে হয়। তুফানের মাতামাতি থাকতে পারে কিন্তু সফরের যাত্রা বন্ধ করা যায় না। মাল্লারা বারবার যদিও মাটির গভীর টানের কথা বলছে এবং বন্দরের চিন্তা করে ক্রন্দনরত হচ্ছে কিন্তু সিন্দবাদ তাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করছেন। অন্য একটি কবিতার নাম 'হে নিশান বাহী'। কবিতার শেষ স্তবকে কবি বলেছেন--

> 'এখন তোমার দৃষ্টিতে জাগে সমুদ্রের ইঙ্গিত
> সমুদ্র পথ আবিষ্কারের বিপুল সম্ভাবনা,
> নিমেষে আকাশ পার হয়ে এসে বসুধার সঙ্গীত
> শুনিবার সাধ এখনো তোমার যায়নি অন্যমনা।
> তুমি বেঁচে আছো, আজো বেঁচে আছো- সেনানীর তরবারী,
> আধো চাঁদ আজো সঙ্গী তোমার হে আল হেলালধারী।

তোমার তনুতে অনুতে অনুতে সেই অশ্রু সুর,.
জাগ্রত মানবাত্মা হেরিছে সমুদ্র অশ্রুর।
আছে তার পার; সাগর বেলার তীরে ভয় পেয়ো নাকো।
আধো চাঁদ আঁকা হে নিশানধারী এ মিনতি মোর রাখো-
যেথা আবর্ত-সঙ্কুল স্রোত বাধা কুটিল।'

কবি 'আওলাদ' কবিতায় আবার সিন্দবাদকে নিয়ে এসেছেন। অর্থাৎ সিন্দবাদ বহু সামুদ্রিক পীড়া অতিক্রম করে, অনেক ক্ষুধিত রাত্রি পেছনে ফেলে এবং অন্ধকারে দিকভ্রষ্ট হয়ে নিরাশার অতলে নেমে যাচ্ছে যখন তখন সে আবার সাহস নিয়ে জেগে উঠছে এবং বহু ঝড় পার হয়ে সে বিজয়ী হচ্ছে। সাত সাগরের মাঝি কাব্যগ্রন্থে সর্বশেষ কবিতাটির নাম 'সাত সাগরের মাঝি'। এই কবিতার মধ্যে কবি মূলত সিন্দবাদের কথাই বলেছেন, তবে এখানে সরাসরি তার উল্লেখ নেই। তবে সিন্দবাদকে নিয়েই এই কবিতাটি। তার প্রমাণ হচ্ছে তিনি বলছেন-

'ভুলেছ কি সেই প্রথম সফর জাহাজ চলেছে ভেসে
অজানা ফুলের দেশে
ভুলেছ কি সেই জামরুদ- তোলা স্বপ্ন সবার
চোখে ঝলসে চন্দ্রালোকে,
পাল তুলে কোথা জাহাজ চলেছে
কেটে কেটে নোনা পানি;
অশ্রান্ত সন্ধানী
দিগন্ত নীল পর্দা ফেলে সে ছিঁড়ে
সাত সাগরের নোনা পানি চিরে চিরে।'

আরব্য উপন্যাসে উপাখ্যানগুলোর মধ্যে সিন্দবাদের উপাখ্যানটি অপূর্ব সাহসিকতার একটি অনবদ্য উপাখ্যান। সিন্দবাদ একজন ব্যবসায়ী। সে নিজের ভাগ্য গড়ে তুলেছে ব্যবসায়ের মাধ্যমে। সে সমুদ্রগামী জাহাজ নিয়ে বন্দর থেকে বন্দরে গিয়েছে। কখনও ঝড়ের সম্মুখীন হয়েছে, কখনও মৃত্যু বিভীষিকার মুখোমুখি হয়েছে। তাঁর বিপদের অন্ত ছিল না কিন্তু সে কখনও অসহায় এবং নিরাশ্রয়বোধ করেনি। সে বারবার চেষ্টা করেছে নতুন করে সাহস এনে আবার নতুন বন্দুরে যাত্রা করবার। ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি' মূলত সিন্দবাদেরই কাহিনী। দোভাষী পুঁথিতে 'আলিফ লায়লা'র কাহিনী পাওয়া যায়। এই দোভাষীর পুঁথিই ফররুখ আহমদের অবলম্বন ছিল। কিন্তু বিস্ময়করভাবে ফররুখ আহমদ একটি সচেতন ব্যঞ্জনায় আধুনিক কিছু রোমান্টিক কবিতা লিখেছিলেন। মূলত দোভাষীর পুঁথি কাহিনীকে তিনি অনুনির্মাণ করেননি বরঞ্চ পুঁথির রসাবেশে নতুন বিবেচনায় আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের রেশ 'সিরাজাম মুনীরা'য় আমরা পাই। সিরাজাম মুনীরার প্রথম কবিতাটিতে কবি বলছেন-

'কত অজ্ঞতা সাগরে সহসা ভেসে ওঠে কত সোনার দ্বীপ,
ভাষা মুখরিত তোমার পাখায় সব সাগরের অশ্রু জল।'

সিন্দবাদের কথাও এসেছে এই অধ্যায়ে। যেমন-

'অমনি অন্ধকূপমণ্ডুক সাত সাগরের সিন্দবাদ
নোনাপানি চিরে দ্বীপে বন্দরে নুতন দিনের করে আবাদ,
সাগরে সাগরে নীল স্রোত চিরে ওঠায় ফসল মারজানে,
পাখা মেলে কোথা আকাশ নাবিক মুসাফির দূর বন্দরে।'

সাগরের উন্মাদনার কথা, ঝড়ের কথা এবং বিপদসংকুল দরিয়ার পথে যাত্রার কথা 'হাতেম তায়ী' কাব্যগ্রন্থেও আছে। দেখা যাচ্ছে কবি সিন্দবাদের জীবন কাহিনীকে ভুলতে পারছেন না। প্রথম কাব্যগ্রন্থে সমুদ্র যাত্রার কথা যেভাবে এসেছে তারই পুনরাবৃত্তি কখনও কখনও সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে হাতেম তায়ী'তে এসেছে। কবি তাঁর কল্পনার যে জগৎ অর্থাৎ সমুদ্র যাত্রার যে জগৎ সেই জগতকে কখনও ভুলতে পারেননি। একটি শোভমান প্রত্যয়ে বারবার তা আমাদের কাছে ফিরে আসছে। এ কারণে 'সাত সাগরের মাঝি'কে আমাদের বিশেষ গুরুত্ব দিতে হয়। এই কাব্যগ্রন্থটি একদিকে যেমন কবির প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ তেমনি কবির সামগ্রিক কাব্য সাধনায় বিশ্বাস এবং অভিরুচির দিকনির্দেশনা এই কাব্যগ্রন্থে রয়েছে। কবি 'সাত সাগরের মাঝি'তে যে কথা বলতে চেয়েছেন, সে কথা তাঁর কাব্যগ্রন্থের মূল তৃষ্ণা। অন্ধকারের পরে সকাল যখন হল তখন নারঙ্গি বনে সবুজ পাতারা কাঁপছিল। নাবিকের কাছে সাত সাগরের আহ্বান এসেছে। তাঁকে দূর সমুদ্র যাত্রায় যেতে হবে মূল্যবান উপঢৌকনের সন্ধানে। সিন্দবাদ কখনও নিজের গৃহে বসে সময় কাটাতে পারে না। সে হচ্ছে দুর্গম সমুদ্র যাত্রার প্রতীক। যে কিস্তি নোঙ্গর করে আছে তাকে আবার দারিয়ায় সচল করতে হবে। কবি নাবিকদের উদ্বুদ্ধ করছেন এ কথা বলে যে, বেসাতি আনতে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় নাবিকরা গিয়েছে। সে সমস্ত বেসাতি সুগন্ধি এবং আনন্দ তাদের জন্য আবার এসেছে। আবার তাদেরকে নৌকা ভাসাতে হবে। সিন্দবাদের জীবনের মধ্যে শুধুই চলা যেমন ছিল, সেই চলার প্রতীক নিয়ে বারবার যাত্রা শুরু করার কথা কবি বলছেন। তাই এ কাব্যগ্রন্থটি মানুষের জন্য অসীম সাহসিকতার স্ফুরণ ঘটায়।

---

[**ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর, ২০০০**]

# ফররুখ আহমদের সিরাজাম মুনীরা

## সৈয়দ আলী আহসান

ফররুখ আহমদের 'সিরাজাম মুনীরা' প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে ঢাকায়। কিন্তু এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো অনেক আগেই লেখা হয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'সাত সাগরের মাঝি'র পরে। তবে 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতাগুলো যে সময়, যে বছরগুলোতে লেখা হয়েছে অথবা যে মাসগুলোতে লেখা হয়েছে, 'সিরাজাম মুনীরা'র কবিতাগুলো তার পরে লেখা হয়েছে। কিন্তু সবই ১৯৪৬-১৯৪৭ এর মধ্যে।

কলকাতায় থাকতে ফররুখ মহানবীর জীবনী নিয়ে কবিতা লেখার কথা আমাকে বলেছিল। মনে আছে, সে একটি পরিকল্পনার কথা বলেছিল। সেটি নিম্নরূপ :

মহানবীর জন্ম যখন হল তখন একই সময়ে ইরানের অগ্নিপূজকদের শাশ্বত অগ্নি নির্বাপত হয়েছিল এবং জামসিদের পানপাত্র ভেঙ্গে গিয়েছিল। ফেরেস্তাদের মধ্যে উল্লাস জেগেছিল যে, একজন মহান পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে। এসমস্ত ঘটনা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদে সে একটি বৃহৎ কবিতা লিখবে, এ পরিকল্পনার কথা সে আমাকে জানিয়েছিল। কিন্তু এ পরিকল্পনা সে ঠিক রাখতে পারেনি। নতুন পরিকল্পনায় আমরা দেখি যে, 'সিরাজাম মুনীরা' নাম কবিতার সঙ্গে খোলাফায়ে রাশেদীনদের নিয়েও তিনি কয়েকটি কবিতা এ গ্রন্থে সংযোজিত করেছেন এবং কাব্যগ্রন্থের শেষে আরো অনেকগুলো কবিতা যোগ করেছেন। সেগুলো হচ্ছে 'শহীদে কারবালা', 'মন' 'আজ' 'খাজা নকস্‌বন্দ', 'মুজাদ্দিদে আলফেসানি', 'মৃত্যু সংকট', 'অভিযাত্রিকের প্রার্থনা', 'মুক্তধারা' এবং 'ইশারা'। ভাবের দিক থেকে মিল আছে ভেবে ফররুখ এ কবিতাগুলো এ গ্রন্থের সঙ্গে যোগ করেছিলেন।

'সিরাজাম মুনীরা' প্রকাশিত হবার পর অনেকেই বলেছিলেন যে, এ গ্রন্থটি কবির কাব্য জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়। কথাটি ঠিক নয়। কেননা 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থে 'হেরার রাজ-তোরণে'র কথা আছে। 'চন্দ্র-খচিত নিশানে'র কথা আছে এবং মূলত: দুর্গম পথের শেষে ইসলামের আলোকিত লাবণ্যের কথা আছে। সুতরাং 'সিরাজাম মুনীরা' মূলত: এই ধারার গ্রন্থ। শুধুমাত্র তফাৎ এখানে যে, রাসূলের নিকট পৌছবার জন্য যে যাত্রাপথ সে যাত্রাপথের বিবরণ 'সাত সাগরের মাঝি'তে আছে এবং সব কিছু প্রতীকী ব্যঞ্জনায়। 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্যগ্রন্থে একটি সুস্পষ্ট এবং পরিশীলিত কল্যাণধর্মী জীবনের পরিচয় ফুটে উঠেছে। তবে এ গ্রন্থের কিছু কবিতায় কিছু সূফী সাধকের কথা এসেছে। যেগুলো 'সিরাজাম মুনীরা' অথবা খোলাফায়ে রাশেদীনের কবিতাগুলোর সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। আগের কবিতাগুলোর মধ্যে যে সৌন্দর্য্য-অন্বেষা এবং আত্ম-উপলব্দির কথা যেভাবে আছে শেষের কবিতাগুলোর

মধ্যে সেভাবে নেই। যদিও ফররুখ সূফী তত্ত্বগত মোরাকিবার কথা 'সিরাজাম মুনীরা' কবিতাটিতে কয়েকবার এনেছেন। যে অর্থে মওলানা রুমীর মসনবি, মানবাত্মার উৎস সন্ধানের কথা বলে অথবা ইকবালের আশরারে খুদী আত্মানুসন্ধানের কথা বলে সে অর্থে 'সিরাজাম মুনীরা'র কবিতাগুলো একটু ভিন্ন ধরনের। 'সিরাজাম মুনীরা'য় কবিতাটির সর্বশেষ স্তবক এ বিশিষ্টতার পরিচয় বহন করে।

সুর্মা গভীর আকাশের চোখে অশ্রুসজল বৃষ্টিধারা,
নতুন তারার পথ চেয়ে চেয়ে নীহারিকা হল দৃষ্টিহারা।
বিরাট প্রসার মহা-পটভূমি তোমার বেলায় ইতস্তত
অশেষ সম্ভাবনার পলিতে দুরন্ত মরু ঝড়ের মত
যারা এঁকে আসে নতুন মাটিতে সুদৃঢ় ছাপ পথ চলার
দীপ্ত ছুরিতে ভাঁজ কেটে কেটে অসাড় তিমির স্থবিরতার,
তাদের সঙ্গে সালাম জানায় হে মানবতার শাহানশাহ!
হে নবী! সালাম : সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ।

'সিরাজাম মুনীরা'র প্রথম কবিতা 'সিরাজাম মুনীরা– মোহাম্মদ মোস্তফা" যে ছন্দ ভঙ্গিতে রচিত সেটি 'সাত সাগরের মাঝি'র 'সিন্দবাদ' কবিতার অনুরূপ। যেমন– 'সিন্দবাদ' কবিতার নিম্নলিখিত কয়েকটি চরণ :

আর থেকে থেকে দমকা বাতাসে নারকেল শাখে হাওয়া
ভোলায়েছে সব পেরেশানি, শুরু হয়েছে গজল গাওয়া,
সূরাত জামাল জওয়ানির ঠোঁটে কেটেছে স্বপ্নরাত
শুনেছি নেশার ঘোর কেটে যেতে এসেছে নয়া প্রভাত।

এর সঙ্গে সুব মিলিয়ে পড়া যায় 'সিরাজাম মুনীরা'র প্রথম কবিতার এ কয়টি চরণ:

ঐ আসে আসে সেই বিহঙ্গ সাতরঙ্গা তার শ্বেত পাখায়,
আকাশের বুক ঘন হয়ে ওঠে নীল মরকত স্বচ্ছতায়,
সোনালী আলোয় শ্বাপদ রাত্রি আহত, লুপ্ত নিমেষ মাঝে;
থির বিদ্যুৎ আভা তরঙ্গ আলোকের সুর আকাশে বাজে।

এরকম আরো মিল অনেক আছে। 'সাত সাগরের মাঝি'তে যে আবেগ এবং আবেশ 'সিরাজাম মুনীরা'য়ও তা লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

১. কত অজ্ঞাত সাগরে সহসা ভেসে ওঠে কত সোনার দ্বীপ,
ভাষা মুখরিত তোমার পাখায় সব সাগরের অশ্রুজল,
২. সে মাটি পেয়েছে দরাজ বাজুতে আকাশ পারের প্রবল ঝড়
পার হয়ে যায় মরু সাইমুম তীব্রচ্ছটা ভয়ঙ্কর,
রাত্রি মুগ্ধ বেষ্টনী হতে ছিটে পড়ে তারা নীহারিকার,
সকল আকাশ ধরা দেয় এসে বিপুল সবল মুঠিতে তার।

৩. অমনি অন্ধ কূপমণ্ডুক সাত সাগরের সিন্দবাদ
নোনাপানি চিরে দ্বীপে বন্দরে নতুন দিনের করে আবাদ,
সাগরে সাগরে নীল স্রোত চিরে ওঠায় ফসল মারজানের,
পাখা মেলে কোথা আকাশ-নাবিক মুসাফির দূর বন্দরের,

রাসূলে খোদার জীবন বৃত্তান্তের পরিবেশগত দিক হল এই যে, তিনি মরুভূমির উষার ভূমির মানুষ ছিলেন। মরুভূমির পরিবেশ এ কবিতায় এসেছে কিন্তু সমুদ্রের পরিবেশও এসেছে। লেখক "সাত সাগরের মাঝি"র আবেগ এবং আশ্বাসকে ভুলতে পারেন নি। একই চিন্তা-প্রবাহ 'সিরাজাম মুনীরা'য় কাজ করছে। 'সিরাজাম মুনীরা' কবিতাটি অত্যন্ত সুন্দর এবং আবেগময় কবিতা। কিন্তু মহানবীর আদর্শের রূপায়ণ মরুভূমির জীবনে যেভাবে ঘটেছিল তার চিত্র এ কবিতাতে তিনি দেননি। মূলতঃ ফররুখ ভাবরসিক এবং রোমান্টিক কবি।

যে ছন্দ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে সেটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। প্রতিটি চরণ ছয়মাত্রার চালে বিন্যস্ত এবং চরণের শেষের পর্বটি পাঁচ মাত্রার। এই বিন্যাসটি সর্বত্র রক্ষিত হয়নি। 'আবু বকর সিদ্দিক' কবিতায় কখনও কখনও চরণের শেষ খণ্ড পর্বটি পূর্ণ ছয় মাত্রার পর্বে পরিণত হয়েছে। যার ফলে একটি অস্বস্তিকর দোলা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন :

লু হাওয়ায় যদি আহিগ্‌জর শাখা দোলে
ভ্রান্তিতে যদি পথনির্দেশ পুনরায় কেউ ভোলে,
তখন দোলাও সবুজ পতাকা দোলাও
আল হেলালের পতাকা তোমার দোলাও।

যেমন ফররুখ লিখেছেন :

তবে সে মদীনা আকাশে আকাশে দোলাও,
মরু খর্জুর শীর্ষে শান্তি-শুভ্র পতাকা দোলাও,
সৌম্য বৃদ্ধ মহা পারাবার অতল প্রশান্তির
চির বিশ্বাসী হে সর্বত্যাগী সঙ্গী দুখ রাতির
বন্ধু পরম! শান্তি পতাকা দোলাও
মদীনা আকাশে দোলাও।

আর একটা মিল নিম্নরূপ :

বাতাসে বাতাসে খেজুর পাতারা তোলে শুধু মর্মর
আলোর দোলায় কেঁপে ওঠে অম্বর,

২. পরম সত্য বেদনা-বিদ্ধ তার বুজে ওঠে
দূর যাত্রীর স্বর
স্তব্ধ নিথর কোটি তারা ভরা গভীর নিশীথে
মরু রাত্রির স্বর
আল্লাহু আকবর
আল্লাহু আকবর॥

'আবু বকর সিদ্দিক' কবিতাটি একই ছন্দ-স্পন্দের পর্ব বিন্যাসে সাজানো নয়। যার ফলে বিভিন্ন চরণে অব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। 'সাত সাগরের মাঝি' ছন্দ বিন্যাসে যে রকম নিটোল এবং হিল্লোলিত, 'আবু বকর সিদ্দিক' কবিতার ছন্দটি সে রকম নয়। বিশেষ করে কোন কোন চরণের শেষে ছয় মাত্রার একটি পূর্ণ পর্ব ছন্দের গতিকে ব্যাহত করেছে। যেমন–

মরু শর্বরী পাড়ি দিয়ে বহু রাত্রি দেখেছো আদম সূরাত
দেখেনি সে আর দরদী সাথীর ধ্যান গম্ভীর রওশন রাত।

'সাত সাগরের মাঝি'তে ফররুখ মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহারটি সুন্দরভাবে করেছেন। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বিশিষ্টতা হচ্ছে প্রতিটি চরণ পর্বগত বিন্যাসে সাজানো। সমমাত্রার কয়েকটি পর্বের পর চরণের শেষে একটি খণ্ড পর্ব এসে ছন্দের দোলাটাকে বাধা দেয়। শেষ খণ্ড পর্বটি পূর্ণপর্ব না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সাধারণত এ খণ্ড পর্বটি অন্যান্য পর্বের চাইতে মাত্রার দিক থেকে কম হয়। মোহিতলাল মজুমদার এ মাত্রা ব্যবহারে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর পর্ব বিভাগগুলো হচ্ছে- পর পর তিনটি ছয় মাত্রার পূর্ণ পর্ব এবং চরণান্তের শেষ পর্বটি পাঁচ মাত্রার। অন্যান্য পর্বগুলো ছয় মাত্রা করে। ফররুখের মধ্যে এ ব্যাপারটা দেখা যায়।

ইসলামের ইতিহাসে রাসূলে খোদা এবং খোলাফায়ে রাশেদীন একটি বিস্ময়কর সত্যবোধের সূচনা। জগতে যত মানুষ এসেছেন এবং তাঁদের যত প্রত্যয় এবং বিশ্বাস প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে প্রাথমিক যুগের যারা ছিলেন তাঁদের সঙ্গে কারো তুলনা হয় না। তাঁরা মানুষকে সত্যের দীক্ষা দিয়েছেন। বিশ্বাসকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং জীবনের জন্য একটি প্রত্যয় নির্মাণ করেছেন। শুধু এ কারণেই তাঁদের জীবন কাহিনী আমাদের জানার প্রয়োজন আছে। রসূলে খোদাকে আমরা অনুভব করতে পারি না তিনি আল্লাহর বন্ধু হিসাবে এবং অহিপ্রাপ্ত পুরুষ হিসাবে একজন অনন্যসাধারণ অস্তিত্ব ছিলেন। তাঁকে অনুভব করতে হয় ধ্যানে এবং আল্লাহর সান্নিধ্যে উপনীত হয়ে তাঁর অনুপম প্রাপ্তি পরিণত হয়। ফররুখের কবিতায় এই অনুপম প্রাপ্তির কথা আছে।

'সিরাজাম মুনীরা' ফররুখ আহমদের একটি মূল্যবান কাব্যগ্রন্থ। ফররুখ একাডেমী এ কাব্যটি পুনঃমুদ্রণ করে একটি ভাল কাজ করলো। এ জন্যে একাডেমী সকলের সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য।

---

**(ভূমিকা 'সিরাজাম মুনীরা', ফররুখ একাডেমী সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০০)।**

# ফররুখ আহমদ-এর 'হাতেম তায়ী'

## সৈয়দ আলী আহসান

এক সময় মধ্যবিত্ত বাঙালী গৃহে পুঁথি পাঠ করা হত। পুঁথি পাঠ করা হত কাহিনীর জন্য, রূপকের জন্য, অলৌকিকতার জন্য এবং অবাস্তব কাহিনী মাধুর্যের জন্য। এ সব কারণে পুঁথি পাঠ করতেন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে। ড. সুকুমার সেন বলেছেন, তাঁর গৃহে প্রবীণরা মুসলমানদের পুঁথি পাঠ করে আনন্দ পেতেন। এগুলো বাস্তব কাহিনী ছিল না। এগুলো অবাস্তব লালিত্যে গঠিত হত। অধিকাংশ ছিল প্রেমের কাহিনী এবং সেই প্রেমের কাহিনীর মধ্যে পরীদের গল্প থাকতো, জ্বীনদের তাৎপর্যময় আচরণ থাকতো। শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত সকল মানুষ এগুলো পাঠে আনন্দ পেত। এ পুঁথিতে জীবনচর্চা থাকতো না, বাস্তব মানুষের আনাগোনা থাকতো না, এগুলোতে অবিশ্বাস্য কাহিনী মানুষের চিত্তে আনন্দ দিত। বাংলাদেশে একটা সময় ছিল যখন আমাদের দেশে ইংরেজি চর্চা আরম্ভ হয়নি। সেকালেই পুঁথিগুলো পাঠ হত। ইংরেজি চর্চার ফলে আমাদের দেশে জীবনে নৈপুণ্য এসেছে, বাস্তব মানুষের প্রেম-ভালবাসার কাহিনী এসেছে এবং প্রখর বাস্তবতার ইঙ্গিত এসেছে। কিন্তু পুঁথির কাহিনী এরকম ছিলনা। তাতে অবাস্তবতার ইঙ্গিত ছিল, আনন্দ ছিল এবং উচ্ছ্বাস ছিল, এগুলো পাঠ করে মানুষের আনন্দ জাগতো। কিন্তু এগুলোকে তারা বিশ্বাস করতো না। এসব পুঁথির অবাস্তবতা মানুষের মনে একটি মাধুর্য সৃষ্টি করতো। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে এগুলো প্রচলিত হয়। উর্দুতে দাস্তান শ্রেণীর কাহিনী কাব্য ছিল। বাংলা পুঁথির মূলে এই দাস্তানের কাহিনীগুলো কাজ করেছে। গুলে বাকাউলি, শিরি-ফরহাদ, হাতেম তা'য়ী, আমির হামযা ইত্যাদি কাহিনী দাস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই দাস্তানই পুঁথির উৎস। পুঁথিকারগণ দাস্তান থেকে গল্প নিয়েছেন, কিন্তু হুবহু দাস্তানকে অনুকরণ করেননি। মৌল কাহিনীটি দাস্তান থেকে এসেছে, কিন্তু বাংলায় তা বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়েছে। ইংরাজ আগমনের সময় এগুলোর চল ছিল। মূলত বলা যেতে পারে, আমাদের ভাষায় উপন্যাস ও ছোটগল্পের আগমনের পূর্বে এই পুঁথি-কাহিনীগুলো সে স্থান পূর্ণ করেছিল। মানুষের জীবনে তখন কর্মের জটিলতা ছিল না, অবসর ছিল প্রচুর। এই অবসরের সময় চিত্তের প্রসাদের জন্য মানুষ পুঁথি বা দাস্তানের দ্বারস্থ হত। আমাদের পূর্ব প্রজন্ম যাঁরা, তাঁরা পুঁথি পাঠ করতেন এবং আনন্দ পেতেন। বাস্তব ঘটনার নিরিখে পুঁথি পাঠকদের আকর্ষণ করতো। যখন পুঁথির প্রচলন ছিল তখন মানুষের জীবন সাচ্ছল ছিল, বিরোধ-বিসংবাদ কম ছিল এবং পুঁথি তাদের আনন্দের উপঢৌকন হিসেবে এসেছিল। যেভাবে পুঁথি পাঠ করা হত তার একটি কৌশল ছিল। একজন বয়স্ক লোক সুর করে পুঁথি পাঠ করতেন এবং শ্রোতারা বিপুল আনন্দে তা শ্রবণ করতেন। আমার মনে আছে আমার মায়ের মুখে আমি হাতেম

তা'য়ী-এর গল্প শুনেছি। হুসনা বানুর সওয়াল এবং হুসনা বানুর বিভিন্ন কর্ম আমাদের অভিভূত করতো। পুঁথির ধারা এখন শেষ হয়ে গেছে। আগের দিনের পুঁথির পাঠকও নেই, তার শ্রোতাও নেই। আমার যৌবনকালে আমি পুঁথি পড়েছি এবং পুঁথি পড়া শুনেছি। এখন এই পরিণত বয়সে পুঁথির কাহিনী আমাকে আর আকর্ষণ করে না।

ফররুখ আহমদ গভীর মনোনিবেশ সহকারে পুঁথি পড়তো। দুটি পুঁথি সব সময় তাঁর সঙ্গে থাকতো। একটি কাসাসুল আম্বিয়া, অন্যটি হাতেম তা'য়ী। শুধু কাহিনীর জন্য সে পড়তো তা নয়, ঘটনাপ্রবাহ, কাহিনীর গঠন-প্রকৃতি এগুলো সে বুঝবার চেষ্টা করতো। সে আমাকে বলতো, "আলী, এইসব পুঁথির মধ্যে যে সৌন্দর্য আছে তা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। বাস্তব জীবনকে তারা গ্রাহ্য করেনি, কিন্তু অন্য একটি জীবন তারা নির্মাণ করেছে, যার স্বাদ অফুরন্ত। ঘটনার বাস্তবতা কিংবা কৃত্রিমতা কোন বড় কথা নয়, চিত্ত অপহরণ করার কথাই বড় কথা। বাস্তব তো এই আছে এই নেই, কিন্তু অবাস্তবের রসাস্বাদ করতে পারলে আমরা প্রাত্যহিকতাকে অস্বীকার করতে পারে।"

হাতেম তা'য়ী-এর কথা ধরা যাক না কেন সে যথার্থ একজন মানুষ ছিল অবাস্তব কোন সত্তা নয়, কিন্তু তাকে ঘিরে অনেক অবাস্তব রহস্য তৈরী হয়েছে। মানবকল্যাণী একজন পুরুষ হিসাবে সে মানুষের মনে স্বপ্ন সৃষ্টি করেছে এবং কর্ম সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। তার ঐশ্বর্যের তুলনা ছিল না। কিন্তু ঐশ্বর্য সে নিজের জন্য ব্যয় করেনি। যারা তার দরজার কাছে এসেছে তাকেই সে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছে। দুঃস্থ মানুষের কল্যাণের জন্য সে সর্বস্ব ব্যয় করেছে। আগ্রহ ও অনুকম্পা থেকে তার শক্তি সৃষ্টি হয়েছে। বিনয়ী, নির্বিরোধ, কামনাহীন এবং আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হাতেম তা'য়ী একজন আদর্শ পুরুষ ছিলেন। এ গ্রন্থের কাহিনী প্রবাহ জটিল আবর্তে আবর্তিত। মানুষের কল্যাণের জন্য হাতেম তা'য়ী দুর্যোগের মুখোমুখি হয়েছেন, অসৌজন্য তাকে আক্রমণ করেছে। কিন্তু অসৌজন্য তাকে গ্রাস করতে পারেনি। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে হাতেম তা'য়ী-র জীবনযাত্রা ছিল করুণাপ্রবণ, বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সহজাত বিদ্রোহ এবং অনুকম্পা ও করুণায় সকলকে আপন করে নেয়া। সেজন্যই রাসূলে খোদার কাছে তাঁর কন্যাকে যখন বন্দী দশায় নিয়ে আসা হয় তখন তিনি যেই শুনলেন যে এই মহিলা হাতেম তা'য়ীর কন্যা তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে সম্মানের সঙ্গে তাকে মুক্তি দিলেন। এই হাতেম তা'য়ীর কাহিনী ফররুখ পাঠ করতো, শুধু পাঠ করতোই না, এর বিভিন্ন ঘটনার তাৎপর্য সে অনুধাবন করবার চেষ্টা করতো। কাহিনীর মধ্যে অনেক রূপকের বিন্যাস আছে, অস্বাভাবিকতার মাধুর্য আছে এবং অলৌকিকতার তাৎপর্য আছে। ফররুখের সময় আমিও কিছু পুঁথি পড়েছি। চাহার দরবেশ-এর পুঁথি আমি পাঠ করে মুগ্ধ হই এবং সে কাহিনীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে একটি কাব্য কাহিনী লিখি। আমাদের সময় কালের আরেকজন কবি আহসান হাবীব দোভাসী পুঁথির বাণী বিন্যাস গ্রহণ করে আধুনিক কবিতায় তা প্রয়োগ করেছেন। আমাদের চেয়ে অনেক প্রাচীণ এবং শ্রদ্ধেয় আবুল কালাম শামসুদ্দীন পুঁথি সুর করে পড়তেন। এক সময় কবি কায়কোবাদকে দেখেছি পুঁথি পড়তে এবং পুঁথির

কাহিনী উপভোগ করতে। এখন পুঁথি হারিয়ে গেছে। আমার পরে যারা এসেছেন এবং তারও পরে যারা আসছেন পুঁথির কাহিনীর মাধুর্য যে কি তা তারা জানেন না। আমিও যৌবনকালে পুঁথির কাহিনী উপভোগ করতাম। কিন্তু বর্তমানে আধুনিক সাহিত্যের গ্রাসে পুঁথির কথা আমি ভুলে গিয়েছি। তবে এটা স্বীকার করি এককালে প্রেমের উপাখ্যানের লীলা বিলাসে পুঁথি মানুষের মধ্যে আনন্দ সৃষ্টি করতো। তখন পুঁথিতে স্বপ্ন ছিল এবং সে স্বপ্ন আমাদের কাছে সত্য ছিল।

বর্তমানে পুঁথি আর গ্রাহ্য নয়, ইতিহাসের ধারায় এর একটি মূল্য অবশ্যই আছে, কিন্তু শিক্ষিত সমাজে এর গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে গেছে। তার কতকগুলো কারণ আছে। সেগুলো আমরা নিম্নরূপে চিহ্নিত করতে পারি।

১. বাংলা ভাষার বিবর্তন হয়েছে, যে বাংলা ভাষায় এক সময় আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দের মিশ্রণ 'ছিল সে ভাষা সংস্কৃতির সংক্রমণ থেকে রক্ষা পায়নি। এখন মূলত বাংলা ভাষা তৎসম স্বভাবের। ইতিহাসের ধারায় আমরা পুঁথির ভাষাকে এক সময়ের ভাষা প্রবাহের নমুনা হিসাবে গ্রহন করতে পারি, কিন্তু এখন তা নয়।

২. পুঁথির ছন্দ পয়ার ছন্দের প্রাচীন রূপ। পয়ার ছন্দের বিন্যাসের মধ্যে কখনও এটা দ্বিপদী, কখনও ত্রিপদী এবং সমগ্র ছন্দটি একই কাঠামোতে গড়া। তার ফলে কবিতা পাঠে একটি ক্লান্তি আসে। কবিতার সজীবতা নির্ভর করে বিচিত্র ছন্দের আবহে। কিন্তু তা না থাকার দরুন পুঁথির ছন্দরূপ ক্লান্তিদায়ক এবং উৎসাহব্যঞ্জক নয়।

৩. পুঁথির কাহিনীতে অনিবার্যভাবে এসে পড়েছে দৈত্য-দানব এবং প্রবীণদের রূপকথা। বর্তমানে যেসব কাহিনী আমরা পাঠ করি সেগুলো আধুনিক জীবনের বাস্তবতায় চিহ্নিত। সুতরাং আধুনিক জীবনে পুঁথির অনুপ্রবেশ একেবারেই অসম্ভব।

৪. পুঁথির কাহিনীতে যে আনন্দ এবং যে লালিত্যের সংক্রমণ সেগুলো শিক্ষিত মনকে আলোড়িত করে না। অনেকটা মধ্যযুগীয় পুঁথিতে আছে, কিন্তু আধুনিককালে সে রসাবেশের মূল্য নেই।

৫. আরব্য উপন্যাস যেমন বিভিন্ন কাহিনী একত্রে গ্রন্থিত হয়ে বিচিত্র কল্লোলের মত গতিধারা নির্মাণ করেছে পুঁথিতে তাই আমরা লক্ষ্য করি। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হাতেম তায়ীর পুঁথি। হুস্নাবানুর সাতটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে হাতেম তা'য়ী বিভিন্ন রূপকথার সম্মুখীন হয়েছেন। সে রূপকথায় কোথাও বিভীষিকা, কোথাও সমুদ্র তীরে একাকী অপেক্ষমাণ যাত্রী, কোথাও ধ্বংসের লীলা, কোথাও অগ্ন্যুৎপাত, কোথাও বনভূমিতে বিচরণকারী বন্যপশু এ সমস্ত কথা ও কাহিনী হাতেম তা'য়ী পুঁথিতে এসেছে। তাই আজকের দিনে পুঁথির কাহিনীর সাহস ও সংকল্প অনেকটা প্রহসনের মত।

কিন্তু পুঁথিকে অবলম্বন করে নতুন কাহিনী নির্মাণ করা যায়। তার আশ্চর্য নিদর্শন হচ্ছে ফররুখ আহমদের হাতেম তা'য়ী। এই বইটিতে পুঁথিকারদের উদ্দেশ্যে কবি একটি সনেট লিখেছেন। সনেটটি নিম্নরূপ:

"কাহিনী শোনার সন্ধ্যা মিশে যায় দূরে ক্রমাগত
নাতেকা পাখীর মত রঙধনু দিগন্তের পারে,
সহস্র সংশয় এসে হানা দেয় বক্ষে বারে বারে;
হাজার সওয়াল এসে তনু মন করে যে আহত।
যুগান্তের ঘূর্ণাবর্তে বেড়ে যায় হৃদয়ের ক্ষত,
মেলে না সান্ত্বনা, শান্তি, বাদগর্দ হাম্মামের ধারে,
অজানা মুক্তির পথ রুদ্ধ এক রাত্রির দুয়ারে
খুঁজে ফেরে অন্ধকারে শতাব্দীর কাহিনী বিগত।
নির্বাক নিস্ময়ে দেখি বিস্মৃতি প্রাণের ব্যাকুলতা
সঞ্চারিত এ মাটিতে, এই পাক বাংলার প্রান্তরে,
অথবা রাত্রির পটে জীবনের নব রূপকথা
পদ্মা মেঘনার দেশে বহমান ক্লান্তির প্রহরে।
পুঁথির পৃষ্ঠায় ম্লান মানুষের আর্তি' মানবতা
উজ্জ্বল হীরার মত দেখি জ্বলে রাত্রির প্রহরে।।

ফররুখ আহমদ পুঁথিকে কিন্তু অনুসরণ করেনি, না পুঁথির ভাষা না পুঁথির জীবনদর্শন। সে হাতেম তা'য়ীকে বেছে নিয়েছে প্রভাবান মানুষ হিসেবে যিনি সর্বদা উন্মুখ মানব সেবার জন্য। ফররুখ সেজন্য বলেছে ইয়েমেনের শাহাজাদা তা'য়ী পুত্র হাতেম পথের নির্দেশ পেয়েছিলেন আত্মজিজ্ঞাসার মধ্যে। হাতেম তা'য়ীর কাছে একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মানুষের সেবা করা, সত্যকে দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত করা এবং মুক্ত প্রজ্ঞার সন্ধান লাভ করা। ফররুখ বলছে এটাই হাতেম তা'য়ীর পরিচিত এবং বিশ্ব-রহস্যের মূলে এটাই চরম সত্য। সে হাতেম তা'য়ী গ্রন্থের পরিচিতি পর্বে হাতেম তা'য়ীর আত্মজিজ্ঞাসার স্ফুরণ ঘটিয়েছে। সে বলছে : পৃথিবীতে বহু মনুষ্য আছে যারা হতাশাগ্রস্ত এবং দারিদ্র্যে নিপীড়িত। কল্যাণ কামনা করে হাতেম তা'য়ী তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর জিজ্ঞাসার মূলে সর্বদাই একটি প্রশ্ন ছিল। প্রশ্নটি হচ্ছে দুর্গম পথে যাত্রা করতে হবে সৌজন্যের সন্ধানে এবং নিপীড়িত মানুষকে আশ্রয় দিতে হবে। ফররুখ আহমদ হাতেম তা'য়ীর প্রজ্ঞাবান চিত্ত এবং অহমিকাশূন্য মানব-প্রীতিকে ব্যাখ্যা করেছে এভাবে:

বাঁধ মুক্ত দরিয়ার টানে
ক্ষীণ ঝর্ণাধারা, নদী ছুটে আসে আনন্দে যেমন
তেমনি দরাজ দিল হাতেমের সাখাওতি আর
সূরাত, হিম্মাৎ দেখে এল কাছে জনতা মজলুম
এল নির্যাতিত প্রাণ। কেননা যে বান্দা এলাহির,
ঈমানের দীপ্ত শিখা যার দিলে, মুহব্বত মনে
যার অবারিত দ্বার পৃথিবীতে প্রেমে ও সেবায়
পুরায় প্রার্থীর চাওয়া যে মুমিন এলাহির নামে;

জেগে ওঠে মনুষ্যত্ব তার তপ্ত জিগরের খুনে
আরক্তিম (অন্ধকার শেষে যেন আফতাব নূতন
জাগায় জাহান সারা অকৃপণ রশ্মি বিনিময়ে)!

হাতেমের পরিচয় সূত্রে ফররুখ যেসব কথা বলেছে এবং বিশেষণ শোভিত করেছে সেগুলো কিন্তু আধুনিক কবিতার ভাষা এবং ছন্দ। দোভাষী পুঁথির অঙ্গীকারের চিহ্নমাত্র এখানে নেই। ফররুখ দোভাষী পুঁথি এখানে পুনঃনির্মাণ করেনি, কিন্তু দোভাষী সৌজন্যে আধুনিক জীবনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। সূচনা পর্বে হাতেম তা'য়ীর যে পরিচয় আমি পাই সে পরিচয় পুঁথিতে নেই। পুঁথিতে শুধু সংক্ষেপে আছে তিনি একজন সৌখিন এবং মানুষের কল্যাণে সর্বদাই নিয়োজিত। এ সত্যটা ফররুখ ব্যাপক আকারে প্রকাশ করেছে উপমার পর উপমা এনে এবং এগুলোর মধ্যে বিস্ময়কর সঙ্গতি রক্ষা করে ফররুখ যে হাতেম তা'য়ীকে নির্মাণ করেছে তিনি পুঁথির কাহিনীর হাতেম তা'য়ীর আবির্ভাব। প্রাচীন কাহিনীর জের আছে সন্দেহ নেই, প্রাচীন তথ্যও অনেক আছে, কিন্তু চরিত্র জ্ঞাপনের জন্য ফররুখ যে হাতেম তা'য়ীকে নির্মাণ করেছে সে আমাদের মানস-লোকের হাতেম তা'য়ী। অলৌকিকতা তার সামনে কিছু নয়, বন্য শ্বাপদ তার সঙ্গে কথা বলছে এটাও কোন বিস্ময়ের নয়। অতল সমুদ্রের কাছে যে হাতেম দাঁড়িয়ে আছেন সেটাও এমন কিছু নয়। এ সমস্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে যে হাতেম আবিস্কৃত তিনি একজন সহজ, সরল পুণ্যবান পুরুষ। অলৌকিক ঘটনার প্রবাহ তাকে অলৌকিক করেনি বরঞ্চ তাকে জীবনময় করেছে। সূচনা পর্বে ফররুখ একথাই বোঝাতে চেয়েছে যে হাতেম তা'য়ী একজন মানুষ, সুপুরুষ এবং সুমহান তার অভিব্যক্তি। সে দুর্বল নয়, কিন্তু তার অহমিকাও নেই। দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সামনে তিনি স্বততই দণ্ডায়মান। ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের সামনে থেকে তিনি নিরীহ মানুষকে রক্ষা করেছেন, কিন্তু ব্যাঘ্রের ক্ষুধা নিবারণ করেছেন নিজের শরীরের মাংস কেটে দিয়ে। এ কাহিনী রূপকচ্ছলে বলা, কিন্তু এর অভিপ্রায় স্পষ্ট। সকলের জন্য হাতেমের কল্যাণবহ সে মানুষ অথবা পশুই হোক। হাতেমের এই পরিচয় ফররুখ যেভাবে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছে তার তুলনা হয় না।

দোভাষী পুঁথিকার এর ধারে-কাছেও পৌঁছাতে পারেননি। ফররুখ খুব বিস্তারিত বর্ণনা করেছে সবকিছু। এই বিস্তারিত বর্ণনার মধ্যে মনোজগতের কথা, আত্মজিজ্ঞাসা এবং উপলব্ধিজনিত জিজ্ঞাসার কথা আছে। এগুলো কখনই পুঁথিতে থাকে না। পুঁথি ভাবের দিক থেকে নিস্তরঙ্গ, কিন্তু কাহিনীর দিক থেকে অস্বাভাবিক। ফররুখ পুঁথির কাহিনীর অস্বাভাবিকতা বজায় রেখেছে, কিন্তু আধুনিক সময়ের চিন্তা ও মনন প্রবল প্রশ্রয় পেয়েছে তার রচনায়। একটি উদাহরণ দিলে কথাটি স্পষ্ট হবে। বৃদ্ধা ধাত্রী হুসনা বানুকে উপদেশ দিয়েছিল যে কোন পুরুষকে বিনা সংজ্ঞায় এবং বিনা জিজ্ঞাসায় স্বামী হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়। সে হুসনা বানুকে সাতটি সওয়াল বলে দেয়। যে ব্যক্তি এই সাতটি সওয়ালের উত্তর এনে দিতে পারবে তাকেই যেন হুসনা বানু স্বামী হিসাবে গ্রহণ করে। হুসনা বানুও তাই মেনে নিয়েছিল। বিভিন্ন প্রশ্ন

সম্পর্কে হুসনা বানুর কোন অনুভূতি ছিল না। কাহিনীর ধারায় প্রশ্নগুলো এসেছে এবং মুনীর স্বামীর জন্য হাতেম তা'য়ী উত্তর খুঁজতে বেরিয়েছে দেশে-বিদেশে। ফররুখ এটাতে পরিবর্তন ঘটিয়েছে। সে দেখিয়েছে যে প্রশ্নগুলো করছে তা নিয়ে তার মনে প্রতিক্রিয়া জাগছে। কেন সে প্রশ্নগুলো করবে এই জিজ্ঞাসাগুলো তার মনে উদয় হচ্ছে। হুসনা বানুর স্বগতোক্তি অধ্যায়ে ফররুখ এক দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছে। সেই দীর্ঘ বর্ণনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে হুসনা বানুর মানসলোকের উদ্ঘাটন। হুসনা বানু বলছে :

"প্রশ্ন, প্রশ্ন, শুধু, প্রশ্নের জটিল অন্ধকারে
বিভ্রান্ত এ মন ঘোরে ছায়াচ্ছন্ন রাত্রির কিনারে,
পায় না সে পথ খুঁজে,
পায় না সে আলোর ইশারা;
অজ্ঞতার অন্ধকার ঝরোকায় ফোটে না সিতারা।
প্রশ্নের আবর্তে আজ আমার এ মন নিরাশ্রয়
আলোর সন্ধান করে, চায় পূর্ণ জ্ঞানের সঞ্চয়,
পৃথিবীর সাথে চায় পরিচিতি সান্নিধ্য আত্মার;
তবু সে পায় না সাত সওয়ালের জওয়াব আমার।
প্রতি রাত্রে ভাবি আমি পরিপূর্ণ জীবনের কথা :
কি উপায়ে শেষ হবে অজ্ঞতার চরম ব্যর্থতা,
কোন্ পথে পাব খুঁজে জীবনের শান্তি ও সুষমা,
বুঝি না; -বিস্বাদ স্মৃতি ক্রমাগত মনে হয় জমা।"

মানস-চৈতন্যের পরিচয় দোভাষী পুঁথিতে একেবারেই ছিল না। পুঁথিকারগণ অলৌকিক এবং অবাস্তব ঘটনা দিয়ে কাহিনী নির্মাণ করেছেন এবং সরল মানুষের মনে সে কাহিনী আনন্দের সঞ্চার করেছে। পাঠকের মনের মধ্যে একেবারেই কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি। পাঠক শুধু কাহিনীর গতিধারা অনুসরণ করেছে এবং মুহূর্তের জন্য কাহিনীর সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করেনি। আধুনিককালে কবি ও কবিতার পাঠক মুখোমুখি দাঁড়ালেন। কবিকে পাঠক নির্মাণ করতে হল এবং পাঠকও কবির ধ্যান-ধারণার সঙ্গে পরিচিত হলেন। দোভাষী পুঁথির ক্ষেত্রে তা ছিল না। সেখানে পাঠকের প্রজ্ঞা কাজ করেনি। সেখানে পাঠকের কৌতূহল কাজ করেছে। ফররুখ আহমদ পাঠকের সজাগ অনুভূতি, তাৎপর্য বোধ এবং প্রজ্ঞাগত জিজ্ঞাসাকে ব্যাপক আকারে ব্যবহার করেছেন। হাতেম তা'য়ী সে অর্থে একটি আধুনিক কাব্য-কাহিনী। আধুনিক মানুষের চিন্তা, ব্যাকুলতা এবং আগ্রহকে তিনি কাব্য রচনার ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছেন। আধুনিক মানুষ নির্বিকার নয়। সে শুধুমাত্র কথকতায় সন্তুষ্ট নয়। সে মানুষের মনের নিভৃত কক্ষে যেতে চায়। ফররুখ এই নিভৃত কক্ষের দরজা উন্মোচন করেছে। সে এক জায়গায় বলেছে :

"প্রাণের পেয়ালা তুমি পূর্ণ করো কানায় কানায়
ওগো সাকী! যে বিহঙ্গ ওড়ে আজ উন্মুক্ত ডানায়

নতুন প্রেরণা দাও সঞ্জীবিত করো তুমি তাকে
জীবন-মৃত্যুর মাঝে মহত্তর জিন্দেগীর ডাকে,
উদ্দাম ঝড়ের মুখে করো তাকে শংকাহীন, আর
জুলমাতের এলাকায় করো তাকে পূর্ণাঙ্গ সত্তার
অধিকারী। করো রক্ষা প্রসারিত প্রেমে ও প্রজ্ঞায়,
নূহের উজ্জ্বল দৃষ্টি দাও তাকে ঘূর্ণি ও বন্যায়,
অনাবাদী জমিনের বালু-বক্ষে ফলাতে ফসল
খিজিরের প্রাণৈশ্বর্য দাও তুমি ... সবুজ ... শ্যামল,
প্রশ্নের জটিল গ্রন্থি উন্মোচিত হয় যাতে; আর
তৃষিত মানসে যেন খোলে দ্বার প্রশান্তি-প্রজ্ঞার।"

হাতেম তা'য়ীর কাহিনী বিন্যাস অপূর্ব। সে কাহিনী বিন্যাসকে আধুনিক চিন্তা ও মানসের কাছে ফররুখ নিয়ে এসেছে। আধুনিক মানুষও এ কাহিনীটি উদগ্রীব হয়ে পাঠ করে। কবিতার ভাষা শ্লথ নয় এবং আড়ষ্টও নয়। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মৌল কাঠামোতে ফররুখ এ কবিতা রচনা করেছে। প্রথম প্রশ্ন যখন হাতেম তা'য়ী শুনলেন তখন তিনি পথে বেরুলেন প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে। বহু মরু প্রান্তর অতিক্রম করে হাতেম তা'য়ী একটি মনোরম উদ্যানে প্রবেশ করেন। সেখানে একজন প্রবীণ প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসেন তার কাছে দশতে হাবেদার প্রবেশ-রহস্য জানতে পারেন। প্রবীণ ব্যক্তি নিয়ে যাবে। সেই পাতলপুরীতে আগন্তুক লনেক আশ্চর্য দৃশ্য আর অনেক তন্বী সুন্দরীকে দেখতে পাবে। সবচেয়ে সুরূপা তরুণীর হাত ধরলেই এক অদৃশ্য আঘাতে দশতে হাবেদায় নির্বাসিত হয়ে যাবে। দশতে হাবেদায় যাওয়ার এটাই সহজ পন্থা। এটা পুঁথির কাহিনী বটে। এর মধ্যে অলৌকিকতা এবং অস্বাভাবিকতা আছে সন্দেহ নেই। ফররুখ তার অনিন্দ্য সুন্দর ভাষায় এটাকে আধুনিক মনের কাছে গ্রাহ্য করেছে। তার প্রমাণ পাই ফররুখের বর্তমান বর্ণনায় :

"একবার দেখে যার জিন্দেগীর সাধ মেটে নাই
দশতে হাবেদার মাঠে তুমি তার দেখা পাবে ভাই,
সে অজানা মাঠ থেকে ফেরে নাই কেউ এ যাবত;
যে গেছে ভুলেছে সেই মোহমুগ্ধ পৃথিবীর পথ।
তবুও তোমাকে বলি দূর দেশী এসেছো যখন,
আশ্চর্য রহস্যময় মানুষের প্রথম যৌবন,
সামর্থ্যের অধিকারী নেমে যেতে পারে সে সহজে
কামনার নিম্নাবর্তে পাশবিক প্রবৃত্তির ভোজে,
কিম্বা পারে উঠে যেতে উর্ধ্ব স্তরে... উর্ধ্বে ফেরেশতার
সমস্ত সৃষ্টির মাঝে দীপ্ত যেন কুতুব তারার
রোশনি চির অমলিন। ইঙ্গিত জানায়ে বলি আজ
হাবেদার মাঠে শেষ হয় নাই মানুষের কাজ।"

হুসনা বানুর দ্বিতীয় প্রশ্ন দৌলত পানিতে ফেলে নেকি কর - এ কথার কি রহস্য? এই সওয়ালের উত্তর খুঁজতে গিয়ে অনেক পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। সফরের পথে প্রথম তিনি হলুকা নামক একটি দৈত্যের সম্মুখীন হন। কৌশলে হলুকা দৈত্যকে হত্যা করে তিনি উৎপীড়িত জনতাকে রক্ষা করেন। খরযমের গোরস্থানে তিনি শহীদ ও বখিলের আত্মদর্শন করেন। দুর্গত বখিলের আত্মার অনুরোধে তাঁকে নতুন সফরের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। সম্পত্তি বন্টন শেষ হলে বখিলের আত্মা কবরের আযাব থেকে মুক্তিলাভ করে। অতঃপর হাতেম তা'য়ী নতুন সফর আরম্ভ করেন। সফরের পথে বেদাত শহরে উপস্থিত হলে জিনের প্রভাবান্বিতা শাহাজাদী তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। হাতেম সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হন। ইবলিসের অনুচর জিনটিও হাতেমের অস্ত্রে নিহত হয়। পুঁথির ঘটনা এখানেই গড়িয়ে চলেছে। আরও অনেক সংশয় ও উপদ্রূপ অতিক্রম করে হাতেম তা'য়ী শেষ পর্যন্ত হুসনাবানুর দ্বিতীয় সওয়ালের জবাব পান। পুঁথিতে কাহিনী বিন্যাস এরকমই। ফররুখ আহমদ এই কাহিনীর মধ্যে চিন্তা ও মানসলোকের পরিচর্যা এনেছে। ফররুখ এভাবে বর্ণনা দিয়েছে :

"দুসরা সওয়ালের পথে এই ভাবে চলে রাত্রি দিন, গ্রন্থি খুলে সমস্যার ছায়াচ্ছন্ন সন্ধ্যায় হাতেম পৌছিল নগর প্রান্তে সম্পূর্ণ অচেনা; শুনিল সে লক্ষ সন্ত্রাসিত কণ্ঠে আর্তস্বর, আহাজারি করে। শুধালো হাতেম তা'য়ী যখন দেশের সমাচার বলিল প্রবীণ বৃদ্ধ, প্রাণী এক পাহাড় সমান হিংস্রতায় অতুলন পেরেশান করে প্রতিদিন ত্রস্ত জনপদ। আশ্চর্য রাক্ষস সেই মধ্যমুখ মরে না অস্ত্রের মুখে কিংবা হাতিয়ারে দুঃসাহসী জঙ্গী নৌজোয়ান যত মারা গেছে সম্মুখ সংগ্রামে রাক্ষসের হিংস্র নখে, ভয়ঙ্কর হিংস্র সে পিশাচ এ শহরে হানা দিয়ে তুলে নেয় প্রত্যহ শিকার আদম-সন্তান এক প্রতি দিন যায় তার মুখে।"

ফররুখ পুঁথির কল্পকাহিনীর ব্যতিক্রম ঘটায়নি। কিন্তু সেসব কল্পকাহিনী ভাষার সৌন্দর্যে এবং ছন্দের মাধুরিমায় গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। পুঁথির শ্লথ ছন্দ-বিন্যাস এবং মিশ্রিত ভাষা-শৈলী আমাদের মনে চমক জাগায় না। আমরা আধুনিক সময়ে সে ভাষার আবেগে মুগ্ধ হই না। ফররুখের হাতে পুঁথির একটানা একঘেয়েমি একটি নতুন চাঞ্চল্যে আমাদের মনকে গ্রাস করে। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে ভাষা সব কিছুকে সজীব করে। একটি দুর্বল মন্তব্য সুস্পষ্ট ভাষার চাতুর্যে গ্রহণযোগ্যতা পায়। বাংলা ভাষাকে ফররুখ মার্জিত রুচির বাহন করেছে। নাগরিক সত্তা ফররুখের কবিতাকে অনুমোদন করে কিন্তু পুঁথিকে অনুমোদন করে গ্রামীণ সত্তা। বাংলা ভাষাকে ফররুখ মর্জিত রুচির বাহন করেছে। গ্রামের লোকেরা অতীত থেকে জীবন দর্শন সন্ধান করে না, শুধুমাত্র অবাস্তব রহস্যের সন্ধান করে। পুঁথিতে তা ঘটতে থাকে। এটাই পুঁথির বৈশিষ্ট্য। পুঁথির সেই অবাস্তব অঙ্গীকারকে ফররুখ আহমদ ভাষার সাবলীলতা এবং ছন্দের চাতুর্য এবং বরাভয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত করেছে, যার ফলে আমরা অবাস্তব ঘটনার জন্য প্রশ্ন করি না, কিন্তু মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার মাঝে

তাকে গ্রহণ করি। পুঁথির সময় ফুরিয়ে গেছে, সেজন্য আমরা আক্ষেপ করি না। বরঞ্চ বাংলা ভাষা-শৈলী নিরন্তর নতুন সম্মোহ সৃষ্টি করছে। এটাতেই আমরা প্রীত।

ফররুখ আহমদ ইসলামের তত্ত্ব, জীবন সন্ধান এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও তন্ময়তা হাতেম তা'য়ীর চরিত্রে প্রকাশ করেছে। হাতেম তা'য়ী কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু ফররুখের হাতেম তা'য়ী একান্তভাবে মুসলমান। ইসলামের ত্যাগ, সত্যের অন্বেষণ এগুলোর মধ্য দিয়ে হাতেম তা'য়ী একান্তভাবে মুসলমান। ইসলামের ত্যাগ, সত্যের অন্বেষণ এগুলোর মধ্য দিয়ে হাতেম তা'য়ী একজন ইসলামী ধ্যান-ধারণার জাগ্রত পুরুষ। হাতেম তা'য়ীর চরিত্রে ফররুখ এইভাবে একটি দিক-দর্শন দেখাতে চেয়েছে। হাতেম তা'য়ী কাব্যের যে অংশটুকু আমরা উদ্ধৃত করি না কেন সেখানে ইসলামী সত্যবোধের চমৎকারিত্ব বিদ্যমান। এ পরিবর্তনটা কাব্যগত কারণে আমরা গ্রহণ করতে পারি। ফররুখের হাতেম একজন ন্যায়বান, নিষ্ঠাবান, সত্যসন্ধ এবং প্রজ্ঞাবান চিন্তাশীল মুসলমান। তার ত্যাগের মধ্যে, কর্মের মধ্যে আল্লাহর ধ্যানের নিমগ্নতা আছে। সুতরাং একথা বলা যায় যে, 'সাত সাগরের মাঝি' এবং 'সিরাজাম মুনীরা' পেরিয়ে হাতেম তা'য়ী কাব্য অবিসংবাদিতভাবে ইসলামী আদর্শের একটি মহিমান্বিত রূপকে প্রকাশ করেছে।

হাতেম তা'য়ী ফররুখের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য। ভাষার কৌশলে, শব্দের বিন্যাসে এবং ছন্দের গতিধারায় এই কাব্য বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট রূপের কাব্য। এই কাব্যের শ্রেষ্ঠত্বের দ্বারা ফররুখ বাংলা সাহিত্যে একটি চিরকালীন শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে।

---

**[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, জুন, ২০০১]**

# ফররুখ আহমদের মুহূর্তের কবিতা

## সৈয়দ আলী আহসান

ফররুখ আহমদ সনেটের ভঙ্গিতে এবং চরণ-বিন্যাসে যে সমস্ত কবিতা লিখেছেন সেগুলো মুহূর্তের কবিতা বলে পরিচিত। মুহূর্তের কবিতা অর্থ যে কবিতা অল্প সময়ে পাঠ শেষ হয়। কিন্তু এর চেয়েও একটি নিগূঢ় অর্থ আছে। সেটা হলো মুহূর্ত বলতে আমরা কি বুঝি, মুহূর্তের কোন পরিমাপ আছে কিনা এবং যা শাশ্বত এবং চিরকালই তাঁর সঙ্গে মুহূর্তের সম্পর্ক কী? মুহূর্ত বললে আমরা বুঝি একটি চলমান দ্রুততা। সেটা স্থায়ী হয় না কিন্তু অল্প সময়ের জন্য তাঁর অস্তিত্ব জানিয়ে যায়।

ফররুখ আহমদ মুহূর্তের কবিতার ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, গতিমান মুহূর্তের খরস্রোতের উদ্দাম। একই সঙ্গে ফররুখ বলেছেন যে, সময় হলো শাশ্বত এবং স্থির। এর অর্থ সময়ের কোন পরিমাণ নেই। কিন্তু আমরা আমাদের কর্তব্যকর্মে সময়কে হারাই। সে অর্থে সময় মুহূর্ত মাত্র। সুতরাং সময়ের দুটি পরিচয় আছে। একটি হল শাশ্বত পরিচয় আরেকটি হল খণ্ডকালীন মুহূর্তের পরিচয়। আমরা নিঃশ্বাস ফেলি এবং সে সঙ্গে সময়ও হারাই। মানুষের জীবন চেতনা এই নিঃশ্বাসও বর্ণের উপর নির্ভরশীল। আমরা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিঃশ্বাস ফেলে চলি। অবশেষে আমাদের মৃত্যু হয়। ঐ নিঃশ্বাসগুলো জীবনের মুহূর্ত মাত্র। ফররুখ এটাকে বলেছেন "অধীর পাখির মত"। যে পাখি সমুদ্রের তীর দেখে এসে বিভিন্ন বর্ণ বিভায় পৃথিবীকে ভরে তোলে। ফররুখ আরো বলেছেন, যে জীবনের তপ্তশ্বাস এই মুহূর্তকে গণনা করে। এই যে, তপ্তশ্বাস এটি ফররুখের বিবেচনায় উচ্ছল সঙ্গীতের মতো। তিনি আরো বলেছেন মুহূর্তের কলতান বিশ্বের সুর সম্ভার পরিপূর্ণ করতে পারে না। তবে ক্ষণিকের কথার মূল্য আছে। আমরা পৃথিবী ছেড়ে যাবো, কিন্তু পৃথিবী থাকবে। অর্থাৎ আমাদের অস্তিত্ব চঞ্চল আবার আমাদের অস্তিত্ব চিরায়ত। মুহূর্তে আমরা সচল হই এবং মুহূর্তেই আমরা বিনাশপ্রাপ্ত হই। আমরা এই মুহূর্তে আছি। আবার শাশ্বত সময়-অঙ্গীকারেও আছি। এই কথাগুলো ফররুখ তাঁর মুহূর্তের কবিতায় বুঝাতে চেয়েছেন।

দীর্ঘ শতাব্দীর কথা মানুষ মনে রাখতে পারে না। যে জন্য আমরা যুগান্তের কথা অথবা দীর্ঘ শতাব্দীর কথার খতিয়ান করতেও পারি না। আমাদের কাছে আছে শুধু ক্ষণকাল অর্থাৎ একটি মহূর্ত মাত্র। সেই মুহূর্তকে আমাদের জীবন্ত রাখতে হবে এবং সেই মুহূর্ত হচ্ছে উল্কার মতো নিক্ষিপ্ত একটি দ্রুতি। এই আসে এই চলে যায়। তাকে চিরকালের জন্য ধরে রাখা যায় না। আমরা একটি খণ্ডকালের মধ্যে বাস করি। সেখানেই আমাদের জীবন এবং সেখানেই আমাদের কর্ম-প্রবাহ। ফররুখ একটি উদাহরণ দিয়েছেন, "ঘাসের সবুজ শিষে যেমন এক বিন্দু শিশির কণা" আমাদের

জীবন ঠিক তেমনি। সে শিশির কণা সৌন্দর্যে অপরূপ কিন্তু তাঁর ক্ষণস্থায়ী উজ্জ্বল আলো যেমন ক্ষণস্থায়ী তেমনি দীপ্তিমান, নক্ষত্রের দ্রুতি যেমন ক্ষণস্থায়ী তেমনি আমরা ক্ষণস্থায়িত্বের মধ্যে বাস করি। শতাব্দী তৈরি হয় বিচ্ছিন্ন মুহূর্তের মধ্যে কিন্তু সেটাও খেলাঘর। নিঃশব্দে সে খেলাঘর অতলে তলিয়ে যায়। আমরা যদি মুহূর্তের সৌন্দর্য ধরে রাখতে পারি আমাদের চেতনায় তাহলে আমরা সার্থক হবো। শতাব্দীর চেতনার কথা আমাদের ভুলে যেতে হবে। চোখে যেমন দৃষ্টি আছে এবং সে দৃষ্টি সকল কিছুকে দেখে এবং আমাদের সকল মুহূর্ত স্পর্শ করে বেঁচে আছে। এইভাবে ফররুখ মুহূর্তকে ব্যাখ্যা করেছেন।

আমরা মানুষ বিশেষ মুহূর্তের কথা চিন্তা করি এবং বলি এমন একটি মহূর্ত আসুক যাকে আমরা আজীবন মনে রাখবো। সে বিশেষ মুহূর্ত কার জীবনে কখন আসে কেউ বলতে পারে না। ফররুখ বিষণ্ন সন্ত্রাসের কথা বলেছেন। বিষণ্ন সন্ত্রাসের দ্বারা কখনো বুঝাতে চেয়েছেন মানব জীবনের অস্থিরতা এবং লোভ। এই বিষণ্ন সন্ত্রাসকে তিনি দূর করতে বলেছেন। এবং আমদের জীবনে দুর্লভ মুহূর্ত হচ্ছে তাই যেটা বিষণ্নতা দূর করে এবং যে মুহূর্তের উজ্জ্বলতায় আমরা পদার্পণ করি। পুরনো যে দীপ্তি যাকে ফররুখ হারানো সঙ্গীতও বলেছেন, সেটা যখন মানুষের কর্ণে প্রবেশ করে তখন এমন একটা মুহূর্ত আসে যখন মানুষের মধ্যে কবিতা রচনার প্রেরণা সৃষ্টি হয়, সেটা দুর্লভ মুহূর্তের একটি ঘটনা। কবিতা হচ্ছে পৃথিবীর সৌন্দর্য। কবিতা থাকে সর্বত্র প্রতিদিনের পৃথিবীতে অরণ্যের সবুজাভায় এবং কবিতা থাকে অর্ধস্ফুট গোলাপের পাপড়িতে এবং রাত্রিতে যখন শিশির পড়ে সেই শিশিরের ফোঁটায় কবিতার সৌন্দর্য জাগে। দুর্লভ মুহূর্ত হচ্ছে সেই মুহূর্ত যে মুহূর্তে মানুষ জীবনের সন্ধান পায় এবং রূপ লাবণ্যের স্পর্শ পায়। এইভাবে মুহূর্তকে আমরা জাগ্রত করি। প্রতিদিনের দৈন্য এবং হাহাকারের মধ্যে এই মহূর্ত আমাদের জীবনে বিষণ্নতা দূর করে। আমরা বহু বছর অপেক্ষা করে হঠাৎ এই মুহূর্তের তন্ময়তার সন্ধান পাই।

সুতরাং মহূর্তের সফলতা এবং সার্বিক উৎকর্ষ আমাদের পেতে হবে। আমাদের দিন যায়, রাত্রি শেষে প্রভাত আসে সেই প্রভাতের ঘাসের পাতায় আমরা শিশির বিন্দু দেখি এবং উল্লসিত হই। মুহূর্তে সেই শিশিরবিন্দু রৌদ্রে শুকিয়ে যায়। কিন্তু আমি যে শিশিরবিন্দু দেখলাম এটাইতো আমাদের সার্থকতা। মাটির বন্ধনে ঘাস থাকে সারা দিন তার মধ্যে রুক্ষতা থাকে কিন্তু হঠাৎ সকালবেলা শিশিরের স্পর্শে সে পুলকিত হয়। আমাদের জীবনে সেই পুলকিত মুহূর্ত কখন আসবে আমরা তা বলতে পারি না। যখনই আসুক তখনই আমাদের মুগ্ধতা আসবে এবং প্রাণচাঞ্চল্য জাগবে।

শাশ্বত আমরা কাকে বলি। সময়কে বলি? আমরা শাশ্বত বলি একমাত্র বিধাতাকে এবং তাঁর বাণীকে এবং তাঁর সৃষ্টির রহস্যকে। মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমী বলেছেন, সৃষ্টি ভঙ্গুর। এর কোন মূল্য নেই। একমাত্র বিধাতার অবস্থানই চিরকালীন। তিনি আরো বলেছেন সবই শূন্য এবং নিঃশেষ হবার যোগ্য। কিন্তু

বিধাতার ইচ্ছা চিরকালীন। সূফীতত্ত্বের এই তাৎপর্যটা ফররুখ মুহূর্তের কবিতার মধ্যে আলোচনা করেন। তিনি শুধু মুহূর্তের শব্দটার ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা তাঁর "সাত সাগরের মাঝি" কবিতায় শাশ্বতের একটি ইঙ্গিত পেয়েছি। সেখানে তিনি বলেছেন। উদ্দাম কল-কল্লোলের মধ্যে অসম্ভবকে অতিক্রম করে আমরা শাশ্বতের দরজায় গিয়ে পৌঁছাই। "সাত সাগরের মাঝি" কবিতার মধ্যে সে যাত্রা-পথের বর্ণনা আছে। মুহূর্তের কবিতায় এই তত্ত্বটি নেই, প্রয়োজনও নেই। তিনি দুই একবার শুধু সর্বকালিনতার কথা বলেছেন কিন্তু গুরুত্বের সাথে ব্যাখ্যা করেননি। সুতরাং এ নিয়ে আমরা আলোচনা করবো না। এখানে চলমান মুহূর্তের কথাই আছে।

তবে এখানে কবিতাগুলো অত্যন্ত সুন্দর। প্রকৃতির কথা এসেছে, বৃষ্টির কথা এসেছে, বৈশাখের কথা এসেছে, ঝড়ের কথা এসেছে, এই প্রকৃতির কথাগুলো অত্যন্ত সুন্দরভাবে এখানে এসেছে। 'বৃষ্টি' কবিতা অত্যন্ত সুন্দর। এই বৃষ্টিকে বলছেন বহু প্রতীক্ষিত বৃষ্টি। আমাদের কৃষি জীবনে এবং এক কথায় গ্রামীণ জীবনে এই বৃষ্টির প্রয়োজন বেশি। রৌদ্রদগ্ধ গ্রাম, বৃষ্টি পেয়ে সান্ত্বনা পায়। নদীর তীর আবাদী জমি যত আছে বৃষ্টি পেয়ে তা জীবন পায়। আর একটি কবিতার নাম 'বৈশাখী'। বৈশাখকে কবি রুক্ষতার প্রতীক বলেছেন। রবীন্দ্রনাথও বৈশাখকে রুদ্র বৈশাখ বলেছেন। ফররুখ বৃক্ষশূন্য মাঠ এবং রূঢ়, রুক্ষ প্রকৃতির সঙ্গে বৈশাখের তুলনা করেছেন এবং বলেছেন, জীবন বৈশাখের সময় যেন স্পন্দনে জাগরিত হয়।

ফররুখ বিভিন্ন কবিতায় অশান্ত পৃথিবীর কথা বলেছেন। অশান্তি যে পৃথিবীর গতিকে কতভাবে ক্ষতি করছে একথা তিনি উচ্চারণ করেছেন এবং তিনি বলেছেন, এই পৃথিবী শান্তি চায় এবং মানুষের প্রাণও শান্তি চায়। তার বক্তব্য হচ্ছে-

এ পৃথিবী শান্তি চায়, শান্তি চায় মানুষের প্রাণ,
সংশয়-সন্দেহ-দ্বন্দ্ব-অবিশ্বাস রক্তাক্ত বিক্ষত,
তারকালোকের পথে হয়তো সে চায় পরিত্রাণ;
মারণাস্ত্র গড়ে তবু মৃত্যু বয়ে আজ সে বিব্রত
জানি না কখন তার দুঃখ রাত্রি হবে অবসান
কণ্টকিত প্রশাখায় ফুটবে সে গোলাবের মতো।

**('অশান্ত পৃথিবী' : মুহূর্তের কবিতা)**

এখানে একটি কবিতার নাম- "হিংস্র ক্ষুদাতুর রাত্রি"। এতে কবি বলেছেন, রাত্রিতে পৃথিবীতে অনেক অন্যায় হয়, কে যেন রাত্রের অন্ধকারে সাপের বিষ ঢালে। মানুষ ক্ষণকালের জন্য যে বিশ্রাম এবং অবসর কামনা করবে তাও সে পারে না। এখানে ফররুখ রাতের পৃথিবীর অসহায়ত্বের কথা বর্ণনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য–

এক অন্ধকার যদি শেষ হয় তবে ঘনতর
রাত্রির তরঙ্গ মেঘ নেমে আসে প্রগাঢ় আঁধার

(সারা বুক চেপে ধরে জগদ্দল পাথরের মতো)।
অথবা ছোবলে তার তনু মন করে সে আহত,
বিদ্যুৎ গতিতে তীব্র করে সে দংশন বারম্বার;
অজগর বেষ্টনীতে এ পৃথিবী কাঁপে থরোথরো।

**('হিংস্র, ক্ষুধাতুর রাত্রি' : মুহূর্তের কবিতা)**

ফররুখ আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেছেন যেন তিনি সমস্ত অকল্যাণকে নিবারণ করেন, পৃথিবীর দৈন্যদশা দূর করেন এবং মানুষের চিত্তে প্রশান্তি এনে দেন। তিনি বলেছেন, বিধাতার প্রশ্রয় পেয়ে তিনি নিজে পূর্ণ কণ্ঠে গেয়ে যাবেন প্রভাতের গান। সে ভোর অথবা যে ভোর পৃথিবীর প্রতীক্ষার অপেক্ষায় আসবে সংশয়ের অন্ধকার ভেদ করে সে অন্ধকারের প্রতীক্ষায় তিনি রয়েছেন। তাই কবির শেষ কথা হচ্ছে যে, প্রভাত সকাল তিনি রঙের বৈচিত্র্য দিয়ে পৃথিবীটাকে সাজাবেন এবং মুহূর্তের আনন্দ উত্তাল উদ্ভাসিত করবে দিগ-দিগন্তর।

---

**[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ৫ম সংখ্যা, জুন, ২০০২]**

# ফররুখ আহমদের 'দিলরুবা'

## সৈয়দ আলী আহসান

কাজী আফসার উদ্দীন আহমদ 'মৃত্তিকা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি 'মৃত্তিকা'র স্বত্বাধিকারীও ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরনের লেখার জন্য ফরমায়েস দিতেন। একবার তিনি আরব্য উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে আমাকে এবং ফররুখকে কবিতা লিখতে বলেছিলেন। আমি লিখেছিলাম "হাজার রাতের এক রাত" নামক একটি কবিতা। ফররুখ কোন কিছু লিখেছিলেন কিনা তা জানি না। 'মৃত্তিকার' পুরনো সংখ্যাগুলো পাওয়া গেলে এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া যেত। মোটকথা, আরব্য উপন্যাসের বিষয় অবলম্বন করে কিছু কবিতা লেখার প্রয়াস সেই সময় হয়েছিল। ফররুখের 'দিলরুবা' কাব্যগ্রন্থের সনেটগুচ্ছের মূল বিষয় প্রেম এবং তার মধ্যে আরব্য উপন্যাসের ইঙ্গিত আছে। আমার ধারণা ফররুখ কাজী আফসার উদ্দীনের অনুরোধ সেই সময় রক্ষা না করলেও আরব্য উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে "দিলরুবা" লিখেছিলেন। তাঁর জীবিত অবস্থায় এই কবিতাগুলো পুস্তকাকারে ছাপা হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর আব্দুল মান্নান সৈয়দের সম্পাদনায় এই কবিতাগুলো প্রকাশিত হয়। এখানে আর একটি কথা বলা ভাল যে, বহুপূর্বে "দিলরুবার" একটি পাণ্ডুলিপি আমাকে ভূমিকা লেখার জন্য দিয়েছিল সবিহ-উল-আমিনের পক্ষ থেকে তার ভ্রাতা অথবা অন্য কেউ। আমি একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছিলাম কিন্তু ভূমিকাসহ এই পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে যায়। পরে আব্দুল মান্নান সৈয়দ "চট্টগ্রাম সংস্কৃতি" কেন্দ্রের পক্ষে "দিলরুবার" বইটি প্রকাশ করেন। আমার লেখা ভূমিকাসহ "দিলরুবা" প্রকাশ না পেলেও "দিলরুবা" যে আলোয় উপস্থিত হয়েছে সেই জন্য আমি আনন্দিত।

"দিলরুবা" প্রেমের কবিতা। কবিতাগুলো সনেটের আকারে লেখা। সনেটে পরম্পরা থাকে বলে এইগুলো সে রকম নয়। ইংরেজীতে সনেট সিকোয়েন্স বা পরম্পরা অনেক আছে যেমন- "এলিজাবেথ ব্রাউনিং"। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হচ্ছে "সেক্সপীয়রের" সনেট পরম্পরা। তিনি একজন মহিলাকে লক্ষ্য করে তাঁর সনেটগুলো লিখেছিলেন। এই সনেটগুলো বিশ্বসাহিত্যে অসাধারণ। ভাবের গভীরতায়, আবেগের উচ্ছলতায় এবং প্রাণবন্ত উচ্ছ্বাসের উন্মাদনায় এগুলোর তুলনা নেই। তিনি প্রতিটি সনেটের মধ্যে একজন নারীর প্রতি তার ভালবাসা এবং অভিযোগ উপস্থাপন করেছেন। "সেক্সপীয়ারের" এই সনেট পরম্পরা পাঠ করলে মনে হয় এ যেন একটি প্রেম কাহিনী। একটি সনেটের মাঝে পরবর্তী সনেটের সম্পর্ক আছে এবং সব কয়টি সনেট মিলে একটি ভালবাসার দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। এলিজাবেথ ব্রাউনিং-এর সনেটগুলো কোমল এবং আতিশর্যে পরিপূর্ণ। সেক্সপীয়ারের মতো

উদ্দীপনাপূর্ণ না হলেও এই সনেটগুলো প্রেমের প্রশান্তি বহন করে। বাংলায় সনেট পরিপূর্ণতার দ্যোতনা সৃষ্টি করে না। এটার কারণ বোধ হয় সনেট বাংলা ভাষার নিজস্ব বিষয় নয়। সনেটের প্রকৃতি যে রকম সে রকম প্রকৃতি বাংলা কবিতায় কখনও ছিল না। প্রথম মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর সনেটগুলোকে সনেট বলেননি, "চতুর্দশপদী" কবিতা বলেছেন। এগুলোর প্রতিটি কবিতা অন্য কবিতা থেকে বিচ্ছিন্ন। অর্থাৎ প্রতিটি সনেট স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্যারিসের ভার্সেই শহরে প্রবাস-জীবন যাপন করবার সময় কবির বাংলাদেশের কথা মনে হয়েছে অথবা বলতে পারি তাঁর মাতৃভূমির কথা মনে হয়েছে এবং তিনি স্মরণ করেছেন তাঁর দেশের নদীকে, বটবৃক্ষকে এবং প্রাচীন কাব্যকে। এগুলো স্মরণের মধ্য দিয়ে তাঁর "চতুর্দশপদী" কবিতাগুলো মনোমুগ্ধকর হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও সনেট লিখেছেন, মোহিতলাল মজুমদারেরও সনেট আছে এবং এখনকার দিনেও অনেকেই সনেট লিখছেন কিন্তু সনেট রচনার ক্ষেত্রে আমরা সত্যিকারের দক্ষতা দেখাতে পারিনি।

'ফররুখের' সনেট অনেক আছে। "দিলরুবার" সনেটগুলো তার একটি পর্যায়। এ গ্রন্থের একটি সনেট অন্য সনেটের সংলগ্ন নয়। অর্থাৎ আমরা যাকে সনেট পরম্পরা বলি এগুলো তা নয়। আমি প্রথমেই বলেছি এ সনেটগুলো আরব্য উপন্যাসের কাহিনীর রসাবেশ নিয়ে লেখা। এথম সনেটটিতে "হাজার রাতের কথা" উল্লেখ আছে। এ সনেটটি নিচে উদ্ধৃত হলো :

হাজার রাত্রির কোন এক রাতে যদি ভুলে থাকি
প্রতিজ্ঞা আমরা, কিম্বা অসতর্ক যদি ভুলে থাকো
তোমার প্রতিজ্ঞা- তবে সঙ্কল্পের দোষ দিয়ো নাকো;
সে রাত্রির- তীরে এসে বহুদূরে গিয়েছিল ডাকি,
আকাশের বাঁকা রেখা (স্বপ্নাচ্ছন্ন চাঁদ কিম্বা পাখী)
সমুদ্রে অথবা মনে এনেছিল দুরন্ত জোয়ার।
সংশয়ের দাহ মুছে, ভেঙ্গে দিয়ে গ্রন্থি এ মিথ্যার
মুহূর্তের মূর্ছনায় তনু মন ফেলেছিল ঢাকি।
সৃষ্টি-সম্ভাবনা-দীপ্ত সে নিশীথে প্রোজ্জ্বল উৎসাহে
প্রেম এসেছিল কাছে, শতাব্দীর যে বন্ধ্যা মৃত্তিকা
জ্বলিয়াছে এতকাল তৃষিত মনের অন্তঃর্দাহে
সে-ও চেয়েছিল তার মৃত স্বপ্নে তারকার শিখা'
আ-দিগন্ত জীবনের স্বপ্নলুব্ধ সুপ্ত নীহারিকা
নিজেরে বিলায়ে দিতে চেয়েছিল উত্তাল প্রবাহে।

এ প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভাল যে, ফররুখ "পুঁথি সাহিত্য" গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। তিনি "হাতেম তায়ী", "কাসাসুল আম্বিয়া" এবং "আলিফ লায়লার" পুঁথি সব সময় সঙ্গে রাখতেন। "হাতেম তায়ীর" পুঁথি অবলম্বন করে তিনি "হাতেম তা'য়ী" কাব্য লিখেছেন পুঁথির বর্ণনাভঙ্গি সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে তিনি নিজের মেজাজে আধুনিক শিল্প-সৌন্দর্য্যে "হাতেম তায়ী" লিখেছেন কিন্তু উৎসকে তিনি কোন দিন ভোলেন নি। "আলিফ লায়লার" পুঁথির মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে প্রেম। সেই প্রেমের ক্ষেত্রে নর-নারীর যে মানসিক অস্থিরতা তা সেখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে। আরব্য উপন্যাসে প্রেম ভঙ্গের ইতিহাস আছে এবং প্রেমাস্পদ নারী-পুরুষের কথা আছে। মূলত : বিশ্বসাহিত্যের এই বিখ্যাত গ্রন্থটির প্রধান চরিত্রটি হচ্ছে "নারী"। এভাবে নারীকে লক্ষ্য করে ফররুখের "দিলরুবা" কাব্যগ্রন্থের সনেটগুলো গ্রথিত। এখানে আরব্য উপন্যাসের কোন কাহিনী নেই অথবা বিশেষ কোন চরিত্রের অভিব্যক্তি নেই। শুধুমাত্র প্রেমের যে রসাবেশ তাঁকে অবলম্বন করে এবং তা দিয়ে তিনি "দিলরুবার" সনেটগুলো সাজিয়েছেন।

ফররুখ যে আরব্য উপন্যাসের প্রেমকে অবলম্বন করে এই কাব্য রচনা করেছেন তার সাক্ষী আমি নিজে। কলকাতায় থাকতে আমরা প্রায়ই একে অন্যের সান্নিধ্যে আসতাম। আমার সান্নিধ্য-সূত্র তৈরী করে দিত কখন কাজী আফসার উদ্দীন আহমদ, কখনও সিকান্দার আবু জাফর। 'মৃত্তিকা'র অফিসে আমরা কখনও মিলিত হতাম অথবা কখনও সিকান্দারের সার্কাস এভিনিউ বাসায় আসর বসত, কখনওবা আমার মেসে। আমি থাকতাম গার্ডনার লেনে। এখানেও ফররুখের নিত্য গতিবিধি ছিল। সুতরাং ফররুখ সম্পর্কে আমি যতটা সুনিশ্চিত হয়ে কথা বলতে পারি ততটা বোধ হয় আর কেউ বলতে পারবে না। ফররুখের বন্ধুদের মধ্যে এবং ফররুখের নিজস্ব গণ্ডির লোকদের মধ্যে এখন আর কেউ বর্তমান নেই। দুই একজন যারা আছেন তারা গভীরভাবে ফররুখকে জানতেন না। যেমন আবু রুশদ অথবা আবুল হোসেন। তাদের সঙ্গে কোলকাতার জীবনে কখনও কখনও ফররুখের দেখা হতো। কিন্তু সেটাকে গভীর অন্তরঙ্গতা বলা চলে না। ফররুখের কোলকাতার জীবন এবং ঢাকার জীবন এ দু'য়ের সাক্ষী আমি। সুতরাং আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে আমি ফররুখের মূল্যায়ন করছি। সেই অভিজ্ঞতা সূত্রে আমি বলছি যে, "দিলরুবার" সনেটগুলো আরব্য উপন্যাসের প্রেক্ষিতে রচিত। প্রেক্ষিত বলতে আরব্য উপন্যাসের ঘটনা বুঝাতে চাচ্ছিলাম কিন্তু আরব্য উপন্যাসের নারীঘটিত ইচ্ছা ও অনিচ্ছার কথা বলছি না।

ফররুখ আহমদ তাঁর "দিলরুবার" সনেটগুলোকে সাতটি স্তবকে বিভক্ত করেছেন। কেন করেছেন তা ঠিক স্পষ্ট নয়। কেননা সব কবিতায় একই অশরীরী প্রেমের গুঞ্জরণ। একটি স্তবকে একটি বিশেষ ভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে তা নয়। এভাবে স্তবক বিভাগ না থাকলেও চলতো। কেননা প্রেমের অর্থাৎ প্রেমজনিত আত্মিক

উপলব্ধির বিশ্লেষণ সব কবিতায় আছে। স্তবকগত বিভাগে কবিতাগুলোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে ফুটে উঠেছে, তা নয়। আমার মনে হয়, কবি একটি স্তবকের সঙ্গে অন্য স্তবকের সূক্ষ্ম একটি পার্থক্য বিবেচনা করতে চেয়েছিলেন। প্রথম স্তবকের কবিতাগুলো আমরা বলতে পারি প্রস্তাবনামূলক। সেখানে ছয়টি সনেট আছে। প্রথম সনেটে "হাজার রাতের" কোন এক রাতের কথা আছে। দ্বিতীয় সনেটে স্বপ্নের কথা আছে যে স্বপ্ন কবি গড়ে তুলতে চেয়েছেন। তৃতীয় সনেটে "মৌসুমী ফুলের" দিন শেষ হলো এবং মৃত্যুর অভিনিবেশ এনেছেন একথা তিনি বলেছেন। চতুর্থ সনেটে 'বিভ্রান্ত সন্ধ্যার চক্রে'র কথা বলেছেন। পঞ্চম সনেটে "কালবৈশাখী" বেশে প্রিয়াকে আহ্বান করেছেন এবং ৬ষ্ঠ সনেটে প্রিয়াকে নিকটে আহ্বান করেছেন। বলা যেতে পারে, এখানকার অর্থাৎ প্রথম স্তবকের সনেটগুলো প্রেমের প্রস্তাবনার মতো। কি কি কারণে প্রেমের প্রস্তাবনা করেছেন সে কারণগুলো এই সনেটগুলোতে তিনি বর্ণনা করেছেন। জানিনা আমি ঠিক বললাম কি না? কেননা প্রতিটি সনেটেই অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে প্রেমের প্রথম উন্মেষের কথা বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় স্তবকে প্রেমিকার যে চিত্র কবির হৃদয়ে জেগে উঠেছে সেই চিত্রের বিষয়ে কবি কথা বলেছেন। এখানে প্রথম সনেটে প্রেমিকার যে চিত্র কবির হৃদয়ে জেগে উঠেছে সে চিত্রের বিষয় নিয়ে কবি কথা বলেছেন। দ্বিতীয় সনেটে প্রেমিকার প্রতি আকর্ষণকে কবি এক অতৃপ্ত কামনা বলেছেন। তৃতীয় সনেটেও সেই রকম অতৃপ্ত তৃষ্ণার কথা বলা হয়েছে। চতুর্থ সনেটে অজ্ঞাত সংশয়ের কথা বলা হয়েছে। পঞ্চম সনেটে সমস্ত সৃষ্টির চেয়ে প্রেমিকাকে সুন্দর ভেবেছেন কবি। ৬ষ্ঠ সনেটে প্রেমের প্রথম আবির্ভাবের কথা বলা আছে এবং সপ্তম সনেটে সব কিছু অতিক্রম করে প্রেম যে যুগে যুগে বেঁচে থাকে সে কথা বলা হয়েছে।

তৃতীয় স্তবকে কবি নিজের কথা বলেছেন। অর্থাৎ নিজের বিশ্বাসের কথা এবং নিজের প্রতীক্ষার কথা। প্রথম সনেটে তিনি প্রতীক্ষায় রয়েছেন একথা বলেছেন। দ্বিতীয় সনেটে তিনি প্রেমিকাকে বলতে চাননি যে, তিনি কাকে ভালবাসেন। তৃতীয় সনেটে শিশির আর্দ্র রাতে প্রভাতের আকাশ যেমন প্রতিভাত হয় না তেমনি প্রেমও সেভাবে প্রতিভাত হয় না একথা বলেছেন। চতুর্থ সনেটে যে প্রেমে বেদনার দাহ নেই সেই প্রেম প্রেম নয় একথা বলেছেন। পঞ্চম সনেটে বলা হয়েছে যে, হৃদয়ের সব অনুভূতি মুছে ফেলতে চান কেননা তার বিক্ষত মন শুধু প্রেমিকাকে চেয়েছিল। ষষ্ঠ সনেটে শব্দ মুখরিত দিন এবং স্তব্ধ রাতে আবেশের কথা বলেছেন এবং সপ্তম সনেটে তিনি প্রেমিকাকে ভালবেসে সমস্ত পৃথিবীটাকে ভালবেসেছেন।

চতুর্থ স্তবকে মোট পাঁচটি সনেট আছে। এই সনেটগুলোতে মূলত: প্রেমিকার প্রসঙ্গে কবির অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে। প্রেমিকের অনুভূতি বুঝতে পেরে সেকথা কবি বলেছেন এবং বুঝতে না পারার দরুন কবির হৃদয়ে যে আঘাত লেগেছে সেই

আঘাতের কথা তিনি বলেছেন। কিন্তু অবশেষে কবির সান্ত্বনা হচ্ছে এই ভেবে যে, প্রেমিকা মুখে যে কথা বলেনি সেই কথা তার আঁখি দুটি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে।

পঞ্চম স্তবকে ৬টি সনেট আছে। সব কয়টি সনেটে কবি প্রেমিকার কাছে আর্জি জানাচ্ছেন এবং এখানে কিছুটা রমণীয় শরীরের আবেশ এসেছে। কিন্তু সেগুলো শরীরী তাপ অথবা কোন প্রকার শরীরী আশ্লেষ নয়। শরীরের ক্ষেত্রে প্রায় নীতিবাচক যেমন গ্রীবা-ভঙ্গের কথা তিনি বলেছেন। এতে বিশেষ রমণীর গ্রীবা বুঝা যাচ্ছে না। এটা একটি প্রথাগত কথা। যেমন সংস্কৃত কাব্যে আছে "মরাল গ্রীবা"। এখানকার প্রথম সনেটে কবি প্রেমিকাকে বিচিত্র বলেছেন। বলেছেন তার দৃষ্টিতে মুখরতা এবং গ্রীবা-ভঙ্গে রহস্য রয়েছে। দ্বিতীয় সনেটেও গ্রীবা-ভঙ্গ এবং পদ্মপ্রভ মুখের কথা এসেছে। কোনটাই বিশিষ্ট নয়। ইচ্ছে করলেই একজন কবি সকল রমণীর ক্ষেত্রেই এইগুলো প্রয়োগ করতে পারেন। তৃতীয় সনেটে স্বপ্নের কথা বলেছেন। কবি স্বপ্ন দেখছেন ঘুমে এবং জাগরণে। অর্থাৎ প্রেম যেন নিদ্রায় এবং জাগরণে একই রকম। চতুর্থ সনেটে আবার স্বপ্নের কথা এসেছে। যে স্বপ্ন প্রকাশ পাচ্ছে দৃষ্টির সংকেতে। পঞ্চম সনেটে রমণীর ক্ষণকালীন আদর্শনের কথা তিনি বলেছেন। ষষ্ঠ সনেটে কবি প্রেমের ক্ষেত্রে তপ্ত কথা শুনতে ইচ্ছুক নন এ রকম একটি আবেশ আছে।

ষষ্ঠ স্তবকে সাতটি সনেট আমরা পাই। এখানে কবির নিজের কথাই সর্বস্ব। জীবনের জটিল গ্রন্থিকে আরো জটিল করা হয় যদি চিন্তা করা হয়। দ্বিতীয় সনেটে তিনি নিজেকে সূর্যসম বলেছেন যে সূর্য তীব্র আলোক ছড়ায়। তৃতীয় সনেটে রাত্রির তারার রহস্যের কথা আছে। চতুর্থ সনেটেও সেই তারার ঔজ্জ্বল্যের কথা আছে। পঞ্চম সনেটে তিনি রমণীর পথের উপর তার হৃদয় রেখেছেন একথা বলেছেন। ৬ষ্ঠ সনেটে গোলাপের রক্তিম অধরের কথা আছে। সপ্তম সনেটে প্রেমের রহস্যের যে অন্ত নেই সেকথা বলেছেন।

সপ্তম স্তবক এই গ্রন্থের শেষ স্তবক। এখানে সনেটগুলোতে প্রেম নামক একটি অনুভূতির সন্ধানে কবি যে সর্বক্ষণ ঘুরে ফিরছেন সে কথা আছে। এখানেই মনে হয় কবি কিছুটা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তিনি আদৌ কোন শরীরী রমণীকে ভালবাসেননি। তিনি ভালবাসাকে-ভালবেসেছেন। মাওলানা রুমী যে কথা তাঁর একটি কবিতায় বলেছেন যে, আমি ভালবাসাকে ভালেবেসে তার সান্নিধ্যে যেতে চাই। অর্থাৎ তাঁর ভালবাসা কোন নারী-কেন্দ্রিক নয়। ফররুখও এই স্তবকের কবিতাগুলোতে এটা বলবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রেম রহস্যময় এবং তাঁর প্রেম "অলৌকিক মুগ্ধতা"। একটি সনেটে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে চিরন্তন সত্তা থেকে সত্যিকার প্রেম বিচ্ছুরিত হয়। তিনি বলেছেন প্রেম হল একটি পাথেয়। সেই পাথেয় নিয়ে একজন ভক্ত ঊর্ধ্বে নীহারিকালোকে যাত্রা করে। এই শেষের কবিতাটি "দিলরুবা" কবিতাগুলোর মূলতত্ত্ব বহন করছে বলে মনে হয়। কবিতাটি এই:

সে পাথেয় নিয়ে চলে ভাবনায় নীহারিকালোকে
ভ্রাম্যমাণ মন মোর- সহযাত্রী তার লক্ষ তারকার,
অস্ফুট গোধূলি থেকে অগণন তারার ঝলকে
বিস্ময়ের অধিত্যকা পার হয়ে পাখা মেলে তার
নতুন বিস্ময় পানে। জীবনের সৌর দিগ্বলয়ে
আলোর পাপড়ি যত খুলে যায় তত অজানায়
দূরত্ব বাড়িয়ে চলে। চলি আমি অজ্ঞাত বিস্ময়ে
প্রিয়ার মঞ্জিল পানে আলো নিয়ে অশেষ চেতনায়।
পরিপূর্ণ-রূপে তাই তোমাকে যে হয় নাই জানা
তাতে মোর নাই ক্ষোভ, শুধু আমি আশা ক'রে আছি
যে মধু পিপাসু চিত্র একদিন মেলিয়াছে ডানা
তোমার রাত্রির স্বপ্নে ঠাঁই পাবে কভু সে মৌমাছি
জাগ্রত চেতনা আছে অথবা বিশ্রান্ত ঘুম ঘোরে
আত্মার স্মরণালোকে-প্রেমের প্রোজ্জ্বল স্মৃতি ডোরে।

ফররুখের প্রেমের কবিতায় 'প্রেম' যে একটি অনিবার্য সত্তা তা বলা হয়েছে। শাশ্বত 'প্রেম' যাকে বলে অর্থাৎ যে প্রেম লায়লী-মজনু, শিরি-ফরহাদের প্রতীকে প্রকাশিত হয়েছে। সেই প্রেমকে ফররুখ নিজের উপজীব্য করেছেন। এই প্রেমের কবিতাগুলোতে রিরিংসার রসাবেশ নেই এবং কোন বিশেষ প্রেমিকাও নেই। প্রেমকে কবি একটি অন্তরঙ্গ রসাবেশে পরিণত করেছেন। তাই একে বলা যায় প্রেম, শাশ্বত প্রেম। যার আদি নেই এবং অন্ত নেই। ফররুখ মৌলিকভাবে কখনও কোন রমণী বন্দনা করেননি কিন্তু প্রেমের রসাবেশ এনেছেন। এখানেই তার বিশিষ্টতা। ◻

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, অক্টোবর, ২০০১]

# ফররুখ আহমদের কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য

ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ

কবি ফররুখ আহমদের কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের বিস্তারিত অনুসন্ধান, বিবরণ ও মূল্য বিচার আমাদের এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এ প্রবন্ধে কবি ফররুখ আহমদের কবি-মানসের প্রকৃতি বিশ্লেষণে তাঁর সামগ্রিক কাব্য সাধনায় নয়, বরং সামান্য কয়েকটি উদ্ধৃতির মাধ্যমে তাঁর ঐতিহ্য-প্রীতি, ইতিহাস লালন এবং তামাদ্দুনিক ও তাহযীবী বিকাশ প্রয়াসের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশের চেষ্টা করব। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, কোন কবির শিল্পী-সত্তা বিশেষ করে ভাগ করা যায় না। কবি-সত্তা স্বয়ংসম্পূর্ণ, একক, নিরবচ্ছিন্ন ও অবিভাজ্য। আমরা আলোচনার সুবিধার্থে শিল্পীর সমগ্র প্রকাশকে নানা ভাগে বিভক্ত করে একেক দিকের আলোচনা করি। এভাবে নানা বিষয় সূক্ষ্ম ধারায় বিভাবিত হয়ে আমরা একটি মৌলসত্তা ও অভিন্ন শিল্প মূল্যায়নে পৌছতে পারি। ফররুখ আহমদ কবি। তাঁর কবিসত্তা অখণ্ড এককে বিভাজিত। তাই সামগ্রিকতার আংশিক মূল্যায়ন একদেশদর্শিতার পরিচায়ক ও বিশ্লেষণ সীমিত হতে বাধ্য।

ভাব ও বিষয়ভিত্তিক বিভাজনে ফররুখ কাব্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। তার মধ্যে সর্বপ্রথম যা চোখে পড়ে সেটি হল তাঁর ঐকান্তিক চিন্তা ও সহানুভূতি বিভিন্নভাবে তাঁর কাব্যে রূপায়িত হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়কে অবলম্বন করে তা উজ্জীবিত হয়েছে। ঐতিহ্য একটি জাতির সংস্কৃতি বিকাশে সহায়ক হয়। আর সে সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলিত রূপই তার সংস্কৃতিতে বিধৃত। এদেশে এ ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে ইসলামের শিক্ষা আদর্শ ঈমান আকিদাহ্ ও উত্তরাধিকারের সমন্বিত সংস্কার ও অনুশীলনে। ঈসায়ী উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে বাংলা ভাষা তার প্রাথমিক গতিবেগ হারিয়ে নির্জীব সংস্কৃত বহুল কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ হয়, বিশ শতকের গোড়া থেকেই এর প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। মুসলিম বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় আবার সেই আরবি ফারসি মিশ্রিত প্রাণের ভাষা প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় নিয়োজিত হয়। এ চেষ্টা ফলবতী হয় কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে। কবি ফররুখ আহমদ এ ধারারই অন্যতম বাহক ও ধারক। বস্তুত বলা যায়, কাজী নজরুল ইসলামের যেখানে সমাপ্তি ফররুখ আহমদের সেখানে শুরু।

বাংলা কাব্যে মুসলিম রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদের আবির্ভাব ঘটে কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য সাধনার যৌবনে। ১৯১৮ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান, নজরুলের কাব্য জগতে প্রবেশ এবং বাংলায় মুসলিম রেনেসাঁর উজ্জীবন। আর এ

সালেই ফররুখ আহমদের জন্ম। শৈশব পেরিয়ে নবীন আলোকে বিশ্বকে দেখার এবং আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মসচেতনতার বয়সে আসতে তাঁকে বহু চড়াই উৎরাই পার হয়ে আসতে হয়েছে। মুসলিম সমাজের চরম দুর্দশা তাঁকে পীড়িত করে। নবীন জীবনের আশা নিয়ে, নবযৌবনের প্রচণ্ডতা নিয়ে তিনি বাংলার মানুষকে দেখেন। দেখেন সমাজ ও সংস্কৃতিকে। ইংরেজ কবি শেলি যে দুঃখে বলেছেন, **I swear, I bleed,** সে দুঃখই ফররুখ আহমদকে পীড়িত করে, ক্লিষ্ট করে। তিনি আমাদের সমাজের স্বকীয় সত্তাকে সুদৃঢ় করার দৃঢ় প্রত্যয়ে বাংলা কাব্যাকাশে উদিত হন। তাঁর উচ্চারণে আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের তাহযীব তামাদ্দুন, আমাদের জীবনের সমুজ্জ্বল অধ্যায় অঙ্কুরিত হয়। তিনি নজরুল ইসলামের ধারায় এক নব বিপ্লবের চেতনায় সমৃদ্ধ জীবন সৃষ্টির স্বপ্ন দেখেন। নজরুল ইসলাম যেমন তীব্র তীক্ষ্ণ কষাঘাতে নিদ্রিত সিংহকে জাগ্রত করে তোলেন তেমনি ফররুখ তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সে সুপ্ত ক্ষমতাধর জাতিকে প্রাণের স্পন্দনে জাগিয়ে তোলেন। তিনি বাংলা কাব্যে মুসলিম জাতিকে এক বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন। অলস জড়তার বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী জেহাদী ভূমিকা পালনে অবতীর্ণ হয়। তিনি অন্যায়, শোষণ, লাঞ্ছনা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানান :

হাজার দ্বীপের বদ রুসমের উপরে লানত হানি
কিশ্‌তির মুখ ফিরায়েছি মোরা টানি।
নিজেকে আজ
জয় করে নিতে চালাও সাহসী কুচকাওয়াজ
মনের সকল দিগন্তে করো সমর সাজ
মাটির আকাশে মনের আকাশে গর্জে বাজ।

নজরুল ইসলাম প্রথম অবির্ভাবেই যে কাজটি করেছিলেন, তার সার্থক অনুসারী ফররুখ আহমদও সে ধারাকে সাফল্যের সাথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হন। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সারা জীবনের সাধনার পূর্ণ পরিপক্ব ফলটি নিয়েই আমাদের সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হন। এ দিক থেকে অন্যদের মত তাঁর কাব্য সাধনার শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের ক্রম বিবর্তন নেই। একেবারেই পূর্ণাঙ্গ সার্থক সৃষ্টি নিয়ে ঘটে তাঁর আবির্ভাব। আর ফররুখ আহমদ প্রায় তেমনি, মনে হয়, পূর্বসূরি নজরুলের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই সাফল্যের ফলটি, ভাবের অনুগ ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সার্থক সৃষ্টি নিয়েই এ আসরে অবতীর্ণ হন। সকল হীনম্মন্যতা, নীচতা, কূপমণ্ডুকতা, কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলে দিয়ে জাতিকে সত্য-সুন্দরের পথে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়চিত্ত হয়ে এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি চলার পথের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন :

এবার তোমার যাত্রা সে পথে
যেথা উমরের পায়ের দাগ,

জং ধরে যেথা পড়ে হায়
আলীর হাতের জুলফিকার।

ফররুখ আহমদ তাঁর কাব্যে সাগরের উদাত্ত হিন্দোল, লোনা দরিয়ার ডাক, সিন্দাবাদের নির্ভয় প্রত্যয়ের আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর আহ্বানে রয়েছে সকল সংশয় অতিক্রম করে দুর্বার গতিতে চলার উদ্দীপনা।

সংশয়, শংকা, ভয় -
সে কথা জানি না, মানি না সে কথা, দরিয়া ডেকেছে নীল
খুলি জাহাজের হালে উদ্দাম দিগন্ত ঝিলমিল,
জংগী জোয়ান দাঁড় ফেলে করি দরিয়ার পানি চাষ
আফতাব ঘোরে মাথার উপর মাহতাব ফেলে দাগ
তুফান ঝড়েতে তোলপাড় করে কিশতির পাটাতন
মোরা নির্ভীক সমুদ্র স্রোতে দাঁড় ফেলি বার মাস।'

কবি ফররুখ আহমদ বিদ্রোহী কবির ভাবশিষ্য বিপ্লবী কবি। আমাদের ঘরের ভাষায়, মুসলিমের নিজের ভাষায়, ইসলামের পরিভাষায় ফররুখের আত্মস্ফূর্তি ঘটেছে দুঃসাহসী প্রেরণায়। তাই দেখি সাত সাগরের মাঝি কবিতায় তিনি বাছাই করে শব্দ চয়ন করেছেন এবং শব্দ ধ্বনি তরঙ্গের মহিমায় অন্তর বিদ্ধ হয়েছে সতর্ক ও নিপুণ শিকারীর তীরের মতোই, তিনি বলেন :

'কাঁকর বিছান পথ
কত বাধা কত সমুদ্র পর্বত
মধ্য দিনের পিশাচের হামাগুড়ি
শকুনি ফেলেছে ছায়া আমাদের মাথার উপরে উড়ি,
ফেলেছি হারায়ে তৃণঘন বন, যত পুষ্পিত বন
তবু দেখা যায় দূরে বহু দূরে হেরার রাজ তোরণ।'

এ হেরার রাজ তোরণ মুসলিমের পথের দিশারী ধ্রুব নক্ষত্রসম। একথা কেউ কোন দিন শুনিয়েছে আমাদের? ভাবে ভাষায় ছন্দে ফররুখ তাঁর পূর্বসূরি মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামকে আত্মসাৎ করেছেন। আত্মস্থ করেছেন কীট্‌স, শেলি, বায়রন মায় মিল্টনকে। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন :

ওরে বিহঙ্গ, তবু বিহঙ্গ মোর
এখনি অন্ধ বন্ধ করো না পাখা।

তখন স্বভাবতই মনে পড়ে মহাকবি ইকবালের শাহীনের কথা, শেলির স্কাইলার্কের কথা। ফররুখের কল্পনায় সে বিহঙ্গ বা স্বর্ণ ঈগল রূপ পরিগ্রহ করেছে এভাবে :

'হে বিহঙ্গ এই জিঞ্জির প্রবল আঘাত হানো,
সাত আকাশের বিয়াবানে ফের উদার মুক্তি আনো,

এখানে থেক না পড়ে।

হে বিহঙ্গ! এ শুধু শ্রান্তি বুঝতে পারনা তুমি,
ক্ষণ বিস্মৃতি জাগায় সামনে বালিয়াড়ি মরুভূমি।
দেখেছো কেবল তৃষ্ণায় ভরা কালো রাত্রির বিষ
সূর্যোদয়ের পথে দেখো নাই মিঠে পানি; ওয়েসিস।'

এ দুঃখ রজনীর কি অবসান নেই? নেই কি প্রভাত সূর্যোদয়, প্রভাত পাখির গান? কবি বলেন:

'রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী?
শুধু গাফলতে, শুধু খেয়ালের ভুলে
দরিয়া অথৈ ভ্রান্তি নিয়াছি তুলে,
আমাদেরি ভুলে বালির কিনারে মুসাফির দল বসি
দেখেছে সভায় অস্ত গিয়াছে তাদের সেতারা, শশী;
মোদের খেলায় ধুলায় লুটায়ে পড়ি
কেঁদেছে তাদের দুর্ভাগ্যের বিস্বাদ শর্বরী।'

ফররুখ আহমদ তাঁর পূর্বসূরি, বিশেষ করে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামকে এবং ত্রিশের কবিদের অস্বীকার করেননি। বরং তাঁর কাব্য সাধনার বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁদের কাব্যধারা ও কাব্যরীতিকে অনুসরণ ও স্বীকরণ করে নিয়ে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা অর্জন করেছেন। জন্ম দিয়েছেন নতুন কাব্যরীতির। ফররুখ আহমদের কবিতায় বিষয়বস্তু, ছন্দ, আঙ্গিক ও রূপরীতির এবং উপমা উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্পের যে বৈচিত্র্যময় ব্যবহার, কবিতার ছন্দ, আঙ্গিক ও রূপরীতি নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তার মূলে কবির সৃজনী প্রতিভা এবং শিল্প সচেতনতা যেমন কাজ করেছে, তেমনি কাজ করেছে ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারবোধ এবং সমগ্র বাংলা কাব্যে ও ইউরোপীয় সাহিত্যের বিশেষ কাব্য সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয়। বিদ্রোহী কবি এবং বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্যের ও রেনেসাঁর অসামান্য রূপকার কাজী নজরুল ইসলামের মতই ফররুখ আহমদও ফারসি সাহিত্যের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারকে স্বীকরণের মাধ্যমে নিজের কাব্য-সাধনায় সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। ফররুখ আহমদের কবিতার বিষয়বস্তু, ভাষা, ছন্দ, আঙ্গিক ও রূপরীতি এবং উপমা উৎপ্রেক্ষা চিত্রকল্পের ব্যবহারে পূর্বসূরি কবিদের বিশেষত মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখের যে প্রভাব লক্ষণীয় তা ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকে গ্রহণ এবং স্বীকরণেরই ফল। কবিতায় ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের রূপায়ণে এবং মানবতাবাদের উজ্জীবনে তিনি নজরুলের এবং মহাকবি আল্লামা ইকবালের কাব্যধারা থেকে প্রেরণা লাভ করেছেন, অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহারে এবং নাট্যকাব্য ও মহাকাব্য রচনায় ও ক্লাসিক ভাষারীতির প্রয়োগে আদর্শের আদল পেয়েছেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্যধারা থেকে, এবং রোমান্টিক স্বপ্ন-

কল্পনা ও সৌন্দর্যবোধের উৎসারণে আর গীতিকাব্য রচনায় তিনি আদর্শের আদল পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ দাশের কাব্যধারা থেকে।

কবি ফররুখ আহমদ আমাদের ঐতিহ্যিক জীবনের পথ দেখিয়েছেন। তিনি সবল জাগরণী বাণী শুনিয়েছেন। তওহীদের পথে, পারত্রিক জীবনের অনুশীলনীতে, অধ্যাত্ম্য সাধনায় উৎসাহিত করেছেন। তিনি নিজের তাসাওফ অনুসরণ করেছেন, মুরাকাবা, মুশাহাদা করেছেন। ফলে তাঁর কাব্যের বহু স্থানে তাসাওফের শিখা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে। তিনি 'সিরাজাম মুনীরা', শীর্ষক কবিতায় মহানবী (সাঃ)-এর পথ ধরে যুগে যুগে যারা এগিয়ে চলেছেন, তাঁদের বিবরণ দিয়েছেন এভাবে :

'চলেছে ধ্যানের জ্ঞান-শিখা বয়ে জিলানী বীর, চিশতী বীর
রঙিন করি মারি সূরাহী নক্শাবন্দের নয়ন নীর,
জ্ঞানের প্রেমের নিশান তুলেছে হাজার সালের মুজাদ্দিদ
রায় বেরেলীর জঙ্গী দিলীর ভেঙেছে লক্ষ রাতের নিঁদ
ওরা গেছে বহি তোমার নিশান রেখে গেছে পথে সেই নিশানি।
তবু সে চলার শেষ নাই আর, কোনদিন শেষ হবে না জানি।
লাখো শামাদান জ্বলে অফুরান রাত্রি তোমার রশ্মি স্মরি
সে আলো বিভায় মুখ তুলে চায় প্রাণ পিপাসায় এ শর্বরী।

তিনি চার খলীফা ও পীরানে পীরদের জীবনালেখ্য তুলে ধরেছেন, আহ্বান জানিয়েছেন জিহাদে আকবরের। ষড়রিপু দমন করে আত্মাকে শক্তিশালী করার, খুদীকে বুলন্দ করার আহ্বান জানিয়েছেন। যেমন ইকবাল বলেছেন :

'খুদীকো কার্ বুলন্দ এত্না কে/হর তকদীর সে পহলে
খোদা খোদ বান্দাসে পুছ্‌ছে/বাতা তেরে রেজা কিয়া হ্যায়।'

তেমনি ফররুখ আহমদ বলেছেন :

পাশবিকতার ললাটে তীব্র তীর উদ্যত করো/এই সংগ্রাম-জিহাদ বৃহত্তরো
প্রগাঢ় রক্ত পাপড়ি খোলার মত/একটি নিমেষ দাও অন্তত।

ফররুখের কবি-কর্মে বিধৃত হয়েছে হাতেম তাঈ, নওফেল, পাঞ্জেরী, হারুনুর রশীদ, সুলেমান নবীর শিকলে বন্দী বিশাল জীন, এসেছে দরিয়ার তুফান, মরু সাইমুম, কালো আকীক, নিকষ দরিয়া, বিয়াবান মরু, পোখরাজ, ইয়াকুত, এমনি অসংখ্য রূপক, উপমা ও প্রতীক। ফররুখ আমাদের জীবন-সত্তাকে জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে তাঁর কাব্য-শিল্পে যে অবদান রেখে গেছেন তা আমাদের হৃদয়ে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। প্রাচীনকে কেন্দ্র করে নতুনের ইতিহাস সৃষ্টি হবে। প্রাচীনের উপর বর্তমান প্রতিষ্ঠিত হবে বর্তমান অভিনব রূপে নির্মাণ করবে ভবিষ্যৎকে।

ফররুখ আহমদের কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়ণ কাব্যমূল্যের মর্যাদায় উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রতিভার যে বিশিষ্ট চেতনা ও প্রক্রিয়ায় বাংলা কাব্যে এ অভিনব শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে, তার মর্মবাণী সর্বদাই আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ।

কাব্যের বহিরঙ্গে ফররুখের কৃতিত্ব আরবি ফারসি শব্দের অবাধ ও অকুণ্ঠ সংযোজনার। এগুলোর ভাবানুষঙ্গ মুসলিম ঐতিহ্যের স্মৃতি বিজড়িত, তার অনেকটাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক সম্পদ থেকে আহরণ করা হয়েছে, আর বাকিটা সংগ্রহ করা হয়েছে ইসলামী সাহিত্য, ইতিহাস ও প্রাক আধুনিক যুগের পুঁথি সাহিত্য থেকে। কবির লক্ষ্য হলো আলংকারিকের সে বিখ্যাত বাণী **The best words in the best order** অর্থাৎ শব্দের যথাযথ প্রয়োগ, লালিত্য সৃষ্টি ও কাঙ্ক্ষিত ব্যঞ্জনায় পাঠকের চিত্ত জয় করা। শব্দের অবিশ্বাস্য বিস্ময়কর ধ্বনিগত ব্যঞ্জনা বহু ক্ষেত্রে অর্থনিরপেক্ষ মোহবিস্তারে সমর্থ হয়েছে। এ সম্পর্কে সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের একটি মন্তব্য প্রাসঙ্গিক মূল্যায়নে যথাযথ মনে করি। তিনি কবি নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে যা বলেছেন, ফররুখ আহমদ সম্বন্ধেও তা প্রযোজ্য। তিনি বলেছেন : ছন্দকে রক্ষা করে তার মধ্যে একটি অবলীলা, স্বাধীন, স্ফূর্তি, অবাধ আবেগ, কবিতাকে কোথাও হারিয়ে ফেলেননি; ছন্দ যেন ভাবের দাসত্ব করছে। কোনখানে অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করেনি। এ প্রকৃত কবি শক্তিই পাঠককে মুগ্ধ করে। কবিতা আবৃত্তি করলেই বোঝা যায় যে, শব্দ ও অর্থগত ভাবের সুর কোনখানে ছন্দের বাঁধনে ব্যাহত হয়নি। বিস্ময়, ভয়, ভক্তি, সাহস অটল বিশ্বাস এবং সর্বোপরি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি ভীষণ গম্ভীর অতিপ্রাকৃত কল্পনার সুর, শব্দ বিন্যাস ও ছন্দ ঝংকার মূর্তি ধরে ফুটে উঠেছে। দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে :

'ঘন সন্দল কাফুরের বনে ঘোরে এ দিল বেহুঁশ
হাতির দাঁতের সাঁজোয়া পরেছে শিলাদৃঢ় আবলুস,
পিপুল বনের ঝাঁঝালো হাওয়ায় চোখে যেন ঘুম নামে,
নামে নির্ভীক সিন্ধু ঈগল দারিয়ার হাম্মামে।'

এ পঙ্‌ক্তিগুলোতে ভাবানুযায়ী শব্দ বিন্যাস, অন্ত্যমিল ও গভীর গম্ভীর ধ্বনি ছন্দের অধীন হয়ে এবং চমৎকার ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে এক অভিনব রূপ লাভ করেছে।

ফররুখের ঐতিহ্য-প্রীতি সামান্য ঋদ্ধ মানসের অতীতের প্রতি অন্ধ মোহের সঙ্গে তুলনীয় নয়। কবি অতীতকে স্মরণ করেছেন বর্তমানকে নির্মাণ করার উদ্দেশ্যে হাতিয়ার রূপে। তাঁর দৃষ্টিতে ইতিহাস চির জীবন্ত। ইতিহাসের বিবর্তন আছে, মৃত্যু নেই। যুগে যুগে সে নব নব আবর্ত সৃষ্টি করে চলেছে। মুহররম মাসে বা শহীদে কারবালা রচনা করতে গিয়ে তার উদ্‌গত অশ্রু গড়িয়ে পড়েছে সমকালীন মানুষের তৃষ্ণাতপ্ত জীবনের উপর। সিরাজাম মুনীরা, আবু বকর সিদ্দিক, উমর দরাজ দিল, ওসমান গনি, আলী হায়দার কিংবা গাওসুল আজম, সুলতানুল হিন্দ, মুজাদ্দিদ আলফে সানী প্রমুখের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে স্বদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কথাই স্মরণ করেছেন। বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়ণ দুটি কাব্যসূত্র ফররুখ আহমদের সাফল্যের মূলে ক্রিয়াশীল। প্রথমত বাংলা হোক, আরবি, ফারসি বা উর্দু

হোক শব্দের ধ্বনিগত ব্যবহারে তিনি ছিলেন অসাধারণ কুশলী শিল্পী। দ্বিতীয়ত তাঁর ঐতিহ্যবোধ জীবন-সম্পৃক্ত। অতীতকে তিনি নকল করেন নি, ইতিহাসকে তিনি কেবল বিবৃত করেন নি, ঐতিহ্যকে আউড়ে যাননি, তাকে নবরূপ দান করেছেন। বর্তমানের সঙ্গে তার সেতুবন্ধন ঘটিয়েছেন, অনাগত দিনের স্বপ্ন সম্ভাবনায় তাকে ঐশ্বর্যশালী করেছেন।

বাংলা কাব্যকুঞ্জের বহু প্রতিভাবান কবি দীর্ঘকাল ধরে রূপকল্প সৃষ্টির এক ঐশ্বর্যদীপ্ত ঐতিহ্য গড়ে তুলেছেন। ফররুখ আহমদ তাঁর পূর্বসূরিদের অবদান স্বীকার করেও রূপকল্প নির্মাণে তাঁর স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন। তিনি তীক্ষ্ণ টানের সরল রেখায় সুন্দর সুন্দর রূপকল্প সৃষ্টিতে অসাধারণ সৌন্দর্য দেখিয়েছেন। দেখুন ঃ

বুরাইর সাথে পেয়েছি ভালাই অফুরান জিন্দিগী
আবলুস ঘন আঁধারে পেখম খুলেছে রাতের শিল্পী।

কিংবা :

তুফানের ছাঁচে ঘূর্ণাবর্তে সুগঠিত তার তনু,
পুষ্ট পালকে পিছলিয়া পড়ে প্রবাল বর্ণ ধেনু।

অন্যত্র,

দেখ আসমানে ফোটে সেতারার কলি,
আরশির মত নিটোল পানিতে মুখ দেখে বকাগুলি।

ফররুখ আহমদের কবিতার স্থানে স্থানে যে অপূর্ব বর্ণালি ও শাণিত রূপচ্ছটা রয়েছে, তার কিছু পরিচয় এসব উদ্ধৃতিতে ধরা পড়েছে।

মহাকবি ইকবাল বলেছেন : আমাদের অধিকাংশ কাব্যই মৃত্যুর বন্দনা গীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। ওহে বন্ধু, যদি তোমার তহবিলে কাব্যের উপমা থেকে থাকে, তবে মৃত্যুহীন জীবনের পরশ-পাথরে তা ছুঁইয়ে নাও। প্রবল বজ্রবর্ষণের পূর্বে যেমন বিদ্যুৎ চমক, তেমনি পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিধারাই কর্মপথের সন্ধানী দূত। একথা সত্য যে, রাতের গভীরতম অন্ধকার অংশই অদূরাগত সুবহে সাদেকের নকীব এবং এ সময়েই মুআয্যিনের কণ্ঠস্বরে ঊষার আযানের তকবীর ধ্বনি ঘোষণার প্রয়োজন সবচাইতে বেশি। ফররুখ আহমদের কাব্য সে ঊষার আযানের তকবীর ধ্বনি ঘোষণার মত। ফররুখ আহমদের কাব্যে সে ঊষার আযানের কল্যাণের সুর, সঞ্জীবনী স্পর্শ আর বজ্রগর্ভ জ্যোতিজ্বালা আছে। তার সুর ধ্বনিতে 'নার' ও 'নূর'-এর সম্মেলন ঘটেছে। ◻

---

**[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর, ২০০০]**

# ফররুখ আহমদ ঃ এক নিঃসঙ্গ ডাহুক

**আবদুর রশীদ খান**

মধ্যাহ্নে মরু-সূর্যের প্রচণ্ড ভ্রুকুটি তপ্ত বালির উপর শায়িত নগ্নপিষ্ঠ এক যুবক। বুকে তাঁর বিরাট পাথর চাপা। তাঁর মুখে 'আহাদ' 'আহাদ' শব্দ অস্পষ্ট ধ্বনি তুলছে– অথচ এ কথা না বলার জন্যেই তাঁকে এ শাস্তি দেয়া হচ্ছে। কবি ফররুখ আহমদের শেষ দিনগুলোর কথা মনে পড়লে অলক্ষ্যে আমার চোখে ভেসে ওঠে উপরে বর্ণিত দৃশ্যটি। আসলে বড় দায়িত্ব পালন করতে গেলে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। কথায় এবং কাজে এক হতে হলে 'অবাস্তব', "অপরিণামদর্শী' ইত্যাদি নানা বিশেষণে বিভূষিত হতে হয় এবং তাই হয়েছে এক নিঃসঙ্গ ডাহুক কবি ফররুখ আহমদের ক্ষেত্রে।

কলকাতা থেকে ঢাকায় আসার পর পরই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। 'নতুন কবিতা'[১] কাব্য সংকলন বের করবার পরিকল্পনা নিয়ে আলাপের মাধ্যমেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় গাঢ়তর হয়। ফররুখ আহমদ তরুণ লেখকদের উৎসাহ দিতেন, উদ্বুদ্ধ করতেন–এটা সর্বজন স্বীকৃত। তিনি স্নেহ করতেন, শাসন করতেন এবং তরুণদের লেখায় সামান্যতম স্ফুলিঙ্গের সন্ধান পেলেই বুকে জড়িয়ে ধরে লেখার প্রেরণা যোগাতেন। এ উদারতা তখনকার অনেক প্রবীণের মধ্যেই দুষ্প্রাপ্য ছিল– 'নতুন কবিতা' সংকলন বের করতে গিয়ে তা প্রকট হয়ে ধরা দেয়। সত্যি বলতে কি, ফররুখ আহমদের অকপট উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা না পেলে 'নতুন কবিতা' বের হতে আরো কত দেরী হতো কে জানে। কবি ফররুখ আহমদের উৎসাহেই 'মহুয়া' পালা গানকে আমি সনেট সিকোয়েন্সে রূপদান করেছি এবং অনুবাদে হাত দিয়ে কবি ইকবালের 'সবূর-ই-আজম' কাব্যের বাংলা রূপান্তরের চেষ্টা করেছি। ব্যক্তিগত এসব কথা প্রায় সব কবি-লেখকের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। সূর্যের প্রোজ্জ্বল রশ্মি সব কচি গাছকেই সতেজ ও প্রাণরসে উজ্জীবিত হতে প্রেরণা যুগিয়েছে। ফররুখ আহমদের সেই ঋণ আজ আমরা স্বীকার করি বা না করি, প্রত্যেকের অন্তরই তার সাক্ষী। বিবেক কখনো প্রতারিত করে না কিংবা ভুল সাক্ষ্য দেয় না।

কবি ফররুখ আহমদের আতিথেয়তা প্রায় কিংবদন্তির মতো। মাস শেষে রেডিওর রেস্তোরাঁর বকেয়া শোধ করতে তাঁর বেতনের বৃহদাংশ চলে যেতো– এর বেশীর ভাগই মেহমানদারীর খেসারত। তাঁর বাড়ীতে গিয়ে কেউ কোনদিন মুখে কিছু না দিয়ে ফিরেছে

১. কবি ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী ও কবি আব্দুর রশীদ খানের যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম কবিতা সংকলন।– সম্পাদক

বলে শোনা যায়নি। অন্তত: আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় তেমনটা স্মরণে আসছে না। অথচ আদর্শের ক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের বেলায়ও নির্মম ও কঠোর ছিলেন।

এখানে আপোষের কোন প্রশ্নকেই তিনি প্রশ্রয় দেয়া তো দূরে থাক, ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতেন। তাঁর জীবনের এই দিকটার সম্যক পরিচয় পেয়েছিলেন পাকিস্তানের তৎকালীন ডাকসাইটে প্রেসিডেন্ট ফিল্ডমার্শাল মোহাম্মদ আইউব খান ও তৎকালীন কেন্দ্রীয় তথ্য সচিব তথা রেডিওর সর্বোচ্চ কর্মকর্তা বোখারী সাহেবও। আর নবীন-প্রবীণ সব লেখক-শিল্পী তো তাঁর শাণিত কষাঘাতে জর্জরিত হবার ভয়ে তটস্থ থাকতেন। অথচ সবার জন্য ছিলো তাঁর প্রসারিত বুক।

ফররুখ আহমদের বিশ্বাস ছিলো অকৃত্রিম, হৃদয়ের গভীরতম কন্দর থেকে উৎসারিত স্বতঃস্ফূর্ত জেকেরের মতো। তাঁকে যারা সহ্য করতে পারতেন না তারাও স্বীকার করতেন ফররুখ মুনাফেকী কাকে বলে জানতেন না। প্রথম যৌবনে বামপন্থী আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট, পরে মানবতাবাদী চিন্তাধারায় আপ্লুত ইংরেজী সাহিত্যের তুখোড় ছাত্র ফররুখ আহমদ নিজের নামের 'সৈয়দ' উপাধি বাদ দিয়েছিলেন আভিজাত্য ও কৌলন্যকে পরিত্যাগের জন্য। ইসলামের পুনর্জাগরণেই তাঁর বিশ্বাস অবশেষে পূর্ণ আস্থায় নোঙর ফেলেছিল। সারা জীবন তিনি সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করেছেন ব্যক্তিগত আচার-আচরণে, আনুষ্ঠানিকতায় ও কবি-কর্মে। তাই তাঁর কাব্যে একদিকে 'লাশে'র মতো মানবতাবাদী কবিতা ও অন্যদিকে 'সাত সাগরের মাঝি'র নয়া অন্বেষা। তাঁর আশা ও স্বপ্ন ছিল হেরার রাজতোরণ।

তাই বিশ্বাসের অকৃত্রিমতায় ও হৃদয়ের বলিষ্ঠতায় তিনি ছিলেন অন্যতম সেরা মানুষ। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্যের কাছে অন্যদের অনেক বেশী ম্লান ও মেকি মনে হতো। আমাদের কাছে তিনি ছিলেন মানবিক মর্যাদাবোধের মূর্ত প্রতীক। এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে হাত পাততে তিনি ঘৃণাবোধ করতেন। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন রিজিকের মালিক আল্লাহ– একথা বহুবার তিনি তাঁর ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে শুনিয়ে দিয়ে নিজের বিশ্বাসে অটল থেকেছেন। এই ধরনের চরিত্রের মানুষ নিঃসঙ্গ–ন্যায়ের পথে এক নির্ভীক সৈনিক। পার্থিব সুখ-দুঃখের তাড়নায় যেখানে সবাই আপোষকামী সেখানে তাঁকে সংগ দেবার ক্ষমতা কতোটুকু ! একটা নির্দিষ্ট সীমারেখার পর তিনি হিমালয়ের মতো একাই তাঁর মাথা উঁচু করে আমাদের সকল সাধারণের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে এক তুলনাহীন নজীর সৃষ্টি করেছিলেন।

তাঁর কাব্য সম্পর্কে অনেকেই বলেছেন, লিখেছেন। তাঁর মূল্যায়ন এখনো যে পুরোপুরি হয়েছে তা বলা যায় না। তৎসম শব্দের প্রতি গভীর আগ্রহী মাইকেলের গভীর অনুরাগী, প্রবহমান বিলম্বিত পয়ারের প্রতি পক্ষপাতী ফররুখ আহমদ কাব্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পথিকৃতের কাজ করে গেছেন। কি শব্দ চয়নে, কি উপমায়, উৎপ্রেক্ষায়, কি ছন্দ-ব্যঞ্জনায় তিনি আমাদের সামনে অতুলনীয় উদাহরণ রেখে গেছেন। নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রতি তাঁর ছিল গভীর আগ্রহ এবং অন্যদেরও এদিকে তিনি সব সময় উদ্বুদ্ধ করতেন। 'সাত সাগরের মাঝি' ও অন্যান্য গ্রন্থ ছাড়াও কাব্য-নাট্য,

সনেট-গুচ্ছ, 'হাতেম তা'য়ী' নামক মহাকব্যের আঙ্গিকে রচিত পুঁথি-সাহিত্যভিত্তিক বিরাট কাব্যগ্রন্থ, 'সিরাজাম মুনীরা', 'পাখির বাসা', শিশুতোষমূলক অন্যান্য কাব্য ও অসংখ্য ব্যঙ্গ কবিতা ইত্যাদি রচনায় নানা বিষয় নানা আঙ্গিকে তিনি নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। ঐতিহ্য-চেতনা ও বিষয়-বৈচিত্র্যে তিনি একক ও অনন্য। যেমন নিজের জীবনে, তেমনি কাব্য রচনার ক্ষেত্রেও তিনি স্বকীয়তায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বাংলা কাব্যে তার বৈশিষ্ট্যের পূর্বসূরি নেই এবং উত্তরসূরি হবার মতন যে সাধনা ও চারিত্র্যের প্রয়োজন আজকের অবক্ষয়ের দারুণ দুর্দিনে তার দেখা মেলা ভার। তাঁর লক্ষ্য ছিল ইনসানে কামেল বা পূর্ণ মানবতার আদর্শ প্রতিষ্ঠা। তাই তাঁর বিভিন্ন অনন্য-সাধারণ অনুবাদ কর্মে ও লেখায় এই পূর্ণ মানবের প্রত্যাশাই তিনি করেছেন এবং জীবনের প্রতিক্ষেত্রে মানবতার জয়গান গেয়েছেন। কিন্তু সব কিছু ঊর্ধ্বে তিনি কবি– মহান কবি– জাতীয় জাগরণের কবি, রেনেসাঁর অবিসংবাদী কবি-ব্যক্তিত্ব।

কবি ও রাজনীতিকের সমাজ-সংস্কারের ধ্যান-ধারণা এক নয়। লক্ষ্য এক হলেও উপলক্ষ ও আঙ্গিক ভিন্ন। সামাজিক অবিচার, অনাচার, মুনাফেকী কবি ফররুখ আহমদকে ভীষণভাবে বিচলিত করতো। তাই তিনি ব্যঙ্গ কবিতার শানিত কষাঘাতে অন্যায়ের প্রতিকার ও প্রতিরোধের চেষ্টা করে গেছেন। এতে তাঁর নিজস্ব পরিমণ্ডলেই তাঁর বিরোধিতার অপচেষ্টা চলতে থাকে– যদিও সম্মুখে সবাই ছিলেন তাঁর প্রিয় সহৃদ ও একান্ত বশংবদ। তাঁর শেষ জীবনের নিদারুণ দুঃখ-গ্লানির জন্য এইসব ছদ্মবেশী সহৃদগণই সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন। আজ তিনি সব কিছুর ঊর্ধ্বে; তাঁর কাব্যই আমাদের জন্য তাঁর মহান ফসল ও উত্তরাধিকার।

উত্তারাধিকার প্রসঙ্গে একটা কথা এসে যায়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 'ব্যক্তি ও কবি ফররুখ আহমদ' শীর্ষক ৭০০ পৃষ্ঠার বিরাট প্রশস্তিমূলক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তাতে জীবিত ও মৃত বহুলেখক ব্যক্তিগত সম্পর্কের আলোকে ফররুখ আহমদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। হৃদ্যতার, অন্তরঙ্গতার, বন্ধুত্বের সম্পর্কের দাবী করেছেন তাঁরা এবং এই দাবী যথার্থ ও সত্যনিষ্ঠ। কিন্তু আমি শুধু একটা কষ্টি পাথরে এই দাবী যাচাই করার অনুরোধ জানাবো। আমরা আমাদের লেখায় বলেছি ঃ ফররুখ আহমদ স্ববিরোধহীন, আপোষহীন, অনমনীয়, ন্যায়ের প্রতি অবিচল, অপরাজেয়, আদর্শবান, বিশ্বাসী এক সেরা মানুষ ও সেরা কবি ছিলেন। একই নিঃশ্বাসে আমরা তাঁর সঙ্গে সহৃদ্যতার, অন্তরঙ্গতার সম্পর্কেরও দাবীদার। পথ চলতে আমরা তাঁর সঙ্গে কতদূর পর্যন্ত সহযাত্রী ছিলাম বা আছি ? কি বিশ্বাসে, কি আদর্শে, কি চৈতন্যে। যদি আমাদের কথার সাথে সত্যের কিছুটা সম্পর্কও থাকে, তাহলে বলতে হয়, তিনি কেন ছিলেন এক নিঃসঙ্গ ডাহুক !

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ত্রয়োদশ সংখ্যা, জুন-২০০৬]

# দুঃসময়ের দিশারী : কবি ফররুখ আহমদ

আবদুর রশীদ খান

আমার ধারণায়, দুটো সময়ই প্রায় অভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। একটি 'অন্ধকার' বিশেষণে বিশেষিত, অন্যটি ১৪০০ বছর পরে বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমাদের বিজ্ঞানময় 'আধুনিক যুগ'। হত্যা, নারী-নির্যাতন, লুণ্ঠন, সন্ত্রাস, অপরাধবোধ-হীনতা অবিকল প্রায় অভিন্নরূপে বিরাজমান। গোত্রে গোত্রে হানাহানির স্থান নিয়েছে এখন সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কোন্দল, সন্ত্রাস ও হানাহানি। এমনি এক অরাজক অন্ধকার পরিবেশে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব এসেছিলেন আলোর দিশারী হয়ে সত্য ও ন্যায়ের চিরন্তন বাণী নিয়ে, যার ফলে তাঁর জীবনকালেই অন্ধকারাচ্ছন্ন, বহুধাবিভক্ত জাতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ, ঐক্যবদ্ধ ও সম্মানিত জাতির গৌরব লাভ করেছিল। সত্য পথ প্রদর্শনের জন্য সে মহামানবের অমীয় বাণী ও পবিত্র কোরআন শরীফ এখনো বিদ্যমান রয়েছে। তবু কেন এ অন্ধকার ? নবী আর আসবেন না, কিন্তু তাঁর বাণীর আলোক-বর্তিকা হাতে যুগে যুগে এসেছেন এবং আসবেন কতো সাধক, প্রচারক আর বিপ্লবী। আসবেন মুযাদ্দেদ, তাঁরাই আমাদের দুঃসময়ের সাথী।

কবি ফররুখ আহমদের স্মরণে তাঁকে আমার মনে হয়েছে দুঃসময়ের সাথী আর দিশারীরূপে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে তো বটেই, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন সত্যিকারের দুঃসময়ের দিশারী। চল্লিশের দশকেই ফররুখ আহমদ শক্তিমান ও খ্যাতিমান ব্যতিক্রমধর্মী কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। ১৯৪৩ সনে বৃটিশ-সৃষ্ট বাংলার দুর্ভিক্ষের মর্মন্তুদ হাহাকার তাঁর বিখ্যাত 'লাশ', 'আউলাদ' প্রভৃতি কবিতায় চিরন্তন হয়ে রয়েছে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের দুর্ভিক্ষের রেখাচিত্র তাঁর সঙ্গে যোগ হয়ে বিশ্ববিবেককে তখন নাড়া দিয়েছিল। জড়-সভ্যতাকে অভিশম্পাত দিয়ে কবি দুঃসময়ে আমাদের প্রাণের মানুষে পরিণত হয়েছিলেন, হয়ে উঠেছিলেন একান্ত আপনজন।

উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ১৯০ বছরের ইতিহাসে এদেশের বহু বরেণ্য সন্তান তাঁদের অম্লান অবদান রেখে গেছেন। ভারত-বিভাগের প্রাক্কালে দুর্যোগের ঘনঘটায় ফররুখ আহমদ দেখা দিলেন দুঃসময়ের দিশারীরূপে। তাঁর এ সময়কার লেখা প্রায় সব কবিতাই বাংলার মানুষের বুকে বিরাট উন্মাদনা ও প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল। অন্য সকলকে উতরিয়ে তাঁর দীর্ঘদেহী অবয়ব আর সৃষ্টিকর্ম হয়ে উঠল মুসলিম নবজাগরণের উৎস। তিনি হলেন দুঃসময়ের দিশারী।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে রাষ্ট্রভাষা বাংলার সপক্ষে তাঁর অবস্থান ছিল সুদৃঢ় ও আপোষহীন। ঐ সময় যাঁরা আরবি অক্ষরে বাংলা লেখার সপক্ষে ওকালতি

করেছিলেন, তাঁদের জন্য জমা ছিল তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শানিত কষাঘাত। বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর গভীর মমতা তাঁর বিভিন্ন কবিতা, সনেট ও প্রবন্ধে বিধৃত রয়েছে।

কবি ফররুখ আহমদের কর্মে ও বিশ্বাসে কোন বৈপরীত্য ছিল না। তাঁর লেখায় ছিল তাঁর বিশ্বাসেরই প্রতিফলন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সম্পর্কে প্রবীণ, সমসাময়িক ও নবীন যেসব শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি ও গুণীজন মন্তব্য করেছেন তাঁর কথায় ও কাজে তাঁরা কোন বৈপরীত্যের উল্লেখ করতে সমর্থ হননি। বরং জীবিতকালে মতাদর্শের কারণে যাঁরা তাঁর বিপক্ষে কাজ করেছেন, তাঁরাও একবাক্যে স্বীকার করেছেন, আদর্শের ক্ষেত্রে আপোষহীন হলেও তিনি ব্যক্তি মানুষের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি ছিলেন বিগলিতপ্রাণ। মত ও পথের বিভিন্নতার কারণে যেসব কবি-সাহিত্যিকের প্রতি তাঁর বিরূপ মনোভাব আমি লক্ষ্য করেছি, তাঁদের কোন ভাল লেখা বা কবিতা পড়লেই তিনি আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠতেন এবং তাঁদের দেখা পেলেই লেখাটির ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁদের উৎসাহ প্রদান করতেন। তিনি যে বিরাট প্রাণের অধিকারী ছিলেন, তাঁর প্রতিটি কাজেই তিনি তাঁর প্রমাণ রেখে গেছেন।

খোলাফায়ে রাশেদার আদর্শ তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিফলনের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল ছিলেন। তখনকার তথাকথিত প্রগতিবাদীরা তাঁদের সুবিধাবাদী সামাজিক মূল্যবোধের জন্য কবির করুণার পাত্র হয়েছিলেন।

তখনকার শাসকগোষ্ঠীর কথা ও কাজে অসংগতি ও চারিত্রিক বৈপরীত্য তাঁর বিভিন্ন ব্যঙ্গ কবিতার নির্মম কষাঘাতে অক্ষমের রোষবহ্নির সৃষ্টি করতো। জীবনের শেষ দিকে তিনি তাঁর জীবন দিয়ে সেই রোষবহ্নির জ্বালা জুড়াতে পেরেছিলেন। আমার কেবলই সক্রেটিসের কথা মনে পড়ে, হাবশী গোলাম হযরত বেলাল (রাঃ)-এর চারিত্রিক দৃঢ়তার দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কবি তাঁর বিশ্বাসের জন্য, আদর্শের জন্য চরম মূল্য দিলেও সেজন্য তিনি কোন অনুশোচনা করেননি। আদর্শগত কারণে রেডিওর চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলেও, সরকারি ফ্লাট ছেড়ে দেয়ার নোটিশ পাওয়ার সত্ত্বেও এবং বড় মেয়ের বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু, টাকার অভাবে মেডিকেলে অধ্যয়নরত মেধাবী বড় ছেলের পড়া বন্ধ হয়ে গেলেও নিজের জীবনের উপর রাজনৈতিক ঝড়ের প্রচণ্ড তাণ্ডবের ফলে যন্ত্রণাকাতর অসুস্থ কবি করুণার দান প্রত্যাখ্যান করেছেন। অথচ চিকিৎসা ও পথ্যের অভাবে তিনি তখন তিলে তিলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছিলেন।

'তোরা চাসনে কিছু কারো কাছে, খোদার মদদ ছাড়া'– তাঁর লেখা এ কবিতার প্রতিপাদ্য কেবল তাঁর কবিতার ক্ষেত্রেই নয়, তাঁর নিজের জীবনেও তিনি সে দৃঢ় প্রত্যয়ে ছিলেন চির অবিচল। নিজের জীবন দিয়ে তিনি তা প্রমাণ করে গেছেন। ◻

---

**[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ত্রয়োদশ সংখ্যা, জুন-২০০৬]**

# কবি ফররুখ আহমদ

## ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী

॥ ১ ॥

কবি ফররুখ যশোরের মাঝ আইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন যার অনতি দূরেই ডা. লুৎফর রহমানের পৈতৃক নিবাস হাজীপুর, জন্মস্থান পার নান্দুয়ালী মাতুলালয়ও খুব একটা দূরে নয়। বহু দিনের ইচ্ছা আমার প্রিয় ফররুখ আহমদের জন্মস্থানটি মধুমতি দেখতে যাবো। সেবারে এক অনুষ্ঠানে ঝিনাইদহ যেতে মাগুরা বাজার ও সেতু পার হয়ে পূর্ব দিকে সামান্য দূরে মাঝআইল গ্রামে যাবার সুযোগ হলো। মধুমতি নদী তখন শীর্ণ। গ্রামে তাঁর স্মরণে তখনও কিছু করা হয়েছে বলে মনে হলো না। তবে ওখানকারই এক ভক্ত স্কুল শিক্ষক বললেন- তাঁরা করবেন অন্তত একটি স্মৃতি পাঠাগার এবং তাঁর নামে স্কুল-কলেজ।

ছাত্রজীবনে পাগলের মত পড়েছি তার প্রকাশিত কবিতা, গ্রন্থ– সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪), সিরাজাম মুনীরা (১৯৫২), নৌফেল ও হাতেম (১৯৬১), হাতেম তায়ী (১৯৬৬), হে বন্য স্বপ্নেরা (১৯৭৬); শিশু সাহিত্য- পাখীর বাসা (১৯৬৫), নতুন লেখা (১৯৬৯), হরফের ছড়া (১৯৭০), ছড়ার আসর (১৯৭০) ইত্যাদি। তিনি সেই যুগেই সাহিত্যে অনন্য অবদানের জন্য প্রেসিডেন্ট পুরস্কার, আদমজি, ইউনেস্কো, একুশে পদক (মরণোত্তর) পান। আমি আত্মতৃপ্তি লাভ করি যে, ফররুখ রচনাবলি আমার কার্যকালে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশের ব্যবস্থা করতে পেরেছিলাম।

॥ ২ ॥

"ফররুখ আহমদ সেই কবি যাঁকে... (আমরা) বাংলাদেশের কাব্যজগতে শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে চিহ্নিত করতে প্রস্তুত। ... কবিতায় আরবি ফারসি শব্দ ব্যবহারে মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইসলাম যতখানি সার্থক, ফররুখ আহমদ কোন অংশে কম নয়। ... দু'হাতে কবিতা লিখেছেন, সনেট, ছড়া, গান... উচ্চারিত হয়েছে সাহিত্য মহলে। কেউ কেউ গবেষণা করে বিরাট ভল্যুম-এর গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। ...ফররুখ আহমদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁর কবিসত্তা ক্ষুদ্রতার গণ্ডিতে, সংকীর্ণতার পঙ্কিল আবর্তে আবদ্ধ হয়ে থাকেনি... ইসলামী রেনেসাঁর বলিষ্ঠ প্রবক্তা হলেও তিনি বিশ্বজনীন মানবতার বাণীকেই করেছিলেন তাঁর কবিতার প্রধান উপজীব্য। বাংলা কাব্যজগতে তাঁর কবিতা ও সনেটগুচ্ছ বিস্ময় হয়ে থাকবে... ।"

কবির মৃত্যুর পর উপরোক্ত মন্তব্যগুলো ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত সাহিত্য সাময়িকী 'দেশ'-এর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছিল। যে 'দেশ' পত্রিকায় নাকি কবি তাঁর

কবিতার প্রধান উপজীব্য। বাংলা কাব্যজগতে তার কবিতা ও সনেটগুচ্ছ বিস্ময় হয়ে থাকবে... ।'

ফররুখ আহমদ সম্বন্ধে যখন অনুসন্ধিৎসা প্রবল এবং পরিচিত হবার জন্য উকিল খুঁজে বেড়াচ্ছি, ঠিক তক্ষুনি আমাদের মুকুল ফৌজের সর্বাধিনায়ক কামরুল ভাই (শিল্পী কামরুল হাসান)-এর কাছে শুনলাম তাঁরা তালতলা ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেনে একই মডেল নর্মাল এম-ই স্কুল পড়তেন। রবীন্দ্রনাথও একদা ঐ স্কুলেরই স্লোপিং গ্যালারিতে নাকি পা দুলিয়ে পা ঝুলিয়ে বাল্যে কিছুদিন বিদ্যাভাস করেছিলেন। ফররুখ আহমদ নাকি কামরুল ভাইদের ব্যায়াম চর্চাতেও উৎসাহিত করতেন। শুনতাম তাঁর বাবা রীতিমত ব্রিটিশ সিংহের সনদ পাওয়া একজন পুলিশ ইনসপেক্টর আর ছেলে ফররুখ হয়েছেন বিপ্লব-মনা-তিনি নাকি সব গরীবকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন। আমার সঙ্গে যখন তাঁর দেখা হয়েছে তখন তিনি যাদবপুরে তাঁদের নিজের তৈরি বাড়িতে থাকেন। বাড়ির নাম দিয়েছিলেন 'অলোকপুরী'। সে যুগের আধা গ্রাম্য ধূলিধূসরিত ছায়া-ঢাকা , পাখি-ডাকা এই যাদবপুরের বাড়িতে নাকি তাঁর পড়া আর কাব্য সাধনা চলতো গভীর রাত্রি পর্যন্ত (চলতো ব্যায়াম সাধনাও)। আরও শুনলাম তিনি স্কটিসচার্চ কলেজে পড়তেন, বিষ্ণু দে, প্রমথনাথ বিশী, বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্রও নাকি তাঁর কবিতা পছন্দ করেন। তাঁর কবিতা ছাপা হয় শুধু 'মোহাম্মদী' ও 'সওগাতে' নয় 'দেশ', 'চতুরঙ্গ', 'অরণি,' 'কবিতা' 'পরিচয়' প্রায় সব প্রথম শ্রেণীর পত্রিকায়।

মোটামুটিভাবে চতুর্থ দশক বা তার কিছু পূর্ব থেকে পাঠক হিসেবে আমরা যাঁদের কবিতা উৎসাহের সঙ্গে পড়তাম, সে যুগের তরুণ বা তরুণতর কবিদের মধ্যে অবশ্যই প্রথম সারিতে ছিলেন কবি ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, আবুল হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ। লেখক হতে হলেই পাঠক হতে হবে, এটাই ত পূর্বশর্ত। আমরা যারা যখন ছোটদের মহফিলে লিখি, বড়দের সদর মহফিলে উঁকি-ঝুঁকি দিতাম বৈকি। পাঠক হিসেবে সে যুগের হানাফী, নবযুগ, আজাদ, ইত্তেহাদ, মোহাম্মদী, বুলবুল, গুলিস্তান, সওগাত প্রভৃতিতে কবি নজরুল ইসলাম, শাহাদৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, জসীমউদ্‌দীন, আব্দুল কাদির, কাদের নওয়াজ, বেনজীর আহমদ, বন্দে আলী মিয়া, আ.ন.ম. বজলুর রশীদ, শামসুদ্দিন, বেগম সুফিয়া কামাল, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, শাহেদা খানম, বেগম জেবু আহমদ প্রমুখ আরও অনেকেরই লেখা প্রকাশিত হতো। এঁদেরই উত্তরসূরি বা সমসাময়িক সে যুগের তরুণ বা তরুণতর লেখকদের কবিতার সঙ্গে আমাদের পরিচিতি ঘটবে এটাই ত' স্বাভাবিক ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, এ যুগের তরুণ কবিদের যেমন লেখার জন্য বিভিন্ন পত্রপত্রিকার প্রশস্ত ময়দান রয়েছে, সে যুগে তেমন সুযোগ ছিল না। পত্রিকাও ত' হাতেগোনা ছিল। এসব পত্রিকার সম্পাদক বা ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকগণও প্রবীণ বা

অভিজ্ঞ ছিলেন, প্রবীণদের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ছিল, নবীনদের প্রতি ছিল স্নেহ। এই অবস্থায় একজন নতুন লেখকের জায়গা করে নেয়া খুব সহজ ছিল না। এই সময় প্রায় প্রতি মাসে এবং প্রায় প্রতিটি পত্রিকায় বিশেষ বিশেষ সংখ্যায় কখনো প্রথম পৃষ্ঠায়, যখন ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, তালিব হোসেন বা আবুল হোসেন প্রমুখের কবিতা বের হতো তখন তাঁদের আমরা পত্রিকা জগতের স্নেহধন্য সুপরিচিত লেখক হিসেবেই ধরে নিতাম। তাঁদের সম্বন্ধে এর-ওর কাছে-কি করেন, কেমন দেখতে, কোথায় থাকেন- এসবই আমাদের জিজ্ঞাসা ছিল। দেখতে ইচ্ছে হতো, তাঁদের মনে মনে শ্রদ্ধা জানাতাম। উপরে যে কয়জন লেখকের কথা বললাম, তাঁরা প্রত্যেকে রবীন্দ্র-নজরুল-সাহিত্য-সূর্যালোকিত পৃথিবীতে বসবাস করেও আপন বৈশিষ্ট্যে প্রোজ্জ্বল ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি আহসান হাবীবের 'রাত্রি শেষের' কবিতা অথবা আবুল হোসেনের 'নব বসন্তের' সমুদয় কবিতাই প্রায় এই সময়েই অধিকাংশই পূর্ববর্ণিত পত্র-পত্রিকা এবং এ-ছাড়া বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত প্রগতিশীল 'কবিতা' এবং হুমায়ূন কবির সম্পাদিত 'চতুরঙ্গ-এ' বের হয়েছে। একই মন্তব্য তদানীন্তন স্কটিস চার্চ কলেজের ছাত্র ফররুখ আহমদ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। কিন্তু তবু একজন কিশোর বা সদ্য কলেজে পড়া আমার মতো পাঠকের হৃদয়ে আবেদনটা কিভাবে এসে পৌঁছাতো? আহসান হাবীবকে মনে হত রোমান্টিক (বিশেষ করে তাঁর 'নীল খাম' প্রভৃতি কবিতা) কিন্তু কথা বলেন বড় তির্যকভাবে - ধনুকের তীরটা সোজা এসে বক্ষ ভেদ করে। বিশেষ করে তাঁর 'হক নাম ভরসা' প্রবৃতির মত শানিত তীর। আবুল হোসেন 'মেহেদীর জন্য' কবিতা লিখতেন। গদ্য কবিতার এমন একটি আবেশ সৃষ্টি করতেন যে, এ মেহেদীকে সুর করে পড়তে ভালো লাগতো, পড়া শেষ হলেও তার অনুরণন থাকতো। সম্ভবত এখনও ভালো লাগবে। ফররুখ এলেন তিরিশের আধুনিক কবিদেরই পথ ধরে, তাঁর 'সওগাতের' আঁধারের স্বপ্ন' (পৌষ, ১৩৪৫), 'চৈত্র প্রভাতের সুর' (ফাল্গুন, ১৩৪৫), 'নাটকীয়' (চৈত্র, ১৩৪৫) 'চৈত্র সন্ধ্যার সুর' (বৈশাখ, ১৩৪৬), 'কাঁচড়া পাড়ার রাত্রি' (পৌষ, ১৩৪৭); (বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত কবিতায় পুনঃমুদ্রিত), 'পথিক' (কার্তিক, ১৩৪৯) প্রভৃতি পার হয়ে। ১৩৫০-শ্রাবণেই প্রথম 'তায়েফের পথে' যাত্রা সূচিত হলো। তারপর কতকটা নজরুলের সেই ইসলামী গজল পুঁথি এবং দূর আরবের আলিফ-লায়লার স্বপ্ন-রঙ্গীন পথ ধরে বলিষ্ঠ থেকে বলিষ্ঠতর যাত্রা তাঁর; আলিফ-লায়লার সমুদ্র-নাবিকদের সাথে ভেসে যেতে একটা রোমাঞ্চ ছিল, যাত্রা মন্দ, লাগতো না, কথা, ছন্দ ও সুর নতুন। আর এটাও অস্বীকার করার উপায় ছিল না যে, নজরুল বাংলা সাহিত্যে পূর্বেই যে ইসলামী শব্দ ভাণ্ডারের সার্থক রূপায়ণ করেছিলেন, জসীমউদ্‌দীনের মধ্যে যা পেল ঘরোয়া আবেষ্টনী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, মোহিতলাল বা নরেন্দ্র দেব প্রমুখের মাধ্যমে যা সুপরিচিত মর্যাদায় আসীন—ফররুখে তা স্বভাবতই একেবারে আনকোরা নতুন মনে হলো না। কিন্তু নূতন

লাগলো ওয়র্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলি, কিটস বা ইলিয়টি মাধুর্যমণ্ডিত তাঁর প্রকাশ-ভঙ্গি, শব্দ-যোজনা, যা তরুণ পাঠকদের আকর্ষণ করার জন্য যথেষ্ট ছিল:

কেটেছে রঙীন মখমল দিন, নতুন সফর আজ
শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদের তাজ,
পাহাড়-বুলন্দ্ ঢেউ বয়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক,
নতুন পানিতে সফর এবার হে মাঝি সিন্দবাদ ...

**(সওগাত, পৌষ, ১৩৫০)**

অথবা

সমুদ্র থেকে সমুদ্রে ঘোরে দরিয়ার সাদা তাজী!
খুরের হলকা, –ধারালো দাঁড়ে আঘাতে ফুলকি জ্বলে
সমুদ্র থেকে সমুদ্রে ঘোরে দরিয়ার সাদা তাজী ...

**('বারদরিয়ায়', ঐ, মাঘ, ১৩৫০)।**

অথবা

আখরোট বনে,
বাদাম খুবানি বনে
কেটেছে তোমার দিন।
হে পাখী শুভ্র তনু,
সফেদ পালকে চমকে বিজুরী, চমক বর্ণধনু,
সোনালী, রূপালী 'রক্তিম রংগিন"

('ঈদের স্বপ্ন; ঐ, আশ্বিন ঃ ১৩৫১; 'সাত সাগরের মাঝি'-তে' সংক্ষিপ্ত এবং নাম ('আকাশ নাবিক')

বলা নিস্প্রয়োজন, নজরুলের 'কামাল পাশা', 'খালিদ', 'মহররম' প্রভৃতি কবিতার স্টাইল যেমন তাঁর একান্ত নিজস্ব, ফররুখের এসব কবিতার প্রকাশ-নৈপুণ্য তেমনি তাঁর একান্তই নিজস্ব। এ নৈপুণ্য রপ্ত করা অথবা যৌগিক মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্তের স্বচ্ছন্দগামী কাব্যের ঘোড়াকে বল্গা খিঁচে ঠিকমত পরিচালনা সহজ ছিল না। অনেকেই কিন্তু চেষ্টা করেছিলেন, পারেননি। আর যাঁরা পারেন নাই, সেসব কাব্য-সমালোচকের দল এক যুগে যেমন নজরুলকে গালমন্দ দিতেন, ফররুখকেও তেমনি বাঁকা-চোরা কথা বলতেন। সাধারণ একজন পাঠক হিসেবে আমাদের প্রতিক্রিয়া ছিল এই যে, বৈচিত্র্য নিয়েই ত' সুর-সংগীত নদী-সমুদ্র, ভালোই ত' লাগছে, নতুন সুরে নতুন ভাবাবেগ-নতুন আবেগ।

কিন্তু তাজ্জব হয়ে গেলাম আমরা 'সওগাত (কার্তিক,) ১৩৫১-এ তাঁর 'ডাহুক' কবিতা পড়ে :

রাত্রিভর ডাহুকের ডাক...
এখানে ঘুমের পাড়া, স্তব্ধ দীঘি অতল সুপ্তির।
দীর্ঘ রাত্রি একা জেগে আছি।...
বেতসলতার তারে থেকে থেকে বাজে আজ বাতাসের বীণা;
ক্রমে তাও থেমে যায়,
প্রাচীন অরণ্য তীরে চাঁদ নেমে যায়;
গাঢ়তর হ'ল অন্ধকার।...
রাত্রি ঝরে পড়ে
পাতায় শিশিরে,...
জীবনের তীরে তীরে
বেদনা নির্বাক।
সে নিবিড় আচ্ছন্ন তিমিরে
বুক চিরে, কোন ক্লান্ত কণ্ঠ ঘিরে
দূর বনে উঠে শুধু
তৃষাদীর্ণ ডাহুকের ডাক।।...

এটি এমন একটি কবিতা, যার একটি পঙ্‌ক্তিও বাদ দিয়ে পড়া চলতে পারে না। এটি এমনই এক সুর যা বাজানো যেন-তেন বাদকের পক্ষে সম্ভব নয়, এ-টি এমনহি একটি সৃষ্টি, যা যতবারই পড়া যায় ততবারই নতুন মনে হয়। একেই কি বলে কাব্যের এটারনিটি? এটারনাল ট্রুথ বা এটারনাল মিউজিক? এ কবিতা স্মরণ করিয়ে দেয় ইংরেজি সাহিত্যের ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও শেলির 'টু এ স্কাইলার্ক'-কে কিন্তু ফররুখের 'ডাহুক' আকাশচুম্বী নয়, মর্তমাটির উলায় বন্দি কণ্ঠ হতে রক্ত উদ্‌গীরণকারী এক মিথিক ডাহুক, আত্মার আত্মলোকে যার অবিরাম জেকের, জিগর উন্মোচন করে যে মানবতার ডিম্বকুসুম ফোটাতে চায়! কয়টি কবিতা আছে 'ডাহুকের' মতো শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যে? অসংখ্য আছে কি?

ইং ১৯৪৩। বাংলায় ১৩৫০। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় নর-কংকালের মিছিল। দেখেছি নারীদেহ নিয়ে কায়েমী সুখবাদীদের একই খেলার পুনরাবৃত্তি। দেখেছি কত স্বল্পমূল্য আদম সন্তানের। সেই বেদনাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য নতুন যুগের 'অগ্নিবীণার' প্রয়োজন ছিল। নজরুল তখন অসুস্থ। বীণা বাজলো সুবাস মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস প্রভৃতি আরও অনেকের হাতে। আরও ২/১ বছর পরে সুকান্তের। কখনো ময়লা পাজামা, কখনো লুঙ্গি পরা, হাতে কালো কালো লম্বা তুলির কলমে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছবি আঁকছেন ময়মনসিংহের এক শিল্পী-নাম জয়নুল আবেদিন। ঈদ-সংখ্যা 'আজাদের' প্রথম পৃষ্ঠায় এই শিল্পী আঁকলেন দুইটি মাত্র শীর্ণ হাত-যে কোন আদম সন্তানের, দূরের আকাশে ঈদের চাঁদ-বিরাট ভ্রুকুটির মত। সওগাতে,

মোহাম্মদীতে বিশেষ ঈদ-সংখ্যায় এ শিল্পীর ছবি-ডাস্টবিনে কুকুরে মানুষে উচ্ছিষ্টের জন্য কাড়াকাড়ি, মৃত আদমের লাশ পড়ে আছে রাজধানীর গর্বিত ফুটপাতে, মৃত মায়ের স্তন চুষছে জীবন্মৃত নিষ্পাপ শিশু। আর ঠিক সেই সময়ে মাসিক 'মোহাম্মদী', ১৩৫০-এ বের হলো একটি কবিতা নাম- 'লাশ' যেখানে প্রশস্ত পথ ঘুরে গেল মোড়।

কালো পিচে ঢালা রঙে লাগে নাই ধূলির আঁচর
সেখানে পথের পাশে মুখ গুঁজে পড়ে আছে জমিনের 'পর
সন্ধ্যার জনতা জানি কোনদিন রাখে না সে মৃতের খবর।
স্ফীতোদর বর্বর সভ্যতা
এ পাশবিকতা,
শতাব্দীর ক্রূরতম এই অভিশাপ
বিষাইছে দিনের পৃথিবী
রাত্রির আকাশ।
কার হাতে হাত দিয়ে নারী চলে কাম-সহচারী?
কোন সভ্যতার?
কার হাত অনায়াসে শিশুকণ্ঠে হেনে যায় ছুরি?
কোন সভ্যতার?
পাঁজরার হাড় কেটে নৃত্য-সুর জেগে উঠে কার?
শ্রমিকের রক্তপাতে পান-পাত্র রেঙে উঠে কার?
কোন সভ্যতা?
হে জড় সভ্যতা!
মৃত-সভ্যতার দাস স্ফীতমেদ শোষক সমাজ!
মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ।
তারপর আসিলে সময়
বিশ্বময়
তোমার শৃঙ্খলগত মাংসপিণ্ডে পদাঘাত হানি'
নিয়ে যাব জাহান্নাম দ্বার প্রান্তে টানি';
আজ এই উৎপীড়িত মৃত্যু-দীর্ণ নিখিলের অভিশাপ বও :
ধ্বংস হও–
তুমি ধ্বংস হও।

এমনিই সব কবিতা ছিল 'শকুন' (সওগাত, কার্তিক, ১৩৫০), 'বিরান সড়কের গান' (ঐ, মাঘ, ১৩৫২) ইত্যাদি। যা জ্বালা ধরিয়ে দিত আমাদের তরুণ রক্তে, বলা নিষ্প্রয়োজন, এ-কবি ফররুখ আহমদ। এর আগে-পরেই পড়লাম বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত 'অরণি', 'দেশ' 'পরিচয়', 'রূপায়ণ',

হুমায়ুন কবীর সম্পাদিত 'চতুরঙ্গ' এবং কাজী আফসার উদ্দীনের 'মৃত্তিকায়' আরও কিছু মৌলিক সুরের কবিতা। এ-সব কবিতা, যার সংখ্যা অজস্র, যা হয়তো সব এখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়নি, 'ইজম', বহির্ভূত নিটোল কবিতা, সে-যুগের এইসব পত্র-পত্রিকা মিলিয়ে দেখল, এ বক্তব্যের যথার্থতা খুঁজে পাওয়া যাবে। কাব্য-সমগ্র পড়ুন (বাংলা একাডেমী) সার্বিক মূল্যায়ন তখনই সম্ভব বলে মনে করি। নব মূল্যায়নেরও প্রয়োজন হতে পারে। তরুণ সমাজে সকলের মুখে মুখে তখন ফররুখের নাম। অমুসলিম খ্যাতিমান কবি এবং পত্রিকা সম্পাদকগণও তখন পরিচিত হয়ে গেছেন তাঁর প্রতিশ্রুতিশীল কাব্য-প্রতিভার সঙ্গে। তখন বিভিন্ন সাহিত্য সভা-সমিতিতে আবৃত্তিকৃত হচ্ছে তাঁর কবিতা। প্রশংসা করে প্রবন্ধ লিখছেন কাজী আবদুল ওদুদ-১৯৪৫-এ রাজস্থান (ভারত)-এর জয়পুরে অনুষ্ঠিত পি-ই-এন সম্মেলনে; শান্তি রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র মজুমদার, 'পরিচয়' 'নতুন সাহিত্য' গোষ্ঠীর নরহরি কবিরাজ, কবি আবদুল কাদির এবং কবি সুবাস মুখোপাধ্যায়। কলকাতা বেতারে কথিকা প্রচারিত হচ্ছে এই তরুণ কবির কাব্য-প্রতিভা নিয়ে। এ সময়ের প্রায় প্রতিটি কাব্য সমালোচনামূলক গ্রন্থেই তাঁর উল্লেখ থাকতো, নজরুলের পরে এতো প্রচার কেউ পেয়েছিল কি?

ফররুখ আহমদের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় ১৯৪৪-এ নিতান্ত ঘরোয়া পরিবেশে। হাতে তৈরি টিটাগড়ের একরূপ অমসৃণ কাগজে মুদ্রিত হলো তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্ত 'সাত সাগরের মাঝি', কবি বেনজির আহমদের অর্থানুকূল্যে। সেই গ্রন্থের একটি কপি তিনি দিতে এসেছিলেন ৩৯, সৈয়দ আমির আলী এভিনিউতে 'পার্ক সার্কাস', কলকাতা তদানীন্তন তরুণ মুসলিম ছাত্র-আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও প্রেসিডেন্সি কলেজের একদা সাহিত্য-বার্ষিকী এবং 'রূপায়ণ' পত্রিকার সম্পাদক জনাব আবু সাঈদ চৌধুরীকে (পরে রাষ্ট্রপতি)। পরিধানে ছিল তাঁর পাজামা এবং শেরোয়ানী। চা খেলেন। চা শেষে চেয়ে খেলেন পান। নামাজের সময় হয়েছিল, মাগরিবের নামাজও আদায় করলেন। কবি কামাল চৌধুরীকে (প্রাক্তন মন্ত্রী ড. মফিজ চৌধুরীর ভ্রাতা) দিয়ে একটি সমালোচনারও অনুরোধ জানিয়ে গেলেন কোন সাময়িকীতে। কিছুদিন পরই একদিন সন্ধ্যায় আবার দেখা 'আজাদের' বার্তা সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ মোদাব্বেরের (বাগবান) কক্ষে ৮৬-এ, লোয়ার সার্কুলার রোডে। চা খেলেন, পান খেলেন। কবিকে খুব যেন উচ্ছ্বাসপ্রবণ মনে হলো। জানলাম তখনও থাকেন তিনি তাঁর বাবার তৈরি যাদবপুরের নিভৃত সেই 'অলোকপুরী'-তে সেখান থেকেই কলকাতা আসেন কার্যোপলক্ষে। এরি মধ্যে সম্ভবত এপ্রিল-মে মাসে (১৯৪৫) কলকাতা বেড়াতে গিয়ে শুনলাম আমাদের প্রিয় কবি ফররুখ মাসিক 'মোহাম্মদীর' ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হয়েছেন। 'আজাদের' বার্তা সম্পাদক মোদাব্বের সাহেবের (বাগবান) সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ফররুখ-এর সঙ্গেও দেখা করে এলাম।

দোতলার দক্ষিণ দিকের রুমে স্মোকি গ্লাসের অর্ধ দরজাওয়ালা রুমে পায়জামা-পাঞ্জাবী পরিহিত কবি মাসিক মোহাম্মদীর সম্পাদনা নিয়ে ব্যস্ত। চা আর পান খান বিস্তর-সিগারেট ছোন না (কোন দিনই সম্ভবত ছোন্‌নাই)। আমার হাতে কিছু কবিতা ছিল-দিলাম পড়লেন। একবার-দু'বার।

-আচ্ছা-ঠিক আছে-আস্তে আস্তে যাবে। যাবে-যাবে- 'মোহাম্মদীতে'। শান্তি নিকেতন সম্বন্ধে নানা কথা-বিশেষ করে আদম উদ্দীন আহমদ, পুঁথি-সাহিত্যের কালেকশন কেমন, কিভাবে পড়াশোনা হয়, গাছের নিচে পড়তে অসুবিধা হয় কিনা, বৃষ্টি এলে কী করতে হয়- ইত্যাদি নানা কথা। জিজ্ঞেস করলেন বলে মনে পড়ে। তাঁর সেদিন খুব জলি-মুড্ ছিল বলেই যেন মনে হ'ল। আমি বললাম, বৃষ্টিতে খুব অসুবিধা হয় না। কিন্তু ঘনপত্র শোভিত বৃক্ষরাজির উপরে অবোধ পক্ষীকুল মধ্যে মধ্যে বড় উৎপাত করে- এতে করে শুভ্রবসনা আমাদের মহিলাদের বড়ই বেকায়দায় পড়তে হয়। হো-হো করে দরাজ হাসি। হেসে উঠলেন ফররুখ। তাইতো-পক্ষীকুল বড় বেরসিক দেখি-কবির শান্তিনিকেতনের শান্তি ভঙ্গের দূত। যেতে হবে ত' একবার। হাঁ-হাঁ-নিশ্চয়ই যাবো একবার বুড়োর (রবীন্দ্রনাথ) শান্তিনিকেতন দেখতে। কামরুল (শিল্পী কামরুল হাসান) ও হাবীবও (কবি হাবীবুর রহমান) যাবে-জায়গা ঠিক করে রাখবেন। আর হাঁ-ওখান থেকে মোফাজ্জল হায়দার নামে একজনও মধ্যে মধ্যে কবিতা পাঠান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'কাঁঠালীচাপা' শীর্ষক হায়দারের একটি কবিতাও কিন্তু একবার আগে-পরে মাসিক 'মোহাম্মদীতে' প্রকাশিত হয়।

শান্তিনিকেতন থেকে একবার পত্র দিলাম। কামরুল ভাই ও হাবীবুরকে নিয়ে আসছে বর্ষামঙ্গল ও বৃক্ষরোপণ উৎসবে আসার জন্য। পত্রোত্তর এলো একটু দেরিতে। মাসিক মোহাম্মদীর মুদ্রিত প্যাডে : খাড়া খাড়া বড় বড় হাতের লেখা। নাম সইটি আরবি কায়দায় দেখার মত!

**Masik Mohammadi (Illustrated Monthly) Journal 86A, Lower Circular Rood, Calcutta, Gram : Daily Azad, Calcutta, Phone : 465, 466.** ৩১-৭-৪৫

**তসলিম বাদ আরজ,**

আপনার চিঠি পেয়েছি। ঈদ-সংখ্যা 'আজাদ' সম্পাদনা করছেন এবনে খলদুনের লেখক আবদুল হাই সাহেব। নতুন লেখকদের সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সজাগ এবং সহানুভূতিশীল। তবুও আপনার লেখার জন্য আমি বিশেষভাবে তাঁকে বলব। কাজের চাপে খুব ব্যস্ত আছি, শান্তিনিকেতন যাওয়া হয়তো সম্ভব হবে না। আদম উদ্দীন সাহেবকে আমার সালাম দেবেন। তাঁর পুঁথি সাহিত্যের ইতিহাস ইতিমধ্যেই সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

ইতি- আপনাদের-ফররুখ আহমদ।

এই পত্রে যে সহজ সরল স্নেহশীল মনটির দর্শন পাওয়া যাচ্ছে ব্যক্তি ফররুখও ছিলেন ঠিক তেমনি। আমরা যারা নতুন এসেছিলাম তখন এতটুকু ভণিতা বা ফর্মালিটি না দেখিয়ে তিনি সকলকেই অকৃত্রিম অবারিত স্নেহ ডোরে বেঁধে ফেলেছেন। প্রথমে 'আপনি' তারপর 'তুমি এবং পরিশেষে একদম 'তুই'। তাঁর কাছেই গল্প শুনেছিলাম একবার এক সাহিত্য যশোপ্রার্থী হবু কবি তার কবিতা ছাপার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু সে কবিতা পত্রস্থ করা যায় না। অগত্যা নিজেই নাকি কবিতা লিখে তার নামে ছাপিয়ে তাকে তৃপ্ত করতে হয়েছিল একেই বলে সম্পাদকের বিড়ম্বনা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মাসিক মোহাম্মদী মুদ্রিত পৃষ্ঠার শূন্যস্থান পূরণের জন্য 'ফ' নামেও এই সময় তাঁকে ছোট ছোট কবিতা লিখতে হতো। সম্পাদক হিসেবে যতদূর শুনেছি, কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। নতুন শিল্পী সাহিত্যিকদের প্রতি পূর্বেই বলেছি, ছিল তাঁর অকৃত্রিম দরদ। তিনি নিজেই বারবার বলেছেন যারা নতুন এসেছেন তাদের প্রতিষ্ঠা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। চিঠিপত্রেও এ-সব কথা বলেছেন। আমার যতদূর মনে পড়ে কবি সিকান্দার আবু জাফর প্রভৃতি অনেককে তিনি তাড়া দিয়ে লেখা এবং জয়নুল আবেদিন, সফীউদ্দীন ও কামরুল হাসানের কাছ থেকে ছবি আদায় করেছেন"। সিকান্দার আবু জাফরের এই সময়ে 'মোহাম্মদীতে' প্রকাশিত অনবদ্য কবিতাগুলো আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করেছিল। লেখক হিসেবে আবু রুশদ, শওকত ওসমান, কাজী আফসার উদ্দীনের মতো মননশীল লেখা লিখুন। এঁদের সাহিত্যকর্মের প্রচার করুন সমাজে। কিন্তু নিজের কাব্যকলার কথা কখনো ঘুণাক্ষরেও বলতে শুনেছি বলে মনে পড়ে না।

দুঃখের বিষয়, মাসিক মোহাম্মদীতে তাঁর চাকুরিকাল দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। কেন হয় নাই, সে অন্য প্রসঙ্গ।

১৯৪৮-এ ঢাকা এসে ফররুখ-এর সঙ্গে দেখা হলো নাজিমুদ্দিন রোডের সেকালের বেতার ভবনের আবুল মিয়ার চায়ের দোকানে। দেখা হতেই তাঁর সহজ স্নেহপ্রবণ উল্লাসে বললেন-আ-রে এসে গেছিস্! তোর 'তালেব মাস্টার' পড়েছি। লেখ্-লেখ্ আরও লেখ্। কবিতাটা কিন্তু ভালো হয়েছে।

তা-কি করবি-কোথায় আছিস? বললাম, আছি আমার মামাতো ভাই আবু সাঈদ চৌধুরী সাহেবের বাসায়, রোজেভেলে, ১০৩, ময়মনসিংহ রোডে। অনার্স পরীক্ষার ফল বের হলো-সলিমুল্লাহ হলের বাসিন্দা হলাম আর দেখা হতে লাগলো পুরানো বেতার ভবনে অথবা আবুল মিয়ার চায়ের দোকানে। সে সময়ে ফররুখ ভাইকে কিছু জানাতে হলে বা তার খবর নিতে হলে আবুল মিয়া ছিল নির্ভরযোগ্য অবধারক। কাব্যরোচনায় উচ্ছল হয়েছেন, নবীন থেকে প্রবীণ সকলের সঙ্গেই; কবিতা আবৃত্তি করেছেন দরাজ কণ্ঠে-চায়ের দোকানে, বাসায় বা বেতার তরঙ্গে, লিখতেন যত্র-তত্র বসে, এতটুকু গরিমা বা অহঙ্কার নেই, বাহবা দিয়েছেন অন্যকে কিন্তু নিজে নেননি।

পাজামা-পাঞ্জাবী পরিহিত, কখনো ঘাড়ের উপর একটি সাধারণ আচকান-সামনে ঝুঁকে দ্রুত পায়ে হেঁটে চলেছেন কখনো, মুখে পান, চুনের বোঁটাটি কখনো ডান হাতের তর্জনীর ফাঁকে ধরা, উচিত বক্তা কিন্তু তাঁর প্রতিপক্ষকেও চা পানে আহ্বানে মুক্তপ্রাণ-অগোচরে নিন্দা নয়-যাকে যা বলার মুখের উপরে...তা সে খুশিই হোক আর বেজারই হোক আর-শুধু বলা নয়-কবিতা বা গানের ব্যাঙের চাবুকেও জর্জরিত করেছেন প্রতিবাদীদের। যার জন্য কিছু কিছু প্রগতিশীল সাহিত্যব্রতী তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে উঠতে থাকেন। বিরূপ হন সরকারও, ছেড়ে কথা বলেননি, এমনকি তা যদি আয়ুবের মিলিটারি সরকারও হয়। এবং রাষ্ট্র ভাষা হবে বাংলা একমাত্র বাংলা-এ মত তাঁর ১৯৪৭-এর সেপ্টেম্বর থেকেই, স্পষ্ট মত প্রকাশ করেন, 'সওগাতের' প্রবন্ধে এই মাসেই।

সাহিত্য-সাধনার পথে আমার ব্যক্তিগত মতামত স্পষ্ট-যে যা পারেন-যেদিকে তাকে খাপ খায়-সেই পথেই হাঁটুন তিনি-বিরাট বিস্তৃত ময়দান কেউত' কারো পথে দাঁড়িয়ে নেই। পূর্বসূরিদের প্রতিও (তিনি যে মত বা পথেরই হোন না কেন) আমাদের যেমন কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা থাকা প্রয়োজন, পূর্বসূরিদেরও তেমনি দায়িত্ব হলো উত্তরসূরিদের নিয়ে বসা, তাদের জিজ্ঞেস করা, কেমন আছি, কি ভাবছি, কি লিখছি। আমি এসব কথা ফররুখ ভাইকেও বারবার বলেছি। পরবর্তী সময়ে তেরজন কবির কবিতা নিয়ে যখন আমার ও আবদুর রশীদ খানের সম্পাদনায় আর মোহাম্মদ মামুন (মরহুম) এর সর্বক্ষণের তত্ত্বাবধানে 'নতুন কবিতা' সংকলন (১৯৫১) বের হলো তখন তাঁর কাছ থেকে যে উৎসাহ পেয়েছিলাম তা ভোলার নয়। লালবাগের তমদ্দুন প্রেসের মালিক তৈয়বর রহমান সাহেবকে বলে তিনি যদি ছাপার খরচ কমিয়ে দেবার ওকালতি না করতেন তাহলে ১৯৫১-এ আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তালেব মাস্টার ও অন্যান্য কবিতা' বের হতো কিনা সন্দেহ। বয়ঃকনিষ্ঠ সাহিত্যব্রতীদের প্রতি তাঁর স্নেহ আজকের এই দলমত-সংকুল আবহাওয়ায় একরূপ বিরল বললেই চলে। অর্থ, পদ বা বাহবা নেবার মোহ তাঁর ছিল না। বহুবার তিনি তদানীন্তন রাজধানী করাচি বা পিন্ডি যাওয়ার দাওয়াত পেয়েও কিন্তু যাননি। উৎসাহ দেখান নাই ইউনেসকোর টাকায় বিদেশ সফরের ইশারা পেয়েও। 'ইত্তেফাকের' কার্যনির্বাহী সম্পাদক সুলেখক আসফদ্দৌলা সাহেবের কাছে শুনেছি একাত্তরে পঁচিশে মার্চের অন্ধকারে স্বৈরাচারী এহিয়া সরকার যখন 'ইত্তেফাক' অফিস ভস্মীভূত করে এই সময়ে সহায় সম্বলহীন আসফদ্দৌলা এবং সিরাজ উদ্দিন হোসেনের (শহীদ এবং প্রাক্তন কার্যনির্বাহী সম্পাদক) এর নিকট পৌঁছালো দু'টি খাম-তাতে একশত করে টাকা। পাঠিয়েছেন কবি ফররুখ, লিখেছেন, থাকলে আরও অনেক বেশিই পাঠাতেন।

এতদিন ঢাকা থেকেও না করতে পেরেছিলেন একটি বাসস্থান, না একটি বাড়ি। মৃত্যুর পর তাঁর বাড়িতে কাফনের টাকা ছিল কিনা সন্দেহ। অগ্রজ কবি বেনজির

আহমদ যদি দয়া করে 'সাড়ে তিন হাত জমিন' না দিতেন তবে 'লাশ' কবিতার অসংখ্য লাশের মত তাঁর দেহও বারোয়ারী গোরস্তানে একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত কিনা কে বলতে পারতো!

আমি নিজে যা বুঝি, মহাজনদের কাছে যা শুনেছি এবং যা পড়ে শুনে শিখেছি, তাতে একটা সরল সিদ্ধান্তে এসেছি এই যে, একজন লেখক বা শিল্পী বেঁচে থাকেন তাঁর শিল্প-কর্মের ভেতর দিয়ে। একজন লেখকের বড় গুণ হলো তাঁর মানবতার প্রতি মমত্ববোধ, অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, ভাগ্যহতদের জন্য অশ্রু, সর্বোপরি বিশ্বমানবতা। পৃথিবীর ইতিহাস খুঁজে দেখা গেছে, বহু স্বপ্নদ্রষ্টা কবির স্বপ্নই স্বার্থপর রাজনীতির খেলোয়াড়দের হাতে পড়ে সফল হতে পারেনি। সে যুগের দান্তে বা এযুগের প্যাস্টারনাক, কেউই হিংসুকদের সমালোচনার ঊর্ধ্বে ছিলেন না। হুইটমানও স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাঁর স্বপ্নের আমেরিকা কালো-ধলোতে গলাগলি করে গান গাইবে। কিন্তু মেলানো, এই মিলন-মহামিলনের ব্যাপারটি অত সহজ নয়। তাহলে কি করণীয় একজন লেখকের, মহাজনরা বলেন-যা সত্য-সবযুগে-সবদেশে-তাই বলো-যদি সেজন্য তোমার ক্রুসিফিকেশন হয়, গর্দান যায়, হেমলক বিষ পান করতে হয়; করো। তোমার জয়গাথা গাইবার জন্য ইতিহাস তৈরি থাকবে। পৃথিবীর এমন কোন শক্তি নাই তোমাকে মলিন করতে পারে। সে মৃত্যু পৃথিবীর যে-কোন স্বৈরাচারী জল্লাদ অথবা এহিয়ার নরঘাতক পশুদের বুলেট-বেয়নেটকেও কোনদিনই পরোয়া করে না! যে কবি 'লাশ' বা 'আওলাদের' মত কবিতা লিখতে পারতেন; যে কবির তখনো দেবার ছিল; যিনি সর্বাধিক সনেট লিখেছেন; যিনি উপোস করে এক ডজন পরিবার-পরিজন (শিশুসহ) নিয়ে মরবেন, কিন্তু কারো কাছে ভিক্ষা চাইবেন না; যিনি অর্ধাহারী বা অনাহারী, কিন্তু দান গ্রহণ করবেন না; যার কন্যা বিনা চিকিৎসায় মরবে, কিন্তু ডাক্তারের ভিজিট দেবার ক্ষমতা নাই বলে ডাক্তারের কাছে ঔষধের জন্য পাঠাবেন না; যার স্বপ্নের দুলাল অর্থাভাবে ডাক্তারি পড়া ছেড়ে কেরানি হয়,-বড় দুঃখ হয় সেই একগুঁয়ে, অভিমানি, বজ্র-সদৃশ্য চরিত্রটির পাশে গিয়ে সময় থাকতে আমরা কেউ দাঁড়ালাম না, বললাম না যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশ তোমার কাছে কবিতা চায়, সংগত চায়, স্বপ্ন চায়। এক স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে কিন্তু শত স্বপ্ন তোমার সামনে, বাস্তব '৭১-এর রক্ত-পিচ্ছিল পথে আবার যাত্রা শুরু কর, বলা আছে লেখার আছে, এসো-উঠো-।

না, অতো দেরি তাঁর সইলো না। একগুঁয়ে অভিমানী, ক্ষুধার্ত, কবি তার আগেই বীরের মত নাটকীয়ভাবে 'গুড্‌বাই' দিয়ে চলে গেলেন। সম্ভবত তথাকথিত ষড়যন্ত্রকারীদের চোখের পানি মুছতে মুছতে 'অকৃতজ্ঞ' কথাটিও উচ্চারণ করেছিলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য এই দেশের এবং বাংলা সাহিত্যের তথাকথিত রবীন্দ্র বিতর্কে জড়িয়ে তাঁর চাকরিটি খাওয়া হলো-শুধু তাই নয়, অপমান করে ঢাকা বেতার থেকে

বের করেও দেয়া হলো। কবি জসীমউদ্‌দীন, বেগম সুফিয়া কামাল (যাঁকে তিনি 'আম্মা' বলতেন) এবং আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় চাকরি তিনি ফিরে পেলেন। কিন্তু যোগও দেন নাই-বকেয়া বেতনও গ্রহণ করেন নাই। এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী এক চরিত্রহীন সুযোগসন্ধানী অধ্যাপক যিনি দিনের পর দিন তাঁর বিরুদ্ধে বিবৃতি নয় শুধু, প্রসেশনও বের করেন। অথচ কবির মৃত্যুর পর তিনিই হলেন সবচেয়ে সোচ্চার শোকার্ত ব্যক্তি। মুনাফেকী আর কাকে বলে। এভনও। ইতিহাস এঁদের বিচার করলেও বর্তমান এদের বিচার করে না- এদের কুৎসিত ষড়যন্ত্র থেকে সর্বজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আবদুল হাই প্রমুখও রেহাই পান নাই- সে ইতিহাসও এখন উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে এবং আরও হবে কারণ তাঁদের অভিশাপ-কারণ সত্য সত্যই- এবং এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই ফররুখ আহমদের মত যুগান্তকারী কবিদের জন্ম হয়েছিল। অমর কবিতা 'মীর জাফরের 'কৈফিয়ত'-এর মাধ্যমেই যার জবাব নিহিত এবং কবিরা এভাবেই জবাব দেন-যা হয় ইতিহাস-মর্মন্তুদ ইতিহাস। দুঃখের বিষয় হলো রাজনীতিবিদ তথাকথিত সাহিত্য-ধ্বজাধারীগণ এ থেকে শিক্ষা নেয় না। কিন্তু তারা পতিত হয় ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে। ▭

---

**[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, জুন, ২০০১]**

# অভিভাষণ

## প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

**[ ১০ জুন, ২০১২ তারিখে মানবতার কবি ফররুখ আহমদের ৯৪তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির রের্কডকৃত ভাষণ।- অনুলিখন: মুহম্মদ মতিউর রহমান]**

আমি অনুষ্ঠানে আসার পূর্বে ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন সম্বন্ধে ইতিপূর্বে কিছুই জানতাম না। এখানে এসে জানতে পারলাম তারা বেশ কিছুদিন যাবৎ এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কবি ফররুখ আহমদের জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালন করছেন, ফররুখ একাডেমী পত্রিকা এবং ফররুখ আহমদের উপর গ্রন্থাদি প্রকাশ করছেন। শুধু তাই নয়, তারা প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরেও একজন ফররুখ-গবেষককে পুরস্কৃত করছেন। এবারে তারা কবি আব্দুর রশিদ খানকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করলেন। আব্দুর রশিদ ফররুখের কিছু নির্বাচিত কবিতা ইংরাজিতে অনুবাদ করে অসাধারণ একটি কাজ করেছেন। এজন্য তিনি অবশ্যই আমাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য। ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন তাঁকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করে একটি প্রসংশনীয় কাজ করেছে।

কবিতা অনুবাদ করা সত্যিই খুব কঠিন কাজ। আমি নিজেও একসময় অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি, তাই বুঝি এ কাজটি কত কঠিন। সে কাজটা যে আব্দুর রশিদ খান করেছেন সেজন্য আমি তাকে সাধুবাদ জানাই এবং আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি এ কাজটি তিনি ভালভাবেই সম্পন্ন করেছেন, কবির প্রতি সুবিচার করেছেন। অনুবাদে অনেক সময় কবিতার অসল জিনিসটাই হারিয়ে যায়। প্রত্যেক কবিতায় একটি: মোসেজ থাকে, একটি বার্তা থাকে। সে বার্তাটা যদি যথাযথভাবে তুলে ধরা যায়, তাহলে অনুবাদ সার্থক হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। কবিতার অনুবাদ করা যে কতটা দুরূহ যারা এ কাজটি করেছেন তারাই সে সম্পর্কে অবগত এবং অনুবাদ থেকে যদি এটা ধারণা করা যায় যে মূল কবিতার আসল বাণী বা বার্তাটি এখানে তুলে ধরা হয়েছে তাহলে সেটাকেই সার্থক অনুবাদ বলা যায়। অনুবাদে এর চেয়ে বেশি কিছু প্রত্যাশা আমাদের নেই। এটাই হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। এর ব্যতিক্রম আছে যেখানে অনুবাদ এতটাই নিজের সৌন্দর্য নিয়ে দাঁড়িয়েছে পৃথকভাবে যে, সে অনুবাদকে আমরা আর অনুবাদ বলে মনে করি না। সেটা মূল কবিতার মর্যাদা পেয়ে যায়। যেমন-রুবাইয়েতে ওমর খৈয়ামের অনুবাদ ইংরাজ কবি ফিটজেরাল্ড **(Fitzerald)** সেটাকে ফিটজেরাল্ডের কবিতা হিসাবেই আমরা দেখি। ওমর খৈয়াম আছেন সেখানে কিন্তু যিনি ধরা দিচ্ছেন কবি হিসাবে তিনি ফিটজেরাল্ড। এ ধরনের ব্যতিক্রমী ঘটনা কখনও কখনও ঘটে।

যাই হোক, ফররুখ আহমদকে আজ আমরা কতটা স্বীকার করি, কতটা মান্য করি সে প্রশ্নটা আছে এবং এটা ঠিক যে, তাঁকে একটি বিশেষ ভাবাদর্শের কবি হিসাবে বাংলাদেশের কবিতার মূলধারা থেকে কিছুটা সরিয়ে দেয়া হয়েছে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। প্রত্যেক কবিরই একটি নিজস্ব ভাবাদর্শ থাকে। আমরা তাঁকে কখনও তাঁর ভাবাদর্শ দিয়ে বিচার করি না। বিচার করি তাঁর কবিতা শিল্প-সৌষ্ঠবে মানোত্তীর্ণ হয়েছে কিনা। এ বিচারে মানোত্তীর্ণ না হলে তাঁকে কবি বলা যায় না। ফররুখ আহমদকে এ মানদণ্ডে কেউ অনুত্তীর্ণ বলার দুঃসাহস করবে না। শিল্প-বিচারে তাঁর কবিতা অসাধারণ। তাই বাংলা কবিতার মূলধারা থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার সুযোগ নেই। বরং এক সময় আমাদের দেশের অনেক বড় কবিরাও তাঁর কবিতার মোহজালে আচ্ছন্ন ছিলেন এবং অনেকেই তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

আমি যখন কবির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসি তখন কবির বয়স মাত্র ২২-২৩ বছর, আমার বয়স মাত্র ১২/১৩ বছর। কি আশ্চার্য লাগে যে, ঐ সময়ই কবির সঙ্গে আমার কবিতা নিয়ে কথা-বার্তা হয়েছে। তিনি আমাকে অপগণ্ড বালক হিসাবে খারিজ করে দেন। তারপর আমি যখন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেই ১৯৪৫ সালের দিকে, তখন তিনি কলকাতায় মওলানা আকরম খাঁর পত্রিকা মাসিক মোহাম্মদীর নৈপথ্য সম্পাদক হিসাবে কর্মরত। সম্পাদক হিসাবে মওলানার নাম ছাপা হতো। কিন্তু পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন মূলত ফররুখ আহমদ। ঐ সময় তিনি আমার প্রথম কবিতা গ্রহণ করেন এবং ছাপেন। এরপর তিনি সবসময় চাইতেন যেন আমি লিখি। এই যে উৎসাহটা পেয়েছিলাম তাঁর কাছ থেকে সেটা জীবনে কখনও ভুলবনা। এরপর আমার লেখার পেছনে তাঁর অনুপ্রেরণা সবসময় কাজ করেছে।

ফররুখ আহমদ আমাদের চোখের সামনেই হঠাৎ বদলে গিয়েছিলেন। প্রথম যৌবনে তিনি একজন বামপন্থী এবং ভীষণ রকম ঝুঁকিপূর্ণ বামপন্থী কাজের সাথে তিনি নিজেকে জড়িয়েছিলেন। তারপরে তাঁর মধ্যে একটি বিরাট পরিবর্তন আসে তাঁর ব্যক্তিগত আবেগের জগতে এবং ঐসময়ই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' প্রকাশিত (১৯৪৪) হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সবাই মেনে নিল এটা একটি অসাধারণ কাব্যগ্রন্থ। 'সাত সাগরের মাঝি'র বেশ কিছু কবিতা অসাধারণ পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে কবি-খ্যাতি অর্জন করেন। এরপর তাঁর 'আজাদ কর পাকিস্তান' নামে একটি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত (১৯৪৬) হয়। তারপর প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত 'সিরাজম মুনীরা' (১৯৫২) কাব্য। কবির মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটে, তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় শেষোক্ত কাব্যগ্রন্থে। এরপর 'মুহূর্তের কবিতা' নামে তাঁর বিখ্যাত সনেট কাব্য প্রকাশিত হয়। 'মুহূর্তের কবিতা' ঐসময় প্রকাশিত হলেও কেন জানিনা কোন অজ্ঞাত কারণে সেটা তখন বাজারে প্রচার হয়নি। কবির মৃত্যুর পর আমি 'মুহূর্তের কবিতা' গ্রন্থটি সম্পাদনা করে প্রকাশ করি এবং সেই সাথে তার প্রথম যৌবনের কবিতার সংকলন 'হে বন্য স্বপ্নেরা' নামে সম্পাদনা করে প্রকাশ করি। এভাবে আমি কবির রচিত দু'টি কাব্য গ্রন্থ একসময় সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছি।

ফররুখ আহমদ সম্পর্কে আমরা বলতে চাই যে, তাঁর ভাবাদর্শ যাই থাকনা কেন, তিনি কখনও কারো কাছে কোনো অনুগ্রহ গ্রহণ করেননি। এমনকি রাষ্ট্রীয় অনুগ্রহও তিনি গ্রহণ করেননি। এমনকি পাকিস্তান আমলে সরকার তাঁকে যে সকল সম্মাননা প্রদান করেছেন, তিনি নিজে তা কখনও গ্রহণ করেননি। তাঁর বাড়িতে এসে কেন্দ্রীয় সরকারের একজন সচিব সে সম্মাননা তাঁকে পৌছে দিয়েছিলেন। তিনি কখনও আমন্ত্রণ পাওয়া সত্ত্বেও কোন রাষ্ট্রপ্রধানের সফর-সঙ্গী হননি। তিনি বারবার আমন্ত্রণ পাওয়া সত্ত্বেও দেশের বাইরে এমনকি পাশ্চিম পাকিস্তান সফরেও যাননি। কারো কোনরূপ অনুগ্রহ বা পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করেননি। এই যে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ী এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ এটা সমাজে অতিশয় বিরল। তিনি তাঁর কবি-সত্তায় আস্থাশীল ছিলেন এবং সেকারণেই তিনি সকলের প্রশংসা এবং শ্রদ্ধা পেয়েছেন এবং তা নিয়েই বেঁচে থেকেছেন এবং পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।

এই যে মানুষটি প্রবলভাবে আত্মবিশ্বাসী এবং নিজের কাব্য-সত্তায় আস্থাশীল, সে মানুষটি শুধু অসাধারণ নয় বর্তমান সমাজে তার নজির একান্ত বিরল। যদিও জাগতিক নানা বঞ্চনা, দুঃখ, দারিদ্র্য ও দুঃসহ কষ্টের মধ্যে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে, তবু তিনি কখনো কারো অনুগ্রহপ্রার্থী ছিলেন না। একারণে তিনি সকলের শ্রদ্ধা পেয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত কারো কাছে মাথা নত করে নয়, মাথা উঁচু করেই সকলের শ্রদ্ধা নিয়ে তিনি পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিয়েছেন। এখানেই তাঁর প্রকৃত গৌরব। তাঁর ব্যক্তিত্বের মত তাঁর কাব্য-নৈপুণ্যও চিরকাল সকলের সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মানুষ হিসাবে তিনি যে অসাধারণ ছিলেন তা আমি আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি।

তাঁর কর্মস্থল রেডিও পাকিস্তানে তাঁকে ঘিরে সকলেই সেখানে জড় হতেন। তিনি তাদেরকে চা-নাস্তা খাওয়াতেন। তাঁকে ঘিরে আড্ডা জমে উঠতো। সব মতাদর্শের কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীরা সেখানে আসতেন এবং তিনি সকলের মধ্যমণি হিসাবে তাদের কাছে এক প্রাণবন্ত মানুষ হিসাবে বিরাজমান ছিলেন। তিনি যা আয় করতেন, তার একটা বড় অংশ রেডিও পাকিস্তানের সামনের আবন মিয়ার চায়ের দোকানে বসে সকলকে আপ্যায়ন করে ব্যয় করতেন। এরকম সৌজন্যবোধ ও মেহমানেওয়াজ ব্যক্তি আমাদের সমাজে অতি বিরল। এটা ছিল ফররুখের এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য।

আজকে কবি হিসাবে তাঁর স্থান নিরূপণ করতে হলে আমি বলবো যে, আমার ধারণা তিনি সন্দেহাতীতভাবে বাংলা সাহিত্যের একজন মৌলিক কবি। আমার মনে আছে, কলকাতায় তাঁর কবিবন্ধু সুভাস মুখোপাধ্যায় একবার ঢাকায় এসে তাঁর খোঁজ করেছিলেন, পেয়েছিলেন কিনা তা আমি জানি না কিন্তু সুভাস মুখোপাধ্যায়ের মতো কবি ফররুখের কবি-প্রতিভা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। তারা দুজনই একসময় কলকাতায় বসবাস করতেন এবং পরস্পর বন্ধু ছিলেন। দীর্ঘদিন পর ঢাকায়

এসে তিনি তাঁর পুরাতন বন্ধু ফররুখকে খুঁজেছিলেন। তিনি বলতেন ফররুখের ভাবাদর্শ যাই হোক না কেন, কবি হিসাবে তিনি অসাধারণ।

আমি মনে করি, ফররুখ আহমদের জন্ম শতবার্ষিকী এগিয়ে আসছে। আর কয়টি বছর বাকী আছে। এ সময় যতদূর পারা যায় তাঁকে, তাঁর কবিতার প্রচার যেন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। সে চেষ্টা আমাদের সকলের থাকা উচিত এবং বিশেষ করে যারা তাঁর সম্পর্কে বিশেষ শুনছে না, জানছে না, কিছু দেখছে না যে মূলধারায় যেখানে আমাদের বাংলা কবিতা এগিয়ে চলেছে সেখানে মূলধারার কবিতা নিয়ে যেখানে আলোচনা চলছে সেখানে ফররুখ আহমদ অনুপস্থিত। এটা কেন হয়েছে সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। কিন্তু এই পরিস্থিতিটার মধ্যে একটা পরিবর্তন আনতে হবে। তিনি কোন বিশেষ গোষ্ঠীর কবি নন। তিনি সকলের কবি, প্রকৃত কবিরা মূলত সকলের কবি, সব সময়ের কবি। আমি মনে করি ফররুখ আহমদ সকলের কবি এবং তিনি বাংলা সাহিত্যে একজন অমর কবি।

কিন্তু বর্তমানে ফররুখ কেন সকলের কবি হতে পারছেন না, সে প্রশ্নটাই এ অনুষ্ঠানে আসার পর থেকে আমাকে পীড়িত করছে। এখানে তো সকলে নেই। আমি যাদেরকে আশা করি তারা এখানে অনুপস্থিত। যারা আধুনিক বাংলা কবিতার প্রতিনিধিত্ব করেন, আধুনিক বাংলা কবিতার আলোচনা-সমালোচনা করেন, তারা কেউই এখানে নেই। এটা কি কারণে হয়েছে সেটাই আমি ভাবছিলাম যে এইভাবে তো তাঁকে খণ্ডিত করলে চলবে না। তাঁকে সকলের মধ্যেই যেতে হবে, সকলের কাছেই তাঁকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে। সকলের কাছেই তাঁর গ্রহণযোগ্যতা আছে বলে আমি মনে করি। সেই গ্রহণযোগ্যতার পরিচয়ই আমি দেখছি না। এমনকি সেক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীও কিছুটা অপরাধী বলে আমি মনে করি। বাংলা একাডেমী অন্যদের ক্ষেত্রে যেটা করে থাকে ফররুখ আহমদের ক্ষেত্রে সেটা তারা করেনি। অনেক আলোচনা হয়ে থাকে অনেককে নিয়ে, অনেকের জন্ম দিন মৃত্যুদিন পালিত হয় কিন্তু ফররুখকে নিয়ে বাংলা একাডেমী এধরনের কোনো অনুষ্ঠানেরই আয়োজন করে না। এ পরিস্থিতি থেকে ফররুখ আহমদকে বের করে আনার দায়িত্ব আমাদের সকলকে পালন করতে হবে।

ফররুখ আহমদের কবিতার প্রচার যাতে অব্যাহত থাকে সেটা দেখতে হবে, তাঁর বই যাতে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে। এমন যেন না হয় যে, যারা তাঁর বই পেতে চায় তারা তা পাচ্ছে না। কারণ তাঁর নিজের কবিতার শক্তিতেই তিনি দাঁড়াবেন এবং চিরকাল বেঁচে থাকবেন। যে কবি 'সাত সাগরের মাঝির' অনবদ্য কবিতাগুলো রচনা করেছেন, তাঁর জন্য আর কারো কিছু করার প্রয়োজন নেই। তাঁর কবিতাকে সকলের সামনে উপস্থিত করতে হবে। কবিতার প্রাপ্ততাকে নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে যারা কবিতা বোঝে, কবিতার আবেদন যাদের কাছে আছে, তারা ঠিকই ফররুখ আহমদকে চিনে নিবে এটা আমার বিশ্বাস।

আজকে অনেক কবিতা শোনা হলো। এগুলো শুনে মনে হয়েছে, তাঁকে নিয়ে অনেকের আগ্রহ আছে। অনেকেই তাঁর উদ্দেশ্যে কবিতা রচনা করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন, কিন্তু ফররুখ আহমদ এখানে উপস্থিত থাকলে তিনি এ কবিতাগুলোকে কীভাবে গ্রহণ করতেন আমি জানি না। তবে আমি মনে করি কবিতা লেখার জন্য যে ন্যূনতম পরিশীলনের প্রয়োজন আছে যা না থাকলে কবিতা হয় না, সেটার অভাব অনেকের মধ্যেই লক্ষ্য করা গেছে। কবিতা লিখে গেলেই তা হয় না। কবিতা রচনার জন্য প্রচুর চর্চা প্রয়োজন। ভাল কবিতার সাথে পরিচয় থাকতে হবে। সুকবিতার সাথে পরিচয় থাকতে হবে। অনেক ভাল কবিতা মুখস্থ থাকতে হবে। তাহলে একজন হয়তো বিশেষ মুহূর্তে একটি ভাল কবিতা রচনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশে ভালো কবিতার যে সমাদর আছে সেটা তো অস্বীকার করা যায় না। পহেলা বৈশাখে বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণ অথবা তাঁর কাছাকাছি বিভিন্ন স্থানে যে সব কবিতার আসর বসে সেখানে দেখা যায় যে, সারা বাংলাদেশ থেকে কবিরা বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে এসে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশে কবি হিসাবে যারা সম্মানিত- রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাস, ফররুখ আহমদ এবং ফররুখ আহমদের সমসাময়িক কবি আহসান হাবীব, সৈয়দ আলী আহসান, আবুল হোসেন এঁরা ছিলেন তিরিশোত্তর যুগের প্রথম আধুনিক বাংলা কবি। এঁদের কবিতা প্রায়ই একসঙ্গে বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হতো। বিশেষ করে মোহাম্মদী পত্রিকায়, আমি দেখেছি এদের জন্য একটি বিশেষ জায়গা ছিল। আবুল হোসেন, ঐ সময়কার একমাত্র কবি যিনি এখনও বেঁচে আছেন, যার বয়স ৯০-এর কাছাকাছি, তিনি সারা জীবনই কবিতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক রক্ষা করেছেন। আলী আহসানও কবি হিসাবে অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। আহসান হাবীবও তাই। এই যে চার জন কবি প্রায় একই সময় লিখতে শুরু করেছিলেন, এঁরা কিন্তু প্রত্যেকেই কবি পরিচয় নিয়ে সগৌরবে টিকে আছেন।

আমরা এখন বাংলাদেশে নানাভাবে বিভক্ত হয়ে আছি, সমাজটা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে ফররুখ আহমদও ব্যতিক্রম নন। বর্তমানে তিনি যে অবস্থানে আছেন সেখানে পরিবর্তন আনতে হবে। আমি মনে করি, তিনি কোন গোষ্ঠীর কবি নন। তাঁর কবিতায় সর্বজনীন ও সর্বমানবিক একটি আবেদন আছে। তাই তিনি কেন শুধু একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর কবি হয়ে থাকবেন? কেন তিনি সকলের কবি হতে পারবেন না? আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি, ফররুখের কবিতার দ্বারাই এ অবস্থার পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব এবং তাঁকে সর্বসমক্ষে সর্বজনীন কবি হিসাবে তুলে ধরা সম্ভব। তাঁর কবিতার মধ্যে সেধরনের সর্বজনীন ও সর্বমানবিক এক শক্তিশালী আবেদন আছে।

আমি ফররুখ আহমদের স্নেহধন্য। তাঁর কাছে আমি অনেক কিছু পেয়েছি, অনেক কিছু শিখেছি এবং সত্যিকথা বলতে কি, ঐ সময়ে আমার কবিতার রুচি গঠনে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান ছিল। তিনি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। মাইকেল মধুসূদনের প্রতি তাঁর যে ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল, সেটা তাঁর কবিতার উপরে

বিভিন্নভাবে ছাপ ফেলেছে। যারা তাঁর হাতেম তা'য়ী পড়েছেন অথবা আজকে এখানে আমরা তাঁর যে সব কবিতার আবৃত্তি শুনলাম, তা থেকে বুঝা যায় যে, তাঁর কবিতার ভাষায় যে দাঢ্য, যে শক্তি এবং সেই সঙ্গে সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে, এটা যে তিনি অর্জন করতে পেরেছিলেন, এখানে কিন্তু মাইকেলের অবদান আছে।

ফররুখ আহমদ কবিতা আবৃত্তি করতেন খুব আবেগ দিয়ে। নিজের কবিতা আবৃত্তি করতেন রেডিও পাকিস্তানে। তখনকার দিনে রেডিও পাকিস্তানে তিনি বহুবার তাঁর কবিতা আবৃত্তি করেছেন। আমি তাঁর কবিতার আবৃত্তি শুনেছি। যারা তাঁকে দেখেছেন, তাঁকে চিনতেন, তাদের মনে আছে তাঁর একটি অপূর্ব কণ্ঠস্বর ছিল। সেই কণ্ঠে তিনি যখন তাঁর কবিতা আবৃত্তি করতেন, তখন তাঁর কবিতা একটি ভিন্নরূপে ধরা দিত। কবিতা জীবন্ত হয়ে উঠতো।

আজকে আমার নিজের একটি অপরাধবোধ আছে তাঁর সম্বন্ধে যে তাঁকে নিয়ে আমি অল্প কিছু কাজ করেছিলাম, তাঁর দু'টি কাব্য সম্পাদনা করেছিলাম। কিন্তু আরো অনেক কিছু হয়তো আমার পক্ষে করা উচিত ছিল। সেটা করা হয়নি। সুতরাং একটা অপরাধবোধ আমার রয়ে গেছে। কিন্তু আমার কিছুটা ভাল লাগছে একারণে যে আপনারা এ অনুষ্ঠানে আমাকে ডেকেছেন। কারণ অনেক অনুষ্ঠান হয় আমি কাগজে পড়ি, কিন্তু আমাকে কেউ কখনও আমন্ত্রণ জানায়নি। অথচ যারা জানেন, তারা জানেন যে, তাঁর সঙ্গে আমার একটি বিশেষ সম্পর্ক ছিল। আমি তার খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম। আমি তাঁর অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলাম এবং তাঁর উপরে সামান্য কিছু কাজও আমি করেছি।

যাই হোক, আমি আজকে ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মুহম্মদ মতিউর রহমানকে আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই যে, তার এই সুন্দর অনুষ্ঠানে তিনি আমাকে ডেকেছেন– যে কারণে আমি এখানে আসবার সুযোগ পেলাম এবং এখানে এসে বুঝতে পারলাম যে, ফররুখ আহমদ হারিয়ে যাবার মত ব্যক্তি নন। তিনি কখনও হারাবেন না, হারিয়ে যাবেন না। তিনি তাঁর কবি পরিচয়েই বেঁচে থাকবেন এবং চিরকাল উজ্জ্বলভাবে বেঁচে থাকবেন। এ অনুভূতিটা নিয়ে যে যেতে পারছি, সে জন্য আমি এ ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানাই, মতিউর রহমান সাহেবকে ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। ◻

---

**ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, চব্বিশতম সংখ্যা, অক্টোবর, ২০১২**

# নতুন পানিতে সফর এবার

## শামসুর রাহমান

আমরা যখন প্রথম লিখতে শুরু করি, তখন আমাদের জিভের ডকায় নাচতো কয়েকটি নাম–শওকত ওসমান, আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, আবুল হোসেন, আবু রুশদ, গোলাম কুদ্দুস, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্ এবং শামসুদ্দীন আবুল কালাম। আমাদের এই জগদ্দল সমাজে লেখক হওয়ার যে কি মানে, তা আমি কাগজে কলম ছুঁইয়েই বুঝতে পেরেছিলাম। তাই আমাদের সমাজের এই অগ্রগণ্য লেখকদের সাহিত্যচর্চা বরাবরই আমার কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ঠেকেছে। তাঁদের সাহিত্য- ফসলের দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞ বোধ করেছি সব সময়। তাই আমাদের আড্ডায় বার বার ঘুরে-ফিরে উচ্চারিত হতো তাঁদের রচিত কতো পঙ্‌ক্তি।

আমাদের বরণীয় এই আটজন লেখকের মধ্যে দু'জন লোকান্তরিত হয়েছেন। সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্ তিন বছর আগে মারা গেছেন প্যারিসে, ফররুখ আহমদ ইন্তেকাল করেছেন গত শনিবার আমাদের এই চিরচেনা ঢাকা শহরে। তিনি মারা গেছেন একেবারে নিঃস্ব অবস্থায়। না, ভুল বললাম। নিঃস্ব কথাটা তাঁর সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। তাঁর মানসিক ঐশ্বর্যের কোনো কমতি ছিল না। তিনি রেখে গেছেন এমন কয়েকটি গ্রন্থ, যেগুলো পঠিত হবে দীর্ঘকাল। তাঁর বহু পঙ্‌ক্তি বারবার গুঞ্জরিত হবে কাব্যপিপাসুদের স্মৃতিতে। যে কবিতা তিনি আমাদের উপহার দিয়ে গেলেন, তা তাঁর স্মৃতিকে চিরদিন পাঠকদের মনে উজ্জ্বল করে রাখবে সত্য, কিন্তু কবিতা তাঁকে দেয়নি সচ্ছলতা, তাঁর পরিবারকে দেয় নি কোনো নিরাপত্তা, সারা জীবন তিনি দারিদ্র্যের সঙ্গেই ঘর করেছেন; জাহান্নামে বসে হেসেছেন পুষ্পের হাসি। দারিদ্র্য তাঁর শরীরকে ক্ষইয়ে দিয়েছিলো ভীষণভাবে, কিন্তু কখনো কামড় বসাতে পারেনি তাঁর মনের উপর। তাঁর মতো অসামান্য কবি খুবই সামান্য একটা চাকরি করতেন। মাইনে পেতেন মাত্র ছ'সাতশ' টাকা। অথচ তাঁর ঘরে বারো-তেরোজন পুষ্যি। আজকের দিনে এই ক'টি টাকায় কি করে চালানো সম্ভব এত বড় সংসার? ফররুখ আহমদের কাব্যের সংসার যত জেল্লাদারই হোক না কেন, তাঁর সংসার বরাবরই খুব নিষ্প্রভ। দারিদ্র ম্লান করে দিয়েছিল তার সংসারের সুখ। পয়সা কামানোর দিকে কখনো মন ছিল না তাঁর। পারলে তিনি হয়তো চাকরিও করতেন না কখনো। ধরা-বাঁধা চাকরি করার মানসিকতা তাঁর ছিল না। তিনি ছিলেন ভিন্ন ধাতুতে গড়া। তাই যখন তাঁকে রেডিও অফিসে দেখতাম একজন সামান্য চাকুরে হিসাবে, আমার কেমন যেন ঘটকা লাগতো। সেখানে বড় বেমানান লাগতো ফররুখ আহমদকে।

অনেক বছর আগের কথা। আমিও তখন রেডিওতে চাকরি করি। আমার জীবনের সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন দুটি বছর আমি কাটিয়েছিলাম রেডিওতে। কিন্তু আমার সেই কর্মজীবনের একমাত্র আনন্দ ছিল ফররুক আহমদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দেয়া। মতাদর্শের দিক থেকে আমরা অবস্থান করতাম দুই বিপরীত মেরুতে। আমি জানতাম তার ঝাঁঝালো রাজনৈতিক মতাদর্শের কথা, তাঁর অসহিষ্ণুতার কথা–কিন্তু এর কোনোটাই সে সময় আমার আর তার সম্পর্কের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি। তিনিও ভালো করেই জানতেন আমার বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের কথা, আমার রাজনৈতিক মতামতের কথা। তাঁর সঙ্গে কখনো আমার কোনো রাজনৈতিক সংলাপ হয়নি। তিনি এড়িয়ে যেতেন, আমিও তাকে রাজনৈতিক তর্কে জড়াতে প্ররোচিত করিনি কোনদিন। আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা মেতে থাকতাম সাহিত্যালোচনায়। বিশেষ করে কবিতার কথা বলতে ভালোবাসতেন তিনি, বিভিন্ন কবির পঙ্‌ক্তিমালা তিনি আবৃত্তি করতেন তাঁর আশ্চর্য সুরেলা কণ্ঠে। ইংরাজি রোমান্টিক কবিকুল তাঁর মন হরণ করেছিলেন। তাঁর কণ্ঠে যখন-তখন ধ্বনিত হতো শেলী, কিট্‌স এর অবিনাশী পঙক্তিমালা। যখন তিনি আবৃত্তি করতেন, তাঁর দীর্ঘ এলোমেলা চুল নেমে আসতো কপালে, ধারালো উজ্জ্বল চোখ হয়ে উঠতো উজ্জ্বলতর। তাঁর আরেকটি প্রিয় প্রসঙ্গ ছিল মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতা। মধুসূদনের কথা বলতে গেলেই তার কণ্ঠে বেজে উঠতো অন্য রকম সুর। মধুসূদনের কবিতা অনর্গল মুখস্থ বলে যেতে পারতেন তিনি।

শনিবার রাতে তার মৃত্যুর সংবাদ শুনে ছুটে গিয়েছিলাম কবির ফ্ল্যাটে। যে ফররুখ আহমদকে আমি বহুদিন বসে থাকতে দেখেছি আজিজিয়া রেস্টুরেন্টে, যে ফররুখ আহমদের সঙ্গে রেডিওর মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে কবিতা পড়েছি, যে ফররুখ আহমদের সঙ্গে রমনার কৃষ্ণচূড়াময় পথে হেঁটেছি বহুদিন, যে ফররুখ আহমদের সঙ্গে কথা বলেছি দিনের পর দিন, যে ফররুখ আহমদকে কাজের ক্লান্তির মধ্যেও কোনোদিন এতটুকু ঝিমুতে দেখিনি, সেই ফররুখ আহমদকেই দেখলাম শায়িত তাঁর নিভৃত শয্যায়। তাঁকে দেখলাম নির্বাক, নিথর। কী আশ্চর্য, তিনি একবারও হাসিমুখে তাকালেন না আমার দিকে, বললেন না কি চলবে নাকি এক পেয়ালা? না তিনি এই প্রথমবারের মতো আমাকে চা খেতে অনুরোধ করলেন না। অথচ তাঁর চা না খাওয়ানো ছিল অসম্ভব ব্যাপার। আমি অনন্ত এমন একটি দিনের কথাও মনে করতে পানি না যে, আবন মিয়ার দোকানে গিয়ে ফররুখ আহমদের পাশে বসেছি এবং চা ও নিমকি খাইনি। চা না খাইয়ে তিনি ছাড়তেন না। কোন ওজর-আপত্তি তিনি শুনতেন না। 'আরে খাও খাও কিস্‌সু হবে না', বলতেন সেই দরাজ-দিল মানুষটি ।

অমন নিথর, নিঃশব্দ ফররুখ আহমদকে বড়ই বেমানান লাগছিল সেই বিছানায়। যেমন তাঁকে বেমানান মনে হতো রেডিওর কাছে। তাঁর নিস্পন্দ শরীর আর তন্ময় নিদ্রার দিকে তাকিয়ে আমার মনে পড়লো তাঁরই কয়েকটি লাইন-

এ ঘুমে তোমার মাঝি-মাল্লার ধৈর্য নেইকো আর,
সাত সমুদ্র নীল আক্রোশে তোলে বিষ ফেনভার,
এদিকে অচেনা যাত্রী চলেছে আকাশের পথ ধরে
নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা।
বেসাতি তোমার পূর্ণ করে কে মারজানে মর্মরে?
ঘুমঘোরে তুমি শুনছো কেবল দুঃস্বপ্নের গাঁথা।
উচ্ছৃঙ্খল রাত্রির আজো মেটেনি কি সব দেনা?
সকাল হয়েছে। তবু জাগলে না?
তবু তুমি জাগলে না?

তিনি আর কোনোদিনই জাগবেন না। তাঁর প্রায় আসবাবহীন সেই ঘরে দেখলাম ইতস্তত ছড়ানো কিছু বই। দেখলাম, তাঁর খুব কাছেই রয়েছে তাঁর প্রিয় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্যগ্রন্থ। মধুসূদনের অকৃত্রিম শুভার্থী এবং উনিশ শতকী বাংলার অন্যতম প্রধান গুরু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতিও ফররুখ আহমদের অবিচল শ্রদ্ধা ছিল। তিনি প্রায়শই বলতেন, বুঝলে শামসুর রহমান, এই বিদ্যাসাগরের মতো, এক-দেড়জন ব্যক্তি আমাদের সমাজে জন্মালে এই পচা-গলা সমাজের চেহারাটাই পাল্টে যেতো।

কখনো-কখনো জীবনের দুঃখ-দুর্দশার কথা উঠতো, উঠতো জীবন-সংগ্রামের কথা। এই প্রসঙ্গে একবার তিনি রানা প্রতাপ সিংহের পলাতক দিনের গল্প বলেছিলেন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রানা প্রতাপ ঘুরছেন বনে-প্রান্তরে। শত দুঃখ-দুর্দশা সত্ত্বেও তিনি আত্মসমর্পণ করেননি আকবর বাদশাহের কাছে। কিন্তু যেদিন একটা বনবেড়াল তাঁর শিশুকন্যার হাত থেকে খাসের রুটি ছিনিয়ে নিয়ে খেলো, সেদিনই তিনি ধরা দিলেন আকবরের সৈন্যদের হাতে। তিনি একাধিকবার এই গল্প আমাকে শুনিয়েছেন। কেন এই গল্প বলতেন তিনি? পুত্র-কন্যার মুখ চেয়ে চাকরি করতে বাধ্য হচ্ছেন বলেই এই গল্পই তিনি বলতেন, যেন নিজেকেই শোনাতেন সেই আত্মসমর্পণের অত্যন্ত মানবিক কাহিনী। হয়তো রানা প্রতাপ সিংহের সঙ্গে কোথাও নিজের একটা মিল খুঁজে পেতেন।

আমি আজ তাঁর কাব্যের গুণাগুণ বিষয়ে কিছু বলবো না। এই মুহূর্তে ব্যক্তি ফররুখ আহমদই আমার কাছে বড় হয়ে উঠেছেন বার বার। মনে জেগে উঠছে নানা স্মৃতির ভগ্নাংশ। তবে একথা অবশ্যই বলবো, তাঁর মৃত্যুতে অনেকখানি গরিব হয়ে গেল আমাদের কাব্যক্ষেত্র। একদা তিনি লিখেছিলেন :

গোধূলি-তরল সেই হরিণের তনিমা পাটল

-অস্থির বিদ্যুৎ তার বাঁকা শিঙে ভেসে এল চাঁদ
সাত সাগরের বুকে সেই মৃদু আলোক চঞ্চল।
অন্ধকার ধনু হাতে তীর ছোঁড়ে রাত্রির নিষাদ।

কিংবা-

আমি দেখি পথের দু'ধারে ক্ষুধিত শিশুর শব,
আমি দেখি পাশে পাশে উপচিয়া পড়ে যায়
ধনিকের গর্বিত আসব
আমি দেখি কৃষাণের দুয়ারে দুর্ভিক্ষ বিভীষিকা,
আমি দেখি লাঞ্ছিতের ললাটে জ্বলিছে শুধু অপমান টিকা,
গর্বিতের পরিহাসে মানুষ হয়েছে দাস, নারী
হলো লুণ্ঠিতা গণিকা

-এর মতো পঙ্‌ক্তি। তাঁর লেখনী আর কোনোদিন চঞ্চল হবে না, ভাবলেও দুঃখ হয়। আমার এই লেখা খুবই অকিঞ্চিৎকর। তবে একটু সান্ত্বনা, অনেক বছর আগে দৈনিক 'মিল্লাত'-এর 'রবিবার'– এর ক্রোড়পত্রে আমি এই প্রতিভাবান কবির প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছিলাম একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধে। একজন অর্বাচীন উত্তরসাধকের সেই প্রবন্ধ পাঠ করে তিনি অখুশি হননি, এই তথ্য আমার পক্ষে খুবই তৃপ্তিকর।

ফররুখ আহমদ কোনো ব্যাংক-ব্যাল্যান্স রেখে যাননি। রেখে যাননি কোনো জমিজমা। তাঁর চিরনিদ্রার এতটুকু ঠাঁইয়ের জন্য আমি খুঁজতে গিয়েও বিড়ম্বিত হতে হয়েছে তাঁর অনুরাগীদের। শেষ পর্যন্ত উজ্জ্বল উদ্ধার হয়ে এলেন কবি বেনজীর আহমদ। তিনি বললেন, আমি আমার ফররুখ ভাইকে নিয়ে যাব আমার ডেরায়। একজন কবিকে কবরস্থ করা হলো অন্য এক কবির বসত বাড়ির সীমানায়। তাঁর কবরের জমি নিয়ে যত ঝামেলাই হোক, তাঁর সন্তানরা যত বঞ্চিতই হোক, পার্থিব জমি-জমা থেকে তিনি রেখে গেছেন অন্যরকম বিঘা বিঘা জমি– যে জমির ফসল দেখে চোখ জুড়াবে, সাহিত্য-পথযাত্রীদের। এই সমৃদ্ধ জমি পেছনে রেখে তিনি নিজে যাত্রা করেছেন নতুন রহস্যময় পানিতে, নিরুদ্দেশ সফরে। ◻

---

**[শাহাবুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত 'ফররুখ আহমদ ব্যক্তি ও কবি', প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪ গ্রন্থ থেকে পুনর্মুদ্রিত।]**

# আমার বন্ধু ফররুখ আহমদ

## লুৎফর রহমান জুলফিকার

মুসলিম রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদের কথা মনে পড়ছে। ১৯৪৩-এ কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ হলে পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যে জাঁকজমকপূর্ণ শিল্পী-সাহিত্যিকদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত, সে সম্মেলনে তখনকার তরুণ কবি ফররুখ আহমদ তাঁর স্বরচিত 'খোশ্ আমদেদ্' নামে একটি সাড়া জাগানো সুদীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। স্বরচিত কবিতা পড়ে সেদিন তিনি শিল্পী-সাহিত্যিক সুধীসমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

কবিতা পাঠের সেই মঞ্চে তাঁর দীপ্ত প্রতিভা, চেহারা, কণ্ঠস্বরের পৌরুষে এবং শেরওয়ানী-পাজামা চুল ও চোখের বৈশিষ্ট্য সুধীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আবৃত্তি শেষে হলে প্রশংসামুখর ইসলামিয়া কলেজের হল-ঘরটি হাততালির শব্দে টালমাটাল হয়ে উঠেছিল। কবিতা পাঠের পর তরুণ কবি সুধী-শ্রোতামণ্ডলীর কাছ থেকে যে আন্তরিক সম্বর্ধনা লাভ করেছিলেন, তা বোধ হয় আমদের পরম প্রিয় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছাড়া আর কারো ভাগ্যে জোটেনি। তাছাড়া 'শাত-ইল-আরবে'র তরুণ কবি নজরুল যেমন তাঁর একটি কবিতা প্রকাশের পর যে যশ ও খ্যাতি লাভ করেছিলেন, ঠিক তেমনি 'খোশ আমদেদ্'-এর তরুণ কবি ফররুখ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তখনকার পত্র-পত্রিকায় কবি ও কবিতাটির ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছিল।

সেদিন সেই ইসলামিয়া কলেজের হল থেকে কবি ফররুখ আহমদের সঙ্গে আমার যে ব্যক্তিগত পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়েছিল তা কখনো ক্ষুণ্ন হয়নি। পরবর্তীকালে কলকাতা থেকে বিদ্রোহী কবি নজরুলের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'নওজোয়ান' পত্রিকার একজন নির্ভীক লেখক হিসাবে ফররুখের সঙ্গে আমার আরো গভীর সখ্যতা গড়ে ওঠে। আমরা বহু স্বপ্ন ও সাধনা নিয়ে চলার পথে এগিয়ে চলি। ভারত ও পাকিস্তানের প্রথম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সাপ্তাহিক 'নওজোয়ান' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় ফররুখ আহমদ কলকাতা লোয়ার সার্কুলার রোডে 'নওজোয়ান' পত্রিকার অফিসে বসে তাঁর বিখ্যাত 'শিকল' কবিতাটি রচনা করেন। কবিতাটি 'নওজোয়ান' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ভারত ও পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার প্রতীকের নিচে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ছাপানো হয়েছিল। কবিতাটি হচ্ছে এই -

> শিকল যদিও শিথিল হয়েছে বণিক রাজার
> পুঁজিবাদ তবু শতমুখে তার বিষ ছড়ায়,

বর্গীরা লোটে দুই হাতে ধান, শূন্য খামার
বিরান বাগের বুলবুল হ'লে শকুনি হায়,
মজলুমানের রক্তে এখনো পৃথ্বি লাল;
কোথায় ওড়াবো শান্তি প্রতীক আল-হেলাল?
কোথায় ওড়াবো হেলাল? সামনে মৃত্যু-প্রাকার।
কোথায় আমার মুক্তির দিশা-পথ রঙিন?
হানে বিশ্বাসে ইব্‌লিস তার খঞ্জর ধার,
হায় পলাতক এখনো তোমার আসেনি দিন,
খোলেনি অন্ধ আজো কবন্ধ রাতের খিল
আঁধারের চেয়ে আরো বিষাক্ত, ক্রুর, জটিল।
আবার তোমার তূর্যে বাজাও নবীন নকীব,
তিমিরাবর্তে এখনো রাতের হয়নি শেষ,
পদতলে প'ড়ে আছে জনগণ বিশীর্ণ ক্লীব
অনাবিস্কৃত আমার স্বাধীন স্বপ্নদেশ ।
বাজাও তোমার তূর্য নকীব! জ্বালা আগুন,
দেখো হানা দেয় এখনো দু'পাশে দস্যু হুন।
এখনো আঁধারে হানা দিয়ে ফেরে পুঁজিবাদী পাপ,
এখনো আকাশ ভরে মানুষের আর্তরোলে,
এখনো ছড়ায় পথে-প্রান্তরে কোটি অভিশাপ,
ধনতন্ত্রের প্রেত ঘোরে আজো চতুর্দোলে,
ঘোর বুভুক্ষ, জনগণ পথে পাংশু মুখে;
দ্বার থেকে দ্বারে ফেরে তার দাবী ক্লান্ত বুকে।
হে নকীব! জাগো, জাগাও সুপ্ত দিগন্ত নীল,
সব বন্ধন, মুক্তির সুর বাজাও আজ,
ইস্রাফিলের 'সুরে' ভেঙে দাও বিশ্ব নিখিল,
ইস্রাফিলের 'সুরে' পৃথিবীকে জাগাও আজ!
চির পলাতক শিকার সে হোক দৃপ্ত আজ;
মানবতা হোক নির্যাতিতের মাথার তাজ ॥

তাছাড়া, ফররুখ আহমদ 'নওজোয়ান' পত্রিকার ছদ্মনামেও অনেকগুলো কবিতা রচনা করেছিলেন। 'নওজোয়ান'-এ তিনি 'হায়াত দারাজ খান পাকিস্তানী' নামে 'মন্ত্রিগিরির সিঁড়ি' ও অন্যান্য কয়েকটি স্যাটায়ার **(Satire)** লিখেছিলেন।

১৯৫২-এর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সাপ্তাহিক 'নওজোয়ান' পত্রিকার একটি বৈপ্লবিক ভূবিকা ছিল। ১৯৪৮ থেকে 'নওজোয়ান' পত্রিকার মাধ্যমে তা

বেপরোয়াভাবে শুরু করা হয়েছিল-যেদিন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' বলে হুমকি দিয়ে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেদিন আমরা তীব্র বিরোধিতা করেছিলাম। সেই বিরোধী কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিকের প্রথম কাতারের অন্যতম সৈনিক ছিলেন তরুণ নির্ভীক কবি ফররুখ আহমদ। আমরা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করেছি, পত্রিকায় লিখেছি, ইশতেহার ছেপেছি এবং বহু মিটিং করেছি। ঢাকা থেকে আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'নতুন দিন' পত্রিকার মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে আরো ব্যাপকভাবে শক্তিশালী ও সংগঠিত করার ব্যাপারে তৎকালের ছাত্র-শিক্ষ-বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে গঠিত ভাষা সংগ্রাম আন্দোলনের সঙ্গে আমরা সমস্ত শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাই। এ প্রসংগে সে সময়ে নাজিমউদ্দীন রোডে অবস্থিত ঢাকা রেডিও স্টেশনের কথা স্মরণ হচ্ছে। কবি ফররুখ আহমদ, বেতার-শিল্পী শেখ লুৎফর রহমান, আব্দুল লতিফ ও অন্যান্য শিল্পী-সাহিত্যিকদের নিয়ে আমরা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন গড়ে তুলি।

আমি তখন ঢাকা রেডিওর একজন নিয়মিত কথক ছিলাম। বন্ধু ফররুখ আহমদ ও আমরা রেডিও স্টেশনের সামনে আজিজ মিয়ার রেস্তোরাঁর আড্ডায় বসে রাষ্ট্রভাষার উপর অনেক কাব্য-কবিতা গান-গল্প তৈরি করে ভাষা আন্দোলন-বিরোধী বন্ধুদের ক্ষেপিয়ে তুলতাম। ফররুখ আহমদ ছোট-ছোট স্যাটায়ার তৈরি করে স্যুটি-টাইওয়ালা সরকার সমর্থক রেডিওর বন্ধুদের ক্ষেপিয়ে অনেক রসাত্মক কবিতা রচনা করতেন, আর মাঝে মধ্যে তাঁর বিখ্যাত প্রিয় পার্কার কলমটি উঁচিয়ে ধরে বলতেন, এ কলম দিয়ে গুলি করে বাংলা-বিরোধী দালালদের ধ্বংস করবো, আর রাষ্ট্রভাষা বাংলার জয়গান গাইবে। সে সময় বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর অসম্ভব প্রীতির জন্যে তাঁকে কমুনিস্ট পর্যন্ত বলা হতো। বলাবাহুল্য, কবি ফররুখ আহমদকে তদানীন্তন সরকার কর্তৃক নানাভাবে নাজেহাল হতে হয়। কিন্তু নির্ভীক কবি ফররুখ আহমদ কখনো কারো কাছে তাঁর উন্নত শির নত করেননি। তাঁর সে আদর্শ ছিল ইস্পাতের মতো দৃঢ় ও অটুট। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তা থেকে তাঁকে বিচ্যুত হতে দেখা যায়নি। এই মহান কবি-ব্যক্তিত্ব ও আমার বিশিষ্ট বন্ধুর কথা মনে পড়ায় আমার চোখ অশ্রুতে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। ❐

---

**[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, বিংশ সংখ্যা, অক্টোবর ২০১০-জুন ২০১১]**

# ব্যক্তি ও কাব্য-শিল্পী ফররুখ

## সানাউল্লাহ্ নূরী

১৯৪৯ সালের দিকে ফররুখ আহমদের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। এক অসাধারণ সম্মোহনী শক্তি ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের। প্রথম আলাপেই ঘনিষ্ঠতা। মনে হয়েছিল যেন কত কাছের মানুষ তিনি। তখন সংবাদপত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়ি। কলকাতার ৮৬/এ সার্কুলার রোড থেকে ঢাকার ঢাকেশ্বরী রোডে কেবল স্থানান্তরিত হয়ে এসেছিল দৈনিক আজাদ। খোলা ময়দানে টিনের লম্বা একটি শেড তুলে শুরু হয় কাগজের কাজকর্ম। এর আগে ১৯৪৭ সালের শেষ দিকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের নিবেদিত-প্রাণ কর্মী এবং সাংবাদিক ডা. আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে আমরা তাঁর কয়েকজন সহযোগী মিলে ঢাকা থেকে অর্ধ সাপ্তাহিক কাগজ 'ইনসান' বের করবার কাজে হাত দেই। এটি ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রথম বলিষ্ঠ মুখপত্র। ১৯৪৮ সালের জুলাই পর্যন্ত নিয়মিত বেরুবার পর টাইফয়েডে আক্রান্ত আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরীর আকস্মিক মৃত্যুতে 'ইনসান'-এর প্রকাশনায় ছেদ পড়ে যায়। আমি দৈনিক আজাদ পত্রিকার বার্তা বিভাগে যোগ দেই। এখানেই সম্ভবত ঊনপঞ্চাশে ফররুখ আহমদের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ।

নওয়াবপুর রোডে 'দরদী লাইব্রেরি' নামে আমার একটি বই বিপণি ছিল। পরে 'ইনসাফ' অফিসও এখানে উঠে আসে। এখানে প্রায়ই আসতেন কবি। আসতেন ১৯ নম্বর আজিমপুরস্থ সাপ্তাহিক সৈনিক ও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সংগঠন তমদ্দুন মজলিস অফিসে। দু'টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই জড়িত ছিলাম আমি।

তখন আজাদ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক ও সমালোচক আবুল কালাম শামসুদ্দিন। সম্পাদকীয় বিভাগে ছিলেন মননশীল প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট মুজিবুর রহমান খাঁ এবং কথাশিল্পী আবু জাফর শামসুদ্দিন। বিকেলে কবি এবং লেখকদের জমজমাট আসর বসতো সম্পাদকীয় কক্ষে। ১৯৪৭ সালের আগস্টে উপমহাদেশ বিভাগের পটভূমিতে ঢাকা সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হওয়ায় ততদিনে কলকাতা থেকে কবি শাহাদাৎ হোসেন, কবি জসীমউদ্‌দীন, কবি গোলাম মোস্তফা, কবি বন্দে আলী মিয়া, কবি বেনজীর আহমদ, সঙ্গীত শিল্পী আব্বাস উদ্দিন আহমদ, কবি আহসান হাবীব, কবি আবদুল কাদির, কবি সুফিয়া কামাল, কবি তালিম হোসেন, কবি আবুল হোসেন এবং কলকাতা বেতারের অনেক সঙ্গীত শিল্পী স্টাফ আর্টিস্ট, কথক ও উপস্থাপক এই শহরে এসে গেছেন।

বর্ষীয়ান কবি শাহাদাৎ হোসেন, কবি ফররুখ আহমদ এবং আরও অনেকে নাজিমুদ্দিন রোডস্থ ঢাকা বেতার কেন্দ্রে যোগ দিলেন নিয়মিত স্ক্রিপ্ট রাইটার

হিসেবে। এঁদের প্রায় সবাই আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন এবং মুজীবর রহমান খাঁ সাহেবের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। আজাদ-এর সান্ধ্যকালীন আলাপচারিতার আসরে রোজই এঁদের পাঁচ-সাতজনকে দেখা যেত। ঘণ্টা কয়েক ধরে চলত এই সাহিত্যিক আড্ডা। আপ্যায়ন চলত চা-বিস্কিট আর গান পরিবেশনে। সে সঙ্গে কবিতা, গল্প, নাটক, বিশ্ব সাহিত্য এবং মাঝে মাঝে রাজনীতি, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করবার দাবি ইত্যাদি প্রসঙ্গেও মতবিনিময় হতো।

প্রখ্যাত রাজনীতিক, বাগ্মী, বিদগ্ধ সাহিত্যিক ১৯৩৬ সালে আত্মপ্রকাশের সময়কার দৈনিক আজাদ-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মওলানা মুহম্মদ আকরম খাঁ, বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সাংবাদিক-সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, মুজীবুর রহমান খাঁ, সাংবাদিক-লেখক তালেবুর রহমান প্রমুখ বুদ্ধিজীবীগণ বিভাগ-পূর্বকালীন যুগেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে লেখালেখি করে আসছিলেন। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়ার দাবি নিয়ে ১৯৪৭ সালের পনের সেপ্টেম্বর থেকে তমদ্দুন মজলিস এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ ও শিক্ষকদের মিলিত সহযোগিতায় আমরা যে ব্যাপক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলাম তার একনিষ্ঠ সমর্থকদের অগ্রসারিতে পাই কবি ফররুখ আহমদকে।

বিশ শতকের তিরিশ দশকের তরুণ কবিদের মধ্যে আগেই তিনি বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে একজন ব্যতিক্রমী কাব্য কলাবিদ হিসেবে নিজের আসন পাকাপোক্ত করে নিয়েছিলেন। ছন্দের বৈচিত্র্য, উপমা-উৎপ্রেক্ষার নিপুণ ব্যবহার, কবিতায় ভাষার শিল্প সৌকর্য, শব্দের ঔজস্বিতা, বিষয়বস্তুর সঠিক উপস্থাপনা ইত্যাদি গুণের একত্র সমাবেশের মাপকাঠিতে তাঁর কবিতা পেয়েছিল এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। চল্লিশ দশকের বিরল প্রতিভাধর কয়েকজন আধুনিক কবির মধ্যে শীর্ষে উঠে আসে তাঁর নাম। সেকালে তাঁর কবিতা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয় প্রথম শ্রেণির সাহিত্য পত্রিকাগুলোতে। সনেট, মাঝারি ধরনের শিল্পিত এবং দীর্ঘাঙ্গ কবিতা ছাড়াও বিদ্রূপাত্মক কাব্য চর্চায়ও পারঙ্গম ছিলেন ফররুখ আহমদ। এর পরিচয় পাই আমরা বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে তদানীন্তন মুসলিম লীগ সরকারের অপনীতির তীব্র সমালোচনা করে ছদ্মনামে রচিত তাঁর শ্লেষাত্মক কবিতাগুলোতে। ১৯৫০ সাল থেকে পত্র-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা ভাষার পক্ষে লেখা তাঁর এ পর্যায়ের বিপুল সংখ্যক কবিতা।

ফররুখ কত বড় একজন বাংলা ভাষাপ্রেমিক ছিলেন তাঁর এই ধারার কবিতাগুলো তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। যাঁরা তাঁকে শুধুমাত্র ইসলামের ঐতিহ্যবাদের ধারক কবি হিসেবে সংকীর্ণতার গণ্ডিতে আবদ্ধ রেখে ছোট করে দেখতে চান তাঁর এদিকটি সম্পর্কে হয় অজ্ঞ নয়তো বিষয়টিকে পাশ কাটিয়ে যেতে চান। তাছাড়া একজন প্রধান কবির মূল্যায়ন করতে হলে তাঁর সমগ্র কাব্যকর্মের তুল্য মূল্যের বিচার

করতে হয় এবং চিহ্নিত করতে হয় কবিতার শৈল্পিক গুণটিকে। যন্ত্রণাক্ষত এই মহান কবিপুরুষের বিষাদময় মৃত্যুর অনেককাল পর গত কয়েক বছর ধরে কেবল নব প্রজন্মের কবি ও সমালোচকদের সঠিক মূল্যায়নের ফলে ফররুখ এখন আপন প্রাপ্য গৌরবে উঠে আসতে শুরু করেছেন এক কালোত্তীর্ণ কবির স্বীকৃত মর্যাদায়।

ফররুখ আহমদের জন্ম যশোরের এক ঐতিহ্যবাহী পরিবারে। অনেক কাল আগে থেকেই এই পরিবারে সাহিত্য, সঙ্গীত এবং সংস্কৃতির চর্চা চলে আসছিল। তাঁদের বাড়িতে দুর্লভ গ্রন্থ-সম্ভারে পূর্ণ একটি সমৃদ্ধ পাঠ্যাগারও ছিল। শৈশবকালেই এখানে সাহিত্য জগতের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। স্কুল জীবন থেকেই ফররুখের কাব্য চর্চার শুরু। কবি আবুল হাশিম ছিলেন খুলনা জেলা স্কুলে ফররুখের শিক্ষক। ১৯৩৬ সালে এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে বদলি হয়ে আসেন আবুল হাশিম। ফররুখ আহমদ সে বছরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে খুলনা ছেড়ে কলকাতা চলে গেলেন কলেজে ভর্তি হতে। আবুল হাশিম তাঁর ফররুখ সংক্রান্ত এক স্মৃতিচারণমূলক নিবন্ধে লিখেছেন : "কলেজের ক্লাস রুমে ডাগর চোখের এক স্বল্পভাষী ছেলেকে দেখে প্রথম তার দিকে আমার দৃষ্টি পড়ল। একান্তে বসে বই পড়তো সে। একদিন স্কুল ম্যাগাজিনে ছাপাবার জন্য একটি কবিতা নিয়ে আমার কাছে হাজির হলো ছেলেটি। পড়ে দেখলাম সুঠাম ছন্দে লেখা চমৎকার কবিতা সেটি। ম্যাগাজিনে ছাপাতে দিলাম। এই ছেলেই ফররুখ আহমদ।"

স্মৃতিচারণে আবুল হাশিম আরও লেখেন : "এর পর অনেক দিন আমার যোগাযোগ হয়নি ফররুখের সঙ্গে। দশ বছর পর, ১৯৪৬ সালে কলকাতায় এক আত্মীয়ের বাসায় উঠলাম। সেখানে সাহিত্যিক অধ্যক্ষ ইবরাহীম খাঁ সাহেবও থাকতেন। একদিন তিনি সদ্য প্রকাশিত দুটি কাব্যগ্রন্থ নিয়ে টেবিলে রাখলেন। এর একখানির নাম 'সাত সাগরের মাঝি'। কাব্যগ্রন্থটি তুলে নিলাম। খুলতেই চোখে পড়ল 'সিন্দবাদ' কবিতাটি। পড়েই নতুন এক ছন্দ এবং ভাবানুভূতির কাঁপন জাগল প্রাণে।" ফররুখের সেই কবিতার অনুপম কয়টি পঙ্ক্তি তুলে ধরল :

> কেটেছে রঙিন মখ্‌মল দিন, নতুন সফর আজ
> শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
> ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ
> পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ বয়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক...

আমাদের পুঁথি সাহিত্য প্রাচীন কাহিনী কাব্য এবং বিশেষ করে আরবি, ফার্সি ভাষা থেকে চয়ন করা অনুপম শব্দাবলীর এক অফুরন্ত উৎস। বাংলার 'ছন্দ সম্রাট' বলে অভিহিত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রথম অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বাংলা কবিতায় এসব শব্দ ব্যবহার করেন। কবি মোহিত লাল মজুমদারের কবিতায়ও এ ধরনের অনেক শব্দের বিপুল ব্যবহার লক্ষ্যগোচর। নজরুল ইসলামের অজস্র গান, কবিতায়

এ সব শব্দের পারঙ্গম ব্যবহার কবিতার বাণীকে দিয়েছে তীক্ষ্ণতা। যেমন– তাঁর বিখ্যাত 'শাতিল আরব' কবিতা। এই কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তিগুলো এরকম :

'শাতিল আরব, শাতিল আরব
পূত যুগে-যুগে তোমার তীর
শহীদের লহু, দিলীরের খুন ঢেলেছে যেখানে
আরব বীর।...

রবীন্দ্রনাথ রক্ত অর্থে খুন শব্দটি ব্যবহারে প্রথম দিকে আপত্তি করলেও পরে নজরুলের মতই তা গ্রহণ করেছেন। তিনি রঙিন, তাজা, মহান, হাওয়া, দুয়ার, রংমহল, কেতাব প্রভৃতি অনেক ফার্সি শব্দ ব্যবহার করেছেন তাঁর পদ্যে এবং গদ্যে।

ফররুখ আহমদই প্রথম কবি যিনি এসব শব্দকে বাংলা শব্দের সঙ্গে অসাধারণ শিল্পকুশলতায় এক অপূর্ব দ্যোতনায় ব্যবহার করলেন। যেমন- 'রঙিন মখ্‌মল দিন', 'নোনা দরিয়ার ডাক', 'সফেদ চাঁদির তাজ', 'ঝরে যায় শবনম ভোরের হাওয়ায়', 'জ্বলি শামাদানে, জ্বলি বেদনার দাহে', 'বুনিয়াদ হল নব সৃষ্টি শুরু' ইত্যাদি।

১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষকালীন সময়ে রচিত 'লাশ' কবিতায় কবি লিখেছেন :

'.... তারপর আসিলে সময়
বিশ্বময়
তোমার শৃংখলগত মাংসপিণ্ডে পদাঘাত হানি
নিয়ে যাব জাহান্নাম দ্বারপ্রান্তে টানি
আজ উৎপীড়িত মৃত্যুদীর্ণ নিখিলের অভিশাপ লও;
ধ্বংস হও–
তুমি ধ্বংস হও।'

ফররুখ যে কত বড় একজন মানবতাবাদী কবি ছিলেন এই কবিতাটি তার এক নজির। উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে তাঁর শাণিত উচ্চারণ 'শৃংখলগত মাংসপিণ্ডে পদাঘাত হানি/নিয়ে যাব জাহান্নাম দ্বারপ্রান্তে টানি'-এই দুই পঙ্‌ক্তিতে 'জাহান্নাম পদপ্রান্তে টানি' শব্দগুচ্ছে 'জাহান্নাম' শব্দটির ব্যবহার কী অসামান্য ব্যঞ্জনাই-না যুগিয়েছে কবিতার সমস্ত গাত্রকে। প্রকৃতপক্ষে বিচিত্র শব্দাবলীর শৈল্পিক ব্যবহারই কবি হিসেবে ফররুখের শ্রেষ্ঠত্বের বড় প্রমাণ।

সম্পাদক-সাহিত্যিক আবুল কালাম শামসুদ্দিন, সম্পাদক-সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদ, মুজিবর রহমান খাঁ, ছান্দসিক কবি আবদুল কাদির, সৈয়দ আলী আহসান, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সওগাত সম্পাদক নাসির উদ্দিন, কবি সিকান্দার আবু জাফর, কথাশিল্পী আবু জাফর শামসুদ্দীন, আবু রুশ্‌দ, সঙ্গীত সাধক আবদুল আহাদ, শিল্পী কামরুল হাসান, কবি হাসান হাফিজুর রহমান, প্রফেসর মুস্তফা নূরুল ইসলাম, প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, কবি আবু হেনা

মোস্তফা কামাল, কবি মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্, নজরুল-গবেষক শাহাবুদ্দীন আহমদ, কবি-সমালোচক আব্দুল মান্নান সৈয়দ, অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান প্রমুখ ফররুখ সম্পর্কে ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণসহ তাঁর কাজের প্রকৃষ্ট মূল্যায়ন করেছেন।

**ব্যক্তি ফররুখ**

ফররুখ আহমদ অসাধারণ দৃঢ়চেতা, আত্মপ্রত্যয়ী এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এক স্পষ্টভাষী চরিত্রের অধিকারী মানুষ ছিলেন। স্বাধীনতার পর চরম বঞ্চনা এবং দারিদ্র্যের দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য হলেও মুহূর্তের জন্যও কারও কৃপাপ্রার্থী হননি তিনি। সাদামাটা আটপৌরে জীবনযাপন করতেন কবি। একটি সাদা পাঞ্জাবি, একটি পায়জামা এবং পকেটে একটি কলম ও টুপি ছিল তাঁর সম্বল। নিজেই তিনি বাজার করতেন পরিবার-পরিজনের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে।

১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৭৪-এ মৃত্যু পর্যন্ত আমার ও কবির সম্পর্ক ছিল অন্তরঙ্গতায় উষ্ণ। সামান্য আয়ের মানুষ হলেও নাজিমুদ্দিন রোডস্থ সাবেক বেতার ভবনের সামনের চায়ের দোকানে তাঁর সন্দেশ, সিংগাড়া আর চা খায়নি তাঁর পরিচিত এমন কোনও প্রবীণ ও নবীন কবি ও লেখক সেকালে ছিলেন কিনা সন্দেহ। এদের মধ্যে প্রগতিশীলরাও ছিলেন। সবাইকে সমানে আপ্যায়ন করতেন তিনি। মতাদর্শ-নির্বিশেষে তরুণ লেখকদের কাছে ছিলেন তিনি 'ফররুখ ভাই'।

লেখার জন্য সবাইকে তাগিদ দিতেন তিনি। চাখানাটি গুলজার হয়ে উঠতো সাহিত্যবিষয়ক আলাপচারিতায়। প্রকৃতপক্ষে আজিজ মিয়ার রেস্টুরেন্ট নামে পরিচিত এই চাখানাটি ছিল ফররুখ আহমদকেন্দ্রিক একটি সাহিত্যিক আড্ডাখানা।

একদিন একজন মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখি সামনের কলতলায় নিজের হাতে নিজের জামা-কাপড় ধোয়ায় তিনি ব্যস্ত। মন্ত্রীকে দেখে সংকুচিত হলেন না। হাত ধুয়ে আমাদের নিয়ে গেলেন নিজের আটপৌরে বৈঠকখানায়।

তাঁর কথা বলতে গেলে মনে জেগে ওঠে হাজারো স্মৃতি। এ সামান্য ক'টি কথা বলেই এখানে ছেদ টানলাম। ❐

---

**[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, জুন, ২০০১]**

# আমার অনুভব একান্ত আমারই

## ডক্টর সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়

ফররুখ আহমদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সূত্র তাঁর 'সাত সাগরের মাঝি' নামক কবিতাটি। সে ১৯৫০ সালের কথা। সবে বি.এ পরীক্ষা দিয়ে বসে আছি। সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিনগুলো। ডাক এলো মুনশীগঞ্জ হাইস্কুল থেকে শিক্ষকতা গ্রহণের। উপরের ক্লাসগুলোতে বাংলা পড়াতে হবে। বলা বাহুল্য, সামান্য ষাট টাকা মাইনের ঐ চাকরিটি পেয়ে যেন হাতে আকাশ পেলাম। প্রথম দিনই একেবার তাদের সমস্যার কথা জানতে চাইতেই তারা দুটো কবিতার কথা বিশেষভাবে আমার কাছে উল্লেখ করল, এক, ফররুখ আহমদের 'সাত সগারের মাঝি, দুই, মোহিতলাল মজুমদারের 'কালাপাহাড়'। এ দুটি কবিতা ইতিপূর্বে একজন শিক্ষকের কাছে পড়লেও এদের মানে তাদের কাছে পরিষ্কার হয়নি। তাই নতুন করে কবিতা দুটোর ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব নিতে হল। আর ঐখানে শুরু হল কবি ফররুখ আহমদের সঙ্গে আমার পরিচয়-পর্ব। কবিতাটি পড়াতে গিয়ে কবির শক্তিমত্তার পরিচয় পেলাম, তাঁর কবি-সত্তার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হলাম। বাংলা কাব্যে ফররুখ আহমদ যে কেন একটি বিশিষ্ট কবিকণ্ঠ বলে স্বীকৃত তার আভাস আমি পেলাম ঐ কবিতা পঠন-পাঠনের ফলে।

ফররুখ আহমদ সম্পর্কে আমার প্রাথমিক আগ্রহ ঐখানেই স্থির হয়ে থেকেছিল বেশ কিছুকাল। আমার তখনকার জীবনযাত্রার বেড়া বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঐ বিষয়ে আর বেশিদূর এগোবার। সে যাই হোক, ঐ সময় থেকেই বাংলাদেশের মুসলমান সমাজের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আমার ভাবনার সূত্রপাত হয়। স্বাধীনতার সঞ্জীবনী মন্ত্রে তখন সবাই কিছুটা উজ্জীবিত, সকলেরই জীবনাগ্রহ কিছুটা বেড়ে গিয়েছে। ঐ পরিবেশে আমি মুসলমান সমাজ, কৃষ্টি, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে যেমন কৌতূহলী হয়ে উঠি, তেমনি বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য সাধনা সম্পর্কেও খোঁজ-খবর নিতে থাকি। সে যাই হোক, ১৯৫৫ সলে বাংলায় এম.এ পড়তে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই, তার আগ পর্যন্ত নিতান্তই ছিল আমার সে-সব বিষয়ে ভাসা ভাসা জ্ঞানের ফল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় বাংলাদেশের সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষভাবে কৌতূহলী কবি মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহকে আমি সহপাঠী হিসেবে পাই। ওঁরই সঙ্গে মাঝে মাঝে দীর্ঘ আলোচনা হত এ নিয়ে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমি থাকতাম শ্রোতা, তিনি বক্তা। কথা-প্রসঙ্গে একদিন কবি ফররুখ আহমদের প্রসঙ্গ আমি তুলে ধরতেই, মাহফুজউল্লাহ খুব উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। ফররুখ সম্পর্কে আমার ধারণা শুনে, মাহফুজউল্লাহ শুধু খুশিই হলেন না, আমাকে তাঁর সম্পর্কে কিছু লিখতে অনুরোধ জানালেন, প্রয়োজনে বই-পত্র দিয়ে আমাকে সাহায্য করতেও তিনি প্রতিশ্রুত হলেন। তখন ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি' ও 'সিরাজাম মুনীরা' এ দু'টি বই সম্ভবত প্রকাশিত হয়েছে। তার বাইরে লেখা অজস্র কবিতা পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে

রয়েছে।

তবু ফররুখ আহমদ সম্পর্কে সে যাত্রায়ও আমি বেশিদূর অগ্রসর হতে পারি না। মাহফুজউল্লাহর সঙ্গে আলোচনার পর কবির সম্পর্কে কিছু লিখবার ইচ্ছা জাগলেও তা তখনকার মত মনেই চেপে সহজ ছিল না। পাঠ্য কেতাবের বাইরে বিচরণে বাস্তব কারণেই যথেষ্ট অনীহা ছিল। তার পরে বেশ কিছু দিন গিয়েছে। ১৯৫৮ সালে রাজশাহী কলেজে লেকচারার পদের চাকরি পেয়ে আমি রাজশাহী চলে যাই। সেখান থেকেই পূর্বসংকল্প অনুযায়ী মাহফুজউল্লাহর তাগিদে ফররুখ আহমদ সম্পর্কে দীর্ঘ একটি প্রবন্ধ ফাঁদি। বাংলা কাব্যে ফররুখ আহমদ নামে সেই সুদীর্ঘ প্রবন্ধে আমি ফররুখ আহমদের কবি প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশিত কবিকর্মের এক বিস্তৃত পরিচয় দানের প্রয়াস পাই। মাহফুজউল্লাহের প্রচেষ্টায় প্রবন্ধটি তিন পর্যায়ে যথাক্রমে মাসিক 'মোহাম্মদী', 'মাসিক সওগাত' ও 'বিবর্তন' নামের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য, সাহিত্যিক মহলে প্রবন্ধটি বেশ সাড়া জাগায়। অনেকে আমাকে সাধুবাদ দেন। কেউ কেউ কবি ফররুখ আহমদ সম্পর্কে অত বড় প্রবন্ধ প্রয়োজন ছিল কিনা, সন্দেহ প্রকাশ করেন। সে যাই হোক, ঐ সময়েই কেউ কেউ আমাকে 'ফররুখ আহমদ' সম্পর্কে একটি বই লিখতে অনুরোধ করেন। লেখার ভাবনাটা তখন আমার মাথায় ছিল না। কারণ কবি ফররুখ আহমদের প্রকাশিত রচনার অনেকটাই তখনও বইয়ের আকারে পাঠকদের হাতে পৌঁছে নি। আমার বিবেচনায় কবির শিল্পীসত্তার পরিণতির জন্য আরও কিছুকাল অপেক্ষা করা অপরিহার্য ছিল। তাই ঐ প্রবন্ধ প্রকাশের পর দীর্ঘদিন আমি ফররুখ আহমদ সম্পর্কে নীরব থেকেছি।

ইতিমধ্যে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লেকার ফাঁকে ফাঁকে কবি জসীমউদ্‌দীনের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কেও ভাবতে শুরু করি। ১৯৬৩-৬৪ সালে চট্টগ্রাম কলেজে প্রফেসর হিসেবে চাকুরী করার কারণে সহকর্মীদের উৎসাহ ও প্রেরণায় জসীমউদ্‌দীন সম্পর্কে গ্রন্থ রচনায় হাত দেই। ঐ গ্রন্থ ১৯৬৭ সলে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় এবং আমি ঐ বইয়ের বদৌলতে সাহিত্যিক মহলে কিছুটা পরিচিতি লাভ করি। এরপরই আমার কাছে আবার তাগিদ আসে ফররুখ আহমদ সম্পর্কে বই লিখবার। ইতিমধ্যে তাঁর বেশ কয়েকটি বই বেরিয়ে গেছে। আমারও মনে হল, ফররুখ আহমদ ইতিমধ্যেই তাঁর পরিণত প্রতিভার ফসল আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তাই এখন একটি বই লেখা যেতে পারে। বই তো লেখা হবে: কিন্তু প্রকাশক জুটবে তো? কারণ ফররুখ আহমদ তখনও আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে পাঠ্য কবি হয়ে উঠেন নি। কিন্তু সে বাধাও দূর হল। কবি মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ জানালেন, নওরোজ কিতাবিস্তানের অন্যতম পরিচালক মোহাম্মদ নাসির আলী বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিতে স্বীকৃত হয়েছেন। অগত্যা সমস্ত মানসিক বাধা কাটিয়ে বই লেখার কাজে লেগে গেলাম। বক্তব্য প্রকাশে আমি বাস্তব কারণেই পুরোপুরি স্বনির্ভর রইলাম আর তখন ফররুখ আহমদ সম্পর্কে বাইরে ছিটেফোঁটা যা লেখা হয়েছিল, তার প্রায় সবটাই ছিল আয়ত্তের বইরে। স্বনির্ভর হওয়া ছাড়া উপায়ও ছিল না। কবির সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগের সুযোগ তখন হয়নি।

ইতিমধ্যে কর্মক্ষেত্র বদল হয়েছে। ১৯৬৪ সালের মাঝামাঝি আমি সরকারি

চাকরি ছেড়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে ছিলাম। ঐখানে থেকেই জসীমউদ্‌দীন বইয়ের পাণ্ডুলিপি বড় অংশটা তৈরি করে ঢাকার প্রকাশককে পাঠিয়ে ছিলাম। জসমি উদ্‌দীন গ্রন্থ প্রকাশের পরে পরেই ফররুখ আহমদ সম্পর্কিত গ্রন্থটি রচনায় হাত দেই। ১৯৬৮ সালের জুন মাসে দাউদ পুরস্কার বিতরণী সভায় যোগ দিতে লাহোরে যাবার আগেই কবি ফররুখ আহমদ-এর পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। এই ঘটনার মাস কয়েক আগে, আমর মনে নেই, ঠিক কখন, পাঠ্য পুস্তক সংক্রান্ত কাজে আমি একবার ঢাকার এসেছিলাম আমার প্রকাশক ইস্টবেঙ্গল পাবলিশার্সের কাছে। তখন হঠাৎ করেই একরকম ঢাকা বেতার কেন্দ্রে এলান-এর তৎকালীন সম্পাদক হেমায়েত হোসেনের সৌজন্যে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক বন্ধুবর আলিমুজ্জামান চৌধুরীর কক্ষে কবি ফররুখ আহমদের সঙ্গে সাক্ষাত হয়ে যায়। আকস্মিক এ সাক্ষাতকার আমার জন্যে ছিল এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা।

কবিকে ঐ প্রথম আমি স্বচক্ষে দেখি এবং ঐ শেষবারের মত। কারণ দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের সুযোগ আর ঘটেনি। ১৯৬৯ সালে 'কবি ফররুখ আহমদ' গ্রন্থ প্রকাশনা উৎসবেও তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। সে যাই হোক, প্রথম সাক্ষাতের সময় আমাকে ধুতি চাদর পরিহিত ভদ্রলোক হিসেবে দেখবার সুযোগটি হয় নি বলে কৃত্রিম হতাশা প্রকাশ করে, অত্যন্ত আন্তরিকভাবেই আহ্বান জানালেন তাঁর গরীবের ডেরায় আতিথ্য গ্রহণ করতে। কথায় কথায় কখন তিনি অফিস থেকে কেটে পড়লেন মনে নেই। দুপুরের দিকে হেমায়েত হোসেন ও সাংবাদিক আখতার উল আলমকে সঙ্গে করে ইস্কাটনে কবির বাসায় গেলাম। কবি তৈরিই ছিলেন। হাসি মুখে হাত বাড়িয়ে সবাইকে গ্রহণ করলেন। কবির আতিথেয়তার কোন ত্রুটি ছিল না। খাওয়া-দাওয়ার পর নানা কথা আলাপ হল: কিন্তু তাঁর সম্পর্কে আমার লিখিত প্রবন্ধ এবং প্রায় সদস্য প্রস্তুত বইয়ের পাণ্ডুলিপি নিয়ে কোন কথা হল না। তিনিও কোন কৌতূহল প্রকাশ করলেন না। আর আমিও সঙ্কোচ বোধ করে ঐ প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে বিরত রইলাম। বন্ধুদের ইঙ্গিত সত্ত্বেও ফররুখ আহমদকে তাঁর শিল্পকর্ম সম্পর্কে বিশেষ কিছু প্রশ্ন করলাম না। শুধু মানুষটিকে গভীরভাবে লক্ষ্য করলাম। তিনি নিজেই একসময় কথা প্রসঙ্গে পুঁথি সাহিত্যের কথা তুললেন। কথা বলতে বলতে এক সময় উঠে গিয়ে বিরাট কয়েক খণ্ড বাঁধানো পুঁথি নিয়ে এলেন। তার মধ্যে মোহাম্মদ খাতেরের শাহনামার পুঁথিও ছিল। তিনি অত্যন্ত আবেগভরে এই পুঁথিগুলোর বিষয়-বৈভব ও লোকায়ত ভাষা-সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে বলছিলেন। এই পুঁথি সম্পর্কে তিনি বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যিক ঐতিহ্যের একটা মূল্যবান অংশ বলে মনে করতেন। হাতেম ও নৌফেল, কাব্যটান্য, হাতেম তা'য়ী নামক সাহিত্যিক মহাকাব্যে বা কাব্যকাহিনী তিনি এ পুঁথির আশ্রয়েই রচনা করেছিলেন। তাছাড়া তাঁর কাব্যের মনোযোগী পাঠক মাত্রই লক্ষ্য করলেন। তিনি কিভাবে পুঁথিতে ব্যবহৃত বহু অপরিচিত শব্দকে অবলীলায় তাঁর কাব্যদেহে প্রয়োগ করেছেন।

মোট কথা, তাঁর সঙ্গে আলোচনায় আমার এ ধারণা হয়েছিল যে, তাঁর স্বপ্নের জগতের অনেকটাই পুঁথির ভুবন থেকে মাল-মশলা দিয়ে তৈরি। তবু পুঁথির জগতেই তিনি নিবদ্ধ ছিলেন না। আধুনিক মুসলমানের বিশ্বব্যাপী জাগরণ কামনার তিনি এক উৎসাহী দ্বার ছিলেন। তিনি ইসলামী মানবতাবদী জীবনবিধানকে যাবতীয় সমস্যা সমাধানে সমর্থ একটি মজবুত আদর্শ বলে মনে করতেন।

সময় হাতে বেশি ছিল না। আলোচনা তাই দীর্ঘায়িত হল না। তবু এরই ফাঁকে দু'একটি প্রশ্ন করে কবির সাহিত্যিক মানসিকতার মূলগত চেহারাটি চিনে নেবার চেষ্টা করলাম। কবিকর্মে বিশেষ আদর্শের পরিপোষক কর্তব্যের প্রতি ঝোঁক দিতে গিয়ে তিনি কি গণ্ডীবদ্ধ হয়ে পড়ছেন না? তিনি কি সমসাময়িক জীবনের তোড় থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজের প্রতিভাকে সংকুচিত করছেন না? তাঁর সাহিত্যকর্মের সমসাময়িক জীবন-চেতনাপুষ্ট ধারার প্রতি তাঁর সাম্প্রতিক অনাগ্রাহের কারণ কি? তিনি কি নিজেকে আর একটু ব্যাপ্ত করে দিতে পারেন না? সমসাময়িক তথাকথিত সাহিত্যিক বিতর্ক তাঁর নাম ও ভাবে জড়িত হওয়া ঠিক হয়েছে কি? এসব প্রশ্নের জবাব আমিও চাই নি, তিনিও দেন নি। কিন্তু এর যে সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছি, তাই আমার জন্যে যথেষ্ট ছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে পথে তিনি প্রথম যাত্রা শুরু করেছিলেন, সে পথকে তিনি শেষ পর্যন্ত নিজের বলে আঁকড়ে ধরতে পারেন নি। চারদিকের পৃথিবীতে আদর্শহীন মতবাদের কলহে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠে, ধর্মীয় মূল্যবোধ-আশ্রিত এক মানবিক জীবনাদর্শকে বেছে নিয়েছিলেন তাঁর সকল চিন্তা ও কর্মে। এ পথ থেকে সরে আসা তাঁর বৈশিষ্ট্যসহ। অন্যভাবে নয়। সমসাময়িক কিছু সাহিত্যিক বিতর্কে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন। অনেক ক্ষেত্রেই বন্ধু বান্ধবদের চাপে পড়ে, স্বেচ্ছায় নয়।

আর কি কথা হয়েছিল মনে নেই। যথাসময়ে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আস্তানায় ফিরেছিলাম। সে ভিন্ন প্রসঙ্গ। ফিরতে ফিরতে বারবার যেটা মনে হচ্ছিল, কবি ফররুখ আহমদ তাঁর কবি-কর্মকে নেহাত শিল্পকর্ম বলে ভাবেন নি বা তাকে জীবনসংগ্রামের একটা বড় হাতিয়ার করে তুলতে চান নি। তিনি বিশ্বপথিক মানুষের চলার পথের সামনে একটি আদর্শের দীপবর্তিকা তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। সে কাজে তিনি কতটা সার্থক বা ব্যর্থ হয়েছিলেন, তাঁর বিচার করবে মহাকাল। এই মুহূর্তে আমরা তাঁকে শত বিতর্কের মধ্যে মাথা তুলে শুধু বলে যাচ্ছি : আমার অনুভব একান্ত আমারই : যদি কারও সঙ্গে এর মিল খুঁজে না পাওয়া যায়, আমার কিছু করার নেই। আমি বিশ্বাস করি, আমার এ বিশ্বাস এ প্রত্যয়ই শেষ পর্যন্ত আমার কবি-কর্মের প্রতিষ্ঠাকে সম্ভব করে তুলবে।

কবি এ বিশ্বাস নিয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। আগেই বলেছি, কবির সঙ্গে ঐ আমার প্রথম ও শেষ দেখা। দ্বিতীয় বার সাক্ষাতের সুযোগ আর আসে নি। তাই স্মৃতিচর্যা করতে গিয়ে কবি-সম্পর্কে আমি আর কতটুকু বা বলতে পারি। **(সংকলিত)।**

# অনন্য পুরস্কার

## ডক্টর রফিকুল ইসলাম

ফররুখ ভাইয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচয়ের আগে তাঁর কবিতা ও গানের সাথে আমার পরিচয় হয়। ফররুখ ভাইয়ের 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' কবিতা বা গান এবং ঐ রচনা নিয়ে মাওলানা আকরম খাঁ-র সঙ্গে তাঁর যে লড়াই তার মাধ্যমেই আমি তাঁকে প্রথম চিনি। ঐ ঘটনা ঘটে দেশ বিভাগের পূর্বে, তবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পরে ফররুখ ভাইয়ের গানের সঙ্গে আমার সম্যক পরিচয় ঘটে। আমরা যখন মুকুল ফৌজ করি, আমি ছিলাম রমনা মুকুল ফৌজের অগ্রসেনা। আমরা প্রথমে ফজলুল হক হলের মাঠের পরে কার্জন হলের পেছনে তদানীন্তন ভূগোল বিভাগের মাঠে এবং বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে প্রতিদিন বিকেলে প্যারেড পিটিগান. আবৃত্তি ইত্যাদি করতাম। দেশ বিভাগের পর পর একবার 'বাগবান' ভাই (মোহাম্মদ মোদাব্বের) এবং কামরুল ভাই মুকুল ফৌজ পরিদর্শনে ঢাকা এলেন। সেবারে কামরুল ভাই আমাদের ফররুখ ভাইয়ের একটা গান শিখিয়ে দিয়ে গেলেন, 'সামনে চল, সামনে চল/তৌহিদেরীর শান্ত্রী দল', ঐ গান আমরা অনেক করেছি।

ফররুখ ভাইয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচয় নাজিমুদ্দীন রোডে বেতার ভবনে। দেশ বিভাগের পরে কলকাতা থেকে অনেকে ঢাকা বেতারে এলেন; ফররুখ ভাই ছাড়াও কবি শাহাদাত হোসেন, সাহিত্যিক শামসুদ্দীন আবুল কালাম, কবি আবুল হোসেন, কবি সিকান্দার আবু জাফর, কবি সায়ীদ সিদ্দিকী, জনাব নাজির আহমদ এবং আরো অনেকে। দেশ বিভাগের সময় আমরা চার ভাই-বোনের তিনজন ছোটদের আসর 'খেলাঘরে' আবৃত্তি বা গান করতাম। স্কুল ব্রডকাস্ট শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানেও আমরা ছিলাম। আগে যাঁদের নাম উল্লেখ করেছি তাদের সঙ্গে পরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ হই খেলাঘরে; কিন্তু ফররুখ ভাই শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করতেন। সেই আসরেই আমরা ভাই-বোনেরা (আমি, আতিকুল ইসলাম ও মাসুমা খাতুন) ফররুখ ভাইয়ের স্নেহভাজন হয়ে পড়ি। ফররুখ ভাই ও শিল্পী জয়নুল আবেদিন বিকেলের দিকে মাঝে মাঝে মুকুল ফৌজের মাঠে আসতেন, সেখানে কামরুল ভাই বা লতিফ ভাই যখন আমাদের গান করাতেন, তাঁরা বসে বসে শুনতেন। ফররুখ ভাইয়ের একাধিক গান তখন আমরা গাইতাম। আর একটি গানের কথা মনে পড়ে, 'দূর দিগন্তে ডাক এল'। গানটি আহাদ সাহেবের সুরে ছিল, কিন্তু আমাদের শিখিয়েছিলেন লতিফ ভাই। ফররুখ ভাইয়ের বাসা ছিল তখন সম্ভবত কমলাপুরের দিকে, বাড়ী যাবার পথে তিনি মাঝে মাঝে আমাদের বাসায় থামতেন। আমাদের বাসা ছিল ফজলুল হক হল গেটের উল্টো দিকে রেল কলোনীতে, ছোট্ট একটি একতলা কোয়ার্টারে। আমাদের বাড়ীতে গান বাজনা হত। সেখানে আসতেন সোহরাব ভাই, বেদার ভাই, লতিফ ভাই, ওস্তাদ ফুলঝুরি খান, ওস্তাদ সাখাওয়াত হোসেন খান

প্রমুখ। কেউ শেখাতেন, কেউ গাইতেন। গানের চেয়ে আড্ডা হত বেশী। সেকালের নামকরা গীটার-বাদক ওয়ারেস আলীর আড্ডাও ছিল আমাদের বাড়ীতে। তাঁর পিয়ানোটি আমাদের বাড়ীতেই রাখা ছিল, সবাই সেটায় টুং টাং করতেন। এভাবে কখন যে ফররুখ ভাইয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলাম জানতাম না; ফলে রেডিওতে গেলে, দেখা হলে, সামনের আবুল মিয়ার রেস্টুরেন্টে মিষ্টি-চা না খাইয়ে ফররুখ ভাই ছাড়তেন না।

ফররুখ ভাই ঘনিষ্ঠ স্নেহভাজনদের 'তুই' সম্বোধন করতেন। ঐ সম্বোধন থেকে আমিও বাদ পড়ি নি। ইতিমধ্যে স্কুল থেকে কলেজ, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছি, মুকুল ফৌজ থেকে ঢাকার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে গিয়েছি, রেডিওতেও খেলাঘর বা শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান থেকে সাহিত্য ও নাটক বিভাগে উন্নীত হয়েছি। কিন্তু ফররুখ ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক আগের মতোই থেকে গেছে। আমার মনে হয় না যে, ফররুখ ভাইয়ের কাছে আমার বয়স কোনদিন বেড়েছিল।

বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনার পর পর যখন রেডিওর সামনে রেস্টুরেন্টে যাই বেতার শিল্পীদের ধর্মঘটে যোগদান করানোর জন্যে; গিয়ে দেখি, ইতিমধ্যেই ফররুখ ভাই, লতিফ ভাই, আহাদ ভাই, খোন্দকার আবদুল হামিদ প্রমুখ সংগঠন করে ফেলেছেন। ফররুখ ভাই পাকিস্তান ও ইসলামী আদর্শের অনুরাগী ও অনুসারী বরাবর, কিন্তু তদানীন্তন পাকিস্তানী ও পূর্ব পাকিস্তানী শাসকেরা ইসলামের নামে যা করছিলেন, তাতে তাঁদের ওপরে সবচেয়ে বেশী ক্রুদ্ধ ছিলেন ফররুখ ভাই। তিনি ঐ শাসকদের ব্যঙ্গ করে 'রাজ-রাজড়া' নামে একটা নাটক লিখেছিলেন এবং তা বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিনীত হয়েছিল। বেনজীর আহমদ ও আবু জাফর শামসুদ্দীন সম্পাদিত 'নয়া সড়ক' সংকলনে নাটকটি প্রকাশিত হয়। ভাষা আন্দোলনের পরে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বাইরে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি ঘোরতরভাবে। পঞ্চাশ দশকের বেশীর ভাগ সময় কাটে আমাদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে। ঐ সময় ফররুখ ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটত কম, ফররুখ ভাই আবার ঐ সময়ে বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু তাতে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কোন ফারাক ঘটে নি। রেডিওতে দেখা হলেই সেই হাস্য মুখ, মিষ্টি আর তার সঙ্গে যুক্ত পান-জর্দা ও কাব্যালোচনা।

ষাটের দশকে আবার ফররুখ ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে, এবারে 'রাইটার্স গিল্ড' বা 'লেখক সংঘে।' আমরা প্রথমে লেখক সংঘে যাই নি। তখন ঐ প্রতিষ্ঠান কবি গোলাম মোস্তফার প্রভাবাধীন ছিল। আমরা অর্থাৎ মুনীর ভাই, ফররুখ ভাই, আস্‌কার ইবনে শাইখ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, হাসান হাফিজুর রহমান প্রমুখ ঠিক করি 'গিল্ড' দখল করতে হবে। আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে 'গিল্ড' যারা শুরু থেকে পকেটে পুরে রেখেছিলেন, তাঁদের তাড়াই। ঐ নির্বাচনে ফররুখ ভাই আমাদের খুবই সাহায্য করেছিলেন। গিল্ডের পত্রিকার নাম বদলে 'পরিক্রম' করা হয়, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এবং আমি তা সম্পাদনা করতাম। গিল্ড বা লেখক সংঘ থেকে আমরা শামসুর রাহমানের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রৌদ্র করোটিতে' ছাড়াও ফররুখ ভাইয়ের

কাব্য নাটক 'নৌফেল ও হাতেম' প্রকাশ করেছিলাম। ফররুখ ভাই লেখক সংঘের আদমজী পুরস্কারও পেয়েছিলেন।

ফররুখ ভাই প্রেসিডেন্ট পুরস্কার– প্রাইড অব পারফরমেন্স পেলে আমরা তাকে একটি সংবর্ধনা দিয়েছিলাম। ওপরে যাদের কথা উল্লেখ করেছি, তাঁরা সবাই ছিলেন ঐ সংবর্ধনার উদ্যোক্তা, অনুষ্ঠানটি হয়েছিল ঢাকা হল মিলনায়তনে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটির দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। ফররুখ ভাইয়ের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি খুবই সার্থক হয়েছিল এবং ফররুখ ভাই প্রেসিডেন্ট পুরস্কার পাওয়ার চেয়ে বেশী খুশী হয়েছিলেন আমাদের সংবর্ধনা পেয়ে। বস্তুত তিনি আইয়ুব খানের কাছ থেকে আদমজী পুরস্কার আনতে করাচী যেতে রাজী ছিলেন না। পাকিস্তানী শাসকদের ইসলামের নামে অনৈসলামিক কার্যকলাপে ফররুখ ভাই এতই ক্ষুব্ধ ছিলেন যে, তাকে কখনো রাইটার্স গিল্ডের কোন কনফারেন্সে পশ্চিম পাকিস্তানে নেওয়া যায় নি। ফররুখ ভাই রেডিওর কর্মচারী ছিলেন আর ওদিকে পাকিস্তান সরকারের তথ্য বিভাগের কর্মকর্তা কুদরতুল্লাহ্ শাহাব ছিলেন রাইটার্স গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক। কিন্তু ফররুখ ভাই কোনদিন কোন আমলাকে তোয়াক্কা করতেন না, বরং ঐ সব জাঁদরেল আমলারাই ঢাকা এলে ফররুখ ভাইয়ের ভাঙা বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে তোয়াজ করে আসতেন। কিন্তু ঐসব মুহূর্তে ফররুখ ভাই যেমন মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে চলতেন, ঠিক তেমনি ব্যবহার ও আচরণ করতেন। বস্তুত পাকিস্তানী আমলারাই ফররুখ ভাইকে রীতিমতো তোয়াজ করতেন আর ঢাকা রেডিওর কর্মকর্তারা তাঁকে দস্তুরমতো ভয় পেতেন। ফররুখ ভাইয়ের আপোষহীন স্বাধীনচেতা নির্লোভ আদর্শবাদী চরিত্রের সামনে সব সুবিধাবাদীরাই মাথা নীচু করে চলতেন। ফররুখ ভাই ব্যক্তিগত স্বার্থ ও লোভের ঊর্ধ্বে ছিলেন।

উনিশ শ তেষট্টি সালের দিকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' পালন করি, ঐ অনুষ্ঠান এক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে এবং মানুষের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগায়। ঐ সপ্তাহে বাংলা কবিতার বিবর্তন প্রদর্শনী এবং আবৃত্তির মাধ্যমে দৃশ্যমান করে তোলা হয়েছিল। চর্যাপদ বা কাহ্নপাদ থেকে ফররুখ আহমদ পর্যন্ত আমরা প্রদর্শনী ও আবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত রেখেছিলাম। আবৃত্তি ও পাঠের আসরে ফররুখ ভাইয়ের 'ডাহুক' কবিতাটি আমি আবৃত্তি করেছিলাম। আমি জানতাম না যে, সেদিন পাবলিক লাইব্রেরী মিলনায়তনের বাইরে হাজার হাজার দর্শকের মধ্যে ফররুখ ভাইও ছিলেন। আবৃত্তি আমি কেমন করেছিলাম জানি না, কারণ 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' আয়োজনের জন্যে এক মাস কাল ধরে আমাদের কয়েকজনকে দিবারাত্রি পরিশ্রম করতে হয়েছিল। প্রতিদিন সকাল থেকে প্রদর্শনী, সেমিনার ইত্যাদির পরে রাতে অনুষ্ঠানের সময় আমাদের আর কোন শক্তি অবশিষ্ট থাকত না, তবুও ফররুখ ভাইয়ের কবিতা আমি প্রাণ দিয়ে আবৃত্তি করেছিলাম। অনুষ্ঠানের পর ফররুখ ভাই আমাকে আবেগের সঙ্গে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। ফররুখ ভাই তখন আবেগে টগ্‌বগ্ করছিলেন; আমি তার বুকের

দ্রুত স্পন্দন অনুভব করতে পারছিলাম। অদ্যাবধি আমি ফররুখ ভাইয়ের সেই উষ্ণ আবেগ ও হৃৎস্পন্দন অনুভব করতে পারি। তার আগে আমি অনেক আবৃত্তি করেছি কিন্তু অমন পুরস্কার কখনো পাই নি।

তারপরে দিন গড়িয়ে গেছে ষাটের দশকে দ্রুত, ছেষট্টি থেকে একাত্তর নানা রাজনৈতিক আবর্তে বিক্ষুব্ধ দেশকালের সঙ্গে সঙ্গে আমরা চলেছি বিপরীত স্রোতে। ক্রমশ ফররুখ ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ কমে এসেছে। মাঝে মাঝে রেডিওতে গেলে দেখা হয়েছে। যখনই দেখা হয়েছে। আবার সেই পুরোনো দিনগুলিতে আমরা ফিরে গেছি। নাজিমুদ্দীন রোডের আবুল মিয়ার দোকানের মতোই শাহ্‌বাগের আবুল মিয়ার দোকানে ফররুখ ভাই তার হাস্যমুখ, মিষ্টান্ন, চা, পান-জর্দা দিয়ে আপ্যায়ন করেছেন। ফররুখ ভাইয়ের প্রিয় কবি ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং তা উভয়ের বাড়ী যশোহর বলে নয়। ফররুখ ভাইয়ের চেয়ে বড় মাইকেলপ্রেমিক আমি দেখি নি। দেখা হলেই আমরা মাইকেলের কবিতার মাহাত্ম্য নিয়ে আলোচনায় ডুবে গেছি। ফররুখ ভাই বা আমি আমাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে কখনো প্রশ্ন তুলি নি। জাফর ভাই (সিকান্দার আবু জাফর), মুনীর ভাই, কামরুল ভাই সবাই ফররুখ ভাইয়ের বন্ধু ছিলেন, একসঙ্গে হলে তাদের গভীর বন্ধুত্বে নিমগ্ন দেখেছি। হাস্যকৌতুকে তাঁরা উচ্ছল হয়ে উঠেছেন। কোন রাজনৈতিক মতামত তাঁদের সম্পর্ককে মলিন করতে পারে নি। রেডিওতে রেস্টুরেন্টে ফররুখ ভাইকে দেখেছি আহাদ ভাই বা লতিফ ভাইয়ের সঙ্গে, যাঁরা ওঁর সবচেয়ে বেশী গানে সুর করেছেন। এক্ষেত্রেও একই ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। বস্তুত ব্যক্তিগত আদর্শে আপোষহীন ফররুখ ভাই তাঁর বন্ধু ও স্নেহ ভাজনদের প্রতি সখ্য ও প্রীতিতেও আপোষহীন ছিলেন। বাইরে যা-ই ঘটুক, ব্যক্তিগত সম্পর্ককে কোনদিন নষ্ট করতে পারে নি।

ফররুখ ভাইয়ের সঙ্গে আমার শেষ দেখা শাহবাগে রেডিওর রেস্টুরেন্টেই, ষাটের দশকের একেবারে শেষের দিকে বা সত্তরের দশকের শুরুতে। ফররুখ ভাই আমাকে যথারীতি আপ্যায়ন করলেন, কিন্তু সেদিন ফররুখ ভাইকে একটু গম্ভীর, অন্যমনস্ক দেখেছিলাম এবং তা এই প্রথম ও শেষবারের মতো। মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হবার পরে আর ফররুখ ভাইয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয় নি।

---

**[শাহাবুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত 'ফররুখ আহমদ ব্যক্তি ও কবি' থেকে সংকলিত।]**

# কবি ফররুখ আহমদ ও প্রসঙ্গ কথা

**জাহানারা আরজু**

১৯৭৪ সন। ১৯ অক্টোবর, পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের পরের দিন। হঠাৎ করেই খবর পেলাম কবি ফররুখ আহমদ ইন্তেকাল করেছেন। যদ্দুর মনে পড়ে কবি তালিম হোসেন খবরটি জানিয়েছিলেন। এ মর্মান্তিক খবরের আকস্মিকতায় স্তব্ধ হয়ে গেলাম। মনের ভেতর সবকিছু কেমন যেন মুহূর্তে তছনছ হয়ে গেল। চোখের ওপর বড় বেশি জীবন্ত হয়ে ভেসে উঠল সেই শানিত তলোয়ারের মতো দেহ কাঠামো, ঘাড় পর্যন্ত চুলের কেশর-প্রখরতায় উজ্জ্বল অপূর্ব সুন্দর দুটি দীপ্তিময় চোখ, টিকালো খাড়া নাক– সর্বোপরি উন্নত শির। একক চলার একলা সে পথিক। তাঁর মৃত্যু সংবাদ! এ যেন বিশ্বাস হতে চায় না। বিশ্বাস করে মনে নিতে ইচ্ছে হয় না।

নিজেদের বিপদ-আপদ-বিপর্যয়, দুঃখ-বেদনা নিয়ে এত ব্যস্ততায় কেটে গেছে বেশ কিছু সময়। নিতান্ত স্বার্থপরের মতোই আমাদেরই এক আপনজনের খোঁজ-খবর নেয়া হয় নাই। বাংলা কাব্যের এক অন্যতম প্রাণ-পুরুষ মৃত্যুর দিকে এগুচ্ছিলেন এ কথা কেউ বুঝতে পারিনি। অভিমান, অভাব, দারিদ্র্য এবং আপোষহীন আদর্শ তাঁকে তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল। তাঁর অন্তিম নিদ্রামগ্ন শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে সে কথা সেদিন উপলব্ধি করেছিলাম গভীর শোকার্ত অন্তরে।

আমার বাসায় ছিল সেদিন আমারই এক আত্মীয়ার বিয়ের অনুষ্ঠান। সন্ধ্যে সাতটায় বরাগমন। বিয়ে বাড়ির হিসাবহীন কাজের ঝামেলা। এ সময় ফররুখ ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সব ফেলে আমি ও আমার স্বামী 'ইস্কাটন গার্ডেনে' ছুটে গেলাম। বড় বেশি নীরব আয়োজনের মধ্যে কবির অন্তিম যাত্রার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল সেদিন। কবি তালিম হোসেন, কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ, বেগম মাফরুহা চৌধুরী তদারক করছিলেন। আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সবগুলো নাম এখন মনে করতে পারছি না। আমরা কয়েকজন কবি-পত্নীকে ঘিরে ছিলাম। ট্রাকে করে কবির লাশ অন্তিম যাত্রা করল— কবি বেনজীর আহমদ তাঁর নিজ বাড়ির পারিবারিক কবরস্থানে কবির লাশ দাফন করতে সাগ্রহে সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন। এ হৃদয়বান ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতায় সবাই যেন নুয়ে পড়েছিলাম। আমাদের দেশের বিশেষ কোনো কবরস্থানে কবির ঠাঁই হয় নাই। এ লজ্জা ও দুঃখ সবার জন্যই কবির প্রতি অবহেলার স্বাক্ষর হয়ে রইল।

ওখান থেকে সেদিন হাজারো স্মৃতির দংশন নিয়ে ফিরে এলাম। বুকের ভেতরে এক বেদনার অথই সমুদ্র। সেদিনই তাৎক্ষণিকভাবে আমি একটি বড় কবিতা লিখে মনের ভার লাঘব করতে চেয়েছিলাম। কবিতাটির নাম 'সম্রাটের শিরোপায় ভূষিত' (কবি ফররুখ আহমদের মৃত্যুদিন স্মরণে)। কবিতাটির কিছু অংশ তুলে দিলাম।

আমরা ক'জন শুধু ঘিরেছিলাম তখন তাঁকে
চোখে চোখে বরফ-গলা হৃদয়ের নদী বহমান

অসহায় সহস্র প্রশ্ন বিদ্ধ করেছিল পাঁজরের ভিতর;
নীরব বিবেক-পীড়িত দংশনে রক্তাক্ত
চেতনার পাখি আহত মুহ্যমান
ডানা ঝাপটালো বারবার!
পাশের ঘরে সদ্য বৈধব্যের শিকার
ঝড়-ক্লান্ত কবি-স্ত্রী, সন্তান, পরিজন;
সহস্র প্রশ্নের তীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে গিয়েছিল
সেদিনের সে আকাশ।
আমরা যেন ছায়া ছায়া দুঃস্বপ্নের ঘোর লাগা
সবাই, এ ওকে দেখছি অচেনার মত, সবারই
চোখে মুখে ঘুরে ঘুরে ছায়া ফেলছে একটি প্রশ্নের
শকুনি, আমরা যেন সচকিত সভয়ে ফিরে আসছি
সে প্রশ্নে মুখোমুখি হতে কি পেরেছি তখন?
অতি পরিচিত যে ছিল, ছিল আমাদের কাছের
একজন, সবার প্রিয় পরিচিত কবি; যে তাঁর
শব্দের মায়াবী আখরের বন্ধনে নিয়ে গেছেন
অচেনা দ্বীপের সন্ধানে বা'র দরিয়ায় পাল
তুলে দিতে, অসীম সাহসী সে নাবিক ঝড়ের
ভ্রূকুটি হেলায় উপেক্ষা করে বারবার
দিয়ে গেছে ডাক!
সেদিনও দেখেছি তাঁকে
সেই প্রদীপ্ত প্রখর সুন্দর অবয়ব
মৃত্যুর মহিমায় আরো বুঝি সুন্দর
সম্রাটের শিরোপায় ভূষিত যেন সে বহ্নি দীপ!
একলা চলার নির্ভীক সে সৈনিক, মোম হয়ে
গলে গলে নির্বাপিত; নির্বাসিত জীবনের সব
পঙ্কিল আবর্ত থেকে, ঘাঁটাঘাঁটি কাড়া কাড়ি।
ছেঁড়া খোঁড়া এ জীবনের মর্তলোক উপেক্ষায়
ঠেলে সে পবিত্র শাহী-আত্মা বন্ধনহীন উড্ডীন
ধরা ছোঁয়ার সীমানা ছাড়িয়ে দূর হতে দূরতম দেশে
তখন বুঝি পালে লেগেছে তার সাত সাগরের হাওয়া
নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা,
দুঃসাহসী সে
সিন্দবাদ তুলেছে পাল তাঁর বা'র দরিয়ার উদ্দেশে।
কাফনের তলে তখনো যেন বুকে তাঁর
জিজ্ঞাসারা কথা বলে, রাত পোহাবার আর
কত দেরী পাঞ্জেরী?

উত্তর দিতে পারিনিত কেউ
রাত পোহাবার কত দেরি আর!
আমরা যে ক'জন ঘিরে ছিলাম তাঁকে, তারা
যেন নিঃস্ব হয়ে ফিরে এলাম
পূর্ণতায় সে চলে গেল দূরে বহুদূরে, মৃত্যুর শিরোপায় ভূষিত
সে সম্রাট যেন, আমরা যেন দুঃস্বপ্নের ঘোর লাগা
অশরীরীর মত ফিরে এলাম সহস্র প্রশ্নের
দংশন পীড়িত বড় শ্রান্ত তখন।
**(স্বনির্বাচিত শত কবিতা : পৃ. ১৬৭)**

অসংখ্য স্মৃতির মৌমাছি গুঞ্জন করতে লাগল মনের মালঞ্চে। মানিকগঞ্জ মফস্বল শহরে থাকি। সপ্তম শ্রেণীতে পড়ছি। কোলকাতা থেকে নজরুল ভাই (আমরা যাঁকে 'দাদা' ডাকতাম) পাঠালেন একটি কবিতার বই– 'সাত সাগরের মাঝি' লেখক– কবি ফররুখ আহমদ – বইটির প্রথম প্রকাশ ইংরেজি ১৯৪৪ সন। তখন থেকেই ছোটদের পাতায় আমার লেখালেখি শুরু হয়েছে। মনের আনন্দে লিখছি আর লিখছি। ১৯৪৫ সনে আমার প্রথম কবিতা 'দৈনিক আজাদে'র 'মুকুলের মাহফিলে' ছাপাও হয়েছে। 'মোহাম্মদী', 'মিল্লাত', 'সওগাত' মহিলা সংখ্যায়ও লিখছি। এর পর পরই নতুন কবিতার বই হাতে পেয়ে নাওয়া-খাওয়া ভুলে গোগ্রাসে সব কবিতা পড়ে ফেললাম। বারবার পড়লাম। পড়ে পড়ে সাধ মেটে না। যদিও কবিতার মর্মবাণী বোঝার বয়স হয় নাই। তবুও কী যে ভালো লেগেছিল ওই 'সাত সাগরের মাঝি'– বইয়ের সব কবিতা। কী অপরূপ স্বাদ– কী অপূর্ব ছন্দ-শব্দ-রূপকথার মতো মন কেড়ে নেয়া বর্ণনা। বারবার পড়ে পড়ে মুখস্থ হয়ে গেছে অনেক কবিতার পঙ্‌ক্তিমালা। আজ পরিণত বয়সে এসে বুঝি সেই চল্লিশের দশকের প্রারম্ভে কী অমিত তেজোদীপ্ত শক্তিমান এক কবির আবির্ভাব হয়েছিল। নজরুলের কাব্যধারার সমুদ্র-গর্জনের পরপরই এ কবি ছিলেন আর একজন একক বলিষ্ঠ 'উন্নত শির'–ঘোষণার উত্তরসূরি। উত্তরসূরি হয়েও নজরুল কাব্য-ধারা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এক পৃথক পৃথিবীর নতুন নকীব তিনি। পুঁথির কাহিনী নিয়ে তিনি আধুনিক ভাষায় ছন্দে-উপমায় তাঁর কাব্যভুবন সৃজন করেছেন। পুঁথি সাহিত্যের কুড়ানো মানিক তাঁর হাতে হীরকের দ্যুতি নিয়ে ঝলমল করে জ্বলে উঠেছে। এ স্বাদ ভিন্ন। নজরুলের পরে আরবি ফারসি ভাষা সমন্বয়ে– ভাষা শৈলীর এমন সুষ্ঠু ও সার্থক বিকাশ আর কারো হাতেই সম্ভব হয়নি। কী ভীষণ সম্মোহনী শক্তি লুকানো ওইসব কবিতার পঙ্‌ক্তিমালায়। কবির অসীম সাহসী অভিযাত্রী নাবিক মনের স্বপ্ন ও অভিজ্ঞতা তার বিভিন্ন কবিতায় রূপ পেয়েছে। সমুদ্র জীবনের পশ্চাদভূমির ওপর কবির অভিযাত্রী মনের জিজ্ঞাসা অন্ধকার কালো রাত্রির বুকে অসংখ্য নক্ষত্র হয়ে ফুটে উঠেছে। উত্তাল সমুদ্র যাত্রার প্রাক্কালে নাবিক মনের খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতা এবং জিজ্ঞাসা ধরা পড়েছে। কবি বলেছেন—

"কত যে আঁধার পর্দা পারায়ে ভোর হ'ল জানি না তা'।
নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা।
দুয়ারে তোমার সাত-সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা।

তবু জাগলে না? তবু তুমি জাগলে না?"

**(সাত-সাগরের মাঝি)**

নারঙ্গী বনের দোলায়িত কম্পিত সবুজের হাতছানির মধ্যে কবির স্বপ্ন রূপ পেতে চায়। ঝড়ে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের বুকে কবির সংগ্রামী চেতনা এক নতুন ব্যঞ্জনায় সফেদ পাল তুলে নির্ভীক যাত্রা শুরু করে। 'সমুদ্র যাত্রা', 'নারঙ্গী বনে সবুজ পাতা' 'দরিয়ার হাম্মাম'– এসব প্রতীকের মধ্যে কবি জাতীয় রেনেসাঁর স্বপ্ন দেখেছেন। চোখের ওপর থেকে সরে গেছে অনেকগুলো পুরানো ছবি। নতুন বিন্যাসের স্বপ্নের রোমান্টিকতায় ফররুখের কাব্য-ভুবন আরো বেশি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে—

"ঘন সন্দল কাফুরের বনে ঘোরে এ দিল বেহুঁশ,
হাতীর দাঁতের সাঁজোয়া প'রেছে শিলা দৃঢ় আব্‌লুস,
পিপুল বনের ঝাঁঝালো হাওয়ায় চোখে যেন ঘুম নামে;
নামে নির্ভীক সিন্ধু ঈগল দরিয়ার হাম্মামে।"

**(সিন্দবাদ)**

"দেরী হয়ে গেছে অনেক জানো তা তুমি,
ফিরে গেছে কত জাহাজ-ভাসানো দরিয়ার মৌসুমী,
কত এলাচের দানা উড়ে গেছে ঝড়ে
দারচিনি-শাখা ভেঙেছে বনান্তরে,
মেশ্‌কের বাস বাতাস নিয়েছে লুটি'।"

**(সাত-সাগরের মাঝি)**

"দেখ আসমানে ফোটে সেতারার কলি,
আরশির মত নিটোল পানিতে মুখ দেখে বকাওলি।"

**(বা'র দরিয়ায়)**

ঘুরে ফিরে কবির চেতনায় বার বার দরিয়ার স্বপ্ন প্রতীকে জীবনের দর্শন ফুটে উঠেছে। কবি বলেছেন :

"কোথায় জাহাজ হবে ফিরে বানচাল,
তক্তায় ভেসে কাটাবে আবার দরিয়ায় কতকাল;
সে কথা জানি না, মানি না সে কথা, দরিয়া ডেকেছে নীল!

**(সিন্দবাদ)**

বন্ধনহীন কবির মাটির মমতা-শৃঙ্খল তাঁকে যেন আর বাঁধতে পারেনি-কবি বলেছেন :

"ভেঙ্গে ফেল আজ খাকের মমতা আকাশে উঠেছে চাঁদ,
দরিয়ার বুকে দামাল জোয়ার ভাঙছে বালুর বাঁধ,
ছিঁড়ে ফেলে আজ আয়েশী রাতের মখমল অবসাদ,
নতুন পানিতে হাল খুলে দাও হে মাঝি সিন্দবাদ।"

**(সিন্দবাদ)**

ঐতিহ্যের হিরন্ময় প্রাসাদে কবির অনুসন্ধানী মন চিরজাগ্রত। নতুন শব্দ-সম্ভার নতুন চিত্রকল্পে আমাদের তিনি নিয়ে যান ভুলে যাওয়া সে ঐতিহ্যের সন্ধানে। কবি বলেন :

"তুমি কি ভুলেছ' লবঙ্গ ফুল, এলাচের মৌসুমী,
যেখানে ধূলিতে, কাঁকরে দিনের জাফরান খোলে কলি,
যেখানে মুগ্ধ ইয়াস্‌মিনের শুভ্র ললাট চুমি'
পরীর দেশের স্বপ্ন-সেহেলি জাগে গুলে বকাওলী।!"

**(সাত-সাগরের মাঝি)**

গন্তব্যের নিশানায় স্থির অভিযাত্রী- আপন বিশ্বাসে অটল কবি বলেন :

"দূর বন্দরে দীপ্ত সূর্য, আমাদের গতিমান
জাহাজের পাল স্রোতের নেশায় ভরা,
যেথা দিগন্তে সব্‌জা হেরেমে ভাসে পরীদের গান,
নেকাব দোলায়ে আদিম বনানী জাগছে নৃত্যপরা;
দরিয়া-মরুর মরীচিকা পানে মাতাল দুঃসাহসী
ছুটছে অন্ধ তাজী।

**(বা'র দরিয়ায়)**

তৌহিদের সুরায় বিভোর কবি খুঁজে চলেছেন 'হেরার রাজ-তোরণ'। তৌহিদের সত্য-দীপ্ত আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান কবি-কণ্ঠের উচ্চারণ অনন্য, তাঁর দু'চোখের মণিতে আলো জ্বলছে 'হেরার রাজ-তোরণ' ঃ

"ফেলেছি হারায়ে তৃণঘন বন, যত পুষ্পিত বন,
তবু দেখা যায় দূরে বহুদূরে হেরার রাজ-তোরণ—"

**(সাত-সাগরের মাঝি)**

ফররুখ আহমদ গতানুগতিক কাব্য-ধারার রাজপথে পথ হাঁটেননি। তাঁর কাব্য-ভুবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁকে আমরা নবতর রূপে আবিষ্কার করি। সেখানেও তিনি প্রত্যয়ী পদক্ষেপ রেখেছেন। তাঁর 'নৌফেল ও হাতেম' (জুন, ১৯৬১) কাব্য-নাটক এবং 'হাতেম তা'য়ী' (মে ১৯৬৬) কাব্য এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

ফররুখ আহমদ মহাকাব্যের স্বপ্নে বিচরণ করেছিলেন। কবি ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের আবাল্য ভক্ত। এছাড়া মিলটনও তাঁর কাব্য-নাট্যে ছায়া ফেলেছেন। 'ফাউস্টে'র সাথেও কিছু মিল লক্ষণীয়। তিনি ফাউস্টের মতো এ কাব্যে নানা ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এ কাব্যে প্রতীকধর্মী চরিত্রও রয়েছে বেশ কিছু। এ কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দও ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও তা মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ থেকে কিছুটা পৃথক। তিনি প্রথাবদ্ধ চৌদ্দ অক্ষরের কাঠামো ভেঙ্গেছেন। তিনি প্রতিপদে আঠারো অক্ষর ব্যবহার করেছেন। নিচের উদ্ধৃতিতে এ নমুনা মিলবে :

"যখন রক্তিম চাঁদ অন্ধকার তাজীতে সওয়ার
উঠে আসে দিগ্বলয়ে, ওয়েসিস নিস্তব্ধ, নির্জন,
দূরে পাহাড়ের চূড়া ধ্যান-মৌন; অজানা ইঙ্গিতে
তখনি ঘুমন্ত প্রাণ জেগে ওঠে। তখনি এ মনে
মরুপ্রশ্বাসের সাথে জেগে ওঠে বিগত দিনের
দীর্ঘশ্বাস। আধো-আলো অন্ধকারে দেখি আমি চেয়ে
বিস্মৃতির দ্বার খুলে উঠে আসে ঘুমন্ত স্মৃতিরা।"

(হাতেম তা'য়ী)

এ কাব্যে বর্ণনাধর্মী চিত্র ফুটে উঠেছে নিচের পঙ্‌ক্তিমালায়—

"শস্যদানা ওষ্ঠপুটে যেমন জালালী কবুতর
দূর দারাজের রাহা পাড়ি দিয়ে ফিরে আসে তার
পরিচিত নীড়ে, ফিরিল হাতেম তা'য়ী শাহাবাদে
প্রশ্নের উত্তর নিয়ে বক্ষপুটে"

এ কাব্যে তিনি নানা-সমিল ছন্দেরও ব্যবহার করেছেন। অনেক প্রতীকী চরিত্রের সাথে এ কাব্যে আমরা পরিচিত হয়েছি। তাঁর কাব্যধারার বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁকে আমরা নব নবরূপে আবিষ্কার করেছি। 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্যগ্রন্থে ইসলামের সারতত্ত্ব তাঁর মনে দানা বেঁধে উঠেছে। তৌহীদী বোধ-বিশ্বাসে অটল সরল পথে চলতে তিনি কখনোই দিগভ্রান্ত হননি।

তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি 'লাশ' ও 'ডাহুক' কবিতা। এ 'লাশ' কবিতার নতুন ব্যঞ্জনায় তাঁর সৃষ্টিতে আলাদা মাত্রা সংযোজন করেছে। মানবতার কবি 'লাশ' কবিতায় পৃথিবীর এ যান্ত্রিক সভ্যতাকে, এ প্রাণহীন মেকী সভ্যতার শোষক শ্রেণীকে অভিশাপ দিয়েছেন। এখানে সর্বজনীন বোধ-বিশ্বাসে দীপ্ত মানবতার কবি মানুষেরই সৃষ্ট মানুষের ধ্বংসকে অভিসম্পাত দিয়েছেন।

"হে জড় সভ্যতা!
মৃত সভ্যতার দাস স্ফীতমেদ শোষক সমাজ!
মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ!
তারপর আসিলে সময়,
বিশ্বময়,
তোমার শৃঙ্খলগত মাংসপিণ্ডে পদাঘাত হানি'
নিয়ে যাব জাহান্নাম দ্বার-প্রান্তে টানি;
আজ এই উৎপীড়িত নিখিলের অভিশাপ বও;
ধ্বংস হও,
তুমি ধ্বংস হও।।"

তাঁর আর এক অনবদ্য সৃষ্টি 'ডাহুক' কবিতা। ডাহুকের অশ্রান্ত ডাক শুনছেন কবি চরাচরব্যাপী, কবি বলেন ঃ

"রাত্রিভর' ডাহুকের ডাক...
এখানে ঘুমের পাড়া, স্তব্ধদীঘি অতল সুপ্তির!
দীর্ঘরাত্রি একা জেগে আছি।
ছলনার পাশা খেলা আজ প'ড়ে থাক
ঘুমাক বিশ্রান্ত শাখে দিনের মৌমাছি,
কান পেতে শোন আজ ডাহুকের ডাক;
তারার বন্দর ছেড়ে চাঁদ চলে রাত্রির সাগরে
ক্রমাগত ভেসে ভেসে পালক মেঘের অন্তরালে,
অশ্রান্ত ডুবুরি যেন ক্রমাগত ডুব দিয়ে তোলে

স্বপ্নের প্রবাল।"

বিশুদ্ধ তৌহীদবাদী, আত্মবিশ্বাসী– সিন্দবাদ আর ঈগল পাখির দুঃসাহসী অভিযান ছিল তাঁর চোখের ভাষায় এবং সমগ্র কাব্যভুবনে। নির্লোভ শানিত অহংবোধ ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম গুণ। ছোটদের জন্যও তাঁর প্রচুর লেখা রয়েছে— 'পাখীর বাসা' (১৯৬৫), 'হরফের ছড়া' (১৯৭০) তার স্বাক্ষর বহন করছে। তাঁর লেখা অনেক ব্যঙ্গ-কবিতাও রয়েছে। তাঁর লেখা গানের সংখ্যাও কম নয়। এছাড়া তাঁর অপ্রকাশিত অনেক কাব্যগ্রন্থ শিশু-কিশোর কবিতা গল্প ও কাহিনীর ভাণ্ডার আজো লোকচক্ষুর অন্তরালে। এগুলো আমাদের জাতীয় সম্পদ। এগুলো প্রকাশনার ব্যবস্থা নেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

এ কবির সাথে আমার প্রথমত পরিচয় ঘটে ১৯৪৮-৪৯ সনে। তখন আমি ঢাকা ইডেন গার্লস কলেজের ছাত্রী। নাজিমুদ্দীন রোডের রেডিও পাকিস্তানের অফিসেই তাঁকে প্রথম দেখেছিলাম। তাঁর সস্নেহ 'ছোট বোন' সম্বোধনে স্নেহ-রসে সিক্ত হয়েছিলাম। তিনি আমার স্বরচিত কবিতা-আবৃত্তি শুনেছেন– তাঁর প্রশংসা পেয়েছি– যা' আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে কবিতা লিখতে। তাঁর চোখের দীপ্তিতে ছিল ঠিকরানো প্রতিভা– হাসিতে শিশুর সারল্য– অপরকে অল্প সময়ে আপন করে নেবার এক আশ্চর্য ক্ষমতা। তিনি আমাকে বলেছেন– 'লিখ-পুঁথির কাহিনীগুলো কবিতায় নিয়ে এসো।...' আমরা কেউ-ই তাঁর একলা চলার পথে সাথী হতে পারিনি, অক্ষমতা আমাদের। তিনি একক হাতেই বাজিয়েছেন তাঁর একতারার সুর– 'নৌফেল ও হাতেম' নামক কাব্যনাট্যে তাঁর স্বাক্ষর এঁকেছেন :

"...মুমিনের মৃত্যুই চেয়েছি
দীর্ঘ দিন এ জীবনে, আল্লাহর দরগাহে অসত্যের।
অন্যায়ের পদপ্রান্তে চাই নাই আত্মসমর্পণ
পৃথিবীতে।"

এখনো তার অবয়ব– দীর্ঘদেহ কাঠামো কর্মব্যস্ত চেহারা মনের আয়নায় স্পষ্ট দেখতে পাই। মনে পড়ে আমার প্রথম কবিতার বই 'নীলস্বপ্ন' (১৯৬২) যখন তাঁর হাতে দিয়েছিলাম– তিনি কী যে খুশি হয়েছিলেন! তক্ষুণি কবি আব্দুস সাত্তারকে ডেকে রেডিওতে রিভিউ করার জন্য পাঠালেন। তাঁর সাথে আমার শেষ দেখা হয় সম্ভবত ১৯৭০ সনে। তিনি আমাকে বলেছিলেন– সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত যেন সর্বদা পাঠ করি।

আমার স্বামী যখন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক ছিলেন (২৬/১২/৭১ থেকে ২২/১/৭৩ পর্যন্ত) তিনি আমাকে লোক মারফত খবর পাঠিয়েছিলেন– 'আমি যেন ভেঙ্গে না পড়ি এবং মনোবল সুদৃঢ় রাখি।' আজ স্মৃতির পাতা উলটিয়ে দেখছি– এমন একজন একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষীর আজ আমাদের বড় অভাব। এ অভাব পূরণ হবার নয়। ▭

---

**[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ৯ম সংখ্যা, জুন, ২০০৪]**

# ফররুখ-কাব্যে বাংলাদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশ

মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্

সাহিত্যে দেশ, মাটি ও মানুষের কথাই রূপ পায়। দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ, বৈচিত্র্য, নৈসর্গিক সৌন্দর্য-মহিমা এবং দেশের মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রাম-সাধনা, স্বপ্ন-কল্পনা বিচিত্ররূপে বাঙময় হয়ে ওঠে। কখনো তা ভাষা পায় বাস্তবের বিশ্বস্ত অনুসরণ, হিসাবে, অনেকটা ফটোগ্রাফিক পদ্ধতিতে, কখনও বা পরোক্ষভাবে নানা রূপ-প্রতীকে। কিন্তু এই রূপায়ণ রীতি যাই হোক না কেন, দেশ, মাটি, মানুষের চিত্রই সাহিত্যে ধরা পড়ে। এমনকি, দেশ-নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক ভাবানুভূতি এবং বিশ্বজনীন মানবিক বোধের রূপায়ণের ব্যাপারেও সাহিত্যিক-শিল্পীর রচনায় স্বদেশের প্রকৃতি, পরিবেশ, মাটি, মানুষ অনেক সময় পটভূমি হিসাবে কাজ করে।

প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সুনিবিড়। কেননা, প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যেই মানুষ বিচরণশীল এবং আজন্ম লালিত-পালিত। সে-পরিবেশ হতে পারে গ্রামীণ, এবং প্রকৃতি তথা নৈসর্গিক সৌন্দর্য-মহিমাও গ্রাম-কেন্দ্রিক, আবার সে পরিবেশ প্রকৃতি ও নৈসর্গিক সৌন্দর্যরূপ, হতে পারে নাগরিক তথা নগর-কেন্দ্রিক। তবে পরিবেশ-প্রকৃতি এবং, নৈসর্গিক সৌন্দর্যরূপ যেস্থানের ও যে-ধরনেরই হোক না কেন, মানুষের স্বপ্ন-কল্পনায়, প্রতিটি উচ্চারণে প্রকৃতি ও পরিবেশ অবশ্যই অস্তিত্বের স্বাক্ষর রেখে যায়। প্রকৃতি হয়ে ওঠে শিল্পী-সাহিত্যিকদের রচনার উপকরণ ও অবলম্বন। স্বদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে মানুষের পরিচয় আবাল্য, অনিবার্য ও সুনিবিড়। এই পরিচয়ই তাঁকে প্রাকৃতিক রূপ-বৈচিত্র্যের সন্ধানে, সৌন্দর্যের তৃষ্ণায় ও আর্তিতে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু প্রকৃতিতো কেবল রূপ ও সৌন্দর্য-সুষমার আধার নয়, নয় শুধু অনাবিল প্রশান্তির উৎসও। প্রকৃতি যেমন মনোরম-দৃষ্টিনন্দন, আবার তেমনি ভীষণ-ভয়াল ও রুদ্র। তার এক অঙ্গে দুই রূপ; এক রূপে সে স্নিগ্ধ ও প্রশান্ত, অন্যরূপে নিষ্ঠুর ও রূদ্র। এই দুই রূপই ধরা পড়ে শিল্পী-সাহিত্যিক বিশেষত কবিদের রচনায় তাদের অনুভূতিশীল হৃদয় ও কল্পনা-প্রতিভার স্পর্শে হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত ও বাঙময়। কখনো বা বিরূপ নিষ্ঠুর প্রকৃতি যে মানবিক বিপর্যয় ডেকে আনে তাও রচনায় বিধৃত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে এবং বিশেষভাবে কবিতায় প্রকৃতি ও পরিবেশের চিত্র-তার নানা বৈচিত্র্যময় রূপ, প্রশান্ত-স্নিগ্ধ এবং রুদ্র ও নিষ্ঠুর রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের বহু কবি-সাহিত্যিক প্রকৃতি ও পরিবেশের নানা রূপ বিধৃত করেছেন। শক্তিমান ও যুগ-স্রষ্টা কবিরা- বিশেষত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিদ্রোহী ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের রচনায় প্রকৃতি ও পরিবেশের বিচিত্র রূপ-সৌন্দর্য-সুষমা এবং রুদ্র ও ভয়ালতা এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক প্রতিভাধর কবি ফররুখ আহমদের নানা আঙ্গিক ও রূপরীতির অসংখ্য কবিতায় বাংলাদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশ বিচিত্ররূপে বিধৃত হয়েছে। নজরুলোত্তর যুগের বাংলা সাহিত্যে ইসলামী রেনেসাঁর অনন্যসাধারণ রূপকার হিসাবে এবং ইসলামের সাম্য, ন্যায় ও মানবতাবোধের আদর্শে গভীরভাবে বিশ্বাসী কবি ও মুসলিম নবজাগরণের বাণীবাহকরূপে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার অধিকারী ফররুখ আহমদ তাঁর কবিতায় বাংলাদেশের প্রকৃতি, পরিবেশ এবং জনজীবনের আলেখ্য অসামান্য দক্ষতায় রূপায়িত করেছেন। বিশ শতকের চল্লিশের দশকে সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত ফররুখ ,আহমদের কবিজীবনের প্রাথমিক পর্বের বিভিন্ন আঙ্গিক ও রূপরীতির কবিতায় যেমন বাংলাদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশ এবং জনজীবনের আলেখ্য বিধৃত হয়েছে, তেমনি পরবর্তীকালের অর্থাৎ তাঁর জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ে রচিত কবিতায়ও এ দেশের প্রকৃতি ও পরিবেশের রূপায়ণ ঘটেছে, জনজীবনের আলেখ্য চিত্রিত হয়েছে। ইসলামী রেনেসাঁর ও মুসলিম নবজাগরণের বাণীসমৃদ্ধ অনেক কবিতায়ও ফররুখ আহমদ স্থানবিশেষে বাংলাদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশের এবং জনজীবনের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। মূলত রোমান্টিক মানস-প্রবণতার অধিকারী এবং স্বপ্ন ও সৌন্দর্যবোধের রূপকার, সমাজসচেতন ও বাস্তববাদী কবি ফররুখ আহমদ যেমন স্বপ্ন-কল্পনা, আবেগ-অনুভূতি, আর্তি-আকুলতা ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে প্রকৃতি-আশ্রয়ী, পরিবেশ-সচেতন এবং পরিবেশ-নির্ভর হয়েছেন, তেমনি সমাজের বাস্তব রূপ, সমস্যা, সঙ্কট আর জনজীবনের দুঃখ-দুর্দশার আলেখ্য বিধৃত করতে গিয়েও প্রকৃতি-আশ্রয়ী, পরিবেশ-সচেতন এবং পরিবেশ-নির্ভর হয়েছেন। মানবতাবাদী কবি ফররুখ আহমদ তাঁর বহু কবিতায় প্রকৃতি ও পরিবেশের বর্ণনা ও সৌন্দর্যসুষমা ফুটিয়ে তোলার পাশাপাশি নানা রূপকে ও প্রতীকে বাস্তব জীবনের সমস্যা-সঙ্কটের চিত্র বাঙময় করেছেন, তাঁর চিন্তা-চেতনায় এবং আদর্শভিত্তিক কবিতায়, এমনকি ইসলামী রেনেসাঁ ও মুসলিম নবজাগরণমূলক কবিতায়ও প্রকৃতি ও পরিবেশ আশ্রয়ী হয়েছেন। কবি উচ্চারণ করেছেন :

'তুমি আনো সাথে মানবতার সে নির্ভীক ঝড়
প্রলয়াকাশের বুকে জীবনের দাও স্বাক্ষর
আউশ ধানের দেশে মদীনার সৌরভভার
ঝড় বৈশাখে জাগে নির্ভীক, জাগো নি:শঙ্ক হেলাল আবার!
হও প্রতিষ্ঠ আকাশে আকাশে নিশান আমার!'

**[নিশান, সাত সাগরের মাঝি, ১৯৪৪]**

ফররুখ আহমদ নিছক প্রকৃতি-বর্ণনার জন্যই প্রকৃতি-আশ্রয়ী হননি, বাংলাদেশের নদী-নিসর্গ, অরণ্যানী, বৃক্ষরাজি, মাঠ-প্রান্তর, ফুল-ফসল, সবুজ-শ্যামলিমা, ষড়ঋতু এবং আকাশ-নীলিমা ও মেঘবৃষ্টির আশ্রয় নেননি; প্রকৃতির ও পরিবেশের নদী-নিসর্গের বর্ণনায় তিনি স্বপ্ন-কল্পনার বিস্তারে, উপমা-চিত্রকল্পের ব্যবহারে অবশ্যই সৌন্দর্যরূপ বিধৃত করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর রচনার অন্তরালে কোন না কোন বক্তব্য সংগুপ্ত রয়েছে, কোথাও কোথাও তা রূপকে-প্রতীকে বিধৃত হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে প্রত্যক্ষ উচ্চারণে। ব্যক্তিমন ও হৃদয়ের

হাহাকার এবং বোবা বেদনার প্রকাশ করতে গিয়েও তিনি প্রকৃতি-আশ্রয়ী হয়েছেন। তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে :

> 'আমার হৃদয় স্তব্ধ, বোবা হয়ে আছে বেদনায়
> যেমন পদ্মের কুঁড়ি নিরুত্তর থাকে হিম রাতে।'

বাংলাদেশের নদী-নিসর্গ ফররুখ আহমদের কবিতায় বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। 'সাত সাগরের মাঝি'র কবি এ দেশের বহু নদীকে আশ্রয় করে নানা আঙ্গিকের কবিতা লিখেছেন। চল্লিশের দশকে অর্থাৎ তাঁর কবি-জীবনের প্রাথমিক পর্বে রচিত 'মধুমতী তীরে' শীর্ষক কবিতার অংশবিশেষের উদ্ধৃতি :

> আকাশের মাঠ ঘিরে ঘিরে ঘন সূর্যাস্তের নলবন
> তারি মাঝে ডুব দিয়ে পাখী চাঁদ দেখে আলোর স্বপন,
> দিনের কুশ্রীতা ঝেড়ে ফেলে ওড়ে কোন শুভ্র রাজহাঁস
> জোছনা ভেজানো তনু তার নীচে ফেলে মাঠ মরা ঘাস
> উড়ে চলে আকাশের ধারে অন্তহীন নদীর কিনারে।
> জনতার কোলাহল নাই প্রশান্তির স্বপ্ন-মধুমতী
> দুই পাশে ধান ক্ষেত রেখে অবিশ্রান্ত চলে সেই নদী'
>
> [মধুমতী তীরে]
>
> পদ্মার পাড়ের মত ক্ষয়মান জনতার তীর
> সামান্য অস্তিত্ব নিয়ে শংকাতুর বুকে জেগে ছিল
> সর্বহারা নিরাশায়। এল ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ বধির'
>
> [পদ্মার ফাটল]
>
> তারপর বন্যা এল মৃত্যু-বেগে পদ্মার ফাটলে
> জরাস্তব্ধ জীর্ণতটে জাগিল আকুল আর্তনাদ ।
> দুঃস্থের দুর্বল বাধা মানিল না পদ্মা ও প্রকৃতি
> শোষণের পূর্ণ দেহ দেখা দিল পূর্ণ রূপ ধরি,
> সে কী আর্তনাদ, মৃত্যু, সংখ্যাহীন ক্ষুধিতের ভীতি
> পদ্মার ভাঙ্গনে এসে জমা হ'ল বুভুক্ষু শর্বরী;
> নদীতে প্রশান্তি এল, থেমে গেল বন্যার প্রকোপ
> থামিল না সেই বর্শা-শোষকের মেদ-স্ফীত লোভ ॥
>
> [পদ্মার ভাঙ্গন]

উপরোক্ত দু'টি চতুর্দশপদী কবিতার ('পদ্মার ফাটল' ও 'পদ্মার ভাঙ্গন') উদ্ধৃতাংশ থেকেই স্পষ্ট যে, রোমান্টিক মানস-প্রবণতার অধিকারী এবং স্বপ্ন ও সৌন্দর্যবোধের রূপকার মানবতাবাদী কবি ফররুখ আহমদ বাংলাদেশের নদী-নিসর্গেও সৌন্দর্যই শুধু প্রত্যক্ষ করেননি, নদী-ভাঙ্গন ও বন্যার ফলে নদী-তীরবর্তী জনজীবনে যে বিপর্যয় ও সর্বনাশ নেমে আসে, প্রাকৃতিক দুর্যোগকে কেন্দ্র করেও যে এক শ্রেণীর লোভী মানুষ দুর্গতদের শোষণের শিকারে পরিণত করে সেই সত্যও উপলব্ধি করেছেন এবং তাঁর প্রতিবাদী কবি-ভাষায় তা ব্যক্ত করেছেন। বাংলাদেশ যে নদীমাতৃক দেশ এবং এদেশের অসংখ্য নদীনালা যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অফুরন্ত উৎস, তেমনি তা যে

নদী-ভাঙ্গন ও বন্যার এবং জনজীবনের দুঃখ-দুর্দশারও উৎস-এই বাস্তবতাও বিধৃত হয়েছে ফররুখ আহমদের কবিতায়। পঞ্চাশের দশকে তাঁর রচিত 'নদীর দেশ' শীর্ষক চতুর্দশপদী কবিতার অংশবিশেষের উদ্ধৃতি :

পদ্মা,মেঘনার দেশ, চিত্রা, হেনা, তিতাসের দেশ
-যে দেশে রজতরেখা, কর্ণফুলী, কপোতাক্ষ আর
গোমতি, যমুনা, তিস্তা, মধুমতী, হরিণ-ঘাটার
বহমান গতিস্রোত খুঁজে ফেরে পূর্ণতা অশেষ;
অসংখ্য নদী ও নদে যে দেশের মাঝি নিরুদ্দেশ
গেয়ে যায় ভাটিয়ালী স্বপ্নে দেখে যে দেশ আমার
সুপ্তোত্থিত, সাথে নিয়ে অভিজ্ঞান মুঠো মৃত্তিকার
এসেছিল এ জমিনে একদা জালালী দরবেশ।'

[নদীর দেশ]

বাংলাদেশ যেমন নদ-নদীর দেশ, তেমনি ধান আর গানেরও দেশ। প্রকৃতির দাক্ষিণ্যেই ফুল-ফসলের অবারিত সমারোহ ঘটে, আবার প্রকৃতির বিরূপতায়ই খরায়, ঝড়-বৃষ্টিতে ও বন্যায় চাষাবাদ ব্যাহত হয়, ফুল-ফসলও বিনষ্ট হয়ে যায়। নদীমাতৃক, কৃষিনির্ভর ও কৃষি-অর্থনীতিনির্ভর আমাদের দেশে প্রকৃতি বিশেষত নদী-নিসর্গ তার বিরূপতা ও রুদ্র রূপ নিয়ে এবং অনাবৃষ্টি, বন্যা ও ঝড়-তুফানে মানবিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনে। তবু আশাবাদী মানুষ চাষাবাদে ও শস্য উৎপাদনে ব্রতী হয়। উৎপাদন ভাল হলে ফসল গোলায় তুলে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানায়, নবান্নের উৎসবেও মাতে। পঞ্চাশের দশকে রচিত 'ধানের কবিতা' শীর্ষক চতুর্দশপদীতে ফররুখ আহমদ যে চিত্র-আলেখ্য তুলে ধরেছেন তার অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

'ধান ধান, ধান শুধু, এ ধানের স্বপ্নে দি গোণে
মাঠের মানুষ যত! ফাল্গুনে জমিন করে চাষ,
বৈশাখে ছড়ায়ে বীজ প্রতীক্ষায় থাকে দীর্ঘ মাস,
কখনও শংকিতচিত্ত উত্তরের ঝড়ে ও প্লাবনে,
কখনো শিশির-ঝরা ভোরে পেয়ে সুরভী আশ্বাস
অজস্র ধানের শীষে;

আউশ ও আমন ধানের ফলনে কৃষাণ পল্লীতে ও চাষা পরিবারের জীবনে যে আনন্দধারা প্রবাহিত হয়, নবান্নের উৎসবও হয়ে থাকে, তাও বিধৃত হয়েছে কবিতায়:

'আউশ ধানের স্বপ্নে কৃষাণের তপ্ত দিন কাটে;
আমনের বন্যা আনে ফসলের সম্পূর্ণ জোয়ার।
শোকর-গোজারী ক'রে তারপর দরবারে খোদার
গোলায় তোলে সে ধান-
কৃষাণ-পল্লীতে আনে পরিপূর্ণ সুরের সম্ভার।'

[ধানের কবিতা]

নদীমাতৃক বাংলাদেশ প্রায় প্রতিবছরই প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, নদী-ভাঙ্গন, ঝড়-তুফান এবং সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস জনজীবনে ও জাতীয় অর্থনীতিতে বিরাট বিপর্যয় ডেকে আনে। মানবতাবাদী কবি ফররুখ আহমদ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও রূপচিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি তাঁর অনেক কবিতায় প্রাকৃতিক ও মানবিক আলেখ্যও অঙ্কন করেছেন। 'বৈশাখী' শীর্ষক কবিতায় ফররুখ আহমদের উচ্চারণ:

'বৈশাখের মরা মাঠ নিস্পন্দ যখন
নিস্প্রাণ, যখন ঘাস বিবর্ণ, নিস্প্রভ ময়দান,
যোজন যোজন পথ ধূলি-রুক্ষ, প্রান্তর বিরান,
শুষ্ক খড়কুটো নিয়ে ঘূর্ণি ওঠে মৃত্যুর মতন
বিদ্যুৎ চমকে তার সাড়া জাগে সমস্ত আকাশে
জেগে ওঠে বজ্র রবে এক সাথে নির্জিত প্রান্তর
দিক দিগন্তের পথে যায় চলে নিমিষে খবর;
ধ্বংসের আহবান নিয়ে অনিবার্য সে আসে সে আসে ॥

[বৈশাখী]

প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা ঝড়ের ভয়াবহতা এবং ধ্বংসকারী ক্ষমতা তুলে ধরে ফররুখ আহমদ 'শিকার' শীর্ষক কবিতায় হাঙ্গরের প্রতীকে লিখেছেন:

বিদ্যুৎ বন্যার বহ্নি বুকে পুরে হাঙ্গরের মত
মেঘেরা চলেছে ডুবে আকাশের গহীন নদীতে
নিঃশব্দ সঞ্চারে, জ্বলে অগ্নিগর্ভ পাহাড়ের মত
জাগে এক চাপা ঝড় ঘনীভূত বাষ্পের ধোঁয়ায়
তীরবেগে ছুটে চলে দুর্নিবার সে আগুন বুকে।
সারা বন তোলপার করে সেই ভয়াল হাঙ্গর
বিদ্যুতের হিংস্র দাঁতে ছিঁড়ে ফেলে অরণ্যের টুঁটি
সবুজ বনানী স্বপ্নে তুলি নগ্ন শাখার ভ্রূকুটি
তন্বী তমালের দেশে টেনে আনে কংকালের ঘর;

[ শিকার ]

ঝড়-বৃষ্টি, বন্যা ও নদী-ভাঙ্গনজনিত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিপর্যয় এ দেশে প্রায় সাংবৎসরিক ব্যাপার। প্রখর গ্রীষ্মের দিনে সূর্যের দাবদাহে মাটি-মাঠ ফেটে চৌচির হয়, ব্যাপক খরা দেখা দেয়, প্রচণ্ড গরমে মানুষ অসহ্য ও বিপন্নবোধ করে। তৃষ্ণার্ত মাটি ও মানুষ বৃষ্টির সজল স্পর্শ চায়, অবারিত বর্ষণের প্রত্যাশা করে। ঝড়-বৃষ্টিতে এবং বিশেষ করে অতিবৃষ্টির দরুন বন্যার যে আশঙ্কা থাকে, তা বিস্মৃত হয়ে মানুষ বৃষ্টির প্রার্থনা করে। আর সেই প্রার্থিত বৃষ্টি এলে জনমনে যে আনন্দ জেগে ওঠে- তা-ই বিধৃত হয়েছে ফররুখ আহমদের 'বৃষ্টি' শীর্ষক কবিতায়:

'বৃষ্টি এল এবং প্রতীক্ষিত বৃষ্টি-পদ্মা মেঘনার
দু'পাশে আবাদী গ্রামে, বৃষ্টি এল পুবের হাওয়ায়,
বিদগ্ধ আকাশ, মাঠ ঢেকে গেল কাজল ছায়ায়;
বিদ্যুৎ রূপসী পরী মেঘে মেঘে হয়েছে সওয়ার।

বর্ষণ মুখর দিনে অরণ্যের কেয়া শিহরায়,
রৌদ্রদগ্ধ ধানক্ষেত আজ তার স্পর্শ পেতে চায়,
নদীর ফাটলে বন্যা আনে পূর্ণ প্রাণের জোয়ার।'
[বৃষ্টি]

'কোথায় অনেক দূরে লাগিয়াছে বৃষ্টির কোমল
সজল সহানুভূতি কোথায় জমেছে যেন মেঘ
দূর বহুদূর হতে রাতের সাথে সেই জল
স্বপন আশ্বাস আনে। কবে তুমি দেখা দেবে মেঘ?
আমার আতপ্ত বুকে রাত্রি ভরা তারার ইঙ্গিত,
বন্ধ্যা ধরণীর বুকে আজ শুধু মেঘের উদ্বেগ
চাতকের ব্যগ্র ওষ্ঠে আজ শুধু তৃষ্ণার সঙ্গীত
তৃষ্ণার্ত অন্তর কাঁদে; কবে তুমি দেখা দেবে মেঘ!'
[প্রতীক্ষা]

বৃষ্টি এলে তৃষিত মাটি ও মানুষের চিত্ত পরিতৃপ্ত হয়, ফসলের জমিও হয় আবাদযোগ্য, চাষাবাদ ও বীজ আর চারাগাছ রোপণের ফলে মাঠ সবুজ আর সোনালী শস্যে ভরে যায়, অরুণ্যানী, গাছপালা শ্যামলিম হয়ে ওঠে, ফুল-ফল ও ফসলের সমারোহ ঘটে, প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং রূপশ্রীও দীপ্তিমান এবং আকর্ষণীয় হয়। ফররুখ আহমদের দৃষ্টিতে প্রকৃতি ও পরিবেশ ধরা পড়েছে বিচিত্ররূপে:

'ঘাস ফড়িঙের রঙ মিশে যায় ধানের সবুজে,
শাপলা-শালুক ঘেরা সুদূর দিগন্ত ছোঁয়া বিল,
বকাওলি পরী বুঝি খেলে আকাশের ঝিলমিল
শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ উঁকি দেয় নীলার গম্বুজে।'
[বিগত]

'বনানী সেজেছে সাকী ফুলের পেয়ালা নিয়ে হাতে
তুহিন শীতের শেষে দেখি আজ মুক্ত রূপ তার,
গাছে গাছে ডালে ডালে তারুণ্যের জেগেছে জোয়ার
জেগেছে ফুলের কুঁড়ি অরণ্যের মদিরা বিলাতে।'
[ফাল্গুনে]

দেশীয় পরিবেশ সৃষ্টিতে, প্রাকৃতিক রূপ-বৈচিত্র্যের রূপায়ণে ফররুখ আহমদ যেমন বৈচিত্র্য-সন্ধানী হয়েছেন, তেমনি আশ্রয় নিয়েছেন রূপক ও প্রতীকের। এ দেশের নদী-নালা ও দিগন্ত-ছোঁয়া বিল-ঝিলকে অবলম্বন করে তিনি রচনা করেছেন নানাধর্মী কবিতা। বিশাল সমুদ্র এবং দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমির রুক্ষতার উপমার পাশাপাশি শান্ত-স্রোতা নদীর ধীর-মন্থর প্রবাহ এবং নরম-নমনীয় গ্রাম-বাংলার রূপ ফররুখ আহমদের বহু কবিতায় দক্ষতার সঙ্গে বিধৃত হয়েছে। ইসলামী রেনেসাঁর ও মুসলিম নবজাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার কবি তাঁর প্রতীক ও রূপকধর্মী কবিতায় (যা মধ্যপ্রাচ্য-বিশেষভাবে আরব ও মরু মদীনার পটভূমিকায় রচিত) বাংলার পরিবেশ ফুটিয়ে তুলেছেন:

আউশ ধানের দেশে মদীনার রক্ত গোলাপ
সকল আশার পূর্ণতা নিয়ে মেলবে কলাপ
বন্য ঝড়ের বৈশাখী পাখা নিশান আমার
আধো চাঁদ আঁকা, ফের মেঘে ঢাকা নিশান আমার;

**[নিশান : সাত সাগরের মাঝি, ১৯৪৪]**

বস্তুত স্বাদেশিক পটভূমি, প্রকৃতি ও পরিবেশ-সচেতনতার দরুন এবং মানবতাবাদী কবি-সত্তার অধিকারী হওয়ার ফলে ফররুখ আহমদ মধ্যপ্রাচ্য থেকে আহরিত কাহিনী বিশেষত পুঁথি সাহিত্য অবলম্বনে যেসব কবিতা ও কাহিনী রচনা করেছেন, তাতেও স্থানে স্থানে বাংলাদেশের পরিবেশ এবং নদী-নিসর্গ ছায়া বিস্তার করেছে, জনজীবনের দুঃখ-দুর্দশা বিধৃত হয়েছে। যেমন:

'নদীর ভাঙনে জেগে অসতর্ক গৃহস্থ যেমন
সদ্য ঘুম-ভাঙা চোখ মেলে দেখে আশায় মৃত্তিকা
চির খাওয়া তার পাশে ভেঙ্গে পড়ে সে মাটি যেমন
ভাসায়ে প্রবল স্রোতে মুহূর্তে সে গৃহহারা জনে
যখন মেলে না ঠাঁই পদনিম্নে, মেলে না আশ্বাস
ধরে সে দুর্গত প্রাণ তৃণখণ্ড আপ্রাণ প্রয়াসে
তেমনি আমার মন জেগে আছে শূন্য অন্ধকারে
সর্বশেষ প্রয়াসে আত্মার।'

**[হাতেম তায়ী]**

এ নিবন্ধের সূচনাতেই বলেছি, স্বদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে কবির পরিচয় আবাল্য। জন্মসূত্রে এবং অনেকটা নিয়তি-নির্ধারিতভাবেই অন্যসব সামাজিক মানুষের মতোই কবিও কোন না কোন দেশের বাসিন্দা। যে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে কবি আবাল্য লালিত-পালিত, সীমিত ক্ষেত্রে হলেও তার প্রভাব কবির মানস-চেতনায় মুদ্রিত হয়। তাঁর ভাষায়, ভাষার উচ্চারণে, উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্পে ইত্যাদিতে স্বদেশ, স্বসমাজ ও প্রকৃতির পরিচয় দীপ্ত হয়ে ওঠে। ফররুখ আহমদের অজস্র কবিতায় ও গানে স্বদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশ নানারূপে বিধৃত হয়েছে। এখানে সামান্য কয়েকটি কবিতার অংশ-বিশেষের উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টি তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। ▫

---

**(ফররুখ একাডেমী পত্রিকা ১০ম সংখ্যা অক্টোবর-২০০৪)**

# ফররুখ আহমদের কবিতায় মানবতাবাদী আদর্শের রূপায়ণ

**মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্**

ফররুখ আহমদ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক প্রতিভাধর কবি। তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব ও মৌলিকতার পরিচয় বিধৃত ফররুখ আহমদের বলিষ্ঠ, স্বতন্ত্র ও সহজে শনাক্তযোগ্য কাব্য ভাষায়, বিভিন্ন ছন্দে এবং আঙ্গিক ও রূপরীতিতে বিচিত্র বিষয়ে কাব্য-রূপায়ণে, উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্পের সৃষ্টিশীল ও স্বাতন্ত্র্যধর্মী ব্যবহারে, ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ এবং মানবতাবাদী আদর্শের নবরূপায়ণে।

উল্লেখ্য, মানবতাবাদ তথা মানবতাবাদী আদর্শের রূপায়ণ বাংলা কাব্যে কোন নতুন ব্যাপার বা বিষয় নয়। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ এবং সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত বিভিন্ন কবির রচনায় মানবতাবাদী ভাবধারা, চিন্তা-চেতনা ও আদর্শের প্রতিফলন ও রূপায়ণ নানাভাবেই ঘটেছে, মানবতার লাঞ্ছনা, অত্যাচার-নিপীড়ন, শোষণ-বঞ্চণা এবং পরাধীনতার বিরুদ্ধে অনেক কবিই প্রতিবাদ ও সংগ্রামের বাণী উচ্চারণ করেছেন। আর এ-সত্যও সুবিদিত যে, বাংলা কাব্যে মানবতাবাদের উৎসারণ ও রূপায়ণে মানবধর্ম ইসলামের আদর্শ ও ঐতিহ্য এবং মানবিক মূল্যবোধ যেমন প্রেরণার উৎস হয়েছে, তেমনি আধুনিক যুগে ইউরোপীয় ভাবধারা ও জীবনবোধ প্রেরণা যুগিয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের তিন যুগ-স্রষ্টা কবি এবং আধুনিককালের ও বৃটিশ পরাধীনতার যুগের কাব্য-সাধক মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের রচনায় মানবতাবাদী ভাবধারা এবং মানবতাবাদের আদর্শ নানাভাবে বিধৃত হয়েছে। উল্লেখ্য, দেব-দেবীর কাহিনী-নির্ভর মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে মুসলমান কবিরাই মর্ত্যের মানুষের জীবনধর্মী কাহিনী-কাব্য– বিশেষত রোমান্টিক কাহিনী-কাব্য রচনার মাধ্যমে (যার অধিকাংশই ফারসি কাহিনী-কাব্যের অনুবাদ) মানবসত্তার রূপায়ণ ঘটান, মানবতাবাদী আদর্শও বিধৃত করেন। মধ্যযুগের কবি চণ্ডীদাসের কণ্ঠে উচ্চারিত মানবতাবাদের বাণী : 'শুন হে মানুষ ভাই/সবার উপরে মানুষ সত্য/তাহার উপরে নাই' এবং আধুনিক যুগের মহৎ মানবতাবাদী ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কণ্ঠে উচ্চারিত বাণী : 'গাহি সাম্যের গান/মানুষের চেয়ে বড় কিছু নহে/ নহে কিছু মহীয়ান'– এই ঘোষণার মূলে সাম্য, শান্তি ও মানবতার ধর্ম ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষা যে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, তা অনস্বীকার্য।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাহিত্য-সমালোচক ও শিক্ষাবিদ মরহুম হুমায়ুন কবির তাঁর 'বাংলার কাব্য' শীর্ষক গ্রন্থে বাংলা কাব্যে মানবতাবাদের উদ্বোধন ও বিকাশে ইসলামের অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। ফররুখ আহমদের কবিতায়

মানবতাবাদী আদর্শের রূপায়ণ প্রসঙ্গে বাংলা কাব্যে মানবসত্তা ও মানবতাবাদের উদ্বোধন এবং তাঁর পূর্বসূরি কবিদের রচনায় মানবতাবাদী আদর্শের রূপায়ণের বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করা হলো এই কারণে যে, তাঁর রচনায়ও মানবতাবাদী আদর্শের প্রতিফলন ও রূপায়ণ ঘটেছে ধর্ম-নিরপেক্ষ মানবতাবাদের ভাবধারায়, ইউরোপীয় কাব্য পাঠের অভিজ্ঞতা ও চিন্তা-চেতনার সংস্পর্শে এবং সর্বোপরি ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য মূল্যবোধের প্রভাবে এবং সাম্য, শান্তি ও মানবতার আদর্শ ধর্ম ইসলামে গভীরভাবে বিশ্বাস স্থাপনের ফলে। মুসলমান কবিদের রচিত পুঁথি-সাহিত্য-বিশেষত মানবজীবন-নির্ভর এবং ধর্মীয় আদর্শভিত্তিক ও আরবি-ফারসি শব্দ সংবলিত 'দোভাষী' পুঁথি-সাহিত্য পাঠের ফলেও ফররুখ আহমদ মানবতাবাদী চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন এবং তাঁর কাব্যে মানবতাবাদী আদর্শের রূপায়ণ ঘটান। ফররুখ আহমদের কবিতায় মানবতাবাদী আদর্শের রূপায়ণ ঘটেছে নানাভাবে– কখনো সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে, কখনো বা নানা রূপক ও প্রতীকের মাধ্যমে। তাঁর কবিতাকে এবং বিশেষভাবে মানবতাবাদী ভাবধারার কবিতাকে একাধিক প্রেক্ষাপটে ও দৃষ্টিকোণ থেকে এবং নানাভাবে প্রত্যক্ষ করা বা পর্যালোচনা করা যায়। আর তা থেকে যে-বিষয়টি স্পষ্ট হয় তা হলো এই যে, জীবনের এক পর্যায়ে অর্থাৎ কাব্য-সাধনার প্রাথমিক পর্বে একাধারে তিনি ধর্ম-নিরপেক্ষ মানবতাবাদী আদর্শের রূপকার এবং বাংলা কাব্যে ইসলামের মানবতাবাদী আদর্শ, ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধেরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও মহৎ রূপকার। ফররুখ আহমদের কবিতায় ধর্ম-নিরপেক্ষ মানবতাবাদী আদর্শ তাঁর কাব্য-সাধনার কোন্ পর্বে এবং কীভাবে রূপায়িত হয়েছে, ইসলামের মানবতাবাদী আদর্শকে তিনি কীভাবে ক্রমান্বয়ে তাঁর কবিতায় রূপায়িত করেছেন তা প্রত্যক্ষ করতে এবং অনুধাবন করতে হলে ফররুখ আহমদের কবি-মানস ও কবিতার বিবর্তনের দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। তাঁর কবিতা পাঠে এটাই স্পষ্ট হবে এবং উপলব্ধি করা যাবে যে, কবিতার উপজীব্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যেমন তাঁর কাব্য-ভাষার পরিবর্তন ঘটেছে তেমনি ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধে গভীরভাবে আস্থাবান হওয়ার পর মানবতাবাদী এই কবির রচনায় রূপক ও প্রতীকের ব্যবহার স্বতন্ত্র এবং তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি এবং নজরুলোত্তর যুগের মহৎ মানবতাবাদী কবি এবং ইসলামের আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের অসামান্য রূপকার ফররুখ আহমদের নানা আঙ্গিক ও রূপরীতির বিচিত্রধর্মী এবং বিপুল কাব্য-সম্ভার থেকে অজস্র উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় এবং মানবতাবাদী আদর্শের রূপায়ণে তাঁর অবদান তুলে ধরা এই স্বল্পপরিসর নিবন্ধে সম্ভব নয়। তবে ফররুখ আহমদের কবিতার অভিনিবিষ্ট পাঠক মাত্রই জানেন যে, তিনি ছিলেন একাধারে স্বপ্নচারী, রূপ ও সৌন্দর্যের অভিসারী এবং সমাজ-সচেতন ও বাস্তববাদী এক সংবেদনশীল কবিসত্তা। স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতা প্রীতি এবং নির্যাতিত-নিপীড়িত

মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা, পাশাপাশি প্রকৃতি ও পরিবেশ এবং নৈসর্গিক সৌন্দর্য-মহিমা ফররুখ আহমদের কবিতায় তাঁর কাব্য-সাধনার প্রাথমিক-পর্ব থেকেই বাঙময় হয়েছে। কিন্তু মানবতাবাদী কবি ফররুখ আহমদ 'নিছক শিল্পের জন্য শিল্প নীতিতে' বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই রোমান্টিক মানস প্রবণতার অধিকারী এবং স্বপ্ন ও সৌন্দর্যবোধের রূপকার কবি ফররুখ আহমদ তাঁর কাব্য-সাধনার প্রাথমিক-পর্বেই মানবতাবাদী আদর্শের রূপায়ণ এবং পরাধীনতা, অত্যাচার-নিপীড়ন ও শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বলিষ্ঠ বাণী উচ্চারণকে তাঁর মানবিক ও শৈল্পিক দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করেন। এদিক থেকে তাঁর পূর্বসূরি এবং বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহী চেতনার অসামান্য রূপকার এবং পরাধীনতা, অত্যাচার-নিপীড়ন ও শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রামী– মহৎ মানবতাবাদী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর এক ধরনের মানস-সাযুজ্য রয়েছে। ফররুখ আহমদ তাঁর কাব্য-সাধনার পথ কী, কবিকর্মী ও শিল্পী হিসাবে তিনি কোন্ পথের পথিক, মানবতাবাদী আদর্শের রূপায়ণে এবং মানব-মুক্তির লক্ষ্যে তাঁর করণীয় কী, সে-কথা তিনি কাব্য-সাধনার প্রাথমিক-পর্বেই বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন। তাঁর 'পথ' শীর্ষক কবিতায় (চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত) তিনি বলেছেন :

.... মেঠো পথ; পায়ে-চলা পথ
কাঁকর বিছানো পথ : মজুরের আর
নিঃস্ব জনতার পথ টানিছে আমাকে।

.... .... ....

ডাকে মানুষের পথ
নিরন্ন ক্ষুধিত শীর্ণ মানুষের পথ,
ধর্ষিতা মায়ের রিক্ত ক্রন্দনের পথ
সংকীর্ণ আবদ্ধ পথ পীড়িত আত্মার,
অশান্ত ক্ষুধিত পথ বিপ্লবী-মনের

.... .... ....

শৃংখলিত মনে আর শৃংখলিত পথে
মৃত্যু সন্নিবিষ্ট দৃঢ় আজাদীর পথ

.... .... ....

যে-পথের ধূলিমাঝে পতাকা সাম্যের
উঠায়েছে উর্ধ্বশির, সে-পথে আমার
আরব্ধ জীবন ............

**(পথ : আজাদ করো পাকিস্তান)**

কবি-জীবনের প্রাথমিক-পর্বে অর্থাৎ চল্লিশের দশকের গোড়াতেই রোমান্টিক ও স্বপ্ন-মুগ্ধ কবি ফররুখ আহমদ বাস্তব জীবন ও সমকালীন সমাজ-প্রেক্ষিতের সংস্পর্শে এসে প্রত্যক্ষ করেছেন নির্যাতিত-নিপীড়িত, বঞ্চিত ও রিক্ত মানুষের করুণ ছবি, অনুভব করেছেন যে বিপ্লবের পথেই রয়েছে পরাধীনতার, অত্যাচার-নিপীড়নের অবসান, 'শির-দাঁড়া বাঁকা ম্লান মানুষ' ও ঘুমন্ত জনতার উত্থান ও মানবতার মুক্তি। মানবতাবাদী আদর্শের রূপকার ফররুখ আহমদ তাঁর কাব্য-সাধনার প্রাথমিক-পর্বে ছিলেন অনেকটা বামপন্থার অনুসারী এবং তাঁর সেকালের কবিতায় ধর্মনিরপেক্ষতারই প্রাধান্য। মানবতাবাদী এই কবি তখন নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের মুক্তি চাইতেন বটে, কিন্তু কোনো সুনির্দিষ্ট পথ-নির্দেশ তাঁর ছিল না, দারিদ্র্য-পীড়িত,শোষিত-বঞ্চিত এবং ক্ষুধাতুর ও নিরন্ন মানুষের মুক্তি আর উত্থানই ছিল তাঁর স্বপ্ন এবং কাম্য। সংগ্রামী ও বিপ্লবী চিন্তার অধিকারী মানবতাবাদী কবি ফররুখ আহমদ তাঁর বহু কবিতায় প্রত্যক্ষভাবে এবং 'প্রতীক' আর 'রূপক'-এর মাধ্যমে মানবতার লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, বিপ্লব ও বিদ্রোহের আহ্বান জানিয়েছেন, তিনি উচ্চারণ করেছেন ঃ 'জাগো জনতার আত্মা, ওঠো কথা কও'।

কবি-জীবনের প্রাথমিক পর্বেই তিনি প্রত্যাশা করেছেন বিদ্রোহের দিনের। আশাবাদী কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন :

"এ দিন সম্পূর্ণ নয় – এদিনেও রয়েছে ফাটল।
সূর্যের জোয়ার এসে সেই পথে ঢালিবে যে ঢল
আজো পাই তাহার আভাস।

.... .... .... ....
পথে দেখি দেখি আসন্ন প্রলয়–
মৃত্যুর সঙ্গীন পাশে আর এক মুক্তির সঙ্গীন
বিদ্রোহের দিন।"

**(দিন, সওগাত, আষাঢ়, ১৩৫২)**

মানবতাবাদী কবি ফররুখ আহমদের অজস্র রচনায়-বিশেষত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন এবং ১৩৫০ সালের মহামন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত বহু কবিতায় দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, অনাহার-ক্লিষ্ট মৃত মানুষের করুণ ও মর্মন্তুদ পরিণতির চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। শুধু ১৩৫০-এর মন্বন্তরের পটভূমিতে লেখা তাঁর সুবিখ্যাত 'লাশ' কবিতায় নয়, তার আগে রচিত বহু কবিতায়ও ফররুখ আহমদের মানবতাবাদী মনের উজ্জ্বল পরিচয় রূপ পেয়েছে। জড় সভ্যতা ও স্ফীতমেদ শোষক সমাজের বিরুদ্ধে তিনি উচ্চারণ করেছেন ঘৃণা ও ধিক্কার। মানবতার বিজয়ে আশাবাদী ও বিশ্বাসী কবি জানেন : একদিন এই নিপীড়িত মানুষের অভ্যুত্থান ঘটবে– আগামী কোন ভবিষ্যতে। জড়-সভ্যতার দাস স্ফীতমেদ শোষক সমাজ সেদিন হবে মৃত্যু-মুখী। ফররুখ আহমদ তাই উচ্চারণ করেছেন :

"হে জড় সভ্যতা !
মৃত-সভ্যতার দাস স্ফীতমেদ শোষক-সমাজ।
মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ;
তারপর আসিলে সময়
বিশ্বময়
তোমার শৃংখলগত মাংসপিণ্ডে পদাঘাত হানি'
নিয়ে যাব জাহান্নাম দ্বার-প্রান্তে টানি';
আজ এই উৎপীড়িত মৃত্যুদীর্ণ নিখিলের অভিশাপ বও;
ধ্বংস হও
তুমি ধ্বংস হও।।"

**(লাশ : সাত সাগরের মাঝি)**

চল্লিশের দশকে– তাঁর কাব্য-সাধনার মাঝামাঝি পর্যায়ে ফররুখ আহমদ গভীরভাবে উপলব্ধি করেন যে, বিশ্বজনীন মানবধর্ম ইসলামের আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের বাস্তবায়নের মাধ্যমেই জড়-সভ্যতার এবং স্ফীতমেদ শোষক সমাজের শোষণ নিপীড়নের অবসান ঘটানো এবং মানব-মুক্তি সম্ভব। তিনি আরও উপলব্ধি করেন যে, ইসলামের মানবিক মূল্যবোধ ও আদর্শের আলোকে মানব-মুক্তিকে সফল করে তুলতে হলে, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, বৃহত্তর জেহাদের মাধ্যমেই তা করতে হবে এবং তা কেবল চরিত্রবান ও আদর্শবাদী 'প্রকৃত' মানুষের পক্ষেই সম্ভব। কাব্য-সাধনার প্রাথমিক-পর্বে কিছুটা বামপন্থার এবং ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারী হলেও পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ চল্লিশের দশকের এক পর্যায়ে ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও রেনেসাঁর রূপকার এবং জাতীয় জাগরণের বাণী-বাহক ও মানবতাবাদী কবি ফররুখ আহমদ তাঁর 'সাত সাগরের মাঝি' ও 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্য-গ্রন্থের কবিতাবলীতে বলিষ্ঠ ও সৌন্দর্যদীপ্ত এবং কাব্য-ভাষায় স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত রূপ নির্মাণে সক্ষম হন।

ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'সিন্দবাদ', 'সাত সাগরের মাঝি', 'ডাহুক', 'লাশ', 'আউলাদ' প্রভৃতি কবিতায় যেমন ইসলামের সাম্যবাদী আদর্শের অনুসারী ও মুসলিম রেনেসাঁর রূপকার একজন মানবতাবাদী কবির সাক্ষাৎ মেলে, তেমনি স্বতন্ত্র কাব্যভাষা ব্যবহারে, কবিতায় রূপক ও প্রতীকের রূপায়ণে, উপমা-চিত্রকল্প বিনির্মাণে এবং বিচিত্র ছন্দোধ্বনির প্রয়োগে একজন রূপদক্ষ ও শিল্প-নিপুণ কবির সাক্ষাৎ মেলে। ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি' ও 'সিরাজাম মুনীরা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের কবিতাবলীতে একদিকে যেমন রূপ পেয়েছে মুসলিম রেনেসাঁর বাণী, বিশ্বজনীন মানবধর্ম ইসলামের সাম্য ও ন্যায়নীতির আদর্শ ও উজ্জীবনের প্রেরণা, অন্যদিকে তাতে বিধৃত হয়েছে মানবতাবাদী চিন্তাধারা, মানবতার লাঞ্ছনার চিত্র। সাম্য, শান্তি ও মানবতার ধর্ম ইসলামের আদর্শের বাস্তবায়নই শোষণ-

বঞ্চনা ও অত্যাচার-নিপীড়নের অবসান ঘটাতে পারে, উন্মোচিত করতে পারে মানব-মুক্তির পথ– এই দৃঢ় বিশ্বাস থেকেই ফররুখ আহমদ তাঁর 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্যগ্রন্থের কবিতাবলীতে বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত মহানবী হজরত মোহাম্মদ (সাঃ), ইসলামের মহান চার খলিফা এবং মুসলিম সাধক ও মনীষীদের অনেকের জীবনালেখ্য, আদর্শ ও শিক্ষা অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে এবং সুষমামন্ডিত ভাষায় ও আকর্ষণীয় উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্পে বিধৃত করেছেন। ফররুখ আহমদের কবিতায় মানবতাবাদী আদর্শের রূপায়ণ কীভাবে ঘটেছে তা 'সাত সাগরের মাঝি' ও 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্যগ্রন্থ থেকে কিছু কবিতাংশের উদ্ধৃতি দিয়ে উপস্থাপন করা যেতে পারে :

"আমি দেখি পথের দু'ধারে ক্ষুধিত শিশুর শব,
আমি দেখি পাশে পাশে উপচিয়া প'ড়ে যায়
ধনিকের গর্বিত আসব,
আমি দেখি কৃষাণের দুয়ারে দুর্ভিক্ষ বিভীষিকা,
আমি দেখি লাঞ্ছিতের ললাটে জ্বলিছে শুধু অপমান টিকা,
গর্বিতের পরিহাসে মানুষ হ'য়েছে দাস,
নারী হ'ল লুণ্ঠিতা, গণিকা।"

**(আউলাদ : সাত সাগরের মাঝি)**

মানবতাবাদী কবি ফররুখ আহমদ মানবতার লাঞ্ছনা এবং মানবতার-মৃত্যু প্রত্যক্ষ করে বেদনাহত চিত্তে উচ্চারণ করেছেন :

"কমজোর বাজু পারে না বইতে ও গুরুভার,
সঙ্গ দিলে আজ ওড়ে না নিশান মানবতার;
চারদিকে আজ দেখছে সে তাই মৃত্যু তার!"

**(নিশান ঃ সাত সাগরের মাঝি)**

বেদনাহত চিত্তে ও আকুতিভরা-কণ্ঠে কবির উচ্চারণ :

"হে নিশান ফের ইঙ্গিত দাও মানবতার,
হে নিশান ফের ইঙ্গিত দাও
মৃত যাত্রীকে পথ চলার,"

**(ঐ)**

সাম্য,শান্তি ও মানবতার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং শোষণ-বঞ্চনা ও অত্যাচার-নিপীড়নের অবসানের উদ্দেশ্যেই মানবতাবাদী কবি ফররুখ আহমদ মহানবীর (সা:) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের শরণ নিয়েছেন, তাঁদের অনুপ্রেরণাদায়ক মহৎ মানবতাবাদী আদর্শ ও শিক্ষার পুনরুজ্জীবন ও প্রতিষ্ঠা কামনা করেছেন। ফররুখ আহমদ বিশ্বাস করতেন যে, আদর্শবাদী, সৎ ও চরিত্রবান এবং সংগ্রামী ও মানবতাবাদী মানুষ ছাড়া মানব-মুক্তি সম্ভব নয়, মানবতার লাঞ্ছনাও দূর করা সুকঠিন।

বাংলা কাব্যে প্রতীক ও রূপকের সুদক্ষ ব্যবহারকারী ফররুখ আহমদ আরব্য উপন্যাসের 'সিন্দবাদ' কাহিনীকে এবং 'সাত সাগরের মাঝি'কে যেমন মুসলিম অভিযান ও পুনর্জাগরণের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করেছেন, তেমনি পুঁথি-সাহিত্য থেকে আহরণ করেছেন 'হাতেম তা'য়ী'র কাহিনী এবং চিত্রিত করেছেন হাতেম তা'য়ীর মহৎ, দানশীল ও মানবতাবাদী চরিত্র। হাতেম তা'য়ী ইসলাম-পূর্ব যুগের ঐতিহাসিক চরিত্র এবং কিংবদন্তীতুল্য পুরুষ হলেও, ইসলামী রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদ দাতা হাতেম তা'য়ীর মহৎ মানবতাবাদী চরিত্রকেই তাঁর মহাকাব্য 'হাতেম তা'য়ী'তে এবং কাব্য-নাটক 'নৌফেল ও হাতেম' গ্রন্থে আদর্শ চরিত্রের প্রতীক হিসাবে বিধৃত করেছেন। হাতেম তা'য়ীর ত্যাগ ও নিঃস্বার্থ সেবা এবং অত্যাচার ও দাম্ভিক বাদশা নৌফেলের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম মানবতাবাদী আদর্শের দৃষ্টান্ত হিসাবে সমুজ্জ্বল। মানবতার নিঃস্বার্থ ও অক্লান্ত সেবার পথেই যে মানবকল্যাণ সুনিশ্চিত হতে পারে, মানবতাবাদী কবি ফররুখ আহমদ ছিলেন এ-ব্যাপারে গভীর প্রত্যয়ী। তাই ' নৌফেল ও হাতেম' কাব্যনাট্যের শেষে কবির উচ্চারণ :

"কাব্য নয়, গান নয়, শিল্প নয়, – শুধু সে মানুষ
নিঃস্বার্থ, ত্যাগী ও কর্মী, সেবাব্রতী – পারে যে জাগাতে
সমস্ত ঘুমন্ত প্রাণ, – ঘুমঘোরে যখন সে বেহুঁশ
জ্বালাতে পারে যে আলো ঝড়-ক্ষুব্ধ অন্ধকার রাতে;"
('নৌফেল ও হাতেম')

'হাতেম তা'য়ী' কাব্যে মানবকল্যাণকামী এবং নিঃস্বার্থ সেবাব্রতী হাতেমের উক্তি :

"পড়ে আছে অন্তহীন অন্ধকারে
শাসনে, শোষণে আর অন্যায়ের জগদ্দল চাপে
বিকলাঙ্গ মানুষের পৃথিবী বিশাল'

....  ....  ....  ....

রক্ত শোষণের পালা চলেনি কি অব্যাহত আজও
এই পৃথিবীতে ? সভ্যতা-গর্বিত মন জনপদে
দেখে নাকি রাত্রিদিন সংখ্যাহীন যন্ত্র শোষণের,
ষড়যন্ত্রজাল শোষকের ? দেখে নাকি চারপাশে
অনাহার-ক্লিষ্ট প্রাণ ভারগ্রস্ত মরে ?"

হাতেম তা'য়ীর এই উক্তি ও জিজ্ঞাসায় মানবতাবাদী কবি ফররুখ আহমদের কণ্ঠই ধ্বনিত। হাতেম তা'য়ীর জবানীতে তাই ফররুখ আহমদের আহবান ঃ

"বনি আদমের প্রাপ্য দাও তাকে ফিরায়ে আবার
দাও ইনসানের হক।"

পুঁথি-সাহিত্য থেকে আহরিত ঐতিহাসিক চরিত্রের আদলে এবং তাঁর জবানীতে উচ্চারিত হলেও, সমকালীন জীবনের এবং শোষণ-বঞ্চনার চিত্রও হাতেম তা'য়ীর উক্তিতে বিধৃত। প্রতীক ও রূপক ব্যবহারের মাধ্যমে মানবতাবাদী কবি ফররুখ আহমদ সাবেক পাকিস্তান আমলের শোষণ-বঞ্চনার এবং জনগণের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর 'হাবেদা মরুর কাহিনী' শীর্ষক গদ্যকাব্য-গ্রন্থে। তৎকালীন অবস্থা তুলে ধরতে গিয়ে রূপকামিশ্রিত কবিতায় তিনি উচ্চারণ করেছেন :

> "মনে হয় বন্দী হয়ে আছি
> ক্লেদ-পংকিল এক দুঃসহ বন্দীখানায়
> (বাদগর্দ হাম্মামের মতই যা ভয়াবহ)
> শান্তির চিহ্ন নাই যেখানে
> শুধু মধ্যরাত্রে শোনা যায় শয়তানের অট্টহাসি
> মানুষ বেঁচে আছে কিন্তু মুর্দার শামিল।"

রূপক ও প্রতীকের বৈশিষ্ট্য এই যে, তা বিশেষ দেশ, সময় ও বক্তব্যকে ধারণ করলেও, গভীর ও ব্যাপকতর ব্যঞ্জনার কারণেই তা অর্জন করে অনেকটা সর্বজনীনতা। 'হাবেদা মরুর' প্রতীক এবং প্রাণহীন ভূমির রূপকী উপস্থাপনায় স্বদেশের একটি বিশেষ সময়-সন্ধিক্ষণের হতাশাময় আলেখ্য তুলে ধরলেও, আশাবাদী কবি কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে বিশ্ব-শান্তির কথা, সর্ব মানবের কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা ঃ

> "যেন বঞ্চিত বনি আদমের এই দীর্ঘশ্বাস
> রূপ নিতে পারে শান্তির প্রশ্বাসে,
> যেন এই তৃষাতপ্ত হাবেদা মরুর মাঠ
> আবার হতে পারে
> সুন্দর শান্তিময় মাটির জান্নাত
> দুনিয়ার সকল মানুষের জন্যে
> দুনিয়ার সকল মানবীর জন্যে।"

মানবতাবাদী কবি ফররুখ আহমদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে এক ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা। প্রশ্ন হতে পারে, বাংলা কাব্যের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এবং মানবতাবাদী আদর্শের রূপায়ণের ধারায় বাংলা কাব্যের তিন যুগ-স্রষ্টা কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং আধুনিক যুগের অন্যান্য কবিদের অবদানের পর, মানবতাবাদী আদর্শের রূপায়ণে চল্লিশের দশকে আবির্ভূত কবি ফররুখ আহমদের অবদানের স্বরূপ এবং স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য কোন্‌খানে এবং কতটুকু ? এ-প্রশ্নের জবাব বর্তমান নিবন্ধের বিভিন্ন স্থানে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে এবং ফররুখ আহমদের কবিতার কিছু-কিছু

উদ্ধৃতির সাহায্যে প্রদানের এবং তাঁর রচনার স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। তবুও পরিশেষে বলবো যে, বাংলা কাব্যে বিদ্রোহী চেতনার, মানবতাবাদের এবং মুসলিম রেনেসাঁর শ্রেষ্ঠ রূপকার কাজী নজরুল ইসরামের পর, অনন্য-সাধারণ কবি-প্রতিভা ও কল্পনা-শক্তির অধিকারী ফররুখ আহমদ তাঁর সৃজনশীলতার স্পর্শে যেমন কবিতাকে শিল্প-মহিমামণ্ডিত করেছেন, তেমনি রূপক ও প্রতীকের ব্যবহারে তাঁর অনেক রচনাকে করেছেন সবিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত এবং স্বাতন্ত্র্যধর্মী। শুধু রোমান্টিক স্বপ্ন-কল্পনার প্রকাশে, হৃদয়ের আর্তি-আকুলতার ও সুখ-দুঃখের কাব্য রূপায়ণেই নয়, জাতীয় নবজাগরণে, মুসলিম রেনেসাঁর বাণী উচ্চারণে এবং মানবতাবাদী আদর্শের রূপায়ণেও তিনি বিভিন্ন প্রতীক ও রূপকের বিচিত্র ব্যবহার করেছেন। এখানেই ফররুখ আহমদের শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় বিধৃত।

কাব্যবেত্তারা বলেন, বিশ্বাসে জোর না বাঁধলে বাক্যবন্ধন দৃঢ় হয় না। ফররুখ আহমদের কাব্য-সাধনার প্রাথমিক ও পরবর্তী পর্যায়ের অজস্র কবিতায়– বিশেষত 'সাত সাগরের মাঝি', 'সিরাজাম মুনীরা', 'কাফেলা', 'মুহূর্তের কবিতা', 'হাতেম তা'য়ী', 'নৌফেল ও হাতেম' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় যে বাক্যবন্ধন দৃঢ় হয়েছে, তার মূলে রয়েছে কবির প্রতিভা ও রচনাশক্তি এবং মানবতাবাদে–বিশেষত ইসলামের মানবতাবাদী আদর্শে গভীর ও সুদৃঢ় বিশ্বাস। ◻

---

**(ফররুখ একাডেমী পত্রিকা ১১তম সংখ্যা- জুন-২০০৫)**

# পাকিস্তান-আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠার পূর্বাপর : ফররুখ আহমদের 'আজাদ করো পাকিস্তান'

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্

ফররুখ আহমদ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক প্রতিভাধর কবি। তাঁর কবি-প্রতিভার মৌলিকতা এবং শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় ফররুখ আহমদের বিচিত্র বিষয়-নির্ভর বিপুল কাব্য-সম্ভার ও সৃষ্টিকর্মের মধ্যে বিধৃত। তাঁর কল্পনা-প্রতিভা, সৃজন-ধর্মিতা এবং চিন্তা-চেতনা, আবেগ-অনুভূতি, স্বপ্ন-কল্পনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ইতিহাস-ঐতিহ্যবোধ, আদর্শ-প্রীতি, স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রেম এবং মানবতাবোধ ফররুখ আহমদের কবিতায় নানাভাবে, ভাষায়, ছন্দে, আঙ্গিক ও রূপরীতিতে, উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্পের সৃজনধর্মিতায় ও অসাধারণ প্রয়োগে, কবিতার সামগ্রিক উপস্থাপনায় ও শিল্পরূপ নির্মাণে। শুধু রোমান্টিক ও কল্পনা-নির্ভর কবিতায়ই নয়, সমাজ সচেতনতা ও বাস্তবতা-নির্ভর কবিতায়ও এই দক্ষতার পরিচয় বিধৃত।

ফররুখ আহমদ বিচিত্র বিষয়ে এবং নানা ছন্দে, আঙ্গিক ও রূপরীতিতে এবং উপমা-চিত্রকল্পে সুশোভিত করে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা-চেতনায় ও ভাবধারায় অজস্র উৎকৃষ্ট এবং শিল্প-গুণান্বিত কবিতা রচনা করলেও এবং সে সবে মানবতাবাদী আদর্শ এবং চিন্তাধারার সুপ্রকাশ ঘটলেও, ফররুখ আহমদ বাংলা সাহিত্যে ও নজরুলোত্তর যুগে ইসলামী রেনেসাঁর, মুসলিম নবজাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার কবি হিসেবেই সমধিক পরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত। তাঁর রাজনৈতিক এবং সমাজের নবজাগরণমূলক কবিতা-গানেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং উপরোক্ত ভাবধারা রূপায়িত। চল্লিশের দশকে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত শক্তিমান কবি ফররুখকে যেমন ইসলামী রেনেসাঁর ও মুসলিম নবজাগরণের এবং মানবতাবাদী আদর্শের রূপকার কবি হিসেবে অভিহিত করা হয়, তেমনি তাঁকে পাকিস্তানী আদর্শের প্রবক্তা কবি হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়। যদিও ফররুখের কবিতায় ইসলামী রেনেসাঁ ও মুসলিম নবজাগরণের বাণী এবং মানবতাবাদী আদর্শের কথা ব্যাপক এবং গভীরভাবে বিধৃত হলেও, পাকিস্তানী আদর্শবাদের এবং পাকিস্তানের কথা কমই বিধৃত হয়েছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বকালে 'মৃত্তিকা গ্রন্থনি-বিভাগ-কলকাতা' থেকে প্রকাশিত ফররুখ আহমদের 'আজাদ করো পাকিস্তান' শীর্ষক কাব্যপুস্তিকা (পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০)'র অন্তর্গত ফৌজের গান', 'আজাদ করো পাকিস্তান', 'ওড়াও ঝাণ্ডা, 'কায়েদে আজম জিন্দাবাদ', 'পাকিস্তানের কবি'– এই কয়টি কবিতা-গান ছাড়া, সেকালে তিনি পাকিস্তানী আদর্শবাদ বা পাকিস্তান বিষয়ক অন্য কোনো কবিতা-গান সম্ভবত রচনা করেননি।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, পাকিস্তান-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের এবং 'পাকিস্তান' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বহু আগেই কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের অনেকের মনোরাজ্যে 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। সেকালেই পাকিস্তান বিষয়ক কবিতা-গান ছাড়াও, অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সম্ভবত এ কারণেই ফররুখ তাঁর কাব্যপুস্তিকার নাম রাখেন 'আজাদ করো পাকিস্তান' অর্থাৎ বৃটিশের পরাধীনতা থেকে 'পাকিস্তান'কে মুক্ত করতে হবে।

শুধু ফররুখ আহমদ নয়, বিভাগ-পূর্বকারে এবং পাকিস্তান-আন্দোলনের পটভূমিতে চল্লিশের দশকে এবং পাকিস্তান (সাবেক) পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বহু কবি পাকিস্তান ও কায়েদে আজম বিষয়ে অজস্র কবিতা-গান লিখেছেন। এঁদের মধ্যে যেমন রয়েছেন বহু মুসলিম কবি, তেমনি আছেন অনেক হিন্দু কবি; রয়েছেন ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধে এবং পাকিস্তানী আদর্শবাদে বিশ্বাসী কবি, আছেন ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শবাদে বিশ্বাসী, মানবতাবাদে বিশ্বাসী কবিও। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে চল্লিশের দশকে যাঁরা 'পাকিস্তান' ও 'কায়েদে আজম' সম্পর্কে কবিতা-গান রচনা করেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন : গোলাম মোস্তফা, শাহাদাৎ হোসেন, সুফিয়া কামাল ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন, মুফাখখারুল ইসলাম, রওশন ইজদানী, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, শাহেদা খানম, হোসনে আরা, কামাল চৌধুরী, সুকান্ত ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকে।

বিভাগ-পূর্বকালে এবং পাকিস্তান আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে চল্লিশের দশকে এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন মতাদর্শের অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শবাদে ও মানবতাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী কবিদের এবং ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী আর পাকিস্তানী আদর্শবাদে দীক্ষিত কবিদের 'পাকিস্তান' ও 'কায়েদে আজম' বিষয়ে এত কবিতা-গান রচনার কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস, বৃটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস এবং পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাসের দিকেও আমাদের ফিরে তাকাতে হবে। মনে রাখতে হবে, বিশ শতকের বিশের দশকে অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বৃটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যর্থ হবার পর, অর্থাৎ ভারতীয় উপমহাদেশের সকল রাজনৈতিক দলের ও সব ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, চল্লিশের দশকে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের উদ্যোগে এবং দ্বি-জাতিতত্ত্বের মূলে রয়েছে এই সত্য এবং বাস্তবতা যে হিন্দু ও মুসলমানরা এক জাতি নয়, তারা দুই স্বতন্ত্র জাতি– কেননা, তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও জীবনাচরণ এবং জীবন-পদ্ধতি আলাদা, তাদের-জাতীয় বীরও এক এবং অভিন্ন নয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পটভূমি সম্পর্কে বলা হয়েছে :

"১৯৪৭ সনের ১৪ই আগস্ট থেকে যদিও পাকিস্তানের যাত্রা শুরু কিন্তু ১৯৪০ সনের আগে পাকিস্তানের কোনো স্পষ্ট ধ্যান-ধারণা কারো মনে ছিল না। ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমেই পাকিস্তান পরিকল্পিত হয়েছিল। অবিভক্ত ভারতের সংখ্যাগুরু মুসলমান এলাকা নিয়েই এই নতুন আবাসভূমির দাবী উত্থিত হয়। ১৯৩০ সনের আগে পাকিস্তানের মত একটি স্বতন্ত্র মুসলমানের দেশের কথা নীহারিকালোকের কুয়াসার মধ্যে কোথাও উঁকি-ঝুঁকি দেয় নাই, সে-কথা আমরা বলব না। তবে ১৯৩০ সনে মহাকবি ইকবাল এরূপ একটি স্বপ্ন-স্বাধের ইশারায় মুসলমানকে ডাক দিয়েছিলেন মাত্র। তাই বলা যায়, ১৯৪৭ সনে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা বহু দেশের মানুষকে বিস্ময়-চকিত করে দিল। কারণ এর আগে পাকিস্তান একটি দেশ এবং পাকিস্তানীরা একটি জাতি-এ কথা অনেকেরই ছিল সম্পূর্ণ অজানা। **(পাকিস্তানের সৃষ্টি, মুজীবুর রহমান খাঁ, 'পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য', পৃ. ২, সম্পাদনা : সরদার ফজলুল করিম, অধ্যক্ষ, সংস্কৃতি বিভাগ, বাংলা একাডেমী, মার্চ, ১৯৬৮)।**

ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও পাকিস্তান আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাস রচনা আমার এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। ইতিহাসের সত্য এই যে, চৌধুরী রহমত আলীর 'পাকিস্তান পরিকল্পনা' এবং মহাকবি ইকবালের 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের' পরিপ্রেক্ষিতে এবং ভারতীয় কংগ্রেস ও ভারতীয় মুসলিম লীগের সম্মিলিত স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটেই ভারতীয় মুসলমানরা স্বতন্ত্র জাতীয়তা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার চায় এবং স্বতন্ত্র 'পাকিস্তান' রাষ্ট্র দাবি করে। উল্লেখযোগ্য যে, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং ভারতীয় মুসলিম লীগের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতারাও উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে ভারতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, অনেকে কংগ্রেসের নেতৃত্বেও ছিলেন, কোনো কোনো পর্যায়ে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস–এ উভয় রাজনৈতিক দলের পরিচালনার দায়িত্বও তারা পালন করেন। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ তো অভিহিত হয়েছিলেন **Ambassador of Hindu-Muslim Unity** অর্থাৎ হিন্দু-মুসলিম মিলনের ঐক্যদূত বা অগ্রদূত হিসাবে। উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলিম-এ উভয় সম্প্রদায় ধর্মীয় এবং সংস্কৃতিগত দিক থেকে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন পর্যায়ে তারা ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করেছেন, আবার নিজ নিজ রাজনৈতিক দলের প্লাটফর্ম থেকে একই লক্ষ্যে ভিন্নভাবেও সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু উভয়বিধ সংগ্রামের ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে এবং ভারতীয় উপমহাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠী মুসলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থহানির আশংকার প্রেক্ষাপটে মুসলিম লীগ তথা উপমহাদেশের মুসলমানরা শেরে বাংলা একে ফজলুল হক উত্থাপিত ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারতের পূর্বাঞ্চলে ও পশ্চিমাঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে দুটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনের দাবি জানায়। এ দাবীর পেছনে দ্বি-জাতিতত্ত্বের বাস্তবতা এবং যুক্তিকে কাজে লাগানো হয়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে ১৮৪০-এর দশকেই কেন বহু মুসলমান নবীন-প্রবীণ কবি 'পাকিস্তান' বিষয়ক কবিতা-গান লিখলেন, কেন অনেকে 'কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'কে নিয়ে কবিতা-গান রচনা করলেন, কেন হিন্দু কবিদের অনেকেও তাঁদের কবিতায় 'পাকিস্তান' ও 'কায়েদে আজম'কে উপজীব্য করলেন, তা জানা ও উপলব্ধির জন্য উপরোক্ত রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি জানা দরকার। বৃটিশ শাসনামলে ভারতীয় উপমহাদেশের– বিশেষত পূর্বাঞ্চলের মুসলামনরা ছিল শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ, তারা ছিল ইংরেজ শাসক এবং হিন্দু জমিদারদের দ্বারা শোষিত-বঞ্চিত, শুধু অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ মুসলমানরা নয়, নিম্নবর্ণের এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হিন্দুরাও ছিল শিক্ষা-দীক্ষা বঞ্চিত। দারিদ্র্যপীড়িত। এ বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই শুধু মুসলমানরাই নয়, নিম্নবর্ণের দারিদ্র্যপীড়িত হিন্দুরা, সাম্যবাদী ও বামপন্থী চিন্তাধারার হিন্দুরাও মুসলানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার এবং 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠার প্রতি সমর্থন দেয়। যারা র‍্যাডিকেল হিউম্যানিস্ট ও কমিউনিস্ট অর্থাৎ বৈপ্লবিক মানবতাবাদী এবং সমূহবাদী তারাও পাকিস্তান-দাবী সমর্থন করেন এ কারণে যে এটা ছিল সংখ্যালঘু ও বঞ্চিত মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবি। ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবে অবশ্য 'পাকিস্তান' শব্দটি ছিল না, ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে দুটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা।

উমহাদেশের জননন্দিত নেতা বাংলার মানুষের এবং বিশেষভাবে শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর ও দারিদ্র্যপীড়িত মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রাণপ্রিয় নেতা এবং বৃটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব শেরে-বাংলা এ. কে. ফজলুল হক উত্থাপিত ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' (যা 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামেও খ্যাত) পাসের পর উপমহাদেশের-বিশেষত বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠীর মনে 'পাকিস্তান'–এর স্বপ্ন প্রবল অনুপ্রেরণার সঞ্চার করে। অবশ্য শেরেবাংলা পরে মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন এবং কৃষক-প্রজা পার্টি গড়ে তোলেন। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে উপমহাদেশের এবং মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম প্রমুখের এবং তাঁদের অনুসারী নেতা-কর্মীদের নেতৃত্বে অবিভক্ত বাংলার মুসলমানরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে ১৯৪৬ সালে সিলেটে যে গণভোট বা রেফারেন্ডাম অনুষ্ঠিত হয়, তাতে বিপুল ভোটে সিলেট পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিকার লাভ করে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে উপমহাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে ও পূর্বাঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে দুটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা থাকলেও, ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের দিল্লী কনভেনশনে

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী উত্থাপিত প্রস্তাব অনুযায়ী দুই 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠার বদলে এক 'পাকিস্তান' অর্থাৎ **Two states** এর পরিবর্তে **One state** প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ প্রস্তাব গ্রহণ ছিল ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের স্পিরিট বা মূলনীতির বিরোধী এবং উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলের মুসলমানদের স্বার্থহানিকর। উক্ত প্রস্তাব পাসের ফলে উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলের তথা বর্তমান বাংলাদেশের জনগণ একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এতে এক পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলে পশ্চিমা অবাঙালি শাসকদের দ্বারা 'পূর্ব পাকিস্তান' শোষিত হবার পথও অবারিত হয়। তবু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পেছনে বাংলার অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের জনগণের এবং কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের ভূমিকা ও অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অবিস্মরণীয়।

ফররুখ আহমদের 'পাকিস্তান' ও 'কায়েদের আজম' বিষয়ক কবিতা এবং তাঁর 'আজাদ করো পাকিস্তান' শীর্ষক কাব্য-পুস্তিকা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, পাকিস্তান এবং এক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পটভূমি সংক্ষেপে তুলে ধরতে হলো এ কারণে যে, দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে এবং কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম প্রমুখ নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে যে, 'পকিস্তান' (সাবেক) প্রতিষ্ঠিত হয়, সে পাকিস্তান ও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সম্পর্কে কবি ফররুখ আহমদ এবং অন্যান্য কবি-গীতিকাররা চল্লিশের দশকে এবং পরবর্তীকালেও সাবেক পাকিস্তান আমলে যে সব কবিতা-গান লিখেছেন, তা ছিল সময়েরই দাবি এবং বাস্তবসম্মত ব্যাপার। দেশের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে, পরাধীনতা থেকে মুক্তি অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে এবং দেশের জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন এবং উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ ও সমাজ গঠনের স্বপ্ন নিয়ে রাজনৈতিক দলসমূহ ও নেতৃবৃন্দ জনগণের সহযোগিতায় আন্দোলন ও সংগ্রাম করেন এবং কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীরা স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনের স্বপ্ন নিয়ে কবিতা-গান ও অন্যান্য রচনার মাধ্যমে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেন। ফররুখ আহমদের 'আজাদ করো পাকিস্তান' শীর্ষক কাব্য-পুস্তিকায় পাকিস্তান-বিষয়ক যে কয়টি কবিতা ও গান রয়েছে তাতে শুধু সংগ্রামের মাধ্যমে 'পাকিস্তান' অর্জনের কথাই বলা হয়নি, ইসলামের আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী তৌহীদবাদী কবি 'খোদার রাজ' প্রতিষ্ঠার কথাও বলেছেন :

'সামনে চল্; সামনে চল্
তৌহিদেরই শান্ত্রীদল
সামনে চল্; সামনে চল্
... ... ...

লক্ষ ভয় করব জয়
তুলবো ঝড় বিশ্বময়
গড়বো আজ খোদার রাজ
ভাঙবো বাঁধ অমঙ্গল
সামনে চল্; সামনে চল্

শুনবো না আর পিছু টান
মানবো না আর বান-তুফান
ডাকছে খুন রক্তারুণ
পাকিস্তানের পথ উজল
সামনে চল্; সামনে চল্॥

**[ফৌজের গান]**

উপরোক্ত গানটি থেকেই স্পষ্ট যে, ইসলামী রেনেসাঁর রূপকার এবং বিশ্বজনীন মানবধর্ম ইসলামের সাম্য, শান্তি, ন্যায় ও মানবতার আদর্শে বিশ্বাসী কবি 'পাকিস্তান' কে শুধু একটি সম্ভাব্য রাষ্ট্ররূপেই ভাবেননি, পাকিস্তানে তিনি তৌহীদের আদর্শ এবং ইসলামের সাম্য, ন্যায়, শান্তি ও কল্যাণের নীতি প্রতিষ্ঠারও স্বপ্ন দেখেছেন। 'ওড়াও ঝাণ্ডা' শীর্ষক গানে ফররুখ আহমদ বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন :

'আনো সাম্যের নতুন গান
আনো মানুষের নতুন প্রাণ
আনো উদ্দাম ঝড়ের গতি
দরিয়ার ঝড় ফেনোত্তল।।

জালিমের হাতে পশুর প্রায়
আজো মজলুম মরিছে হায়
ছিঁড়িতে তাদের মরণের ঘের
হও মুজাহিদ আজি সামাল।।
মোরা মুসলিম সারা জাহান
ভরিয়া গড়িব পাকিস্তান
আজাদীর দিন হবে রঙিন
লভিয়া মোদের রক্ত লাল।।

**[ওড়াও ঝাণ্ডা]**

ইসলামের শান্তি, সাম্য, ন্যায়, কল্যাণ ও মানবতাবাদের আদর্শে বিশ্বাসী কবি ফররুখ আহমদ স্বপ্ন দেখেছেন এবং এমন প্রত্যাশাও করেছেন যে 'পাকিস্তান' হবে একটি সাম্যবাদী রাষ্ট্র- যেখানে কোনোরূপ অত্যাচার-নিপীড়ন ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী-

সুন্দর উন্নত সমাজ। তাঁর দৃষ্টিতে, স্বপ্নে ও আশাবাদে 'পাকিস্তান' সাম্য ও শান্তির এবং তৌহীদবাদের প্রতীক। আল্লাহ'র 'রাজ' প্রতিষ্ঠার প্রতীক। সে-কারণেই তিনি উচ্চারণ করেছেন : 'মোরা মুসলিম সারা জাহান/ভরিয়া গড়িব পাকিস্তান।' শুধু কবি ফররুখ আহমদই নন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যারা আত্মনিয়োগ করেছিলেন– সে নেতৃবৃন্দ এবং জনগণও স্বপ্ন দেখেন এবং প্রত্যাশা করেন যে, 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠিত হলে ইসলামের সাম্য, ন্যায়, শান্তি ও কল্যাণ এবং মানবতাবাদের আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, অত্যাচার-নিপীড়ন, শোষণ-বঞ্চনা ও দারিদ্র্যের অবসান ঘটবে, জনগণের ভাগ্যোন্নয়ন হবে। 'কায়েদে আজম জিন্নাহ' শীর্ষক কবিতায় ফররুখ আহমদ উচ্চারণ করেছেন :

'আজিকে জেহাদ এজিদের সাথে,
দল বেঁধে এস খুনেরা-প্রভাতে
ভাঙো জুলুমের জুলমাতঃ হোক
    জালিমের শিরে বজ্রাঘাত॥
আজ মুজাহিদ উদ্যত শির
ভাঙবে পাপের সকল প্রাচীর
আজ নির্ভীক জনতা হয়েছে
    জেহাদের জোশে রণোম্মাদ।।

[নতুন মোহাররম]

ফররুখ 'কায়েদে আজম জিন্দাবাদ' শীর্ষক কবিতায় পাকিস্তান আন্দোলনের শীর্ষ-নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের নেতৃত্বের এবং গণ-জাগরণের তথ্য 'জনতা'র উল্লেখ করলেও উক্ত গানেও তিনি জালিম এবং জুলুমের অবসানের স্বপ্ন আর আশাবাদের কথাই বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে যে-বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটবে তার উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন :

'মওতের দেশের খুলবে আবার
    জিন্দিগানীর সিংহ-দ্বার,
জনতার বাজু সরাবে আবার
    জুলুম-বাজীর পাহাড় তার,
হাজার বছর আঁধারের শেষে
    জাগবে আবার রাঙা প্রভাত
    মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ
    কায়েদে আজম জিন্দাবাদ।
দেখ দলে দলে মুজাহিদ-সেনা
    এল মুসলিম নও-জোআন

সাহারার বুকে ঝড়ের মতন
নাম্‌ল কুঅত খোদার দান,
হানিবে আবার জালিমের শিরে
এবার প্রলয় মরণাঘাত
মুসলিম-লীগ জিন্দাবাদ
কায়েদে আজম জিন্দাবাদ।।

'পাকিস্তানের কবি আল্লামা ইকবাল' শীর্ষক চতুর্দশপদী কবিতায়ও ফররুখ আহমদ নবীন তুরস্কের জনক এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রসেনানী গাজী মোস্তফা কামাল পাশার 'স্বাধীন স্বদেশ ভূমি' প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ প্রেরণার উল্লেখ করে এবং কবি আল্লামা ইকবালের জাতীয় ঐক্য ও প্রেরণা-সঞ্চারী রচনার উল্লেখ করেও বলেছেন যে, 'সব শৃংখলিত মনে জেগেছে আজাদ পাকিস্তান/সকল স্থানুর বুকে উঠায়েছে আজ সে তুফান/ক্ষুদ্র বালুকণা দেখে বাঁধমুক্ত সাহারা বিশাল।'

ফররুখ আহমদের আলোচ্য 'আজাদ করো পাকিস্তান' শীর্ষক কাব্যপুস্তিকায় পাকিস্তান ও 'কায়েদে আজম' বিষয়ক উল্লেখিত কয়টি গান এবং কবিতা ছাড়াও 'পথ', 'রাত্রির অগাধ বনে', 'কারিগর' 'জালিম ও মজলুম' শীর্ষক কয়েকটি কবিতা রয়েছে। বিশ্বজনীন মানবধর্ম ইসলামের সাম্য, ন্যায়, শান্তি ও কল্যাণের আদর্শে গভীরভাবে বিশ্বাসী মানবতাবাদী কবি ফররুখ আহমদ উল্লেখিত কবিতাসমূহেরও নির্যাতিত-নিপীড়িত, শোষিত-বঞ্চিত মানুষের–বিশেষত জনগণের উত্থান ও মুক্তি কামনা করেছেন, তাদের জালিম ও জুলুমের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিশের দশক থেকে চল্লিশের দশকের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্রোহী কবি এবং বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহী চেতনার অসামান্য রূপকার, জাতীয় নবজাগরণের বাণীবাহক, বৃটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগ্রামী সৈনিক, ইসলামের সাম্য, শান্তি, ন্যায় ও কল্যাণের মহান প্রবক্তা কাজী নজরুল ইসলাম উপমহাদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে যেমন অজস্র কবিতা-গান লিখেছেন, স্বাধীনতা অর্জন ও অত্যাচার-নিপীড়ন এবং শোষণ-বঞ্চনার অবসানের লক্ষ্যে, জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির, উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ এবং সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে জনগণের প্রতি সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছেন, ফররুখও তেমনি চল্লিশের দশকে পাকিস্তান আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ও স্বাধীনতার লক্ষ্যে অনুরূপ ভূমিকা পালন করেছেন। ফররুখের সমকালে এবং চল্লিশের দশকে নবীন-প্রবীণ যে সব কবি পাকিস্তান ও কায়েদে আজম বিষয়ক কবিতা-গান লিখেছেন, তাঁদের অধিকাংশই পাকিস্তানের আশা ও স্বপ্ন দেখেছেন, আশাবাদে উজ্জীবিত হয়ে আনন্দের গান গেয়েছেন। তবে কেউ কেউ পাকিস্তানকে ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত এবং মজলুম জনতার মুক্তিকামী রাষ্ট্রের প্রতীক হিসাবেও প্রত্যক্ষ করেছেন। মুফাখখারুল ইসলাম, রওশন ইজদানী,

তালিম হোসেন প্রমুখের কবিতা-গানে এদিকটি বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন :

১. '–আসে নওল পাকিস্তান।
বেগুনা বন্দী য়ুসুফের কাছে
আজাদীর ফরমান
সব রহস্য হইলো জাহির
শাহী খোয়াবের এইতো তবীরঃ
ভূখারীর তরে ফসল জমাও,–
মজলুমে দাও ত্রাণ।।'

**['তারানা-ই-পাকিস্তান', মুফাখখারুল ইসলাম মাসিক মোহাম্মদী, অগ্রহায়ণ- পৌষ, ১৩৫১]**

২. 'ফিরিবে আবার পাকিস্তানের
পাক ইসলামী সুলতানাৎ!
ফিরদৌস হ'তে নামিবে প্রভাত
টুটিয়া ধরার আঁধারি রাত।।
জিন্দেগী সেথা পাক হবে ফের
দুঃখের রোজা হবে কাবার।
নতুন চাঁদের ঝাণ্ডা উড়ায়ে
জাগিবে নিশানে নতুন চাঁদ।।
আজাদ হবে গো মুসলিম দিল সে দেশে ফের,
টুটিবে আবার জিঞ্জির তার দুই হাতের!
এক হাত তার রবে খেদমতে মজলুমে
জালিমের তরে দুসরা হাত ॥

**[গান, তালিম হোসেন, মোহাম্মদী, আষাঢ়, ১৩৫৪]**

ফররুখ আহমদের সমসাময়িক কালের কবি এবং ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী, পাকিস্তান আন্দোলনের ও আদর্শবাদের সমর্থক কবিদের যে কবিতাংশ ও গীতাংশ উদ্ধৃত হলো তার সঙ্গে ফররুখ আহমদের 'আজাদ করো পাকিস্তান' এর অন্তর্গত একই ভাবধারা ও আদর্শের কবিতাংশ ও গীতাংশ মিলিয়ে পাঠ করলে সহজেই উপলব্ধি করা যাবে যে ফররুখের রচনা কত বলিষ্ঠ, শিল্পোত্তীর্ণ এবং তিনি আদর্শবাদে ও মানবতাবোধে কত উদ্দীপ্ত। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান আন্দোলনকালে- চল্লিশের দশকে এবং পরবর্তীকালেও ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান ও কায়েদে আজমকে বিষয়বস্তু করে অনেক কবিতা রচিত হয়েছে। ১৯৪৮ সালে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ইন্তেকালের পরও রচিত হয়েছে তাঁর সম্পর্কে অনেক কবিতা। এঁদের মধ্যে শাহদাৎ হোসেন, সৈয়দ

এমদাদ আলী, বেনজীর আহমদ, বন্দে আলী মিঞা, কাজী কাদের নেওয়াজ, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, আ.ন.ম বজলুর রশীদ, বেগম সুফিয়া কামাল (তিনি কায়েদে আজম সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে আটটি কবিতা লিখেছেন), আজিজুর রহমান, ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন, সিকান্দার আবু জাফর, সৈয়দ আলী আহসান, মুফাখখারুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য (জিন্নার প্রতি, দৈনিক আজাদ, ১৩৫১), আশরাফ সিদ্দিকী, মাযহারুল ইসলাম, আবদুর রশীদ খান, আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, আবদুস সাত্তার, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, প্রজেশকুমার রায়, আবুল ফজল সাহাবুদ্দীন (ফজল শাহাবুদ্দীন), মোহাম্মদ কায়সুল হক (কায়সুল হক), আবু হেনা মোস্তাফা কামাল, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, চৌধুরী ওসমান, আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন, জামাল উদ্দীন মোল্লা, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, মুহম্মদ খুরশেদুল ইসলাম, মাহবুবুর রহমান তালুকদার (মাহবুব তালুকদার), হেমায়েত হোসেন, কুমারী উষারাণী দাস, সায়মা চৌধুরী (বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়– বিশেষত 'মাহে নও', পত্রিকায় প্রকাশিত উল্লেখিত কবিদের কবিতা শাহেদ আলী সম্পাদিত এবং মুসলিম রেনেসাঁ আন্দোলন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'আমাদের সাহিত্যে ভাবনায় কায়েদে আজম' শীর্ষক গ্রন্থে সংকলিত)।

ফররুখ আহমদের 'আজাদ করো পাকিস্তান' শীর্ষক কাব্যে-পুস্তিকার আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখিত কবিদের পাকিস্তান ও কায়েদে আজম– সম্পর্কিত কবিতা-গানের উল্লেখ করা হলো এ জন্য যে, তাঁদের কাউকেই ফররুখের মতো পাকিস্তানী আদর্শবাদের কবি বা 'পাকিস্তান' -এর কবি বলা হয় না। ফররুখ অবশ্যই 'পাকিস্তান' আন্দোলনের এবং 'পাকিস্তান'-এর সমর্থক ছিলেন– যেমন ছিলেন উল্লেখিত কবিরাও। তবে উল্লেখ্য যে, ফররুখের 'পাকিস্তান' ও 'কায়েদে আজম' বিষয়ক কবিতার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম এবং তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি', 'সিরাজাম মুনীরা' ও অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ এবং মুসলিম রেনেসাঁর কথা নিজস্ব স্বকীয়তামণ্ডিত ভাষায়, বিভিন্ন ছন্দে, আঙ্গিক ও রূপরীতিতে, নানা উপমা-চিত্রকল্পে এবং রূপক ও প্রতীকে অসামান্য দক্ষতায়, কাব্য ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে রূপায়িত হলেও 'পাকিস্তান'–এর কথা নেই বললেই চলে।

চল্লিশের দশকে ফররুখ আহমদ রেনেসাঁ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান-আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে পাকিস্তান বিষয়ে কবিতা ও গান রচনা করেন এবং সে সব রচনায় এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, পাকিস্তান হবে এমন একটি রাষ্ট্র– যেখানে ইসলামের মহৎ মানবতাবাদী আদর্শের রূপায়ণ ঘটবে, শোষণ-বঞ্চনা ও অত্যাচার-নিপীড়নের অবসান হবে, জনগণ দারিদ্র্য ও ভেদ-বৈষম্য থেকে মুক্তি লাভ করবে। কিন্তু ১৯৪৭ সালে 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠর পর সুদীর্ঘ চব্বিশ বছরেও ইসলামী আদর্শ ও ন্যায়-নীতির বাস্তবায়ন ঘটেনি, ভেদ-বৈষম্যের অবসান হয়নি, পাকিস্তানের অবাঙালি

শাসক-শোষকরা 'পূর্ব-পাকিস্তান' -এর জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার বিভিন্ন সময়ে হরণ করেছে, সামরিক ও স্বৈরশাসন চাপিয়ে দিয়েছে, তাদেরকে শোষণ-বঞ্চনা এবং দারিদ্র্যের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত করেছে। পশ্চিমা অবাঙালি শাসকদের বৈরী ও স্বৈরাচারী এবং বাঙালি-বিদ্বেষি মনোভাবের শিকার হয়ে ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক ভাষা-আন্দোলনে আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিক এবং আরও অনেক ভাষাশহীদকে আত্মাহুতি দিতে হয়েছে। মাতৃভাষা-প্রেমিক ফররুখ বাংলা ভাষা, ভাষা আন্দোলন ও ভাষা শহীদদের স্মরণে অনেক কবিতা-গান রচনা করেন, তিনি ভাষা আন্দোলনে অংশ নেন। ফররুখ পাকিস্তান-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে যেমন কবিতা-গান লিখেছিলেন, তেমনি তিনি পাকিস্তানী অবাঙালি শাসকদের বৈরী নীতি এবং এদেশের মানুষকে শোষণ-বঞ্চনার এবং অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধেও লেখনী চালনা করেন, তিনি রচনা করেন অনেক ব্যঙ্গ-কবিতা, ব্যঙ্গ-নাটক 'রাজ-রাজড়া' এবং ব্যঙ্গ-কাব্য 'ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক কাব্য'। ঢাকা বেতার-কেন্দ্রের তথা রেডিও পাকিস্তানের সরকারি কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও, ফররুখ পাকিস্তানী অবাঙালি শাসকদের আদর্শহীনতা, নীতিভ্রষ্টতা এবং স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে নানা রূপকে এবং বিভিন্ন ছদ্মনামে লেখনী চালনা করতে দ্বিধা করেননি।

বাংলাদেশের মানুষ স্বদেশপ্রেমিক, স্বজাতিপ্রেমিক এবং মাতৃভাষাপ্রেমিক। এ দেশের মানুষ গণতন্ত্রমনা, স্বাধীনচেতা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধে ও ঐতিহ্যে গভীরভাবে বিশ্বাসী। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তারা আশা করেছিল– এ রাষ্ট্রে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং নিজস্ব স্বকীয় চিন্তা-চেতনা-মূল্যবোধে বিকাশ লাভ করবে, সাহিত্য-সংস্কৃতি উন্নত ও সমৃদ্ধ হবে। জনগণের ভাগ্যোন্নয়ন ঘটবে। এ দেশের জনগণের আশা সুদীর্ঘ চব্বিশ বছরেও পূর্ণ হয়নি, বরং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েক বছরের মধ্যেই পাকিস্তানের জনক ও গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এদেশে এসে (১৯৪৮ সালের মার্চ মাস) ঘোষণা করেন যে, 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' জিন্নাহর এ ঘোষণায় এবং বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী স্বীকৃত না হওয়ায় এ দেশের জনগণ বিক্ষুব্ধ হয় এবং ১৯৪৮ সালের ভাষা-আন্দোলনের সূচনা ঘটে। জিন্নাহর উক্ত ঘোষণার ছয় মাস পর তিনি ইন্তেকাল করেন। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানী জনগণের স্বার্থ-বিরোধী বক্তব্য রাখা সত্ত্বেও তাঁর ইন্তেকালের পরও এ দেশের কবি-সাহিত্যিকরা জিন্নাহর স্মরণে এবং তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অজস্র কবিতা গান লিখেছেন, এমনকি– পশ্চিমা অবাঙালি শাসকরা পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করা সত্ত্বেও এবং এ দেশের স্বাধিকার আন্দোলনের সূচনার পরও, ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে, এ দেশের অনেক কবি-সাহিত্যিকই যুদ্ধের বিরুদ্ধে লেখনী

ধারণ করেন; স্বদেশ প্রেমমূলক কবিতা-গান রচনা করেন, এমনকি ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলিম নবজাগরণের লক্ষ্যে কবিতা-গান লেখেন, স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে রচনা করেন গান ও কবিতা। ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে সরকারি প্রতিষ্ঠান 'পাকিস্তান পাবলিকেশনস' থেকে প্রকাশিত 'চির-দুর্জয়' শীর্ষক 'জাতীয় অনুপ্রাণনামূলক গীতি-সংকলন'-এ জসীমউদ্‌দীন, ফররুখ আহমদ, আহসান, হাবীব, তালিম হোসেন, সিকান্দার আবু জাফর, আজিজুর রহমান, হাবীবুর রহমান, রওশন ইজদানী, আশরাফুজ্জামান খান, আবদুল করীম, হোসনে আরা, হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, শামসুর রাহমান, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, খান আতাউর রহমান, সৈয়দ শামসুল হক, ফজল শাহাবুদ্দীন, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আবদুল লতিফ, আবুল হাসান শামসুদ্দীন, আল কামাল আবদুল ওহাব, বেলাল মোহাম্মদ, মাসুদ করীম, মাহমুদুল আমীন, শামসুন্নাহার চিনু, এ.কে.এম হারুনুর রশীদ, ফজল-এ-খোদা প্রমুখ কবি-গীতিকারের রচনা স্থান পায়।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, সামরিক স্বৈর-শাসক আইয়ুবের শাসনামলে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষিতে রচিত উপরোক্ত গ্রন্থের কিছু-কিছু কবিতায় এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী প্রগতিশীল কবিদের অনেকের রচনায়ও পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর শৌর্য-বীর্য, পাকিস্তানী স্বদেশপ্রেম, জেহাদের প্রেরণা, মুসলিম শক্তির নবজাগরণ, ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যের কথা ভাষা পায়। যারা পাকিস্তানবাদী এবং ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী কবি হিসেবে পরিচিত নন, তারাও পাক–ভারত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে লেখেন :

১. 'নয় নয় আমাদের কোন সংশয় নয়
আমাদের কারো চোখে মৃত্যুর ভয় নয়
চাই শুধু দুর্জয় জীবনের জয় গান
অক্ষয় হ'ক চির নির্ভয় হ'ক প্রিয় জন্মভূমি
প্রিয় পাকিস্তান।'
**[সিকান্দার আবু জাফর]**

২. 'জেহাদের ডাকে জেগেছি আবার
আমরা মুসলমান,
বাহুতে শক্তি হৃদয়ে দীপ্ত
ঈমান অনির্বাণ।'
**[হাবীবুর রহমান]**

৩. 'স্থলে আর জলে আর শূন্যে
শত্রুর সংহার জন্যে

এক প্রাণ একহাত আমরা।
সুমহান দেশপ্রেম বর্মে
কোরবানী উদ্‌বোধ ধর্মে
এক আশা এক ভাষা আমরা।'
**[হাসান হাফিজুর রহমান]**

৪. 'জাগো জামানার নয়া হায়দার
গর্জনে কাঁপে গিরি-কান্তার
কে আছিস ওরে আল্লাহর পথে
হবি আজ কোরবান।
স্বদেশ আমার পাক আমানত
হাতে হাতিয়ার বুকে হিম্মত,
জেগেছে হাজার সালাদিন আজ
দূর হঠো শয়তান।'

**[দুই]**
আমরা মুসলমান
আমরা মুসলমান
আল্লাহ ছাড়া কভু কারে নাহি ডরি
যেখানে জুলুম সেখানে জেহাদ করি।।
**[সৈয়দ শামসুল হক]**

উল্লেখ্য যে, ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত এসব কবিতায় বিদ্রোহী ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও ফররুখ আহমদের অনেক রচনা বিশেষত তাঁর 'আজাদ করো পাকিস্তান' শীর্ষক কাব্য-পুস্তিকার অন্তর্গত অনেক কবিতা-গানের প্রভাব রয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধকালে 'পশ্চিম পাকিস্তান' ভারতের দ্বারা আক্রান্ত হলেও, পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ 'পূর্ব-পাকিস্তান' আক্রান্ত হয়নি। তবু এ দেশের কবি-সাহিত্যিক-গীতিকাররা 'স্বদেশপ্রেম'-এ উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রেরণা-সঞ্চারী কবিতা-গান ইত্যাদি রচনা করেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, 'পূর্ব পাকিস্তানী'দের এ 'পাকিস্তান-প্রীতি' এবং 'স্বদেশপ্রেম' সত্ত্বেও, পাকিস্তানী অবাঙালী স্বৈরাচারী শাসকরা এদেশের প্রতি বৈরী ও বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ করে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রসহ প্রায় সব ক্ষেত্রে শোষণ-বঞ্চনা, অত্যাচার-নিপীড়ন অব্যাহত রাখে, এ দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার পদদলিত করে। পশ্চিমা শাসকদের এ গণ-বিরোধী ভূমিকা ও বৈরী আচরণ এ দেশের মানুষের স্বাধীনচেতা মনোভাব, স্বদেশপ্রেম, স্বাধিকারবোধ, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নতুন করে

জাগিয়ে তোলে। এ পরিপ্রেক্ষিতে উনসত্তরের আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থানের পথ ধরে স্বাধিকার ও স্বাধীনতার আন্দোলনও জোরদার হয়। এ দেশের তথা তদানীন্তন 'পূর্ব-পাকিস্তান'-এর জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার মেনে না নিয়ে, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বিজয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হতে না দিয়ে, ন্যায্য অধিকার হতে ষড়যন্ত্রপূর্বক বঞ্চিত করে এবং এর প্রেক্ষিতে শেখ মুজিবের ডাকে সারা দেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে সামরিক স্বৈরশাসক ইয়াহিয়া খান 'পূর্ব-পাকিস্তান' -এর জনগণের ওপর ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চের কাল রাতে তাঁর অবাঙালি সেনাবাহিনী লেলিয়ে দেয়, ব্যাপক গণহত্যা শুরু করে। দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর অর্জিত হয় মহান বিজয়, অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের।

ফররুখ আহমদের 'আজাদ করো পাকিস্তান' শীর্ষক কাব্য-পুস্তিকার আলোচনা প্রসঙ্গে উপরোক্ত ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক পটভূমি তুলে ধরা হলো এ কারণে যে, পশ্চিমা অবাঙালিদের শাসনাধীন 'পাকিস্তান' কোনো দিনই 'আজাদ' অর্থাৎ 'স্বাধীন' হতে পারেনি, ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে গিয়ে, গণতান্ত্রিক আদর্শ, সমানাধিকার ও ন্যায়-নীতিকে পদদলিত করে, ধর্মের নামে শোষণ-বঞ্চনা ও অত্যাচার-নিপীড়ন অব্যাহত রেখে পাকিস্তানী শাসকরা 'পাকস্তান'-এর মূল আদর্শকে ভূলুণ্ঠিত করেছে। পাকিস্তান আমলে রচিত 'ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক কাব্য'-এ মীরজাফরের উল্লেখ করে ফররুখ তাই লিখেছেন :

> 'আদর্শ বর্জিত জাতি দুশ্চরিত্র সে যুগে যেমন
> চারিত্রিক দীনতার ছবি দেখি এ যুগে তেমন!
> সেদিন স্বার্থের চক্র দেখেছি যেমন সবখানে
> তেমনি চক্রান্ত দেখি এই যুগেও মোহমুগ্ধ প্রাণে
> সমাজের সর্বস্তরে সে দিনের মতো দেখি আজ
> কাজের বদলে শুধু অপকর্ম অথবা কুকাজ।
> জাফরের জামানায় ছিল যত কথার ফানুস
> এ যুগেও সবিস্ময়ে দেখি আজ তত অমানুষ!"

পাকিস্তানের অবাঙালি পশ্চিমা শাসকদের অপশাসন, শোষণ-বঞ্চনা, ষড়যন্ত্র আর একাত্তরে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর ব্যাপক গণহত্যার কারণেই পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয়ে। বাস্তবে রূপ লাভ করেছে বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতার স্বপ্ন। ☐

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ৯ম সংখ্যা, জুন, ২০০৪]

# ফররুখ আহ্‌মদের গল্প : তাঁর সৃজনক্ষমতার স্বরূপ

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্

এই নিবন্ধের শিরোনাম 'ফররুখ আহমদের ছোটগল্প' হওয়ায়ই সমীচীন ছিল। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক প্রতিভাধর কবি ফররুখ আহ্‌মদ তাঁর দীর্ঘ সাহিত্য-জীবনে বিচিত্র বিষয়ে নানা ছন্দের এবং আঙ্গিক ও রূপরীতির অজস্র কবিতা রচনা করলেও, এবং তাঁর বহু কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও, তিনি গল্প লিখেছেন মাত্র গোটা পাঁচেক, আর সেসব গল্পের মধ্যে রয়েছে ছোট গল্প এবং দীর্ঘ গল্প। অবশ্য গল্পের আকার ছোট হোক আর বড়োই হোক– সব ধরনের গল্পকেই 'ছোট গল্প' আখ্যায়িত করা হয়। যদিও কখনো কখনো পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বড় পরিসরের ও দীর্ঘ আয়তনের গল্পের শিরোদেশে 'বড় গল্প' বা 'দীর্ঘ গল্প কথাটিও মুদ্রিত হয়ে থাকে। আলোচ্য 'ফররুখ আহ্‌মদের গল্প'[১] মূলত কবি ফররুখ আহ্‌মদের লেখা পাঁচটি গল্পের সংকলন। তাই 'ফররুখ আহ্‌মদের গল্প' শিরোনামটি তাঁর লেখা না বুঝিয়ে, ফররুখ আহ্‌মদ-সম্পর্কিত গল্পও বুঝাতে পারে। এজন্যই এত কথা।

এ রচনার শুরুতেই বলেছি যে, ফররুখ আহমদ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক প্রতিভাধর কবি। কবি হিসাবেই তিনি প্রধানত পরিচিত এবং সর্বাধিক খ্যাতিমান, যদিও তিনি একটি ব্যঙ্গ-নাটক এবং গোটা পাঁচেক গল্পের (যার মধ্যে দীর্ঘ গল্পও রয়েছে) রচয়িতা। তাঁর একটি অসমাপ্ত উপন্যাসও ('সিকান্দর শা'র ঘোড়া') রয়েছে। কিন্তু গোটা পাঁচেক অসাধারণ গল্পের (ছোট ও বড়) এবং একটি অসমাপ্ত উপন্যাসের রচয়িতা হওয়া সত্ত্বেও, ফররুখ আহমদ কথাশিল্পী তথা গল্পকার হিসাবে তেমন পরিচিত নন, খ্যাতিমানও নন। ফররুখ আহমদ যে চল্লিশের দশকে সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাবকালে অর্থাৎ সাহিত্য-জীবনের সূচনা-পর্বেই বহুসংখ্যক উঁচুমানের এবং অনন্যসাধারণ কবিতা রচনার পাশাপাশি কয়েকটি অসাধারণ গল্পও লিখেছেন, তা ফররুখ-সাহিত্যের পাঠকদের, তাঁর ভক্ত ও অনুরাগীদের– এমনকি অনেক গবেষক-সমালোচকেরও জানা নেই।

আমাদের এবং সার্বিকভাবে বলতে গেলে, বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের দুর্ভাগ্য এই যে, বিভাগ-পূর্বকালে এবং চল্লিশের দশকে রচিত এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ফররুখ আহমদের গল্পগুলো অতীতে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না হওয়ায় এবং গল্পগুলো নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার অভাবে, বাংলা সাহিত্যের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক প্রতিভাধর কবি যে একজন দক্ষ ও সৃজনীক্ষমতার অধিকারী শক্তিমান গল্প লেখক ও কথাশিল্পী– এই তথ্য এবং সত্য একরূপ অজানাই থেকে যায়, যদিও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের পর সেকালেই তাঁর কয়েকটি গল্প সুধী-সমালোচক এবং বোদ্ধা

পাঠকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ফররুখ আহমদের গল্প গ্রন্থাকারে প্রকাশের বহু পূর্বে এবং সাবেক পাকিস্তান আমলে তাঁর অসাধারণ গল্প 'মৃতবসুধা' প্রখ্যাত কবি, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য-সমালোচক সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত 'গল্পসংগ্রহ' শীর্ষক সংকলনের অন্তর্গত হয়। এই গল্পটি বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'বাংলাদেশের ছোটগল্প' শীর্ষক সংকলনেরও অন্তর্ভুক্ত হয়।

ফররুখ আহমদের মৃত্যুর সুদীর্ঘকাল পরে প্রখ্যাত কবি, সাহিত্য-সমালোচক ও গবেষক আব্দুল মান্নান সৈয়দের সুদক্ষ সম্পাদনায় এবং ঢাকার 'সৃজনী প্রকাশনী লিমিটেড'-এর উদ্যোগে ১৯৯০ সালের জানুয়ারি মাসে 'ফররুখ আহমদের গল্প' শিরোনামে তাঁর একটি গল্প-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। মান্নান সৈয়দ গ্রন্থের অন্তর্গত পাঁচটি গল্প সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন এবং 'ভূমিকা'য় গ্রন্থগুলো সম্পর্কে মনোজ্ঞ ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করেছেন। ফররুখ আহমদ যে শুধু বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ মৌলিক প্রতিভাধর কবিই নন, তিনি যে একজন শক্তিশালী ও সৃজনধর্মী কথাশিল্পী তথা গল্পকারও ছিলেন, 'ফররুখ আহমদের গল্প' শীর্ষক গ্রন্থের অন্তর্গত ১. 'মৃতবসুধা' (প্রথম প্রকাশ ঃ মাসিক মোহাম্মদী, কার্তিক, ১৩৪৪), ২. 'বিবর্ণ' (প্রথম প্রকাশ ঃ মাসিক মোহাম্মদী), ৩. 'অন্তর্লীন' (প্রথম প্রকাশ ঃ মাসিক মোহাম্মদী, ভাদ্র, ১৩৪৪), ৪. 'যে পুতুল ডলির মা' (প্রথম প্রকাশ ঃ 'বুলবুল', বৈশাখ, ১৩৪৫), ৫. 'প্রচ্ছন্ন নায়িকা' (প্রথম প্রকাশ ঃ মাসিক মোহাম্মদী, কার্তিক, ১৩৪৬) প্রভৃতি গল্প পাঠ করলে এবং আব্দুল মান্নান সৈয়দের 'ভূমিকা'য় গল্পগুলোর আলোচনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন পড়লে সাহিত্যবোদ্ধা পাঠক ও সাহিত্য-সমালোচক তা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন বলে আমার বিশ্বাস।

ফররুখ আহমদ একজন শক্তিমান ও সৃজনধর্মী কথাশিল্পী হওয়া সত্ত্বেও এবং বিভাগ-পূর্বকালে উপরোক্ত পাঁচটি জীবনধর্মী এবং শিল্পোত্তীর্ণ গল্প লেখার পরও তিনি কেন আর গল্প-উপন্যাস লিখলেন না, তা কেবল ফররুখ আহমদের পক্ষেই বলা সম্ভব ছিল। তবে আমাদের ধারণা (এই ধারণা সঠিক নাও হতে পারে) ফররুখ আহমদ বিভাগ-পূর্বকালেই একজন শক্তিমান সৃজনধর্মী কবি এবং সেকালেই ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের এবং মুসলিম রেনেসাঁর রূপকার কবি হিসাবে ভাবে, ভাষায়, ছন্দে এবং আঙ্গিকে ও রূপরীতিতে নতুনত্ব এনে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক প্রতিভাধর কবি হিসাবে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করায় তিনি আর কথাশিল্প রচনায় তথা ছোটগল্প লেখায় আত্মনিয়োগ করেননি। তাঁর দীর্ঘ সাহিত্য-জীবনে অব্যাহতভাবে নানা বিষয়ের, ছন্দের, আঙ্গিক ও রূপরীতির কবিতা রচনা করার ফলে ফররুখ আহমদের অবদানে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়েছে। তিনি অব্যাহতভাবে ছোটগল্প বা উপন্যাস লিখলে বাংলা কথা সাহিত্যও অধিকতর সমৃদ্ধ এবং ঐশ্বর্যমণ্ডিত হতে পারতো, এমন আশা অমূলক নয়।

এ আলোচনায় উপরোক্ত যেসব কথা বললাম, কথাশিল্পী হিসাবে ফররুখ আহমদের বিশেষ অবদান রাখার সম্ভাবনার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করলাম, তা মরহুম কবি ফররুখ আহমদের আলোচ্য গল্পগ্রন্থ 'ফররুখ আমহদের গল্প'-এর অন্তর্গত পাঁচটি গল্প পাঠের অভিজ্ঞতা এবং ধারণার ভিত্তিতেই। বলাবাহুল্য, ফররুখ আহমদ ছিলেন একজন প্রতিভাসম্পন্ন, শক্তিমান, দক্ষ এবং আধুনিক মনোভাব ও জীবনদৃষ্টিসম্পন্ন কবি। মূলত: কবি বলেই তাঁর প্রায় সব কয়টি গল্পই কাব্যময় ভাষায়, বর্ণনা দক্ষতার মাধ্যমে এবং ঘটনার ও চরিত্রের বিশ্লেষণের– বিশেষভাবে বলতে গেলে মনোবিশ্লেষণের ধারায় রচিত। ফররুখ আহমদের সব কয়টি গল্পেরই পটভূমি বা প্রেক্ষাপট কিংবা বলা যেতে পারে ঘটনাস্থান গ্রাম এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্ধেক গ্রাম, অর্ধেক শহর। তাঁর গল্পে কাহিনী বা ঘটনাচক্র এবং বিভিন্ন চরিত্র থাকলেও, ফররুখ আহমদ বর্ণনাত্মক পদ্ধতির মাধ্যমে গল্পের কাহিনী বা ঘটনা এবং চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। অধিকাংশ গল্পে লেখক নিজেই কথক ও বর্ণনাকারী এবং তিনি নিজেই যেন গল্পের চরিত্র। ফররুখ আহমদের গল্পের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সব গল্পের কাহিনীই বর্ণনার অন্তরালে অন্তস্রোতের মতো তুলে ধরেছেন, অনেক ক্ষেত্রে কাহিনীর, ঘটনার, চরিত্রের নাটকীয় সূচনা ও উন্মোচন ঘটিয়েছেন, গল্প বর্ণনা ও চরিত্র সৃজন করেছেন হৃদয় দিয়ে, কবিসত্তাকে মিশিয়ে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জীবনদৃষ্টি, জীবনবোধ এবং জীবনের অভিজ্ঞতা, অন্তঃদৃষ্টিতে দেখার অসাধারণ ক্ষমতা।

যে ক্ষেত্রে ছোটগল্পের বা উপন্যাসের কাহিনী অতি সংক্ষেপে এবং কয়েকটি পঙ্ক্তিতে বা একটি স্তবকের পরিসরে তুলে ধরা ও বর্ণনা করা খুবই কঠিন। সে গল্প বা উপন্যাস যদি হয় বর্ণনাত্মক, বিশ্লেষণাত্মক ও প্রতীকধর্মী তা'হলে তো কাহিনীর তথা গল্পের সারাৎসার তুলে ধরা আরো কঠিন। ফররুখ আহমদের বর্ণনাত্মক, বিশ্লেষণধর্মী (চরিত্র মনোবিশ্লেষণ), কাব্যগুণান্বিত প্রতিটি গল্পে কাহিনী, ঘটনাক্রম এবং একাধিক চরিত্র অবশ্যই আছে, তিনি গল্পের কাঠামোও সম্পূর্ণ বর্জন করেননি, কিন্তু তাঁর গল্পে প্রতীকধর্মিতা থাকার কারণে গল্পের সার-সংক্ষেপ তুলে ধরা কঠিনতর। তবুও অতি-সংক্ষেপে তাঁর গল্পের সার-সংক্ষেপ তুলে ধরার চেষ্টা করছি। 'ফররুখ আহমদের গল্প' গ্রন্থের প্রথম গল্প 'মৃতবসুধা' বেশ দীর্ঘ পরিসরে বর্ণনাত্মক ভঙ্গিতে এবং কাব্যগুণান্বিত ভাষায় রচিত– এতে প্রতীকধর্মিতাও আছে। 'মৃতবসুধা' গ্রামীণ পটভূমিতে লেখা এবং এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বা নায়ক বৃদ্ধ খন্দকার রউফ সাহেব– যিনি যৌবনে ছিলেন শক্তিমান, দুর্দান্ত প্রতাপশালী, তার দৌরাত্ম্য ও লাম্পট্য ছিল প্রবল, বিবাহিত স্ত্রীকে ছাড়াও, তিনি অবিবাহিত নারীকে শক্তির জোরে ধরে এনে রক্ষিতা অবস্থায় উপভোগ করেছেন, জারজ সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, তার ঔরসে ও রাহেলার গর্ভে জন্ম নিয়েছে কন্যা লতিফা। রাহেলা আত্মহত্যার মাধ্যমে তার

মনোবেদনার ও জীবন-যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়েছে। কন্যা লতিফা প্রেমিকের হাত ধরে পালিয়ে গিয়ে স্বগৃহ তথা পাপ-পুরী থেকে, লম্পট ও নারী- ভোগলিপ্সু বৃদ্ধ পিতার সান্নিধ্য থেকে মুক্তি পায়। যৌবনরিক্ত, শারীরিক শক্তিরহিত এবং বৃদ্ধ ও অথর্ব খন্দকার রউফ সাহেব হাঁপানি ও অন্যান্য রোগে ভুগে মৃত্যুবরণ করে, কষ্টময় নিঃসঙ্গ জীবন এবং ক্লান্তি-অবসাদ ও নৈরাশ্যভরা জীবন থেকে মুক্তি পায়। নদীর তীরে বিরাট অশ্বত্থ গাছের তলে অন্যান্য বৃদ্ধদের সঙ্গে যে রউফ সাহেব আড্ডা জমাতো, জীবন ও যৌবনের শক্তিমত্তা ও লাম্পট্যের গল্প শোনাতো– সে চিরতরে হারিয়ে যায়।

'মৃতবসুধা' গল্পের কাহিনী যতখানি গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় কাহিনী ও চরিত্রের বর্ণনা, চরিত্রায়ণ এবং বর্ণনাত্মক ও কবিত্বময় ভাষায় এবং নাটকীয় ভঙ্গিতে কাহিনীর উপস্থাপনা, গল্পের পরিসমাপ্তি এবং খন্দকার রউফের জীবনের করুণ পরিণতি ফুটিয়ে তোলা। গল্পটি যে প্রতীকধর্মী এবং সব বৃদ্ধেরই পরিণতির প্রতীক তা নিম্নোক্ত বর্ণনাতেই উপলব্ধি করা যায় ঃ "এমনি এক শীতের রাতে। পৃথিবী যখন গভীর আলস্যে ঘুমুচ্ছে– রউফ সাহেবকে তখন নদীর ধারে দেখা গেল। ভয়-বিবর্ণ তাঁর মুখ, কপালের পাশে ঘাম জেগেছে, শরীর কাঁপছে থর থর করে। আস্তে আস্তে এসে তিনি অশ্বত্থ গাছের তলায় দাঁড়ালেন। শীতার্ত অশ্বত্থ গাছে একটী পাতাও নাই, শুধু কঙ্কালের মত বিশীর্ণ দেহখানি দাঁড়িয়ে আছে। ওর ডালপালা থেকে উড়ে গেছে পাখীরা।... তাদের সংবাদ গাছটি জানে না– শুধু পীড়িত দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।" গল্পের সমাপ্তিতে রউফ সাহেবের মৃত্যুর পরের অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বলে হয়েছে, "পত্রঝরা ছায়া বিরল বনস্পতির নীচে সেই বৃদ্ধদের আসর বসে। কিন্তু তাদের দল ছোট হয়ে এসেছে– নতুন বৃদ্ধরা সেই দলে মিশবার চেষ্টায় আছে। নদীর পরপারে সেই মাঠখানি সম্পূর্ণ শস্যহীন হয়ে হাহাকার কর্চ্ছে। বোধ হয় ওখানে আর শস্য ফলবেনা। কোনদিন। বসুধা ওখানে মৃত– উৎপাদিকা শক্তিহীন।" ('মৃতবসুধা', পৃ. ৩৬)। মানবজীবনের– বিশেষত বৃদ্ধদের জীবনের প্রতীক রূপায়ণ ঘটানো হয়েছে বৃদ্ধ ও নিস্পত্র অশ্বত্থবৃক্ষের এবং মৃতমাঠের বর্ণনার মধ্য দিয়ে। এই গল্পে জীবনতত্ত্ব, জীবনসত্য এবং দার্শনিক তত্ত্বকথাও পরোক্ষরূপে ভাষা পেয়েছে।

ফররুখ আহমদ চল্লিশের দশকে তাঁর কাব্য সাধনার প্রাথমিক পর্বে কিছুটা বামপন্থার অনুসারী এবং ধর্মনিরপেক্ষবাদী ছিলেন, রোমান্টিকতার পাশাপাশি সমাজ-সচেতনতা ও বাস্তববাদিতা এবং মানবতাবাদী ভাবধারা ও চিন্তা-চেতনা তাঁর সেকালের কবিতায় বিশেষভাবে রূপ পায়। বিভাগ-পূর্বকালে ও চল্লিশের দশকে তাঁর কাব্য-সাধনায় একেবারে প্রাথমিক পর্বে তাঁর কবিতায় ও অন্যান্য রচনায় বিষয়বস্তুর দিকে এবং ভাবে ভাষায় ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও জাগরণী প্রেরণা তেমন রূপ পায়নি, এমনকি তাঁর রচনায় মুসলিম সমাজে প্রচলিত-অপ্রচলিত আরবি-ফারসি

শব্দাবলীও তেমন ব্যবহৃত হয়নি। লক্ষণীয় যে, চল্লিশের দশকে রচিত তাঁর গল্পগুলোতেও রচনার ভাষায় তিনি আরবি-ফারসি শব্দ এবং মুসলিম-জীবনে প্রচলিত বুলি তেমন ব্যবহার করেননি। অথচ বিভাগ-পূর্বকালে চল্লিশের দশকেই ফররুখ আহমদ মুসলিম ঐতিহ্যবাহী, পুঁথি-সাহিত্যে ও মুসলিম জনজীবনে প্রচলিত আরবি-ফারসি-উর্দু ইত্যাদি শব্দাবলী ব্যবহারের মাধ্যমে নিজস্ব স্বতন্ত্র কাব্য ভাষা গড়ে তোলেন এবং ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের রূপকার, মুসলিম রেনেসাঁর বাণীবাহক এবং মহৎ মানবতাবাদী কবি হিসাবে পরিচিতি, খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ফররুখ আহমদের গল্পের ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের এবং মুসলিম ঐতিহ্যের তেমন পরিচয় না থাকলেও, গ্রামীণ পটভূমিতে, কলকাতা মহানগরীর পটভূমিতে এবং আধা-গ্রাম ও আধা-শহরকেন্দ্রিক পটভূমিতে রচিত সবগুলো গল্পের কাহিনীই মুসলিম জীবননির্ভর, মুসলিম চরিত্রকেন্দ্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী আদর্শ-উচ্ছৃত। ইতোমধ্যেই এ রচনায় আলোচিত 'মৃতবসুধা' শীর্ষক গল্পে যেমন গ্রন্থের অন্তর্গত অন্যান্য গল্পেও তেমনি এর পরিচয় বিধৃত।

'বিবর্ণ' শীর্ষক গল্পের প্রাথমিক পটভূমি গ্রাম এবং আড়িয়াল খাঁ নদী এবং পরবর্তী পটভূমি মহানগরী কলকাতা। গল্পের প্রধান চরিত্র বা নায়িকা হাসিনা ছিল গ্রামের বাসিন্দা, আড়িয়াল খাঁ নদীর তীরবর্তী গ্রামের বিত্তশালী পরিবারের বধূ। কিন্তু প্রবল স্রোতস্বিনী ও গর্জমান আড়িয়াল নদীর ভাঙনে হাসিনার পরিবারে বিপর্যয় নেমে আসে, সব সম্পদ নদী গ্রাস করে এবং হাসিনার স্বামী নিজাম বন্যায় ও তীব্র স্রোতে ডুবে প্রাণ হারায়। এই ট্রাজিক ঘটনার পর স্বামী ও সম্পদহারা হাসিনা তার মা, মেয়ে এবং ছেলেকে নিয়ে কলকাতা মহানগরীর বাশিন্দা হয়। গ্রামীণ প্রকৃতি, পরিবেশ ও আড়িয়াল খাঁ নদীর সঙ্গে পরিচিত হাসিনা সেই অবারিত মুক্ত-জীবনের স্মৃতি ভুলতে পারে না, কলকাতার বদ্ধ ঘরে এবং সংকীর্ণ পরিসরে বাস করে সে মুক্ত আকাশ ও মুক্তবায়ুর স্পর্শ চায়, বাইরে বেড়াতে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাকে তাড়িত করে। কিন্তু জীবন-জীবিকার ব্যস্ততায়, ঘর-কন্নার কারণে সে সুযোগ এবং অবকাশ কমই মেলে। তাঁর পুত্র হোস্টেল প্রবাসী ছাত্র হাসান মাঝে-মাঝে এসে মাকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যেতে চায় কিন্তু আকাশে মেঘ ও ঝড়ো হাওয়ার কারণে হাসিনার যাওয়া হয়ে ওঠে না। এই পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়েছেন গল্পকার এইভাবে ঃ "মায়ের মুখের দিকে ম্লান দৃষ্টিতে তাকিয়ে আস্তে আস্তে হাসান চলে যায়। পাথরের মত একটা ভারী বেদনা তার বুকে জমা হয়ে ওঠে। সারা বিকেল ঘরের বাইরে যাবার জন্য মা'র উল্লাসের কথা মনে পড়ে। ছোট খুকীর মত আগ্রহে মা সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় বসেছিল। কিন্তু এতখানি আগ্রহকে একটা অকারণ আপত্তির তলায় নিষ্পিষ্ট হয়ে যেতে দেখে তার সমস্ত মন নিরাশ বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। হাসান তাড়াতাড়ি পথে নামে। আকাশে কাজল মেঘ কেটে গেছে, সেখানে জেগে উঠেছে নির্মম ঔদাসীন্যের কঠোর বিবর্ণতা।" (পৃ. ৪৩)

উপরোক্ত বর্ণনা ও বক্তব্যের মধ্যে দিয়েই 'বিবর্ণ' গল্পটির পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে। এ রচনার অন্যত্রও বলা হয়েছে যে, ফররুখ আহমদের গল্প বর্ণনাত্মক, বিশ্লেষণধর্মী, চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ-প্রধান এবং তাঁর রচনার ভাষা কবিত্বময়, উপমা-চিত্রকল্পবহুল ও অত্যন্ত সাবলীল। এসব গল্পের সার-সংক্ষেপ তুলে ধরা কঠিন। 'বিবর্ণ' গল্পটি থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে।

১. "জীবন আর আ-দিগন্ত মুক্তি। নগর প্রান্তের অট্টালিকা শ্রেণীর ক্রুর ইঙ্গিতে সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ আকাশের বীজানুময় ধুমাচ্ছন্নতা কখনো এই তিনটি জিনিসের প্রার্থনা করে কিনা জানি না। কিন্তু দিনের প্রথম সূর্য আর শেষে রাত্রির চাঁদ দিগন্ত অতিক্রম করার সময় আকাশের এই বিবর্ণ যবনিকাকে যখন আলোকিত করে তুলতে ব্যর্থ চেষ্টা করে, তখন ঠিক ঐ তিনটি জিনিসের একটু সান্নিধ্য পাওয়ার জন্যই হাসিনার রক্তের প্রতি কর্ণিকা উদগ্রীব হয়ে ওঠে।"

২. "অনেক দিন আগে আড়িয়াল খাঁর তীরে সাবেকী আমলের প্রকাণ্ড থামওয়ালা বাড়ির বারান্দায় বসে আড়িয়াল খাঁর সাথে হাসিনার পরিচয় হয়। ভাটী পথে হাটুরিয়া দল নদীর স্রোতে প'ড়ে তীব্র বেগে উধাও হয়ে যেত আর বর্ষাকালে দিগন্ত মথিত করে ঘোলাপানির ঢেউ বিরাট অজগরের মত গড়িয়ে গড়িয়ে তীরে এসে প্রবল বেগে আঘাত ক'রত। মধ্য নদী দিয়ে তলোয়ারের মত চক চক স্থির ধারাল প্রবাহ বয়ে যেত। কিন্তু দূরে বসে তার গতি অনুভব করা যেত না। সুদীর্ঘ তীক্ষ্ণধার তরবারির মত সেই বিশাল স্রোত মৃত্যুর ভ্রুকুটির মত দুই তীরের বাড়ী আর গাছপালার দিকে তাকিয়ে থাকত। মৃত্যুর মতই সকলেই সেই স্রোতকে ভয় করত।... হাসিনার বিয়ের পর অনেক রাত্রিতে একদিন নদীর গর্জন শোনা গেল–বুভূক্ষু অজগরের সংক্ষুব্ধ গর্জন। বাহিরের মহল ভাঙল, খাসমহলে ভাঙল, অন্দরমহল ভাঙল– অতি দ্রুত বিপর্যয়ের মধ্যে। নদীর ভাঙন হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। এবার শুরু হল মৃত্যুর খেলা। হাসিনার স্বামী নিজাম নদীর মত প্রাণবত্তা হারিয়ে নদীর তীরেই যেদিন নিঃশেষে হয়ে গেল, আড়িয়াল খাঁর কাজ শেষ হল সেদিন। অবশেষে মুমূর্ষু নদী তরঙ্গের আঘাতে হাসিনাকে সরিয়ে দিল অনেক দূরে। আকাশ যেখানে বিবর্ণ, আড়িয়াল খাঁর মত সুবিস্তৃত পরিসর যেখানে পাওয়া অসম্ভব, সেই অভিশাপের বুকে।" (**'বিবর্ণ' পৃ. ৩৭-৩৮**)। ফররুখ আহমদের কবিতায় নদী-সমুদ্র, সমুদ্রের বিশাল ঢেউ ও গর্জন, নদী-ভাঙন এবং মানবিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় (দ্রষ্টব্য ঃ 'পদ্মার ফাটল', 'পদ্মার ভাঙন' ইত্যাদি কবিতা) একটি বড় স্থান করে আছে। নদীর সর্বনাশা ভাঙনমুখী রূপ তিনি বিধৃত করেছেন এই গল্পে।

'অন্তর্লীন' শীর্ষক গল্পটি অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিসর। কিন্তু এই গল্পে ট্রাজিক কাহিনীর মধ্য দিয়ে মানব-জীবনের– বিশেষত প্রেম-ভালবাসা, বিবাহ ও দাম্পত্য-জীবনের এবং নারীর সন্তান কামনার, পুরুষের বংশধারা রক্ষার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার

গুরুত্বপূর্ণ দিক বিধৃত হয়েছে। এই গল্পটিও বর্ণনাত্মক, বিশ্লেষণধর্মী, দার্শনিক জীবন-ভাবনা জড়িত, এ গল্পের ভাষাও কবিত্বময়, উপমা-চিত্রকল্প সমৃদ্ধ, সাবলীল এবং এর সমাপ্তিতেও আছে নাটকীয়তা বা নাট্যগুণ। সংক্ষেপে বলতে গেলে 'অন্তর্লীন' গল্পের কাহিনীর সারাৎসার হলো ঃ গল্পের নায়ক শাহরিয়ার কল্পনা-বিলাসী। তাকে কেউ বলে নাস্তিক, কেউ বলে অহংকারী। কিন্তু এর কোনোটিই নয়। লেখকের ভাষায় ঃ "শারীরিক কামনাকে সে সহজ এবং প্রয়োজনীয় বলে স্বীকার করে, কিন্তু সে অসচ্চরিত্র বা অসংযমী নয়।" বিবাহ করা ও দাম্পত্য-জীবন পরিচালনার ব্যাপারে তেমন আগ্রহ না হলেও, শাহরিয়ার একটু বেশি বয়সেই জীবনকে সুন্দর করার জন্য বিয়ে করল, যদিও তেত্রিশ বছর বয়সে বিয়ে করার মধ্যে তার "কোনো রোমাঞ্চ ছিল না, ছিল না অতিরিক্ত লোভ বা আসক্তি।" বিবাহিত জীবনে স্ত্রী রিহানার সঙ্গে সে দাম্পত্য-জীবন কাটিয়েছে, তাদের মধ্যে প্রেম-ভালবাসাও ছিল, দৈহিক মিলনও ছিল। কিন্তু শাহরিয়ার তার স্ত্রী রিহানার মতো সন্তানের আকাঙ্ক্ষী নয়, সন্তান জন্ম দিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। ফলে উভয়ের মধ্যে ঘটে মানসিক দ্বন্দ্ব, জন্ম নেয় মনস্তাত্ত্বিক বাধা। রিহানা মামার বাড়িতে গিয়ে সিঁড়ি থেকে পড়ে শয্যাশায়ী হয়। শাহরিয়ার এই দুঃসংবাদ পেয়ে মামার বাড়িতে ছুটে যায়, রিহানার শয্যাপাশে গিয়ে প্রিয়তমা স্ত্রীকে গভীর ভালবাসায় আপন করে নেয়। কিন্তু রিহানার জীবন-প্রদীপ নিভে যায়। স্ত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যুর পর শাহরিয়ার উপলব্ধি করে সন্তানের প্রয়োজনীয়তা, রিহানার সন্তান-কামনা পূর্ণ না করে তাকে বঞ্চিত করার মর্মবেদনা। গল্পের পরিসমাপ্তিতে লেখকের বর্ণনা ঃ "বহুদিন আগেকার একটি বঞ্চিত রাত্রির আকাশের দিকে তাকিয়ে রিহানার অতৃপ্ত কামনা অনুভব করে সে বেদনায় অভিভূত হয়ে পড়লো।"

'অন্তর্লীন' শীর্ষক গল্পটি পড়তে গিয়ে পাঠকের চিত্তও 'বেদনায় অভিভূত হয়ে পড়বে', উপলব্ধি করবে রিহানার অন্তর্লীন আকাঙ্ক্ষা , সন্তান কামনার উদগ্র বাসনা এবং তাঁর জীবনের করুণ পরিণতি। শাহরিয়ারের অন্তর্লীন চারিত্র্য এবং দাম্পত্য-জীবনের শেষ পর্যায়ের, স্ত্রী রিহানার মৃত্যুর পর তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন এবং সন্তানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি পাঠকের চিত্তকেও নাড়া দেবে। শুধু দাম্পত্য-জীবনের করুন কাহিনীর জন্য নয়, গল্পকার ফররুখ আহমদের বর্ণনাত্মক রীতির কারণে, সৃজনশীল গদ্যের দরুন এবং সিচোয়েশন সৃষ্টির ক্ষমতার ফলে, চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের দক্ষতার এবং জীবনসত্য তুলে ধরার দার্শনিক প্রজ্ঞায়। গল্পটি থেকে কিছু-কিছু অংশ উদ্ধৃতি দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

১. "শাহরিয়ারের বেষ্টনে থেকে রিহানা তৃপ্ত নয়। সে চায় নিজের সৃষ্টি দিয়ে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে। তার ভীরু দুর্বল বুক ব্যাকুল স্নেহছায়ায় কি যেন খুঁজে ফেরে। শাহরিয়ার বুঝতে পার্ল রিহানার কামনা। রিহানা চায় সন্তানের মা হ'তে। শাহরিয়ারের দেহ-কণিকা দিয়ে তার শিল্পী মন একটি শিশু সৃষ্টি করতে চায়।

শাহরিয়ার অস্বীকার করে রিহানার প্রার্থনা। সে আধুনিক যুগের আবহাওয়ায় পালিত; সে চায় না যে পৃথিবীর জনসংখ্যা অনাবশ্যকভাবে মারাত্মক রকম বেড়ে যাক। দেহের দাবী অব্যাহত রেখে সে ভেসে যেতে চায় জীবনের স্রোতে।"

২. "শাহরিয়ার স্তব্ধ হয়ে গেল। সে একদিন অমার্জনীয় ভুল করে এসেছে। সে জানত যে নারী ও পুরুষের দৈহিক কামনা একই রকম। কিন্তু দৈহিক ক্ষুধার উপরও যে নারীর মনে সন্তানের জন্য আর একটি ক্ষুধা আছে সে কথা পুরুষ হয়ে সে জান্তে পারেনি।" দুর্ঘটনায় রিহানা শয্যাশায়ী হবার পর শাহরিয়ারের উপলব্ধি ও অনুশোচনা ঃ "সে বঞ্চিত করেছে রিহানাকে তার সেই সন্তান কামনা থেকে– রিহানার জীবনে সবচেয়ে বড় সাধ সে অপূর্ণ রেখেছে। আর সময় নাই। রিহানার আয়ু নিভে আসছে। শাহরিয়ারের মনে হ'ল যে একটি নারী-জীবন শুধু তারই ঐ নির্মম অবহেলায় পরম আনন্দ থেকে বঞ্চিত হলো।" (পৃ. ৪৬) 'অন্তর্লীন গল্পটিতে একটি প্রতীকধর্মী রূপ অন্তর্নিহিত রয়েছে। শাহরিয়ার ও রিহানার দাম্পত্য-জীবন এবং রিহানার সন্তান-কামনায় যেন সব নারীর মনোভাবেরই প্রতিচ্ছায়া প্রতিফলিত।

'যে পুতুল ডলির মা' শীর্ষক গল্পটি ফররুখ আহমদের গল্প-গ্রন্থের সবচেয়ে স্বল্পায়তন গল্প। কিন্তু গল্পটি ছোট হলেও এবং তাতে প্রধান চরিত্র হিসাবে ছোট্ট মেয়ে ডলি, তার মা কয়েকটি পুতুল থাকলেও, এ গল্পটিতেও মানবজীবনের এবং পারিবারিক জীবনেরও একটি আলেখ্য বিধৃত। এ গল্পেও এক ধরণের প্রতীকধর্মিতা রয়েছে। কেননা, প্রায় সব সংসারেই শিশু-কিশোর– বিশেষ করে মেয়ে শিশু ও বালিকারা পুতুল নিয়ে খেলা করে, পুতুল নিয়ে ঘুমায় এবং খেলাচ্ছলে পুতুল নিয়ে সংসারও গড়ে। কিন্তু বয়স বাড়লে পুতুল-খেলা সাঙ্গ হয়, এক সময় বিয়ে হলে বাস্ত বে দাম্পত্য-জীবন এবং সংসার জীবনও গড়তে হয়, যদিও শৈশবের পুতুল খেলার স্মৃতি সারাজীবনই মনে থেকে যায়। 'যে পুতুল ডলির মা' গল্পে বালিকার পুতুল খেলার, পুতুলকে গভীরভাবে ভালবাসার কাহিনী বিধৃত হয়েছে। শৈশব থেকেই পুতুলের ভালবাসা যেন বালিকার ভবিষ্যৎ জীবনে বিবাহের এবং সন্তান জন্মদানের অজানিত ও সংগোপন আকাঙ্ক্ষা রই প্রতীকায়ন বা রূপকাশ্রিত উপস্থাপনা।

ডলির মাও শৈশবে ডলির মতোই পুতুল নিয়ে খেলা করতো। বিবাহিত জীবনে এবং নিজের সন্তান জন্মদানের পরও পুতুলের স্মৃতি তার মন থেকে মুছে যায়নি। বিয়ের পর ডলির ক্ষেত্রেও তাই ঘটবে। সে জন্ম দেবে খেলার পুতুল নয়, নিজের সন্ত ান। ডলির মা'র মনে যে পুতুল খেলার স্মৃতি জাগরুক তার বর্ণনা ঃ "কিন্তু অন্য সব জিনিসের মত এই খেলার পিছনেও একটা কাহিনী আছে। খুঁজে দেখলে তার আদি পাওয়া যায়, যদিও অন্ত তার নাই। কত ঝড়ের রাতে এই খেলা ভেঙে পড়ার সম্ভাবনায় নির্জীব হয়ে গেছে, কিন্তু বাসন্তী জৌছনায় আবার তারা সাম্‌লে উঠেছে। প্রথম উদয়ের তখন বর্ণ-বৈচিত্র্যেও– ডলির মা'র মনে এখনো সেই সব কথা জাগে

ছবির মত.... মা'র আদর গালাগালির অভাব যার কোন দিন ছিল না, তার ছিল এক বাক্স পুতুল– রঙের বৈচিত্র্যেও এবং বেঁটে, মোটা, সরু, ঢ্যাঙ্গা আকৃতিতে পাড়ার মধ্যে তারা অতুলনীয়। তার নিজের প্রাণের চাইতে প্রিয়তর এই পুতুলগুলোকে সে হাতছাড়া কর্তে পার্ত্তনা একটা দিনের জন্যও। ওদের ঘুম পাড়াতে যেয়ে যে ঘুম-পাড়ানি সুর তার কণ্ঠে জেগে উঠল সে সুর এখনো থামেনি, কিন্তু এত আদরের কাঠের পুতুলগুলি একদিন ঢাকা পড়ে গেছে সেই সুরের আড়ালেই। পৃথিবীর বুকে তখন আর একটী রক্ত-মাংসের আগমন সম্ভাবনা।" বিবাহিত ডলির মা'র সেই রক্ত-মাংসের পুতুলই কন্যা ডলি। স্বামীহারা ডলির মা'র বেদনার মধ্যেও কন্যা ডলিই তার আনন্দের অবলম্বন ও উৎস, তার পুতুল-খেলাই মায়ের জন্যে শৈশবের স্মৃতি-জাগনিয়া। গল্পকারের ভাষায় ঃ "সে আনন্দ ডলি-জীবনের পরিবর্তিত পটভূমির নতুন পুতুল– তার বুকে আছে আনন্দ, মুখে আছে কথা।" গল্পের অন্যত্র "ডলি স্বপ্ন দেখে তার লাল পুতুলের। ডলির মা-ও স্বপ্ন দেখেন একটি পুতুলের– সে পুতুল ডলি। তাঁর ঘুমন্ত মুখে হাসি ফুটে ওঠে। সে হাসি দেখার কেউ সেখানে থাকে না। যদি তার চোখে দৃষ্টি থাকত, যদি থাকত ঘুমন্ত হাসি দেখবার চোখ ঝলসানো আলো, তবে ডলির পুতুল তার মাতামহীর (?) দুর্বোধ্য হাসি দেখে অবাক হয়ে যেত।" (পৃ. ৫৩)।

'প্রচ্ছন্ন নায়িকা' গল্পটি দীর্ঘায়ত পরিসরের গল্প এবং এটি কলকাতা মহানগরীর পটভূমিতে রচিত। 'প্রচ্ছন্ন নায়িকা' শিরোনামটিও তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে, এই গল্পে আপাতদৃষ্টিতে এবং কথাবার্তায় শুচিতা ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী এবং নারী-আন্দোলনের নেত্রী এক বৃদ্ধা মহিলার চরিত্রের নষ্ট ও জঘন্য দিক উন্মোচিত হয়েছে– যা সৎচরিত্রের অধিকারী, আদর্শবাদী এবং সমাজ-জাগরণের কর্মী তরুণ হারুনের মনে প্রচন্ড আঘাত হেনেছে। বর্ণনাত্মক এই গল্পটিতে হারুনের চারিত্র্যগত বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে এইভাবে ঃ "অনায়াসে বলা যায় যে, ওর-বয়সী সাধারণ তরুণদের সাথে হারুনের একটা পার্থক্য আছে। সে পার্থক্যটা কি তা সহজে ধরা যায় না। সহজ অবস্থায় হারুন অত্যন্ত মিশুক প্রকৃতির, অন্ততঃ তাই মনে হয়। কিন্তু আর একটা দিক আছে যেখানে হারুন অত্যন্ত ভাবপ্রবণ। তারুণ্যের প্রথম স্তর থেকেই হারুনের চরিত্র এই দুইয়ের বিপরীতমুখী স্বভাব দ্রুতগতিতে বেড়ে উঠেছে। তাই দিনের বেলায় সে অত্যন্ত সহজ ও মিশুক আর রাত্তিরে গভীর ভাবপ্রবণতার আবছায়ায় রহস্যময়।" কলকাতার নৈশনগরীতে ভ্রমণে অভ্যস্ত এবং অপমৃত্যুর হাত থেকে, বিকৃত জীবন থেকে মানুষকে বাঁচাতে আগ্রহী, দারিদ্র্যপীড়িত ও ভিক্ষুক শ্রেণীর মানুষের কল্যাণে উৎসুক আদর্শবাদী ও মানবকল্যাণকামী হারুন "জীবনের দিক দিয়ে হারুন বিশ্বাসঘাতক নয় এবং কারুর বঞ্চনা সইতে পারে না।... চারিদিককার অনাচারের সংবাদ তার বুকে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। আর সে নিজের অক্ষমতায় ঘরময় পায়চারি করে।" (পৃ. ৫৫)। এমন যে হারুন– সে বেকার। তার বন্ধু নকীবের

মাধ্যমে সমাজকল্যাণে ও মানুষের জীবনের উন্নয়নে নিবেদিতপ্রাণ বৃদ্ধ ওয়াজেদ সাহেবের সঙ্গে হারুনের পরিচয় ঘটে এবং ওয়াজেদ সাহেবই তাকে পরিচয় করিয়ে দেন নারী-উন্নয়ন ও কল্যাণ-সমিতির নেত্রী তথা সেক্রেটারি বৃদ্ধা সালমা সাহেবার সঙ্গে।

অল্পদিনেই হারুন সালমা সাহেবার ঘনিষ্ঠ এবং পুত্রবৎ হয়ে ওঠে। সালমা সাহেবা তাকে বুকে টেনে নেয়। কিন্তু ঘটনাচক্রে হারুন আবিষ্কার করে যে, সালমা সাহেবা চরিত্রহীনা, তার বাহ্যিক শুচিতা ও পবিত্রতার অন্তরালে রয়েছে প্রচ্ছন্ন নায়িকা এবং একাধিক জনের সঙ্গে দৈহিক মিলনে অভ্যস্ত চরিত্রহীনা এক মহিলা– যে পুনরায় বিবাহিতা হওয়া সত্ত্বেও, অন্যপুরুষের সঙ্গে সঙ্গমে অভ্যস্ত। হারুন আবিষ্কার করে যে, ওয়াজেদ সাহেবও মহিলার এই চরিত্র সম্পর্কে অবহিত। গল্পের প্রত্যেকটি চরিত্রের বহিরাঙ্গিক ও অন্তর্গত দিক ফররুখ আহমদ অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। সালমা বেগমের নায়িকাসুলভ ব্যবহার এবং চরিত্রহীনতার পরিচয় পাওয়ার পর আদর্শবাদী হারুনের মনের অবস্থা ঃ 'উহ'। হারুনের মুখ দিয়ে মাত্র একটি শব্দ বেরিয়ে এল। আর কিছু বলবার শক্তি তার নাই। দুই হাতের মধ্যে মাথা রেখে সে নিশ্চল হয়ে বসে আছে। বাইরের তপ্ত আকাশের মত তার মনের মধ্যে জ্বলন্ত অগ্নি-নৃত্য। এত ছলনাও মানুষ করতে পারে; মনে মনে একবার ভাবল। কি বিশ্রী এই মেয়ে মানুষটা।..." সালমা বেগমের ঘরে তাঁর বিছানায় একজন অচেনা পুরুষকে শুয়ে থাকতে দেখে হারুনের মানসিক অবস্থার বিবরণ: "হারুনের পায়ের রক্ত বিদ্যুতের বেগে ঘুরতে ঘুরতে মস্তিষ্কে উঠে এল যেন একটা রাইফেলের বুলেট ঘুরতে ঘুরতে তার হৃদপিণ্ডে ঢুকছে, দৃঢ় সবল বল্লমের মত ওর সমস্ত চেতনা এক মুহূর্তে জেগে উঠে নিমেষের মধ্যেই ভেঙে পড়ল। সমস্ত মুখে রক্তের ছায়াও নাই, যাদুঘরের মধ্যে রাখা আদি যুগের সরীসৃপের মত ওর ধূসর চেহারা। হারুন বুঝতে পারল, এখনি হয়তো তার হৃদপিন্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। অতি কষ্টে নীচে নেমে সে হাঁকল ঃ 'গাড়ী'। হারুন যে কি করে বাড়ি এসেছে তা সে নিজেই জানে না।" (পৃ. ৭৭)।

শুচিতা ও পবিত্রতার অন্তরালে কোনো মহিলার বা পুরুষের চরিত্রহীনতা, লাম্পট্য, কামুকতার এবং প্রতারণার পরিচয় পাওয়া গেলে যেকোনো চরিত্রবান ও নীতিবাদী মানুষের মনের অবস্থা হারুনের মনের অবস্থার মতোই হওয়া স্বাভাবিক। হারুনের চরিত্রে এবং তার চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্যে কবি ও গল্পকার– এবং আদর্শবাদী ও নৈতিকতার অধিকারী ফররুখ আহমদের চরিত্রের ও চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্যের সাযুজ্য লক্ষ্য ও অনুভব করা যায়। তাঁর কোনো কবিতায়– এমনকি প্রেমের কবিতায়ও অশ্লীলতার ছাপ নেই, ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধভিত্তিক কবিতায় তো নেই-ই। তাঁর সাহিত্য জীবনের এবং কর্মজীবনেরও বৃহত্তম কাল কেটেছে বিভাগ-পূর্বকালে

কলকাতা মহানগরীতে এবং পরবর্তীকালে ঢাকা মহানগরীতে। কিন্তু একজন আধুনিক কবি হওয়া সত্ত্বেও এবং নগর-জীবনের নানারূপ পঙ্কিল পরিবেশের মধ্যে না হলেও, এর পাশাপাশি অঞ্চলের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও ফররুখ আহমদ তাঁর রচনায় কোনোরূপ পঙ্কিলতা, অশ্লীলতা, কামুকতা এবং আদর্শহীনতাকে প্রশ্রয় দেননি। আলোচ্য গ্রন্থের অন্তর্গত 'মৃতবসুধা' ও ' প্রচ্ছন্ন নায়িকা' গল্পে। এমন কাহিনী এবং চরিত্র রয়েছে যা লাম্পট্য, কামুকতা ও চরিত্রহীনতার অধিকারী, এসবের পরিচায়ক ও প্রতীক। কিন্তু ফররুখ আহমদ এসব চরিত্রের উপস্থাপনায় ও বর্ণনায় আশ্চর্য সংযমের ও শুচিতার পরিচয় দিয়েছেন, অশ্লীল বর্ণনাকে কোথাও প্রশ্রয় দেননি।

ফররুখ আহমদের আলোচ্য গল্প-গ্রন্থের অন্তর্গত পাঁচটি গল্পই শিল্পোত্তীর্ণ এবং সৃজনশীল ক্ষমতার পরিচায়ক। একথা এ আলোচনার অন্যত্রও বলেছি, আবারও বলছি। পাঁচটি গল্পের কোনটি ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ গল্প তা নির্ণয় করা সহজ নয়। তবুও 'মৃতসুধা' এবং 'প্রচ্ছন্ন নায়িকা' গল্পদ্বয়কেই আমার কাছে শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়েছে– গল্প দু'টিতেই উপন্যাসের উপাদান রয়েছে। আব্দুল মান্নান সৈয়দের মতে, 'প্রচ্ছন্ন নায়িকা' ফররুখ আহমদের সবচেয়ে পরিণত ও শ্রেষ্ঠ গল্প। তাঁর সঙ্গে একমত পোষণ করা সত্ত্বেও, আমার মনে হয়েছে 'মৃতবসুধা' গল্পটিকেও সবচেয়ে পরিণত ও শ্রেষ্ঠ গল্প গণ্য করা যেতে পারে। সুধী পাঠক সমালোচকরা বিষয়টি ভেবে দেখতে পারেন।

---

**(ফররুখ একাডেমী পত্রিকা ১২তম সংখ্যা- অক্টোবর-২০০৫)**

# ফররুখ আহমদে মানবতাবাদের রূপায়ণ

মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্

ফররুখ আহমদ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক প্রতিভাধর কবি। চল্লিশের দশকে সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভাবের পর থেকে তিনি তাঁর বিপুল কাব্যসম্ভারে, বিচিত্র বিষয়, নানা আঙ্গিক ও রূপরীতিতে এবং ছন্দে ও নিজস্ব ভাষায় যে শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় রেখে গেছেন তা কবির সৃষ্টিক্ষমতা ও মৌলিক অবদানের পরিচয়বাহী। ফররুখ আহমদ ছিলেন রোমান্টিক মানস প্রবণতার অধিকারী এবং স্বপ্ন ও সৌন্দর্যবোধের রূপকার। পাশাপাশি তিনি ছিলেন বাস্তববাদী, সমাজসচেতন ও জীবনধর্মী। তিনি শিল্পের জন্য শিল্পনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি জীবনধর্মী শিল্পী হিসেবে আস্থাবান ছিলেন মানবতাবাদে। মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ও লাঞ্ছনা-দুর্গতির রূপকার। স্বদেশপ্রেম, প্রকৃতিপ্রেম, নিসর্গপ্রীতি ইত্যাদি বিষয়ে বহুসংখ্যক খণ্ড কবিতা রচনা করলেও তিনি শুধু এতেই পরিতৃপ্ত থাকেন নি, তিনি যে মানবতাবাদী কবি এবং মানুষের শোষণ, নির্যাতন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী তার পরিচয় রয়েছে কবির অসংখ্য দীর্ঘ ও খণ্ড কবিতায়।

ফররুখ আহমদ ইসলামী রেনেসাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার হিসেবে পরিচিত। তিনি মানবতাবাদী আদর্শের শিক্ষা, প্রেরণা ও নির্দেশনা নিয়েছেন মানবধর্ম এবং বিশ্বমানবতার মুক্তির সনদ পবিত্র ইসলাম ধর্ম থেকে। পবিত্র আল কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদিসের নির্দেশনার আলোকে তিনি মানবসেবায় অর্থাৎ নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের মুক্তির ব্যাপারে তাঁর কাব্যে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন এবং সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছেন। ফররুখ আহমদের এ মানবতাবাদী চিন্তাধারা এবং তাঁর কাব্যে তা রূপায়ণের একটি পটভূমি আছে।

চল্লিশের দশকে ব্রিটিশ পরাধীনতার যুগে সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভাবের সূচনা পর্বেই ফররুখ আহমদ মানবতাবাদী চিন্তা-চেতনার অধিকারী ছিলেন। তাঁর সে সময়ের কবিতায় এর পরিচয় রয়েছে। কিন্তু সেকালে তিনি কোনো বিশেষ আদর্শ-আশ্রিত মনোভাব থেকে মানবতাবাদী চিন্তা-চেতনার রূপায়ণ ঘটানিনি তাঁর কাব্যে, তবে কাব্য-সাধনার প্রাথমিক পর্বে তিনি ছিলেন অনেকটা বামপন্থী এবং রেডিক্যাল হিউম্যানিজমের অনুসারী। যদিও তাঁর কাব্যে এর কোনো সুস্পষ্ট পরিচয় নেই। সেকালে তিনি কলকাতায় অবস্থান করতেন এবং বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতা লিখতেন। তাঁর রচনায় তখন ছিল অনেকটা নাগরিক জীবনের এবং নাগরিকতার প্রভাব ও পরিচয়। মানবতাবাদী কবি হিসাবে তিনি সে সময়ে তাঁর রচনায় কী রূপ তুলে ধরেছেন তার পরিচয় দু-একটি কবিতার উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট হবে। লক্ষণীয় যে, সেকালেই তিনি শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের, বিশেষ করে

যারা কলকাতা মহানগরীতে বাস করতেন তাদের চিত্র তুলে ধরেছেন :

কাঁচড়াপাড়ায় রাত্রি। ডিপোতলে এঞ্জিন বিকল–
সুদীর্ঘ বিশ্রান্ত শ্বাস ফেলে জাগে ফাটা বয়লার,
–অবরুদ্ধ গতিবেগ। তারপর আসে মিস্ত্রিদল
গলানো ইস্পাত আনে, দৃঢ় অস্ত্র হানে বারবার।
জ্বলন্ত অগ্নির তাপে এইসব যন্ত্র জানোয়ার
দিন রাত্রি ঘোরেফেরে সুদুর্গম দেশে, সমতলে
সমান্তর, রেলে রেলে, সেতুপথ পার হয়ে আর
অভীষ্ট লক্ষ্যের পানে দার্জিলিঙে আসামে জঙ্গলে।

আহত সন্ধ্যায় তারা অবশেষে কাঁচড়াপাড়াতে।
দূরে নাগরিক আশা জ্বলে বাল্‌বে লাল-নীল-পীত;
উজ্জীবিত কামনার অগ্নিমোহ– অশান্ত ক্ষুধাতে;
কাঁচড়াপাড়ার কলে মিস্ত্রিদের নারীর সঙ্গীত।
(হাতুড়িও লক্ষ্যভ্রষ্ট) ম্লান চাঁদ কৃষ্ণপক্ষ রাতে
কাঁচড়াপাড়ায় জাগে নারী আর স্বপ্নের ইঙ্গিত ॥

**(কাঁচড়াপাড়ায় রাত্রি ; হে বন্য স্বপ্নেরা)**

এখানে মানুষ ছিল আজ শুধু প'ড়ে আছে শব।
গোধূলির অপূর্ণতা প্রভাতের কথা মনে আনে
এ গোধূলি শেষ কিনা এই কথা কেউ বলো জানে !
আজিকার এ গোধূলি ঊষার নির্মম পরাভব;
এখানে মানুষ ছিল আজ শুধু প'ড়ে আছে শব।
আমরা তো শববাহী যাত্রীদল চ'লেছি অশেষ,
এ শবের জীবাণুতে পান করি বিষাক্ত নিমেষ
শুনে যাব বেলাশেষে পিপাসার তৃপ্তিহীন রব।

**(সমাপ্তি : হে বন্য স্বপ্নেরা)**

যন্ত্রের গর্জন-শ্রান্ত তন্দ্রাতুর প্রেসম্যান দেখে
নতুন বিস্ময় এক : পথচারী আহত বুলেটে,
নির্ভীক জনতা চলে বারুদের বুকে পথ কেটে :
চলেছে শতাব্দীকাল যারা পথে ক্লান্তি-চিহ্ন রেখে
যৌবন-বন্যার মত আজ তারা এসেছে অনেকে,
আজ তারা প্রাণ পেল একসাথে কঠিন বুলেটে
আজ তারা প্রাণ পেল রক্তনীল তীক্ষ্ণ বেয়নেটে
রেখে গেল পথপ্রান্তে প্রাণবন্ত বলিষ্ঠ মৃত্যুকে...

**(প্রেসম্যান : হে বন্য স্বপ্নেরা)**

ফররুখ আহমদ শুধু নগরজীবনের সাধারণ মানুষের জীবনযন্ত্রণার আলেখ্যই তুলে ধরেননি, তিনি গ্রামবাংলার; বিশেষ করে পদ্মা-তীরবর্তী মানুষের দুঃখ-কষ্ট এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপন্ন অবস্থার এবং শোষণ-যন্ত্রণার মর্মন্তুদ আলেখ্যও তুলে ধরেছেন। একটি কবিতার অংশবিশেষ ঃ

তারপর বন্যা এলো মৃত্যু-বেগে পদ্মার ফাটলে
জ্বরাস্তব্ধ জীর্ণতটে জাগিল আকুল আর্তনাদ।
তীব্র সংগ্রামের বার্তা উঠে এল রুধিরাক্ত জলে
পদ্মার দু'তীর চূর্ণ করি দূরে চলিল নিষাদ।
দুঃস্থের দুর্বল বাধা মানিল না পদ্মা ও প্রকৃতি,
শোষণের পূর্ণ দেহ দেখা দিল পূর্ণ রূপ ধরি
সে কী আর্তনাদ, মৃত্যু, সংখ্যাহীন ক্ষুধিতের ভীতি
পদ্মার ভাঙনে এসে জমা হ'ল বুভুক্ষু শর্বরী :
ক্ষুধাশীর্ণ। জননীর সম্ভ্রম লুটালো ধূলিতলে,
শিশুর কান্নার বেগে শান্ত করি দিল মৃত্যু ঘুম।
নাগরিক আঘাতের বর্শা আর রুখিল না জলে
অগণন শবদেহে তুলিল সে মৃত্যুর মৌসুম।
নদীতে প্রশান্তি এল, থেমে গেল বন্যার প্রকোপ।
থামিল না সেই বর্শা– শোষকের মেদস্ফীত লোভ ॥

(পদ্মার ভাঙন : হে বন্য স্বপ্নেরা)

বন্যা ও নদী ভাঙনে নদীমাতৃক বাংলাদেশের মানুষের জীবনে যে দুঃখ-কষ্ট-দুর্গতি নেমে আসে এবং নিরাশ্রয় মানুষ কত সীমাহীন দুর্দশার সম্মুখীন হয়, তা বর্ণনা করার পর কবি উল্লেখ করেছেন, বন্যা চলে গেলেও শোষণের তীর দূর হয়নি– অর্থাৎ শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটেনি। ফররুখ আহমদের বহু কবিতাতেই সাধারণ মানুষের শোষণ-বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে কবির প্রতিবাদী কণ্ঠ উচ্চারিত হয়েছে। শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে ফররুখ আহমদের এ প্রতিবাদী মনোভাব তাঁর সমগ্রকাব্য-সত্তার এক অনিবার্য উপাদান। ক্ষুধিত-বঞ্চিত-নিপীড়িত মানুষের মর্মবেদনা কবি তাঁর সমগ্র সত্তা দিয়ে অনুভব করেছেন এবং তাঁর কাব্য-সাধনায় তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

কাব্য সাধনার প্রাথমিক পর্বেই ফররুখ আহমদ রূপক-উপমা-প্রতীকের ব্যবহার করেছেন। কেবল গতানুগতিকভাবে নয়, তাঁর প্রতীক ব্যবহারে তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। এখানে সাপের কবলে পড়ে মানুষের কান্নার আলেখ্য তিনি তুলে ধরেছেন সাপের প্রতীকে। কবিতাটির অংশবিশেষ :

সাপের কবলে প'ড়ে কাঁদে এক নির্জীব শিকার।
শেষ হ'য়ে এল তার
জীবন-পিপাসা।
মাথা ঠুকে মরে সে মাটিতে

সকল জীবন, স্বপ্ন, আলোকের মুক্ত অধিকার
বাতাসে-বাতাসে ভাসে ব্যর্থতার রোনাজারি ব্যর্থ হাহাকার।
এখানে সভয়ে দেখি আদমের সন্তানেরা
হ'ল কোটি মৃত্যুর শিকার,
কোটি আজদাহা-লোভ-কুণ্ডলীতে ক্ষয়মান দিগন্ত-কিনার
লীলাভূমি হ'ল জালিমের।

**(জালিম ও মজলুম : আজাদ করো পাকিস্তান)**

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মতো ফররুখ আহমদ বিশেষভাবে বিদ্রোহী কবি হিসাবে পরিচিত নন। কিন্তু তাঁর কবিতায়ও বিদ্রোহের বাণী অর্থাৎ বিদ্রোহের সম্ভাবনা ও প্রতিবাদী সুর উচ্চারিত হয়েছে :

শীতের হাওয়ায় কেঁপে এরা একদিন শেষ হয়ে যাবে।
যারা আজ ধরণীকে ছেয়ে আসন্ন শীতের রাত্রে উৎপীড়িত
অন্তিম হাওয়ায় বিছাতেছে হাড়ের বিছানা,
চিরদিন তারা সহিবে না অত্যাচার ও পাপের।
সমস্ত জীবন দিয়ে বসন্ত তাদের আসে অগ্নিচূড়ে
–আসন্ন শীতের প্রান্তর পারায়ে
হিংস্র প্রতিহিংসা নিপুণ সঙ্গিন বিদ্রোহের দিন।

(আসন্ন শীতে)

উপরোক্ত দু'টি উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট, ফররুখ আহমদ মানবসৃষ্ট ও প্রকৃতিসৃষ্ট দুর্যোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠে বক্তব্য উচ্চারণ করেছেন। তাঁর বিদ্রোহের বাণী নজরুলের মতো সরাসরি ও উচ্চকিত নয়, কিন্তু তাঁর কবিতার ভাব ও আবেদনে বিদ্রোহের সুর অনুরণিত– যা পাঠকের চিত্তে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তিনি একটি কবিতায় জনতাকে জাগানোর এবং অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন :

রাত্রির অগাধ বনে ঘোরে একা আদম-সূরাত
তীব্রতর দৃষ্টি মেলে তাকায় পৃথিবী :
জাগো জনতার আত্মা ! ওঠো, কথা কও,
কতোকাল আর তুমি ঘুমাবে নিসাড়
নিস্পন্দ, আকাশ ছেয়ে চলেছে যখন
নতুন জ্যোতিষ্ক-সৃষ্টি; তখনো তোমার
স্থবির নিশ্চল বুকে নাই কোনো প্রাণদণ্ড ইঙ্গিত
নাই অগ্নিকণা : নাই ধূমকেতু বেগ !
জনতার অপমৃত্যু বুকে নিয়ে পৃথিবী ঘুমায়,
শোষকের রক্ত জমে সমুদ্রের গভীর অতলে
অগ্নিকণা সৃষ্টি হয় নাকো !

কতোকাল ঘুমাবে একাকী ?
তোমার পাঞ্জার সাথে জালিমের শাণিত পাঞ্জার
হবে নাকি সুকঠিন প্রাণান্ত-প্রয়াস !
হবে নাকি বোঝাপড়া জীবন-মৃত্যুর!
হবে নাকি ব্যর্থতার চাপাকান্না
জেহাদের ঝড় সাইমুম :
জাগো জনতার আত্মা ! ওঠো, কথা কও!

**(রাত্রির অগাধ বনে : আজাদ করো পাকিস্তান)**

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহ যেসব কবিতা থেকে নেয়া হয়েছে, সেগুলো ফররুখের কবি জীবনের প্রাথমিক পর্বে রচিত। কিন্তু এসব কবিতায়ও এটা স্পষ্ট যে, ফররুখ আহমদ মানবতাবাদী কবি। তবে তখনো তাঁর স্বতন্ত্র কাব্য ভাষা গড়ে ওঠেনি, যদিও তাঁর কবিতার ভাষা ও গঠন খুবই আঁটসাঁট ও সুঠাম। বামপন্থা থেকে ইসলামী আদর্শের অনুসারী হওয়ার পর মানবতাবাদী কবি ফররুখ আহমদের কাব্যধারা ও কবিতার ভাষা আকস্মিকভাবে বদলে যায়। তিনি আরবি-ফার্সি সংবলিত এমন এক নিজস্ব কাব্য ভাষা তৈরি করেন যার হুবহু নমুনা অন্য কোনো কবির রচনায় পাওয়া যায় না। ফররুখ আহমদের পূর্বসূরি কবি এবং বিদ্রোহী ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কাব্যভাষায় প্রচুর আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা বাংলা কাব্যে নজরুলের এক সুস্পষ্ট ও স্বতন্ত্র কাব্য ভাষা নির্মিত হয়েছে। এ ভাষার বলিষ্ঠতা ও ওজস্বিতা বাংলা কাব্যে নজরুলের এক অসাধারণ অবদান। নজরুলের উত্তরসূরি ফররুখের আরবি-ফার্সি শব্দ সংবলিত কাব্য ভাষা নজরুলের ভাষা থেকে খানিকটা স্বতন্ত্র। ফররুখ তাঁর পূর্ববর্তী কবি নজরুলসহ প্রায় সব কবির কাব্য ভাষা বিশেষত মুসলিম শাসনামলে মুসলিম কবিদের রচিত পুঁথি সাহিত্যের ভাষা অধ্যয়ন, অধিকরণ ও স্বীকরণ করেছেন। তারপর সবকিছু আত্মস্থ করে নিজস্ব স্বতন্ত্র কাব্যভাষা তৈরি করেছেন। উদাহরণ হিসেবে তাঁর কবিতা থেকে তাঁর কাব্যভাষার সামান্য উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো :

কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ,
শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ,
পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ ব'য়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক;
নতুন পানিতে সফর এবার, হে মাঝি সিন্দবাদ !

**(সিন্দবাদ : সাত সাগরের মাঝি)**

সমুদ্র থেকে সমুদ্রে ঘোরে দরিয়ার সাদা তাজী !
খুরের হল্‌কা,- ধারালো দাঁড়ের আঘাতে ফুল্‌কী জ্বলে
সমুদ্র থেকে সমুদ্রে ঘোরে দরিয়ার সাদা তাজী...
কেশর ফোলানো পালে লাগে হাওয়া, মাস্তুলে দোলে চাঁদ,
তারার আগুনে পথ বেছে নেয় স্বপ্নেরা সারারাত,

....     ....     ....

তুফানের মাঠ পাড়ি দেওয়া তার একী দুরন্ত নেশা।
দাঁড়ের আঘাতে জিঞ্জিরে তার নীল নেশা ওঠে বাজি
আমাদের মনে দরিয়ার মওতা !
কোথায় উল্কা ছুটেছে মাতাল তাজী ?

(বা'র দরিয়ায় : সাত সাগরের মাঝি)

পূর্বাচলের দিগন্ত নীলে সে জাগে শাহানশাহের মত
তার স্বাক্ষর বাতাসের আগে ওড়ে নীলাভ্রে অনবরত।
ঘুম ভাঙলো কি হে আলোর পাখী ? মহানীলিমায় ভ্রাম্যমাণ
রাত্রি-রুদ্ধ কণ্ঠ হ'তে কি ঝ'রবে এবার দিনের গান ?
এবার কি সুর ঘন অশ্রুর কারা তট থেকে প্রশান্তির ?
এবার সে কোন আলোর স্বপ্নে তাকাবে ক্ষুব্ধ প্রলয় নীর ?
এ বোবা বধির আকাশে এবার ভুলবে কি তার নীরবতাকে
সেই মুসাফির সুদূরচারীর সুগভীর সুরে দরদী ডাকে ?

ঐ আসে আসে সেই বিহঙ্গ সাতরঙা তার শ্বেত পাখায়,
আকাশের বুক ঘন হ'য়ে ওঠে নীল মরকত স্বচ্ছতায়,
সোনালী আলোয় শ্বাপদ রাত্রি আহত, লুপ্ত নিমেষ মাঝে;
থির-বিদ্যুৎ আভা তরঙ্গ আলোকের সুর আকাশে বাজে।

(সিরাজাম মুনীরা মুহম্মদ মুস্তফা : সিরাজাম মুনীরা)

ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি', 'সিরাজাম মুনীরা' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ থেকে কবিতার বহু উদ্ধৃতি দিয়ে ফররুখের কাব্যভাষার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা যেতে পারে। এ স্বল্পপরিসরে তা সম্ভব নয়। তবে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে, বাংলা সাহিত্যে ইসলামী রেনেসাঁর শ্রেষ্ঠতম রূপকার বিদ্রোহী ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের পর ফররুখ আহমদই ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের সার্থক রূপকার। সাত সাগরের মাঝি কাব্যগ্রন্থে ফররুখ আহমদ মানবতাবাদের অনেক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন। উদাহরণস্বরূপ নিচে কয়েকটি পঙক্তি তুলে ধরেছি:

আমি দেখি পথের দুধারে ক্ষুধিত শিশুর শব,
আমি দেখি পাশে পাশে উপচিয়া পড়ে যায় ধনিকের গর্বিত আসব,
আমি দেখি কৃষাণের দুয়ারে দুর্ভিক্ষ বিভীষিকা,
আমি দেখি লাঞ্ছিতের ললাটে জ্বলিছে শুধু অপমান টিকা,
গর্বিতের পরিহাসে মানুষ হ'য়েছে দাস,
নারী হ'ল লুণ্ঠিতা গণিকা।

(আউলাদ : সাত সাগরের মাঝি )

ফররুখ আহমদ বাংলা ১৩৫০ (ইংরাজি ১৯৪৩) সনে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে অসংখ্য

মানুষের মৃত্যুর মর্মন্তুদ দৃশ্য অবলোকন করে তাঁর বিখ্যাত 'লাশ', 'আউলাদ' ইত্যাদি বহু কবিতা লিখেছেন। এসব কবিতায় মানবতাবাদী কবির মর্মবেদনা প্রকাশ পেয়েছে:

যেখানে প্রশস্ত পথ ঘুরে গেল মোড়,
কালো পিচঢালা রঙে লাগে নাই ধূলির আঁচড়,
সেখানে পথের পাশে মুখ গুঁজে পড়ে আছে জমিনের 'পর;
সন্ধ্যার জনতা জানি কোন দিন রাখে না সে মৃতের খবর।
জানি মানুষের লাশ মুখ গুঁজে পড়ে আছে ধরণীর পর,
ক্ষুধিত অসাড় তনু বত্রিশ নাড়ীর তাপে প'ড়ে আছে নিসাড় নিথর,
পাশ দিয়ে চ'লে যায় সজ্জিত পিশাচ, নারী নর
—পাথরের ঘর,
মৃত্যু কারাগার,
সজ্জিতা নিপুণা নটী বারাঙ্গনা খুলিয়াছে দ্বার
মধুর ভাষণে,
পৃথিবী চষিছে কারা শোষণে, শাসনে
সাক্ষ্য তার রাজপথে জমিনের 'পর
সাড়ে তিন হাত হাড় রচিতেছে মানুষের অন্তিম কবর।

প'ড়ে আছে মৃত মানবতা
তারি সাথে পথে মুখ গুঁজে।

**(লাশ : সাত সাগরের মাঝি)**

বাংলা ১৩৫০ সনের দুর্ভিক্ষ কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছিল না, এটা ছিল মানবসৃষ্ট বিপর্যয়। বিদেশী শাসক ও স্বদেশী শোষকেরা ছিল এ বিপর্যয়ের মূলে। কৃত্রিম খাদ্যসঙ্কট সৃষ্টি করে এবং খাদ্যদ্রব্যের দাম অসম্ভব বাড়িয়ে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির মাধ্যমে অসংখ্য লোককে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া হয়। এখানে সাম্রাজ্যবাদ ও ধনবাদী অপশক্তির মানবতা-বিরোধী চক্রান্তের বিরুদ্ধে ফররুখ আহমদের প্রতিবাদী কণ্ঠ সোচ্চারিত হয়েছে :

হে জড় সভ্যতা!
মৃত্যু-সভ্যতার দাস স্ফীতমেদ শোষক সমাজ !
মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ;
তারপর আসিলে সময়
বিশ্বময়
তোমার শৃঙ্খলগত মাংসপিণ্ডে পদাঘাত হানি
নিয়ে যাব জাহান্নাম দ্বার-প্রান্তে টানি;
আজ এই উৎপীড়িত মৃত্যু-দীর্ণ নিখিলের অভিশাপ বও;
ধ্বংস হও
তুমি ধ্বংস হও ॥

(লাশ : সাত সাগরের মাঝি)

ইসলামী রেনেসাঁর রূপকার হিসেবে খ্যাত ফররুখ আহমদের এসব মানবতাবাদী কবিতা আলোচনায় খুব বেশি উল্লেখিত হয় না। আলোচকরা ভুলে যান যে, ইসলাম মানবতার ধর্ম এবং বিশ্বমানবের ইহলোক ও পারলৌকিক জীবনে উন্নতি, সমৃদ্ধি ও মুক্তির পথনির্দেশ রয়েছে ইসলামে। ইসলাম শোষণ-বঞ্চনা, অত্যাচার-নিপীড়ন, লুণ্ঠন-হত্যা ইত্যাদির সম্পূর্ণ বিরোধী। ইসলামই শান্তি, সাম্য ও মানবকল্যাণের ধর্ম। ইসলামে বিশ্বাসী কবি ফররুখ আহমদ এ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই মানবতার সপক্ষে এবং অমানবিকতার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ হাতে কলম ধরেছেন। শুধু সাত সাগরের মাঝি, সিরাজাম মুনীরা কাব্যগ্রন্থেই নয়, তিনি অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ এবং কবিতায় মানবতাবাদকে সর্বোচ্চে তুলে ধরেছেন এবং অত্যাচার-নিপীড়ন ও শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। ফররুখ আহমদ ইসলামের পুনর্জাগরণ এবং সর্বমানবের কল্যাণ কামনা করেছেন। সব ধরনের অত্যাচার-নিপীড়ন, শোষণ-বঞ্চনা ও অমানবিকতার বিরুদ্ধে কবি সর্বদা সোচ্চার। ফররুখ আহমদ ছিলেন একজন আধুনিক মনোভাবাপন্ন এবং যুগ-সচেতন মানবতাবাদী কবি এবং তাঁর সমগ্র কাব্য-কবিতায় এ মানবতার অকৃত্রিম বাণী সর্বত্র অনুরণিত। তাই তিনি মূলত একজন আধুনিক কবি এবং তাঁর কাব্য মানবতার মুক্তি ও কল্যাণে সর্বাতোভাবে সমর্পিত– যা একজন মহৎ ও শ্রেষ্ঠ কবির প্রকৃত পরিচয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ফররুখের কাব্যালোচনায় তাঁর এ দিকটি তেমনভাবে উল্লেখ করা হয় না।

আধুনিক কবিরা সাধারণত রূপক ও প্রতীক ব্যবহারে অতিশয় সচেতন। ফররুখ আহমদ এক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম নন। তাঁর কবিতায় রূপক-উপমা-প্রতীকের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্যযোগ্য। এক্ষেত্রেও তাঁর স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ সাত সাগরের মাঝিকে তিনি মুসলিম নবজাগরণের দিশারী হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর হাবেদা মরুর কাহিনী কাব্যগ্রন্থে তিনি এভাবে লিখেছেন :

কিন্তু এখানে,
এখানে এই অমিল, ছন্দহীন প্রাণের পৃথিবীতে,
কাঁকর-বিছানো মাঠে,
বালু-রুক্ষ বিয়াবানে
আমাদের দিন কেটে যায়
হাবেদা মরু মাঠের
বাতাসের দীর্ঘশ্বাস শুনে...
(এক : হাবেদা মরুর কাহিনী)

তিনি আরো লিখেছেন ঃ

যেন বঞ্চিত বনি আদমের এই দীর্ঘশ্বাস
রূপ নিতে পারে শান্তির প্রশ্বাসে,
যেন এই তৃষ্ণাতপ্ত হাবেদার মরু মাঠ

আবার হতে পারে
সুন্দর শান্তিময় মাটির জান্নাত
দুনিয়ার সকল মানুষের জন্যে
দুনিয়ার সকল মানবীর জন্যে ॥
(**উনপঞ্চাশ : হাবেদা মরুর কাহিনী**)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট যে, মানবতাবাদী কবি ফররুখ আহমদ শুধু মুসলমানদের শান্তি ও কল্যাণ কামনা করেননি, তিনি সর্বমানবের শান্তি-কল্যাণ কামনা করেছেন। শুধু হাবেদা মরুর কাহিনী গ্রন্থেই নয়, তার রচিত মহাকাব্য হাতেম তা'য়ী গ্রন্থে এবং কাব্য নাটক নওফেল ও হাতেম গ্রন্থেও তিনি সর্বমানবের শান্তি ও কল্যাণ কামনা করেছেন। হাতেম তা'য়ীর জবানিতে লিখেছেন :

ঘুরেছি অনেক দেশ, বহু মাঠ, অরণ্য পাহাড়
পার হয়ে গেছি, আর ভাগ্যবলে পেয়েছি সাক্ষাৎ
বিভোর, নিভৃত কক্ষে জ্বলে যে আলোক অনির্বাণ
নিঃশেষে ছড়িয়ে দেয় পৃথিবীর মানুষের তরে।
কিন্তু যে মহান কর্মী চলে ঈমানের দীপ্তি নিয়ে,
যার প্রেমে, মহত্ত্বতে প্রাণ পায়,
বঞ্চিত জীবন পায় সে সাফল্য খুঁজে।
এই দোয়া করি তাই করিতা'লা আল্লাহর দরবারে
তোমাদের জিন্দেগিতে প্রেম যেন হয় অগ্রগামী
সর্বক্ষণ, জান্নাতের ছবি যেন জাগে পৃথিবীতে,
খালেস খিদমত পাক তোমাদের হাতে মুক্ত প্রাণ
আল্লাহর পিয়ারা সৃষ্টি আশরাফুল মখলুক ইনসান।

ফররুখ আহমদ তার কাব্যনাটক নওফেল ও হাতেমে হাতেম তা'য়ীর কাছে পরাভূত নওফেলের উক্তিতে হাতেমকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন :

দিয়ে যাও মহৎ প্রেরণা
প্রেমহীন সুমহান আদর্শের পথে।

ফররুখ আহমদ হাতেম তায়ীর মুখে ফুটিয়েছেন এ কামনা–

প্রত্যেক মানুষ যেন হয় প্রজ্ঞাবান ইনসানে কামিল,
মজলুম পায় যেন বাঁচার অকুণ্ঠ অধিকার

ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি' এবং তাঁর মহাকাব্য 'হাতেম তা'য়ী' শ্রেষ্ঠ রচনা বলে অনেক কাব্য সমালোচকের অভিমত। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' সমধিক আলোচিত। যদিও তাঁর অন্যান্য কাব্যগন্থে অনেক উন্নত মানের ও মানবতাবাদী ভাবধারার অনেক কবিতা রয়েছে, সেগুলোরও আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক প্রতিভা ফররুখ আহমদের এসব সৃষ্টকর্ম সম্পর্কে তেমন আলোচনা হয় না। একজন

কবিকে জানতে হলে তার সব রচনাই পঠিত এবং আলোচিত হওয়া দরকার। মনে রাখা প্রয়োজন, প্রত্যেক বড় কবিই নিজের ধর্ম, ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি ইত্যাদি উপাদান নিয়ে কাব্য রচনা করেন।

ফররুখ আহমদও তা-ই করেছেন। একথা মনে রেখেই কবিতা তথা সাহিত্যের আলোচনা হওয়া উচিত। কবির সৃষ্টি শিল্পরূপে এবং গুণগত উৎকর্ষে উত্তীর্ণ, আকর্ষণীয় ও আবেদনশীল হয়েছে কি না সেটাই বড় কথা। সাহিত্যের ইতিহাসে যেমন ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় নিয়ে অনেক উন্নত মানের রচনা হয়েছে তেমনি ধর্মীয় আদর্শ ও শিক্ষাকে কেন্দ্র করেও অনেক উন্নত মানের কাব্য ও সাহিত্য রচিত হয়েছে। লেখক, কবি ও সাহিত্যিক কতটা আধুনিক মনোভাবাপন্ন, সর্বমানবের কল্যাণকামী সেটাই বড় কথা।

ফররুখ আহমদ তাঁর সাত সাগরের মাঝি কাব্যগ্রন্থে প্রতীকের আশ্রয় নিয়ে ইসলাম ও মুসলিম পুনর্জাগরণের কথা বলেছেন, কোথাও সরাসরি ইসলামের কথা বলেন নি। যদিও মুসলিম রেনেসাঁ ও মানবতাবাদের নবজাগরণই তাঁর লক্ষ্য। সাত সাগরের মাঝিতে তিনি কবিতার মাধ্যমে বলেছেন :

এখানে এখন রাত্রি এসেছে নেমে,
তবু দেখা যায় দূরে বহু দূরে হেরার রাজ-তোরণ,
এখানে এখন প্রবল ক্ষুধায় মানুষ উঠছে কেঁপে,
এখানে এখন অজস্র ধারা উঠছে দু'চোখ ছেপে
তবু দেখা যায় দূরে বহুদূরে হেরার রাজ-তোরণ...
**(সাত সাগরের মাঝি : সাত সাগরের মাঝি)**

এখানে 'হেরার রাজতোরণ' পাঠ করে যেমন স্বতই ইসলামের কথা অনুধাবন করা যায় তেমনি 'এখানে এখন প্রবল ক্ষুধায় মানুষ উঠছে কেঁপে' পাঠ করে মানবতাবাদী আদর্শের প্রতিফলন অনুভব করা যায়। ফররুখ আহমদ তাঁর অসাধারণ কাব্যকৌশলে এ দু'য়ের চমৎকার সম্মিলন ঘটিয়েছেন। কবির কাব্যাদর্শ ও মানবতাবাদ এক সমান্তরাল ধারায় মিলিত হয়েছে। এখানেই কবির মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব। ❐

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, **ঊনবিংশ সংখ্যা, জুন ২০১০**]

# ফররুখের স্বাতন্ত্র্য ও বিষয় বৈচিত্র্য

## মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্

ফররুখ আহমদ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক প্রতিভাধর কবি। রবীন্দ্র ও নজরুল-উত্তর যুগে ১৯৪০-এর দশকে এই প্রতিভাবান কবি তাঁর সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার অবদানে বাংলা কাব্য-সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছেন। দীর্ঘকালের কাব্যসাধনায় তিনি শুধু অসংখ্য কবিতা, কাব্যগীতি এবং বহু কাব্যগ্রন্থই রচনা করেন নি, তার রচিত বিভিন্ন আঙ্গিকের নানা ছন্দের এবং স্বাতন্ত্র্যধর্মী কাব্যভাষা সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি তাঁর শক্তি, স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। ফররুখ আহমদ অর্ধশতাধিক কাব্যগ্রন্থ রচনা করলেও তাঁর সম্পর্কে এবং বাংলা কাব্যে তাঁর অবদান সম্পর্কে আলোচনায় মাত্র কয়েকটি গ্রন্থই উল্লিখিত হয়ে থাকে। গ্রন্থগুলো হলো– তাঁর সুবিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ– 'সাত সাগরের মাঝি', 'সিরাজাম মুনীরা', কাব্যনাটক– 'নৌফেল ও হাতেম', মহাকাব্য– 'হাতেম তা'য়ী' ইত্যাদি। ফররুখ আহমদ শুধু বড়দের কবিই নন, তিনি শিশু-কিশোরদের উপযোগী বহু কবিতা এবং কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। এসব রচনা ও গ্রন্থাদি তাঁর সম্পর্কিত আলোচনায় খুব কমই উল্লিখিত হয়ে থাকে।

সবিনয়ে নিবেদন করছি, স্থানস্বল্পতার কারণে আমার বর্তমান আলোচনায়ও সমগ্র ফররুখ কাব্য নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে সুধী পাঠ সমাজের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, আমার রচিত 'বাংলা কাব্যে ফররুখ আহমদ তাঁর শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ' শীর্ষক গ্রন্থে ফররুখ কাব্যের বিচিত্র বিষয় ও দিক নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা হয়েছে। ফররুখ আহমদও তাঁর কবিতা সম্পর্কে আরো যারা গ্রন্থও প্রবন্ধ, নিবন্ধ লিখেছেন তাদের রচনায়ও ফররুখ কাব্যের ও তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে ফররুখ আহমদ বাংলা কাব্যে যে অনন্যসাধারণ অবদান রেখেছেন, সে তুলনায় তাঁর সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণা গ্রন্থের সংখ্যা নিতান্তই কম। যদিও ব্রিটিশ আমল থেকেই চল্লিশের দশকের এই কবির প্রতিভা ও কাব্যক্ষেত্রে তাঁর অবদান সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ, নিবন্ধরূপে অনেক লেখা প্রকাশিত হয়ে আসছে।

উপরিউক্ত কথাগুলো বলতে হলো এ কারণে যে, একজন কবিকে গভীরভাবে জানতে হলে এবং তাঁর প্রতিভার ও সৃষ্টিকর্মের যথাযথ মূল্যায়নের জন্য তাঁর রচনা তথা কবিতাবলি যত বেশি পাঠ করা যায় ততই উত্তম।

শুরুতেই বলেছি ফররুখ আহমদ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক প্রতিভাধর কবি। সে সময়ে ফররুখ আহমদ ছিলেন কলকাতা মহানগরীর বাসিন্দা এবং কিছুটা বামপন্থার অনুসারী। বাস্তব কারণেই নাগরিক পরিবেশ এবং ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী ভাবধারা তাঁর কবিতায় পরোক্ষভাবে হলেও রূপ লাভ করে। সেকালে

রচিত তাঁর বহু কবিতা ব্রিটিশ আমলে তো বটেই, সাবেক পাকিস্তান আমলেও অগ্রন্থিত থেকে যায়। তবে স্বাধীনতার পর ১৯৭৬ সালে প্রখ্যাত কবি ও শিক্ষাবিদ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর সম্পাদনায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'হে বন্য স্বপ্নেরা'। সম্পাদক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী গ্রন্থের ভূমিকায় লেখেন–

"প্রথম পর্বের কবিতার মধ্যেই ধরা পড়েছে ফররুখের কাব্যে, যা পরবর্তীকালে একটা স্থায়ী লক্ষণ হিসেবে দেখা যায়- নির্মিতির দিকে ঝোঁক, বলিষ্ঠ উচ্চারণের দিকে প্রবণতা এবং কল্পনার দূরচারিতা। এই পর্বেই তিনি সনেটের আঙ্গিক আত্মস্থ করেছেন।...'হে বন্য স্বপ্নেরা' কবিতাগুচ্ছ ভাবনাগত ঐক্য এদের রোমান্টিকতায়।... ফররুখ এই রোমান্টিকতার মধ্যে ইতিমধ্যেই জীবন সম্বন্ধে এক গভীর কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার সুর সংযোজন করেছেন।"

উল্লেখযোগ্য যে, ফররুখ আহমদের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' ১৯৪৪ সালে কলকাতা থেকে, দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'আজাদ কর পাকিস্তান' ১৯৪৬ সালে কলকাতা থেকে এবং তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সিরাজাম মুনীরা' ১৯৫২ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এ তিনটি গ্রন্থের অন্তর্গত কবিতাবলীর সমসাময়িক কালের রচিত অন্যান্য কবিতা পাণ্ডুলিপি 'কাফেলা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালের জুন মাসে ঢাকা থেকে। আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত 'কাফেলা' গ্রন্থের ভূমিকায় আমি লিখেছি- বিভাগ-পূর্বকালে, ফররুখ আহমদের কাব্য রচনায় (১৯৪৭ পূর্বে) প্রকাশিত হলে হয়তো এর কবিতাসূচি অনেকটা অন্যরকম হতো এবং বিভাগ-পরবর্তীকালে লেখা অনেক কবিতাই এর অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ মিলত না; ফলে ফররুখ আহমদ তাঁর স্বদেশের মাটিতে, ইতিহাস-ঐতিহ্যের ভিতে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশেও যে গভীরভাবে নোঙর বেঁধে রেখেছিলেন তা এ গ্রন্থের অনেক কবিতা পড়ে নতুনভাবে উপলব্ধি করার ও অনুভবের সুযোগও মিলত না। এ সম্পর্কে ফররুখ আহমদও ছিলেন সচেতন, তিনি পাণ্ডুলিপির ভূমিকায় এক স্থানে লিখেছেন, "আমার বক্তব্য এই যে, পরবর্তী সময়ের আজাদী-উত্তর যুগের (১৯৪৭-এর দেশ ভাগের পরবর্তী সময়ের) অনেক কবিতা ও গান এই বইয়ে সঙ্কলিত হয়েছে, পঁচিশ বছর আগে 'কাফেলা' প্রকাশিত হলে যা হতো না (১৯৬৭)।"

এদিক থেকে বর্তমান গ্রন্থের বিলম্বিত প্রকাশও অনেকটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। দুঃখ শুধু এই, কবি স্বয়ং তাঁর প্রিয় পাণ্ডুলিপি 'কাফেলা'র গ্রন্থরূপ দেখে যেতে পারলেন না। ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি' এবং 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্যগ্রন্থ পাঠ করে যারা তাকে কেবলই ইসলামী রেনেসাঁর রূপকার এবং আরবি, ফারসি শব্দ সংবলিত কাব্য ভাষার স্রষ্টা মনে করেন এবং এমন ধারণা করেন যে, তিনি শুধু আরব, ইরান, তুরানের দিকে তাকিয়ে থাকেন, তারা 'কাফেলা', 'মুহূর্তের কবিতা', 'হে বন্য স্বপ্নেরা' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ পাঠ করলে উপলব্ধি করতে পারবেন যে ফররুখ আহমদ তাঁর কাব্য সাধনার প্রাথমিককাল থেকেই একজন মহৎ মানবতাবাদী কবি এবং তাঁর স্বদেশপ্রেম, স্বজাতি প্রেম, মাতৃভাষা প্রীতি ও শোষিত-বঞ্চিত,

নির্যাতিত এবং ক্ষুধাতুর মানুষের প্রতি মমত্ববোধ কত গভীর। মানবধর্ম ইসলামের অনুসারী এই কবি গোড়া থেকেই ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, তিনি ইসলামী সাম্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষে মানুষে ভেদ-বৈষম্য ও শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর কাব্য সাধনার প্রাথমিক পর্বে রচিত একটি কবিতার অংশবিশেষ :

"এখানে শিশুর কান্না-ক্ষুধাতুর আগ্নেয় প্রান্তরে
মানুষের অপমৃত্যু এ রাত্রির শংকিত প্রহরে।
বাঁকা শিরদাঁড়া, ম্লান, মানুষের শিয়রে পাথর।
পথে পথে বাঁধা পড়ে। পলাতক সে ভগ্ন মিছিল
দেখে দ্বার রুধিয়াছে বহুদিন আগে এ নিখিল
তাহাদেরি অত্যাচারে। তারপর অদ্ভুত জনতা
মুখ গুঁজে পড়ে আছে শুধু ওঠে অশ্রু-আকুলতা
কণ্ঠতট চেপে ধরা শব্দহীন দুর্বোধ্য ভাষাতে
রাত্রি নেমে এ প্রান্তরে ক্রমাগত আশংকার সাথে,
দুর্ভেদ্য নিবিড় তার অন্তস্থল নাহি যার দেখা,
সূচী-চিহ্নহীন সেই তিমিরের, শেষ তটরেখা
শুধু দূরে সরে যায়; অবিরাম হেথা আর্তস্বর;
বাঁকা শিরদাঁড়া, ম্লান, মানুষের শিয়রে পাথর।

**(হে বন্য স্বপ্নেরা)**

ফররুখ আহমদ তাঁর 'কাব্য সাধনার পথ' শীর্ষক কবিতার উচ্চারণ করেছিলেন :

"যে পথের ধূলি মাঝে' পতাকা সাম্যের
উঠায়াছে ঊর্ধ্ব শির, সে-পথে আমার
জীবন আর যে পথে আমার
সমাপ্তি মৃত্যুর সেই পথে ধূলির
আমন্ত্রণ শুনি আমি প্রত্যেক অণুতে,
প্রতি পরামাণু মাঝে করি অনুভব
সে-পথের সজীবতা, সে জীবন্ত ধূলি
আমাকে টানিয়া নেয় দূর হতে দূরে
চেংগিসের উদ্দামতা সীমানা হারায়ে
এসে সে-পথের টানে : মাঝি সিন্দবাদ
সে-পথের রেখা ধরি করে অভিযান।"

এই নিবন্ধে উদ্ধৃত কবিতাগুলোর অংশবিশেষ থেকে এবং ফররুখ আহমদের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের কবিতা পাঠ করলে অনুধাবন করা যাবে যে, তিনি তাঁর কবিতা রচনায় কত ধরনের আঙ্গিক, ছন্দ এবং রূপরীতির ব্যবহার করেছেন। ফররুখ আহমদ

ছিলেন ছন্দনিপুণ কবি, অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ও অমিত্রাক্ষর এবং গদ্যছন্দেও তিনি লিখেছেন বিচিত্র বিষয়ে অসংখ্য কবিতা। তাঁর হাতে সৃজিত হয়েছে খণ্ড কবিতা, দীর্ঘ কবিতা, সনেট বা চতুর্দশপদী, ব্যঙ্গ কবিতা, শিশুতোষ কবিতা, কাহিনী কাব্য, নাট্যকাব্য ও মহাকাব্য। তিনি মহাকাব্যে শুধু অমিত্রাক্ষর ছন্দই ব্যবহার করেন নি, মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দও ব্যবহার করেছেন। তাঁর রচিত কাব্যনাট্য 'নৌফেল ও হাতেম' মহাকাব্য 'হাতেম তা'য়ী', 'মানুষ ও ইবলিশ', 'মির্জাফরের কইফিয়ত' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ পাঠ করলে তাঁর ছন্দ দক্ষতার এবং আঙ্গিক বৈচিত্র্য সৃষ্টির পরিচয় মিলবে। শিশু-কিশোর কবিতা রচনাতেও তিনি বৈচিত্র্য সৃষ্টির এবং ছন্দনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর স্বাক্ষর রয়েছে শিশু-কিশোরদের জন্য রচিত বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে। আগেই বলেছি, ফররুখ আহমদের কবিতা এত বিপুল এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ যে, তা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানো স্বল্প পরিসর প্রবন্ধে অসম্ভব।

আমরা জানি এবং সমজদার পাঠকরাও জানেন 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থই ফররুখ আহমদের সর্বাধিক পঠিত এবং আলোচিত গ্রন্থ। উল্লেখযোগ্য যে, 'সাত সাগরের মাঝি' শীর্ষক কবিতাতে ইসলামী রেনেসাঁর রূপকার ফররুখ আহমদ তাঁর কাব্যভাষায় মুসলিম সমাজ জীবনে প্রচলিত আরবি ও ফারসি শব্দ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেন। বাংলা সাহিত্যে ইসলামী রেনেসাঁর শ্রেষ্ঠতম রূপকার বিদ্রোহী ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর ইসলামী আদর্শ ঐতিহ্যভিত্তিক কবিতা ও গানে প্রচুর পরিমাণে আরবি ও ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন। নজরুলের পর ফররুখ আহমদের মতো আর কোনো কবি সম্ভবত আরবি ও ফারসি শব্দ এমন দক্ষতার সাথে ব্যবহার করেন নি বা করতে পারেন নি। উল্লেখ্য যে, 'সাত সাগরের মাঝি' শীর্ষক অনন্য সাধারণ কবিতার কাহিনী নেয়া হয়েছে আরব্য উপন্যাসের সিন্দাবাদের কাহিনী থেকে। ফররুখ আহমদের কাব্যে সিন্দবাদ নামে একটি কবিতাও রয়েছে। 'সাত সাগরের মাঝি' মুসলিম জাগরণ ও ইসলামী রেনেসাঁর প্রতীক। নাবিক সিন্দবাদ ফেনোত্তালসমুদ্র পাড়ি দিয়ে নানা ঝড়-ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে লক্ষ্যে পৌঁছাবে অর্থাৎ তার উদ্দিষ্ট স্থানে তথা 'হেরার রাজতোরণে' সমবেষ্টিত হবে এটাই প্রতীকী বক্তব্য।

মানবতাবাদী ফররুখ আহমদ আলোচ্য কবিতায় সরাসরি ইসলামের কথা বলেন নি এবং প্রতীকের মাধ্যমে তাঁর আদর্শের এবং লক্ষ্যের কথা বলেছেন। 'হেরার রাজতোরণ' কথাটা দিয়েই ইসলামের কথা বলা হয়েছে। যেমন :

"এখানে এখন রাত্রি এসেছে নেমে,
তবু দেখা যায় দূরে বহু দূরে হেরার রাজতোরণ
এখানে এখন অজস্রধারা উঠেছে দু'চোখ ছেপে
তবু দেখা যায় দূরে বহু দূরে হেরার রাজতোরণ।"

ফররুখ আহমদের আরবি ও ফারসি শব্দ ব্যবহার যে নজরুলের আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার থেকে অনেকটা ভিন্নধর্মী তা ফররুখের কবিতা থেকে কয়েকটি পঙক্তির

উদ্ধৃতি দিলেই বোঝা যাবে।

"কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ,
শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক;
ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ,
পাহাড় বুলন্দ ঢেউ বয়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক;
নতুন পানিতে সফর এবার, হে মাঝি সিন্দবাদ।

**(সিন্দবাদঃ সাত সাগরের মাঝি)**

সমুদ্র থেকে সমুদ্রে ঘোরে দরিয়ার শাদা তাজী।
খুরের হল্‌কা ধারালো দাঁড়ের আঘাতে ফুলকি জ্বলে,
সমুদ্র থেকে সমুদ্রে ঘোরে দরিয়ার শাদা তাজী
কেশর ফোলানো পালে লাগে হাওয়া, মাস্তুলে দোলে চাঁদ,
তারার আগুনে পথ বেছে নেয় স্বপ্নেরা সারারাত,
তাজী ছুটে চলে দুরন্ত গতি দুর্বার উচ্ছল;
সারারাত ভরি' তোলপাড় করি' দরিয়ার নোনাজল।

**(বা'র দরিয়াঃ সাত সাগরের মাঝি)**

বিদ্রোহী ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ইসলাম বিষয়ক ও মুসলিম জাগরণমূলক কবিতা-গানের পাঠক মাত্রই উপলব্ধি করবেন যে, তাঁর রচনার ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার ফররুখ আহমদের কাব্যে ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফররুখ আহমদ রচনার কাহিনী নিয়েছেন পুঁথি সাহিত্য থেকে এবং ভাষার ও কাহিনীর নবনির্মাণে পুঁথি সাহিত্যকে অবলম্বন করেছেন। মনে রাখতে হবে ফররুখ পুঁথি রচনা করেন নি। কিন্তু তিনি পুঁথির কাহিনী ও ভাষার আধুনিকায়ন ও পুনর্নির্মাণ করেছেন। একথা তাঁর কাব্য-নাটক 'নৌফেল ও হাতেম' এবং মহাকাব্য 'হাতেম তা'য়ী' সম্পর্কে প্রযোজ্য। এ দু'টি গ্রন্থ থেকে আংশিক উদ্ধৃতি দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। এটাও বোঝা যাবে যে, ফররুখ আহমদ মহৎ মানবতাবাদী চিন্তাচেতনার অধিকারী, মানবকল্যাণ এবং মানুষের শান্তিকামী। অত্যাচারী ও ঈর্ষাকাতর নৌফেলকে যুক্তির মাধ্যমে পরাভূত করে হাতেম তা'য়ী তার উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করেন :

"প্রত্যেক মানুষ যেন হয় প্রজ্ঞাবান
ইনসানে কামিল, মজলুম পায় যেন বাঁচার
অকুণ্ঠ অধিকার।"

ফররুখ আহমদের রচিত মহাকাব্য 'হাতেম তা'য়ী'তে জ্ঞানী, পরোপকারী ও সেবাপ্রতীম হাতেম তা'য়ীর উক্তি :

"ঘুরেছি অনেক দেশ, বহু মাঠ, অরণ্য পাহাড়
পার হয়ে গেছি, আর ভাগ্য বলে পেয়েছি সাক্ষাৎ
বিজ্ঞের নিভৃত কক্ষে জ্বলে যে আলোক অনির্বাণ

নিঃশেষে ছড়িয়ে দেয় পৃথিবীর মানুষের তরে।
কিন্তু যে মহান কর্মী চলে ঈমানের দীপ্তি নিয়ে,
যার প্রেমে, মুহব্বতে প্রাণ পায় বঞ্চিত জীবন
পায় সে সাফল্য খুঁজে।
এই দোয়া করি তাই বারিতা'লা আল্লাহর দরবারে
তোমাদের জিন্দেগীতে প্রেম যেন হয় অগ্রগামী
সর্বক্ষণ, জান্নাতের ছবি যেন জাগে পৃথিবীতে,
খালেস খিদমত পাক তোমাদের হাতে মুক্ত প্রাণ,
আল্লাহর পিয়ারা সৃষ্টি আশরাফুল মাখলুক ইনসান।"

প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্য সমালোচক আবদুল কাদির তাঁর এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি' দৈব প্রতিভার দান, এ গ্রন্থটি ফররুখের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য। 'প্রখ্যাত কবি শামসুর রাহমান'ও 'সাত সাগরের মাঝি'কে ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ হিসেবে অভিমত দেন (স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত)। কিন্তু ফররুখের মহাকাব্য হাতেম তা'য়ী প্রকাশের পর তাঁরা উভয়েই মত বদলান এবং হাতেম তা'য়ীকে কবির সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলে আখ্যায়িত করেন। কবি আবদুল কাদির বলেছেন, "বাংলা সাহিত্যে 'হাতেম তা'য়ী' ফররুখ আহমদের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। ইহার বিষয়বস্তু, এ কাব্য অমিত্রাক্ষর ও অন্যান্য ছন্দের বৈচিত্র্যধর্মী সুদক্ষ ব্যবহার, উপমা উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্প সৃষ্টিতে কবির নৈপুণ্য পাঠক ও সুধী সমালোচক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণের অন্যতম কারণ।"

এছাড়া আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হকসহ আরো অনেকে এ কাব্যের সপ্রশংস মূল্যায়ন করেন। কাব্য-নাটক ও মহাকাব্য রচনা ফররুখ আহমদের মৌলিক কবি প্রতিভার এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বেরই পরিচায়ক। তাঁর সমসাময়িক অর্থাৎ চল্লিশের দশকের কিংবা পরবর্তীকালের কোনো কবি মহাকাব্য লিখেছেন কি না আমার জানা নেই। যদি ভবিষ্যতে কেউ রচনা করেন তবে বাংলা সাহিত্য তাতে সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত হবে। তা না হলে ফররুখ আহমদই যে বাংলা সাহিত্যে সর্বশেষ মহাকাব্য রচয়িতা এবং এক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব সর্বদা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণযোগ্য। ◻

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, বিংশ সংখ্যা, অক্টোবর ২০১০-জুন ২০১১]

# হাবেদা মরুর কাহিনী

## মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্

॥ এক ॥

ফররুখ আহমদের 'হাবেদা মরুর কাহিনী' গদ্য-ছন্দে একটি 'রূপক' কাব্য। কবিতায় রূপক ও প্রতীক ব্যবহারের তাৎপর্য এবং এক্ষেত্রে ফররুখ আহমদের প্রচেষ্টা ও সাফল্যের পরিমাপ করতে হলে, একথা প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, কবিতায় রূপক ও প্রতীকের ব্যবহার কবির গভীর জীবনবোধ এবং জীবন-দৃষ্টির পরিচায়ক। কিছুটা দার্শনিক মনের অধিকারী ও জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে বক্তব্য-প্রবণ না হলে, রূপক ও প্রতীক ব্যবহারের দিকে কবি-মন তেমন ঝুঁকতে চায়না; বক্তব্যের রূপকাশ্রিত এবং প্রতীকী উপস্থাপনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য থেকে যায় উপলব্ধি ও বোধের অগোচরে।

বস্তুত, অনভূতি, উপলব্ধি স্বপ্ন-কল্পনা ও আবেগ-আর্তিকে যারা সরল উপস্থাপনায় এবং নিছক বর্ণনার মাধ্যমে তুলে ধরে পরিতৃপ্তি বোধ করেন না, তারা গভীরতা ও ব্যঞ্জনাধর্মিতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রূপক ও প্রতীকাশ্রয়ী হন। ব্যক্তিমনের প্রকাশে যেমন, সর্বজনীন মনের প্রকাশে এবং জাতীয় চৈতন্যের রূপায়ণেও তেমনি, অনেক কবিকেই রূপক ও প্রতীকের শরণ নিতে দেখা যায়; কারো কারো সৃষ্টিতে রূপক এবং প্রতীক অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের মতো হয়ে দাঁড়ায়, যেমন চিত্রকল্পের মধ্যেও উপমা অন্তর্লীন বা সংগোপন থাকে, তেমনি রূপক-প্রতীকও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা ছাড়াও পরস্পর অন্তরিত হয়ে থাকে।

ফররুখ আহমদের কবিতায়ও রূপক ও প্রতীকের ব্যবহার আছে। তাঁর রচিত খণ্ড কবিতায় যেমন, তেমনি কাহিনী কাব্যে এবং নাটকেও প্রতীকের ব্যবহার দৃষ্টিগ্রাহ্য, অনুভবযোগ্য। তাঁর 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থে নাবিক, নদী-সমুদ্র ও প্রত্যাশিত বন্দর রূপ পেয়েছে ইতিহাসের পটে, আদর্শ-আশ্রিত প্রতিভাসে ও উজ্জীবনী প্রেরণায়। 'সিন্দবাদ'-এর প্রতীকে তিনি ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম সভ্যতার পুরুজ্জীবনের আকাঙ্ক্ষা ই ভাষা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি উপজীব্য ও বক্তব্য বিষয়কে প্রত্যক্ষভাবে না এনে রূপক-প্রতীকের মাধ্যমে পরোক্ষ-পদ্ধতিতে রূপায়িত করার বিশেষ কবি-কৌশল ও শিল্পরীতি অবলম্বন করেছেন। ফলে, নাবিক, সমুদ্র, নিশান, পাখি, পাঞ্জেরী, ইত্যাদি একটি আদর্শ- উজ্জীবিত ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক মানবগোষ্ঠীর নতুন ও প্রত্যয়ী আকাঙ্ক্ষা র প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অশ্রান্ত সন্ধানী, সমুদ্রবিজয়ী নাবিক 'সিন্দবাদ' ফররুখ আহমদের দৃষ্টিতে 'মুসলিম সমাজ ও মুসলিম চেতনা, মুসলিম গৌরব ও অভিযানের প্রতীক, 'হেরা' পর্বত অণুপ্রেরণার উৎস, আদর্শ ভূমি ও স্বর্গের প্রতীক– যেখানে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) ঐশী আহ্বান লাভ করেছিলেন।' (সৈয়দ আলী আশরাফ, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য, পৃঃ ৫০)

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাব্যেই পাখি একটি বহুল-ব্যবহৃত প্রতীক ও 'রূপক'। বাংলা সাহিত্যেও যুগে যুগে পাখি রূপক ও প্রতীক হয়ে ভাষা পেয়েছে। সেই প্রাচীন কবিতা ও আদি গীতিগাথার কথা না হয় বাদই দেয়া যাক, আঠারো শতকের মরমী কবি লালন ফকির যখন উচ্চারণ করেন :

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি ক্যামনে আসে যায়!
ধরতে পারলে মনো-বেড়ি দিতাম তাহার পায়,–

তখন এর রূপকী ও প্রতীকী ব্যঞ্জনা চেতনায় আঘাত হানে, মুগ্ধ করে। আধুনিক কালের কবিরাও ব্যক্তিসত্তার প্রতীকে, অজানা ও রহস্য-নিবিড় মনের রূপকে এবং আরও নানাভাবে পাখিকে দেখেছেন, বিচিত্রধর্মী কবিতা লিখেছেন। ফররুখ আহমদের কবিতায়ও পাখি একটি প্রধান প্রতীক। তিনি যখন 'ডাহুক' এর প্রতীকে মুক্ত-মানুষ ও আত্মার কথা বলেছেন এবং শৃঙ্খলিত সত্তার জন্যে আহাজারী করেছেন, তখনও কাব্য-সৌন্দর্যের উদ্বোধনের পাশাপাশি সমকালীন জীবনচেতনাও বাঙময় হয়েছে।

কীট্‌সের মতো 'পাখি'কে মুক্ত-আত্মার প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করেছেন ফররুখ আহমদ 'ডাহুক' কবিতায়। কীট্‌সের নাইটিঙ্গেল যেমন পয়েজি বা শিল্পকলার নামান্তর, ফররুখ আহমদের 'ডাহুক' তেমনি একটা তুলআমূলক চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে 'ডাহুক' কবিতায়। পার্থক্য সম্ভবতঃ এই যে, কীট্‌স নাইটিঙ্গেলকে আবহমান কালের পটভূমিকায় স্থাপন করেছেন, আর 'ডাহুক' একটি বিশেষ সময়-পরিস্থিতিতে ইতিহাসের পটভূমিকায় চিত্রিত। প্রত্যক্ষভাবে কোনো উল্লেখ না থাকলেও বৃটিশ-পরাধীনতা যুগের মর্মবেদনা এবং উপমহাদেশের মানুষের মুক্তি-কামী মনের প্রতিফলন আর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও যে এতে বাঙ্ময়, তা বুঝে নিতে কষ্ট হয়না।

একালে রূপক ও প্রতীকের ব্যবহার শুরু মানস-সংকট, আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা, উপলব্ধি, জীবন চেতনা ও অন্বেষার মধ্যেই সীমায়িত নেই, তার এলাকা আরও বিস্তৃত হয়েছে। ফররুখ আহমদের অনেক কবিতায়ও এর পরিচয় মেলে। ফররুখ আহমদ ছিলেন ইসলামী আদর্শ ও জীবন দর্শনে বিশ্বাসী, আধ্যাত্মিকতায়ও তিনি ছিলেন স্থিরপ্রত্যয়ী, মুক্তি-সন্ধানী। ফররুখ আহমদ বলতেন, তিনি 'ডাহুককে নিঃসঙ্গ সাধকের জিকির রাতভর ডাকতে-ডাকতে গলায় রক্ত তুলে ডিমে তা ছড়িয়ে দিয়ে উম্‌ দিলেই নাকি বাচ্চা ফোটে। সাধকের সাধনা এবং সাফল্যও অনেকটা ঐ রকমই।

ব্যবহারের স্বাতন্ত্র্য তাৎপর্য যাই হোক, ফররুখ আহমদের কাব্য-সাধনায় 'প্রতীক' এর ব্যবহার একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। তিনি তাঁর সনেটে এবং সনেট-সিকোয়েন্সেও 'পাখির' প্রতীকে এ যুগের যন্ত্রণা এবং গ্লানিবোধ ফুটিয়ে তুলেছেন, 'নদী'র প্রতীকে রূপায়িত করেছেন গতিময় জীবন ও আদর্শে'র উজ্জীবন। বস্তুতঃ ফররুখ আহমদের বহু কবিতায় নদী-নিসর্গ এসেছে জীবনের প্রতিরূপ, এবং প্রাণ-

সত্তা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা র প্রতীক আর উজ্জীবনী প্রেরণা হয়েই। শুধু খণ্ড কবিতায় এবং সনেটেই নয়, দীর্ঘ কবিতায় ও কাহিনী-কাব্যেও ফররুখ আহমদের কবিতায় রয়েছে রূপক ও প্রতীকের ব্যবহার। 'হাতেম-তায়ী' কাব্যে 'নুরয়েজ' ফুলের প্রতীকে বর্তমান সভ্যতার অন্ধত্ব ঘুচানোর পথ-নির্দেশ করেছেন তিনি। এ কাব্যে প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে একাধিক ক্ষেত্রে।

॥ দুই ॥

'রূপক' ব্যবহারের কথা বিশষভাবে বলতে গেলে, ফররুখ আহমদের বর্তমান কাব্যগন্থ 'হাবেদা মরুর কাহিনীর (যা কবির জীবদ্দশায় ছিল অপ্রকাশিত) উল্লেখ অনিবর্যভাবেই করতে হয়। খণ্ড কবিতায়, আখ্যান-কাব্যে এবং নাটকে ফররুখ আহমদ নানাভাবে 'প্রতীক' ও রূপকের ব্যবহার ঘটিয়েছেন, কিন্তু সে-সব ছন্দোবদ্ধ রচনায়ই ব্যবহৃত, গদ্যে কিংবা গদ্য-ছন্দের কতিায় নয়। 'হাবেদা মরুর কাহিনী' শুধু রূপকাশ্রিত কাব্যই নয়, গদ্য-ছন্দে রচিত অনেকগুলি কবিতার সমষ্টি। খণ্ড কবিতা হলেও, ভাব ও বক্তব্যের দিক থেকে পারস্পরিক অন্বয়ধর্মী ও অন্তরিত সম্পর্ক আছে এসব কবিতায়। বইয়ের পান্ডুলিপির 'ভূমিকা'য় ফররুখ আহমদ লিখেছেন :

"রূপকথার 'হাবেদা মরুর' অন্য নাম হাওয়ার ময়দান। নিঃসীম শূন্যতা আর হতাশার ব্যঞ্জনা আছে ঐ মাঠের সাওয়ালে। 'হাবেদা মরুর কাহিনী' গদ্যে লেখা রূপক কবিতা' ঈসায়ী উনিশ শো সাতান্নর শেষভাগে এই বইয়ের সূচনা আর উনিশ শো আটান্নর প্রথমার্ধে এর সমাপ্তি। ১৩৭৭ হিজরীর উদ-উল-আজহার দিনে এই বইয়ের শেষ কবিতা লেখা হয়। দুর্নীতি, অব্যবস্থা আর হতাশা যখন সারাদেশ ছেয়ে ফেলেছিল।" (কবির হাতে লেখা মূল পান্ডুলিপি থেকে)

প্রসঙ্গত : উল্লেখ্য যে, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত এবং 'হায়াত দারাজ খান পাকিস্তানী' ছদ্মনামে সাপ্তাহিক 'আজ' পত্রিকায় প্রকাশিত ফররুখ আহমদের ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক কাব্য' শীর্ষক ব্যঙ্গ-কাব্যেও তিনি ঐতিহাসিক চরিত্র মীর জাফরের জবানীতে তদানীন্তন শাসক-শোষক ও অন্যান্য সমাজবিরোধী 'নীতিবিদদের' তীব্র সমালোচনা করেছেন। আঠারো মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে ও প্রবহমান পয়ারে রচিত এই দীর্ঘ ব্যঙ্গ-কাব্যটি পত্রিকায় প্রকাশের পর তাঁকে নাকি তদানীন্তন কর্তৃপক্ষীয় কেউ-কেউ 'কম্যুনিস্ট কবি' বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছিলেন, এমনকি সে আমলে তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশও নাকি লেলিয়ে দেয়া হয়েছিল।

তাৎকালীন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থার দূর্নীতি, অব্যবস্থা, আদর্শ হীনতা আর হতাশা দেখে আদর্শবাদী ও সমাজ-সচেতন এবং মানবতাহীনতা আর হতাশা দেখে আদর্শবাদী ও সমাজ-সচেতন এবং মানবতাবাদী কবি ফররুখ আহমদের মন কতটা বেদনার্ত হয়েছিল, তার পরিচয় আছে 'হাবেদা মরুর কাহিনী'র অন্তর্গত রূপকাশ্রিত কবিতাগুচ্ছে। একটি কবিতার উদ্বৃতি থেকেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে :

মনে হয় বন্দী হয়ে আছি
ক্লেদ-পংকিল এক দুঃসহ বন্দীখানায়
(বাদগর্দ হাম্মামের মতই যা ভয়াবহ)
শান্তির চিহ্ন নাই যেখানে
শুধু মধ্যরাত্রে শোনা যায় শয়তানের অট্টহাসি
মানুষ বেঁচে আছে কিন্তু মুর্দার শামিল।
এদের চলা-ফেরা, ওঠা-বসা
সব কিছুই নিষ্প্রাণ,
জড় পদার্থের মত
ঠাণ্ডা,
অনুভূতিহীন।
বিদেশী মুসাফিরের যদি কেউ এখানে আসে
চমকে ওঠে। বলেঃ এ কোন জমিনে এলাম?
যদি কেউ বলেঃ জিন্দেগীর পথ
খোলা আছে এখনো
এরা তখন তাকায় বিকারের রোগীর মত
ঘোলাটে, আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে
(হয়তো বিশ্বাস করেন।)
কারণ সত্যিকার মুক্তির পথে
চায়নি কেউ এদের নিয়ে যেতে,
চেয়েছে কাহিনীর সেই প্রতারক হাজ্জামের মত
শুধু ভুলিয়ে রাখতে মিথ্যা প্রবঞ্চনায়।

জীবনকে এখন আমরা দেখছি
সেই অতন্দ্র রোগীর মত
রাত্রির দীর্ঘ প্রহর যায় সামনে কেটে গেছে
স্বপ্নহীন আর শান্তিহীন,
ভোরের আলোকেও যে শুধু দেখছে
অন্ধকারের তিক্ত বিভীষিকা।

এই 'হাবেদা মরুর' প্রতীকে স্বদেশের তৎকালীন অবস্থানই যে বিদ্ধৃত, তা বুঝে নিতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। কিন্তু রূপক ও প্রতীক-এর বৈশিষ্ট্যই এই যে, তা বিশেষ দেশ, সময় এবং বক্তব্যকে ধারণ করলেও, গভীরতর ও ব্যাপকতর ব্যঞ্জনার কারণেই তা অর্জন করে অনেকটা সর্বজনীনতা। আসলে, 'হাবেদা মরু' প্রাণহীনতা, রুক্ষতা, হতাশা, অন্ধকার এবং বিভীষিকারই প্রতীক, এবং এ কারণেই এ রূপকাশ্রিত উপস্থাপনাও ব্যাপকতর ও সর্বজনীন আবেদনের অধিকার রাখে।

ফররুখ আহমদ যেমন কীট্‌সের মতো 'পাখির' প্রতীক ব্যবহার করেছেন, তেমনি তিনি টি. এস এলিয়টের মতো 'হাবেদা মরুর কাহিনী'তে নিয়েছেন প্রতীক ও রূপকের আশ্রয়। এলিয়টের 'ওয়েস্ট ল্যান্ড' বা 'পোড়ো জমি' 'ফাঁপা মানুষ' আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার অবক্ষয়ের আর বন্ধ্যাত্বেরই প্রতীক। যদিও তিনি যুগ-সমস্যায় পীড়িত ও হতাশায় দীর্ণ মানুষকে ভবিষ্যতের আশা-আশ্বাসের বাণী শুনিয়েছেন উজ্জীবন ও মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। আধুনিক সভ্যতার অবক্ষয়ী রূপ অঙ্কন করতে গিয়ে টি. এস. এলিয়ট মৃত্যুর আতঙ্কে অস্থির ও হতাশায় দীর্ণ মানুষকে অবলোকন করেছেন, আত্মার নিপীড়নে পর্যুদস্ত 'ফাঁপা' মানুষের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন– কিন্তু ক্ষণ-মুহূর্তের জন্যও হতাশাকে বরণ করে নেননি। জীবনের প্রতি অনিঃশেষ আশাবাদ দার্শনিক প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞান এবং সর্বোপরি মননশীল অনুপ্রেরনা তাঁকে জীবনের সঞ্জীবনী-উৎসের দিকে টেনে নিয়ে গেছে–বন্ধ্যাভূমিতেও তিনি মৌসুমী ফসলের প্রতীক্ষা করেছেন।

ফররুখ আহমদের আছে অনিঃশেষ আশাবাদ এবং আদর্শ-উজ্জীবনের, নতুন সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা । 'হাবেদা মরুর' প্রতীকে এবং এই রুক্ষ ও প্রাণহীন ভূমির রূপকী উপস্থাপনায় স্বদেশের একটি বিশেষ সময়-সন্ধিক্ষণের হতাশাময় আলেখ্য তুলে ধরলেও আশাবাদী কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে বিশ্ব-শান্তির কথা, সর্বমানবের কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা :

> যেন বঞ্চিত বনি আদমের এই দীর্ঘশ্বাস
> রূপ নিতে পারে শান্তির প্রশ্বাস,
> যেন এই তৃষাতপ্ত হাবেদার মরু মাঠ
> আবার হতে পারে সুন্দর শান্তিময় মাটির জান্নাত
> দুনিয়ার সকল মানুষে জন্যে
> দুনিয়ার সকল মানবীর জন্যে।

ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা, এবং শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমেই এটা সম্ভব, ঐতিহ্যবাদী ও মানব-কল্যাণকামী কবি ফররুখ আহমদের এই গভীর এবং আন্তরিক বিশ্বাসও রূপকের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়েছে।

## ॥ তিন ॥

ফররুখ আহমদের কবিতায় প্রতীক ও রূপকের ব্যবহার যেমন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, তেমনি তাঁর রচনায় আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ছন্দের বৈচিত্র্যময় ব্যবহারও বিশেষ উল্লেখনীয়, দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো। সৃজনধর্মী কবিরা আবেগ-অনুভূতি, স্বপ্ন-কল্পনা ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে যেমন, বক্তব্য প্রকাশের জন্যও তেমনি নতুন ভাষা, ছন্দ, আঙ্গিক ইত্যাদি নির্মাণ করে নেন, নানাভাবে পরীক্ষা-

নিরীক্ষা করেন। ছন্দ-নিপুণ এবং রূপদক্ষ কবি ফররুখ আহমদ ছন্দোবদ্ধ কবিতায়ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন, বিভিন্ন ধরনের ছন্দে এবং আঙ্গিক রূপায়িত করেছেন তাঁর বক্তব্য, ভাবনা-বেদনা, ও আশা-আকাঙ্ক্ষা র কথা। তাঁর কবিতাকর্মের বৃহত্তর অংশই ছন্দোবদ্ধ রচনা এবং কাব্য-আঙ্গিক নির্ভর। কিছু কিছু গদ্য ছন্দের কবিতা লিখলেও 'হাবেদা মরুর কাহিনী'ই একমাত্র গদ্য-কাব্য।

কবিতার ছন্দ নিয়ে ফররুখ আহমদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তাঁর গদ্য-কবিতা সম্পর্কে ইতিপূর্বে এক আলোচনায় লিখেছিলাম, (সাহিত্য ও সাহিত্যিকঃ মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্ পৃঃ ১৮৮-৮৯) 'অন্ত্যমিল-যুক্ত, ছন্দোধ্বনিময় কবিতা রচনাতেই ছিল তাঁর বিশেষ-প্রবণতা। তাঁর গদ্য-কবিতা, মুক্তছন্দের কবিতা (ফ্রি-ভার্স) প্রায় নেই বললেই চলে। যতদূর জানি, তিনি ছদ্মনামে কিছু গদ্য কবিতা লিখেছিলেন। .....কবি জীবনের শুরুতে তিনি কোনো গদ্য-কবিতা কিংবা মুক্তছন্দের কবিতা লিখেছিলেন কিনা, জানি না। তবে মাসিক 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রথম কবিতাটি গদ্যছন্দে রচিত :

মাধবী বিতানের পাশে তার ছায়া-বিতান।
তবু সে ফুটলো না মধুরাতে বসন্তের বিহ্বলতায়
সঙ্গী বসন্ত যেদিন লুটে পড়ল
অন্তিম নিঃশ্বাসে, সেদিন
থেকেই বুঝি তার মনে সত্যিকারের
অশ্রুর পরাগ জমতে
আরম্ভ করেছে। সঙ্গীহীনা সে এক কেতকী।

**(আঁধারের স্বপ্ন)**

১৩৪৫ সালের পৌষ সংখ্যা (১৯৩৮) 'সওগাত'-এ প্রকাশিত এই সুদীর্ঘ কবিতাটি গদ্য-ছন্দে রচিত এবং এতে কোনো 'পঙ্‌ক্তি-শেষের অন্ত্যমিল' নেই। কিন্তু কবিতাটির অনেক পঙ্‌ক্তিই সুনির্দিষ্ট ছন্দে, মাত্রায় ও পর্বে ভাগ করা যায়। যদিও সর্বত্র একই নিয়ম-রীতি এবং মাত্রা ও পর্বের অনুসরণ নেই। কবিতাটির শেষের দিকে আশ্চর্যজনকভাবে পঙ্‌ক্তি-শেষের 'মিলও' দুয়েকটি এসে গেছে। এসব স্তবক পুরোপুরি ছন্দে সমর্পিত:

তোমার বুকের গন্ধে কখন ঘুমিয়ে ছিলাম একা
তোমার মনের কোণে,
পেলব তোমার পাপড়ি দলে সবার অগোচরে
ছিলাম সঙ্গোপনে।
কোন্ সুদূরের স্বপন-মায়ার কাজল-ঘুমের মোহে
জানতে পারিনি তা

আজকে দেখি উঠছে ফুটে আমার মনের কোণে
তোমার মনোলিখা।
বাদল রাতে তোমার গীত অশ্রু রুধির ধারা
শুনছি জেগে একা,
আমার মনের গান যে মেশে তোমার মনের ছায়ে
মেলে মনের লেখা।

এই কবিতার গদ্যাংশে ও পদ্যাংশে, কবির জীবনের প্রাথমিক-পর্বের রচনা বলেই, ভাষা ও রীতিভঙ্গির দিক থেকে রাবীন্দ্রিক-প্রভাবের পরিচয়ও মেলে। কিন্তু কবিতায় এমন গদ্য ও পদ্যের পাশাপাশি সংস্থাপন ফররুখ আহমদের অন্য কোনো কবিতায় রয়েছে কিনা, জানিনা। তবে তাঁর বহু কবিতাতেই স্তবক-বিশেষ ছন্দের বৈচিত্র্যময় প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। কবিতায় নানা ছন্দ ও স্তবক-বিন্যাস কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন, বিভিন্ন নাটকীয়তার আশ্রয় তাঁর বহু কবিতায়ই অনুভবযোগ্য। পরিবেশ রচনা এং পাঠকদের মানসিক প্রস্তুতির জন্যেই তিনি কবিতায় মূল বক্তব্যের অবতারণার আগে এক ধরণের আকস্মিক-উন্মোচন ঘটিয়েছেন। 'হাবেদা মরুর কাহিনী' পড়তে গিয়েও এটা উপলব্ধি করা যাবে।

গদ্য-কাব্য তথা গদ্য-ছন্দের কবিতা রচনায় ফররুখ আহমদ কতটা সাফল্য অর্জন করেছেন, তা ছান্দসিক-সমালোচক এবং সুধী পাঠকদের বিবেচনার বিষয়। তবে গদ্য কবিতা তথা গদ্য-ছন্দের কবিতার চারিত্র্য সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত, এই মূল্যায়নে সহায়ক হতে পারে। মনে রাখা দরকার যে, সাধারণ পাঠক অন্ত্যমিলকেই প্রধানত: কবিতার ছন্দ বলে ধারণা করে থাকেন এবং অন্তমিলবর্জিত হলেই, সাধারণভাবে কবিতা গদ্য কবিতা বলে গণ্য হয়। প্রথাগত রীতিতে মাত্রা, যতি, পর্ব ইত্যাদি অনুসৃত হলেও অন্তমিল না থাকলে কবিতা 'গদ্য কবিতা' অভিধায় সাধারণত: চিহ্নিত হয়।

কবিতার ছত্রান্তে, যে কোনো বর্ণের পারস্পরিক ধ্বনিগত মিলকেই, সেই সুদূর অতীতে কবিওয়ালার যুগে যেমন, একালেও তেমনি কবিত্ব শক্তির প্রকাশ হিসাবে সাধারণ্যে গণ্য করা হয়। কাব্যপাঠ ও উপভোগের এই ঐতিহ্যগত ধ্যান-ধারণা থেকেই সাম্প্রতিককালের পাঠক পর্যন্ত অন্তমিলহীন ছন্দোবদ্ধ যে কোন কবিতাকেই গদ্য কবিতা হিসাবে গণ্য করতে কুণ্ঠিত হন না, তারা ভুলে যান যে, গদ্য কবিতারও এক ধরনের ছন্দ এবং ছন্দ-স্পন্দ রয়েছে, আর ছন্দ-নিপুণ কবি ছাড়া সার্থক গদ্য কবিতা লেখাও সম্ভব নয়।

সুনির্দিষ্ট নিয়ম-রীতির অধীনে ছন্দোবদ্ধ কবিতা রচনার ক্ষেত্রে মাত্রা, যতি, পর্ব ইত্যাদি অনেকটা প্রথাবদ্ধরীতিতে মেনে নিয়ে অগ্রসর হতে হয়, এবং সেক্ষেত্রে সামান্যতম বিচ্যুতিকেই ছান্দসিকেরা ছাড়পত্র দিতে চাননা; কিন্তু 'ফ্রি-ভার্স' বা গদ্য-

কবিতা রচনার সুবিধা এই যে তাতে ঐসব ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা স্বাধীনতা নেয়া চলে; ফ্রি-ভার্সের প্রতি কবিদের ঝোঁকের উৎস সম্ভবত এটাই। ফররুখ আহমদও সম্ভবতঃ বক্তব্য প্রকাশের সুবিধার জন্যেই 'হাবেদা মরুর কাহিনী' তে এই স্বাধীনতা নিয়েছেন, অবলম্বন করেছেন গদ্যছন্দ। ছন্দোবদ্ধ রচনার একঘেয়েমী পরিহার করার, এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনেও হয়তো তিনি এই রীতি অবলম্বন করে থাকবেন; হতাশা, জীবনের রুক্ষতা এবং প্রাণহীনতার প্রতীকায়ণ আর রূপকাশ্রয়ী উপস্থাপনাই যেখানে লক্ষ্য সেখানে নিরেট অবলম্বন এবং আবেগ রহিত, লাবণ্যহীন ভাষা ব্যবহার অস্বাভাবিক কিংবা বিচিত্র কিছু নয়।

অবশ্য 'বহিরাচারী ছন্দমাপকে' বর্জন করলেও, গদ্যকবিতায় শব্দের অন্তরাশ্রয়ী যে ছন্দ এবং পরস্পর বন্ধনে যার দ্যোতনা সেই ছন্দকে বর্জন করা সম্ভব নয়, এবং বর্জন করলে, করতে গেলে, কাব্যছন্দের মুক্তি তো দূরের কথা, বাক্যসৃষ্টি হওয়াই অসম্ভব। কারণ প্রচলিত ছন্দের চারিত্র্য এবং পরিমাপ অনুসরণ না করলেও, প্রত্যেকটি শব্দের এবং সে সবের ধ্বনিগত পরস্পর বন্ধনের যে একটি ধ্বনিগত সুসাম্য, মিল এবং দ্যোতনা আছে এ সম্পর্কিত সচেতনতা মুক্তছন্দের অনুসারী কবির জন্যেও অপরিহার্য। 'হাবেদা মরুর কাহিনী'তে যখন আমরা পড়ি,

কিন্তু এখানে  
এখানে এই অমিল, ছন্দহীন প্রাণের পৃথিবীতে  
কাঁকর বিছানো মাঠে,  
বালুরুক্ষ বিয়াবানে  
আমাদের দিন কেটে যায়  
হাবেদা মরুর মাঠের  
বাতাসের দীর্ঘশ্বাস শুনে

তখন অন্ত্যমিলহীন, এ গদ্য-উচ্চারণও মনে ছন্দের দ্যোতনা জাগায়। মুক্তছন্দের কবিতা রচনার ক্ষেত্রেও শব্দ-নির্বাচনের ব্যাপারে অমনোযোগ কিংবা অসতর্কতা কবিতার সুশৃঙ্খল অন্তর-প্রকৃতিকে ক্ষুণ্ন করতে পারে। কারণ, গদ্য কবিতার ছন্দ যদিও সুনির্দিষ্ট কিংবা নিরূপিত ছন্দ নয়, তাহলেও ছন্দস্পন্দ (রিদম) এবং যাকে বলা যেতে পারে ছন্দের অন্তপ্রবাহ কিংবা চোরস্রোত, তাও শব্দ নির্বাচনের এই অসতর্কতা ও অমনোযোগের কারণে বিশেষভাবে ব্যাহত হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। ফররুখ আহমদের মতো শব্দ-সচেতন, ভাষা-ব্যবহারে দক্ষ কবির ক্ষেত্রেও যে এমনটি না ঘটেছে এমন নয়। 'হাবেদা মরুর কাহিনী'তেও তিনি বক্তব্য প্রকাশের অবারণ ঝোঁকে অনেক অ-কাব্যিক ও নিতান্ত গদ্যাত্মক শব্দ ব্যবহার করেছেন। কবির বদলে হয়ে উঠেছেন বক্তা। যিনি লিখেছেন এমন অনুপম আকর্ষণীয় স্তবক :

বিষণ্ন সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে

কাল জেগে উঠেছিল
এক মজানদীর কাহিনী
(উচ্ছল পারার মত আকাশের সেই আর্শি–
মুখ দেখতো যাতে
সংখ্যাহীন তারা আর চাঁদ,
পাল তুলে যেত দূরের নৌকা
উদ্দাম স্রোতে ভাসমান রাজহাঁসের মত
সে নদী এখন গেছে শুকিয়ে,
তার বালুবক্ষে এখন ঘুরে বেড়ায়
তপ্ত হাওয়ার শ্বাসে
বহু যুগ আগেকার এক বিগত দিনের কান্না।)
আর মনে হয়েছিল
এখনো সে নদী পারে বাঁচতে
এখানে সে পারে ফিরে পেতে
তার বহমান তরঙ্গ
উদ্দাম গতিবেগ
প্রবল প্রাণোচ্ছ্বাস;
যদি সে খুঁজে পায়
শুধু তার মূলের ঠিকানা।

তিনিই সকল রূপক, প্রতীক ও কাব্যের আড়াল ছিন্ন করে আত্মসমালোচনার আঘাত হেনে একেবারই গদ্যাত্মক ও অ-কাব্যিক ভাষায় বলেছেন এই উপলব্ধির কথা :

যেদিন থেকে আমরা নিয়েছি
ঈমানের পরিবর্তে বে-ঈমানী
একতার পরিবর্তে অনৈক্য,
আর শৃঙ্খলার পরিবর্তে বিশৃঙ্খলা
(কদর্য উচ্ছৃঙ্খলতা)
শুরু হয়েছে সেদিন থেকেই
আমাদের চূড়ান্ত দুর্গতি।

মনে রাখতে হবে, 'ফ্রি-ভার্স' বা গদ্য-কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলী গদ্যাত্মক হয়েও থাকে অনেকখানি কাব্যধর্মী এবং এই চারিত্র্যের কারণেই উল্লেখিত বিশেষ রীতির কবিতা 'গদ্য-কবিতা' এই অভিধায় চিহ্নিত। ছন্দোবদ্ধ এবং পদ্যবন্ধের কবিতায় যে ধরনের শব্দ-নির্বাচিত ও ব্যবহৃত হয়, অনিবার্য কারণেই তার কিছুটা অলংকৃত ও প্রসাধিত চারিত্র্য থাকে কাব্যগন্ধী লাবণ্যের ছটা। ফররুখ আহমদের ছন্দোবদ্ধ এবং

অন্তমিলযুক্ত কবিতায় কবিত্বময় ইমেজোচ্ছল ভাষায় উজ্জ্বল পরিচয় আছে। 'সিন্দবাদ' প্রতীকে তিনি যখন উচ্চারণ করেনঃ

কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ,
শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে
সফেদ চাঁদির তাজ
পাহাড় বুলন্দ ঢেউ বয়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক'
নতুন পানিতে সফর এবার, হে মাঝি সিন্দবাদ।
সমুদ্র থেকে সমুদ্রে ঘোরে দরিয়ার সাদা তাজী!
খুরের খল্‌কা ধারালো দাঁড়ের আঘাতে ফুলকি জ্বলে,
সমুদ্র থেকে সমুদ্রে ঘোরে দরিয়ার সাদা তাজী
তুফানের মাঠ পাড়ি দেওয়া তার এ কী দুরন্ত নেশা।

তখন বলিষ্ঠ ও সৌন্দর্যদীপ্ত ভাষার বন্ধনে এবং ছন্দ-ধ্বনিময় বাক-প্রতিমার এক অরুপম আলেখ্যেই অঙ্কিত হয়, বাঙময় হয়ে ওঠে। নিরূপিত ও সুনির্দিষ্ট ছন্দে এধরনের কাব্যগন্ধী, লাবণ্যময় এবং বলিষ্ঠ ও সৌন্দর্যদীপ্ত ভাষা ব্যবহার অপেক্ষাকৃত সহজ বিধিবদ্ধ, কিন্তু গদ্য-কবিতায় শব্দ নির্বাচন ও ভাষা ব্যবহারের প্রশ্নে এমন রীতিবদ্ধতা অপরিহার্য নয়, এ কারণেই গদ্য-কবিতায় শব্দ নির্বাচন ও ব্যবহারের স্বাধীনতা কিছুটা বেশি। কিন্তু তবু যেহেতু গদ্য-কবিতা মূলত কবিতাই, এবং ভাষার ক্ষেত্রে ঘরোয়া-আলাপচারী ভঙ্গী ব্যবহারের অবকাশ এতে বেশি, আর গদ্য হলেও, এই কবিতায়ও ছন্দের চোরপ্রবাহ রয়েছে, সেকারণে সাধারণত: ছন্দ-নিপুন কবির হাতেই গদ্য-কবিতাও প্রাণবান এবং সজীব হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে একালের অনেক আধুনিক কবির রচনায়ই এর পরিচয় আছে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় বলতে গেলে, কবিতার ভাষার যে 'অভব্য বস্তুতন্ত্র তাতেও ছন্দঃস্রোত প্রবাহিত' এবং শব্দের 'ক্যাডেন্স' অর্থাৎ স্বরপ্রবাহ মূলত: বক্তব্যের ও সে অনুসারে উচ্চারণের প্রকৃতি অনুযায়ী ধ্বনিত। অনিরূপিত ছন্দোবদ্ধ কবিতায় শব্দের এই ক্যাডেন্স অর্থাৎ স্বরপ্রবাহ প্রাধান্য পায় না, কারণ সেখানে মাত্রানুযায়ী শব্দ উচ্চারিত হয় বলে এবং ভাবগতি অনুসারে ছেদ পড়ে বলে, পূর্ণ এবং অপূর্ণ পর্বে ছন্দই প্রাধান্য বিস্তার করে রাখে; কিন্তু গদ্য-ছন্দের কবিতায় শব্দের ক্যাডেন্স বা স্বরপ্রবাহই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, গদ্যছন্দের প্রকৃতি অনেকখানি অন্ত র্নিহিত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : "গদ্যই হোক, পদ্যই হোক, রসরচনা মাত্রেরই একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে। গদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ, গদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত। সেই নিগূঢ় ছন্দটিকে পীড়ন করলেই কাব্যকে আহত করা হয়। পদ্যছন্দ বোধের চর্চা বাঁধা নিয়মের পথে চলতে পারে, কিন্তু গদ্যছন্দের পরিমাপ বোধ মনের মধ্যে যদি সহজে

না থাকে অলংকার-শাস্ত্রের সাহায্যে এর দুর্গমতা পার হওয়া যায়না। অথচ অনেকেই মনে রাখেনা যে যেহেতু গদ্য সহজ সে কারণেই গদ্যছন্দ সহজ নয়।"

ফররুখ আহমদ তাঁর কবি-জীবনের বৃহত্তর অংশই ব্যয় করেছেন পদ্যছন্দের চর্চায় এবং এক্ষেত্রে তিনি রেখেছেন দক্ষতা ও সাফল্যের স্বাক্ষর। শুধু ছন্দের বিভিন্নরূপ এবং বৈচিত্র্যধর্মী ব্যবহারেই নয়, কবিতার অন্ত্যমিলেও এই দক্ষতা এবং সাফল্যের স্বাক্ষর আছে। গদ্যকাব্য আলোচ্য 'হাবেদা মরুর কাহিনী'তে তিনি ছন্দের প্রথাবদ্ধ রীতি এবং মনোটনি অর্থাৎ একঘেয়েমী ভেঙেছেন। তিনি যখন উচ্চারণ করেন :

কাফেলা এসে দাঁড়ালো
হাওয়ার মাঠ দশ্‌তে হাবেদায়...
জিন্দেগীর সবুজ নিশানা হারিয়ে
খাঁ খাঁ করছে যেখানে দিগন্ত ছোঁয়া ময়দান,
যেখানে পোড়া মাটি রঙ্গ ফসলের শূন্য মাঠ
বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে গুমরে উঠছে রাত্রিদিন
কাফেলা এসে দাঁড়ালো সেই রুক্ষ বিয়াবানে
সবচেয়ে প্রাণবন্ত চারা গাছ
যে মাটিতে মাথা তুলে
কুঁকড়ে শুকিয়ে মারা গেছে
যে মরা গাছের শুকনো ডালে দেখেছি
ঝড়ো সন্ধ্যায় হিংস্র জ্বীনের নর্তন।

তখন এই গদ্য কবিতায়ও স্বরপ্রবাহ, ধ্বনি দ্যোতনা এবং ছন্দের চোরাস্রোত অনুভব করা যায়। কিছু কিছু শব্দের স্থানান্তর ঘটিয়ে, দু'য়েকটি শব্দ সংযোজনের মাধ্যমে এবং যতি, মাত্রা, পর্ব ইত্যাদির নব-বিন্যাসে এই গদ্যাংশকেও রূপান্তরিত করা যায় পদ্য-ছন্দে। যেমন :

কাফেলা দাঁড়ালো এসে। সেই
অচেনা হাওয়ার মাঠ। দশ্‌তে হাবেদায়...
জিন্দগীর। সবুজ নিশানা যত। হারিয়ে সুদূরে
খাঁ খাঁ করছে আজ। যেখানে দিগন্ত ছোঁয়া। ময়দান
যেখানে রয়েছে যত। পোড়া মাটি রঙ আর।
ফসলের। ঢের শূন্য। মাঠ
বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে। গুমরে উঠছে কেঁদে।
শুনি রাত্রিদিন।

ভাষা ও ছন্দের সুদক্ষ রূপকার ফররুখ আহমদ যদি গদ্যছন্দে না লিখে, পদ্যছন্দে লিখতে চাইতেন, তাহলে উপরোক্ত কাব্যাংশ হয়তো অনেক বেশি প্রাণবান, সজীব এবং আকর্ষণীয় হয়ে উঠতো। শুধু ফররুখ আহমদেরই নয়, যে কোনো প্রতিভাবান এবং ভাষা ও ছন্দের দক্ষ রূপকার কবির হাতেই তেমন সৃষ্টি সম্ভব হতে পারে। কেননা, গদ্যছন্দে রচিত হলেও, উপরোক্ত রচনাংশে একটা স্বাভাবিক ছন্দ আছে, আর এটা সম্ভব হয়েছে এ কারণে যে, পদ্যছন্দের দক্ষ রূপকার ফররুখ আহমদের মনের মধ্যেও গদ্যছন্দের পরিমাপ বোধ ছিল, আর এটাও মনে রাখা দরকার যে, 'গদ্য কিংবা পদ্য' যাই হোক না কেন, ভাষামাত্রেরই যে একটা স্বাভাবিক ছন্দ আছে, এই বোধ যার নেই, তার পক্ষে 'অলংকার শাস্ত্রের' সহায়তায় কোনো ছন্দই যথার্থরূপে আয়ত্তে আনা সম্ভব নয়। ভাষার এই স্বাভাবিক ধ্বনিপ্রবাহ এবং ছন্দোময়তা সম্পর্কে সচেতনতাই মাত্র ভাষার ব্যবহারকারীকে এর বৈচিত্র্যময় ছন্দ এবং ছন্দোপ্রকৃতি আবিষ্কারে সহায়তা করতে পারে। এমন সহায়তা পেয়েছেন বলেই, ফররুখ আহমদ গদ্যছন্দেও অসফল হননি। বস্তুত : 'হাবেদা মরুর কাহিনী'তে তাঁর সাফল্য, কবির অন্যান্য কাব্যের তুলনায় ন্যূন হলেও, একটি রূপকাশ্রিত গদ্যকাব্য হিসাবে এটি ফররুখ আহমদের এক উল্লেখযোগ্য রচনা। ◘

---

**[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, একুশতম সংখ্যা, অক্টোবর ২০১১]**

# ফররুখ আহমদের কবিতার প্রতি অনুরাগের গোড়ার কথা

**মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্**

ফররুখ আহমদের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের এবং সান্নিধ্য ও স্নেহ লাভের অনেককাল আগে বৃটিশ শাসনামলের শেষ দিকে অর্থাৎ চল্লিশের দশকের শেষ পর্যায়েই তাঁর কবিতার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। আমার কৈশোরকালে এবং হাইস্কুল জীবনেই ফররুখ আহমদ একজন খ্যাতিমান কবি। তাঁর কবিতা-পাঠের প্রথম সুযোগ পাই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবং সাহিত্য সাময়িকীতে। সেকালেই মাসিক 'সওগাত', মাসিক 'মোহাম্মদী' ত্রৈমাসিক 'চতুরঙ্গ' ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর নানা বিষয় ও বিচিত্র আঙ্গিক এবং রূপরীতির কবিতা প্রকাশিত হতো। গ্রামের বাসিন্দা ছিলাম বলে, তাঁর বহু কবিতা যে অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় এবং সাহিত্য সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে, সে কথা তখন জানা ছিল না। 'সওগাত', 'মোহাম্মদী', 'চতুরঙ্গ' ছাড়া অন্য কোনো সাহিত্য-সাময়িকী দেখার ও পাঠের সুযোগও মেলেনি। সেকালে প্রায় সব ধরণের সাহিত্য-সাময়িকী এবং পত্র-পত্রিকাই প্রকাশিত হতো অবিভক্ত বাংলার অর্থাৎ তদানীন্তন বঙ্গদেশের রাজধানী কলকাতা মহানগরী থেকে। ফররুখ আহমদসহ বাংলা সাহিত্যের হিন্দু-মুসলিম প্রায় সব কবি-সাহিত্যিকই কলকাতা থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় এবং বিভিন্ন সাহিত্য-সাময়িকীতে লিখতেন। অধিকাংশ কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী আর সংস্কৃতিসেবীরও কর্মস্থল এবং অধিবাস ছিল কলকাতায়। যে কিছুসংখ্যক কবি-সাহিত্যিক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ঢাকার বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক সাহিত্য চর্চা করতেন, তাঁদের রচনা প্রকাশের প্রধান অবলম্বন ও বাহন ছিল কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাহিত্য-সাময়িকী ও পত্র-পত্রিকা। কেননা, অবিভক্ত তথা সেকালের বঙ্গদেশে ঢাকা থেকে মাত্র কয়েকটি পত্র-পত্রিকা এবং সাহিত্য-সাময়িকীই প্রকাশিত হতো। এত কথা বললাম এ কারণে যে, চল্লিশের দশকের কবি ফররুখ আহমদ ১৯৪৭ সালে দেশ-বিভাগ এবং পাকিস্তান (সাবেক) প্রতিষ্ঠার আগে ঢাকার কোনো পত্রিকায় লিখেছেন বলে অন্তত আমার জানা নেই।

চল্লিশের দশকে আমার কৈশোরকালেই আমাদের গ্রামের বাড়িতে একটি ছোট পারিবারিক পাঠাগার ছিল। কিছু বই-পত্র ছাড়া, এই পাঠাগারে ছিল মাসিক 'সওগাত' মাসিক 'মোহাম্মদী' মাসিক 'প্রবাসী', ত্রৈমাসিক 'চতুরঙ্গতে' ইত্যাদি সাহিত্য-সাময়িকীর কিছু বাঁধানো সেট। কৈশোরকালেই আমাকে ছবি আঁকার এবং কবিতা লেখার নেশায় প্রবলভাবে পেয়ে বসে। কবিতা লিখতে এবং ছবি আঁকতে গিয়েই আমি সাহিত্য-সাময়িকী ও পত্র-পত্রিকা পাঠে অভ্যস্ত এবং একরূপ নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। গল্প-উপন্যাস, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, কিছু-কিছু পাঠ করলেও, কবিতা পাঠই আমার প্রধান নেশায় এবং অভ্যাসে পরিণত হয়। কবিতার বিষয়ের চেয়েও, ছন্দ-ধ্বনির ও অন্তমিলের আকর্ষণে আমি

কবিতা-পাঠে অভ্যস্ত হয়ে উঠি। মাসিক 'সওগাত' মাসিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় মুসলমান লেখকদের রচনা প্রাধান্য পেলেও পাশাপাশি হিন্দু লেখকদের রচনাও প্রকাশিত হতো। অন্যপক্ষে, ত্রৈমাসিক 'চতুরঙ্গ' এবং মাসিক 'প্রবাসী' ইত্যাদি পত্রিকায় মুসলমান লেখকদের লেখা প্রকাশিত হলেও, হিন্দু লেখকদের রচনারই ছিল প্রাধান্য। বিভিন্ন সাহিত্য-সাময়িকীতে বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকদের রচনা প্রকাশিত হলেও, নবীন লেখকদের রচনাও প্রকাশিত হতো। নবীনদের মধ্যে যাঁরা প্রতিভাবান ও খ্যাতিমান তাঁদের রচনাও প্রকাশিত হতো গুরুত্বসহকারে।

আমার কৈশোরকালে এবং হাইস্কুল জীবনে মাসিক 'সওগাত' মাসিক 'মোহাম্মদী' ইত্যাদি পত্রিকায়ই আমি ফররুখ আহমদের বেশি সংখ্যক এবং অনেক বিখ্যাত কবিতা পাঠের সুযোগ পাই। চল্লিশের দশকের কবি ফররুখ আহমদ মাসিক 'সওগাত', মাসিক 'মোহাম্মদী', ইত্যাদি বিখ্যাত পত্রিকা ছাড়াও, হিন্দু-মুসলিম সম্পাদকদের সম্পাদনায় প্রকাশিত আরও অনেক বিখ্যাত সাহিত্য সাময়িকীতে কবিতা লিখলেও, সেসব পত্র পত্রিকা আমাদের পারিবারিক পাঠাগারে না থাকায় সেগুলো পাঠের সুযোগ আমার কৈশোরকালে হয় নি। আমাদের ঢাকা শহরে হাইস্কুলে প্রচুর বই-পত্র বিশেষ করে গল্প-উপন্যাস এবং কিছু কাব্যগ্রন্থ থাকলেও, সাহিত্য-সাময়িকী এবং পত্র-পত্রিকার সংগ্রহ ছিল খুবই কম। চল্লিশের দশকে ফররুখ আহমদ বড়দের উপযোগী অজস্র কবিতা লিখলেও, শিশু-কিশোরদের উপযোগী কোনো কবিতা সম্ভবত: লেখেননি, অন্তত: সেকালের কোনো শিশু-কিশোর পত্রিকায় তাঁর শিশুতোষ রচনা পাঠের অভিজ্ঞতা আমার হয়নি। বড়দের উপযোগী বিচিত্র-বিষয়ক এবং নানা আঙ্গিক ও রূপরীতির কবিতা রচনায় তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও পারঙ্গমতার পরিচয় চল্লিশের দশকে দিলেও, ফররুখ আহমদ শিশু-কিশোরদের উপযোগী কবিতা রচনায় সম্ভবত: প্রথম আত্মনিয়োগ করেন ১৯৪৭ এর দেশ-বিভাগের পরে, এবং (সাবেক) পাকিস্তান আমলে। প্রতিভাধর কবি ফররুখ আহমদ যে শিশু-কিশোর কবিতার রচনায়ও অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন আঙ্গিক ও রূপরীতির কবিতা রচনার মাধ্যমে।

ফররুখ আহমদ চল্লিশের দশকের খ্যাতনামা কবি হলেও এবং তাঁর কলকাতার জীবনেই তিনি বহুসংখ্যক অসাধারণ কবিতা লিখলেও, আমাদের কৈশোরকালে এবং হাইস্কুলের বাংলা পাঠ্যবইয়ে তাঁর এবং ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের কোনো কবিরই (বিশেষ করে রবীন্দ্রোত্তর যুগের, আধুনিক ও অত্যাধুনিক, কবি হিসাবে খ্যাতদের) কবিতা অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ফররুখ আহমদ যেহেতু চল্লিশের দশকে এবং তাঁর কলকাতার জীবনে সম্ভবত: কোনো শিশু-কিশোর উপযোগী কবিতা রচনা করেননি, সেকারণে সেকালে প্রাইমারী স্কুলের পাঠ্যবইয়েও তাঁর কোনো কবিতা ছিল না। চল্লিশের দশকের তাঁর সমসাময়িক কবিদের প্রায় সবার ক্ষেত্রেই একই কথা প্রযোজ্য। ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের অনেক খ্যাতিমান কবিই স্কুল-পাঠ্য উপযোগী-বিশেষ করে শিশু-কিশোর কবিতা রচনা না করায়, পাঠ্য বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হননি।

১৯৪৯-৫০ সালের শিক্ষা বছরে আমরা যখন হাইস্কুলে ম্যাট্রিক ক্লাসের ছাত্র-সে বছরেই প্রথম ম্যাট্রিকের বাংলা সংকলনে চল্লিশের দশকের খ্যাতিমান কবি ফররুখ আহমদসহ ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের অনেক 'আধুনিক' ও 'অত্যাধুনিক' খ্যাতিমান কবির কবিতা পাঠ্য-সূচির অন্তর্ভুক্ত হয়। যতদূর মনে পড়ে, বাংলা কবিতার এই সংকলন গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন চল্লিশের দশকের এবং ফররুখ আহমদের প্রায় সমসাময়িককালের আরেক বিশিষ্ট কবি সৈয়দ আলী আহসান। গ্রন্থটি প্রকাশ করেন তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ড।

ফররুখ আহমদের কবিতার সঙ্গে আমার কৈশোরকালের ও হাইস্কুল জীবনের পরিচয়ের প্রসঙ্গে ১৯৪৯-৫০ সালের ম্যাট্রিকের পাঠ্য বাংলা কবিতা-সংকলনের উল্লেখ করতে হলো এ কারণে যে, উক্ত সংকলনের অন্তর্ভুক্ত ছিল ফররুখ আহমদের বিখ্যাত কবিতা 'সাত সাগরের মাঝি'। সেকালে মাসিক 'সওগাত', মাসিক 'মোহাম্মদী', ইত্যাদি পত্রিকা পাঠ করতে গিয়ে ফররুখ আহমদসহ তাঁর সমসাময়িক অনেক কবির-বিশেষ করে চল্লিশের দশকের মুসলিম কবিদের অনেকের রচনা পাঠ করার সুযোগ হয়। চল্লিশের দশকে মাসিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রকাশিত ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতাটি আমি আগেই পত্রিকার পৃষ্ঠায় পড়েছিলাম। কিন্তু 'সাত সাগরের মাঝি' নামে যে তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ রয়েছে এবং সেটি ১৯৪৪ সালেই প্রকাশিত হয়েছে, সেটা আমার জানা ছিল না। কাব্যগ্রন্থটি দেখার এবং পড়ার সুযোগ আমার স্কুলজীবনে হয়নি। ফররুখ আহমদের বহু কবিতা-বিশেষ করে তাঁর 'সাত সাগরের মাঝি' শীর্ষক কবিতাটি আমাকে আগেই আকৃষ্ট ও মোহিত করেছিল। এ প্রসঙ্গে স্কুল-জীবনের কাব্য পাঠের অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে, আমি লিখেছি, "ছন্দ-মিলওয়ালা কবিতা পেলে আমি আগ্রহ নিয়ে পড়তাম, উচ্চস্বরে আবৃত্তি করতাম। সব সময় অর্থ ঠিক বুঝতে না পারলেও শব্দের ধ্বনি-গরিমা এবং মিলের মোহিনী যাদুই আমাকে আকৃষ্ট করে রাখতো। মনে পড়ে, 'সওগাত'এ প্রকাশিত আহসান হাবীবের 'এই মন এই মৃত্তিকা' এবং 'মোহাম্মদী' তে প্রকাশিত ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতাটি আমাকে ধ্বনি-গরিমা ও ছন্দ মিলের জন্য সেসময়ে মুগ্ধ করেছিল:

'ঝরা পালকের ভস্মস্তূপে তবু বাঁধলাম নীড়
তবু বার বার সবুজ পাতার স্বপ্নেরা করে ভীড়।'

আহসান হাবীবের কবিতাটির এই দু'টি পঙ্ক্তি তখনই আমার মনে গেঁথে যায়। সে সময়ে আহসান হাবীব ও ফররুখ আহমদ এই দুই কবির কবিতা প্রায় প্রতি সংখ্যার 'সওগাত' ও 'মোহাম্মদী' তে প্রথম পৃষ্ঠায় অর্থাৎ পত্রিকার মুখবন্ধে ছাপা হতো। তাঁদের নাম ও কবিতা মনে দাগ-কাটার এও ছিল একটা কারণ।

উক্ত স্মৃতিচারণমূলক ও মূল্যায়নধর্মী নিবন্ধে, আমি আরও লিখেছি, পরবর্তীকালে ম্যাট্রিক সিলেকশনে ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতাটির সাথে আমার নতুন করে পরিচয় ঘটে। সংকলনে থাকলেও, কবিতাটি আমাদের পাঠ্য-সূচীতে ছিল না (অর্থাৎ ক্লাসে ছাত্রদের পড়ানো হতো না। আহসান হাবীবের 'এই মন এই

মৃত্তিকা'ও পড়ানো হতো না। তাই যতদূর মনে পড়ে, চল্লিশের দশকের এবং তাঁর সমসাময়িক কবিদের কারও কবিতাই সে-সময়ে ক্লাসে পড়ানো হতো না। 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতাটি সংকলিত হয়েছিল কিছুটা সংক্ষিপ্ত আকারে। কবি আবদুল কাদির ও রেজাউল করিম সম্পাদিত কাব্য 'মালঞ্চ' সংকলন থেকেই কবিতাটি সে সময়ে ম্যাট্রিক সিলেকশনে গৃহীত হয়েছিল। সে জন্যেই ছিল কিছুটা সংক্ষিপ্ত রূপ। পাঠ্যসূচীভুক্ত না হলেও কবিতাটি স্বতন্ত্রধর্মী ভাষা, ছন্দ-ধ্বনির বৈশিষ্ট্য ও কবিত্বময়তা ও শিল্পরূপের কারণে আমার মন হরণ করে। 'সাত সাগরের মাঝি' যে একটি প্রতীকধর্মী কবিতা এবং 'সাত সাগরের মাঝি'কে জাগার ও সমুদ্রে পাড়ি জমানোর আহ্বান যে মুসলিম পুনর্জাগরণ তথা সব জাগরণের অর্থাৎ রেনেসাঁর প্রতীক তা উপলব্ধি ও অনুধাবনের বয়স ও ক্ষমতা স্কুল-জীবনে আমার ছিল না। সংকলনে থাকলেও, পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত না থাকায় স্কুলের শিক্ষকেরাও কবিতাটি ক্লাসে পড়াননি, কবিতার অন্তগর্ত বক্তব্যের এবং প্রতীকী ব্যঞ্জনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেননি। উল্লেখ্য, একালেও ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতাটি ম্যাট্রিক ক্লাসের (এস.এস.সি'র) বাংলা কবিতা-সংকলনের অন্তর্ভুক্ত এবং ক্লাশেও কবিতাটি ছাত্রদের পড়ানো হয়। শুধু স্কুলের পাঠ্য কাব্য-সংকলনেই নয়, কলেজের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য বাংলা কাব্য-সংকলনেও 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত, পাঠ্যক্রমেরও অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন স্তরে ছাত্রদের পড়ানোর ফলে প্রতীকধর্মী এবং মুসলিম নবজাগরণ-মূলক তথা রেনেসাঁর বাণীবাহক ও ইসলামী আদর্শের দ্যাতক কবিতাটির অন্তর্লীন বক্তব্য অজানা নেই। বাংলা কাব্যের গবেষক এবং সাহিত্য-সমালোচকদের আলোচনা-সমালোচনা এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কারণেও কবিতাটির অন্তর্গত বক্তব্য ও শিল্পরূপ সুপরিচিত, ব্যাপকভাবে জানা। নজরুলের সুবিখ্যাত এবং সর্বাধিক জনপ্রিয় কবিতা 'বিদ্রোহী' যেমন বাংলা সাহিত্যে অন্যতম যুগ-স্রষ্টা এই কবির মানসরূপ এবং অনন্যসাধারণ সৃজনক্ষমতার ও মৌলিক প্রতিভার প্রতীক, তেমনি নজরুলোত্তর যুগের এবং চল্লিশের দশকের আরেক মৌলিক প্রতিভাধর কবি ফররুখ আহমদের মানসরূপের ও সৃজনক্ষমতার প্রতীক 'সাত সাগরের মাঝি'। যদিও উভয় কবিরই অসংখ্য সাড়া জাগানো এবং শিল্পগুণসমৃদ্ধ নানা আঙ্গিক ও রূপরীতির কবিতা রয়েছে।

আগেই বলেছি, 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতাটি আমাদের ম্যাট্রিক ক্লাসের তথা দশম শ্রেণীর পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত না থাকলেও আমি কবিতাটির মুগ্ধ পাঠক ছিলাম। কবিতাটির অভিনবত্বে মুগ্ধ হয়ে, ধ্বনি-গরিমার ও ছন্দ মিলের আকর্ষণে সে সময়ে আমি এই কবিতাটি বার বার আবৃত্তি করতাম।

'কত যে আঁধার পর্দা পারায়ে ভোর হলো জানি না তা
নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা।'

এই দুটি পঙ্‌ক্তি আমার মনে আশ্চর্য দ্যোতনা জাগাতো। কবিতাটিতে ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দাবলীর প্রকৃত অর্থ সেসব ব্যবহারের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে না পারলেও এতে ফেনোচ্ছল সমুদ্রের যে বর্ণনা ও 'সাত সাগরের মাঝি'র প্রতি জেগে

ওঠার এবং সফরে বেরিয়ে পড়ার আকুতি ভাষা পেয়েছে, তা সেসময়েই আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল :

'দুয়ারে তোমার সাত সাগরের জোয়ার এসেছে ফেনা
তবু জাগলে না? তবু তুমি জাগলে না?
সাত সাগরের মাঝি চেয়ে দেখ দুয়ারে ডাকে জাহাজ
অচল ছবি সে তসবির যেন দাঁড়ায়ে রয়েছে আজ
হালে পানি নাই পাল তার উড়ে নাকো
হে নাবিক তুমি মিনতি আমার রাখো;
তুমি উঠে এসো তুমি উঠে এসো মাঝিমাল্লার দলে
দেখবে তোমার কিশ্‌তী আবার ভেসেছে সাগর জলে
নীল দরিয়া যেন সে পূর্ণ চাঁদ
মেঘ-তরঙ্গ কেটে কেটে চলে ভেঙে চলে সব বাঁধ।'

'সাত সাগরের মাঝি' নামে ফররুখ আহমদের একটি কাব্যগ্রন্থ রয়েছে এবং ১৯৪৪ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত এটিই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ এই তথ্য আমার জানা ছিল না। তথ্যটি আমি জানলাম ১৯৫০ সালে ঢাকা কলেজে অধ্যয়নের সময় আমি আমার সহপাঠী বন্ধু কবিরউদ্দিন আহমদের কাছে। কবিরউদ্দিন আহমদ ছিলেন সেসময়ে 'তমদ্দুন মজলিসে'র একজন একনিষ্ঠ কর্মী। তাঁর মাধ্যমেই ঐতিহাসিক ভাষা-আন্দোলনের অগ্রণী-সংস্থা তমদ্দুন মজলিস এবং এই সংস্থার সংগ্রামী মুখপত্র সাপ্তাহিক 'সৈনিক' এর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটে। তিনিই আমাকে ফররুখ আহমদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' এবং ইসলামী আদর্শ ও চিন্তাধারা সম্পর্কিত অনেক মূল্যবান বই আমাকে পড়তে দেন। হুমায়ুন কবীরের 'মার্কসবাদ', কার্লমার্কসের 'ডাস ক্যাপিটাল' ইত্যাদি বইও তিনি আমাকে পড়তে দেন সে-সময়েই। টিটাগড়ের মোটা কাগজে বড়ো বড়ো পাইকা টাইপে ছাপা 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ হাতে পেয়ে আমি আকৃষ্ট ও আনন্দিত হই। গ্রন্থটি বিশেষ আগ্রহসহকারে পাঠ করতে লক্ষ্য করলাম এটি ফররুখ আহমদের অনেক অসাধারণ ও অনবদ্য কবিতার সংকলন। এতে যেমন আছে দীর্ঘ দীর্ঘ কবিতা, তেমনি রয়েছে স্বল্প-দীর্ঘ, কবিতা এবং সনেট বা চতুর্দশপদী। ইসলামী ঐতিহ্যবাহী, মুসলিম জাগরণমূলক কবিতা ছাড়াও এতে রয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ কবিতাও। ইসলামী সাম্যবাদে ও মানবতাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ এবং প্রেরণা-সঞ্চারী কবিতায় গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'সিন্দবাদ'-এর শুরুর স্তবকটি বার বার মনে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো :

'কেটেছে রঙিন মখমল দিন নুতন সফর আজ
শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
ভাসে জোরওয়ার মওজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ
পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ বয়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক
নতুন পানিতে সফর এবার হে মাঝি সিন্দবাদ।'

কবিতাটিতে ব্যবহৃত অনেক আরবি-ফারসি শব্দের অর্থ আমার তখনও পুরোপুরি বোধগম্য হয়নি। কিন্তু উপমা, চিত্রকল্প, বাক-প্রতিমা এবং ছন্দের ধ্বনি ব্যঞ্জনা মনকে আবিষ্ট করে। 'রোষে ফুলে উঠে কালাপানি যেন সুবিশাল আজদাহা', 'পাকে পাকে ঘোরে, তীর বেগে ছুটে আবর্তে দিশাহারা', 'দরিয়ার বুকে দামাল জোয়ার ভাঙ্গছে বালুর বাঁধ', ইত্যাদি পঙ্‌ক্তি মনে গেঁথে যেতে থাকে :

'সমৃদ্ধ থেকে সমুদ্রে ঘোরে দরিয়ার সাদা তাজী!
খুরের হল্‌কা, -ধারালো দাড়ের আঘাতে ফুলকি জলে
সমুদ্র থেকে সমুদ্রে ঘোরে দরিয়ার সাদা তাজী'

'সাত সাগরের মাঝি'র অন্তর্গত প্রায় সব কবিতা এবং বিশেষ করে 'পাঞ্জেরী', 'ডাহুক', 'লাশ', ইত্যাদি কবিতা আমাকে অভিভূত করে। আমি ফররুখ আহমদের কবিতার একনিষ্ঠ অনুরাগী পাঠক হয়ে উঠি। পরবর্তীতেকালেও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এবং গ্রন্থবদ্ধ তাঁর কবিতাবলী পাঠ করে ফররুখ প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ উপলব্ধি করি এবং ফররুখ চর্চা ও গবেষণায় ব্রতী হই। ফররুখ আহমদের কবি-প্রতিভা এবং তাঁর বিচিত্রধর্মী ও নানা বিষয়ক কবিতা সম্পর্কে আমি ষাটের দশকেই ঢাকা বেতার-কেন্দ্র থেকে একটি কথিকা পাঠ করি। যতদূর মনে পড়ে, ১৯৬৪ সালে দৈনিক ইত্তেফাকের সাহিত্যবিভাগে 'ফররুখ আহমদ ও সাত সাগরের মাঝি', শীর্ষক আমার একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ফররুখের কবিতার প্রতি গভীর অনুরাগের ফলেই, এবং তাঁর বহু কবিতা এবং কাব্যগ্রন্থাদি পাঠের অভিজ্ঞতা থেকেই ষাটের দশক থেকে অদ্যাবধি আমি ফররুখের কবি-মানস ও তাঁর কবিতা সম্পর্কে বহু সংখ্যক প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছি। 'ফররুক একাডেমী' প্রকাশিত আমার প্রবন্ধগ্রন্থ-'বাংলা কাব্যে ফররুখ আহমদ : তাঁর শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ', ফররুখ ও তাঁর কাব্যের প্রতি আমার অনুরাগের এবং দীর্ঘকাল ধরে ফররুখ-চর্চারই ফল। ◻

---

**(ফররুখ একাডেমী পত্রিকা ১৬ তম সংখ্যা- জুন ও অক্টোবর-২০০৮)**

# শিল্প-সচেতন কবি ফররুখ আহমদ

ডক্টর আনিসুজ্জামান

**(কবি ফররুখ আহমদের ৩৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বিগত ১৮.১০.২০১২ তারিখে ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে মান্যবর অতিথি হিসাবে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক, মননশীল লেখক ও বাংলা একাডেমীর চেয়ারম্যান প্রফেসর এমিরেটাস, ডক্টর আনিসুজ্জামান যে ভাষণ দেন, তার হুবহু অনুলিপি।- অনুলিখন : মুহম্মদ মতিউর রহমান।)**

ফররুখ আহমদ এমন একজন কবি, যাঁর কবিতাকে তাঁর জীবনদৃষ্টি থেকে আলাদা করা যায় না। এ জীবনদৃষ্টির সাথে যাদের সাযুজ্য তারা তাঁকে অনেক বেশী আন্তরিকভাবে ও মর্মগতভাবে গ্রহণ করেন। যাদের সাযুজ্য নেই তারাও তাঁকে শিল্পী হিসাবে, কবি হিসাবে তাঁর যে গুণ সেটা স্বীকার করেন। আমার শিক্ষক মুনীর চৌধুরীর সাথে যখন ফররুখ আহমদের প্রথম দেখা হয়, মুনীর চৌধুরী নাকি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনার এ শ্মশ্রু কি বিশ্বাসজাত না আদর্শজাত? ফররুখ আহমদ নাকি কোন উত্তর দেননি, শুধু হেসেছিলেন। কিন্তু সেই থেকে তারা সম্পুর্ণ ভিন্ন পথের পথিক হয়েও একটা বন্ধুত্বের সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন।

মুনির চৌধুরী বরাবর ফররুখ আহমদের শিল্প-প্রতিভার প্রশংসা করে গেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ফররুখ আহমদের 'হরফের ছড়া' ও 'পাখির বাসা' যখন প্রকাশিত হয় তখন মুনীর চৌধুরী তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এর একটি কারণ হলো, 'হরফের ছড়া' যখন প্রকাশিত হয় তখন আমাদের এখানে বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের কথা হচ্ছে। এরমধ্যে ফররুখ আহমদ ১২টি স্বরবর্ণ ও ৪০টি ব্যঞ্জণ বর্ণ নিয়ে চমৎকার ঐ ছড়ার বইটি লিখলেন। কারণ ১২টি স্বরবর্ণের মধ্যে চার চার করে বিভক্ত তিনটি স্তরে একটি অখণ্ড ছন্দের দোলা আছে। ফররুখ আহমদ সেজন্য এ বারটি বর্ণই রাখার পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি এটা ভাঙতে চাননি বা এর কোন একটি বর্ণই বাদ দেওয়ার প্রয়োজনবোধ করেননি। এ কথাটি মুনীর চৌধুরী তাঁর 'হরফের ছড়া' গ্রন্থ আলোচনায় উল্লেখ করেন।

ফররুখ আহমদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পরই তিনি অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি বাংলা কাব্যের মূলধারার কবি হয়েও একটি স্বতন্ত্র সুর যোজনার চেষ্টা করেছেন বা করতে সফল হয়েছেন। আমরা জানি যে, চল্লিশের দশকে আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, আবুল হোসেন ও সৈয়দ আলী আহসান আমাদের এ চারজন প্রধান কবি প্রায় একসঙ্গে যাত্রা শুরু করেছিলেন। এঁরা চারজনই আমাদের প্রথম আধুনিক কবি। এঁদের মধ্যে আবুল হোসেন ব্যতীত আর কেউই বর্তমানে জীবিত নেই। এঁরা সকলেই নিজের নিজের মত করে তাদের স্ব-স্ব কাব্যভুবন সাজিয়েছেন। একজনের সাথে আরেকজনের সাজুয্য তেমন একটা না থাকলেও মনে হয়েছিল রবীন্দ্রোত্তর যুগে যে আধুনিক কাব্যধারা-এঁরা সে পথেরই পথিক। কিন্তু পরবর্তীকালে

এঁরা দেখিয়েছেন যে, সে ধারা থেকে তাঁরা স্বতন্ত্র ধারার পথিক। তাঁরা মূলত স্বতন্ত্র ধারা নির্মাণ করেছেন।

এঁদের মধ্যে ফররুখ আহমদ ছিলেন সর্বাধিক উজ্জ্বল। তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব এই যে, তিনি আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ ব্যবহারে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। এক্ষেত্রে নজরুলের পরে তিনি সর্বাধিক সফলতা অর্জন করেন। তবে শুধু এর মধ্যেই তাঁর নৈপুণ্য সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর নিজস্ব কবি-ভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে আরো কতগুলো বিষয়কে বিবেচনায় রাখতে হবে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, 'সাত সাগরের মাঝি', 'সিরাজুম মুনীরার' যে কবি-ভাষা তাঁর অন্য কাব্যগ্রন্থ যেমন-"হে বন্য স্বপ্নেরা", 'মুহূর্তের কবিতা', 'দিলরুবা' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের ভাষার সাথে এর কোন মিল নেই। বিষয়ানুযায়ী ভাষার পার্থক্য তিনি করেছেন। এমনকি, তাঁর ব্যঙ্গ কবিতার ভাষা আরো ভিন্নতর। 'হায়াত দারাজ খান পাকিস্তানী' ইত্যাদি ছদ্মনামে তিনি যেসব ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছেন তার ভাষা বিষয়ানুযায়ী ভিন্নতর হয়েছে। একজন সচেতন শিল্পী হিসাবে তিনি জানতেন, বিষয়ানুযায়ী শব্দ প্রয়োগ করতে হয়। তবেই কবিতা সফল হয়। এটাই স্বাভাবিক। এ স্বাভাবিকতা অনেকে উপলব্ধি না করেই তাঁকে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেন। ফলে আমরা পূর্ণাঙ্গ ফররুখকে পাইনা, তাঁকে পাই খণ্ডিত আকারে। কিন্তু ফররুখের সমগ্র রচনাবলী দিয়েই তাঁর যথাযথ মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন।

ফররুখ আহমদ বিশেষভাবে মুসলিম পুনর্জাগরণে বিশ্বাস করতেন এবং সে উদ্দেশ্যে তিনি কতগুলো প্রতীক ব্যবহার করেছেন। 'সিন্দবাদ' প্রতীকে তিনি মুসলিম পুনর্জাগরণের কথা বলেছেন। এখানে তিনি আরবি, ফারসি শব্দ এবং সেসব সাহিত্য বিশেষত ফারসি সাহিত্য থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এ সবই যে মুসলমানদের সম্পদ, তা কিন্তু নয়। যেমন হাতেম তা'য়ীর কথা ধরা যাক। হাতেম তা'য়ী তো প্রাক-ইসলামী যুগের চরিত্র। কিন্তু তিনি আরবি সাহিত্যের এক অপরিহার্য চরিত্র। সে হিসাবে তিনি সমগ্র মুসলিম জাতির নিকটেই অত্যন্ত আদরণীয় ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। সে কারণে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কবি সৈয়দ হামজা, হাতেম তা'য়ীর প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন যে, এত বড় একজন মহৎ ব্যক্তি যদি মুসলমান হতেন, তাহলে কতই না ভাল হত। তাঁরাও এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কিন্তু তাঁরা একটি ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন। ফররুখ আহমদও হাতেমের এ মানবিক গুণের প্রতি মুগ্ধ হয়েই তাকে তার কাব্যে স্থান দিয়েছেন। ঐতিহ্যের কবি ফররুখ আহমদ হাতেমকে মুসলিম ঐতিহ্যের এক গৌরবময় চরিত্র হিসাবেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যেখানে বিষয় আলাদা তিনি সেখানে আলাদাভাবেই বিচরণ করেছেন। তাঁর এ বৈচিত্র্যকে উপলব্ধি করতে হবে।

ফররুখের 'হাতেম তা'য়ী' প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য হলো এই যে, বিংশ শতাব্দী মহাকাব্যের যুগ নয়। সেজন্য হাতেম তা'য়ী রচনার মধ্যে দেখবো, মধুসূদনের মহাকাব্যের যে ধরণ, এটা ফররুখ সম্পূর্ণ গ্রহণ করেননি। তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেছেন, সেই সঙ্গে অন্য ছন্দও ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এটা মহাকাব্যের যুগ না হওয়ায় এত বড় বই আমাদের নিকট অতটা আবেদন বহন করে না, যতটা তাঁর খণ্ড কবিতা আমাদের নিকট আবেদন সৃষ্টি করে। তবে একথা বলতেই হবে যে,

হাতেম তা'য়ীর মধ্যেও কিছু কিছু অসাধারণ কবিত্ব রয়েছে, যা পড়ে আন্দোলিত হওয়া যায়, কিন্তু সবটা মিলে হয়তো অতটা তৃপ্তি পাওয়া যায় বলে আমার মনে হয় না।

কিন্তু অন্যত্র ফররুখ আহমদের সিদ্ধি অসাধারণ। তাঁর কবি-কল্পনার মধ্যে, কবিতার শিল্পরূপ সম্পর্কে যে সচেতনতা তা তুলনাহীন। এর নানা পরিচয় আমরা পাই। এ প্রসঙ্গে এখানে মাত্র তাঁর 'দিলরুবা' কাব্যের কথা উল্লেখ করবো। এটা একটি প্রেম বিষয়ক কাব্য। ইংরেজিতে এটাকে সনেট সিকোয়েন্স বলা যায়। এখানে মোট ৪৮টি সনেট কবিতাকে মোট ৭টি স্তবকে বিভক্ত করে একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্য রচনা করা হয়েছে। এক একটি স্তবকে ৫ থেকে ১০টি পর্যন্ত কবিতা রয়েছে। প্রত্যেকটি কবিতাই সনেটের প্রকরণ অনুযায়ী রচিত এবং আলাদা আলাদাভাবে প্রতিটি সনেটই স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অর্থবহ। আলাদাভাবে প্রত্যেকটি কবিতাই মূল্যবান কিন্তু ঐ স্তবক-বিন্যাসের জন্য প্রতিটি কবিতাই পরস্পর-সংলগ্ন হয়ে একটি অখণ্ড ভাব ও ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে। এ স্তবক-বিন্যাস তিনি ইংরাজি সাহিত্য থেকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বাংলায় তিনি এটা এমনভাবে প্রবর্তন করলেন, যা খুব অর্থপূর্ণ হয়ে দাঁড়ালো এবং কবিদের নিকট একটি অনুসরণীয় বিষয়ে পরিণত হলো। কাজেই তিনি যে শব্দ নির্বাচন ও তার কুশলী প্রয়োগে দক্ষ ছিলেন তাই নয়, কবিতার বিভিন্ন রূপরীতি সম্পর্কেও অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। নানাভাবে তিনি পরীক্ষা করেছেন এবং সেই পরীক্ষার ফল সাধারণভাবে সন্তোষজনক হয়েছে এবং আমরা নতুন কিছু পেয়েছি। একারণেই ফররুখ আহমদ তাঁর সমসাময়িক কবিদের মধ্যে একজন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কবি।

ফররুখ আহমদ একটি বিশেষ যুগের কবি, একটি বিশেষ ভাবধারার কবি। কিন্তু তাঁর কাব্য-সিদ্ধি এমন যে, তিনি তাঁর যুগকে অতিক্রম করে, সে ভাবধারাকে অতিক্রম করে বাংলা সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছেন। এখানেই তাঁর অসাধারণত্ব ও কবি-প্রতিভার অনন্য বৈশিষ্ট্য। আমরা জানি যে, ফররুখ আহমদকে নিয়ে একটি বিতর্কের জায়গা সৃষ্টি হয়েছে। বিতর্ক সৃষ্টি হতেই পারে, আমরা কেউ বিতর্কের উর্দ্ধে নই। কিন্তু সব বিতর্কের উর্দ্ধে ফররুখ বাংলা সাহিত্যের এক অসাধারণ কবি, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই।

ফররুখ আহমদ স্বাধীনতার কবি। তিনি পরাধীন যুগে জন্মেছিলেন। আমরা তখন ইংরাজের গোলামী করেছি। তখন পাকিস্তান আন্দোলন চলছিল। উপ-মহাদেশের সকল মুসলমানই পাকিস্তানের পক্ষে ছিল। ফররুখ আহমদও মনে-প্রাণে পাকিস্তান চেয়েছিলেন। পাকিস্তানকে নিয়ে তাঁর অনেক প্রত্যাশা ছিল। সে প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় আশাভঙ্গের বেদনায় তিনি অনেক ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছেন। সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। তিনি মনে-প্রাণে ছিলেন একজন কবি এবং সকল মানুষের কল্যাণকামী।

ফররুখ আহমদের মত নির্লোভ, উদার, মানবতাবাদী মানুষ আমি কমই দেখেছি। ফররুখ আহমদ সারা জীবন তাঁর নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী চলেছেন। কারো কাছে তিনি কোন ব্যাপারে মাথা নত করেননি। আমাদের দেশে যখন এক শ্রেণীর কবি-সাহিত্যিক সরকারের প্রশংসার কাজে প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত হয়ে নানা এনাম-

উপঢৌকন পেতে ব্যস্ত ছিলেন, ফররুখ আহ্‌মদ তখনও সম্পূর্ণ নির্মোহভাবে তা থেকে দূরে ছিলেন। আমার মনে আছে, কেন্দ্রীয় সরকার যখন রাইটার্স গিল্ড প্রতিষ্ঠা করেন, তখন আমরা সকলেই সেখানে গিয়েছিলাম। আমাদের দেশের নামী-দামী কবি-সাহিত্যিকরা অনেকেই ছিলেন। ফররুখ আহ্‌মদও প্রথম দিকে সেখানে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে রাইটার্স গিল্ড–এর ব্যাপারে তাঁর আর কোন আগ্রহ ছিলনা। এমনকি, রাইটার্স গিল্ডের সেক্রেটারী জেনারেল কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা সচিব বিশিষ্ট উর্দু কথাসাহিত্যিক কুদরতউল্লাহ্ শাহাব যখন ফররুখ আহ্‌মদকে তাঁর সঙ্গে দেখা করার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তখন তিনি সে আমন্ত্রণে সাড়া দেননি। ফররুখ আহ্‌মদ বলেছিলেন, আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তিনি যেন আমার বাসায় আসেন। কুদরতউল্লাহ্ শাহাব অগত্যা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে নিজেই ফররুখ আহ্‌মদের বাসায় গিয়েছিলেন। এই হলো কবি ফররুখ আহ্‌মদের অসামান্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর মত অসামান্য আত্মমর্যাদাশীল কবি আমাদের দেশে অতিশয় বিরল।

ব্যক্তিগতভাবে আমি ফররুখ আহ্‌মদের স্নেহধন্য। আমি যখন ছাত্র, তখন আমার দু'একটি লেখা পড়ে তিনি আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন এবং নানা বিষয়ে আমাকে পরামর্শ দিতেন। আমি তাঁর পরামর্শে যথেষ্ট উৎসাহবোধ করেছি। আরেকটি ঘটনার সাক্ষী আমি নিজেই। ১৯৫৪ সনে আমরা যখন পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন করি, তখন পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেক কবি-সাহিত্যিকদের দাওয়াত দিয়ে নিয়ে এসেছিলাম। তাঁদের মধ্যে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, ফররুখ আহ্‌মদের সাথে তাঁর দেখা করার ব্যবস্থা করে দিতে। আমি নিজে থেকে সে ব্যবস্থা করেছিলাম। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও ফররুখ আহ্‌মদ একসঙ্গে কলকাতায় স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁরা পরস্পর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। সুভাষ এসেই বললেন, আমি ফররুখ আহ্‌মদের সঙ্গে দেখা করবো। আমি ওকে নিয়ে গিয়েছিলাম ঢাকা বেতার কেন্দ্রে ফররুখ আহ্‌মদের সঙ্গে দেখা করাতে। তখন ঢাকা বেতার কেন্দ্র ছিল নাজিমুদ্দীন রোডে। বেতার কেন্দ্রের সামনে আবন মিয়ার চায়ের দোকানে ফররুখ আহ্‌মদের সঙ্গে দেখা। দুই বন্ধু দেখা হলে দু'জনেই গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে কোলাকুলি করলেন। তাঁরা সেই ছাত্র-জীবনের মতই অন্তরঙ্গভাবে কথা বলতে লাগলেন। ফররুখ আহ্‌মদের একটি সরলতা ছিল। সুভাষের মধ্যে তাঁর এ সহপাঠী বন্ধুটি সম্পর্কে একটি শ্রদ্ধামিশ্রিত ভাব ছিল।

ফররুখ আহ্‌মদ মানুষ হিসাবে অসাধারণ, কবি হিসাবে দুর্লভ, তাঁর শিল্পবোধ অনন্যসাধারণ। ◻

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, চব্বিশতম সংখ্যা, অক্টোবর, ২০১২]

# মর্যাদাবোধের প্রতীক ফররুখ

## ডক্টর আবু হেনা মোস্তফা কামাল

তখন আমাদের কতোই-বা বয়স! হঠাৎ একদিন পাঠ্য বইয়ের পাতায় পেয়ে গেলাম এক আশ্চর্য স্বাদের কবিতা : "কত যে আঁধার পর্দা পারায়ে ভোর হল জানি না তা/নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা।" কবির নাম ফররুখ আহমদ। তাঁর কবিতা এর আগে আর কখনো পড়ি নি– কিন্তু ঢাকা বোর্ডের কাব্য সংকলনের অন্তর্গত খণ্ডিত 'সাত সাগরের মাঝি' ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এতোবার পড়েছিলাম যে, সেই ক্ষতি বোধ হয় পুষিয়ে গিয়েছিলো। "তবে তুমি জাগো কখন সকালে ঝরেছে হাস্নাহেনা/এখনো তোমার ঘুম ভাঙলো না? তবু তুমি জাগলে না?" এসব চরণের অর্থ কিছুই বুঝতাম না। কে এই তুমি? তবু এক অদ্ভুত ভালো-লাগার বোধে আচ্ছন্ন হয়ে যেতো মন।

মফঃস্বল শহরে এসব নিয়ে আলাপ করার মতো কোনো বন্ধু ছিলো না। অতএব নিজের ভেতরেই এই মুগ্ধতা ও বিস্ময় দিনের পর দিন বেড়ে উঠেছিলো মৌচাকের মতো। '৫১ সালের মাঝামাঝি কোনো এক সময় হবে সেটা। বিনা নোটিশেই নামলো বৃষ্টি। হুড়মুড় করে এক ঘিঞ্জি রেস্তোরাঁয় উঠে পড়েছিলাম। বাইরে যেমন বর্ষণ, তেমনি উদ্দাম, এলোমেলো হাওয়া। ভেতরে সস্তা সিগারেটের ধোঁয়া আর পেয়ালা-পিরিচের ঝনৎকারের সাথে খদ্দেরদের হাঁকাহাঁকি মিশে দম বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা। হঠাৎ সব কিছু ছাপিয়ে কারো দরাজ গলায় রেডিওতে ভেসে এলো আমার প্রিয় কবিতার চরণ :

> তুমি কি ভুলেছো লবঙ্গ ফুল, এলাচের মৌসুমী,
> যেখানে ধূলিতে কাঁকরে দিনের জাফরান খোলে কলি,
> যেখানে মুগ্ধ ইয়াসমীনের শুভ্র ললাট চুমি'
> পরীর দেশের স্বপ্ন সহেলী জাগে গুলে-বকাওলী।'

খারাপ আবহাওয়ার জন্যে মাঝে মাঝেই আবৃত্তিকারের গলা হারিয়ে যাচ্ছিলো, আবার পরমুহূর্তে ভেসে উঠছিলো, যেন মধ্য সমুদ্রে বিপন্ন জাহাজ। কিন্তু যতোক্ষণ ধরে আবৃত্তি হতে থাকলো, আমি অন্তত ততোক্ষণের জন্যে ভুলে গেলাম পরিপার্শ্বের সেই মলিন রুগ্ন ক্লিন্নতা। এবং আবৃত্তি শেষ হলে ঘোষক বললেন, "এতক্ষণ স্বরচিত কবিতা পড়ে শোনালেন ফররুখ আহমদ।"

১৯৫২ সালের শেষ দিকে যখন ঢাকায় এলাম, কলেজে পড়তে, সেই প্রথম ফররুখ আহমদকে দূর থেকে দেখলাম। নাজিমউদ্দীন রোডের যে দোতলা বাড়ীটায় এখন দেখি বোরহানউদ্দীন কলেজ, তখন সেটা ছিল রেডিও স্টেশন। বেতার ভবনের ঠিক উল্টো দিকে ছিল আজিজিয়া রেস্তোরাঁ। ফররুখ আহমদ রেডিওতে চাকুরী করতেন, এ খবর আগেই পেয়েছিলাম। অতএব তাঁকে দেখার লোভেই আজিজিয়া রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসে থাকতাম। তখন তাঁর বয়স তেত্রিশ। দীর্ঘ দেহ মেদহীন, কিন্তু

স্বাস্থ্যের আভায় উজ্জ্বল ছিলো মুখ। শুক্রবার দিন ছাড়া অন্যান্য দিন আসতেন বিকেলে। এসেই রেস্টুরেন্টের ভেতরে একটা ঘুপচি মতো জায়গায় কাগজ কলম নিয়ে বসতেন। সেখানেই জমে উঠতো দর্শনার্থীদের ভিড়। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিক-রাজনীতিক সবাই এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতেন কবি ফররুখ আহমদের সঙ্গে। অনর্গল চলতো গল্প হাসি-চা আর পান। মাঝে মাঝেই শোনা যেতো কবির উদার নির্দেশ, "আবন মিয়া, আরো দুটো লবঙ্গলতিকা আর দু'পেয়ালি চা।"

ফররুখ ভাই কখনো পেয়ালা বলতেন না। যতো মেহমান আসতেন, সবাইকে লবঙ্গলতিকা আর চা খেতেই হতো। শুনেছি ফররুখ ভাই তাঁর বেতনের একটা মোটা অংশই প্রতি মাসের প্রথমেই আজিজিয়া রেস্টুরেন্টে রেখে যেতেন।

যখন আমার দু'চারটি অকিঞ্চিৎকর লেখা এদিক-সেদিক ছাপা হয়ে গেছে, তখন ফররুখ আহমদের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন কবি তালিম হোসেন। সেটা ১৯৫৪ সাল। আই.এ পাস করে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার চেষ্টা করছি। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ফররুখ ভাই প্রথমেই প্রশ্ন করেছিলেন, "বাচ্চা, কি খাবি বল?" এবং বলাই বাহুল্য, আমাকে লবঙ্গলতিকা ও চা না খাইয়ে উঠতে দেন নি। অতঃপর ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত একটানা ফররুখ ভাইকে খুব কাছে থেকে দেখেছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ হলে বেশ কিছুদিন আমাকে ঢাকার বাইরে মফঃস্বলে থাকতে হলো। আবার ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত প্রায় আড়াই বছরের মতো ছিলাম ঢাকায়। তখন আমাদের নতুন কর্মজীবন শুরু হয়েছে। আগের মতো অখণ্ড অবসর ছিলো না। তবু সুযোগ পেলেই চলে যেতাম রেডিও স্টেশনে। অবশ্য ততোদিনে বেতার ভবনটি উঠে এসেছিলো শাহবাগ এ্যাভিন্যুতে।

সে যাই হোক, আন্তরিকতায়, অভ্যর্থনায়, আতিথেয়তায় ফররুখ ভাই ছিলেন সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত। আমাদের দেখলেই এমন হৈ হৈ করে উঠতেন, মনে হতো যেন কতো যুগ পরে পরমাত্মীয়ের সাক্ষাৎ পেলেন। তৎকালীন পূর্ব বাংলার অবিসংবাদিত প্রধান কবি ছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর আচরণে কোনোদিন কোনো প্রিটেনশান বা অহমিকা দেখি নি। অসম্ভব অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতেন; আর ভয়ানক খোলামেলা ভাষায় কথা বলতেন। বৈষয়িক উন্নতির জন্যে তাঁর কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিলো না। থাকলে, অসময়ে অকালে তাঁর মৃত্যু হতো না। তিনি যে পাকিস্তানের স্বপ্নে উদ্বেল হয়ে 'সাত সাগরের মাঝি' লিখেছিলেন, সেই স্বপ্নের দেশ চিরদিন তাঁর অন্বিষ্টই থেকে গেছে। পাকিস্তানের সংহতির নামে অনেকেই মোটামুটি বিত্ত-সম্পদ অর্জন করেছেন। কোনো সুবিধা কেউ প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে শোনা যায় নি।

ফররুখ আহমদকে ইউনেস্কোর একটি বৃত্তি অর্পণ করা হয়েছিলো পঞ্চাশ দশকের শেষ দিকে। লেখক হিসেবে দু'মাসের জন্যে মার্কিন মুলুক ভ্রমণের সেই আমন্ত্রণ তিনি নির্বিকারভাবে নাকচ করে দিয়েছিলেন।

মধ্যবিত্তের ক্ষুদ্র বাসনা, ক্ষোভ, ঈর্ষা ইত্যাদির অনেক ওপরে ছিলেন বলেই সম্ভবত মধ্যবিত্তের সম্ভ্রম তিনি আকর্ষণ করেছিলেন সহজে। তাঁর কিছু-কিছু আচরণের ভেতরে একালের পর্যবেক্ষক হয়তো অবাস্তব মনোভঙ্গি আবিষ্কার করতে পারেন, কিন্তু দু'দশক আগের নিগৃহীত পূর্ব বাংলার পটভূমিতে ফররুখ আহমদ ছিলেন আমাদের মর্যাদাবোধের প্রতীক। পাকিস্তান লেখক সঙ্ঘের মহাসচিব কুদরতুল্লাহ্ শাহাব ঢাকায় এলে প্রায় সবাই তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়েছিলেন, কিন্তু ফররুখ ভাইয়ের বেলায় ঘটেছিলো ব্যতিক্রম। শাহাব নিজেই কবির বাসভবনে গিয়েছিলেন। পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের একজন সিনিয়র সদস্য তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্যসচিব কুদরতুল্লাহ্ শাহাবকে ফররুখ ভাই তাঁর বৈঠকখানার হাতলভাঙা চেয়ারে বসতে দিয়েছিলেন অনায়াসে। এ গল্প তখন ঢাকায় সবার মুখে মুখে। শুধু ফররুখ ভাই নিজে এ বিষয়ে একটি কথাও বলেন নি।

স্পষ্টভাষণের জন্যে তাঁর খ্যাতি ছিলো। ১৯৫৬ সালে এক নবীন কবি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের পশ্চাত প্রবন্ধ মুদ্রণের জন্যে ফররুখ ভাইকে আমার মাধ্যমে একটি শুভেচ্ছাবাণী দেবার অনুরোধ জানান। তখন ঢাকা শহরের অনেক এলাকা বন্যার পানিতে প্লাবিত। ফররুখ ভাই সম্ভবত কমলাপুর বা শাহজাহানপুরে থাকতেন। সেখানেও বন্যার পানি। অতএব দিনের পর দিন তিনি অফিসে আসতে পারছেন না, আমিও তাঁকে অনুরোধটি পৌঁছে দিতে পারছি না। কিন্তু সেই নবীন কবি ততোদিনে এতো অধৈর্য হয়ে পড়েছেন যে, তিনি আর অপেক্ষা না করে নিজেই নিজের কবিতা সম্পর্কে দু'চার কথা লিখে বইয়ের মলাটে ফররুখ আহমদের নাম ছাপিয়ে দিলেন। অচিরেই এই খবর ফররুখ ভাইয়ের কানে গেলো। নবীন কবিও শুনলেন যে, ফররুখ ভাই সব জেনেছেন। অগত্যা বন্যার পানি নেমে গেলে, পাপ স্খলনের জন্যে তিনি শুক্রবার আমাকে সাথে নিয়ে উপস্থিত হলেন আজিজিয়া রেস্টুরেন্টে। ফররুখ ভাই তখন সবে চায়ের পেয়ালা আর কাগজ-কলম নিয়ে বসেছেন। প্রতি শুক্রবার তিনি স্কুলের ছেলেমেয়েদের অনুষ্ঠান কিশোর মেলা পরিচালনা করতেন। তারই স্ক্রিপট লেখার উদ্যোগ করছিলেন তিনি। আমাদের দেখে বসতে বললেন। এবং বললেন, "বাচ্চা, চা খাবি?" আমি ভাবলাম, মেঘ কেটে গেছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তিনি তাঁর বিশাল দুই চোখের পূর্ণ দৃষ্টি রাখলেন নবীন কবির ওপরে। বললেন, "এতোদিন জানতাম মেদ শুধু তোর গর্দানে, এখন দেখছি তোর মগজেও মেদ জমেছে।" প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, আলোচ্য কবি বেশ মোটাসোটা মানুষ ছিলেন।

কর্মস্থলের অনেক কিছুই ফররুখ ভাই বরদাশত করতে পারতেন না এবং তার খোলাখুলি সমালোচনা করতেন। রেডিওর জনৈক আঞ্চলিক পরিচালক একবার তাঁকে ডেকে বললেন, "আপনার জন্যে এই ছোট চাকুরী মানায় না। আপনি রাজী থাকলে অন্যত্র একটি বড়ো পদের ব্যবস্থা করতে পারি। যাবেন?" ফররুখ ভাই হা-হা করে হেসে জবাব দিয়েছিলেন, "প্রফেট কি আর এ্যাঞ্জেলদের ভেতরে আসেন, তিনি স্যাটানদের ভেতরেই আসেন। অন্য চাকুরীতে আমার দরকার নেই।"

অত্যন্ত বাকপটু বলে পরিচিত সেই আঞ্চলিক পরিচালকও নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন এই উত্তর পেয়ে।

যদ্দুর মনে পড়ে, ফররুখ ভাইকে কোনোদিন তাঁর পারিবারিক প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে শুনি নি। ছেলেমেয়ে ক'জন, কে কোথায় পড়াশোনা করছে, এসব বিষয়ে আমরা কিছুই জানতাম না। তাঁর সার্বক্ষণিক আলোচনার বিষয় ছিলো সাহিত্য। একদা আপাদমস্তক রোমান্টিক ফররুখ আহমদ পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি এসে ক্রমশ ক্লাসিকতার ভীষণ অনুরাগী হয়ে পড়লেন। তখন তাঁর প্রিয় কবি মিল্টন, মধুসূদন, এলিয়ট। এপিক আয়তনের কাব্য লিখবেন বলে হাতেম তা'য়ীকে বেছে নিলেন নায়ক হিসেবে। কাব্য স্বভাবের এই পরিবর্তন তাঁর জন্যে কল্যাণকর হয়েছিলো কিনা, সে সিদ্ধান্ত নেবার ভার সমালোচকের। তবে এটা লক্ষ্য করেছিলাম, চল্লিশ দশকে তাঁর কবিতায় যে মাদকতা ছিলো, ছিলো 'ডাহুক' সৃষ্টির যে আশ্চর্য ক্ষমতা– তা যেন ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে অনেক বড়ো– কিন্তু গদ্যময় কাব্য সংগঠন।

আঁটো-সাঁটো সনেট অথবা দীর্ঘ গীতি-কবিতায় কবির আসক্তি তখন আর নেই বললেই চলে। এলিয়টের কাব্যনাটকের দিকে সে সময় তিনি গভীরভাবে ঝুঁকে পড়েছেন। "নৌফেল ও হাতেম" তারই উজ্জ্বল উদাহরণ।

যাই হোক, সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ধ্যান-ধারণাসমূহ সঠিক ছিলো কিনা, তা নিয়ে মুখোমুখি কথা বলার মতো সাহস আমাদের ছিলো না। বস্তুত আজিজিয়া রেস্তোরাঁর ঐসব আসরে আমরা ছিলাম কেবলই শ্রোতা। ফররুখ ভাই প্রায়শ একাই কথা বলতেন। মাঝে মাঝে আবৃত্তি করতেন মাইকেল মধুসূদনের কবিতা থেকে। অসাধারণ স্মরণশক্তি ছিলো তাঁর। 'মেঘনাদ বধ কাব্য' এর সম্পূর্ণটাই বোধ করি তিনি মুখস্থ বলতে পারতেন। আমরা অবাক হয়ে তাঁর মন্থিত কণ্ঠের আবৃত্তি শুনতাম আর ভাবতাম, 'তুমি কেমন করে গান করো, হে গুণী'।

এবং মানুষ-যে কেবল স্বাধিকার বলেই বিশিষ্ট হয়ে ওঠে না, ফররুখ ভাই ছিলেন তার নিঃসঙ্গ দৃষ্টান্ত। তেমন কিছু বড়ো চাকুরী তিনি করতেন না। অথচ গোটা বেতার কেন্দ্রের সর্বস্তরে তিনি ছিলেন সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি। সবাই তাঁকে সমীহ করতো, ভালবাসতো আবার ভয়ও করতো। বলা যায়, আবুল মিয়ার চায়ের দোকানের সেই অন্ধকার খুপরিতে বসে তিনি যে নিরঙ্কুশ শ্রদ্ধা ও মর্যাদা উপভোগ করতেন, প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে সুসজ্জিত ও আরামদায়ক কক্ষে উপবিষ্ট কোনো আঞ্চলিক পরিচালক কখনো তা পাননি। অথচ কী সাদা-সিধা জীবন ছিলো তাঁর! কখনো ইস্তিরি করা কাপড় তাঁকে পরতে দেখি নি। সারা বছর সাবানে-কাচা পরিষ্কার পাঞ্জাবী-পাজামা পরে কাটাতেন। শুধু শীতকালে গায়ে উঠতো কখনো কালো শেরোয়ানি, কখনো একটি গরম চাদর। তবে শুনেছি, বিশ-বাইশ বছর বয়সে, প্রথম যৌবনে, যখন তিনি ছিলেন স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র, তখন বেশভূষায় সৌখিনতার চূড়ান্ত করে ছেড়ে ছিলেন। শান্তিপুরী, ধুতি, ফিনফিনে আদ্ধির পাঞ্জাবী, সোনার বোতাম ইত্যাদি ইত্যাদি সবই নাকি ব্যবহার করতেন। কখনো কখনো এসব গল্প উঠলে

ফররুখ ভাই আজিজিয়া রেস্তোরাঁর ছাদ কাঁপিয়ে হাসতেন। যেন ইঙ্গিতে বলতে চাইতেন, আহ্, তখন যে কী ছেলেমানুষই ছিলাম!

এখনো তাঁর উতরোল হাসি কানে বাজে। ১৯৬৫ সাল থেকেই আমাকে ঢাকার বাইরে থাকতে হয়েছে। তবু কাজে-অকাজে যখনই ঢাকায় এসেছি, রেডিও স্টেশনে গিয়ে খুঁজেছি, ফররুখ ভাই আছেন কিনা। ইতোমধ্যে যে আমাদের বয়স বেড়েছে, ছেলেমেয়ের জনক হয়ে গেছি এসব হিসেবের মধ্যে আনতেন না। যখনি দেখা হতো, সেই চিরাচরিত প্রশ্ন, 'বাচ্চা, চা খাবি!' তাঁর চোখে আমাদের বয়স কোনদিন বাড়ে নি। এবং এই স্নেহ যে শুধু মৌখিক ছিল না, সে প্রমাণও পেয়েছি একাধিকবার।

এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করি। পঞ্চাশ দশকে পাবনা থেকে বেরুতো একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা– 'পাক-হিতৈষী'। তাতে পাতার পর পাতা ছাপা হতো নীলাম-ইস্তাহার। তবু আমাদের মতো কয়েকজন ছেলে-ছোকরার আবদারে সম্পাদক এ কে এম আজিজুল হক মাঝে মধ্যে সাড়া দিতেন। একবার জিয়া হায়দার ও আমার পীড়াপীড়িতে 'পাক-হিতৈষী'র একটি সাহিত্য সংখ্যা বার করতে সম্পাদক রাজী হলেন। সেটা সম্ভবত ১৯৫৫ সাল। নিতান্ত ভাগ্যের ওপরে ভরসা করে ফররুখ ভাইকে চিঠি লিখেছিলাম 'আমাদের জন্যে একটি কবিতা পাঠাবেন' বলে। তখন ঢাকার নামজাদা পত্রিকার সম্পাদকরাও ফররুখ ভাইয়ের লেখা যোগাড় করতেন অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে। অতএব আমার চিঠির পরিণাম কী হবে, তা আমি আগেই ভেবে নিয়েছিলাম। কিন্তু সত্যি সত্যি যখন একটি নতুন লেখা সনেট সমেত তাঁর উত্তর পেলাম, আনন্দে আমি প্রায় কেঁদে ফেলেছিলাম। 'পাক-হিতৈষী'র জন্যে ফররুখ ভাই কবিতা পাঠাবেন একথা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নি।

১৯৬৫ সালের পর থেকে ঢাকার সাথে আমার দীর্ঘ বিচ্ছেদ ঘটে যায়। মফঃস্বল শহর থেকে কাজে-কর্মে কখনো-কখনো ঢাকায় এসেছি বটে, কিন্তু সে রকম সময় করে যেতে পারতাম না রেডিও স্টেশনে। যদ্দুর মনে পড়ে, ১৯৭০ সালের পরে ফররুখ ভাইয়ের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। আর দেখা হবেও না কোনদিন। সেই অসাধারণ প্রাণবন্ত, স্নেহময় মানুষটি চিরতরে বিদায় নিয়েছেন–একথা ভাবতে অবাক লাগে। শাহবাগের বেতার-ভবনে উঠে এসেছিলো আবুল মিয়ার রেস্তোরাঁ। ১৯৭৪ এর পরেও সেখানে বসেছে শিল্পী-কথক-লেখকদের জমজমাট আসর। পুরনো স্মৃতির লোভে মাঝে মধ্যে চা খেতে গেছি সেখানে। পঞ্চাশ দশকের নবীন যুবা আবুল মিয়াকে দেখেছি অকাল বার্ধক্যে ধূসর, ম্রিয়মাণ, নিষ্প্রভ। তার মুখের দিকে চেয়ে থেকেছি গভীর প্রতীক্ষায়–যেন এই তিনি বলে উঠবেন, "একটু বসুন, কবি সাহেব আসবেন।" তা, আমাদের জীবনে অলৌকিক কিছু কি ঘটতে পারে না? না, তেমন কিছু ঘটেনি। সেই দীর্ঘদেহী, সদাপ্রসন্ন ফররুখ ভাই আর কোনদিন এসে বলেন নি, "বাচ্চা, চা খাবি?" (সংকলিত) ◈

---

[লেখক : প্রখ্যাত কবি, শিক্ষাবিদ ও সাবেক মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।]

# একাকী সিন্দবাদ

## ফজল শাহাবুদ্দীন

১৯৭৪ সালের ১৯ অক্টোবর। তারিখটার কথা আমার মনে আছে। কি বার ছিলো এখন আর মনে করতে পারবো না। সম্ভবত রোজার ঈদের পরের দিন। অক্টোবর মাসে শীত তেমন নামে না বাংলাদেশে- কিন্তু শীতের আমেজ থাকে। হেমন্তের আকাশ থাকে বিষণ্ন আলোতে ভরা- বাতাস প্রবল থাকে না। কিন্তু বাতাসে থাকে এক ধরনের শান্ত অবিচ্ছিন্ন সংলাপ। প্রায় সাধারণ সবকিছু। যেমন হয় যে কোনো অঘ্রাণের শেষ দিকে। চুয়াত্তর সালের ১৯ অক্টোবর অগ্রহায়ণ ছিলো কিনা মনে নেই তবে সকালটা ছিলো পরিচ্ছন্ন। আকাশে কিছু মেঘ ছিলো সম্ভবত আর ঢাকা শহরের উপরে ছিন্নবিচ্ছিন্ন সব ছায়া ছিলো সেই সকালের আলোতে মেশানো। সেই সকালে অক্টোবর মাসের উনিশ তারিখ ১৯৭৪ সালে, বেলা ন'টার দিকে আমার কাছে একটি ফোন এলো।

শামসুর রাহমানের ফোন।

ফজল, ফররুখ ভাই মারা গেছেন। ওর নিজের বাসায়- ইস্কাটনের সরকারি ফ্ল্যাটে।

ফররুখ ভাই নানা অসুবিধায় আছেন সেটা জানতাম। কিন্তু ফররুখ ভাই অসুস্থ তেমনটি শুনিনি।

শামসুর রাহমান শুধালেন, আপনি কি বাসাটা চেনেন ?

না, আমি যাইনি কোনোদিন সে বাসায়।

ফ্ল্যাটের নম্বরটা লিখে নেন। দোতলায়। হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের উল্টোদিকে। আমি সেখানে যাচ্ছি সাড়ে ন'টা থেকে দশটার মধ্যেই। আপনি চলে আসেন।

রিসিভার রেখে দিলেন শামসুর রাহমান।

আর আমি। আমি মনে হয় বলতে থাকলাম হায় একী হলো। এ কেমন হলো। আমি হাত থেকে রিসিভারটা রাখলাম আর বসে পড়লাম-বিছানার উপর-বসে থাকলাম। বেশ কিছুক্ষণ শুধু বসে থাকলাম।

আমাদের বাসাবোর বাড়িটা সেই সময় একটা গ্রামের বাড়ি ছিলো-বাড়ি থেকে বেরুনোর সময় আমরা বলতাম শহরে যাচ্ছি। এক বিঘা জমির উপর একটা বড় টিনের ঘর। কয়েকটা নারকেল গাছ, আমগাছ নতুন করে লাগানো। চারদিকে খোলামেলা। আমাদের বাড়ি থেকে সরাসরি তখন দেখা যেতো যাত্রাবাড়ির মোড়-মাঝে মাঝে গাড়ি যাচ্ছে মাঝে মাঝে রিকশা। কখনও কখনও বাতাস চলে আসতো যাত্রাবাড়ির মোড় থেকে আমাদের নারকেল গাছের পাতায় আমগাছের ডালে।

আমি আমাদের ঘরের জানালা দিয়ে তাকাতে চেষ্টা করলাম বিস্তীর্ণ সেই ক্ষেত আর গ্রামের দিকে। আমরা এ এলাকার বাসিন্দা দীর্ঘদিন ধরে। আগে ছিলাম কমলাপুরে। কমলাপুরে ছিলো দুই ভাগে ভাগ করা- কায়েৎপাড়া আর ঠাকুরপাড়া। আর ছিলো কমলাপুরের নতুন নির্মাণ কমলাপুরের নতুন অংশ কমলাপুর বাজার।

আমরা থাকতাম কমলাপুর কায়েৎপাড়ায়- চাকলাদার বাড়িতে।

ফররুখ ভাই থাকতেন কমলাপুর বাজারের কাছে।

একটা মোটামুটি বড় টিনের ঘরে।

সেই টিনের ঘরে আমি বহুবার গেছি। আমাকে শোনাতেন 'হাতেমতাই' গ্রন্থ থেকে- অর্থাৎ হাতেমতাই-এর পাণ্ডুলিপি থেকে। দশ বছর সময়টা তো খুব কম নয়। কতোবার গেছি কতো যে শুনেছি, কোনো কোনোদিন আমরা চলে যেতাম ছান্দার মাঠে- অপরাহ্নের ছায়ায়।

ফররুখ ভাই-এর মৃত্যু সংবাদ আমাকে যে অগোছালো অবস্থায় এনে দিল তা থেকে স্থিত হওয়ার চেষ্টা হয়তো করছিলাম মনে মনে। ছান্দার মাঠে হাঁটতে হাঁটতে ফররুখ ভাই-এর সঙ্গে কবি আর কবিতা নিয়ে কতো যে কথা বলেছি একদিন। মনে মনে ভাবছিলাম সেইসব দিনগুলির কথা। রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল, নজরুল আর ইরানি কবিদের কথা। বিশেষ করে ফেরদৌসীর কথা। মহাকাব্যের কথা।

এমনি সময় আমার কাছে এলো মীরা- আমার স্ত্রী। বয়স দুয়েক হলো আমাদের বিয়ে হয়েছে। শুধালো, কী ব্যাপার চুপচাপ বসে আছো যে। মন খারাপ নাকি।

বললাম, কবি ফররুখ আহমদ মারা গেছেন।

মাই গড- কী হয়েছিলো ওনার। শরীর খারাপ তো শুনিনি।

বললাম, শরীর খারাপ ছিলো সে কথা আমিও শুনিনি। শরীর খারাপ ছিলো না। তাহলে ?

শুধু মারা গেছেন।

মীরা জানতো ফররুখ ভাই- এর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার কথা। সম্ভবত বুঝতে পেরেছিল আমি আক্রান্ত।

বললো, তোমাকে সংবাদটা দিলো কে ?

শামসুর রাহমান।

তুমি কি যাচ্ছ সেখানে ?

বললাম হ্যাঁ, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। শামসুর রাহমান আসবেন সেখানে দশটার মধ্যে।

মীরা আমার দিকে তাকালো, বললো, নয়টা তো বেজে গেছে।

সেইদিন সকাল দশটার আগেই আমি ইস্কাটন পৌঁছে গিয়েছিলাম।

দেখলাম, শামসুর রাহমান এসে গেছেন সেখানে।

অনেক ভিড় ফ্ল্যাটের নিচে সবুজ মাঠটাতে।

আমরা সিঁড়ি বেয়ে উপরে গেলাম- আমি আর শামসুর রাহমান।

নিচে যত ভিড় দেখলাম উপরে ফ্লাটের ছোট্ট বসার ঘরটাতে ভিড় তার চেয়ে অনেক বেশি। প্রায় ঠাসা। এই এতোদিন পরে ভালো করে কিছুই মনে করতে পারবো না। তবে হুদা ভাই- মানে শামসুল হুদা চৌধুরী, তালিম ভাই- মানে কবি তালিম হোসেন, কবি বেনজীর আহমদ, তখনকার গানের জগতের অনেক শিল্পী আর সুরকার- যেমন আহাদ ভাই- মানে আবদুল আহাদ, আবদুল হালিম চৌধুরী, সোহরাব হোসেন, বেদার উদ্দিন এদের দেখেছি বলে মনে হয়। রেডিওর অনেক সহকর্মী এবং সাংবাদিকও ছিলেন। আর ছিলেন যে সময়কার উচ্চপদস্থ আমলারাও।

এতোদিন পরে সবকিছুই কেমন অস্পষ্ট হয়ে এসেছে।

তবে সেই দিনের সেই সকালে একটি ঘটনাকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম অনেকেই।

হুদা ভাই শামসুর রাহমান তরিকুল (তরিকুল আলম শামসুর রাহমানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, কবিতা লিখতেন- যার স্ত্রী ছিলেন বিখ্যাত ক্লাসিক্যাল গায়িকা আভা আলম) আমি এবং সম্ভবত দৈনিক পাকিস্তানের সহকারী সম্পাদক সানাউল্লাহ নূরী ঘরের একপাশে বসেছিলাম। ঘর মানে ফ্ল্যাটের বসার ঘর। কেউ আমরা তেমন কথা বলছি না- কেমন যেন একটা ভাঙা ভাঙা নিস্তব্ধতা সেখানে। ভেতরে কান্নার শব্দও ক্রমশ স্থিত হয়ে আসছে।

এমনি সময় কে যেন একজন এলো ঘরের ভেতর থেকে।

বললো, হুদা ভাই।

হুদা ভাই ফিরে তাকালেন সেই লোকটির দিকে। যেন বলতে চাইলেন, কী ব্যাপার।

লোকটি বললো, একটা আতরের শিশি লাগবে- আতর আনা হয়নি।

হুদা ভাই বললেন, আচ্ছা আমি দেখছি কাউকে পাঠিয়ে আনানো যায় কিনা।

কার একটা নাম যেন বললেন ও আসুক।

এরপর ঘরে আবার সেই ভাঙা ভাঙা নিস্তব্ধতা।

অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটলো ঠিক সেই সময়। প্রায় অসম্ভব প্রায় অলৌকিক।

সেই প্রায় নিঃশব্দ ঘরের দরোজায় কে যেন বাইরে থেকে কড়া নাড়ালো।

একবার দুইবার।

হুদা ভাই বিরক্ত হয়েছেন সেটা তার চেহারা দেখেই বোঝা গেল- রেডিওর একজনকে বললেন দেখতো লোকটা কে ?

মধ্যবয়সী একটা লোক। লম্বা পাঞ্জাবি পায়জামা পরা- মস্তকে সম্ভবত একটা টুপি কিংবা ক্ষুদ্রাকার একটি পাগড়ি। মুখে অল্প দাড়ি।

দরোজা খুলতেই- লোকটা বললো, বেশ সংযত বলিষ্ঠ কণ্ঠে- বললো, আসসালাম আলাইকুম। এইটা কি কবি ফররুখ আহমদ সাহেবের বাসা। আমি

বাগদাদ শরীফ-এর বড় পীর সাহেবের মাজার থাইকা আসছি- আমি ওইখানেই থাকি। কবি সাহেবের জন্যে দুইটা আতরের শিশি আনছি। ওনার এক বন্ধু ভক্ত দিছেন। উনি কেমন আছেন ?

মনে আছে লোকটার কথা শুনে হুদা ভাই উঠে গিয়েছিলেন দরোজার কাছে। সেই লোকটার হাত থেকে আতরের শিশিগুলি নিয়ে বলেছিলেন, শুকরিয়া— কবি সাহেবের শরীর ভালো নেই।

আরও কী যেন বলেছিলেন হুদা ভাই এবং লোকটা চলে গিয়েছিল।

ঘরের ভেতরে অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা নেমে এসেছিলো। একী ঘটলো আমাদের চোখের সামনে।

আমাদের কারো মুখে কোনো কথা নেই। শামসুর রাহমান আমি হুদা ভাই আহাদ ভাই বেনজীর আহমদ নূরী সবাই যেন হঠাৎ একটি বিস্ময়ের মধ্যে নিক্ষিপ্ত। এ কেমন করে সম্ভব। কোনো এক বন্ধু ভক্ত আতরের শিশি পাঠিয়ে দিয়েছে সেই বাগদাদের বড় পীরের মাজার থেকে। সঠিক দিনে যথামুহূর্তে। আমরা কেউ কিছু বলতে পারলাম না। সেই একটা লোক আতরের শিশিগুলি নিয়ে গেলো ভেতরে। কবির লাশের জন্যে।

আমার মনে হলো ফররুখ ভাই, বেঁচে থাকলে বলতেন, শেকসপিয়র থেকে নিয়ে **There are more thinks in heaven and earth horatio** যা তোমাদের ডিকশেনারিতে লিপিবদ্ধ নেই।

মনে হল আমার এই পৃথিবীতে কতো যে ঘটনা ঘটে লৌকিক অলৌকিক কতো যে ফুল ফোটে কতো বর্ণে কতো রঙে কতো যে উল্লাসে, কতো পাখি গান গায়। কোথাও বৃষ্টি নামে কোথাও রৌদ্র খেলা করে।

আমরা তার কিছুই বুঝতে পারি না।

সেইদিন জোহরের নামাজের সময় লাশ নিয়ে ইস্কাটন মসজিদের যাওয়ার কথা জানাজার জন্যে। ফররুখ ভাই-এর শবদেহ নামানো হল দোতলা থেকে নিচে। হঠাৎ কবি বেনজীর আহমদের উত্তেজিত কণ্ঠে শোনা গেলো।

কাউকেই কিছু করতে হবে না। আমার ফররুখকে আমি আমার বাড়িতেই নিয়ে যাব।

কিছু তর্ক বিতর্কেরও শব্দ পাওয়া গেল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই জানা গেলো ফররুখ ভাইকে কবি বেনজীর আহমদ-এর শাজাহানপুরের বাড়িতেই সমাধিস্থ করা হবে।

এবং পরে তাই হয়েছে। সেখানেই তার সমাধি তার মাজার।

বহুদিন পরে শুনেছি, শুনেছি সেদিনকার তর্ক-বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিলো ফররুখ ভাইকে কবর দেয়ার প্রসঙ্গটি নিয়েই ; কথা হয়েছিল তাকে বনানী গোরস্থানে কবর দেয়া

হবে। কিন্তু সরকারি পক্ষের কারা কারা যেন সেটা হতে দেয়নি। তাদের যুক্তি আর দাবি ছিলো যত বড় কবিই হোক না কেন তারা একজন রাজাকারকে সরকারি গোরস্থানে স্থান দিতে পারেনা এবং দেননি। এই ঘটনা সত্যি হলে এর পক্ষে বা বিপক্ষে কারোই কিছু বলা ঠিক হবে না। শুধু বাহাদুর শাহ জাফরের অমর পঙ্ক্তিগুলো একটু এদিক ওদিক করে আমরা উচ্চারণ করতে পারি। -এ্যাতনা হ্যায় বদনাম ফররুখ কী দাফন কে লিয়ে দু'গজ সরকারি জমিন ভী না মিলি ঢাকা শহরমে।

এবং মাঝে মাঝে জানতে ইচ্ছা করে আসলেই ফররুখ ভাই কতটুকু পাকিস্তানি ছিলেন। এবং তার পাকিস্তানি হওয়াটা কতটুকু অপরাধের।

আমার জ্ঞানমতে কবি ফররুখ আহমদ কখনোই পশ্চিম পাকিস্তান নামক ভূখণ্ডে যাননি। তার ব্যক্তিগত শহর ছিল কোলকাতা এবং ঢাকা।

কবিতা রচনা এবং একজন সৎ কবি হিসেবে বেড়ে ওঠেন এবং অচিন্তনীয় পরিণতি অর্জন করেন এই দুই শহরেই। 'পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড' নামে একটি সংস্থা সারা পাকিস্তানের লেখকদের নিয়ে গঠিত হয়েছিলো আইয়ুবের আমলে যার প্রধান স্থপতি ছিলেন কুদরতউল্লাহ শাহাব। উর্দু ভাষায় বড় মাপের লেখক। আমাদের কবি গোলাম মোস্তফা ছিলেন রাইটার্স গিল্ডের সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য। পরবর্তীকালে ছিলেন কবি আবুল হোসেন এবং কবি শামসুর রাহমান। কবি হাসান হাফিজুর রহমান আর আমি দু'জনে মিলে ঢাকায় এই রাইটার্স গিল্ডের পক্ষ থেকেই পাঁচ দিনব্যাপী একটি মহাকবি স্মরণোৎসব করেছিলাম। ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার ইন্সটিটিউটে। সম্ভবত পাঁচজন কবি ছিলেন মীর্জা গালিব, আল্লামা ইকবাল, মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ আর নজরুল। হাসানকে তখন পূর্ব পাকিস্তানে গিল্ডের সেক্রেটারি নির্বাচিত করা হয়- আর আমি ছিলাম হাসানের নিশান বরদার- আমি রাইটার্স গিল্ডে চান্স পাইনি।

কবি ফররুখ আহমদ- গিল্ডের আশপাশে তাকে অন্তত আমি দেখিনি।

একটি কথা শুধু আমি জানি- ১৯৪৬ সালে একটি সুষ্ঠু ও সৎ গণভোটের মাধ্যমে আমরা পূর্ব বাঙলার বাঙালি মুসলমানেরা পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চল হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম- একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে। সেটা আমরা নিজেদের প্রয়োজনে ঐতিহাসিক কারণেই করেছিলাম। এবং পরে নিজেদের প্রয়োজনে, সত্যিকার স্বাধীনতা অর্জন এবং বাঙালির জন্যে একটি নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কারণে আমরা পাকিস্তানকে ফেলে দিয়েছিলাম। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্যে মাঝখানে একটি পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজন। নইলে ইন্দিরা গান্ধী ভারত ভূমি কর্তন করে আমাদের জন্যে বাংলাদেশ ছেড়ে দিতেন না। আসল কথা হল আজকের বাংলাদেশের আমরা সবাই একসময় অখণ্ডিত বঙ্গদেশের বাসিন্দা ছিলাম, খণ্ডিত পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিক ছিলাম এবং এখন আমরা বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির বাসিন্দা। সবকিছুই আমরা নিজেরা করেছি- আমাদের প্রয়োজনে- ঐতিহাসিক কারণে। আমরা

সবাই এই প্রক্রিয়ার অংশ অঙ্গ এবং যোদ্ধা।

এবং কবি ফররুখ আহমদ আমাদের মতোই একজন ছিলেন। একজন সৎ বাঙালি একজন সৎ মানুষ এবং সবার উপরে একজন সৎ ও মহৎ কবি।

ফররুখ ভাই- এর সঙ্গে ছান্দার মাঠে অনেক হেঁটেছি। এই পদভ্রমণের সময় আমরা অনেক অনেক কথা বলতাম। এবং বেশিরভাগে কথা কবিতা নিয়ে কবিদের নিয়ে। মাইকেল আর রবীন্দ্রনাথ আর নজরুল থেকে মুখস্থ আবৃত্তি করতেন ফররুখ ভাই- বেশি করতেন মাইকেল থেকে।

মাঝে মাঝে শেকসপিয়র থেকে আর টিএস এলিয়ট থেকে আবৃত্তি করতেন।

প্রথম তার কণ্ঠে শেকসপিয়র শুনে আমি ভীষণ অবাক হয়েছিলাম। অনেকের মতো তখন আমারও ধারণা ছিলো ইংরেজি এবং ইউরোপীয় কবিতা সম্পর্কে ফররুখ ভাই- এর অনুশীলন সীমিত।

একটা কথা বলে রাখি আর যাই থাকুক না কেন কবি ফররুখ আহমদ বাংলাদেশের চলতি অর্থে কখনোই মোল্লা ছিলেন না। তিনি ছিলেন সত্যিকার অর্থেই একজন আধুনিক মানুষ। আর কবি ছিলেন এমন একটি জগতের যাকে বাংলা কবিতায় সম্পূর্ণ নতুন এক পরিমণ্ডল বলে আমি শনাক্ত করতে চাই। সেই আরব্য উপন্যাসের সিন্দাবাদের জগত যেখানে সমুদ্র থেকে সমুদ্রের ঘোরে দরিয়ার শাদা তাজী- যেখানে সিন্ধু ঈগল পাড়ি দেয় পাশে যেন উত্তাল রাত- যে ঈগলের তনু তুফানের ছাঁচে ঘূর্ণাবর্তে সুগঠিত- যেখানে দীর্ঘছন্দা নারিকেল শাখে মুক্তি উঠিছে বাজি- সরন্দীপের তীরে তীরে যেথা পাখিরা ধরেছে গান- এ জগত আধুনিক বাংলা কবিতার যারা সৎ পাঠক, তাদের কাছে এক বিস্ময়কর চমক এক অবিশ্বাস্য স্বপ্নলোকের একান্ত উন্মোচন।

আমার বলতে দ্বিধা নেই আমি ফররুখ আহমদের এই সমুদ্র মন্থিত স্বপ্ন মুখরিত আবর্তে আবর্তে দিশেহারা পাখি আর হাওয়া আর গজল দ্বারা প্রবলভাবে আক্রান্ত হয়েছিলাম। তাকে একদিন বলেছিলাম, ফররুখ ভাই আপনার কবিতাকে আপনি যে জগতে নির্মাণ করেছেন একবার পৌঁছে গেলে পাঠককে পাগল হতেই হবে।

ফররুখ ভাইকে বলতাম, আপনি আধুনিক বাংলা কবিতার এক অসামান্য একাকী সিন্দবাদ।

কী সহজে আপনি বলতে পারেন, আফতাব ঘোরে মাথার উপরে মাহতাব ফেলে দাগ- উচ্চারণ করতে পারেন, কেটেছে রঙিন মখমল দিন নোনা দরিয়ার ডাক, নতুন পানিতে সফর এবার হে মাঝি সিন্দবাদ।

ফররুখ আহমদকে আমি মনে করি আধুনিক বাংলা কবিতার এক অসামান্য নির্মাণ শিল্পী রূপকার। তিনি সমুদ্রের কবি দরিয়ার বিরল চিত্রকার।

বাংলা কবিতার চল্লিশ দশকের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।

আমি কবি সুভাষ মুখোপধ্যায়কে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু কবি ফররুখ আহমদ সম্পর্কে

জিজ্ঞেস করেছিলাম- জানতে চেয়েছিলাম কোলকাতায় ওদের বন্ধুদিনগুলোর কথা। সুভাষদা শুধু বলেছিলেন- ফররুখ অনেক বড় মাপের কবি।

মুক্তিযুদ্ধের পর ঢাকায় এসে সুভাষদা যার সঙ্গে প্রথম দেখা করতে চেয়েছিলেন তিনি কবি ফররুখ আহমদ।

কবি আবদুল গনি হাজারী সুভাষদাকে নিয়ে গিয়েছিলেন ফররুখ ভাইর কাছে। আমার পরম শ্রদ্ধেয় এককালের সাংবাদিক রহিম উদ্দীন সিদ্দিকী একদিন আমাকে আর শামসুর রাহমানকে বলেছিলেন, ফররুখের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেছো কোনোদিন- ফররুখের চোখের সঙ্গে ঈগলের চোখের যেন কোথায় একটা মিল আছে।

এতোদিন পরে আমার মনে হয় কথাটা হয়তো ঠিক। ফররুখ ভাই- এর জন্যে ঈগল পাখি ছাড়া অন্য পক্ষীর কথা আমি ভাবতেও পারি না। মাল্লা দরিয়া কিশতী আসমান নোনাপানি অফুরান জিন্দিগী, হারামী মুহূর্ত আর শাহের জাদীর সঙ্গে মিতালীর জন্যে সিন্ধু ঈগলের একান্ত প্রয়োজন।

তাই তো অনায়াসে এই একাকী সিন্দবাদ যেতে পারেন জানাতে পারেন আমাদের নামে নির্ভীক সিন্ধু ঈগল দরিয়ার হাম্মামে।

বাংলা কবিতার এই একাকী সিন্দবাদকে আমি শুধু জানাতে পারি, বলতে পারি- আমরা এখন নতুন দিনের যাত্রী। নতুন পানিতে সফর এবার হে মাঝি সিন্দবাদ। ❑

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, সপ্তদশ সংখ্যা, জুন-২০০৯]

# কবি ফররুখ আহমদ এবং কমলাপুরের গল্প

**ফজল শাহাবুদ্দীন**

পুরনো ঢাকায় আমরা দক্ষিণ মৈশন্দি নারিন্দা রোকনপুর কলতাবাজার এলাকায়। শিশুকাল থেকে আমার যত স্মৃতি সবই এই এলাকার। যখন কৈশোর এলো তখন সাঁতার কাটতাম নারিন্দার দোলাই খালের স্বচ্ছ পানিতে। মনে আছে, আমাদের সাঁতারের চৌহদ্দি ছিল নারিন্দার পুল থেকে রায়সাহেব বাজারের পুল অবধি। মসজিদের নিচে যে ঘাট ছিল, সে ঘাট অবধি। যখন বর্ষা আসত সে খাল ভরে যেত স্বচ্ছ সুন্দর টলমলে নতুন পানিতে। ১৪ আগস্ট সে খালে হতো নৌকা বাইচ। আমরা থাকতাম লালমোহন সাহা স্ট্রিটে ১৫২ নম্বর বাড়িতে-মনে আছে এখনো চার কামরার একতলা একটি বাড়ি। আলাদা রান্নাঘর। সে রান্নাঘরে অচিন্তনীয় এক বাতাস আসত নারিন্দার খাল থেকে– সরু একটি লম্বা গলি দিয়ে। পুরনো ঢাকার ভঙিতে একটি জানালা ছিল আমার আম্মার সে রান্নাঘরে। বাতাস আসত খাল থেকে–পানিতে ভেজা বাতাস। আমার আম্মার খুব পছন্দ ছিল সেই বাতাসের স্পর্শ। কোনো কোনো দিন বলতেন– আজকের বাতাসে অনেক পানি–বৃষ্টি নামবে এখনি।

সত্যি বৃষ্টি নামত–নারিন্দার খাল থেকে শুরু করে লোহার পুল, আর লোহার পুল থেকে বুড়িগঙ্গার উপরে বিশাল আকাশ পর্যন্ত। জিঞ্জিরা কেরানীগঞ্জ চুনকুটিয়া আন্দোলিত হতো সেই বাতাস ভরা বৃষ্টিতে। একাকার হতো পূর্বদি পশ্চিমদি উত্তরদি দক্ষিণদি। ছল ছল করে উঠত আবদুল্লাহপুর রাজেন্দ্র পুর আরো একটু দূরে ধলেশ্বরী নদীর ঘনিষ্ঠ জলের শরীর।

কিন্তু হায় আমি তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি মাত্র– কিংবা সম্ভবত ম্যাট্রিক পাস করেছি মাত্র। পড়ছি জগন্নাথ কলেজে। সতেরো বছর বয়সে আমার একটি দু'টি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকায়। কবিতার আশ্চর্য সুবাতাস আমার অস্তিত্বের চতুর্দিকে। সে সময় একদিন। আব্বা জানালেন আমরা চলে যাচ্ছি দক্ষিণ মৈশন্দি ছেড়ে। ঢাকার উপকণ্ঠে কমলাপুর নামে একটি গ্রামে। শুনে প্রায় কান্না পেল আমার। আম্মা অস্থির হলেন, বললেন– আমি আমাদের কুমিল্লার বাড়িতে চলে যাবো।

যদি গ্রামেই থাকতে হয় নিজেদের গ্রামেই থাকব। ছোট বোন জ্যোৎস্না আমায়–জিজ্ঞেস করল সেখানে কি স্কুল আছে ভাইসাব– ঘোড়ার গাড়ি চলে। আব্বারও দেখলাম মন খারাপ। তবে বাইরে থেকে বুঝবার উপায় নেই।

সবারই মন খারাপ-এক ধরণের বিষণ্নতায় ভরা। তবু যেতে হলো শহর ছেড়ে। দক্ষিণ মৈশন্দি ছেড়ে। তবু যেতে হলো। শহর ছেড়ে। দক্ষিণ মৈশন্দি ছেড়ে। আমার বন্ধু

রহমান, সেলিম, জালালকে ছেড়ে। নতুন এক গ্রামে। নতুন এক আকাশের নিচে। কমলাপুরে। মনে আছে আমি প্রায় প্রতিদিনই পায়ে হেঁটে চলে যেতাম দক্ষিণ মৈশন্দি নারিন্দা আর রোকনপুর কলতাবাজারে। নারিন্দা পুলে বিকেল বেলা বসত যে চীনাবাদামওয়ালা-প্রায় আব্বার বয়সী-সেই সালাম মিয়ার কাছ থেকে কিনতাম এক পয়সা দিয়ে এক ছটাক চীনাবাদাম। মনে হতো এমন চীনা বাদাম সারা পৃথিবীতে আর কোথাও পাওয়া যাবে না। আমি যেন পুরনো ঢাকাকে কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। আসলে এই এত বছর এত যুগ পরও আমি পুরনো ঢাকাকে ভুলতে পারিনি। কিন্তু সেটা তো অন্য কাহিনী অন্য এক ভুবনের রূপকথা। সংক্ষিপ্ত বচনে চলে আসি কমলাপুরে।

আমার জীবনের অন্য এক পর্ব। ভিন্ন এক মঞ্চ এবং আমার প্রথম যৌবনের মতো নতুন এক কাহিনী। কমলাপুর আমাকে অনেক কিছুই দিয়েছিল। নতুন পায়ে হাঁটা পথ নতুন মানুষ নতুন সব মাটির ঘর নতুন বৃক্ষরাজি নতুন আম্রকানন নতুন পুকুরঘাট নতুন লেবুবন এবং নতুন কায়েপাড়, ঠাকুরপাড়া।

কিন্তু সবচেয়ে বড় পাওনা আমার কমলাপুরে এসে এখন মনে হয়, দু'জন মহৎ কবির সান্নিধ্য। জসীমউদ্‌দীন আর ফররুখ আহমদ। আধুনিক বাংলা কবিতার দুই অমর শিল্পী। এত কাছে, এত নৈকট্যে– যা আমি কোনো দিন ভাবিনি, ভাবতে পারিনি। এর মধ্যে ফররুখ ভাইয়ের সঙ্গে কেমন করে যেন ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক হয়ে গেল আমার এখন মনে হয়–সম্ভবত সাত সাগরের মাঝির কারণেই কিংবা হয়তো অসামান্য সেই কাব্যগ্রন্থের কারণে যাকে আমরা অবহেলায় গভীর খাদে নিক্ষেপ করে বসে আছি– হাতেম তা'য়ীর জন্য।

এখন আমি নির্ভয়ে নির্দ্বিধায় বলতে পারি ব্যক্তি ফররুখ আহমদকে যারা দূর থেকে দেখেছেন, তারা তাকে আসলে প্রকৃত অর্থে দেখতেই পাননি। আর কিংবা ফররুখ আহমদের কবিতা পড়ে যারা তাকে একজন মোল্লা মনে করেছেন তারা আসলে তাঁর কবিতা সত্যিকার অর্থে বুঝতে পারেননি, উপলব্ধি করতে পারেননি। ফররুখ আহমদ এমন একজন কবি যিনি বাংলা ভাষায় আমাদের জন্য একটি নতুন পৃথিবী নতুন ভুবন নির্মাণ করেছেন, যিনি তাঁর কবিতার জন্য নতুনতরো শব্দ আবিষ্কার করেছেন, নতুন অর্থে প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং কবিতার শরীরে অসামান্য কাব্যনিষ্ঠার এবং নৈপুণ্য গ্রথিত করেছেন সাত সাগরের মাঝি কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতা তার প্রমাণ। হাতেম তা'য়ী মহাকাব্যটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমি কিছু পঙক্তি এখানে উল্লেখ করতে পারি। যেমন সিন্দবাদ কবিতায়–

কেটেছে রঙিন মখমলদিন, নতুন সফর আজ,
শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ,
পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ ব'য়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক;

নতুন পানিতে সফর এবার, হে মাঝি সিন্দবাদ !

একই কবিতায়–

কোথায় জাহাজ হবে ফিরে বানচাল,
তক্তায় ভেসে কাটবে আবার দরিয়ার কতকাল;
সে কথা জানিনা মানি না সে কথা দরিয়া ডেকেছে নীল!
খুলি জাহাজের হালে উদ্দাম দিগন্ত ঝিলমিল,
জংগী জোয়ান দাঁড় ফেলে করি দরিয়ার পানি চাষ,
আফতাব ঘোরে মাথার উপরে মাহতাব ফেলে দাগ,

... ... ... ...

বিষ নিশ্বাসে জিন্দিগী ফের কেঁদে ওঠে বিস্বাদ,
নতুন পানিতে সফর এবার, হে মাঝি সিন্দবাদ।

ফররুখ ভাইয়ের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ প্রায় আকস্মিক–সম্ভবত কার সঙ্গে আমি যেন পুরনো ঢাকায় রেডিও পাকিস্তানের অফিসে গিয়েছিলাম সেইখানে। আমাকে আলাপ করিয়ে দিলেন যিনি– বললেন, ফররুখ ভাই ওর নাম (আবুল) ফজল শাহাবুদ্দীন–ও কবিতা লেখে।

ফররুখ ভাই খুব স্বাভাবিকভাবেই আমার দিকে ফিরে তাকালেন। আমাকে এক আকুল বিস্ময়ে ঠেলে দিয়ে আসলেন বললেন, তোর কবিতা পড়েছি দিলরুবায়।

কার সঙ্গে যেন কথা বলতে বলতে ফররুখ ভাই একটু দূরে চলে গেলেন। এতদিন পর হলেও এখনও মনে আছে। তিনি আমাকে প্রথম দিনেই তুই সম্বোধন করেছিলেন। সে সময় আরো একজন আমাকে তুই বলেছিলেন। তিনি সমকাল সম্পাদক কবি সিকান্দার আবু জাফর। এখন মনে হয় জাফর ভাই আমাকে খুবই ভালোবাসতেন। এখন আমার খুব খারাপ লাগে ভাবতে আমাদের সাহিত্যে এই সব ভালোবাসা আর নেই।

ফররুখ ভাই থাকেন কমলাপুরের বাজারের কাছে আসিরুদ্দিন সরদারদের বাড়ির দিকের কোনো একটা জায়গায়। একটা টিনের ঘরে। আজকাল সেই রকম টিনের ঘরে আমরা আর থাকি না। সে টিনের ঘরের একপাশে ছোট্ট একটা অংশ বসার রুম ছিল। আমি বহুবার গেছি সেখানে কিন্তু আমরা ঘরে বসে খুব কমই আড্ডা দিয়েছি কিংবা কবিতা নিয়ে আলোচনা করেছি। ফররুখ ভাইয়ের বাসার পেছন দিকে একটু হেঁটে গেলেই ছিল বিশাল খোলা মাঠ– আজকের টি এন্ড টি কলোনি পর্যন্ত সরাসরি বিস্তৃত। আমরা বলতাম ছান্দার মাঠ।

সে মাঠে অনেক হেঁটেছি আমরা। কথা বলেছি। কবিতার কথা কবিদের কথা। কখনো দেশের কখনো বিদেশের। কখনো নজরুল কখনো রবীন্দ্রনাথ। আবার কখনো বা শেকসপিয়র আর রোমান্টিক কবিরা। কখনো আমাদের আধুনিক বাংলা কবিতা–কলকাতার আধুনিক বাংলা কবিতা। ত্রিশের কবি ও কবিতা। বুদ্ধদেব বসুর

কবিতা, জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেন, সাতটি তারার তিমির প্রভৃতি কবিতা। সুধীন দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী এমনকি সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। ছান্দার মাঠে আমার আর ফররুখ ভাইয়ের সাথে কখনো কখনো আরো একজন দু'জন থাকতো। কখনো আরো বেশি। বেশ আড্ডার মতো মনে হতো তখন।

ফররুখ ভাইয়ের প্রিয় বিষয় মাইকেল মধুসূদন। মাইকেল থেকে অনবরত মুখস্থ আবৃত্তি করতে পারতেন ফররুখ ভাই। আমি মাইকেল থেকে আবৃত্তি করা শিখেছি ফররুখ ভাই থেকেই। মাঝে মাঝে শেকসপিয়র থেকে বিশেষ করে হ্যামলেট থেকে আবৃত্তি করে তিনি আমাদের চমকে দিতেন। রেডিওর অনেককেই দেখেছি ফররুখ ভাইয়ের বাসায় আসতেন এ ছান্দার মাঠের আড্ডার জন্য। আসলে কবিতায় কোনো ক্লান্তি ছিল না তাঁর।

হাতেম তা'য়ী পাণ্ডুলিপি থেকে আমাকে মাঝে মাঝে শোনাতেন ফররুখ ভাই। আমার খুব উৎসাহ ছিল হাতেম তা'য়ী নিয়ে। সেটি বুঝতেন তিনি। এক দিন ফোন পেয়েছিলাম ফররুখ ভাইয়ের কাছ থেকে। বললেন, তোর হাতেম তা'য়ী থেকে ছাপছে মাসিক মোহাম্মদী– প্রথম কিস্তি বেরিয়েছে চলতি সংখ্যায়। পড়বি নিশ্চয়ই। কেমন লাগছে জানাবি। মুদ্রিত অবস্থায় না দেখলে কোনো লেখারই আসল সত্যটা বোঝা যায় না। এখন ভাবলে মনে হয়, আমাকে যে সম্মান ফররুখ ভাই সে সময় দিয়েছিলেন–এমন ভাগ্য ক'জনের হয়।

ফররুখ ভাইদের বংশের সবারই সৈয়দ পদবি ছিল। ফররুখ ভাই সেই পদবি ব্যবহার করেননি কখনো। আমি এ সংবাদটি জানতাম কিন্তু কামরুল ভাই (প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান) তাঁর একটি প্রবন্ধে এ বিষয় নিয়ে খুব সুন্দর একটি খবর দিয়েছেন। লিপিবদ্ধ করছি কামরুল হাসানের নিবন্ধ থেকে।

"ফররুখ ভাই ছিলেন সত্যিকারের নিপীড়িত আদমসন্তানদের অতি আপনজন। না হলে সেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগেই একজন ব্রিটিশ সরকারের সনদ পাওয়া পুলিশ অফিসার এবং সৈয়দপুত্র নিজের নামের আগে সৈয়দ লেখা ত্যাগ করেছিলেন। কারো নির্দেশে নয়– কোনো প্রভাবশালী নেতার ভয়েও নয়। হঠাৎ এক সময় আমরা দেখলাম, ফররুখ ভাই আর সৈয়দ লেখেন না। প্রশ্ন করলাম এক দিন। ফররুখ ভাইয়ের ভাষাতেই বলি। তিনি উত্তর দিলেন– অনেক ভেবে দেখলাম, ওই শালার সৈয়দের গোষ্ঠীর মধ্যে থাকলে সত্যিকার মানুষের গোষ্ঠীর বাইরেই থাকতে হবে আমাকে। তোরা কী মনে করিস? ও শালার ফালতু ল্যাজটা কেটে বাদ দিয়ে দিলাম।" –ফররুখ ভাই শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে।

কবি ফররুখ আহমদ অত্যন্ত নির্লোভ মানুষ ছিলেন। রেডিওতে যে চাকরিটি তিনি করতেন– তা প্রকৃত পক্ষেই একটি সামান্য চাকুরি ছিল। কিন্তু সেই রেডিওতেই তিনি কখনোই একজন সামান্য মানুষ ছিলেন না। একজন কবির সম্মানকে তিনি সব

সময় অত্যন্ত সযত্নে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করে রেখেছিলেন। রেডিওর ডিজি সাহেব করাচি থেকে যখন আসতেন তখন তারা দেখা করতে হলে সম্মান করে কবি যেখানে বসতেন সেখানে যেতেন। কবিকে ডাকতেন না তাদের কামরায়।

একবার পাকিস্তান সরকার সিদ্ধান্ত নিলো কবি ফররুখ আহমদকে পাকিস্তানের রোভিং অ্যামব্যাসেডর হিসাবে বিদেশ ভ্রমণে পাঠাবেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাঁকে যেতে হবে একজন রাষ্ট্রীয় দূত হিসাবে এবং সেখানে তিনি নিজের কবিতা পাঠ করবেন বাংলায়। সেই সরকারি সিদ্ধান্ত নিয়ে ঢাকায় তখন এসেছিলেন করাচির ইনফরমেশন মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি সুবিখ্যাত আলতাফ গওহর। পাকিস্তান সরকার তাঁকে কোনো চিঠি দেননি। একজন পূর্ণ সেক্রেটারিকে পাঠিয়ে ছিলেন ঢাকা–কমলাপুরে তাঁর বাসায় সে টিনের ঘরে। আমরা জানি, আলতাফ গওহর একজন কবি ছিলেন একজন লেখক ছিলেন একজন অধ্যাপক ছিলেন–তিনি শুধু সিএসপি ছিলেন না। তাকে পাঠিয়ে ছিলেন পাকিস্তান সরকার। কবি ফররুখ আহমদকে বোঝাতে, রাজি করাতে। কবি হিসাবে এখানে কোনো অসম্মান করা হচ্ছে না। নিজের দেশের জন্য তিনি শুধু নিজের কবিতাই পাঠ করবেন–তার বেশি কিছু নয়।

কবি ফররুখ আহমদ তাঁর কমলাপুরের সেই টিনের ঘরে বসে আলতাফ গওহরের সব কথাই শুনেছিলেন এবং কোনো কথাকেই তিনি অযৌক্তিক বলে প্রত্যাখ্যান করেননি। তিনি সবিনয়ে শুধু একটি কথাই বলেছিলেন, এটা একজন কবির কাজ নয়। তিনি সেই বিশাল প্রস্তাবকে সবিশেষ বিনয়ের সাথে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

একজন কবির এমন প্রবল নির্লোভ মানসিক শক্তি এ দেশে আর দ্বিতীয়টি তো আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি। ভবিষ্যতে দেখার কোনো সম্ভাবনা আছে বলেও আমার মনে হয় না। কেননা বাংলাদেশের কবিরা অন্য এক পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের সনাক্ত করে বেশ আনন্দের সাথেই মঞ্চে আরোহণ করে বসে আছেন। এসব প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ-সংলাপ না করাই ভালো। ফররুখ ভাই এবং তাঁর কবিতায় ফিরে আসি।

দীর্ঘদিন আগে শামসুর রাহমান ফররুখ ভাই এবং তাঁর কবিতাকে নিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় সে সময়কার দৈনিক পত্রিকা মিল্লাত–এর সাহিত্য পাতায়। সে পাতায় আমার একটি গদ্য রচনা ছাপা হয়েছিলো। আর ছাপা হয়েছিল লতিফা রশীদের হৈমন্তিক গ্রামে একটি কবিতা। সেই রচনায় শামসুর রাহমান ফররুখ ভাইয়ের সাত সাগরের মাঝি কাব্য গ্রন্থটির বিশেষ প্রশংসা করে লিখেছিলেন, তিনি সাত সাগরের মাঝি কবিতা গ্রন্থটিকে আধুনিক বাংলা কবিতার একটি বিশেষ ঘটনা বলে মনে করেন– যে অর্থে বুদ্ধদেব বসুর বন্দীর বন্দনা, সমর সেনের কয়েকটি কবিতা এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একাধিক আধুনিক বাংলা কবিতার এক একটি বিশেষ ঘটনা।

আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে–রচনাটি তখনকার মিল্লাত-এর সাহিত্য সম্পাদক রহীমউদ্দিন সিদ্দিকীকে দেয়ার আগে শামসুর রাহমান লেখাটি আমাদের দু'জনকেই পড়ে শুনিয়েছেন। লেখাটির নাম ছিল একজন কবি। ফররুখ ভাই তখন বেঁচে ছিলেন।

কবি ফররুখ আহমদ সম্পর্কে একজন পাঠক হিসাবে আমার অনুধাবন অত্যন্ত সহজ এবং সরাসরি। ত্রিশের কবিদের পরবর্তী সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবি বলে তাঁকে আমি মনে করি। আমার ধারণা আধুনিক বাংলা কবিতার যারা সৎ পাঠক তাদের বেশির ভাগই আমার এবং আমাদের এই সহজ অনুধাবনকে মেনে নেবেন। আমাদের সাথে একমত হবেন। কমলাপুরের বাড়িতে দীর্ঘদিন ছিলাম আমরা।

কবি ফররুখ আহমদও ছিলেন কমলাপুরে অনেকদিন। সেই টিনের চালার ঘরে। কবি জসীমউদদীনের দোতলা বাড়িটা এখনো কমলাপুরের এক প্রান্তে। তাঁর বাড়ির কাছে আছে একটি সরু গলি– যার নাম কবি জসীমউদ্‌দীন রোড। এ গলির নাম কবি জসীমউদদীন রোড রেখেছিল গ্রামেরই একদল তরুণ ছেলে পঞ্চাশ দশকের শুরুতে।

ফররুখ আহমদের নামে কোন রাস্তা-গলি কিংবা মাঠের নাম নেই এই কমলাপুরে কবি ফররুখ আহমদের সংস্কৃতিতে বাংলাদেশের অন্য কোথাও কোন কিছু আছে কিনা আমার জানা নেই।

ফররুখ ভাইয়ের কথা মনে হলেই আমার মনে পড়ে পঞ্চাশ দশকের সেই কমলাপুরের কথা–যেখানে বৃক্ষ ছিল, পাখি ছিল, প্রজাপতি ছিল, পুকুর ছিল আর ছিল ছান্দার মাঠ। ছিলেন কবি জসীমউদদীন ছিলেন ফররুখ আহমদ। ছিল আঁকাবাঁকা পায়ে চলার পথ, ছিল জাহাজবাড়ি।

মনে আছে আমার ফররুখ ভাই যে দিন ইন্তেকাল করেছিলেন সে খবরটি আমাকে দিয়েছিলেন কবি শামসুর রাহমান টেলিফোনে। ঠিকানা দিয়েছিলেন ফ্ল্যাট বাসাটির। আর আমরা দু'জনই সকাল ১০টার মধ্যে সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলাম।

প্রায় বিকেলের দিকে কবি বেনজীর আহমদ বলেছিলেন–ফররুখকে আমি নিয়ে যাব আমার শাহজাহানপুরের বাড়িতে এবং নিয়ে গেলেনও।

ছান্দার মাঠের খুব কাছে- ফররুখ ভাইয়ের সাথে আমরা সেখানে হাঁটতাম তার খুব কাছে–সমাহিত করা হলো ফররুখ ভাইকে। বেনজীর আহমদের সৌজন্যে। আমি এখন থাকি বাসাবোতে। আমার বাবার রেখে যাওয়া বাড়িতে। এখান থেকে শাহজাহানপুরের পথ খুব বেশি দীর্ঘ নয়। দূরে নয়। তবু আমি কিন্তু জানি না কোথায় বেনজীর আহমদের বাড়ি–কোথায় কবি ফররুখ আহমদের সমাধি। বেনজীর আহমদ এখন আর নেই- কে তাহলে দেখাশোনা করে সেই সমাধি। নাকি দিল্লিতে গালিবের কবরের মতো নিঃসঙ্গ পড়ে আছে। অসম্ভব কিছু নয়।

এত কাছে–তবু জানি না কিছুই। খবর নিতে পারি না –নিই না। নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হয় মাঝে মাঝে। মনে হয় কবি ফররুখ আহমদকে ভয়ঙ্কর এক

একাকিত্বের মধ্যে নিক্ষেপ করেছি আমরা। এমনকি তাঁর কবিতাকেও শামসুর রাহমান ফররুখ ভাইয়ের একটি কবিতার কথা বারবার আমাকে বলতেন। একটি সনেট। আমারও প্রিয় কবিতা এই সনেট। বন্দরে সন্ধ্যা। শেষ করার আগে কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করতে চাই।

গোধূলি-তরল সেই হরিণের তনিমা পাটল
—অস্থির বিদ্যুৎ, তার বাঁকা শিঙে ভেসে এল চাঁদ,
সাত সাগরের বুকে সেই শুধু আলোক-চঞ্চল;
অন্ধকার ধনু হাতে তীর ছোঁড়ে রাত্রির নিষাদ।
আরব সমুদ্র-স্রোতে ক্রমাগত দূরের আহ্বান,
তরুণীর মুখ থেকে মুছে গেছে দিনের রক্তিমা,
এ দিকে হরিণ আনে বাঁকা শিঙে চাঁদঃ রমজান;
ক্ষণাঙ্গীর প্রতীক্ষায় যৌবনের প্রাচুর্যঃ পূর্ণিমা।
ষোল পাপড়িতে ঘেরা ষোড়শীর সে পূর্ণ যৌবনে
আসিল অতিথি এক বন্দরের শ্রান্ত মুসাফির!
সূর্যাস্তের অগ্নিবর্ণ সেহেলির বিমুগ্ধ স্বপনে,
নিভৃত ইঙ্গিত তার ডেকে নেয় পুষ্পিত গহনে;
অনেক সমুদ্র তীরে স্বপ্নময় হ'ল এ শিশির,
তারার সোনালি ফুল ছিটে পড়ে রাত্রির অঙ্গনে ॥

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ঊনবিংশ সংকলন, জুন ২০১০]

# ফররুখ আহমদ : জীবন ও কাব্য সাধনা

## হাসান ইকবাল

ফররুখ আহমদের কবিতায় পড়িয়াছি- 'শুনেছি সুদূর আঞ্জির শাখে টাঙানো দোলার গান'। আঞ্জির কখনো দেখি নাই, জানার তেমন তাগিদ কখনও অনুভব করি নাই। কাল ঝড়ের রাতে পাটাতনে পাতিয়া কান সিন্দাবাদের পঞ্চম মাল্লা যখন 'আঞ্জির শাখে টাঙানো দোলার গান' শোনেন তখন সাত সাগরের পাড়ে কোন ধরনের বৃক্ষ বলিয়াই আবছা-আবছা মনে হইত। কিন্তু আঞ্জির যে একটা ফল এবং মানুষ খায়, তাহা জানা ছিল না। ইরানে যাইয়া আঞ্জিরের সঙ্গে বাস্তব পরিচয়, অপ্রত্যাশিত চমক। আঞ্জির প্রসঙ্গে মনে পড়ে কবি ফররুখ আহমদের কীর্তির কথা। ফররুখের কবিতা প্রায় সকলেরই ভাল লাগে। তবে কেউ স্বীকার করেন, কেউ চুপ থাকেন। এই লেখককেও ফররুখ আকৈশোর আকর্ষণ করিয়াছেন। দরিয়ার গর্জনে, অচেনা রূহা দ্বীপের কল্পনায়, সাত সাগরের সীমা জরীপে, হাতীর হাড়ের সওদা নিয়া বিপুল মরিচ, এলাচের বিকি-কিনিতে আকর্ষণ প্রবল। বিশেষভাবে তরুণ মনের রোমান্টিক চেতনায়। 'আয়েশী রাতের মখমল অবসাদ' ঝাড়িয়া ফেলিয়া সিন্দাবাদের সঙ্গে নূতন পানিতে সফরের নেশা কার না জাগ্রত হয়।

ফররুখ আকর্ষণ করিত। কিন্তু বাংলা কাব্যজগতে তাঁহার অবস্থান সম্পর্কে তেমন ধারণা ছিল না। ফররুখের প্রথম পরিচয় পাই কবি শামসুর রাহমানের দীর্ঘ এক নিবন্ধ পাঠে। পঞ্চাশ দশকে অধুনালুপ্ত 'মিল্লাত' পত্রিকায় তাঁহার সেই নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। কোর্ট হাউজ স্ট্রীটের সেই মিল্লাত। সত্য বলিতে গেলে বলিতে হয়, শামসুর রাহমানের মাধ্যমেই আমার ফররুখ প্রতিভার প্রথম যথার্থ সন্ধান। পরবর্তী সময়ে কবি আবদুল কাদিরের লেখা, কবি মাহফুজউল্লাহ ও ড. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের আলোচনা-সমালোচনায় ফররুখ প্রতিভার পরিচয় বিস্তৃত হয়। পাঞ্জেরীর প্রতি কৈশোর হইতেই আকর্ষণ ছিল প্রবল। 'রাত পোহাবার কত দেরী' এই জিজ্ঞাসায় দিলের দরজায় তোলপাড় হইত। কে এই পাঞ্জেরী? অর্থই বা কি? এই সব প্রশ্নে কখনও মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন বোধ করি নাই। সিন্দাবাদের জামানায় পাঞ্জেরী যে রাতের আকাশে জাহাজের দিক-নির্দেশনায় ব্যস্ত থাকিতেন, তাহা সুনীল বাবুর আলোচনাতেই প্রথম নজরে আসে।

আবুল ফজল বলিয়াছেন : 'একটা সুনির্দিষ্ট মহাদর্শে প্রবলভাবে বিশ্বাসী থেকেও ফররুখ আহমদ বিশুদ্ধ কবি ছিলেন।' আমারও তাঁহার সঙ্গে প্রথম পরিচয় বিতৃষ্ণার আবরণে। ১৯৫১ সালের শেষের দিকের কথা। শীতের পড়ন্ত বিকালে ঘুমাইয়াছিলাম। কপালে নিদ্রাসুখ ছিল না। এদিক আড্ডা জমিয়া উঠিয়াছে জবর। হাসির ফোয়ারা আর কথার হল্লায় ঘুম পালাইল। কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বিরক্তি

বোধ করিলাম। অনেকক্ষণ চোখ বুজিয়া বিছানায় পড়িয়া ছিলাম। দুই একবার চোখ মেলিয়া তাকাইলাম অনেকটা বিরক্তির সঙ্গে। আড্ডার মধ্যমণিরূপে আসর গুলজার করিয়াছেন একজন। তিনি অচেনা। কথা বলিতেছেন একটানা। কথা বলিতেছেন উচ্চগ্রামে। চোখে-মুখে প্রচণ্ড রকমের আত্মবিশ্বাস। কথা অসম্ভব শাণিত। কথার ফাঁকে ফাঁকে পান চিবাইতেছেন। আমি উঠিয়া বসিলাম। এক পর্যায়ে জিজ্ঞাসা করিলেন : ছেলেটি কে? কেউ একজন নাম বলিয়া দিলেন। আবার কথার তুবড়ি। যেন তুফান মেইল। আরও দুই-একবার চা আসিল। পান আছে সামনে। এক সময় আগন্তুক চলিয়া গেলেন। তখন জিজ্ঞাসা করিলাম : লোকটি কে? জবাব পাইলাম : ইনিই তো ফররুখ ভাই।

পড়ন্ত বিকালে সেই প্রথম দর্শন। আজিমপুরের ১৯ নম্বর বাড়িতে। বাড়িটা তখন সেকালের অনেক তরুণ কবি–লেখকদের নিয়মিত ও অনিয়মিত আড্ডায় সরগরম থাকিত। কবি ফররুখ আহমদও মাঝে মধ্যে সেই আড্ডায় শরীক হইতেন। সেখান হইতে প্রকাশিত হইত সেকালের সাপ্তাহিক দৈনিক ও মাসিক দ্যুতি। প্রধানত এই দুই পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়াই সেই বাড়িতে তখনকার তরুণ কবি-সাহিত্যিকদের আনাগোনা। ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বরে 'সাত সাগরের মাঝি' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় তমদ্দুন প্রেস হইতে। তমদ্দুন প্রেস ছিল লালবাগে। আজিমপুর হইতে খুব তফাৎ নয়। কবি নাজিমউদ্দিন রোডের রেডিও অফিস হইতে বিকালে প্রায়ই আজিমপুর যাইতেন। সেখান হইতে দলে বলে যাইতেন তমদ্দুন প্রেসে। একদিন জোহরের শেষে তিনি আসিয়া পড়িলেন। বিকালের আড্ডায় তখনও কেউ আসে নাই। একটা ছোট টেবিলের এক পার্শ্বে ছিলাম আমি, অন্য পার্শ্বে তিনি আসিয়া বসিলেন। 'সাত সাগরের মাঝি' গ্রন্থের ফর্মাগুলি তাঁহার হাতে। একান্তে অনেক কথা তিনি বলিয়া গেলেন। সিন্দবাদ হইতে 'সাত সাগরের মাঝি' পর্যন্ত প্রতিটি কবিতার কথা, প্রতি কবিতার পটভূমি, দর্শন ও বক্তব্য তিনি সবিস্তারে বলিয়া গেলেন। মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিয়া শোনাইলেন। তন্ময় হইয়া শুনিতেছিলাম তাঁহার বলিষ্ঠ উচ্চারণ। কিন্তু কোন্ কবিতা প্রসঙ্গে তিনি ঠিক কি বলিয়াছিলেন, এতদিন পরে তাহা আর মনে নাই। মনে থাকার কথাও নয়। তবে 'ডাহুক' সম্পর্কে তাঁহার কথা কিছু মনে আছে। বলিয়াছিলেন ডাহুককে তিনি তাঁহার অনবদ্য সৃষ্টি মনে করেন। সাধক তন্ময়চিত্তে রাত্রিভর রব্বুল আলামীনের এবাদতে মশগুল; তাঁহারই প্রতীকী রূপ 'ডাহুক'। আরও একটি কথা মনে আছে। 'বন্দরে সন্ধ্যা' সম্পর্কে বলিতে যাইয়া তিনি বলেন যে, সনেট তাঁহার ভাল লাগে। সনেটে তাঁহার হাত ভাল খেলে এবং সনেট লিখিয়া তিনি আরাম পান। তাঁহাকে তখন প্রশ্ন করিয়াছিলাম : 'সাত সাগেরর মাঝি' দ্বিতীয় সংস্করণ না বলিয়া তমদ্দুন সংস্করণ বলিতেছেন কেন? জবাব দিয়াছিলেন : তমদ্দুন প্রেস প্রকাশ করিতেছে বলিয়া 'তমদ্দুন সংস্করণ'। যেমন সিগনেট সংস্করণ। বলিলেন, বিদেশেও প্রকাশনা সংস্থার নামে সংস্করণের নাম হয়।

ফররুখ সাত সাগরের কথা বলিয়াছেন। নোনা দরিয়ার ডাক শোনাইয়াছেন। সাগর-মহাসাগরের কথা এমন নির্ভীক উচ্চারণে আধুনিক বাংলা কাব্যে আর তেমন শোনা যায় না। তিনি বলিয়াছেন, "খিজিরের সাথে পেয়েছি আমরা দরিয়ার বাদশাই।" কথাটা নিঃসন্দেহে বর্তমান জামানার নয়। মধ্য যুগের। যখন মুসলমানরা দরিয়ার বাদশাহ ছিলেন। ইতিহাসে দেখা যায়, যাঁহারা দরিয়ার বাদশাহ, তাঁহারাই দুনিয়ার বাদশাহ। মধ্যযুগে আরবরা দরিয়ার বাদশাহ ছিলেন। তখনকার সময়ের বর্ণনা দিতে আর সাহস করে না। কারণ সাগরে আরব আধিপত্য। জবলে তারেক হইতে চীন সাগর পর্যন্ত আরব আধিপত্য ছিল অপ্রতিহত। ফলে দুনিয়ার বাদশাহীও ছিল তাহাদের হাতের মুঠায়। প্রাচীনকালে ভারতীয় বণিকরা জাভা সুমাত্রায় বাণিজ্য পোত লইয়া যাইতেন। জীবনানন্দ দাস দারুচিনি দ্বীপের ভিতর তাহার দিশা খুঁজিয়াছেন। 'আমাদের ছেলে বিজয় সিংহ লংকা করিল জয়।' এই বক্তব্যও সেই প্রাচীন যুগেরই স্মৃতি। পরবর্তীকালে ইউরোপের কর্তৃত্ব কায়েম হয়। ফলে দুনিয়ার কাজ-কারবারেও শুরু হয় ইউরোপের আধিপত্য। এশিয়া-আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে গড়িয়া উঠে ইউরোপীয় সাম্রাজ্য। সাগরে ইউরোপের আধিপত্যের কারণেই সুবিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্যের সৃষ্টি। বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যাইত না। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটেনের সূর্য অস্ত যাইতে শুরু করে। কারণ সাগরে কর্তৃত্ব হ্রাস। সাগরে এখন মার্কিন আধিপত্য প্রবল। ফলে দুনিয়ায় তাহাদেরই কর্তৃত্ব। এই কথাটাই ফররুখের কবিচিন্তায় ধরা দিয়াছিল। তাই তিনি দরিয়ার ডাক শোনাইয়াছেন, নোনা পানির কথা বলিয়াছেন। বলিয়াছেন : "তুমি কি ভুলেছ লবঙ্গ ফুল, এলাচের মৌসুমী।" বলিয়াছেন : "বার দরিয়ায় পেয়েছি আমরা জীবনের তাজা ঘ্রাণ।"

শতাব্দীর মরা গাঙে জাহাজ ভাসাইবার আহ্বান। সাগরে জাহাজ ভাসাইবার স্বপ্নসাধ তাঁহার পূরণ হয় নাই। তবে তিনি দুরন্ত আশাবাদী। একদিন স্বপ্ন সফল হইবে। একদা এই বাংলার পণ্য সাত সাগরের মাঝিরা দেশে দেশে নিয়া যাইত। এই দেশের মসলিন ইউরোপে রাজ-রাজড়াদের দরবারে শোভা পাইত। তখনই ছিল 'সোনার বাংলা', সমৃদ্ধির যুগ। শায়েস্তা খানের সেই আমলে টাকায় ৮ মণ চাউল পাওয়া যাইত। কিন্তু যখন বাংলার পণ্য আর জাহাজে বোঝাই হয় না, তখন হইতে দৈন্যের সূচনা। 'দিলের দুয়ারে মাথা খুঁড়ে নাবিক সিন্দবাদ', -কথাটা এই প্রেক্ষাপটেই বিচার্য।

দামাল দরিয়াতেই ফররুখ শেষ নয়। দূর মরুভূমির কথাও তিনি শোনাইয়াছেন। হাবেদা মরুর কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। 'বোহা' ময়দানের সম্ভব-অসম্ভব অনেক কথা তিনি বলিয়াছেন। সর্বাধিক প্রাণবন্ত চারা গাছটা সেই ময়দানে মাথা তুলিতে পারে নাই। 'জোরালো পাখার পাখী' দশ্‌তে হাবেদায় হারাইয়া গিয়াছে। অগণিত মানুষ সেখানে মৃত্যু বরণ করিয়াছে। তবুও এক নির্ভীক মুসাফির সেই দশ্‌তে হাবেদা পাড়ি দিতে সমর্থ হইয়াছেন। কারণ 'স্থির তার লক্ষ্য, অবিচল তার সংকল্প।' স্থির লক্ষ্য আর অবিচল সংকল্পের কারণেই সেই মুসাফির 'কহর

দরিয়া' পাড়ি দিয়াছেন, ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন "বাদগর্দ হাম্মামের সকল জাদু তেলেসমাত"।

মরুভূমির কথা বলিতে যাইয়াও কবি সওদা ও সওদাগরের কথা বলিয়াছেন। "মরু গিরি পাড়ি দিয়ে এসেছিল যত সওদাগর/চিত্রল/সোয়াত থেকে তাতার বা খোরাসান থেকে/উটের সারির মত উপত্যকা পথে।"

বেবাহা ময়দান, দশ্‌তে হাবেদার বিভীষিকা তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তবুও স্থির লক্ষ্যে অবিচল সংকল্পে কাফেলা আসে, কাফেলা যায়। কিস্‌সাখানির আসর বসে। "শেষ হলে বেচা-কেনা দিন শেষে শুরু হবে কিস্‌সার আসর/জোব্বা-পোশ বৃদ্ধ কোন বলে যাবে রহস্যের অজানা খবর... বলে যায় একে একে সেইসব সওদাগর অন্তহীন জীবনের কথা/কথক হারায়ে গেলে নূতন কথক টানে কাহিনীর ধারাবাহিকতা।

সাত সাগরের মাঝির ধারাবাহিকতায় হাবেদা মরুর কাহিনী, দশ্‌তে হাবেদা, কিস্‌সাখানির বাজার বিচার-বিবেচনার দাবি রাখে। উভয় ক্ষেত্রে শংকা আছে, বিভীষিকা আছে, আছে মৃত্যুর ফাঁদ। তবুও বনি আদম চলে নির্ভীক। বিকি-কিনি চলে। কিশ্‌তি ভরে পণ্যে। উটের পিঠে সওদা উঠে। সমৃদ্ধি আসে মৃত্যুর ফাঁদ পাড়ি দিয়া। ফররুখ কাব্যের ইহাও এক মূল সুর।

দূর সাগর বা দূরান্তের মরুভূমির মধ্যেই ফররুখ শেষ নয়। তিনি বৈশাখের জায়গান গাহিয়াছেন। ময়নামতির মাঠের কথা বলিয়াছেন। মাটির মানুষ, মাঠের মানুষ, আর ঘাটের মানুষের গান গাহিয়াছেন, ছেলের পাল লইয়া 'পাখীর বাসা' সন্ধানে বাহির হইয়াছেন। বেতস লতার বনে ডাহুকের অশ্রান্ত সাধনার আওয়াজ উপলব্ধি করিয়াছেন। সদর রাস্তায়, 'যেখানে কালো পিচ-ঢালা রঙ্গে লাগে নাই ধূলির আঁচড়', সেখানে লাশের খবর বলিয়াছেন। দূর সাগরের তিমিকে তিনি বাংলা কাব্যে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

গান্ধীজী সম্পর্কে নেহরু একবার একটা কথা বলিয়াছিলেন। ১৯৪৬-৪৭ সালের কথা। নেহরু তখন দিল্লীতে অন্তবর্তী সরকারের মন্ত্রী। গান্ধী বিহারে দাঙ্গা উপদ্রুত এলাকায় পদযাত্রায় রত। নেহরু পরামর্শের জন্য বিহারে গান্ধীজীর কাছে যান। দিল্লীতে ফিরিয়া সাংবাদিককদের প্রশ্নের জবাবে বলেন ঃ ৭০ বৎসরের এই তরুণের সান্নিধ্য সব সময়েই আনন্দদায়ক। কবি ফররুখ সম্পর্কেও কথাটি সত্য। দূরন্ত আশাবাদে তাঁহার সমগ্র চেতনা সদ্য ডগমগ ছিল।

কবি জসীমউদ্‌দীন ফররুখকে বলিতেন 'ফারুক', 'পাগলা ফারুক'। তিনি লিখিয়াছেন ঃ 'ফারুকের কবি প্রতিভার উপর আমি খুব আশাবাদী। ঐ পাগলার জীবনে এমন আশ্চর্য ঘটনা আছে। ইউনেস্কো থেকে তাকে স্কলারশীপ দেওয়া হয়েছিল। বছর খানেক বিদেশের সাহিত্যিকদের সঙ্গে মিলতে মিশতে। কিন্তু পাগলা গেল না।" পাগলা গেল না ইহাই ফররুখ চরিত্রের অন্যতম আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

অপরের দান-দক্ষিণার প্রতি তিনি ছিলেন নিরাসক্ত। ১৯৭৪ সালের ১৯ অক্টোবরে তিনি ইন্তেকাল করেন।

ফররুখ আহমদের মৃত্যুর পর কবি আজিজুর রহমান একটি কথা বারবার উচ্চারণ করিতেছিলেন। "ভাইয়া আমার জীবনে কোন দিন শির নোয়ান নাই, মরণের পরেও শির সোজা রেখে নাক উঁচিয়ে রয়েছেন।" কথাটার মধ্যে নিঃসন্দেহে ফররুখ চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই প্রতিভাত হয়। লাশ কবর দেওয়ার প্রশ্নে কবি বেনজীর আহমদের কথাটাও যেন এখনও কানে বাজে। কবি তালিম হোসেন বলিতেছিলেন : কবরের যায়গা পাওয়া যাইতেছে না। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ হইয়াছে, কিন্তু জবাব পাওয়া যাইতেছে না। বেনজীর সাহেব তখন বলিয়াছিলেন : "এত তদবিরের প্রয়োজন নাই, আমার সেখানেই কবর হবে। আমার স্ত্রীর কবর আছে, তাঁর পাশে আমার জায়গা, তার পরেই ফররুখের কবর হবে। আমরা দু'ভাই এক সঙ্গে শুয়ে থাকব।"

মৃত্যুর পর ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনের শোক সভায় দৈনিক ইত্তেফাকের তৎকালীন নির্বাহী সম্পাদক জনাব আসফউদ্দৌলা যে কাহিনী শোনাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যেই মানুষ ফররুখ এবং তাঁহার দরদী মনের এক মহীয়ান রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। আসফউদ্দৌলা সেই শোক সভায় বলিয়াছিলেন : ইত্তেফাক তখন বন্ধ। তিনি এবং তদানীন্তন বার্তা সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন হোসেন বেকার রেডিও অফিসে ফররুখ ভাই তাঁহাকে একটি বন্ধ খাম দিয়া বলিলেন সিরাজ ভাইয়ের নিকট পৌছাইয়া দিতে। সেই খাম সিরাজ ভাইয়ের নিকট হস্তান্তরের সময় তিনি বলিয়া উঠিলেন : আরে, আমাকেও গতকাল একটা খাম দিয়াছিলেন, ফররুখ ভাই তোমাকে দেওয়ার জন্য। দুই জনেই খাম দুইটা খুলিয়া দেখিলেন উভয় খামেই একটি করিয়া এক শত টাকার নোট। ...ইহাই মানুষ ফররুখ আহমদের পরিচয়- চির শাশ্বত মানুষ ফররুখ। ☐

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, জুন, ২০০১]

# নজরুল ইসলাম ও ফররুখ আহমদ

ডক্টর সদরুদ্দিন আহমেদ

নজরুল ইসলামের সঙ্গে ফররুখ আহমদের একটি তুলনামূলক আলোচনা করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এধরণের আলোচনা কবি বা লেখকের মূল্যায়নে সহায়ক হতে পারে। বস্তুত : সমসালোচকদের প্রধান হাতিয়ার হলো তুলনামূলক আলোচনা ও বিশ্লেষণ। টি. এস. এলিয়ট লিখেছেন: Comparison and Analysis are the Chief Tools of the Critic. নজরুল ও ফররুখের মধ্যে তুলনামুলক সমালোচনা হয়তো নতুন নয়; তবে এ প্রবন্ধে আমি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের এ দুই বড় কবির কাব্যের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নিয়ে পর্যালোচনা করার প্রয়াস পাব।

তাঁদের মধ্যে প্রথমেই যে সাদৃশ্য চোখে পড়ে তা হলো বাঙালি কবিদের মধ্যে তাঁরাই প্রধানত তাঁদের পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে তীক্ষ্ণভাবে সচেতন ছিলেন। সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ধ্যান-ধারণা তাদের কাব্যে যে ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা ঐসময়কার অন্য কোন কবির কাব্যে আমরা লক্ষ্য করি না। নজরুল ইসলাম যখন সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন তখন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন চলছিল। রবীন্দ্রনাথ বা অন্য কোন কবির লেখায় এ আন্দোলনের প্রতিফলন তেমন দেখা যায় না। অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী এবং অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নজরুল এ আন্দোলনের প্রতি একাগ্রতা প্রকাশ করেছেন এবং তা করতে গিয়ে তিনি কারাবরণ করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন নজরুল যেহেতু সরকারী চাকুরী করতেন না, তাই তাঁর পক্ষে এটা করা সহজ হয়েছিল। কিন্তু সেক্ষেত্রে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথও সরকারী চাকুরী করতেন না, তাহলে তিনি কেন নজরুলের মতো বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব তাঁর কাব্য-কবিতায় প্রকাশ করেন নি। আসলে রবীন্দ্রনাথ সাময়িক ঘটনার চেয়ে কাব্যের চিরন্তন বিষয়বস্তু ও আবেদনের প্রতি বেশি আগ্রহী ছিলেন। এক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন:

"চির নবীন, চির প্রবীণ প্রকৃতি তাহার নিবিড় রহস্যময় অসীম সৌন্দর্য লইয়া পূর্বের ন্যায় তেমনি ভাবেই চাহিয়া আছে, চারিদিকে সেই শ্যামল তরুপল্লব, কালের চুপি চুপি রহস্যকথার মতো অরণ্যের সেই মর্মরধ্বনি, নদীর সেই চির প্রবাহময় অথচ চির অবসরপূর্ণ কলগীতি, প্রকৃতির অবিশ্রাম নিশ্বসিত বিচিত্র বাণী এখনো নিঃশোষিত হয় নাই।" **(সাহিত্যে আধুনিকতা)**

নজরুল শুধু উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে লিখেছেন তাই নয়, সে সময় সমাজে যে সব ধ্যান-ধারণা বিরাজ করছিল তাতেও তিনি সাড়া দিয়েছেন। তখন সাম্যবাদী আন্দোলন 'উদয়ের পথে' দেখা দিয়েছিল। তারই প্রভাবে তিনি সমাজের নিড়ীড়িত

মানুষের প্রতি সহাভূতি প্রকাশ করেছেন। তাদের জয়গান গেয়েছেন সে সময় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ চলছিল। নজরুলের অনেক কবিতায় এ সম্বন্ধে তার প্রতিক্রিয়া বলিষ্ঠ ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে।

অনুরূপভাবে, ফররুখ আহমদও তার সময়ের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি যখন লিখতে শুরু করেন তখন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে কারণ ব্রিটিশরা স্বাধীনতার দাবী মেনে নিয়েছে। এখন প্রধান ইস্যু ভারত বিভাগ। ফররুখ পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। 'আজাদ করো পাকিস্তান' (১৯৪৬) নামে তিনি একটি কাব্যও লিখেছেন। একটি আদর্শ রাষ্ট্রের ধ্যান-ধারণা তার কল্পনাকে উদ্দীপিত করেছিল। এটাই স্বাভাবিক ছিল কারণ রাজনীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকা কোন বুদ্ধিজীবীর পক্ষে সম্ভব নয়। এ সম্বন্ধে জর্জ অরওয়েল (George Orwell) লিখেছেন- "... in the modern world no one describable as an intellectual can keep out of polities in the sense of not caring about them." (Notes on Nationalism).

কিন্তু এর মধ্যে একটি ঝুঁকি আছে। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে অনেক সময় কবি বা বুদ্ধিজীবীদের নিগ্রহ ভোগ করতে হয়। ইংল্যান্ডে কবি মিল্টনকে তাই করতে হয়েছিল। তিনি ক্রমওয়েলের সময় প্রজাতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু প্রজাতন্ত্রের পর আবার যখন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো তখন তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। নজরুল অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ভারত অখণ্ড থাকেনি। কিন্তু তবু এদেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তার ধ্যান-ধারণা অনেকটা খাপ খেয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। কিন্তু ফররুখ এদিক দিয়ে ভাগ্যবান ছিলেন না। তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্য তিনি উপেক্ষিত হয়েছেন। এটা দুর্ভাগ্যজনক। আসলে কবি-সাহিত্যিকদেরকে সাহিত্য-বহির্ভূত মানদণ্ডে বিচার করা সমীচীন নয়।

নজরুল ও ফররুখ উভয়েই তাঁদের সমাজের কথা ভেবেছেন, গভীরভাবে ভেবেছেন। সমাজের অধঃপতনে তারা উভয়ই ব্যথিত, মর্মাহত। তাঁরা এই নির্জীব, অবসাদগ্রস্ত সমাজের জাগরণের ডাক দিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের উভয়ের প্রকাশভঙ্গি ভিন্ন। নজরুল ডাক দিয়েছেন সরাসরি। যেমন,

নাই তাজ, নাই লাজ
ওরে মুসলিম, খর্জুর শীষে তোরা সাজ।

এ ডাক অনেকটা বক্তৃতার মত। কিন্তু ফররুখ নবজাগরণের আহ্বান জানাতে গিয়ে ব্যবহার করেছেন allegory বা রূপক। তিনি আরব্য উপন্যাসের সিন্দবাদের রূপকের মাধ্যমে জাতিকে জাগরণের আহ্বান জানিয়েছেন। ইংল্যান্ডে সপ্তদশ শতকের কবি ড্রাইডেন এ কৌশল ব্যবহার করেছেন। তাঁর বিখ্যাত কবিতা

Absulom and Achitophel-এ। তিনি তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনাকে The Old Testament এর রূপক ব্যবহার করে অপ্রত্যক্ষভাবে সমসাময়িক ঘটনাকে কাব্যাকারে প্রকাশ করেছেন। টি, এস, এলিয়েটের ভাষায় এভাবে "He made the small into the great, the prosaic into the poetic, and the trivial into the magnificent."

ফররুখও তাই করেছেন সিন্দাবাদের রূপক ব্যবহার করে। তাছাড়া, তিনি ঘুমন্ত জাতিকে জাগরণের জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করেছেন। কারণ জাগতে বললেই মানুষ জাগে না। এ পথে বাঁধা অনেক। এ পথে অনেক সংশয় আছে, অনেক বিপদ আছে। 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতায় এসব আমরা লক্ষ্য করি। কবিতাটি ড্রামাটিক মনোলগের ভঙ্গিতে লেখা। এতে নাটকীয়তা আছে, সংঘাত আছে, সংঘাত থেকে উত্তরণের ইঙ্গিত আছে। বিভিন্ন চিত্রকল্প ও প্রতীকের মাধ্যমে কবিতাটির কাঠামো গড়ে উঠেছে। জাগরণের কথা হিসাবে কবিতাটি অনবদ্য।.

মুসলমানদের কথা বলতে গেলে ইসলামের উৎসে ফিরে যেতে হয়। ইসলামের মহান নবী ও তাঁর আদর্শের কথা বলতে হয়। নজরুল ও ফররুখ উভয়েই তাই করেছেন। নজরুল মহানবী সম্বন্ধে অনেকগুলো অনবদ্য গান রচনা করেছেন। এ গানগুলোতে ধর্মীয় আবেগের অসাধারণ প্রকাশ ঘটেছে। মহানবীর আবির্ভাব ও তিরোধান নিয়ে 'ফাতেহা দোয়াজ দহম' ও 'ফাতেহা ইয়াজ দহম' কবিতা লিখেছেন। তাঁর কাব্য জীবনের সায়াহ্নে 'মরু ভাস্কর' নামে মহানবীর জীবনী লিখতে শুরু করেন কিন্তু শেষ করার আগে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কাব্যখানি অসমাপ্ত রয়ে যায়। ফররুখ আহমদও 'সিরাজুম মুনীরা' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা লেখেন, যেখানে তিনি মহানবীকে আলোর পাখীর রূপক হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

মহানবী সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে নজরুল ও ফররুখ ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছেন। নজরুল মহানবীর জীবনের বিভিন্ন পর্যায় কাব্যছন্দে বর্ণনা করেছেন। অপরপক্ষে, ফররুখ 'সিরাজুম মুনীরাতে' প্রথমে রূপক পরবর্তীতে মহানবীর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনার তাৎপর্য তুলে ধরেছেন। নজরুল 'খেয়াপারের তরণী', কবিতায় রূপকের মাধ্যমে খোলাফায়ে রাশেদীনের কথা বলেছেন। প্রক্ষান্তরে, ফররুখ প্রত্যেক খলিফার উপর পৃথক পৃথক কবিতায় তাঁদের স্বকীয় মহত্ত্ব প্রকাশ করেছেন।

তবে এদিক দিয়ে নজরুলের সঙ্গে ফররুখের একটি পার্থক্য আছে। নজরুল যেমন ইসলামের কথা লিখেছেন, মহানবীর উদ্দেশ্যে অনন্য গান রচনা করেছেন, তাঁর বিচিত্র অনুভূতি ও আবেগ প্রকাশ করেছেন, তেমনি অন্যদিকে তিনি শ্যামা সঙ্গীতও লিখেছেন, একজন তৌহিদবাদী কিভাবে সেটা করতে পারেন এ নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্য-সমালোচক আতোয়ার রহমান লিখেছেন:

"শরৎচন্দ্র নিজেকে নাস্তিক বলে প্রচার করতেন। অথচ তিনি আস্তিক্যের চরমতা

দেখিয়ে ছেড়েছেন। পূত চরিত্র এমিল জোলা ফরাসী নাগরিক জীবনের কদর্যতাকে নিখুঁতভাবে রূপায়িত করেছেন তার সাহিত্যে। শয়তান ও নরকের চমকপ্রদ বর্ণনা পাওয়া যায় পরম ধার্মিক মিল্টন ও দান্তের রচনায়। উপরন্তু নজরুল ছিলেন সাধারণের কবি। তাহাদের সুখ-দুঃখ, বিশ্বাস অবিশ্বাসের অনুভূতির রূপায়ণের মধ্যে নিজ আদর্শ প্রচার করাই হল তার কাজ। সমগ্র বিষয়টিকে অন্যভাবেও নেওয়া যেতে পারে। অন্যের বিশ্বাস অবিশ্বাসে কবি নিজেও বিশ্বাসী অবিশ্বাসী কিনা, সে প্রশ্ন সেখানে অবান্তর।' **('নজরুল কাব্যে হযরত মোহাম্মদ', নওবাহার, তৃতীয় বর্ষ, আষাঢ় ১৩৫৯)**

নওবাহার সম্পাদককে পাদটিকায় লিখেছেন: "লেখকের উপসংহারের সহিত আমাদের মতানৈক্য আছে। এ ব্যাপারে ফররুখের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। ইসলামের প্রতি তাঁর আনুগত্য অখণ্ড। ভিন্ন ধর্মের ধ্যান-ধারণাকে তিনি তাঁর কাব্যে প্রকাশ করেননি। তবে যে সব মূল্যবোধের সঙ্গে ইসলামের কোন বিরোধ নেই সেগুলোকে তিনি অসংকোচে প্রকাশ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর মহাকাব্য 'হাতেম তায়ী'র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। হাতেম মুসলমান ছিলো না কিন্তু তিনি মানবতাবাদের প্রতীক এবং এই মানবতাবাদের আদর্শ এই মহাকাব্যে রূপায়িত হয়েছে।"

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, নজরুল অনেকগুলো কবিতায় নির্যাতিত, নিপীড়িত জনগণের প্রতি গভীর দরদ ও সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। 'বিদ্রোহী', কবিতায় তিনি লিখেছেন:

> আমি সেই দিন হবো শান্ত
> যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল
> আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
> অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না।

'লাশ' ও 'আউলাদ' কবিতায় ফররুখও শোষকদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। যেমন,

> হে জড় সভ্যতা!
> মৃত সভ্যতার দাস স্ফীতমেদ শোষক সমাজ।
> মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ;
> তারপর আসিলে সময়
> বিশ্বময়-
> তোমার শৃঙ্খলগত মাংসপিণ্ডে পদাঘাত হানি
> নিয়ে যাব জাহান্নাম দ্বারপ্রান্তে টানি;
> আজ এই উৎপীড়িত মৃত-দীর্ণ নিখিলের অভিশাপ লও;
> ধ্বংস হও

তুমি ধ্বংস হও

(লাশ)

মোটামোটি একই বক্তব্য এসেছে 'আউলাদ'-এ সেখানে শোষিত মানুষের বিস্তৃত সকরুণ চিত্র আঁকা হয়েছে। তবে সুরটা কিছুটা ভিন্ন। যেখানে 'লাশ'-এ হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে সেখানে 'আউলাদ'-এ হুঁশিয়ারী নয়, ফরিয়াদ জানানো হয়েছে আল্লাহর দরবারেঃ

এবার
ক্লীবের প্রতীক এই মানুষের আদালতে নয়,
শয়তানের কাদা মাখা কালো পথে নয়-
এবার আল্লাহর আদালতে
আমাদের ফরিয়াদ,
ক্ষুধিত, লুণ্ঠিত এই মানুষের রিক্ত ফরিয়াদ।

এই প্রথম সমাজের অন্যান্য গ্লানি ও কদর্যতার প্রতি উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে উভয় কবিই ব্যবহার করেছেন ব্যঙ্গ বা স্যাটায়ার। সমাজ যখন আদর্শচ্যুত হয়, চিরন্তন মূল্যবোধ ভূলুণ্ঠিত হয় তখন কবি-সাহিত্যিকরা এ হাতিয়ার ব্যবহার করেন। ভণ্ডমি, প্রতারণার যারা আশ্রয় নেয়, তাদেরকে আঘাতে, কষাঘাতে জর্জরিত করাই ব্যঙ্গ রচনার উদ্দেশ্য। নজরুল লিখেছেন :

বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে
আমরা তখন বসে
বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি ফেকাহ্-হাদীস চষে।

ফররুখের 'অনুস্বার' কাব্যেও সমাজের বিভিন্ন গ্লানি উদঘাটিত হয়েছে। কখনো আক্রমণ করেছেন সরাসরি, কখানো তীর্যকভাবে। সরাসরি আক্রমণের নমুনা হিসেবে 'হাইব্রিড' কবিতার প্রথম স্তবকের কয়েকটি লাইন উদ্বৃত করছি :

সভাস্থলে উচ্ছুলিয়া বসেছ নির্লজ্জ শয়তান
ইবলিছের বরপুত্র দোআশলা চঞ্চল বানর!
তোমার চাপল্য দেখে লজ্জা পায় বন্য হনুমান।
কেননা প্রকৃতি তব বানরের আকৃতিতে নর।

'নির্লজ্জ শয়তান', 'ইবলিসের বরপুত্র', 'দোআঁশলা চঞ্চল বানর', 'বন্য হনুমান', ইত্যাদি শব্দ বা শব্দসমষ্টি বা চিত্রকল্প কবির ভয়ংকর ক্রোধ ও ঘৃণার অভিব্যক্তি।

ইডেন গার্ডেনে, কবিতার টেকনিক ভিন্ন। এ কবিতার বক্তা প্রচলিত মূল্যবোধকে তাচ্ছিল্যভাবে প্রত্যাখ্যান করে নতুন সভ্যতা তথা পাশ্চাত্য সভ্যতার-অবদানকে, যৌন লালসা চরিতার্থ করার অপূর্ব সুযোগকে গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। সে শরিয়তের বিধান, পর্দার আড়ালে ছুঁড়ে ফেলতে চায়। সিফিলিস, গনোরিয়াকে ভয়

পায় না কারণ আশেপাশেই ক্লিনিক আছে। নতুন সভ্যতা সম্বন্ধে তার বিস্ময়সূচক উক্তি লক্ষণীয় :

নতুন সভ্যতা! আহা, করিয়াছে মুক্ত কত পথ।
পর্দার আড়াল ভাঙো, ভেঙে দাও অন্দরের শিক,
প্রতীক্ষিছে বন্ধু পথে (সেই সাথে মিলিবে নগদ);
তোমার ব্লাউজে জাগে লাল দিন জেনেছি সঠিক ॥

মেয়েটির বিকৃত মূল্যবোধকে বিদ্রুপ করা হয়েছে প্রকাশিত মূল্যবোধ এবং বিকৃত মূল্যবোধকে পাশাপাশি উপস্থাপন করে। (বিস্তৃত জানার জন্য দ্রষ্টব্য সদরুদ্দিন আহমেদ : ফররুখ আহমদের নির্বাচিত কবিতার নিগূঢ় পাঠ)।

নজরুল ও ফররুখ উভয়ই আরবি-ফারসি শব্দ প্রয়োগ করে কাব্য ভাষাকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। এ প্রয়োগ সার্বিক ভাব-প্রকাশের খাতিরে তাঁরা করেছেন। নজরুল যখন বলেন, 'আমি জাহান্নামের আগুনে বসে হাসি পুষ্পের হাসি', তখন জাহান্নাম শব্দের প্রয়োগে যে ধ্বনি ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়েছে তা নরক শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা যেতো না। অনুরূপভাবে ফররুখের কবিতায় আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগে ভাষায় বৈচিত্র্য এসেছে। অপূর্ব ধ্বনি মাধুর্য সৃষ্টি হয়েছে। যেমন,

কেটেছে রঙীন মখমল দিন, নতুন সফর আজ,
শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
ভাসে জোরওয়ার মউজের শীরে সফেদ চাঁদির তাজ
পাহাড় বুলন্দ ঢেউ বয়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক;
নতুন পানিতে সফর এবার, হে মাঝি সিন্দবাদ।

এখানে আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগের যথার্থতা, নতুনত্ব, ধ্বনি-ব্যঞ্জনা-সবকিছু ফররুখের শক্তিমত্তার পরিচয় বহন করে। শব্দের পুনঃপুন ব্যবহারে তা একঘেয়ে হয়ে যায়। নতুন শব্দ বা পুরোনো শব্দের নতুন ব্যবহারে বক্তব্য ঝলমল হয়ে ওঠে। পাঠক মুগ্ধ বিস্ময়ে তা উপভোগ করেন। তবে শুধু নতুনত্ব সৃষ্টির জন্যই শব্দ ব্যবহার করলে চলবে না। তা ভাব প্রকাশের জন্য যথাযথ হতে হবে। চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। সিন্দবাদের কথা লিখতে গিয়ে ফররুখ এ বক্তার পটভূমি চরিত্র ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ শব্দ–আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন। এতে শব্দ চয়নে তাঁর বিচার-বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, 'লাশ' কবিতায় আরবি-ফারসি শব্দ নেই বললেই চলে, কারণ-কবিতাটি আমাদের দেশের পটভূমিতে লেখা। এখানে বক্তার পক্ষে আরবি-ফারসি শব্দ প্রয়োগ যথার্থ হতো না।

নজরুলের সঙ্গে ফররুখের একটি বড় পার্থক্য হলো ফররুখের কবিতার নাটকীয়তা। প্রখ্যাত সমালোচক Cleanth Brooks লিখেছেন- The structure of a poem resembles that of a play (the well wrought tern) ফররুখের প্রায় প্রতিটি

কবিতায় এই নাটকীয়তা লক্ষণীয়। নাটকের বৈশিষ্ট্য হলো যে, এর মধ্যে একটা action আছে যা একটা সংঘাতের সৃষ্টি করে এবং তার মাধ্যমে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে। তাছাড়া, নাটকের প্রতিটি অংশ পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এতে কোন অপ্রাসংগিক বক্তব্য থাকবে না। উদারহরণস্বরূপ 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতার উল্লেখ করা যায়। এতে মূল সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে ঘুমের সঙ্গে জাগরণের। নিষ্ক্রিয়তার সঙ্গে কর্মচঞ্চল জীবনের। মাঝি ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। এ ঘুম দুঃস্বপ্নে ভরা। কিন্তু তাকে জাগাতে হবে। তার অনেক দায়-দায়িত্ব আছে। কিন্তু জাগরণের পক্ষে অনেক বাধা-বিপত্তি আছে। বিভিন্ন চিত্রকল্প, রূপক ও প্রতীকের মাধ্যমে একটি ভয়াবহ চিত্র অংকিত হয়েছে। পাশাপাশি অন্য কয়েকটি চিত্রকল্প ও প্রতীকের মাধ্যমে আশার আলো সঞ্চার করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে হেরার রাজতোরণ প্রধানতম প্রতীক। এর ব্যাঞ্জনা ব্যাপক, গভীর ও শক্তিশালী। এ প্রতীকের প্রয়োগে কবিতায় উপস্থাপিত সংঘাত দূরীভূত হয়ে কবিতাটি যথোচিত ও তাৎপর্যমণ্ডিত রূপ লাভ করেছে। অপরদিকে, নজরুলের কবিতায় এ নাটকীয়তা ও প্রতীকের ব্যবহার তেমন লক্ষণীয় নয়।

এ আলোচনায় কবি হিসেবে উভয়ের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি, তুলনামূলক আলোচনায় কাউকে খাটো বা বড় করার চেষ্টা করা হয়নি। উভয়েই মৌলিক প্রতিভার অধিকারী ও বড় কবি। নজরুল ফররুখের অগ্রজ কবি। তিনি যুগস্রষ্টা কবি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর প্রতিভার ছটায় সমকালীন ও পরবর্তী অনেক কবি নানাভাবে আলোকিত-উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছেন। তিনি আমাদের জাতীয় কবি। তবে প্রত্যেক কবির এক একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে, এখানে সে বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেই আলোচনার প্রয়াস পেয়েছি। ☐

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ষোড়শ সংখ্যা, জুন ও অক্টোবর, ২০০৮]

# ফররুখ কাব্যে ক্ষুধিত মানুষ

**ডক্টর সদরুদ্দিন আহমেদ**

ফররুখ আহমদকে 'রোমান্টিক কবি', 'মুসলিম জাগরণের কবি' ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। তাঁর এ পরিচয়ের যথেষ্ট ভিত্তি আছে; কিন্তু যে কথাটি তেমন গুরুত্ব পায়নি সেটি হলো : তিনি একজন ক্ষুধিত মানুষের কবি। তাঁর বহু কবিতায় তিনি ক্ষুধিত মানুষের কথা লিখেছেন, মজলুম জনতার দুঃখ-বেদনায় ক্ষুব্দ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে এ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

'পাঞ্জেরী' কবিতায় তিনি রূপকের মাধ্যমে জাতির– মুসলিম জাতির– বর্তমান দুর্দশার একটি করুণ চিত্র এঁকেছেন। ঘন কুয়াশার মধ্যে দিক-চিহ্নহীন সমুদ্রে লক্ষ্যহীনভাবে জাহাজ চলেছে। পাঞ্জেরী– মাস্তুলে অবস্থানকারী দিক-নির্দেশক– ঘুমিয়ে আছেন। এক শ্রান্ত অবসাদগ্রস্ত নাবিক দাঁড় টেনে চলেছে। নাবিক পাঞ্জেরীকে জেগে ওঠার জন্য জোর তাগিদ দিচ্ছে। তিনি জেগে না উঠলে কি হবে তার একটা ভয়ঙ্কর চিত্র আঁকা হয়েছে। বন্দরে কিসের গর্জন শোনা যাচ্ছে। এ গর্জন ক্ষুধার্ত মানুষের গর্জন, তাদের বিক্ষোভের শব্দ। পাঞ্জেরী জেগে না উঠলে তারা ক্রোধে ফেটে পড়বে, সবকিছু ভেঙে চুরমার করে দেবে। ক্ষুধিত মানুষের এ তীব্র ভ্রুকুটি, এ বিক্ষোভ একটা পটভূমিতে স্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে একটা নাটকীয়তা আছে এ অর্থে যে বক্তব্যটি পূর্বে উল্লিখিত ঘটনার অনিবার্য পরিণতি। পরিণতি এখনো ঠিক সংঘটিত হয়নি, কিন্তু এর সুস্পষ্ট আভাস দেয়া হয়েছে। আমরা জানি ক্ষুধিত মানুষ দু'ভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে : অনাহারের যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করে, অথবা প্রতিবাদ জানায়, বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ক্ষুধিত মানুষের শেষোক্ত প্রতিক্রিয়ার ইঙ্গিত কবিতার পরিসমাপ্তিতে উল্লেখ করে কবি জাতির কর্ণধারদের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে ধূমায়িত অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

'সাত সাগরের মাঝি' কবিতায় অনুরূপ বক্তব্য পেশ করা হয়েছে অনুরূপ পরিস্থিতিতে। এখানে পাঞ্জেরীর পরিবর্তে মাঝিকে সম্বোধন করা হয়েছে। বক্তা মাঝি-মাল্লাদের কেউ নন। তবে তিনি মাঝির দীর্ঘ ঘুমের প্রেক্ষিতে তাকে জাগিয়ে তোলার নানা কৌশল অবলম্বন করেছেন। অচল জাহাজের ছবির পাশাপাশি একটি সচল বেগবান জাহাজের চিত্রকল্প স্থাপন করে মাঝিকে জেগে ওঠার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। এরপর দুয়ারে গর্জনের শব্দের বিবরণ দিয়েছেন। এ গর্জন সাপের গর্জন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে তা নয়– এ গর্জন ক্ষুধিত মানুষের বিক্ষোভের গর্জন। তারা বেসাতী চায়– ক্ষুধা নিবারণে খাদ্য চায়। তা না দিলে তারা সব ভেঙে চৌচির করে দেবে। এখানে 'পাঞ্জেরী'-তে উল্লিখিত ক্ষুধিত মানুষের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার পুনরুক্তি

করা হয়েছে। কিন্তু সে সঙ্গে আর একটি ভয়ঙ্কর অবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে। তারা পথ ছেড়ে নিচে নেমে যাবে অর্থাৎ তারা বিপথে যাবে, তাদের নৈতিক অধঃপতন হবে। তারা সর্বনাশের দিকে ছুটবে। জনতার বিপথগামিতার এ চিত্রকল্প একটি নতুন সংযোজন। এ চিত্রকল্পে বক্তার উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে।

কবিতাটির মাঝামাঝি স্থানে আবার ক্ষুধিত মানুষের প্রসঙ্গ টানা হয়েছে। মাঝিকে উদ্দেশ্য করে বক্তা বলেছেন :

এবার তোমার রুদ্ধ কপাটে মানুষের হাহাকার
ক্ষুধিত শিশুর কান্নায় শেষ সেতারের ঝঙ্কার
এখানে এখন প্রবল ক্ষুধায় মানুষ উঠছে কেঁপে
এখানে এখন অজস্র ধারা উঠছে দু'চোখ ছেপে।

উপরোক্ত লাইনগুলোতে বক্তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আগে যেখানে ক্ষুধিত মানুষের ভাঙচুরের চিত্রকল্প ব্যবহার করা হয়েছে, এখন সেখানে মানুষের হাহাকার, মৃত্যুপথযাত্রী শিশুর ক্ষীয়মাণ কান্না, অজস্র মানুষের চোখ ছাপিয়ে-পড়া অশ্রুর বন্যার চিত্রকল্প। ক্ষুধিত মানুষের বর্ণনায় এ নব নব চিত্রকল্প জাতির ঘুমন্ত কর্ণধারদের জেগে ওঠার জন্য উদ্বুদ্ধকরণের কৌশল বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য, 'পাঞ্জেরী' ও 'সাত সাগরের মাঝি' রূপকধর্মী কবিতা, যেখানে বাস্তব জগতের চিত্র প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ পায়নি। এর প্রত্যক্ষ প্রকাশ ঘটেছে 'লাশ' ও 'আওলাদ' কবিতায়। 'লাশ' কবিতায় পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রেক্ষিতে অনাহারজনিত একজন মানুষের মৃত্যুর সকরুণ চিত্রকল্প আছে। কলকাতার এক কালো পিচ-ঢালা পরিচ্ছন্ন প্রশস্ত রাজপথে– 'তার ক্ষুধিত অসাড় তনু বত্রিশ নাড়ির চাপে মুখ বুজে পড়ে আছে অসাড় নিথর।' এখানে একটি লাশের কথা বলা হলেও এ লাশটিকে যে একটি প্রতিভূ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে তা নিম্নোক্ত লাইনগুলোতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে :

আকাশ অদৃশ্য হ'ল দাম্ভিকের খিলানে, গম্বুজে
নিত্য স্ফীতোদর
এখানে মাটিতে এরা মুখ গুঁজে মরিতেছে ধরণীর প'র।

'এরা' শব্দটি ইঙ্গিত করছে যে এ লোকটির মতো আরো অনেকে অনাহারে মৃত্যুবরণ করছে। আর এ অকাল মৃত্যুর জন্য বক্তা সমাজ ও সভ্যতাকে দায়ী করছেন। তিনি এতটা উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ যে লাশের কথা প্রায় ভুলে গিয়ে আক্রোশে ফেটে পড়েছেন। এ কোন্ সভ্যতা যেখানে নেতারা জনতার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে তাদেরকে নর্দমার পাশে ফেলে দিচ্ছে ? এ আক্রোশ শেষ পর্যন্ত অভিসম্পাতে রূপ নিয়েছে। এ অভিসম্পাত শুধু তার নিজের পক্ষ থেকে নয়, সকল উৎপীড়িত মানুষের পক্ষ থেকে :

আজ এই উৎপীড়িত মৃত্যুদীর্ণ নিখিলের অভিশাপ বওঃ

ধ্বংস হও
তুমি ধ্বংস হও।

'আউলাদ' কবিতায় ক্ষুধিত মানুষের বিস্তৃত বিবরণ দেয়া হয়েছে। তারা সারে সারে কাতারে কাতারে কাস্তে কোদাল লাঙ্গল নিয়ে ভারবাহী পশুর মতো চলেছে মরু, মাঠ, বন পার হয়ে কাজের সন্ধানে। এরা খেটে খাওয়া বঞ্চিত মেহেনতী মানুষের দল। অমানুষিক পরিশ্রম করে গতর খাটিয়েও তারা তাদের দু'বেলা মুখের অন্ন জোটাতে অক্ষম। সমাজের সুবিধাভোগী বিত্তবান মানুষেরাই এ খেটে খাওয়া মানুষের দুঃসহ বঞ্চনাপূর্ণ জীবনের জন্য দায়ী। তাদের বঞ্চনাপূর্ণ দুঃসহ জীবনের উত্তরাধিকারিত্ব বয়ে চলেছে তাদের অসহায় শিশু-সন্তানেরাও। কবি এসব শিশুদের কথা তুলে ধরেছেন এভাবে :

চলে দল বেঁধে শিশু ওষ্ঠে তুলি জীবনের
পানপাত্র সুতীব্র বিস্বাদ
মানুষের বুভুক্ষু মুমূর্ষু আউলাদ।

তারা জড় সভ্যতার নির্মম শিকার। তাদের দুর্দশার আরো ভয়ানক চিত্র আঁকা হয়েছে :

আমি দেখি পথের দু'ধারে ক্ষুধিত শিশুর শব,
আমি দেখি পাশে পাশে উপচিয়ে প'ড়ে যায়
ধনিকের গর্বিত আসব,
আমি দেখি কৃষাণের দুয়ারে দুর্ভিক্ষ বিভীষিকা,
আমি দেখি লাঞ্ছিতের ললাটে জ্বলিছে শুধু অপমান টিকা,
গর্বিতের পরিহাসে মানুষ হ'য়েছে দাস,
নারী হ'ল লুণ্ঠিতা গণিকা।

আমরা দেখেছি 'লাশ' কবিতায় অত্যাচারীদের সময় আসলে জাহান্নামে টেনে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে 'ধ্বংস হও' বলে অভিসম্পাত দেয়া হয়েছে। কিন্তু এর কোনটাই কার্যকর নয়। তাই 'আউলাদ'-এ ভিন্ন পন্থা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে। বক্তা এবার মানুষের কাছে কোন ফরিয়াদ জানাবেন না :

এবার আল্লাহর আদালতে
আমাদের ফরিয়াদ
ক্ষুধিত লুণ্ঠিত মানুষের এই রিক্ত ফরিয়াদ।

আর এ ফরিয়াদ কি বৃথা যাবে? তিনি কোরআনে বিবৃত সামুদ, ফেরাউন ও নমরুদদের উল্লেখ করেছেন। এসব শোষকরা ধ্বংস হয়ে গেছে, তাদের সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কুরআনের এসব উদাহরণের আলোকে তার ফরিয়াদ যে ব্যর্থ হবে না এ সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত। বস্তুত তিনি চোখের সামনে এখনই তার আলামত

দেখতে পাচ্ছেন। অনেকটা নাটকীয়ভাবে তিনি একটি নতুন জাতির উত্থান প্রত্যক্ষ করছেন 'দুর্গম উপলে'। তাদের দামামা বাতাসে বেজে উঠেছে, তিনি তাদের দামামার স্বর শুনতে পাচ্ছেন– 'বলিষ্ঠ বক্ষের তলে সুকোমল অন্তরের স্বর'। এ প্রেক্ষিতে তার শেষ প্রার্থনা :

আর যেন ক্লিষ্ট নাহি হয়,
আর যেন ত্রস্ত নাহি হয়,
পথে দেখি পীড়নের ফাঁদ,
আর যেন ভ্রষ্ট নাহি হয়
মানুষের ভবিষৎ দিনের আউলাদ।

এ ধরনের প্রার্থনা ছাড়া মানুষের কি আর কিছু করার নেই ? ক্ষুধিত মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য আমরা কি ঐ আল্লাহর বিচারের জন্য অপেক্ষা করে থাকবো ? 'সিরাজাম মুনীরা' ও 'ওমর দরাজদিল' কবিতায় এ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। মহানবী (সা) তাঁর কৈশোরে ক্ষুধার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। কবি বলেন :

কিশোর কণ্ঠ জ্বলে পিপাসায়; জলে ক্ষুধাতুর পাকস্থলী,
বত্রিশ নাড়ী ছিঁড়ে পড়ে বুঝি ক্ষুধার ধমকে ধমনী কাঁপে
বাবলা কাঁটার বিক্ষত দেহ, পিঠ নুয়ে আসে বোঝার চাপে
আঁসু ঝরে আর কলিজার খুন ঝরে সিরিয়ার বালুর মাঠে,
খেজুর কান্ত উপাদান শিরে কিশোর তোমার রজনী কাটে।
কোন সে অটল কারিগর তার কঠিন আঘাতে অনবরত
বার বার হানে আর চেয়ে দেখে হ'ল কিনা তার মনের মতো।

উপরোক্ত লাইনগুলোতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কৈশোরে তার ক্ষুধার অভিজ্ঞতা। সে সময় ক্ষুধায় যন্ত্রণায় তার বত্রিশ নাড়ি ছিড়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে, জীবিকার জন্য কঠিন শারীরিক পরিশ্রম তাকে করতে হয়েছে আয়েশ-আরাম থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন। কিন্তু এ কঠোর কঠিন অভিজ্ঞতা আল্লাহর পূর্ব-পরিকল্পিত। এভাবে তিনি ভবিষ্যতের নবী তৈরি করেছেন যাতে তিনি দ্বীন-দুনিয়ার কষ্ট অনুভব করতে পারেন ঃ

হাজার ব্যথার আগুনে পোড়ায়ে মরুর হাপরে হাজার দিন,
সুন্দরতম তব অন্তর ব্যথার রঙে কে করে রঙিন।
তখন তোমার বিশাল হৃদয় বুঝেছে দুঃখ দীন দুখির
জীবন কাটিয়ে অনশনে হায় বুঝেছো কী জ্বালা ভুখা প্রাণীর
জেনেছে বন্দী বনি-আদমের দুঃখ; কোথায় ব্যথা নারীর।
কোন কারিগর দিয়েছে তোমার ঐ সুবিশাল নয়নে নীর ?

ক্ষুধিত মানুষের দুঃখ, ব্যথিত মানুষের যন্ত্রণা অনুভব করতে হলে নিজের জীবনে

সে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। আল্লাহর পরিকল্পনামাফিক মহানবী (সা)-এর জীবনে সে অভিজ্ঞতা ছিল, তাইতো তিনি 'ব্যথিত মানুষের ধ্যানের ছবি' হতে পেরেছিলেন। কিন্তু ক্ষুধার অভিজ্ঞতা শুধু তাঁর কৈশোরের সঞ্চয় নয়। তিনি যখন মক্কা-মদিনার 'রাজা' তখনও তাঁর গৃহে অভাব মেটেনি, উনানে খাবার চড়েনি, কত রাত কেটেছে ক্ষুধায় ঃ

জ্বলে না কুটিরে চেরাগ, জ্বলে ও ব্যথিত বক্ষে প্রেমের শিখা
জ্বলে ও মাটির শামাদানে লাল ফিরদৌসের স্বপ্ন লিখা।

ক্ষুধিত মানুষের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি হওয়া উচিত তার দৃষ্টান্ত মহানবী (সা) রেখে গেছেন। এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে দেখি 'আল ফারুক' নামে পরিচিত ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর বিন খাত্তাব (রা)-কে। একদিকে 'সে জালিম, পাপীর অত্যাচারীর শিবিরে দৃপ্তকায়' 'আবার দেখি সে ক্ষুধিত জনের শিয়রে একাকী কাঁদে' !

যে বিরাট দেহী দরদীর হাতে
তৃপ্ত এতিম শিশুর বুক,
সে শিশু জানেনা–তার ক্ষুধায় যে
রান্না চড়ালো–সেই ফারুক।
অতন্দ্র তার দীঘল রজনী
দুঃস্থ গরীব দীন সেবার
অনাথ নারীর দরজায় এসে
কাজ করে যেন ভৃত্য তার।

তিনি জনতার কাছে মজুর হয়ে আহার্য পান, বেতন পান, জনতার সাথে ইসলামী জয়কেতন বহন করে চলেন। আজ পৃথিবীর দিকে দিকে তাই 'ওমরপন্থী' লোকের একান্ত প্রয়োজন :

পিঠে বোঝা নিয়ে পাড়ী দেবে যারা প্রান্তর প্রাণ-পণ,
উষর রাতের অনাবাদী মাঠে ফলাবে ফসল যারা
দিক দিগন্তে তাদের খুঁজিয়া ফিরিছে সর্বহারা।
যাদের হাতের দোররা অশনি পড়ে জালিমের ঘাড়ে,
যাদের লাঠির ধমক পৌঁছে অত্যাচারীর হাড়ে
আগুনের চেয়ে নিষ্কলঙ্ক, উদ্যত লেলিহান
যাদের বুকের পাঁজরে বহে দরদের বান
সে ভয়ঙ্কর সেই প্রশান্ত মধ্যদিনের রবি,
এই মজলুম দুনিয়ার খা'ব– নিত্য ধ্যানের ছবি।

খলিফা ওমরের (রা) দু'টি বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। একদিকে তিনি ছিলেন গরিবের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাদের দুঃখ লাঘবের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। অন্যদিকে জালিমের প্রতি তিনি ছিলেন খড়্গহস্ত। দুটো

বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে এ অর্থে যে শোষণের ফলেই সাধারণ মানুষ দুর্দশার শিকার হয়। খলিফা ওমর (রা) সেটা জানতেন। তাই তাঁর মধ্যে কঠোরতা ও কোমলতার সংমিশ্রণ ঘটাতে পেরেছিলেন। উৎপীড়ন এখনো আছে। তাইতো ওমরের মতো মানব-দরদী মনীষীর আমাদের প্রয়োজন আছে; তাইতো তাঁর মতো মহৎ-প্রাণ মানুষের জন্য আমরা অপেক্ষা করে আছি।

উপরের আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ফররুখের চিন্তায় ক্ষুধিত মানুষ একটা বিরাট স্থান দখল করে আছে। তিনি যখন জাতির জাগরণের কথা বলেছেন তখন ক্ষুধিত মানুষের প্রসঙ্গই তাঁর কবিতায় বারবার ফিরে এসেছে। জাতিকে জাগাতে হবে, কারণ নিরন্ন মানুষের মুখে খাবার না দিলে তারা বিক্ষোভ করবে, বিপথে যাবে। এসব একজন সমাজ-সচেতন কবির কথা। তিনি সমাজ-সচেতন বলেই 'লাশ' ও 'আউলাদ'-এর মতো কবিতা লিখতে পেরেছেন যেখানে সমাজের বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের এমন মর্মস্পর্শী চিত্র আঁকতে পেরেছেন। তিনি সমাজ-সচেতন বলেই বুঝতে পেরেছেন যে, একশ্রেণীর মানুষের দুর্দশা ও বঞ্চনার জন্য সমাজের সুবিধাভোগী, স্বার্থপর, বিত্তবান মানুষের শোষণই এর প্রধান কারণ। তাই তিনি শোষণের বিরুদ্ধে এমন সোচ্চার হতে পেরেছেন। তাঁর এ দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে মহানবী (সা) ও খলিফা ওমর (রা) প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করেছে। তাঁদের মধ্যে তিনি দেখেছেন সামাজিক সমস্যা সমাধানের জ্বলন্ত উদাহরণ– অনির্বাণ আলোকবর্তিকা।

এখানে নজরুল ইসলামের সঙ্গে ফররুখ আহমদের পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। নজরুলও ছিলেন দুর্গত মানবতার কবি। তাঁর কবিতায়ও আমরা দেখি গণমানুষের জন্য সুতীব্র দরদ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। কিন্তু তাঁর সঙ্গে ফররুখের তফাৎ এই যে নজরুল সমসাময়িক সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রভাবেই এ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। পক্ষান্তরে, ফররুখ আহমদ প্রেরণা খুঁজেছেন ইসলামের নবী ও খলিফা ওমরের মধ্যে। তিনি একদিকে মহানবীর (সাঃ) দরদী মনের ওপর জোর দিয়েছেন, অন্যদিকে ওমরের চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার সংমিশ্রণের ওপর গুরত্ব আরোপ করেছেন এবং 'ওমরপন্থী' লোকের জন্য প্রহর গুনছেন।

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, বিশতম সংখ্যা, জুন, ২০১১]

# ফররুখ কাব্যপাঠ : কিছু সমস্যা

**ডক্টর সদরুদ্দিন আহমেদ**

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক প্রতিভাধর কবি ফররুখ আহমদ। তাঁকে নিয়ে লেখালেখি কম হয়নি। অনেক বই এবং অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তবু মনে হয়, তাঁর কাব্য নিয়ে পাঠকের বিশেষ করে সাধারণ পাঠকদের কিছু সমস্যা আছে। এ প্রবন্ধে আমি সেগুলোর উপর আলোকপাত করবো।

ফররুখের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি'র (১৯৪৪) জাগরণমূলক কবিতাসমূহ, যেগুলোর জন্য তিনি সমধিক পরিচিত, আরবি, ফারসি শব্দের বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ 'সিন্দবাদ' কবিতার প্রথম স্তবক উদ্ধৃত করা যাক:

> কেটেছে রঙীন মখমল দিন, নতুন সফর আজ,
> শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
> ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ,
> পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ বয়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক
> নতুন পানিতে সফর এবার, হে মাঝি সিন্দবাদ।

উপরোক্ত স্তবকে অনেকগুলো শব্দ যেমন মখমল,সফর, দরিয়া, জোরওয়ার, মউজ, শির, সফেদ, চাঁদির তাজ, পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ আরবি-ফারসি থেকে নেয়া হয়েছে। এর অনেকগুলো কারণ আছে। প্রথমত, কবিতার বক্তা যেহেতু আরব্য উপন্যাসের নায়ক তাই তার মুখে স্বাভাবিকভাবে তার ভাষা ও ঐতিহ্য থেকে শব্দচয়ন করা হয়েছে। এতে তার চরিত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয়ত, কবি ভাষায় নতুনত্ব এনেছেন। শব্দ পুনঃপুনঃ ব্যবহারের ফলে তা একঘেয়ে হয়ে যায়। তাই নতুন শব্দ বা পুরোনো শব্দের নতুন প্রয়োগ কবির শক্তিমত্তার পরিচয় বহন করে। তৃতীয়ত, উপরোক্ত শব্দে ও চিত্রকল্পে ধ্বনি-মাধুর্য সৃষ্টি হয়েছে। 'পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ' আর 'পাহাড় সমান ঢেউ' ধ্বনির দিক দিয়ে এক নয়। 'পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ' শব্দের মধ্যে যে ব্যঞ্জনা ও শক্তিমত্তার প্রকাশ ঘটেছে, 'পাহাড় সমান ঢেউ' ব্যবহারে তা কখনো সম্ভব হত না।

কিন্তু ঐ শব্দগুলো অধিকাংশ পাঠকের অজানা। ওগুলোর অর্থ বুঝতে হলে তাদেরকে অভিধান দেখতে হবে। কবিতা পড়তে গিয়ে বারবার অভিধান দেখা বিরক্তিকর। ফলে কবিতা পাঠের আগ্রহ হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। অনেকে মনে করতে পারেন যে শব্দগুলো শিক্ষিত পাঠকের জানার কথা। কিন্তু আসলে তা নাও হতে পারে। আর বর্তমানে আরবি-ফারসি শব্দ এড়িয়ে চলার প্রবণতা লক্ষ্য করা

যাচ্ছে। একশ্রেণীর শিক্ষিত লোক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ এমনকি গণমাধ্যমসমূহ আমাদের ভাষায় একসময় প্রচলিত আরবি, ফারসি, উর্দু শব্দরাজি বর্তমানে পরিহার করার প্রবণতা দেখা যায়। আগে আমরা 'লাশ' শব্দ ব্যবহার করতাম, এখন তা হয়েছে 'মরদেহ'। আগে 'মরহুম' বলতাম, এখন 'প্রয়াত' বলা হচ্ছে। তাই ভবিষ্যতে শিক্ষিত লোকদের কাছেও ফররুখের কবিতা দুর্বোধ্য হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। এমতাবস্থায় ফররুখের কবিতার ফুটনোট সংবলিত সংস্করণ বের করা জরুরী। ইংরাজি সাহিত্যে অনেক কাব্য-সংকলনে অপ্রচলিত শব্দের ফুটনোট দেয়া থাকে। অনেক কবিতায় allusions থাকে, যেগুলোর ব্যাখ্যা না জানলে বক্তব্য বোঝা যায় না। তাই সে সব allusions এর ব্যাখ্যা দেয়া থাকে। ফররুখের অনেক কবিতায় allusions আছে, যেমন– হযরত খিজিরের (আ) কথা, গুলেবাকাওলীর কথা আছে, হেরার রাজতোরণের কথা আছে।

আরো একটি কথা। সাধারণ পাঠক অনেক সময় কবিতার গভীরে প্রবেশ করতে পারেন না; কিন্তু সমালোচকরা হয়তো তা পারেন। নিগূঢ় অর্থ, কাব্য-কৌশল তারা আবিষ্কার করতে পারেন কারণ তারা বার বার মনোযোগের সঙ্গে কবিতা পড়েন এবং তাদের রসবোধ সাধারণ পাঠকের চেয়ে অনেক বেশী। তাই ফররুখের কাব্য সংকলনের সঙ্গে ফুটনোটসহ প্রতিষ্ঠিত সমালোচকদের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য বা বিশ্লেষণ যদি সংযুক্ত করা হয়, তাহলে ফররুখ কাব্যের জনপ্রিয়তা অনেক বৃদ্ধি পাবে বলে আমার বিশ্বাস। উল্লেখ্য, ইংরাজি সাহিত্যে অনেক কবির এ ধরনের সংকলন আছে।

ফররুখের কাব্য পাঠে আর একটি অসুবিধা আছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। সেটি হলো তিনি নাকি সাম্প্রদায়িক এ অর্থে যে, তিনি শুধু মুসলিম জাতির কথা লিখেছেন। তাছাড়া, তিনি ছিলেন পাকিস্তানপন্থী। এসব অভিযোগের জবাব দেয়া দরকার। 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যের কয়েকটি কবিতায় তিনি মুসলিম পুনর্জাগরণের প্রেরণা যুগিয়েছেন। কিন্তু নজরুল ইসলামও–যাঁকে অসাম্প্রদায়িক বলা হয়–মুসলিম পুনর্জাগরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। তিনি কিন্তু হিন্দু পুনর্জাগরণের কথা বলেন নি। তাঁর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ ওঠে না। তাহলে ফররুখের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ কেন? তারা যখন সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তখন ভারতে রাজনীতি উত্তাল হয়ে উঠেছিল। হিন্দু ও মুসলমান দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। মুসলমানরা স্বতন্ত্র আবাসভূমির জন্য আন্দোলন করেছিল। নজরুল অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন; ফররুখ পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। বুদ্ধিজীবী হিসাবে কেউ রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে পারেন না। George Oxwall লিখেছেন, 'in the modern world no one describable as an intellectual can keep out of politics in the sense of not

caring about them' (Notes on Nationalism). তাই ফররুখের কাব্য পড়তে গিয়ে আমাদের তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি মনে রাখতে হবে। আমাদের Historical sense বা ঐতিহাসিক চেতনা থাকতে হবে।

খুব কম লোকেই তাদের সময়ের ঊর্দ্ধে উঠতে পারেন। আবার রাজনৈতিক মতবাদ সময়ের পরিবর্তনে বদলায়। ইংরাজ কবি Wordsworth ফরাসি বিপ্লবের একজন অতি উৎসাহী সমর্থক ছিলেন; কিন্তু এ বিপ্লব যখন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে পরিণত হয়, তখন তিনি এ আন্দোলন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং তিনি ইংরাজ সরকারের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের পরিবর্তন তাঁর কাব্যের মূল্যায়নে কোন প্রভাব ফেলেনি। জন মিল্টন প্রজাতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন। প্রজাতন্ত্র উৎখাত করে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। তখন তিনি নির্যাতিত হয়েছেন, কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা তাঁর কাব্যের মূল্যায়নে কখনো প্রভাব ফেলেনি। তাই ফররুখের মূল্যায়নে তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ কেন বাধা হয়ে দাঁড়াবে?

তাছাড়া, যেসব কবি ইসলামী পুনর্জাগরণের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে ফররুখের পার্থক্য আছে। তাঁরা সরাসরি মুসলিম জাগরণের আহ্বান জানিয়েছেন, যেমন নজরুল ইসলাম লিখেছেন–

নাই তাজ, নাই লাজ
ওরে মুসলিম, খর্জ্জুর শীষে তোরা সাজ।

কিন্তু ফররুখ সরাসরি মুসলমানদের জাগরণের আহ্বান জানাননি। তিনি allegory ব্যবহার করেছেন। Allegory কাকে বলে? এ জাতীয় লেখায় একটা surface story বা প্রকাশ্য ঘটনা থাকলেও তার একটা Underlying meaning বা অন্তর্নিহিত তাৎপর্য থাকে। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজ কবি Dryden এর Absalom and Achilophil এ জাতীয় একটি কবিতা। এ কবিতায় Dryden তৎকালীন একটি রাজনৈতিক ঘটনাকে বাইবেলের Old Testament এর রাজা David এবং তার পুত্র Absalom এর ঘটনাকে Allegory হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এ Allegory সম্বন্ধে T.S. Eliot লিখেছেন: "He made the small into the great, the prosaic into the poetic and the trivial into the magnificent." (Homage to Dryden).

ফররুখ 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত জাগরণমূলক কবিতা লিখতেও এ Allegory ব্যবহার করছেন। তিনি সরাসরি মুসলমানদের প্রতি জাগরণের আহ্বান জানাননি। তিনি আরব্য-উপন্যাসের সিন্দবাদের কাহিনীর মাধ্যমে জাতীয় জাগরণের আহ্বান জানিয়েছেন। এতে রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে এবং তিনি একটি সার্থক Allegory আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন। তিনি একজন

নাবিকের জাগরণের কথা বলেছেন যে নাবিক দীর্ঘদিন ঘুমিয়ে ছিল। তাকে জেগে ওঠার জন্য তিনি নানা কৌশল অবলম্বন করেছেন। (এ সম্পর্কে বিস্তৃত জানার জন্য লেখকের 'ফররুখের নির্বাচিত কবিতার নিগূঢ় পাঠ' গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য)।

তাছাড়া, তিনি শুধু জাগরণমূলক কবিতা লেখেন নি, তিনি ক্ষুধিত মানুষের কথা বলেছেন, মেহনতী জনতার কথা বলেছেন। তাঁর 'লাশ' ও 'আওলাদ' কবিতা এ শ্রেণীভুক্ত। প্রথমটিতে তিনি রাজপথে এক ব্যক্তির অনাহারজনিত মৃত্যুর সকরুণ বর্ণনা দিয়েছেন এবং সমাজের বিত্তবানদের প্রতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয়টিতে অনাহার-ক্লিষ্ট পুরুষ নারী ও শিশুর মর্মান্তিক চিত্র এঁকেছেন এবং আল্লাহর দরবারে বিচারের জন্য ফরিয়াদ করেছেন এবং গণমানুষের প্রতি গভীর দরদ ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। 'অনুস্বার' কাব্য গ্রন্থে সমাজে বিরাজমান লোভ-লালসা, ভণ্ডামি, গ্লানি ইত্যাদি নৈতিক অবক্ষয় উদ্ঘাটন করেছেন এবং এসব ত্রুটি-বিচ্যুতিকে বিদ্রূপের কষাঘাত হেনেছেন। তাঁর মানবতাবোধের প্রকাশ ঘটেছে 'হাতেম তা'য়ী' নামক মহাকাব্যে। 'সিরাজুম মুনীরা' কাব্যে মহানবী (সাঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন-এর আদর্শের রূপায়ণ ঘটেছে। তিনি প্রেমের কবিতা লিখেছেন, শিশুদের জন্যও কবিতা লিখেছেন।

বস্তুতঃ তাঁর কাব্য একটি বিষয়বস্তুতে সীমিত থাকেনি। তিনি আমাদের জীবনের প্রায় সবগুলো দিক স্পর্শ করেছেন। তাঁর কাব্য তাই জীবন-ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তাঁর কাব্য পাঠ আমাদের আলোকিত করে, পুলকিত করে, জীবনদৃষ্টি সম্প্রসারিত করে। সর্বোপরি, তাঁর কাব্যের শিল্পরূপ ও সৌন্দর্য আমাদেরকে মুগ্ধ করে। তাই বলা যায়, তিনি একজন পরিপূর্ণ কবি। তাঁকে কোন সংকীর্ণ বিবেচনায় বা গণ্ডিতে আবদ্ধ করা যায় না। ▣

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, চব্বিশতম সংকলন, অক্টোবর, ২০১২]

# 'ফররুখের 'অশ্রুবিন্দু' ঃ একটি নিগূঢ় পাঠ

**ডক্টর সদরুদ্দিন আহমেদ**

নিটোল মুক্তার মত অপ্রমেয় তোমার নিটল
সু-দুর্লভ অশ্রুবিন্দু! সে পবিত্র জমজম বারি
নির্জিত প্রান্তরে মোর তোলে লক্ষ বারিধির রোল;
নেহারি সমুদ্র সাত–স্বপ্ন দেখি আজো আমি তারি।
তোমার অশ্রুর বুকে সংগোপন সৌর জগতের
সকল ঐশ্বর্য, স্বপ্ন, সব আলো; সব অন্ধকার।
তোমার চিত্তের পথে যে তৃষিত–প্রদোষ লোকের
মানিয়া অশ্রুর সংজ্ঞা রক্ত পূর্বাশার খোলে দ্বার।
যে কথা গুমরি মরে মরুভূর আগ্নেয় অতলে,
যে কথা পায় না দিশা তৃষাতপ্ত লাভার প্রবাহে,
যে কথা পায় না মুক্তি সমগ্র আকাশে, জলে, স্থলে,
যে কথার অন্তর্জ্বালা অন্তহীন ব্যথা-তিক্ত দাহে
নিয়ত জ্বলিয়া ওঠে অবরুদ্ধ চিত্তের পল্বলে;
সে কথা পূর্ণতা পায় একটি নিটোল অশ্রুজলে।।

ফররুখ আহমদের 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্যগ্রন্থটি ১৯৫২ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। এতে মোট আঠারটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। 'অশ্রুবিন্দু' এ কাব্যের এগার নম্বর কবিতা। মূলত এটা একটি সনেট। এর Speaker বা বক্তা (কবি ও বক্তা এক ব্যক্তি নন) তার প্রিয়জনের অশ্রুবিন্দু নিয়ে তার আবেগ ও অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। প্রথমেই তিনি অশ্রুবিন্দুর বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু সে বর্ণনা বস্তুনিষ্ঠ নয়– আত্মনিষ্ঠ : 'নিটোল মুক্তার মত অপ্রমেয় নিটোল তোমার সুদুর্লভ অশ্রুবিন্দু।' এখানে একটি উপমা ব্যবহার করা হয়েছে। উপমায় তিনটি উপাদান থাকে : tenor, vehicle ও ground of comparison. Tenor বলতে মূল বিষয়বস্তু বুঝায়। এখানে tenor হলো অশ্রুবিন্দু। vehicle হলো মাধ্যম অর্থাৎ মূল বিষয়কে যার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। এখানে অশ্রুবিন্দুর সঙ্গে মুক্তার তুলনা করা হচ্ছে। তাদের মধ্যে মিলটা (ground of comparison) হলো : উভয়ই নিটোল। কবিরা উপমা ব্যবহার করেন কোন বিষয় সম্বন্ধে আমাদের চেতনা প্রলম্বিত ও তীব্রতর করার জন্য। অশ্রুবিন্দুর কথা বলতে গিয়ে মুক্তার কথা আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে। উল্লেখ্য যে, অশ্রুবিন্দুকে শুধু নিটোল বলা হয়নি। এর সঙ্গে আরো দুটো বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে। 'অপ্রমেয়' ও 'সুদুর্লভ'। 'অপ্রমেয়' শব্দের অর্থ অসীম, অক্ষয়। এ শব্দটি অশ্রুবিন্দুকে একটি

বিশিষ্টতা দান করেছে। 'সুদুর্লভ' বলতে বুঝায় যা সচারচর দেখা যায় না। আর যা সচরাচর দেখা যায় না তার আকর্ষণ স্বভাবতই দুর্নিবার।

প্রিয়জনের অশ্রুবিন্দুকে বক্তা আরো অর্থবহ করে তুলেছেন জমজম বারির metaphor বা রূপক ব্যবহার করে। উপমার সঙ্গে রূপকের তফাৎ এই যে উপমার তুলনা প্রকাশ্য (overt), অপরপক্ষে রূপক অপ্রকাশ্য বা লুক্কায়িত (covert)। ফলে রূপক অল্প কথায় অধিক অর্থ প্রকাশ করে। উপমায় তুলনার ভিত্তি উল্লেখ থাকে : 'নিটোল মুক্তার মত'। কিন্তু রূপকে সাধারণত সেটা থাকে না। Geoffray N. Lecch লিখেছেন : The very circumstantiality of simile is a limitation, for the ability of metaphor to allude to an indefinite bundle of things which cannot be adequately summarized, gives it its extraordinary power to open 'new paths of expression' (A linguistic guide to English Poetry).

তবে লক্ষণীয় যে ঝমঝম বারি রূপকের মধ্যে অশ্রুবিন্দুর সঙ্গে এর মিলের ভিত্তি উল্লেখ করা হয়েছে : উভয়ই পবিত্র। 'পবিত্র জমজম বারি' এই রূপকের মধ্যে একটি ধর্মীয় দ্যোতনা আছে কারণ জম জমের উৎপত্তি আমরা জানি। কাজেই রূপকটি অশ্রুবিন্দু সম্বন্ধে আমাদের চেতনা উচ্চকিত করে। বক্তার মনেও একটি আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তার নির্জিত প্রান্তরে– তার হতোদ্যম হৃদয়ে তিনি শুনতে পান 'লক্ষ বারিধির রোল'। এ অশ্রুবিন্দু তিনি কবে দেখেছিলেন তার উল্লেখ নেই। কিন্তু সম্ভবত বহুদিন আগে। কিন্তু তিনি আজো রাত্রে সেই সমুদ্রের স্বপ্ন দেখেন। নিটোল মুক্তা, পবিত্র জমজম বারি, সমুদ্র– এসব চিত্রকল্প অশ্রুবিন্দু সম্বন্ধে আমাদের চেতনার স্ত রকে সমুন্নত করে।

কিন্তু বক্তার কাছে তার প্রিয়জনের অশ্রুবিন্দু শুধু জমজমের মত পবিত্র পানি নয়; এ অশ্রুবিন্দু সৌর জগতের প্রতীক। তিনি বলছেন সৌরজগতের সকল ঐশ্বর্য, স্বপ্ন, সব আলো, সব অন্ধকার এর মধ্যে লুকিয়ে আছে। এখানে সৌর জগতের চারটি উপাদানের উল্লেখ করা হয়েছে– ঐশ্বর্য, স্বপ্ন, আলো, অন্ধকার। সৌরজগতের ঐশ্বর্য অপরিসীম। এর সকল ঐশ্বর্যের যেমন পরিমাপ করা যায় না, তেমনি পরিমাপ করা যায় না এর বাকী উপাদানগুলো। এখানে যে অলংকারটি ব্যবহার করা হয়েছে, সেটাকে hyperbole বা অতিরঞ্জন বলা যায়। Hyperbole সাধারণত বক্তার ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ও আবেগের বহিঃপ্রকাশ। শেকসপিয়রের Hamlet যখন Ophelia-এর খোলা কবরে লাফিয়ে পড়ে Ophelia-এর ভাই Laerty-কে লক্ষ্য করে বলছে :

> I loved Ophelia : forty thousand brothers
> Could not, with all their quantity of love
> Make up my sum.

তখন এই উক্তিকে আমরা কিভাবে দেখবো এ ব্যাপারে Geoffry N. Lecch এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : "Subjective statements like this may seem an exaggeration from the point of view of an onlooker, but from the speaker's viewpoint may be utterly serious. (A linguistic guide to English Poetry).

তাই আমাদের বক্তা যখন তার প্রিয়জনের অশ্রুবিন্দুকে সৌরজগতের সবকিছুর প্রতীক বলে উল্লেখ করেন তখন সেটাকে আমরা তার ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ও আবেগের বহিঃপ্রকাশ বলে ব্যাখ্যা করতে পারি। লক্ষণীয় যে, তিনি সৌরজগতের ঐশ্বর্য ও আলোর সঙ্গে অন্ধকারেরও উল্লেখ করেছেন। আর যেহেতু, অশ্রুবিন্দু এ সৌরজগতের প্রতীক তাই এর মধ্যে অন্ধকার বা অপ্রিয় কিছু থাকতে পারে। তবে অশ্রুবিন্দুর এ সংজ্ঞা মেনে নিলে 'প্রদোষ লোকের'–অন্ধকার এক সময় কেটে যাবে, রক্ত পূর্বাশার দ্বার খুলে যাবে, রাঙ্গা প্রভাতের উন্মেষ হবে।

তৃতীয় স্তবকে বক্তার প্রিয়জনের অশ্রুবিন্দুর ভাব প্রকাশের অসামান্য ক্ষমতার উল্লেখ আছে। এ স্তবকে প্রথম তিন লাইনের শুরুতে একটি Synthetic Pattern- একই রকম ব্যাকরণগত উক্তির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে : যে কথা + ক্রিয়াপদ। এটাকে অলংকার শাস্ত্রে Parallelism বা সমান্তরলতা বলা হয়। এর একটি উদ্দেশ্য হলো rhetorical emphasis and memorability। এ প্যাটার্ন বক্তব্যকে জোরদার করে এবং এতে বক্তব্য সহজে মনে রাখা যায়। এর আর একটি উদ্দেশ্য হলো বক্তব্য ও চিত্রকল্পের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করা। এ সংযোগ দু'ভাবে হতে পারে : সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উল্লেখের মাধ্যমে। এখন দেখা যাক তৃতীয় স্তবকে এ উদ্দেশ্য কিভাবে সাধিত হয়েছে। প্রথম বক্তব্য বা চিত্রকল্প হলো মরুভূমির অতলে যে কথা প্রকাশের ব্যাকুলতায় গুমরে মরে। দ্বিতীয় চিত্রকল্প হলো যে কথা আগ্নেয়গিরির লাভার প্রবাহে প্রকাশ পায় না। এ দু'টি চিত্রকল্পের মধ্যে সাদৃশ্য হলো : উভয়ই উত্তাপের কথা বলছে, পার্থক্য হলো একটি কথা প্রকাশ করতে পারছে না, অন্যটি প্রকাশ করছে কিন্তু অপূর্ণভাবে। তৃতীয় ও চতুর্থ চিত্রকল্পেও সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের উল্লেখ আছে : যে কথা সমগ্র আকাশে 'জলে' স্থলে মুক্তি পাচ্ছে না এবং চিত্তেও মুক্তি পাচ্ছে না কিংবা চিত্তের পল্বলে (জলাশয়ে) জ্বলে উঠছে কিন্তু প্রকাশ পাচ্ছে না। উভয় মাধ্যম ব্যর্থ। এটাই দুটোর মধ্যে সাদৃশ্য। বৈসাদৃশ্য হলো একদিকে অনন্ত পৃথিবী, আর একদিকে চিত্তের ক্ষুদ্র জলাশয়। পর পর চারটি চিত্রকল্পের ব্যর্থতা উল্লেখের ফলে যে tension সৃষ্টি হয়েছে এর অবসান ঘটেছে শেষ চিত্রকল্পে– যেখানে অশ্রুবিন্দুর ভাব প্রকাশের অসাধারণ ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। অনেকগুলো 'না' সূচক চিত্রকল্পের পাশে একটি 'হ্যাঁ' সূচক চিত্রকল্পের এ সমাবেশের ফলে একটি শক্তিশালী contrast বা antithesis সৃষ্টি হয়েছে।

ইংরাজ কবি ও সমালোচক কোলরিজ (Colridge) কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন: A poem...must be an organic unity। অর্থাৎ একটি কবিতার প্রত্যেকটি অংশ বাকী অংশের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত এবং এর সব অংশ মিলে এক অখণ্ড সৃষ্টিকর্ম তৈরী হয়। কোলরিজের এ উক্তির আলোকে দেখা যাক, 'অশ্রুবিন্দু' সনেটটি একটি কবিতা হয়েছে কি না। আমরা দেখেছি কবিতাটির প্রথম স্তবকে অশ্রুবিন্দুর একটি বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তবে সে বর্ণনা বস্তুনিষ্ঠ নয়– আত্মনিষ্ঠ। এরপর তিনি অশ্রুবিন্দুর প্রভাবের কথা বলেছেন : এ অশ্রুবিন্দু তার মনে লক্ষ বারিধির রোল তোলে। দ্বিতীয় স্তবকে তিনি অশ্রুবিন্দুর সংজ্ঞা দিয়েছেন– অশ্রুবিন্দুকে সৌরজগতের প্রতীক হিসাবে দেখেছেন। আর শেষ স্তবকে অশ্রুবিন্দুর ভাব প্রকাশের অসাধারণ ক্ষমতার উল্লেখ করেছেন। ফলে 'অশ্রুবিন্দু' একটি নিটোল মুক্তাসদৃশ সুগঠিত কবিতা হয়ে উঠেছে।

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ২৫তম সংকলন, জুন-অক্টোবর, ২০১৩]

# নজরুলের 'উমর ফারুক' ও ফররুখের 'উমর দরাজ দিল' একটি তুলনামূলক আলোচনা

ডক্টর সদরুদ্দিন আহমেদ

॥ ১ ॥

বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে আমরা কখনো কখনো দেখি একাধিক কবি একই বিষয়ের উপর কবিতা লিখেছেন। উদাহরণস্বরূপ সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজ কবি Robert Herrick এবং উনিশ শতকের ইংরাজ কবি William Wordsworth ড্যাফোডিল ফুল নিয়ে কবিতা লিখেছেন। Wordsworth এবং তাঁর সমসাময়িক কবি শেলী উভয়ই স্কাইলার্ক পাখি নিয়ে কবিতা লিখেছেন। আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। তবে উল্লেখ করা দরকার যে বিষয়বস্তু এক হলেও তাঁদের theme বা মূল বক্তব্য এক নয়। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রকাশভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন, যেমন Herrick তাঁর কবিতায় বলেছেন যে ড্যাফোডিল সকালে ফোটে এবং সন্ধ্যায় ঝরে যায়। মানুষের জীবনও তাই। আমাদের জীবন ড্যাফোডিল ফুলের মত ক্ষণস্থায়ী। কবি ড্যাফোডিল ফুলকে মানব জীবনের প্রতীক হিসাবে দেখেছেন। পক্ষান্তরে, Wordsworth ড্যাফোডিল ফুল নিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত আবেগ ও অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। এই ফুল তাঁর জীবনে একটি মূল্যবান সম্পদ হয়ে আছে। উভয় কবির দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আমাদের জীবনবোধকে সম্প্রসারিত করে এবং তাদের প্রকাশভঙ্গির পার্থক্য আমাদের নান্দনিকবোধকে শানিত করে।

॥ ২ ॥

এই সত্যটি আমরা দেখতে পাই নজরুল ইসলামের 'উমর ফারুক' ও ফররুখ আহমদের 'উমর দরাজ দিল' কবিতাদ্বয়ের মধ্যে। এখানে এ দু'টি কবিতার একটি তুলনামুলক আলোচনা করার প্রয়াস পাবো।

নজরুলের কবিতাটি শুরু হয়েছে অনেকটা নাটকীয়ভাবে বক্তার ব্যক্তিগত আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশের মধ্য দিয়ে। 'তিমির রাত্রি'। দূর মসজিদে এশার আজান প্রিয়-হারা কার কান্নার মত বক্তার বুকে এসে বিঁধছে। আজান শুনে তিনি উঠে পড়লেন কারণ আজানের মধ্যে উমরের স্মৃতি বিজড়িত। উমরের পরামর্শেই মহানবী সা. আজানের প্রচলন করেন যদিও মোয়াজ্জিন তা জানে না। তিনি জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। অনেকগুলো প্রশ্ন তার মনে উদয় হলো। তার একটি হলো: মোয়াজ্জিনের কণ্ঠে কি ওমরের আহবান? বক্তা আবার বিছানায় লুটিয়ে পড়লেন। 'সেদিন গিয়েছে-শিয়রের কাছে কহিছে কালের ঘড়ি'। ওমরের স্মৃতি বক্তার মনে ভেসে উঠলো। তিনি ছিলেন মহানবীর (সাঃ) একজন অত্যন্ত প্রিয় সাহাবা। বক্তা

তাকে আহবান নয়–রূপ ধরে আসার জন্য আবেদন করছেন, কারণ অন্ধতা-রাহু ইসলাম রবিকে গ্রাস করেছে–তার জ্যোতি দিন দিন ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হচ্ছে। বক্তা বলেন :

নাই তুমি নাই, তাই সয়ে যায় জামানার অভিশাপ,
তোমার তক্তে বসিয়া করিছে শয়তান ইনসাফ।
মোরা আসহাব-কাহাফের মতো দিবানিশি দেই ঘুম
এশার আজান কেঁদে যায় শুধু-নিঝুম নিঝুম।

বক্তার মনে নানা কথা জেগে উঠছে। তিনি কল্পনা-বোররাকে চড়ে তেরশো বছর আগে ফিরে গেছেন যেদিন আরবে প্রথম মরু-ভাস্কর মুহম্মদ স. এর উদয় হয়েছিল। এ পর্যায়ে তিনি মহানবীর শৈশবের স্মৃতি স্মরণ করেছেন এবং উমরকে তার সাথী হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এরপর বক্তা উমরের জীবনের কতকগুলো উল্লেখযোগ্য ঘটনার নাটকীয় বিবরণ দিয়েছেন। প্রথমে আছে বিদ্রোহের ধ্বজা ধরে ভগিনী ফাতেমার বাড়িতে তার আগমন। ফাতেমা তখন কোরআন পড়ছিলেন। পাগলের মত তিনি কেঁদে বললেন :

ওরে, শোন। পূণ্য সেই বাণী।
কে শেখালো তোরে এ গান কোন বেহেশত হতে আনি
এ কি হ'ল মোর? অভিনব এই গীতি শুনি হায় কেন
সকল অঙ্গ শিথিল হইয়া আসিছে আবেগে যেন।

এরপর তিনি ঈমান আনলেন। 'আল্লাহু আকবর' রবে গগন পবন মুখরিত হয়ে উঠলো। বক্তা বলেন:

ইসলাম-সে ত পরশ–মানিক তারে কে পেয়েছে খুঁজি
পরশে তাহার সোনা হলো যারা তাদেরই মোরা বুঝি।
আজ বুঝি-কেন বলিয়াছিলেন শেষ পয়গম্বর–
'মোর পরে যদি নবী হতো কেউ হত সে এক ওমর।'

বক্তা আরো বলেন যে তুমি অহি পাওনি, নবী হওনি সেই জন্য তোমাকে বন্ধু বলে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারি। খোদাকে আমরা সেজদা করি, নবীকে আমরা সালাম করি। তারা উর্দ্ধের, পবিত্র হয়ে তাঁদের নাম উচ্চারণ করি। কিন্তু তুমি প্রিয় হয়ে আছো হতমান মানুষের বুকে। তুমি অর্ধেক পৃথিবী শাসন করেছো ধুলার তখতে বসি। সবারে উর্দ্ধে তুলিয়া তুমি ছিলে নিচে।

বক্তার স্মৃতিতে এর পর এক ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে উমরের জেরুজালেম যাত্রার নাটকীয় বিবরণ ভেসে এসেছে। কখনো তিনি নিজে উটের পিঠে চড়েছেন, ভৃত্য উটের রশি টেনে নিয়ে গেছে, আবার কখনো ভৃত্য উটের পিঠে বসে আছে। খলিফা উট টেনে নিয়ে গেছেন। তারা যখন জেরুজালেমে পৌছান তখন সেখানকার লোকেরা

দেখলো ভৃত্য উটের পিঠে বসে আছে এবং খলিফা উটের রশি টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। অবাক বিস্ময়ে তারা বললো : এতো খলিফা নয়-এত মানুষ। সন্ধিপত্র সই করার পর নামাজ পড়ার জন্য তিনি গীর্জার বাইরে যেতে চাইলেন। তাকে গীর্জায় নামাজ আদায় করার অনুরোধ জানানো হলো। তিনি রাজী হন নি। বললেন, এটা একটা খারাপ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। পরবর্তীকালে হয়তো মুসলমানরা জোর করে গীর্জাকে মসজিদ বানাবে।

এসব অসাধারণ ঘটনা বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে বক্তা উমরের চরিত্রের অনেক দিকের প্রতি সরাসরি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এতে উমরের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের বিবরণে বৈচিত্র্য এসেছে। কখনো কাহিনী বলেছেন, কখনো সরাসরি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। জেরুজালেমের ঘটনা বর্ণনার পর আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিবরণ আছে। এর একটি হলো নিজের পিঠে এক দুখিনী মায়ের জন্য খাবার বয়ে নিয়ে যাওয়া এবং এ ব্যাপারে অন্যের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করা। অন্য ঘটনাটি হলো: কোমল হৃদয়ের অধিকারী হয়েও তিনি অপরাধ ক্ষমা করেন নি। মদ্যপানের জন্য নিজ পুত্রকে দোররা মেরে হত্যা করেছেন। এসব কাহিনী বর্ণনায় উমরের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল রেখায় ফুটে উঠেছে। বক্তা আক্ষেপ করে বলছেন যে আমরা তাঁকে ভুলে গেছি। কিন্তু তিনি আমাদের ভোলেননি।

আজো আজানের মাঝে
মোয়াজ্জিনের কণ্ঠে বন্ধু তোমারি কাঁদন বাজে।

তাকে বক্তা শহীদ বীর বলে অভিবাদন জানিয়েছেন এবং তার মত তিনিও শহীদ হতে চান। তিনি এই বলে শেষ করছেন :

মৃত্যুর হাতে মরিতে চাহিনা, মানুষের প্রিয় করে
আঘাত খাইয়া যেন গো আমার শেষ নিঃশ্বাস পড়ে।

॥ ৩ ॥

ফররুখের কবিতাটিও নজরুলের কবিতার মত নাটকীয়ভাবে শুরু হয়েছে। উমরের যে চিত্রকল্পটি তিনি প্রথমে ব্যবহার করেছেন সেটি একজন মুসাফিরের :

দেখি সে চলেছে... মরু মুসাফির ... কোথায় কে জানে
পিঠে বোঝা নিয়ে মৃত বিয়াবান ছাড়ায়ে কী টানে!

সে চলেছে পাহাড়, পর্বত সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে দূর্গমতার শিখরে যেখানে মানুষের ঘর। সম্ভবত দুঃখিনী মায়ের বাসায় খাবার নিয়ে। একই সঙ্গে অন্য এক ভ্রমণের কথাও বলা হয়েছে-জেরুজালেমের উদ্দেশ্যে এক ভৃত্য সংগে নিয়ে। নজরুলের কবিতায় এই দু'টি ভ্রমণের বিস্তৃত নাটকীয় বিবরণ আছে। কিন্তু এখানে এ বিবরণ সংক্ষিপ্ত অনেকটা telescopic. ফররুখ নিশ্চয়ই নজরুলের কবিতাটি

পড়েছিলেন। তাই ঘটনা দু'টোর বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নি। মরু-মুসাফির বেশে উমরের যাত্রাকে একত্রে উল্লেখকে তিনি একটি নাটকীয় কৌশল হিসাবে ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয়।

এরপর একটি বিপরীত চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। উমরকে সম্বোধন করে বক্তা বলছেন যে সেদিনে আর এদিনের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। সেদিন উমর নিষ্প্রাণ মরুতে প্রাণবহ্নিতুফান ঢেলে চলেছেন। আজ এখানে আঁধার রাত ঘনিয়েছে। এখানে কেবল আর্তস্বর-আজকে এখানে নাই উমর। তবু ধূলিলুণ্ঠিত জনতা থামে না-তারা উমরের খেলাফাত খুঁজে ফিরছে। বক্তা জানতে চান কেমন করে উমর এই জনতাকে একত্রিত করে উজ্জীবিত করেছিলেন, কেমন করে এক বিবর্ণ মরু রঙিন হয়ে উঠেছিল, কেমন করে সাম্যের খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কেমন করে মরুভূমির বেদুইনদের মধ্যে প্রাণের ঝড় তুলেছিলেন।

এ পর্যায়ে বক্তা উমরের দু'টি বিপরীতধর্মী চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। একদিকে তিনি ছিলেন কঠোর, অন্যদিকে কোমল। জালিম, পাপী, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তাঁর শানিত তরবারি চমকাত। বিপুল ছিল তাঁর তরবারির প্রতাপ :

> অপারজেয় ফিরে আসতো ঘরে শান্তির পতাকাধারী
> সে কী পৌরুষ! শান্তিদীপ্ত
> দরাজ বক্ষে সে কী পুলক
> মিথ্যা হতে সে সত্যে ফারুক
> করে পৃথক।

অন্যদিকে, তাঁকে দেখা যায় ক্ষুধিত মানুষের শিয়রে একাকী ক্রন্দনরত। পিঠে কাঁধে বয়ে নিয়ে যায় বোঝা, মানবতার ক্ষীয়মাণ শিখা মরুতে সঙ্গিহীন উমর তার দরদী বন্ধু, আখেরী নবীর প্রিয় কাফেলার উত্তরাধিকারী। শ্রেষ্ঠ খাদিম, সেরা চাকর। উমরের আরো অনেক বৈশিষ্ট্যের কথা বক্তা উল্লেখ করেছেনঃ জনতা তার কাছে দাবী আদায়ের জন্য আসে। তিনি হাসিমুখে সে দাবী মেটান। দুর্ভিক্ষ দুর্দিনে তিনি কাটান ক্ষুধিত অর্ধাহারে।

বক্তা আরো বলেন, আজকে উমরপন্থী লোকের প্রয়োজন যারা পিঠে বোঝা নিয়ে যাবে পার হয়ে মরু প্রান্তর, যারা অনাবাদী মাঠে ফলাবে ফসল, যাদের হাতের দোররা পড়ে জালিমের ঘাড়ে, যারা লাথি মারে অত্যাচারীর ঘাড়ে, যাদের বুকের পাঁজরে পাঁজরে বহে দরদের বান, যারা খুলেছে রুদ্ধ মনের সংকীর্ণতার খিল। বক্তা নিজের হাতে খলিফার দোররা বেজে উঠুক বলে কামনা করছেন।

এরপর তিনি একটি vision-একটি কাল্পনিক কাফেলা বা শোভাযাত্রার বিবরণ দিয়েছেন। এই কাফেলা 'শব্দিত নৈঃশব্দ্যের মাঝে অনন্ত নিশিদিন চলছে।' কাফেলার একটি শব্দ থাকে, কিন্তু এ শোভাযাত্রা বাস্তব মানুষের নয় বলে এটাকে 'শব্দিত

নৈঃশব্দ্য' মাঝে বলা হয়েছে। এ কল্পিত শোভাযাত্রার নায়কের হাতে সঙ্গিন দিবালোকে চমকায়, উটের পায়ের আঘাতে ধুলা উড়ে চলেছে, তীব্র গতির বেগে জাগে মহারণ্যের ঝড়। এ কাফেলার পুরোভাগে আছেন উযিনি সত্যে অনুপ্রাণিত হয়ে দিন রাত্রি সংকেতে চালনা করেছেন বিরাট জনতা। তিনি খলিফাতুল মুসলেমিন, তিনি মুমিনের প্রতিনিধি। তাঁর বুকে সব মানুষের কল্যাণের ছবি। তিনি মদিনা মসজিদের সুমহান ঝাড়ুদার। তাঁর ঝাড়ুর আঘাতে মানবতার ক্লেদ উড়ে যায়। সব অসাম্য, সব বিভেদের অবসান ঘটিয়ে তিনি পুলকিত বুকে তোলেন গোলাপের গান। এ অসাধারণ কাফেলার আরো বিবরণ অলংকার-খচিত ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে নিম্নোক্ত স্তবকে :

মহাজীবনের বিকশিত ফুল নিয়ে সকলের আগে
তার কাফেলার বাঁশি বেজে চলে দুর্বার অনুরাগে,
কী বিচিত্র জৌলসে রাঙে নিথর রাত্রিতল,
জমাট পাথর জুলমাত ছিঁড়ে জাগে শিখা প্রোজ্জ্বল।
নতুন পথের মোবারক-বাদে আগ্নেয় বোররাক
সাত সাহারার সাইমুমে শোনে খোর্মাবিথির ডাক,
লাখো সিতারার মাঝে সে উজালা প্রদীপ্ত রোশনিতে
উমর স্মৃতির আতশী বেদনা মখলুকাতের ভিতে।

এখানে উমরের কাফেলার যে vision, যে স্বপ্ন, যে কাল্পনিক চিত্র প্রকাশ পেয়েছে, তা অসাধারণ কাব্য-সৌন্দর্যে মণ্ডিত। মহাজীবনের বিকশিত ফুল, কী বিচিত্র জৌলসে রাঙ্গানো নিথর ধরণীতল, জমাট পাথর জুলমাত ছিঁড়ে প্রোজ্জ্বল আলোর শিখা, মোবারকবাদে মুখরিত আগ্নেয় বোররাক, সাত সাহারার সাইমুম, লাখো সিতারার মাঝে প্রদীপ্ত রোশনাই, উমর স্মৃতির আতশী বেদনা ইত্যাদি চিত্রকল্প কবির অনবদ্য কল্পনা শক্তির পরিচয় বহন করে।

কিন্তু যে vision তিনি এঁকেছেন সেটা তো বাস্তব নয়। কবি কীট্স Ode to Nightingale কবিতায় যে স্বপ্ন জগত সৃষ্টি করেছিলেন সেটা আমাদের মুগ্ধ করে, কিন্তু সেটা সাময়িক। কবিকে বাস্তব জগতে ফিরে আসতে হয়েছিল। আর বাস্তব জগৎ বড় রূঢ়। ফররুখ যে vision এঁকেছেন সেটা একটা স্বপ্ন। একথা তিনি ভোলেন নি। তাই কবিতার শেষে বাস্তব জগতে ফিরে এসেছেন। বলছেন :

আজকে এখানে মৃত মরুভূমি অচল এ মরুপোত
বহে অসংখ্য বালু তুফানে দিন রাত্রির স্রোত
লু হাওয়ায় হেথা তীব্র পিপাসা, মৃত্যুর হাহাকার
আজকে এখানে নিশীথ-প্রহরী উমর জাগেনা আর

এ সর্বনাশা বিপর্যয়ের মধ্যে আমাদের বক্তা বা কবি হতাশ হন নি। কবিতার শেষ লাইন দুটো এই :

তবু অতীতের প্রশ্বাসে আজো ভরে নিখিল,
দরদী উমর! বন্ধু উমর! দরাজ দিল।।

॥ ৪ ॥

নজরুল ও ফররুখের কবিতা দু'টি Wordsworth এবং Milton কে উদ্দেশ্য করে লেখা "London 1802" কবিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এটি একটি সনেট। এ সনেটে Wordsworth ইংল্যান্ডের তৎকালীন পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে Milton এর গুণাবলী উল্লেখ করে তার বেঁচে থাকার প্রয়োজন ছিল বলে মন্তব্য করেছেন। কবিতাটি এই :

## London, 1802
### *By William Wordsworth*

Milton! thou shouldst be living at this hour:
England hath need of thee: she is a fen
Of stagnant waters: altar, sword, and pen,
Fireside, the heroic wealth of hall and bower,
Have forfeited their ancient English dower
Of inward happiness. We are selfish men;
Oh! raise us up, return to us again;
And give us manners, virtue, freedom, power.
Thy soul was like a Star, and dwelt apart:
Thou hadst a voice whose sound was like the sea:
Pure as the naked heavens, majestic, free,
So didst thou travel on life's common way,
In cheerful godliness; and yet thy heart
The lowliest duties on herself did lay.

এ কবিতায় উনিশ শতকের ইংরাজ কবি Wordsworth সপ্তদশ শতকের কবি Milton কে আবার ফিরে আসার আহবান জানাচ্ছেন, কারণ ইংল্যান্ড তখন একটা বদ্ধ জলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। এখানকার মানুষ হয়ে পড়েছে স্বার্থপর। তারা পুরানো মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলেছে। এতে কবি আফসোস করছেন। তিনি মিলটনের কতকগুলো অনুকরণীয় গুণাবলীর প্রশংসা করেছেন এবং সেগুলো অনুসরণ করার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

Wordsworth এর কবিতাটি একটি সনেট-মাত্র ১৪ লাইনে সীমিত। পক্ষান্তরে, নজরুল ও ফররুখের কবিতাটি দুটি বেশ দীর্ঘ। তবু তিনটি কবিতার প্যাটার্ন মোটামুটি এক–কোন ব্যক্তির প্রশংসা, আমাদের দুরবস্থার বিবরণ এবং সেই প্রেক্ষিতে প্রশংসিত ব্যক্তির পুনরাবির্ভাবের আবেদন।

নজরুলের কবিতাটি দীর্ঘ হলেও এর একটি সুদৃঢ় কাঠামো আছে। এশার আজান শুনে বক্তা উঠে পড়েছেন। আজানের সঙ্গে উমরের সম্পৃক্ততার উল্লেখ করেছেন। উমরের কালের সঙ্গে আমাদের কালের তফাৎ উপলব্ধি করে বেদনায় কাতর হয়েছেন। আজানের সূত্র ধরে উমরের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনার নাটকীয় বিবরণ দিয়েছেন এবং সে বিবরণের মধ্যে তিনি উমরের উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি গেয়েছেন। শেষে আবার আজানের উল্লেখ করে তার সঙ্গে একাত্ততা প্রকাশ করেছেন এবং উমরের মত শহীদ হওয়ার বাসনা ব্যক্ত করেছেন। তার ভাষায় ঃ

হে শহীদ! বীর! এই দোওয়া করো আরশের পায়া ধরি,
তোমারি মতন মরি যেন হেসে খুনের সেহারা পরি।

ফররুখের কবিতাটিও দীর্ঘ। তবে এর কাঠামো নির্মিত হয়েছে কিছুটা ভিন্নভাবে। ফররুখ নজরুলের মত উমরের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিবরণ দেননি। তাঁর কবিতাটি প্রশস্তিমূলক যদিও প্রথমে তিনি কাহিনী দিয়ে শুরু করেছেন। তবে এ কাহিনী অতি সংক্ষিপ্ত। নজরুল যেখানে আমাদের কালের দুর্দশার আভাস দিয়েছেন মাত্র, ফররুখ সেখানে এ দুর্দশার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন এবং আজকের দিনে উমরপন্থী লোকের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর কবিতার শেষের দিকে তিনি একটি vision- স্বপ্নের কাফেলার কথা বলেছেন-যে কাফেলার পুরোভাগে আছেন উমর নিজে। এ vision এর মধ্য দিয়ে কবি আমাদের সামনে একটি ভবিষ্যতের রূপরেখা তুলে ধরেছেন। তবে তাঁকে পুরোপুরি স্বাপ্নিক বলা যাবে না কারণ শেষে তিনি বাস্তব জীবনে ফিরে এসেছেন এবং বর্তমান অবস্থার একটি চিত্র তুলে ধরেছেন যার মধ্যে আমাদের দুর্দশার চিত্র ফুটে উঠেছে। তবে তিনি হতাশায় ভেঙ্গে পড়েন নি। নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও কবিতা দু'টো বস্তুনিষ্ঠ নয়, আবেগঘন, ভক্তিরসে সিক্ত, ইসলামী আদর্শে দীপ্ত, সর্বোপরি কাব্য-সুষমায় মণ্ডিত। ☐

---

[লেখক : ঢাকাস্থ নর্দান ইউনিভার্সিটির ইংরাজি বিভাগের চেয়ারম্যান এবং মানবিক ও কলা অনুষদের ডীন।]

# ফররুখ আহ্‌মদের 'সাত সাগরের মাঝি'

## ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

কবি ফররুখ আহমদের (১০ জুন ১৯১৮-১৯ অক্টোবর ১৯৭৪) প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' (১৯৪৪)। এই কাবে'্যই কবি ফররুখ আহমদ চল্লিশ দশকের প্রধান কবি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। কবির প্রথম সমালোচক আবু রুশ্‌দ ১৯৪১ সালে "আধুনিক কবিতা ও মুসলিম কবিগণ (সওগাত, ভাদ্র ১৩৪৮) প্রবন্ধে বলেন : "তাঁর একটি বলিষ্ঠ সজাগ অনুভূতিশীল মন আছে যা সৌন্দর্যের অস্তিত্বকে স্বীকার করবার সাহস রাখে, কিন্তু রোমান্টিসিজমের বিপদ সম্বন্ধে যা সর্বদা সচেতন। তাঁর মেধা এবং সূক্ষ্ম পরিমাণ-জ্ঞান বিস্ময়কর এবং তাঁর বয়সের কবির রচনায় অপ্রত্যাশিত। শব্দের নিপুণ চয়নে কল্পনার ব্যাপকতা এবং গভীর অর্থে পরিস্ফুট রূপক মাধুর্যে তাঁর কবিতা সহজেই বিশিষ্টতা অর্জন করেছে।"

কবি আবদুল কাদির ফররুখ আহমদের উপরে কাজী নজরুল ইসলামের প্রভাব বিশ্লেষণ করে লিখেছেন : "উভয় কবিই মুসলমানের পুনর্জাগরণ কামনা করেন, আর উভয়েই রোমান্টিক। তবে নজরুল জাতীয় গণতান্ত্রিক কবি আর ফররুখ ধর্মবাদী সমাজতান্ত্রিক।" **(সওগাত, বৈশাখ ১৩৫৪)**।

কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁর সম্পাদিত ফররুখ আহমদ রচনাবলীর (আষাঢ় ১৩৪২, জুন ১৯৯৫, বাংলা একাডেমী) প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লিখেছেন : "শব্দ, ছন্দ, কাব্যভাষা ও বিষয়– সব মিলিয়ে 'সাত সাগরের মাঝি' এমন একটি অনুপম গ্রন্থ, যার তুলনা কেবল চলতে পারে ফররুখের পূর্বসূরী শ্রেষ্ঠ কয়েকজন কবির আলোড়ক কবিতা গ্রন্থের সঙ্গে- জীবনানন্দ দাসের, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা', বিষ্ণুদের 'উর্বশী ও আর্টিমিস', সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'অর্কেষ্ট্রা', অমিয় চক্রবর্তীর 'খসড়া', অজিত দত্তের 'কুসুমের মাস', 'বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা' প্রভৃতির সঙ্গে। 'সাত সাগরের মাঝি'তে ফররুখ কেবল নিজস্ব কাব্য বিষয়ই খুঁজে পান নি, তাঁর প্রকাশের উপযুক্ত কাব্য ভাষাও আবিষ্কার করেছেন। সেখানে নজরুল, মোহিতলাল, জীবনানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে-র দূর রণন নেই আর– যদিও যেকোন প্রকৃত কবির মত পূর্বজদের শিক্ষা তিনি পুরো কাজে লাগিয়েছেন। তাই জীবনানন্দ আর প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমুদ্রচারণা থেকে ফররুখের 'সমুদ্র সফর' স্বতন্ত্র হয়ে গেছে; নজরুলের ইসলামী পুনরুজ্জীবন থেকে ফররুখের ইসলামী পুনরুজ্জীবনের স্বর স্বাদ আলাদা; বিষ্ণুদের ইতিহাস-পুরাণের প্রয়োগ থেকে ফররুখের ইতিহাস পুরাণ ব্যবহার অন্যরকম। সব মিলিয়ে 'সাত সাগরের মাঝি' এমন এক বিস্ময়কর কবিতা গ্রন্থ, যাকে আমার বিবেচনায়, ফররুখ আহমদও অতিক্রম করতে পারেন নি আর। তাঁর

প্রথম গ্রন্থই ফররুখের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। প্রথম প্রকাশের পঞ্চাশ বছর পরও এ বই সমানভাবেই জ্বলন্ত, জাগ্রত, প্রাণবন্ত, কালোজ ও কালোত্তর।"

'সাত সাগরের মাঝি' কাব্য গ্রন্থ কবি উৎসর্গ করেছেন, "বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ তমদ্দুনের রূপকার দার্শনিক মহাকবি, আল্লামা ইকবালের অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে।" এই কাব্যে কবি জীবনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা বলেছেন– আশাবাদী নানা চিত্র ও চিত্রকল্প এবং প্রতীকের মাধ্যমে। বাঙালি মুসলিম পুনর্জাগরণের কবি তাঁর কবিতায় পুঁথি সাহিত্য থেকে অভিযাত্রীক চরিত্র সিন্দবাদ অবলম্বন করেছেন তাঁর মূল বক্তব্য প্রকাশের জন্য। তাঁর প্রথম কবিতার নাম 'সিন্দবাদ'। এই কবিতায় কবি বলছেন,–

"কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ,
শুনেছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
ভাসে জোরওয়ার মৌজের শিরে-সফেদ চাঁদের তাজ,
পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ ব'য়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক;
নতুন পানিতে সফর এবার হে মাঝি সিন্দবাদ!

... ... ... ...

ভেঙে ফেলো আজ খাকের মমতা আকাশে উঠেছে চাঁদ,
দরিয়া বুকে দামাল জোয়ার ভাঙছে বালুর বাঁধ,
ছিঁড়ে ফেলে আজ আয়েশী রাতের মখমল-অবসাদ
নতুন পানিতে হাল খুলে দাও, হে মাঝি সিন্দবাদ।

**(ফররুখ আহমদ রচনাবলী-১, পৃষ্ঠা-৫)**

পরবর্তী কবিতা 'বার দরিয়ায়' এই সমুদ্র অভিযাত্রীকের দুরন্ত দুর্বার যাত্রার কথা,–

"সমুদ্র থেকে সমুদ্রে ঘোরে দরিয়ার শাদা তাজী!
খুরের হল্‌কা,–ধারালো দাঁড়ের আঘাতে ফুলকি জ্বলে
সমুদ্র থেকে সমুদ্রে ঘোরে দরিয়ায় শাদা তাজী...
কেশর ফোলানো পালে লাগে হাওয়া, মাস্তুলে দোলে চাঁদ,
তারার আগুণে পথ বেছে নেয় স্বপ্নেরা সারারাত,
তাজী ছুটে চলে দুরন্ত গতি দুর্বার উচ্ছল;
সারা রাত ভারি 'তোলপাড় করি' দরিয়ার নোনাজল।"

**(ঐ, পৃষ্ঠা-৮)**

"এবারের ঝড় পাড়ি দিয়ে মোরা ফিরেছি বিজয়ী মাঝি!
দেখ আমাদের নিশান উড়ছে নীল আকাশের গায়
কেশর ফোলানো পাল নিয়ে ফের ছুটছে সফেদ তাজী।"

**(ঐ, পৃষ্ঠা-১০)**

পরবর্তী কবিতা 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' আটজন মাল্লা ও সিন্দবাদের সংলাপের আকারে রচিত নাট্য কবিতা। সমুদ্রের নানা বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করে সিন্দবাদ তাঁর সাথীদের বলছেন আশা ও সম্ভাবনার কথা,–

"কালো মওতের মুখোমুখী হ'য়ে জংগী জোয়ান ফিরে
দরিয়া-সোতায় টেনে তুলি চলো তুফানের মাতামাতি।
ভুলে যেওনা এ মাল্লার জিন্দিগী,–
শুরু করো ফের নতুন সফর আজি,
দেখ, মাস্তুলে জ্বেলেছি নতুন বাতি;
মৌসুমী-হাওয়া পাল ভ'রে ওঠে বাজি'।"
(ঐ, পৃষ্ঠা ১৪-১৫)

এভাবে পুঁথি সাহিত্যের চরিত্রের মধ্যে কবি সংগ্রাম বিজয়ী অভিযাত্রীকের অপরাজেয় জীবনের ছবি এঁকেছেন। এই অভিযাত্রীকের প্রতীকের মধ্য দিয়ে মুসলিম পুনর্জাগরণেরও নতুন জীবন উপলব্ধির সম্ভাবনার কথাই বলেছেন কবি। 'আকাশ-নাবিক' কবিতায় কবি পাখীর প্রতীকে অপূর্ব আবেগ অভিনব চিত্রকল্পে জীবানুভূতি প্রকাশ করেছেন।

"আখরোট বনে,
বাদাম খুবানী বনে
কেটেছে তোমার দিন।
হে পাখি শুভ্রতনু
সফেদ পলকে চমকে বিজুরী, চমকে বর্ণধনু,–
সোনালি, রূপালি রক্তিম রংগিন।"
(ঐ, পৃষ্ঠা-১৭)

এই কবিতার শেষাংশে কবি বলছেন অন্তর্লোকের কথা :

"তোমাকে সুন্দর করে সে আমার প্রেম–
অন্তরের ঘ্রাণ-
দিন রাত্রি ঝ'রে ঝ'রে পড়ে
পাপড়ির 'পরে,
মনের আকাশে
প্রশান্ত সুপ্তির মতো ব্যথাভারাক্রান্ত তার গন্ধ ভেসে আসে॥
(ঐ, পৃষ্ঠা-২৩)

অন্যদিকে 'ডাহুক' কবিতায় তিনি শুনেছেন অসামান্য তন্ময়তার প্রতিধ্বনি। ডাহুকের ডাকের অশরীরী সুরের মধ্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে জিকিরের গভীর তন্ময়তা।

এই প্রতীকের ব্যবহার প্রসঙ্গে ফররুখ আহমদ আমাদের সঙ্গে আলোচনার সূত্রে একাধিকবার এই ব্যাখ্যার কথা বলেছেন। মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ তাঁর "ফররুখের কবিতা : তাঁর শিল্পরূপ" প্রবন্ধে এ কথা উল্লেখ করে লিখেছেন,– "ফররুখ আহমদ বলতেন, তিনি 'ডাহুক'কে নিঃসঙ্গ সাধকের জিকির এবং তাঁর সাধনার সাফল্যের প্রতীক হিসেবেও ব্যবহার করেছেন। ডাহুক রাতভর ডাকতে ডাকতে গলায় রক্ত তুলে ডিমে তা ছড়িয়ে দিয়ে ওম্ দিলেই নাকি বাচ্চা ফোটে। সাধকের সাধনা এবং সাফল্য অনেকটা ঐ রকমই।" ('ফররুখ আহমদ ব্যক্তি ও কবি' শাহাবুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৮৪)। তবে কবিতাটির যে ব্যাখ্যাই কবি দিন না কেন কবিতাটির মানবিক আবেদন বিচিত্র উপমা ও উৎপ্রেক্ষার মধ্য দিয়ে এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে গেছে। পৃথিবীময় বেদনাদীর্ণ মানুষের নিঃসঙ্গতা যে অসীম অনন্তের সান্নিধ্য সন্ধানী তারই চিত্ররূপ এই কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। ব্যক্তি মানুষের হৃদয়কে প্রকৃতির এই বাঙময় আকুতি আলোড়িত করেছে। যেন গভীর এক বিশ্বাসের মধ্যেই মানুষের সেই আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি।

"রাত্রির অরণ্যতটে হে অশ্রান্ত পাখী।
যাও ডাকি ডাকি
অবাধ মুক্তির মত।
ভারানত
আমরা শিকলে,
শুনি না তোমার সুর, নিজেদের বিষাক্ত ছোবলে
তনুমন করি যে আহত।
এই ম্লান কদর্যের দলে তুমি নও
তুমি বও
তোমার শৃঙ্খল-মুক্ত পূর্ণ চিত্তে জীবনমৃত্যুর
পরিপূর্ণ সুর।

তাই তুমি মুক্তপক্ষ নিভৃত ডাহুক
পূর্ণ করি বুক
রিক্ত করি বুক
অমন ডাকিতে পারো। আমরা পারি না।

**(ফররুখ আহমদ রচনাবলী-১ পৃষ্ঠা ২৭-২৮)**

ফররুখ আহমদের 'ডাহুক' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। তাঁর আর একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা 'পাঞ্জেরী'। ফররুখ কবি মানসের বিশ্বাসের তিনটি সুচিহ্নিত পর্যায় এখানে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। প্রকৃতপক্ষে তিনি নির্যাতিত মানবতার কবি। এই তাঁর প্রথম এবং শেষ পরিচয়। তাঁর জীবন-বিশ্বাস এই অনুভূতির ওপরই প্রতিষ্ঠিত। প্রথম

জীবনে তাঁর আস্থা ছিল বামপন্থী রাজনীতিতে, পরবর্তীকালে তিনি ইসলামী সাম্যবাদে আস্থা স্থাপন করেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে এই সৃষ্টিশীল কবির গভীর অনুভূতি মানবতাবাদী চিন্তা ও চেতনায় অভিষিক্ত হয়ে তাঁর স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করেছে। 'পাঞ্জেরী' প্রতীকের মধ্য দিয়ে তিনি সারা বিশ্বের অবক্ষয়িত মূল্যবোধের ক্রান্তিকালে বিশ্বাসীদেরকে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আহ্বান জানিছেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে স্বীকার করেছেন।

"তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে;
অসীম কুয়াশা জাগে শূন্যতা ঘেরি।"
(ঐ, পৃষ্ঠা-২৯)

'তুমি' এখানে 'পাঞ্জেরী' এবং 'আমি' দাঁড়ি, মাঝি, মাল্লার প্রতীক। এঁদেরই দায়িত্ব বন্দরে অপেক্ষমাণ সওদাগর ও যাত্রীদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়ার কিন্তু কোন 'ভুল' সব পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিচ্ছে, যা সকলের অজ্ঞাত, তাই কবি বলছেন,

"বন্দরে বসে যাত্রীরা দিন গোনে...
... ... ...
সওদাগরের দল মাঝে মোরা ওঠায়েছি আহাজারী,
(ঐ, পৃষ্ঠা-৩০)

এর ফল বড় ভয়ানক বলে কবি মনে করেন। তাই মূল যে চিন্তা কবিকে গভীরভাবে আলোড়িত করে তা হলো এই দায়িত্বহীনতার ফলে নির্যাতিত মানুষের দুঃখভারের দায়-ভাগ কার? তাই জলদ গম্ভীর কণ্ঠে কবির আহ্বান,– পাঞ্জেরীকেই–

"জাগো বন্দরে কৈফিয়তের তীব্র ভ্রুকুটি হেরি,
জাগো অগণন ক্ষুধিত মুখের নীরব ভ্রুকুটি হেরি;
দেখ চেয়ে দেখ সূর্য ওঠার কত দেরী, কত দেরী।"
(ঐ, পৃষ্ঠা-৩১)

এখনো প্রশ্ন থাকে এই নেতা কে? কবির আকুতিতে মনে হয় শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন বিশ্বাসী মানুষেই তাঁর আস্থা।

এই কাব্যের আর একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা 'লাশ'। এই স্পষ্টবাদী সাহসী নির্ভীক কবি দৃঢ়কণ্ঠে অঙ্গীকার করেন এবং এই জড়-সভ্যতাকে অভিশাপ দেন;–

"হে জড় সভ্যতা–।
মৃত-সভ্যতার দাস স্ফীতমেদ শোষক সমাজ।
মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ;
তারপর আসিলে সময়
বিশ্বময়

তোমার শৃঙ্খলগত মাংস পিণ্ডে পদাঘাত হানি
নিয়ে যাব জাহান্নাম দ্বার-প্রান্তে টানি;
আজ এই উৎপীড়িত মৃত্যুদীর্ণ নিখিলের অভিশাপ বও;
ধ্বংস হও
তুমি ধ্বংস হও।"
**(ঐ, পৃষ্ঠা-৩৪)**

১৩৫০ এর মন্বন্তরের পটভূমিতে রচিত এই কবিতা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহে বাংলা ভাষার একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। এই কবিতার চিত্রাবলীর প্রাসঙ্গিকতা এই বিষয়ে জয়নুল আবেদীনের ছবির মতই গভীর ব্যঞ্জনায় চিরন্তনতা লাভ করেছে। এভাবেই এই কবির কবিতা কাব্য-সত্যকে স্পর্শ করে কালীন খণ্ড-আবর্তের ঘূর্ণী অতিক্রম করে স্থায়ী মূল্য লাভ করেছে। 'আউলাদ' কবিতায় এই মানবতার অপমান ও অমর্যাদায় কবির ব্যথিত হৃদয়ের উচ্চারণ শুনি,–

"চলে দল বেঁধে শিশু ওষ্ঠে তুলি জীবনের
পানপাত্র সুতীব্র বিস্বাদ
মানুষের বুভুক্ষু মুমূর্ষু আউলাদ!
জড়তার–
পাথর জমানো পথ,
এ বীভৎস সভ্যতার
গড়খাই কাটাপথ
আঁধারে ঢাকিয়া আকাশেরে
ডাকে তাহাদেরে॥"
**(ঐ, পৃষ্ঠা ৪৩-৪৪)**

কবি তাই ব্যাকুল কণ্ঠে প্রজন্মের ভবিষ্যৎ কল্পনা করে আশা ব্যক্ত করেন,

": আর যেন ক্লিষ্ট নাহি হয়
আর যেন ত্রস্ত নাহি হয়,
পথে দেখি–পীড়নের ফাঁদ,
আর যেন ভ্রষ্ট নাহি হয়
মানুষের ভবিষ্য দিনের আউলাদ।"
**(ঐ, পৃষ্ঠা-৪৫)**

ফররুখ আহমদের রোমান্টিক কাব্য-ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা 'সাত সাগরের মাঝি'। এই কবিতায় কবি জাতির বিবেককে জাগাতে চেয়েছেন। ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সচেতন হয়ে সাফল্যকে ছিনিয়ে আনতে আহ্বান করেছেন। এই মানবিক দায়িত্ব মানুষের উপরেই অর্পিত একথা ভুললে চলবে না,–

"এবার তোমার রুদ্ধ কপাটে মানুষের হাহাকার
ক্ষুধিত শিশুর কান্নায় শেষ সেতারের ঝংকার।
আজকে তোমার পাল ওঠাতেই হবে,
ছেঁড়া পালে আজ জুড়তেই হবে তালি,
ভাঙা মাস্তুল দেখে দিক করতালি,
তবুও জাহাজ আজ ছোটাতেই হবে।"
(ঐ, পৃষ্ঠা-৪৭)

কবি গভীর প্রত্যয়ে বলছেন মানুষ দায়বদ্ধ মাটির কাছে। মাটিই নারঙ্গী বনে সবুজ পাতাকে কাঁপিয়ে নতুন জীবনকে আহ্বান করে। এক সবুজ পাতার দিন শেষ হয়ে গেলেও আবার সবুজ পাতা জাগে। এই পাতাই জীবনের আহ্বান। মাটির এই আকুতির কথাই কবি নতুন কালের অভিযাত্রীদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন,

"সকল খোশবু ঝরে গেছে বুস্তানে
নারঙ্গী বনে যদিও সবুজ পাতা–
তবু তার দিন শেষ হয়ে আসে ক্রমে–
অজানা মাটির অতল গভীর টানে
সবুজ স্বপ্ন ধূসরতা বয়ে আনে
এ কথা সে জানে
এ কথা সে জানে।
তবু সে জাগাবে সব সঞ্চয়ে নারঙ্গী রক্তিম,
যদিও বাতাসে ঝরেছে ধূসর পাতা;
যদিও বাতাসে ঝরছে মৃত্যু হিম,
এখনো যে তার জ্বলে অফুরান আশা;
এখনো যে তার স্বপ্ন অপরিসীম।'
(ঐ, পৃষ্ঠা-৪৯)

এই জাগরণের প্রত্যাশা মাটির আর অঙ্গীকার মানুষের। এই মুক্তি সম্ভব স্বপ্নের বাস্তবায়নে এবং এক প্রত্যাশিত অর্থনৈতিক মুক্তির মধ্য দিয়ে। এই বিশ্বাসে কবি আহবান করেন নতুন প্রজন্মকে তার 'বেসাতি' নিয়ে পৃথিবীর পথে ভাগ্যান্বেষণের অভিযাত্রায়,

'দেখ জমা হল লালা, রায়হান তোমার দিগন্তরে;
তবু কেন তুমি ভয় পাও, কেন কাঁপো অজ্ঞাত ডরে।"
(ঐ, পৃষ্ঠা-৪৬)

উদয়াচলের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে, দিক নির্দেশনা ঠিক করে, যাত্রা পথে অগ্রসরমান থাকতে না পারলে সুনিশ্চিত মৃত্যু জাতির জন্য অপেক্ষা করে আছে, কবি এই সতর্ক ও সাবধান বাণীও উচ্চারণ করেছেন,

'হে মাঝি তোমার বেসাতি ছড়াও, শোনো;
নইলে যে সব ভেঙে হবে চৌচির।"

(ঐ, পৃষ্ঠা-৪৬)

কবি তাই বলেন,

"হে মাঝি! তবুও থেমোনা দেখে এ মৃত্যুর ইঙ্গিত,
তবুও জাহাজ ভাসাতেই হবে শতাব্দী মরা গাঙে।
এখানে এখন রাত্রি এসেছে নেমে,
তবু দেখা যায় দূরে বহু দূরে হেরার রাজ–তোরণ,
এখানে এখন প্রবল ক্ষুধায় মানুষ উঠছে কেঁপে
এখানে এখন অজস্র ধারা উঠেছে দু'চোখ ছেপে
তবু দেখা যায় দূরে বহু দূরে হেরার রাজ তোরণ..." (ঐ, পৃষ্ঠা-৪৮)

হেরার রাজ-তোরণ কবির অভীষ্ট লক্ষ্য। কবি ধূসরতা ও পাণ্ডুরতা থেকে স্বপ্ন এবং সম্ভাবনাময় জীবনের পথে অগ্রসর হতে বলেছেন। কবি তরুণ প্রজন্মকে শতাব্দীর সমস্ত কু-সংস্কার ও ভয়ভীতি ত্যাগ করে শান্তিময় জীবন চেতনার আনন্দে অবগাহিত হতে বলেছেন। যে জাগরণ পৃথিবীতে শুরু হয়েছে, সে সম্পর্কে জাতিকে সচেতন হওয়ার জন্য কবি ডাক দিয়ে বলেছেন,

"শাহী দরজার সকল কপাট অনেক আগেই খোলা,
অনেক আগেই সেখানে দ্বাদশী জোছনা দিয়েছে দোলা।
এবার তাহলে বাজাও তোমার যাত্রার জয় ভেরী,
আসুক যাত্রী পথিক, হে মাঝি এবার করোনা দেরী।"

(ঐ, পৃষ্ঠা-৪৮)

এই কবিতায় কবি জীবন প্রেমের এক অভূতপূর্ব উদ্‌ঘাটন দেখিয়েছেন। মাটি ও মানুষের সম্পর্ক জীবন জয়ের কথাই বলে। অকূল নোনা জলধি অতিক্রম করে এই মাটিতেই জীবনের জয়গাঁথা রচিত হয়। এই জলধি দুস্তর অনতিক্রান্ত বাধার পাথার। গভীর বিশ্বাস ও স্বপ্ন সন্ধান ছাড়া এ যাত্রা পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভয় ভীতি কুসংস্কারই সেই বাধা। তাই কবিতার শুরুতে উদয়াচলে সূর্যের আহ্বান, সবুজ পাতার আন্দোলনকে কবি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং নির্ভীক নতুন কালের অভিযাত্রীকে পিছনের ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে জীবন প্রেরণা নিয়ে সম্মুখে হেরার রাজ-তোরণের দিকে যাত্রা করতে বলেছেন,

"কত যে আঁধার পর্দা পারায়ে ভোর হল জানিনা তা।
নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা।
দুয়ারে তোমার সাত সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা
তবু জাগলেনা? তবু তুমি জাগলে না?

সাত সাগরের মাঝি চেয়ে দেখ দুয়ারে ডাকে জাহাজ,
অচল ছবি সে, তসবির যেন দাঁড়ায়ে রয়েছে আজ"
(ঐ, পৃষ্ঠা-৪৫-৪৬)

এই অচল অবস্থার পরিবর্তনই কবির কাম্য। সমগ্র কাব্য কবিতার ভাষা ছন্দ বিষয় ও আঙ্গিক পরীক্ষায় কবি পূর্বাপর সতর্ক সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের অধিকাংশ কবিতায় তাঁর সচেতন মনের প্রকাশ ঘটেছে। প্রতিটি কবিতাই আবৃত্তিযোগ্য ও বলিষ্ঠ। উপমা রূপক ও উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগে ও ব্যবহারে কবিতাগুলো সমৃদ্ধ। ফররুখ আহমদের এই প্রথম কাব্য গ্রন্থ তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও উৎকর্ষের পরিচয় বহন করে।

কবি ফররুখ আহমদের কাব্য-প্রতিভা সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসান বলেন; "ফররুখের কাব্য-প্রক্রিয়ায় যেহেতু একটি বিশ্বাসের উন্মুখরতা ছিল, তাই তাঁর পাঠকের সংখ্যা আমাদের মধ্যেই সর্বাধিক। বিশ্বাসের সে একটি কল্লোলিত সমর্থন পেয়েছে আবার ব্যবহৃত শব্দের পরিধির সার্থক বিবেচনা এবং ধ্বনিসাম্যের কারণে অবিশ্বাসীও তাঁকে অগ্রাহ্য করতে পারেনি।" **[সৈয়দ আলী আহসান : 'সতত স্বগত', ইউনিভার্সাল প্রেস লি., ১৯৮৩, পৃ. ১৪৫]** ☐

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, অক্টোবর, ২০০২]

# ফররুখ আহমদের 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্য

ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

"সাত সাগরের মাঝি"র সমকালীন রচনা "সিরাজাম মুনীরা" কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে "সাত সাগরের মাঝি" প্রকাশিত হওয়ার আট বছর পর। এ কাব্য গ্রন্থের দু'টি অংশ। প্রথম অংশের নাম 'সিরাজাম মুনীরা মুহাম্মদ মুস্তফা' এবং 'খোলাফায়ে রাশেদীন' নামে দ্বিতীয় অংশ। কবির বিশ্বাসের জগৎ এখানে ধ্বনিত হয়েছে। 'সিরাজাম মুনীরা মুহাম্মদ মুস্তফা' অংশে হযরত মুহাম্মদ (সা:) -এর আবির্ভাব থেকে তাঁর প্রভাবের কাল বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। হযরতের আবির্ভাব-কাল সম্পর্কে কবি বলেছেন :

"পূর্বাচলের দিগন্ত-নীলে সে জাগে শাহানশাহের মত
তার স্বাক্ষর বাতাসের আগে ওড়ে নীলাভ্রে অনবরত।"

হযরতের আবির্ভাবের বর্ণনায় কবি বলেছেন,–

"কে আসে, কে আসে সাড়া প'ড়ে যায়,
কে আসে, কে আসে নতুন সাড়া!
জাগে সুষুপ্ত মৃত জনপদ, জাগে শতাব্দী-ঘুমের পাড়া।"

এ কালের বর্ণনায় কবি বলছেন,–

"মনে জাগে সেই ঘনতর বিষ, বিশ্ব আরব গগনে মেঘ
অত্যাচারীর হাতে পীড়িতে সে কী দুর্ভোগ, কী উদ্বেগ!"

এ সময়ে মা আমিনার কোল জুড়ে হযরতের আবির্ভাবে বিশ্বের পৌত্তলিকতার সমাপ্তি চিহ্নিত হলো। হযরত বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে সত্য ধর্ম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর হেরা গুহার সাধনার শেষে পৃথিবীতে এলো আলোর দিন। সত্য-ধর্ম প্রতিষ্ঠার আবেগময় বর্ণনা এ অংশের প্রতিটি চরণে উদ্বেলিত ও উচ্চারিত হয়েছে। হযরতের জীবনব্যাপী সাধনার মহান উত্তরাধিকার বিশ্ব মোসলেমিনের। তাই এ অংশের শেষে কবি বলছেন,–

"তাদের সঙ্গে সালাম জানাই হে মানবতার শাহানশাহ্!
হে-নবী সালাম: সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসুলুল্লাহ।"

এর পর কবি লিখছেন 'খোলাফায়ে রাশেদীনের' কথা। "আবুবকর সিদ্দিক', 'উমর-দরাজ দিল,' 'ওসমান গণি' 'আলী হায়দার' শীর্ষক চারটি অসামান্য কবিতায় খোলাফায়ে রাশেদীনের বর্ণনার পর এ কাব্যে কবি লিখছেন অন্যান্য ইসলাম প্রসঙ্গ। এখানে আছে 'শহীদে কারবালা' 'মন' 'আজ সংগ্রাম' 'এই সংগ্রাম', 'প্রেম-পন্থী', 'অশ্রু বিন্দু', 'গাওসুল আজম', 'সুলতানুল হিন্দ', 'খাজা নক্‌শ-বন্দ', 'মুজাদ্দিদ আলফে সানী', 'মৃত্যু সংকট', 'অভিযাত্রিকের প্রার্থনা', 'মুক্তধারা' শীর্ষক খণ্ড কবিতার

সংগ্রহ ও 'ইশারা' শীর্ষক দীর্ঘ কবিতা। এ কবিতাগুলোর মধ্যে ইসলামী জীবন সাধনায় সাধকের সিদ্ধি লাভের বর্ণনা করেছেন কবি। খোলাফায়ে রাশেদীনের কবিতাগুলোতে কবি তাঁদেরকে দেখেছেন প্রেরণার উৎস হিসেবে।

**১. আবুবকর সিদ্দিক :**

"হে ধ্যানী, তোমার মন বুস্তান, গুলশান ঘ্রাণাকুল
গান ভুলে যেয়ে সে নীরবতার ধ্যান করে বুলবুল।
পরম সত্য বেদনা–বিদ্ধ তার বুকে ওঠে দূর যাত্রীর স্বর
স্তব্ধ নিথর কোটি তারা ভরা গভীর নিশীথে মরু রাত্রির স্বর:
আল্লাহু আকবর
আল্লাহু আকবর।"

**২. উমর-দারাজ দিল :**

"মহাজীবনের বিকশিত ফুল নিয়ে সকলের আগে
তার কাফেলার বাঁশি বেজে চলে দুর্বার অনুরাগে,
কী বিচিত্র জৌলসে রাঙে নিথর রাত্রিতল,
জমাট পাথর জুলমাত ছিঁড়ে জাগে শিখা প্রোজ্জ্বল।
নতুন পথের মোবারক-বাদে আগ্নেয় বোররাক
সাত সাহারার সাইমুমে শোনে খোর্মাবীথির ডাক,
লাখো সেতারার মাঝে সে উজালা প্রদীপ্ত রোশ্‌নিতে;
উমর স্মৃতির আতশী বেদনা মখলুকাতের ভিতে।"

**৩. ওসমান গনি :**

"কতকাল
ধূলির দরিয়া মাঝে অগণ্য যাত্রীরা হ'ল ধূলি
(আমরা ধূলির কীট, মোদের শিয়রে সেই
কালস্রোত তুলেছে অঙ্গলি)
শুধু সেই মৃত্যু স্রোতে প্রবাল মিনারে দ্বীপ ঘোষে তার জয়
মানুষের ব্যূহ মাঝে ওঠে তার কথা:
সে পেয়েছে পরম পূর্ণতা;
দীপ্তবিভা সত্যের অশনি
ওসমান! ওসমান গনি!!"

**৪. আলী হায়দার :**

"আজ নির্ভীক মজলুম ওঠে মদিনা মিনার বেয়ে
খুন খোশরোজ পারে মওসুমী শিখা ফেলে মাটি ছেয়ে!
আট কেল্লার রুদ্ধ প্রাকার আজিকে হয়েছে গুঁড়া,
কুলমখ্‌লুক হতে দেখা যায় আল হেলালের চূড়া,
তার তক্‌বির শোনা যায়, পিছে ওঠে জনতার স্বর:

আলী হায়দর! আলী হায়দার! আসে আলী হায়দার-।"

'খোলাফায়ে রাশেদীনের' এ চারটি প্রেরণাদায়ক বর্ণনার পর কবি ইসলামের পরবর্তী কালের প্রসঙ্গ উত্থাপন করছেন। প্রথমে 'শহীদে কারবালা'র প্রসঙ্গ কবি বর্ণনা করেছেন। সীমারের হাতে হোসেনের শাহাদাতের পর কবি লিখেছেন :

"তীব্র ব্যথায় ঢেকে ফেলে মুখ দিনের সূর্য অস্তাচলে,
ডোবে ইসলাম-রবি এজিদের আঘাতে অতল তিমির তলে,
কলিজা কাঁপায়ে কারবালা মাঠে ওঠে ক্রন্দন লোহু সফেন
ওঠে আসমান জমিনে মাতম; কাঁদে মানবতা : হায় হোসেন।।"

মানবতার এই ক্রন্দন রোল শাশ্বত জীবনস্পর্শী। এর পরবর্তী 'মন' শীর্ষক কবিতায় কবি লিখেছেন,- "বন্দীর স্বপ্নের মত বাঁধমুক্ত মন;-মোর মন।"

কবির মনের এ বাঁধমুক্ত অবস্থা কবি আজীবন লালন করে গেছেন। 'আজ সংগ্রাম' কবিতায় কবি লিখেছেন,-

"তাই সংগ্রাম নিজের সঙ্গে নিজেকে চেনার সময় আজ
মাটির আকাশে, মনের আকাশে শোন এক সাথে গর্জে বাজ।"

পরবর্তী 'এই সংগ্রাম' কবিতায় কবি বলছেন,-

"যদিও শ্বাপদ তোলে বিষাক্ত ফেণা,
যদিও এখানে অসহ্য হ'ল হীনতার যন্ত্রণা,
তবু বহু দূরে ডাক দিল আজ হেরার শিখরচূড়া
: ডেরার কপাট খোলো আজ বন্ধুরা,
পাশবিকতার ললাটে তীক্ষ্ণ তীর উদ্যত করো
এই সংগ্রাম ... জেহাদে বৃহত্তর ...
প্রগাঢ় রক্ত পাপড়ি খোলার মত
একটি নিমেষ দাও মোরে অন্তত।।"

সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে যাওয়ার বন্ধনহীন স্বপ্ন দেখেছেন কবি। 'প্রেমপন্থী' শীর্ষক সনেটে শেষ দুই পঙ্ক্তিতে কবি বলছেন,-

মেটাতে পারেনি প্রজ্ঞা কোন দিন সে প্রাণ পিপাসা!
সৃষ্টির প্রথম কথা – শুধু প্রেম শুধু ভালবাসা।।"

জীবনবাদী এ ইতিহাচকতা কবি ফররুখ আহমদের বিশিষ্ট চিন্তা ও চেতনা। 'অশ্রু বিন্দু' কবিতায় কবি বলছেন,-

"যে কথা পায় না মুক্তি সমগ্র আকাশে, জলে, স্থলে,
যে কথার অন্তর্জ্বালা অন্তহীন ব্যথা-তিক্ত-দাহে
নিয়ত জ্বলিয়া ওঠে অবরুদ্ধ চিত্তের পল্বলে;
সে কথা পূর্ণতা পায় একটি নিটোল অশ্রুজলে।।"

উপলব্ধির মুক্তি এই পূর্ণতার তাৎপর্য বহন করে। 'গওসুল আজম' সনেটে ষঠকে কবি বলছেন,-

"তিমির পন্থার দেশে, প্রবৃত্তি বিজিত মৃত দেশে
এনে দাও সুপ্রবল প্রাণবহ্নি জীলান সূর্যের,
সত্যের আলোক শিখা এ মৃত কলুষ রাত্রি শেষে
আবার জাগায়ে যাও; দেখে যাও সব আকাশে
সব সমুদ্রের তরে পূর্ণতার অন্তহীন পথ;
প্রতিধূলি কণিকায় পূর্ণতার প্রচ্ছন্ন পর্বত।"

এ ভাবে কবি জীবনের পূর্ণতার অন্তহীন পথ সন্ধান করছেন। ধূলিকণা দেখছেন পর্বত সম্ভাবনায়। "সুলতানুল হিন্দ" সনেটে ষঠকে কবি বলছেন,–

"নয়া জিন্দিগীর স্বপ্নে আনিলে নুতন সূর্যোদয়!
সেই থেকে তুমি আছ হিন্দের একক সুলতান!
কোন সম্রাটের ধ্বজা দেখেনি এ জীবন অক্ষয়,
কোন প্রেমিকের বহ্নি জ্বলেনি এমন অনির্বাণ!
প্রেমের জোয়ারে নিত্য করিয়া অযুত হৃদি জয়,
তুমি আছো একচ্ছত্র প্রেমিক চিত্তের সুলতান।।"

মুসলিম গৌরব হিসেবে অবলোকন করলেও সম্রাটের প্রেমিক-চিত্তের শিল্পী-সত্তাকে কবি সবার উপর স্থান দিয়েছেন। কবি ফররুখ আহমদের কবি-সত্তাও এভাবেই যেন তাঁর সমস্ত বিশ্বাসের বাস্তব জগতকে অতিক্রম করে অনির্বচনীয় সৌন্দর্যলোকের সন্ধানেই সার্থক হয়ে উঠেছে। এখানেই কবির বিজয়। 'মৃত্যু-সংকট' কবিতার ষঠকে কবি বলছেন,–

"আঁধারে ঢাকিবে সূর্য? ঝড় হবে তৃণের সম্মুখে
রুদ্ধশ্বাস; হতমান? এ অথর্ব রাত্রি সংশয়
স্থির জড়পিণ্ড হয়ে ঠাঁই নেবে প্রান্তরের বুকে?
জীবন্ত নদীর ধারা ভুলিবে কি তার পরিচয়,
যে নদী মানেনি বাধা নমরুদের পাষাণ প্রাচীরে:
ফেরাউন ডুবে ম'ল যে নদীর খরস্রোতা নীরে।

মানুষের জীবনে এ কবির প্রগাঢ় বিশ্বাস। সূর্য এক নদীর প্রবাহের মতো জীবন নিরন্তর বিজয়কেই তার পরিচয় বলে জানে। 'অভিযাত্রিকের প্রার্থনা" কবিতায় কবি প্রজ্ঞাবান সাধকের ভঙ্গিতে বলছেন,–

"জ্বালাও আগ্নেয় স্পর্শ বহ্নিশিখা শিরায় শিরায় ...
আমার উধাও গতি মানেনা পাহাড়, নদী, বন!
আমার দুরন্ত অশ্ব ঝাঁপ দিয়ে পড়ে দরিয়ায়
ছড়াব তোমার দীপ্তি আর কোন প্রান্তর ছায়ায়?
কোন মাঠ কোন বন শুনেনি এ সমুদ্র স্বনন
সময়ের খরস্রোতে জীবন্ত যে দীপ্ত মহিমায়।"

সত্যপথের এ প্রদীপ্ত অভিযাত্রায় কবির অনিঃশেষ যাত্রা। 'মুক্তধারা' কবিতায় কবি মুসা-ঈসার পথ ধরে যে অনন্ত সত্যের অভিযাত্রা চলেছে তার উল্লেখ করে বলছেন–

"মুসার পূর্ণতা তার পথ প্রান্তে, – ঈসার নিঃসীম
ধ্যানমূর্তি! দেখেছে সে জিজ্ঞাসার বেলা
খিজিরের দৃষ্টি দিয়ে; পথে যার নবী ইব্রাহিম
জ্বেলেছে তৌহিদ শিখা! সে নিঃসঙ্গ সম্পূর্ণ একেলা
ঈমানের পূর্ণ স্রোতে নিয়ে এল পাথেয় অসীম
–যে পাথেয় নিয়ে আজও চলিয়াছে অসংখ্য কাফেলা।"

এ কাফেলা শুধু কবির কালে নয়। পরবর্তীকালেও সমান শক্তিতে বলীয়ান ও গতিমান। গ্রন্থের শেষ কবিতা 'ইশারা' একটি দীর্ঘ কবিতা। এ কবিতায় কবি বিরান মাঠে সংবাদ-বাহকের শ্রান্ত পথ চলার উল্লেখ করে অনাবাদী জমি ফেটে চৌচির হওয়ার কথা বলছেন-

"তবুও আকাশে চাঁদের ইশারা, তারাঃ
রুদ্ধ ঝরোকা প্রান্তে ঝরছে ঝরণার শিশির ধারা!
তোমার মৃত্যু-সমুদ্র মোহনায়
জীবনের আস্বাদ,
তোমার জীবন-রমজান সাধনায়,
স্বপ্ন ঈদের চাঁদ।
তোমার চৈত্র-ফাটল-দীর্ণ রেখায়িত প্রান্তর
ইশারা করছে সেখানে আকাশে জমেছে মেঘের স্তর।
বিস্মরণের অতল গভীর কূপে কি গেছে সে সাড়া?
পেয়েছে কি সেথা চাঁদের ইশারা কক্ষচ্যুত তারা?
মৃত্তিকা তনু চেরাগে কি জাগে শিখা?
ছিঁড়ছে কি ম্লান আড়াল-কুজ্‌ঝটিকা?
সাড়া পেলে তার? সে আসে প্রবল গতিমান যাযাবর
আরবী তাজীর পিঠে যে বেঁধেছে পথ চ'লবার ঘর।"

এ গতিমান যাযাবর রূপে কবি ইসলামের অভিযাত্রিকের নিশ্চিত যাত্রাপথকে কল্পনা করেছেন। এ গ্রন্থে কবিকে ইসলামিক চিন্তায় গভীর নিবিষ্ট-চিত্ত দেখা যায়। তাঁর কবি-সত্তার শৈল্পিক প্রকাশ এ ভাবেই এ গ্রন্থে সার্থকতা লাভ করেছে।

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ৭ম সংখ্যা, জুন, ২০০৩]

## বিষয় ও ছন্দ-সমীক্ষায় হাতেম তা'য়ী

ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

"হাতেম তা'য়ী" সম্ভবত কবি ফররুখ আহমদের কাব্যাদর্শের শ্রেষ্ঠ ফসল। ৩২৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থটি বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। একটি আদর্শ জীবনের কল্পনা এবং পূর্ণ ইসলামী মূল্যবোধের জাগরণের স্বপ্ন এই কাব্য রচনার প্রেরণা-মূল। প্রকৃতপক্ষে এই প্রেরণা-মূল থেকে ফররুখ আহমদের সকল কাব্যপ্রয়াসের উন্মীলন। "সাত সাগরের মাঝি" ও "সিরাজাম মুনীরা" কাব্যগ্রন্থদ্বয়, সনেট সংকলন "মুহূর্তের কবিতা" এবং কাব্যনাট্য "নোফেল ও হাতেম" ও "হাতেম তা'য়ী" প্রকাশের পর ফররুখ আহমদ সম্পর্কে স্থিত চিন্তার সময় ঘটছে বলে মনে হয়।

স্মরণীয় যে, ফররুখ আহমদের কবি-প্রতিভার উন্মেষ ঘটে নজরুলোত্তর আধুনিক কবিকুলের সমকালে। কিন্তু একানিষ্ঠভাবে তিনি ঐ আধুনিক কাব্যান্দোলনের মধ্যে বসেও ঐকতানে সুর না মিশিয়ে, আপন স্বতন্ত্র কবিকণ্ঠ ও চারিত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও তিনি আপন, কাব্যাদর্শে অবিচল থেকেছেন। এবং এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, জসীমউদ্‌দীনের পর কবি-খ্যাতি অর্জনে বাঙালী মুসলমান কবিদের মধ্যে ফররুখ আহমদকে এখনও কেউ অতিক্রম করতে সমর্থ হননি। এর একটা কারণ সম্ভবত এই যে, ফররুখ আহমদের কাছে তাঁর আপন কাব্যাদর্শ প্রায় 'মিশনারী জীলের' সমার্থক। সাম্প্রতিককালে কোন কবির আপন কাব্যাদর্শের কাছে এতটা বিশ্বস্ততা খুব বেশি চোখে পড়ে না। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক কাব্যাদর্শ প্রতিনিয়ত পরিবর্তমান, অস্থির, চঞ্চল ও নব নবোন্মেষশালিনী। কিন্তু অচঞ্চল কাব্যাদর্শও যে কতটা ফলপ্রদ হতে পারে ফররুখ আহমদ তার বিরল দৃষ্টান্ত।

'পাকিস্তান আন্দোলন'-এর কবি বলেই যে ফররুখ আহমদকে পুরোপুরি চেনা যায় তা মনে হয় না। অবশ্য 'পাকিস্তান আন্দোলন' তাঁর কাব্যপ্রেরণার এক শক্তিকেন্দ্র বটে। তবু, তিনি রাজনীতিক নন, হয়ত ধর্মপ্রবুদ্ধ; তবে তিনি কবি। এবং এক সময় পাকিস্তান আন্দোলনের রাজনৈতিক তাৎপর্য ও ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধ আবেদন তাঁকে কাব্যধ্যানে উদ্বুদ্ধ করে। শেষোক্তটিই মুখ্য; ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধ আবেদন। ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানাদি নয়, অন্তগূঢ় শক্তিকে তিনি স্পর্শ করতে চান। একে তিনি 'মানবতা' বলে চিহ্নিত করতে ইচ্ছুক। অর্থাৎ, যে উদার মানবিক আবেদন নিয়ে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব হয়েছিল তার স্বপ্নধ্যান ফররুখ আহমদকে কাব্যপ্রেরণা দেয়। পাকিস্তান আন্দোলন তাই ফররুখ আহমদের কাছে রাজনৈতিক বিষয় যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি ছিল ইসলামী মানবতার আদর্শ বাস্তবে রূপায়ণের

পরিবেশ সৃষ্টির সম্ভাবনার উজ্জ্বল স্বপ্ন। রাজনীতিক নন বলেই যে কোন নতুন রাষ্ট্র আজ যে সমস্ত জটিল ও দ্রুত পরিবর্তমান সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বিচিত্রবিধ বহির্বিশ্বের প্রতাপের ও প্রচারের সম্মুখীন হয়-তা তাঁর চিন্তার পটে ধরা পড়ে না। এবং তিনি সহজেই আপন বিশ্বাসের জগতে অটল থাকেন। আর ইসলামী মানবতার আদর্শ সন্ধানে প্রতি মুহূর্তে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

এমনকি, যদি তার সন্ধানে তিনি ইসলাম-পূর্বকালে উপনীত হন তবুও তিনি অবিচল থাকেন, সমভাবেই আকৃষ্ট হন এবং সেই ইসলাম-পূর্বযুগের বিষয়ের উপর আপন বিশ্বাসের অঞ্জন অনায়াসে প্রযুক্ত করেন। "হাতেম তা'য়ী" তার প্রমাণ। "হাতেম তা'য়ী" ইসলামপূর্ব যুগের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক চরিত্র। পুঁথি সাহিত্যের মুসলমান কবির হাতে এ চরিত্র বাংলা কাব্যের অন্তর্গত হয়েছে। কবি ফররুখ আহমদ সে পুঁথিপাঠে ঐ চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। "হাতেম তা'য়ী"র মানবতা তাঁকে মুগ্ধ করেছে এবং তার মধ্যে আপন মনের রং মিশিয়ে তিনি আদর্শ জীবন কল্পনা করেছেন; এবং পূর্ণ ইসলামী মূল্যবোধের কবিস্বপ্ন এই ইসলাম-পূর্বকালের চরিত্রকে অবলম্বন করে বেড়ে উঠেছে।

মিথ্যা ও সত্যের দ্বন্দ্ব এবং সত্যের বিজয় হচ্ছে "হাতেম তা'য়ী" কাব্যের উপজীব্য। কাব্যের বিভিন্ন স্থানে কবি এই দ্বন্দ্বের চিত্র এঁকেছেন, উল্লেখ করেছেন, সমাধান নির্দেশ করেছেন :

১. মিথ্যা ও সত্যের দ্বন্দ্ব তবু মনে জেগে ওঠে কেন?

২. প্রশ্ন, প্রশ্ন, প্রশ্ন, শুধু-প্রশ্নের জটিল অন্ধকারে
বিভ্রান্ত এ মন ঘোরে ছায়াচ্ছন্ন রাত্রির কিনারে
পায় না সে পথ খুঁজে, পায় না সে আলোর ইশারা,
অজ্ঞতার অন্ধকার ঝরোকায় ফোটে না সিতারা।

৩. মানুষের কিংবা মানবীর
সত্তা যদি ঘিরে রাখে শয়তানের কুহক জিঞ্জির
অসংখ্য সওয়ালে তার মরে মূর্খ অন্ধকার স্রোতে।
কিন্তু যে পেয়েছে পথ সত্য আর জ্ঞানের আলোতে
খোদার রহমত যাকে আছে ঘিরে-দেয় সে উত্তর
সাচ্চা দিল; - যার হাতে মরে ইবলিসের অনুচর।

৪. তখনি সে পেল সত্য, বিশ্বাসের
শিখা অনির্বাণ, - নেভে নি যা নমরুদের ভ্রুকটিতে,
থামে নি যা লেলিহান আগুনের মুখে; পৃথিবীর
লক্ষ প্রলোভনে। সে সত্য-প্রত্যাশী আমি, আমি চাই
উন্মুক্ত উদার শান্তি জ্যোতিষ্মান সে সত্য আলোকে।

কেননা বঞ্চিত, ক্লান্ত, বিড়ম্বিত, বিক্ষত জীবনে
দেখেছি অশান্তি যত বেড়ে ওঠে অসত্যের মূলে;
বেড়ে ওঠে বিষবৃক্ষ সামান্য মিথ্যার রক্তবীজে।

৫. এই আমীরানা ঠাঁট হ'তে পারে লোভনীয়, তবু
অন্তরের দীনতা সে ঢাকে না কখনো। শুধু জানি
সত্যের কণিকা তাকে তুলে নিতে পারে উর্ধ্বস্তরে;
মুছে দিতে পারে তার ম্লানিমা সে আলোর প্রচ্ছদে।

৬. শান্তির নির্মল দীপ জ্বলে শুধু সত্যের আলোকে
কঠিন শ্রমের পথে; যৌবনের আপ্রাণ প্রয়াসে।

৭. তুমি যে 'পথের পথী' সত্যান্বেষী। সে পথ আমারও!
সত্যের নিগূঢ় তত্ত্ব, খুঁজি আমি জ্ঞানের মঞ্জিল;
কিন্তু অসত্যের বাধা দেখি পথে জেগে ওঠে আরও;
হৃদয়ের দুই প্রান্তে চলে শুধু মিথ্যার মিছিল।

৮. কিন্তু যে মহান কর্মী চলে ঈমানের দীপ্তি নিয়ে,
যার প্রেমে, মহব্বতে প্রাণ পায় বঞ্চিত জীবন
পায় সে সাফল্য খুঁজে।

৯. অসত্যের-
অশান্তির মূল যেন উৎপাটিত হয় পৃথিবীতে।

অসত্যের বিপক্ষে সত্যের অবশ্যম্ভাবী বিজয়ের কথা কবি পৌনঃপুনিকভাবে বলেছেন। পাপ-পুণ্যের চিত্রও তিনি এঁকেছেন স্পষ্ট রেখায় (দুসরা সওয়ালের অন্তর্গত 'খরজমের গোরস্তানে' দ্রষ্টব্য), লোভ, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি মানবীয় ত্রুটিকে তিরস্কার করেছেন তীব্রভাবে। তাঁর বিশ্বাসের জগতে নূররেজ ফুলের স্পর্শে অন্ধত্ব ঘোচে, খোদার নামের কুদরতে অসম্ভব সম্ভব হয়। কাহিনী-বর্ণনার প্রতিটি পর্যায়ে এ বিষয়ে কবিকণ্ঠ সোচ্চার। কখনো কখনো তা ভাষণের মত শোনায়; -এ সব অংশে কবির মনোভঙ্গি স্বচ্ছভাবে ধরা পড়ে ঃ

১. দেখিল সে-লালসার অন্ধকারে মোহাচ্ছন্ন প্রাণ
পৃথিবী, মানুষ ভুলে নেমে গেল বিহ্বল অজ্ঞান।

২. বলিল হাতেম তায়ী- "যদি তারা বিকৃত স্বরূপ
দেখে নিত কোনদিন আত্মার দর্পণে, যদি তারা
দেখে নিত প্রবৃত্তির পাশবতা, -যা রেখেছে ঘিরে
বিকৃত কদর্য সত্তা পশুত্বের কাছে; তবে তারা
মরে যেত সে মুহূর্তে আতঙ্কিত, বিকৃত স্বরূপে,
কিম্বা বান্দা গোনাহগার ক্ষমা চেয়ে দরবারে আল্লার

ফিরে যেত ইনসানের মহান স্বরূপে।"

৩. আছে যার মর্দমী-এমন
আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি মুহব্বত আছে যার দিলে
মানে না সে কোনদিন জালিমের জুলুম নিখিলে।

৪. পড়ে আছে অন্তহীন অন্ধকারে
শাসনে, শোষণে আর অন্যায়ের জগদ্দল চাপে
বিকলাঙ্গ মানুষের পৃথিবী বিশাল।

মজলুমের প্রতি, প্রবঞ্চিতের, কবির দরদ স্বতঃস্ফূর্ত। এ প্রসঙ্গেও তিনি স্পষ্ট ও সোচ্চার। কবি দেখেছেন :

আল্লাহর রহমত, রেজা ঘিরে আছে একভাবে এই
দুনিয়া জাহান। মুক্ত আলো বায়ু নামে একভাবে
জনপদে, এক স্নেহচ্ছায়া ঘিরে আছে এ পৃথিবী
-আল্লার সংসার। তবু কেন এ বিভেদ? ইবলিসের
কি দুরাশা ধ্বংস করে মানুষের ঘর? কেড়ে নেয়
শিশুর মুখের হাসি, মুছে ফেলে শক্তি তরুণের,
স্তব্ধ করে বলদর্পী কি আশায় জ্ঞানীর জবান?

মানুষের স্বার্থপরতা মানুষে মানুষে বিভেদের উৎস। সভ্যতা-গর্বিত মন শাসন-শোষণের চক্রান্তজালের দূর বিস্তার অনুভব করে :

রক্ত-শোষণের পালা চলে নি কি অব্যাহত আজও
এই পৃথিবীতে? সভ্যতা-গর্বিত মন জনপদে
দেখে না কি রাত্রিদিন সংখ্যাহীন যন্ত্র শোষণের,
ষড়যন্ত্র জাল শোষকের? দেখে না কি চারপাশে
অনাহার-ক্লিষ্ট প্রাণ ভারগ্রস্ত মরে?

এর সমাধানের ভঙ্গি কবির কাছে অস্পষ্ট নয়ঃ

বনি আদমের প্রাপ্য দাও তাকে ফিরায়ে আবার,
দাও ইনসানের হক। যে দৌলত আছে সঙ্গোপনে,
পাবে যা সামান্য শ্রমে; মনে রেখ একমাত্র তুমি
তার অধিকারী নও। দিল যারা স্বেদ ও শোণিত,
যাদের রক্তের মূল্যে বেবাহা দৌলত, সম্পদের
অধিকারী তারা, তারাই ঐশ্বর্য পাবে, -জিন্দেগীতে
পেল যারা ক্রমাগত বঞ্চনা; অথচ শ্রমশীল
প্রবঞ্চিত সেই সব বান্দা এলাহির।

এ কাব্যের কাহিনী হচ্ছে: হুসনাবানুর হতাশ প্রেমিক মুনীর শামীর প্রতি করুণাপরবশ হাতেম তা'য়ী কর্তৃক হুসনার সাত সওয়ালের জবাবের সন্ধানে, সাত বার বিপদ শঙ্কুল সফর। হাতেমের বিপদবরণের কারণ প্রেমিক-হৃদয়ের মূল্যায়ন :

মনে হল হাতেমের মত
লক্ষ প্রাণবিনিময়ে যদি বাঁচে আশিক হৃদয়
তবু তার আছে সার্থকতা।

প্রকৃতপক্ষে এ কাব্যে হাতেমই একমাত্র সক্রিয় চরিত্র। হুসনা বানু কেবল প্রশ্নকারিণী আর মুনীর শামী হতাশ প্রেমিক। হুসনা বানুর প্রশ্নের পেছনে তার জ্ঞানস্পৃহার কথা কবি উল্লেখ করেছেন এবং সকল প্রশ্নের উত্তর পেয়ে তার জ্ঞানস্পৃহার নিবৃত্তি হয়, এ কথা বলা হয়েছে। কিন্তু হুসনাবানু চরিত্রের প্রশ্নময়-প্রাণহীনতার মুক্তির কোন প্রচেষ্টা কবি করেন নি। হুসনাবানু যেন গল্প শুনতে ভালবাসে; "হাতেম তা'য়ী"র বর্ণনা তাই কখনো সে যাচাই করে না। কেবল ষষ্ঠ সওয়ালের সূচনায় পঞ্চম সওয়ালের শেষের সফর কাহিনী সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে এবং ফলে পঞ্চম সওয়ালের শেষের সফর কাহিনী ষষ্ঠ সওয়ালের সূচনায় পুনরাবৃত্ত হয়েছে। পুনরাবৃত্তি একটু দীর্ঘ। মুনীরের জন্যে হুসনাবানুর ব্যাকুলতা খুবই ক্ষণিক মনে হয়, কেননা কাব্যের শেষে তাকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হয়েছে। হতাশপ্রেমিক মুনীর শামীর চরিত্র প্রায় ক্লীবত্বের স্পর্শযুক্ত। সে প্রেম-ব্যাকুলও বটে, কিন্তু তার জন্যে সাধনা-বিমুখ। সে জানে :

প্রশ্নের পথ জটিল ভয়ংকর
পাবে পায়ে পায়ে হতাশার দেখা; মৃত্যুর স্বাক্ষর।

কিন্তু সে পথে চলতে তাকে আদৌ আগ্রহী দেখা গেল না। নিজে সে অক্ষম এবং হাতেমের উপকার হাত পেতে নিতে লজ্জিত নয়। হাতেম তাকে বলে :

জীবনে মৃত্যু আসবেই একদিন,
পাব একদিন মওতের দেখা জিন্দেগানির পথে।
আশিক মুনীর ! কেন হও বে-চঙ্গন
কবে মর্দমী হারায়েছে পথ দুরারোহ পর্বতে;
মৃত্যুর ভয়ে যাত্রী থেমেছে কবে?
জানি না যা আমি দুনিয়া জাহানে-তাকে জানতেই হবে।

কিন্তু এতে মুনীরের পৌরুষ জেগে উঠবার মত আগুন জ্বলে না। হাতেম পরোপকারে উৎসর্গিত প্রাণ, সত্যসন্ধানী, অসত্যের বিরুদ্ধে সর্বদা জেহাদে উদ্যত উদার হৃদয়, মহৎ, অতিমানুষ। হাতেমের প্রশংসা এই সমস্ত কাব্য জুড়েই আছে। যেমন:

১. দুনিয়া জাহানে জাহের তোমার মর্দমী।

২. প্রবৃত্তির পাশবতা অনায়াসে যে করেছে জয়
তার কাছে ধরা দেয় চেনা কিংবা সম্পূর্ণ অজানা।

কবি হাতেমের সাহস বীরত্ব যুদ্ধ প্রভৃতিরও বর্ণনা দিয়েছেন। বাঘকে নিজের গোশত কেটে দিয়ে তার গ্রাস থেকে হরিণের প্রাণ রক্ষা করতে কিংবা মৃতপ্রায় জন্তুকে রক্তদান করতে হাতেমকে প্রস্তুত দেখা গেছে। রাক্ষসের অত্যাচার, জ্বিনের জুলুম, হালাকু জানোয়ারের গ্রাস প্রভৃতি থেকে বিপদগ্রস্ত মানুষ ও জনপদকে রক্ষা করতে হাতেম সদা ব্যগ্র। এবং এই মহত্ত্বের প্রভাময় হাতেম সর্বদাই অসাধারণ, অতি মানবিক; মানবীয় স্খলন-পতন ত্রুটির উর্ধ্বে একটি একমাত্রিক চরিত্র এবং সমগ্র কাব্যে এই একমাত্রিকতা যেন বিশেষ নিষ্ঠার সংগে চিত্রিত করা হয়েছে। সত্য ও অসত্যের দ্বন্দ্ব ও সত্যের জয়ের মত বিষয়কে কাব্যের উপজীব্য করা থেকে শুরু করে হাতেম, হুসনা বানু, মুনীর শামী প্রভৃতি চরিত্রের একমাত্রিকতা চিত্রণে কবি নির্দ্বন্দ্ব। এবং কবির বিশ্বাসের জগতের নির্দ্বন্দ্ব স্বরূপেরই তা পরিচায়ক। কাব্যের অন্যান্য চরিত্র সাপ, জ্বিন প্রভৃতি হচ্ছে শয়তানের অনুচর এবং বলা বাহুল্য একমাত্রিক।

পুঁথির কাহিনী অনুসরণের ফলে সে কাহিনীর রূপকথার জগৎও কবি অবলীলায় চিত্রিত করেছেন; যেমন, পানির নীচে ময়দান বা জাদু তালাব প্রভৃতি।

"হাতেম তা'য়ী"র সফরকে কবি প্রতীক হিসেবে দেখেছেন, বস্তুত কবির কল্পনায় সফর হচ্ছে সত্যসন্ধানের একমাত্র পথ, প্রতীকও বটে। সাত সওয়ালের শেষে তাই হাতেম তা'য়ীর উক্তি :

যা জেনেছি, যা দেখেছি আমি
পিপাসা মেটে নি তাতে তৃষিত প্রাণের, র'য়ে গেছে
এখনো অনেক বাকি, -পূর্ণ জ্ঞান আমি পেতে চাই;
জীবনের অভিজ্ঞতা চাই শুধু খিদমত সৃষ্টির।

অন্যত্র হাতেম তায়ী বলে :

জানার সওয়াল নিয়ে চলি আমি আলমে আল্লাহর,
সব জেনে যেতে চাই, -যা কিছু রয়েছে সংগোপন
বিশ্ব রহস্যের মূলে।

হাতেম চরিত্র কল্পনায় যে একমাত্রিকতা আছে চরিত্রের মহত্ত্ব তাকে অতিক্রম করে যাবে-কবি সম্ভবত একথা ভেবেছেন, কখনো তা ঘটেছে বটে; কিন্তু সঙ্গত কারণেই অনেক সময়ই একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, পুনরাবর্তন ঘটেছে একই ভঙ্গিতে।

ফররুখ আহমদের "হাতেম তা'য়ী" "মেঘনাদ বধ কাব্য" এর মত অষ্টাধিক সর্গে রচিত ('সর্গ' এই নামটি অবশ্য ব্যবহৃত হয় নি)। এতে মানুষ, পরী, জ্বিনের কথা আছে, পাতাল ও মর্ত্যে এর কাহিনী প্রসৃত, নায়ক-চরিত্রে নানা সমাহার বর্তমান

এবং পাকিস্তান আন্দোলনের প্রেরণাসার এ কাব্য-রচনার প্রেরণা-মূলে। এতে অবশ্য "মেঘনাদ বধ কাব্য", "প্যারাডাইস লস্ট", "ইলিয়াড" বা "ওডেসি"র মত চরিত্রের জটিলতা, ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ, ট্রাজেডির তীব্রতা, মানব জীবনের বিচিত্রমুখী সম্ভাবনার ইংগিত, কি দুর্লঙঘ্য নিয়তির প্রভাব লক্ষ্যগোচর হয় না। এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অনুসরণে বলা যায় : সভ্যতার অগ্রগতির সংগে সংগে মহাকাব্যের বিলোপ হয়। অর্থাৎ কাব্যের ফর্ম হিসেবে মহাকাব্যের প্রয়োজন ভূমিকা নিঃশেষিত হয়। সাম্প্রতিক কালে তাই মহাকাব্যের চাইতে উৎকৃষ্ট কাব্যের প্রয়োজন বেশী। আমার তাই মনে হয়, "হাতেম তায়ী'তে যেসব উৎকৃষ্ট কাব্যাংশ আছে তার মূল্যই সমধিক।

এ কাব্যের উৎকৃষ্ট চরণসমূহে কবির মর্ত্যপ্রীতি বাঙময়, যেমন-

দেখেছি সৌন্দর্য যত ... ... ফুল, পাখী, অরণ্য, প্রান্তর,
শিশির, সমুদ্র, নদী দেখি স্বপ্নালোকে। দেখি আমি
উজ্জ্বল আলোর ঝর্ণা, -যা দেখেছি প্রথম ভোরে
সফেদ রোশ্‌নিতে, আর যা দেখেছি সূর্যাস্তের তীরে
উজ্জ্বল আগুন রঙ, পাটল অথবা আরক্তিম
সন্ধ্যার মেঘের অন্তরালে, জরিন জরির আভা
দেখেছি যা বে-নেকাব পূর্ণিমার প্রথম প্রকাশে
প্রদীপ্ত, রূপালি স্রোতে দেখেছি যা জ্যোৎস্না-ঝরা মাঠে
নিস্তব্ধ, নিথর রাত্রে বাধহীন অকুণ্ঠ যেমন
বন্যাধারা, তারুণ্যের কলহাস্যে যে আলো উছল,
অশেষ ইঙ্গিতময় আঁখি প্রান্তে দেখেছি প্রিয়ার
যে আলো চকিতে, ঘুমন্ত দেখি তা আমি স্বপ্নঘোরে
আশ্চর্য সজীব আর পরিপূর্ণ মাধুর্যে প্রাণের!

"হাতেম তা'য়ী" কাব্যে কবি অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, ও স্বরবৃত্ত-তিন রকমের ছন্দই ব্যবহার করেছেন। তবে অক্ষরবৃত্তের ব্যবহারই প্রধান। সমিল ও অমিল প্রবহমান এবং সনেটে তিনি সাধারণত সফলভাবে আঠারো মাত্রায় অক্ষরবৃত্ত প্রয়োগ করেছেন। ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্তেও ফররুখ আহমদ খুবই স্বচ্ছন্দ। স্বরবৃত্তের ব্যবহারে কিছু মাত্রার হেরফের লক্ষ্য করা গেল। ১৪১-৪২ পৃষ্ঠায়, মালেকা জরিন পোশের কিস্‌সা!! এক।। -এ পূর্ণ পর্বগুলোতে মাত্রা সংখ্যা চার। নিম্নরেখ অংশে পূর্ণ পর্বে পাঁচ পর্বে পাঁচ মাত্রাও ব্যবহার করা হয়েছে ঃ

| | | |
|---|---|---|
| কখনো তারার। | আলোয় চলে | ৫।৪ |
| কখনো চলে। | দীপ্ত দিনে, | ৫।৪ |
| রাত্রি শেষের। | পথ চলা তার | ৪।৪ |
| হয় যে ভোরের। | রোশ্‌নি চিনে | ৪।৪ |

| | | |
|---|---|---|
| কখনো চলে। | বিরান দেশে | ৫। ৪ |
| শূন্য যে পথ। | প্রাণ জোয়ারে | ৪। ৩ |
| কখনো চলে। | মড়কে | ৫। ৪ |
| উচ্ছ্বসিত। | সড়কে | ৪। ৩ |

"হাতেম তা'য়ী" এ প্রথম সংস্করণের ১৪৮ পৃষ্ঠায় ৪। ৪ । ৪। ৩ চালে প্রতি দু'চরণে স্বরবৃত্তে মাত্রা গণনা করা হয়েছে। কিন্তু ঐ পৃষ্ঠায় কয়েকটি পূর্ণ পর্বে- যেমন- প্রথম চরণে 'সেহেলি আসে', এগারো চরণে 'এগিয়ে গেল,' উনিশ চরণে 'তলিয়ে গেল'; একুশ চরণে 'তাকিয়ে দেখে' এবং তেইশ চরণে 'দাঁড়িয়ে আছে' স্বাভাবিক উচ্চারণে পাঁচ মাত্রা দাঁড়ায়। ১৪৯ পৃষ্ঠায়ও একই চালের, অর্থাৎ প্রতি দু'লাইনে ৪। ৪ । ৪। ৩, মাত্রা ব্যবহৃত হয়েছে এবং ঐ পৃষ্ঠায় তৃতীয় স্তবকের দ্বিতীয় চতুর্থ চরণে অপূর্ণ পর্বে দু'মাত্রা করে ধরা হয়েছে (বন্দর, অন্তর), এতে করে স্বাভাবিক গতির মধ্যে হঠাৎ ধাক্কা লাগে। ২৩০-৩৫ পৃষ্ঠায় 'পাখীর আলাপ' কাব্যাংশে ৪ মাত্রার স্বরবৃত্ত ব্যবহৃত হয়েছে। এখানেও ২৩০ পৃষ্ঠার ষষ্ঠ চরণে প্রথম পর্ব 'ছড়িয়ে গেল' সপ্তম চরণে প্রথম পর্ব 'ছড়িয়ে গেল', চরণে 'সাত-রঙা-পাখা' এবং ২৩৩ বিংশ চরণে 'রয়েছে কাছে' স্বাভাবিক উচ্চারণে দ্বাদশ চরণে 'দাঁড়িয়ে আছে', চতুর্দশ চরণে' 'ছড়িয়ে লহু'; ২৩১ পৃষ্ঠায় তৃতীয় পাঁচ মাত্রা দাঁড়ায়। তবে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, 'এগিয়ে', 'তলিয়ে' 'তাকিয়ে' 'দাঁড়িয়ে', 'ছাড়িয়ে', 'ছড়িয়ে' প্রভৃতি শব্দে ইএ (ইয়ে) দ্বিস্বর ধ্বনি এবং 'রয়েছে' শব্দে ওএ (ওয়ে) দ্বিস্বর ধ্বনি আছে। দ্বিস্বর ধ্বনি বাংলা ছন্দে সাধারণত বদ্ধাক্ষর (Closed syllable) রূপে গণ্য হয় এবং তাহলে এ সব শব্দের মাত্রাসংখ্যা হয় চার। অবশ্য 'সেহেলি আসে' বা 'সাতরঙ্গা পাখা'র মাত্রা অস্বীকার করা সম্ভ নয়। পরেরটাকে 'সাত-রঙ পাখা' করে নেয়া চলতে পারে।

"হাতেম তা'য়ী" প্রধানত কথ্যভঙ্গিতে রচিত। কবি চলিত বাংলার প্রতি মুগ্ধও বটেন। এ কাব্যের উৎসর্গ-পত্র তার প্রমাণ। তবু এ কাব্যে বেশ কিছু সাধু ক্রিয়াপদ চোখে পড়ল- যেমন-, 'চলিত 'দেখিল' 'ছুড়িল' ইত্যাদি। এ কাব্যে মিল বিন্যাসে কবি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। যে-কোন একটি দৃষ্টান্তেই তার স্বরূপ বোঝা যাবেঃ

ঝিল্লীমুখর পৃথিবীর স্বর মনে বয়ে আনে নেশা
তবু জেগে থাকে চারপাশে এক মওতের আন্দেশা।

"হাতেম তা'য়ী" কবি ফররুখ আহমদের কাব্যাদর্শের শ্রেষ্ঠ ফসল এবং এ কাব্যে কবির প্রতিভা তুঙ্গতম পরিণতি লাভ করেছে। ☐

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর, ২০০০]

# ফররুখ আহ্‌মদের কাব্যনাট্য : নৌফেল ও হাতেম

ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

নাটকের কুশীলব যেহেতু সাধারণ লোকভাষী নয় সেহেতু তাদের পুনরায় কাব্যভাষী হতে আপত্তি কি? আসলে নাটকে বাণীভঙ্গির ঊর্ধ্বে ক্রিয়াময় নাট্যরসে দর্শককে মুগ্ধ করতে পারাই সফল নাটকের লক্ষণ। এবং এই শর্তাধীনে মঞ্চে কাব্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা দান কবির পক্ষেই সম্ভব। "কাব্যনাট্যের প্রাণধর্মকে বিচার করতে পারি মঞ্চোপযোগিতার দৃষ্টিকোণ থেকে, বিচার করতে পারি তার অন্তর্নিহিত সঙ্গীতছন্দের সঙ্কেতকে অনুসরণ করে; কিন্তু আমার মনে হয় তার প্রয়োজন নেই। এই সত্য প্রতিষ্ঠা করাই যথেষ্ট যে শ্রেষ্ঠ নাটকে পদ্য একটা প্রথা মাত্র নয়, কেবল বহিরঙ্গের শোভাবর্ধনকারী নয়- কবিতা নাটককে অন্তর থেকে প্রগাঢ় করে তোলে। এই প্রসঙ্গে একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে নাটকীয় কবিতা দর্শক-শ্রোতার উপর তার বিশিষ্ট প্রভাব বিস্তার করে অজ্ঞাতসারে, অবচেতন স্তরে। নাট্যদর্শকদের মধ্যে যাঁরা বিশেষভাবে কাব্যামোদী কেবল তারাই যে এই প্রভাবের সৌভাগ্য লাভ করেন, তা নয়। যাঁরা নিছক নাট্যামোদী তারাও এ রস থেকে বঞ্চিত হন না। এই শেষের দলের যাঁরা বিশেষভাবে কাব্যামোদী কেবল তারাই যে এই প্রভাবে সৌভাগ্য লাভ করেন, তা নয়। যাঁরা নিছক নাট্যামোদী তারাও এ রস থেকে বঞ্চিত হন না। এই শেষের দলের যাঁরা হয়তো ঘরে বসে সানন্দে কাব্যগ্রন্থ পাঠ করেন না তাঁরাও কাব্যনাট্য দেখতে এসে নিশ্চয়ই মঞ্চে পরিবেশিত কবিতার আবেদনে সাড়া দেন।" বলাবাহুল্য এ বক্তব্য আধুনিক কাব্যনাট্যের প্রবক্তাশ্রেষ্ঠ টি.এস. এলিয়টের। এবং ফররুখ আহ্‌মদের 'নৌফেল ও হাতেম' রচনার সপক্ষেও এই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট যুক্তি। কিন্তু 'নৌফেল ও হাতেম' ক্রিয়াময় নাটক নয়, ভাবধর্মী নাটক; এবং ভাবটিও অত্যন্ত সরল। নাটকের পটভূমি পুঁথির জগতে প্রসারিত। ফলে দূরপটে সংস্থিত ভাবময় ঘটনা রোমান্টিক কবির চিত্তে আলোড়ন আনে। এবং বিশেষ করে 'হাতেম তায়ী'র মানবতার কবি ফররুখ আহ্‌মদকে দীর্ঘকাল মুগ্ধ করে রেখেছে। তাই বাংলা দেশে কবিতার ভবিষ্যত-মুক্তি হিসেবে কাব্যনাট্যের আশ্রয় এবং পুঁথির কাহিনীকে তার বিষয় করার সম্ভাবনা বিচারযোগ্য মনে করি।

'নৌফেল ও হাতেম' কাব্যনাট্যে তিনটি অঙ্ক, এবং যথাক্রমে পাঁচ, চার ও পাঁচ সর্বমোট চৌদ্দটি দৃশ্য। য়েমেনের শাহজাদা হাতেমের খ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে আরবের নৌফেল শাহা রাজভাণ্ডার খুলে দিলেন, খাজাঞ্চী থেকে সহস্র আশরফীর থলি নিয়ে পথে পথে ঘুরতে লাগলেন; কিন্তু গুপ্তচর সংবাদ আনল, নৌফেলকে কেউ সুখ্যাতি করে না। সকলেই যেন হাতেমের প্রতি মন্ত্রমুগ্ধ। প্রথম অঙ্কের ঘটনা এই।

দ্বিতীয় অংকে নৌফেল সহিংস পথ গ্রহণ করলেন 'নেব লুটে তার শাহী তখত'। খবর পেয়ে হাতেম রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন। অবাধে যেমন ছারখার করেও হাতেমের খ্যাতি লোপ করা সম্ভব হল না। নৌফেল ঘোষণা করলেন : 'হাতেম তায়ীর শির চাই বিশ সহস্র দিনারে'। তৃতীয় অঙ্কে এক বৃদ্ধ কাঠুরিয়ার পরিবারকে দারিদ্র্য মোচনের উদ্দেশ্যে হাতেম স্বেচ্ছায় নৌফেলের দরবারে ধরা দিলেন। কিন্তু তাঁর এই মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়ে বলদর্পী নৌফেল স্বীয় কৃতকর্মের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে হাতেমের শিরে শাহী তাজ পরিয়ে দিলেন। স্পষ্টতই নাটকটি ভাবধর্মী, তাই ঘটনা নিতান্তই গৌণপদী। এবং কেন্দ্রীয় নাট্যভাবটিও অত্যন্ত সরলরৈখিক। দুটি নাম চরিত্রের একটি নিরঙ্কুশ নির্বিরোধ ভাবের মূর্তি। বস্তুত হাতেম তায়ীর মানবতাবোধই নাট্যকারের আদর্শ। এবং নাটকে নৌফেল ও তার চাটুকারবৃন্দ ছাড়া সকলেই তাঁর খ্যাতি প্রচারে উচ্চকণ্ঠ; যদিও দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কের প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চম এই চারিটি মাত্র দৃশ্যে তাঁর মঞ্চাবতরণ। ফলে মানবতাবোধের আদর্শবাহী হাতেম পাদপ্রদীপের সামনে অতিমানবিক মহত্ত্বজড়িত মহাপুরুষ মাত্র। পক্ষান্তরে ক্রোধে, তেজে, বক্তৃতায় ও কর্মে খ্যাতিলুব্ধ নৌফেলের মানবিক বিকার তাৎপর্যপূর্ণ। নৌফেল আক্রমণ করবে শুনে রাজ্যত্যাগী হাতেমের বক্তব্য :

> খ্যাতির সংঘর্ষে আমি দেখি নাই
> মর্দমী কখনো। স্বার্থান্বেষী যে হৃদয় কলুষিত
> সেই শুধু খ্যাতি চায় দুনিয়া জাহানে, রিয়াকার
> প্রতিটি কর্মের মূলে আছে যার নামের বাসনা।
> আল্লাহর বান্দাকে আমি ভালবাসি রেজামন্দি চেয়ে
> এলাহির। চাইনি কখনো আমি খ্যাতিবা সম্মানঃ
> চাইনা সংঘর্ষ তাই যশের পূজায়। (২ঃ২, পৃ. ৩৭)

অন্যদিকে নৌফেলের উক্তি :

> কি হবে রাজ্য দিয়ে? চাইনি তো হাতেমের তখত
> হাতেমের যশ আমি চেয়েছি জীবনে। পাই নাই
> দৌলত বিলায়ে ঢের। তাই আমি নিয়েছি ভূমিকা
> পৈশাচিক, নেমে যাব আরও নীচে প্রয়োজনে; আর
> বাহুর কুয়তে আমি মুছে দেব নাম দুশমনের।।
> হিংস্র আজদাহার মত এই প্রাণ তার খোঁজ চায়
> যে নিল সকল শান্তি, আরাম। রাত্রিদিন
> জ্বলি আমি যে আগুনে শেষহীন ব্যর্থতার বিষে। (২ঃ৪, পৃঃ ৩৭)

নৌফেলের দীর্ঘতম স্বগতোক্তিতে তার চিত্তের সংশয়াকুলতা ও দোলাচালবৃত্তি অনুভবযোগ্য।

> ... হিংসুকের প্রাণ জাহান্নাম। দিন তার
> শান্তি হারা, সুপ্তিহারা রাত্রি তিক্তময়। জ্বলে মরে

ঈর্ষার দহনে। যেখানে যায় সে দোজখের
অশান্তি আগুন শুধু নিয়ে সাথে; হিংস্র বিষ
বাষ্পে ভরা, যায় সে ছড়িয়ে তিক্ত জহরের জ্বালা
মৃত্যু পারে। শুনেছি এ কথা জ্ঞানী মুর্শীদের কাছে।
জ্ঞান-পাপী তবু আমি ইচ্ছা-অন্ধ।...
... যশের কাঙাল, তবু
পাইনি যা ছিল প্রত্যাশায়।...
... কিন্তু যদি সারা দেশ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে আর বিদ্ধ হয় আমার খঞ্জর
আমার পাঁজরে, তবে-পাব আমি কি ফল, প্রত্যহ
নকীবের মুখে ব্যর্থ ঘোষণা জানিয়ে অকারণ
এ দিনার দিরহাম ছিটিয়ে?...

তাই শেষ দৃশ্যে হাতেমের মহত্ত্বে তাঁর চৈতন্যোদয় অতি স্বাভাবিক মানবিকতায় জাগরণ। ভাবধর্মী নাটক বলেই প্রধান ভাবের প্রসঙ্গ যখনই এসেছে, তখনই কবিকণ্ঠ নাট্যকারকে আড়াল করে স্বপ্রকাশ হয়ে উঠেছে : দর্শক (পৃ. ৮), নৌফেল (পৃ. ২৭, ৬৬-৬৯, ৯১-৯২), উজির (পৃ. ২৯), সিপাহশালার (পৃঃ ৩১), বৃদ্ধ মুর্শিদ (পৃ. ৩২, ৯০), হাতেম (পৃ. ৩৩-৩৮, ৯১), শায়ের (পৃ. ৯০) প্রমুখের সংলাপে। অথচ অন্যত্র, যেমন দর্শকদের আলাপে সরাইখার দৃশ্য কিংবা কাঠুরিয়া দম্পতি ও পুত্রদের আলাপে নাট্যকার চমৎকার নাটকীয় সংলাপ রচনা করেছেন। এ কারণ ভাবধর্মী নাটকের সাধারণ ক্রটিতে নিহিত। ভাবের মূল্য কবির কাছে যতখানি তাৎপর্যপূর্ণ নাটকের নিতান্ত নীতিপ্রাণ দর্শক-শ্রোতার কাছেও তা আন্তরিকভাবেই, ঠিক ততখানিই তাৎপর্যপূর্ণ হবে, এমন কোন শর্তারোপ করা চলে না। অথচ সমগ্র নাটকে সংক্ষিপ্ত ঘটনারাজির গৌণক্রিয়াও দর্শককে তীব্রভাবে আকর্ষণ করার সুযোগ পায় না; ফলে ভাবের প্রতিই দর্শকশ্রোতার সচেতনতা পূর্বাপর বিদ্ধ হয়ে থাকে-আর 'নৌফেল ও হাতেম' নাটকে নাট্যকার স্বয়ং তাঁর মূলভাবের প্রতি দর্শকশ্রোতার মনোযোগ প্রার্থনা করেছেন। কাব্যনাট্যে চমৎকার কাব্য থাকবে না, এমন নয়; কিন্তু দর্শক যেন কখনই না ভাবেন যে 'সাময়িকভাবে নিঃশেষিত' 'নাটকীয় অনুপ্রেরণা' কাব্য দিয়ে ভরাট করে দেয়া হচ্ছে। নাট্যকাব্যের এ একটা বড় দুর্বলতা এবং ভাবধর্মী নাট্যকাব্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও সহজেই এ দুর্বলতার শিকার হয়ে পড়ে। নাট্যকাব্যের ভাষা প্রসঙ্গে এলিয়টের উক্তিই পুনরায় স্মরণ করতে পারি : "বলতে গেলে বলা চলে কবিতাকে স্বাস্থ্যকর স্বল্পাহারে রেখে তাকে রঙ্গমঞ্চীয় উপযোগিতা দান করতে হবে। যখন মঞ্চোপযোগী কারুকুশলতা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন হবে, এক রকম দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হবে, তখন কবিও মঞ্চে অকৃপণ হস্তে কাব্য বিতরণ করতে পারবেন। কাব্য নির্মাণে নিত্যকার মুখের বুলিকে আরও অসঙ্কোচে ব্যবহার করতে পারবেন।"

আর এ কারণেই নাটকের মাধ্যমে কবিতার মুক্তি বা নাট্যকাব্যের সাফল্যের জন্য ঐতিহাসিক বা প্রাচীন ঘটনার নির্ভরতা ধ্রুবপন্থা নয়। কাব্যনাট্য যদি সত্যি

সত্যি তার পূর্ব গৌরব পুনরুদ্ধার করতে চায় তাহলে অবশ্যই তাকে গদ্যনাট্যের সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হবে।

"... প্রাচীনকালের ভূষণ-পরা মহৎ ব্যক্তিদের মুখ থেকে পদ্য গ্রহণ করবার জন্য অনেক দর্শকই তৈরি থাকেন; কিন্তু আমরা চাই, যে মানুষ আমাদের মত সাজগোজ করে, একই ধরনের বাড়িতে বাস করে, টেলিফোনে কথা বলে, রেডিও শোনে, মোটর গাড়ি চড়ে তাদের মুখের কবিতা যেন দর্শক-সাধারণ কান পেতে শোনেন। ...আমাদের কর্তব্য হল, যে জগতে দর্শক খেয়ে পরে বাঁচে, নাটক দেখে ফিরে যায় সেই পরিচিত দুনিয়ার বুকে কবিতাকে প্রতিষ্ঠিত করা।" **(এলিয়ট)**।

বলাবাহুল্য পুঁথির কাহিনীনির্ভর রচনায় নাট্যকাব্যের এই মুক্তি-সন্ধান অর্থহীন।

'নৌফেল ও হাতেম' আঠারো মাত্রার সমমাত্রিক, অমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দে লেখা (নাটকের সূচনায় 'কাহিনীর ইশারা' সনেট ও শেষে শায়েরের সংলাপে একটি ষঠক ব্যতীত)। চৌদ্দ মাত্রায় বাংলায় এ ছন্দের প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্বয়ং এর নাট্যগুণে মুগ্ধ ছিলেন এবং এ ছন্দে চরিত্রসৃজনের নিরীক্ষা-স্বরূপ 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনার পর অলিখিত 'রিজিয়া' নাটকের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের হাতে এ ছন্দ পূর্ণাঙ্গ নাট্যরচনায় ব্যবহৃত হয়। এবং রবীন্দ্রকাব্যের ছন্দ হিসেবে এর উপযোগিতা সপ্রমাণ হয়। ফররুখ আহমদ দক্ষতার সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ নাট্যকাব্যে এ ছন্দের ব্যবহার করেছেন; তাঁর ভক্ত পাঠকদের জন্য এ খুবই আনন্দের বিষয়।

পুঁথির অনৈসলামিক চরিত্রাবলী ফররুখ আহমদের হাতে ইসলাম-ধর্মে প্রগাঢ় বিশ্বাসের অধিকারী; ফররুখ আহমদের তীব্র ধর্মচেতনা এর অনুপ্রেরণাস্বরূপ। ফররুখ আহমদ আমাদের অন্যতম পথিকৃৎ কবি। তাঁর নিরীক্ষামুখী চিত্ত ও প্রতিভা তরুণগোষ্ঠীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। তাঁর পক্ষে পুঁথির রোমান্সরসপূর্ণ কল্পলোক থেকে নেমে আসা হয়তো সম্ভব নয়। তবু তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাব্যনাট্য রচনার এবং আমাদের কাব্যের মুক্তির পথ নির্দেশের কৃতিত্বের জন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদার্হ। তাঁর সাফল্য ও বিফলতার শিক্ষা থেকেই বাংলাদেশে সার্থক কাব্যনাট্য রচিত হবে।

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, জুন, ২০০১]

# ফররুখ আহমদের 'মুহূর্তের কবিতা'

## ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

চল্লিশ দশকে যে কবি বাংলা কাব্য-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন অসাধারণ শক্তি ও প্রতিভা নিয়ে, তিনি ফররুখ আহমদ। তাঁর এক উজ্জ্বল কাব্যগ্রন্থ 'মুহূর্তের কবিতা'। ব্যতিক্রমধর্মীও বটে। ১০১টি সনেট নিয়ে তাঁর এই কাব্যগ্রন্থ। প্রতি সনেটে এই আঙ্গিক-সচেতন কবির বিষয়-বৈচিত্র্য, দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতা ও অসামান্যতা ফুটে উঠেছে। ১৮ মাত্রার সনেটগুলিতে যে আন্তরিক জীবনোপলব্ধির একই সঙ্গে ধরে আছে তাঁর আদর্শ, জীবনবোধ ও সমকাল সচেতন চেতনাকে। তাঁর স্বপ্ন ও সম্ভাবনার কথা তিনি বলেছেন আন্তরিক উপলব্ধিতে। সংকলিত সনেটগুলো বিষয় অনুসারে সাধারণভাবে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায় :

১. কবিতা ও সনেট, ২. প্রকৃতি, ৩. মধ্যপ্রাচ্যের কবি, ৪. পুঁথি সাহিত্য, ৫. লোক সাহিত্য, ৬. ইতিহাস, ৭. তারা, ৮. শহর, ৯. পাখি, ১০. স্বপ্ন ও জাগরণ।

কবি সনেটকে বলেছেন মুহূর্তের কবিতা। এই গ্রন্থের প্রথম কবিতার নামই 'মুহূর্তের কবিতা'। এই সনেটের ষষ্টকে তিনি বলেছেন ঃ

মুহূর্তের এই কবিতা, মুহূর্তের এই কলতান-
হয়ত পাবেনা কণ্ঠে পরিপূর্ণ সে সুর সম্ভার,
হয়ত পাবেনা খুঁজে সাফল্যের, পথের সন্ধান,-
সামান্য সঞ্চয় নিয়ে যে চেয়েছে সমুদ্রের পাড়;
তবু মনে রেখ তুমি নগণ্য এ ক্ষণিকের গান
মিনারের দম্ভ ছেড়ে মূল্য চায় ধূলিকণিকার।।

তাঁর সনেট সম্পর্কে তাঁর পরবর্তী 'মুহূর্তের গান' কবিতার ষষ্টকে তিনি বলছেন,-

'কালের সূরাহি থেকে' ঝরে যাওয়া কণিকা এসব
বিচ্ছিন্ন মুহূর্ত গড়ে কত শতাব্দীর খেলাঘর,
নৈঃশব্দ্যের বিয়াবানে করে কোটি কণ্ঠকে সরব,
ক্ষণিকের অবকাশে রেখে যায় রক্তিম স্বাক্ষর!
তারপর মিশে যায় কীটাণুর ক্ষীণ অবয়ব
কোনদিন, কোনখানে, আর যার মেলে না খবর।

জীবনে কবিতার জন্ম মুহূর্তকে কবি 'দুর্লভ মুহূর্ত' বলেছেন। বলেছেন হয়ত 'ক্বচিৎ সে মুহূর্ত আসে' তবু আসে ফিরে ফিরে বলেই কবিতার জন্ম হয়। 'দুর্লভ মুহূর্ত' কবিতায় এই কথাই তিনি ব্যক্ত করেছেন।

ফিরে পায় তপ্ত বক্ষে সে মুহূর্তে হারানো সঙ্গীত

আকাশের, বাতাসের, শিশির ঝরানো ঘাসে ঘাসে,
সমুদ্রের হৃদপিণ্ডে অথবা প্রিয়ার বাহু পাশে
প্রাণের মূর্চ্ছনা মেশা জীবনের আশ্চর্য ইঙ্গিত।
জন্ম নেয় কবিতার রক্তদল তখনই জীবন,
- যে কবিতা পৃথিবীর অরণ্যে, পাহাড়ে,
যে কবিতা অর্ধস্ফুট গোলাপের পাত্রে সঙ্গোপনে
সুরভি প্রশ্বাসে আর বিগত রাত্রির অশ্রুধারে,
শিশির; - প্রকাশ যার নিজেরে হারায়ে বারে বারে
কাঁদিয়াছে বহুবর্ষ অন্ধকার মাটির বন্ধনে।

কবি জাগতিক পৃথিবীর প্রয়োজনকে কখনো অস্বীকার করেন নি, পোষণ করেন নি কোন পলায়নী মনোবৃত্তি। তাই তিনি জানেন 'আনন্দের রক্তিম সঞ্চয়' নিয়ে 'সংগ্রামের অনিরুদ্ধ পথে' যাত্রা তাঁর অনিবার্য। এই যাত্রায় তাই তিনি কামনা করেন চিন্তার জটিল ঊর্ণাজালে বিক্ষত মনে ঝরোকা খুলে তারার আলো নিয়ে আসবে তাঁর কবিতা। যে কবিতা 'আরক্তিম গোলাপের পাপড়িতে' 'গোধূলি ধূসর হৃদয়ের জাগ্রত স্বপ্ন'। শিশুর মুগ্ধ চোখের স্বপ্নে আর তারুণ্যের কলগানের প্রতিক্ষণে যে সুন্দর স্বপ্ন জাগে সে স্বপ্ন নিয়ে- 'পথশ্রান্ত গোধূলি আলোকে' আশার আবেদন জানাচ্ছেন কবি তাঁর কবিতার প্রতি। প্রকৃতি বিষয়ক সনেটগুলোতে তিনি প্রধানত বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা বিষয়ক কবিতা লিখেছেন। কোকিলকে তিনি বলেছেন 'বসন্তের গীতিকার' 'বনের মুক্তসুরে' সে খেলা করে উচ্ছল আনন্দে। ফাল্গুনে তিনি দেখেছেন 'বনানী সেজেছে সাকী ফুলের পেয়ালা নিয়ে।' এবং 'জেগেছে ফুলের কুঁড়ি অরণ্যের মদিরা বিলাতে।' গ্রীষ্মের বর্ণনা দিয়েছেন তিনি 'বৈশাখী' কবিতায়-

"বৈশাখের মরা মাঠ পড়ে থাকে নিস্তব্ধ যখন
নিষ্প্রাণ, যখন ঘাস বিবর্ণ, নিষ্প্রভ ময়দান,
যোজন যোজন পথ ধূলি-রুক্ষ, প্রান্তর বিরান;
শুকনো খড়কুটো নিয়ে ঘূর্নি ওঠে মৃত্যুর মতন
সে আসে তখনি।...
ধ্বংসের আহ্বান নিয়ে অনিবার্য সে আসে সে আসে।

এর পরের কবিতা 'ঝড়ে' তিনি আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে বিচ্ছুরিত বজ্র ও তুফানে সহস্রবন্দীর মুক্তি বার্তার ঘোষণা দিয়েছেন। গ্রীষ্মের পরে র্বষা-

"বৃষ্টি এল ... বহু প্রতীক্ষিত বৃষ্টি। পদ্মা মেঘনার
দু'পাশের আবাদী গ্রামে, বৃষ্টি এল পুবের হাওয়ায়,
বিদগ্ধ আকাশ, মাঠ ঢেকে গেল কাজল ছায়ায়;
বিদ্যুৎ- রূপসী পরী মেঘে মেঘে হয়েছে সাওয়ার।

দিকদিগন্তের পথে অপরূপ আভা দেখে তার–
বর্ষণ-মুখর দিনে অরণ্যের কেয়া শিহরায়,
রৌদ্রদগ্ধ ধান ক্ষেত জাদু তার স্পর্শ পেতে চায়,
নদীর ফাটলে বন্যা আনে পূর্ণ প্রাণের জোয়ার

'বর্ষার বিষণ্ন চাঁদ' কবিতায় এই চাঁদ যেন হাজার বছর পরে আসে,–

হাজার বছর পরে এই চাঁদ বিষণ্ন বর্ষার–
বয়ে নিয়ে যাবে স্মৃতি জনপদে বেদনা-মন্থর;
অস্পষ্ট ছায়ার মত, যেখানে এ রাত্রির দুয়ার,
খুলে দেবে অন্ধকারে জীবনের বিস্মৃতি- প্রহর;
বৃষ্টি ধোয়া আসমানে জাগাবে সে এই ক্লান্ত শহর;
হাজার বছর পরে একবার শুধু একবার

কবি এর পর স্মরণ করেছেন মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকজন বিখ্যাত কবির ঐতিহ্যকে। এই পর্যায়ের কবিতা ফেরদৌসী, রুমী, জামী, সাদী, হাফিজকে নিয়ে। এ প্রতিটি কবিতায় কবিদের তিনি সত্যাশ্রয়ী, সত্যদ্রষ্টা ও সত্যের সন্ধানী বলে অভিহিত করেছেন। এবং তাঁদের রচনাবলীর নাম দিয়েছেন মানব জাতির 'অমর গীতিকা'। তাই শতাব্দীর অন্ধকার দীর্ণ করে জেগে আছে ফেরদৌসীর অমর কাব্য 'শাহনামা'। তেমনি রুমীর 'মসনবী'। "মসনবী অমর কাব্য এই দুনিয়া জাহানে।" জামীকে তিনি বলেছেন "তুমি শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত' এবং আরো বলেছেন,

তোমার গানের সুরে মুগ্ধ আজ-অসংখ্য-হৃদয়
জেনে গেছে "মোহাম্মদ এ বিশ্বগ্রন্থের"
দেখে গেছে মুগ্ধ চোখে সৌন্দর্যের সমুজ্জ্বল পথ।
প্রেমিক আশিক তুমি অফুরন্ত তোমার সঞ্চয়
ভাবের সমুদ্র থেকে দিল এনে বাণী-এ সত্যের,
দীপ্ত তুমি কাব্যলোকে তুমি শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত"

'সাদী' কবিতায় তিনি বলছেন-

'সৌন্দর্যের সাথে জ্ঞান' মিশে আছে যেখানে, সাদীর
দেখা পাবে সেইখানে, কেননা যে গোলাবের মূলে
লালিত, সুরভি তার সকল হাওয়ায় ওঠে দুলে;
অতিক্রম করে যায় অনায়াসে বাধা শতাব্দীর।

'হাফিজ' কবিতায় কবি বলছেন,–

'বোখারা সমরকন্দ বিকালো সে গালের তিলের
বদলে, ভাবের সাথে দেখালো সে ভাষার মিলন।

এ সমস্ত সনেটের মধ্য দিয়ে ফররুখ আহমদ এইসব মহাকবিদের বৈশ্বিক পূর্বসূরি হিসাবে স্মরণ করেছেন। তাঁদের কবিত্বশক্তির প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি তাঁদের মহান উত্তরাধিকার দাবি করেছেন।

এর পরবর্তী কিছু সনেট পুঁথিসাহিত্য অনুপ্রাণিত। এই সনেটগুলির নাম 'চলতি ভাষার পুঁথি', 'শাহ্ গরীবুল্লাহ', 'অসমাপ্ত পুঁথি প্রসঙ্গে', 'পুঁথির আসর', 'পুঁথি পড়া : মহাররম মাসে - এক ', 'পুঁথি পড়া : মুহররম মাসে - দুই', 'শহীদে কারবালা', 'তাজকেরাতুল আউলিয়া', 'কাসাসুল আম্বিয়া', 'শাহনামা', 'আলিফ লায়লা', 'চাহার দরবেশ', 'হাতেম তায়ী' ও 'কোহে নেদা'। এই সনেটগুলোতে পুঁথি অবলম্বনে পুঁথির চরিত্রগুলোকে তিনি মানবিক মূল্যবোধে পুনর্নির্মাণ করতে চেয়েছেন। পুঁথি সাহিত্য যে বাংলা কাব্যের উজ্জ্বল ঐতিহ্য এই উত্তরাধিকার দাবি করেছেন কবি।

কবি লোক কাহিনী, ময়মনসিংহ ও পূর্ব বাংলা গীতিকা থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে সনেট লিখেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'গাথা ও গান' দীউয়ানা মদীনা' 'লোক সাহিত্যের নায়িকা'। ইতিহাস ও ঐতিহাসিক স্থান কবি কয়েকটি সনেটে বিষয়বস্তু হিসাবে ব্যবহার করেছেন। 'ইতিহাস', 'লালবাগ কেল্লা' 'সোনারগাঁও : একটি প্রাচীন স্মৃতি', তেমনি জিঞ্জিরা ও মতিঝিল এসব স্থান বিষয়ক কবিতায় কবি ঐতিহাসিক ঘটনার স্মরণ করে মানবতার জয়গান করেছেন। তাঁর ৫৭১', ৫৭২, কবিতা সিপাহী বিপ্লবের শতবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত। এই কবিতায় বা এই সব সনেটে সিপাহীদের আত্মদানের উদ্দেশে তিনি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

ছন।

'তারা' বিষয়ক তিনটি সনেটের প্রথমটির নাম 'কুতুব তারা'। 'কুতুব তারা' অর্থ তিনি ধ্রুবতারা বুঝিয়েছেন। এই কবি বলেছেন,

জুলমতের এলাকায় হে নিঃসঙ্গ, খিজিরের মত
আবেহায়াতের তুমি পেয়েছ সন্ধান; চিরন্তন
সত্যের পেয়েছ অভিজ্ঞান। অন্ধকারে শঙ্কাহত
দিকভ্রান্ত প্রাণে তাই দিয়ে যাও আশ্বাস নূতন

পরবর্তী সনেটে 'সন্ধ্যাতারায়' কবি বলছেন,

হাজার শতাব্দী যাবে পথ চেয়ে এভাবে তোমার
একান্তে প্রতীক্ষমানা (বক্ষে নিয়ে বহ্নি অসহন)।।

তৃতীয় সনেটের নাম 'মুশতারী সিতারা'। এই সনেটে কবি সারা জীবন মুশতারী তারা কবির চেতনায় বিস্ময় জাগিয়েছে কবির চেতনায় শৈশবে কৈশোরে যৌবনে। আজ যৌবনের প্রান্তে এসে মুশতারী সিতারার উদ্দেশ্যে বলছেন,-

মুক্তপক্ষ মন মোর উড়ে যায় একান্ত আশ্বাসে
যেখানে তোমার কক্ষে আলোকের রহস্য নিতল।

শহর প্রসঙ্গে দুটি সনেট আছে, 'এই বিধ্বস্ত শহর', এবং 'একটি আধুনিক শহর'। উভয় কবিতায় শহরকে অনাত্মীয় হিসাবে চিত্রিত করেছেন কবি। প্রথম কবিতায় কবি শহরকে ম্লান জরাগ্রস্ত জননীর মত বলেছেন।

রেখেছে বিভ্রান্ত বুকে টেনে রুগ্ন অসংখ্য সন্তান।

সমস্ত কবিতা জুড়ে দুর্দশার নানা চিত্র। অবশেষে তিনি বলেছেন ভিক্ষা চেয়ে 'যে পেয়েছে চারপাশে দীনতার ক্রুর জাহান্নাম।' পরবর্তী কবিতা 'একটি আধুনিক শহর' সনেটে তিনি বলছেন,

ওখানে শহর যেন লাস্যময়ী তরুণী গণিকা
ভাগ্যবান অতিথিকে প্রতিক্ষণে জানায় আহ্বান
অর্দ্ধাবৃত তনু হতে ওঠে যার যৌবনের গান;
দিনে সে উদ্ধত আর সন্ধ্যায় উদগ্র সাহসীকা!

কবির অনাত্মীয় এই সব শহরের ছবির প্রতি কবির কোন আকর্ষণ নেই। 'রকপাখি' ও 'স্বর্ণ ঈগল' তাঁর কাছে মুক্ত বিহঙ্গম এবং গতির আনন্দের প্রতীক। এই দুটি সনেটে তিনি মুক্ত জীবরেন গান করেছেন,–

গতির আনন্দ তার ম্লানময় ঝড়ে বা সংঘাতে,
সব সংঘাতের মুখে সংগ্রামী সে নিঃষ্কম্প, নির্ভীক;
পথের সকল বাধা দূর করে যে পক্ষ সাপটে।
দুর্জয়, দুর্বার, দৃঢ় রাখে পূর্ণ শক্তি যে পাখাতে
মরুর দুরন্ত ঝড়ে কোনদিন ভোলে না যে দিক,
পায় সে আনন্দ খুঁজে ঘূর্ণাবর্তে; ঝড়ের ঝাপটে।।

স্বপ্ন ও জাগরণ বিষয়ক দুটি সনেটের প্রথমটির নাম 'মুক্তির স্বপ্ন' ও দ্বিতীয়টির নাম 'প্রত্যয়'। এই মুক্তির স্বপ্নকে তিনি দেখেছেন তার প্রিয় স্বর্ণ ঈগলকে কেন্দ্র করে। বলেছেন–

স্বর্ণ ঈগলের মত মুক্ত হোক এই বন্দী মন
আসুক পল্লবে ফিরে জীবনের বিপুল স্পন্দন
দীনতার সব গণ্ডী ভেঙ্গে যাক প্রাণের জোয়ার;

সব ভ্রান্তি দূরে যাক, পুড়ে যাক মিথ্যার বন্ধন;
বলে যাবে মুক্ত কণ্ঠে এ পৃথিবী তোমার আমার।

পৃথিবীর অধিকার নিয়ে কবি তাই জেগে ওঠেন সুদৃঢ় জীবন প্রত্যয়ে,-

দ্বিধাহীন সে প্রত্যয় প্রত্যাশার প্রদীপ জ্বালালে,
দেখিনি যা এতদিন আকাশের সেই মুক্ত আলো

তুর পাহাড়ের দীপ্তি মনে হ'ল আজ মোর কাছে।

প্রত্যয়ের সূর্যালোকে অবকাশ নাই সংশয়ের,
সবে বরাতের রাতে জ্বলে সে নিষ্কম্প শামাদানে।

নানা বিষয়ক এই সব সনেটের মধ্য দিয়ে কবি সংগ্রামী জীবন স্বপ্নের সার্থকতা সন্ধান করেছেন। এবং শেষ পর্যন্ত তিনি পৃথিবীর অধিকার সম্পর্কে নিঃসংশয় হয়েছেন প্রকৃত কবির মতন। গ্রন্থের শেষ কবিতার নাম 'শেষ কথা'। শতাধিক সনেট লিখেও কবির মনে অতৃপ্তি থেকে যায়। তাই তিনি শেষ সনেটে বলছেন-

কিছু লেখা হল আর অলিখিত রয়ে গেল ঢের
কিছু বলা হল আর হয়নি অনেক কিছু বলা :
অনেক দিগন্তে আজো হয় নাই শুরু পথ চলা
কে জানে সকল কথা? কে পেয়েছে সংজ্ঞা সময়ের?
শুধু নিমেষের রঙ্গে এই সব গান মুহূর্তের
অতলান্ত দরিয়ায় এসব বুদবুদ গোত্রহীন
কখনো উঠেছে কেঁদে কখনো বা হয়েছে রঙীন
দু'দণ্ড খেলার ছলে স্পর্শ নিতে পূর্ণ জীবনের।
লক্ষ যুগ যুগান্তর মিটে যায় যেখানে পলকেই
সেখানে এ বুদবুদের কান্না হাসি, শংসায়িত কাল
কতটুকু? তবু তারে রাখি ঘিরে প্রদোষ সকাল
রঙের বৈচিত্র্য দিয়ে অন্ধকার তারার ঝলকে
দূরের ইশারা এনে; (মুহূর্তের আনন্দ উত্তাল
উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে দিক দিগন্তে শাশ্বত আলোকে)।।

এই হচ্ছে জীবনবাদী ও মানবতাবাদী ফররুখ আহমদের অসাধারণ সনেটগুলোর মধ্যে বিধৃত জীবন দর্শন। জীবনের পূর্ণতাকে তিনি সন্ধান করেছেন। তিনি সকল বাধা অতিক্রম করে গেছেন স্বর্ণ ঈগলের মতোই প্রত্যয় ও প্রত্যাশায়। আমার বিশ্বাস তাঁর কবিতার অমরত্ব এখানেই সুচিহ্নিত। ⊡

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, অক্টোবর, ২০০১]

# ফররুখ আহমদের 'হরফের ছড়া'

ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

ফররুখ আহমদের নানা রচনার মধ্যে তাঁর "হরফের ছড়া" শিশু পাঠ্যগ্রন্থ হিসেবে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটি ব্যতিক্রমধর্মীও বটে। গ্রন্থে প্রত্যেকটি হরফের সঙ্গে চার লাইন করে ছড়া আছে। ছড়াগুলোর মধ্যে কবির দৃষ্টিভঙ্গি সুপ্রকাশিত। কবির দৃষ্টিতে একদিকে যেমন প্রকৃতির বিচিত্র রঙ, অন্যদিকে শিশু-মনের অনুভূতির বৈচিত্র্য খেলা করেছে। ফলে তাঁর ছড়াগুলো বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

প্রথমে স্বরবর্ণের ছড়া। **অ** বর্ণের বর্ণনায় কবি বলছেন–

**অ** অতসী তিসির মাঠ
অশথ গাছের সামনে হাট
অলি গলি শহর চাই
অলি গলি শহর পাই॥

গ্রামের পরিবেশের প্রাচুর্যের বর্ণনার পাশাপাশি শহরের সংকীর্ণ অলি গলির পরিবেশ কবির সূক্ষ্ম কৌতুক বোধকে জাগ্রত করে। কিন্তু শিশুর কাছে ছন্দ দোলা ও ছবিই মূর্ত হয়ে ওঠে। মনে হয় অ গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত বিচিত্র ছবি এঁকে চলেছে। শিশুর কাছে অ রঙে-রেখায়-ছবিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

তেমনি পরবর্তী স্বরবর্ণ **আ** তে রয়েছে আনারস, আম থেকে আসমান পর্যন্ত অভিযাত্রার কথা। সে যাত্রাও রঙে রেখায় সুবাসে আনন্দে ভরপুর,–

**আ** এ আনারস আম বাগান
আসমানী রঙ ফুলটা আন,
আসমানী রঙ মন টানে
আ যেতে চায় আসমানে॥

লক্ষণীয় প্রতিটি চরণের ছবি আর আনন্দের নেতৃত্বে রয়েছে রঙিন বর্ণনাটি তবে ধ্বনি মাধুর্য নিয়ে। প্রতিটি শব্দই শিশুর প্রিয় পরিচিত জগতের এবং প্রতিটি স্বল্প পরিচিত শব্দ 'আসমান' কে কবি আ ধ্বনিটির পুনরাবৃত্তির আনন্দের সুরে শিশুর কাছে একান্ত আপন করে রঙের মায়ায় জড়িয়ে দিলেন। তেমনি (হ্রস্ব) **ই** তেও রয়েছে বিচিত্র গতির সুর ছন্দ ও আনন্দ,–

(হ্রস্ব) **ই** কয় ইলশে গুঁড়ি
ইলিশ মাছে ভরবে ঝুড়ি,
ইস্টিশনের মিষ্টি পান
ইলিশ কিনে গায় যে গান॥

এ গতির আনন্দ নিয়েই (দীর্ঘ) ঈ সেজে-গুজে ঈদগায়ে যায়। 'নতুন চাঁদের বাঁকা নায়, ঈদ আসে। সেই নৌকার রঙ কিন্তু রাঙা। শিশুর মনের মতই সব ঘটে যায়। (দীর্ঘ) ঈ এর সঙ্গে সখ্য আর পরিচয় সুনিবিড় আনন্দে ভরে ওঠে। এই যে (দীর্ঘ) ঈ এর পরিচয় শিশুর কাছে সহজ স্বচ্ছন্দ করে তুলতে কবির সূক্ষ্ম চাতুরী মাধুর্যে ভরে যায়॥ "নতুন চাঁদের বাঁকা নায়" চাঁদের ছবির রূপ পরিবর্তন শিশুর মনে ঈদের সম্ভাবনা আনন্দের রূপ নেয়।

(দীর্ঘ) ঈ যায় ঈদ গায়
ঈদ এসেছে রাঙা নায়,
নতুন চাঁদের বাঁকা নায়
ঈ যায় ঈদ গায়॥

লক্ষণীয় যে একই সঙ্গে বর্ণের সঠিক পরিচিতি এবং উচ্চারিত ধ্বনি শেখা শিশুর জন্য কত প্রয়োজনীয় কবি সেই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে ভোলেননি।

উ ধ্বনিটির স্পষ্ট পরিচয় করানো হয়েছে পূর্বোক্ত ধ্বনিগুলোর মতো একইভাবে (হ্রস্ব) উ বলে। কিন্তু ছড়াতে শ্রুতি মুগ্ধতা সৃষ্টি করার জন্য রয়েছে ধ্বনির দ্যোতনা-

(হ্রস্ব) উ টা উড়ছে
রঙিন কাগজ ছুঁড়ছে
উঁই পোকাটা বলে, এবার
উড়োজাহাজ ঘুরছে॥

ধ্বনি দ্যোতনা (হ্রস্ব) উ কে চলমান ছবির মধ্যে বাঙময় করে তুলেছে। উড়োজাহাজ চড়ে (হ্রস্ব) উ রঙ্গিন কাগজ ছুঁড়ছে। শিশু জগতে এর চেয়ে প্রিয় খেলা আর কি হতে পারে?

(দীর্ঘ) ঊ কে পরিচয় করানো হয়েছে (দীর্ঘ) ঊ নামে। ভোর বেলা ঊষার হাসি দিনের রঙ খেলায় আনন্দ উল্লাসে রেঙে উঠে ঊ কে উজ্জ্বল করে তুলেছে,-

(দীর্ঘ) ঊ টা ঊষাতে
রাঙলো দিনের ভূষাতে
ঊষার হাসি ভোর বেলা
দেখছি দিনের রঙ খেলা॥

ঋ শেখানোর বেলায় অপ্রচলিত ঋষভ শব্দটি ব্যবহার করলেও ঋষভের প্রচলিত নাম ও এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কৌতুককর দিকটি দিয়েই শিশুকে মুগ্ধ করে ভুলিয়ে ঋকে চিনিয়েছেন সুকৌশলে,-

ঋ তে ঋষভ ষাড়টা
বাঁকিয়ে রাখে ঘাড়টা,
সারা দিন চায় খেতে

লড়াই নিয়ে রয় মেতে॥

এ প্রাণীর স্বভাবটায় একটা খেয়ালিপনা রয়েছে। বিরাট এই প্রাণীটাকে খেলার সাথী ভাবতে শিশুর মনে কোন দ্বিধা থাকে না।

ফররুখ আহমদ হরফের ছড়া বইটি লিখেছেন যেন সচেতন মনের আনন্দে শিশুদের সঙ্গে মনের খেলায় মেতে। এখানে কোন পণ্ডিতি বিতর্কের অবকাশ নেই। ৯ এর অবস্থান ও প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে যতই বিতর্ক থাকুক ফররুখ আহমদ ৯ এর সঙ্গে কাঠবেড়ালীর মিতালীর মজার ছবিটি আঁকতে যেয়ে ভাব বিনিময়ের সঙ্গে 'তালপাটালীর' মিষ্টি বিনিময়ের শর্ত ছুঁড়ে দিতে ভোলেননি,–

৯ কে বলে কাঠবেড়ালী
করতে আমি চাই মিতালী
৯ কয় দিলে তাল পাটালী
তবেই হবে ঠিক মিতালী॥

হরফের ছড়া কোন পাঠ্য-পুস্তক নয় তবে আনন্দ পাঠ। কবি ভালো করেই জানেন আনন্দ পাঠই যথার্থ অর্থে শিশুদের পাঠের যোগ্য বই। শিশুরা সদা চঞ্চল রবীন্দ্রনাথের কথায়,–

'মোরা অকারণে হে চঞ্চল
ডালে ডালে দুলি
বায়ু হিল্লোলে নব পল্লব দল।'

এ নতুন পাতার চঞ্চলতাই সৌন্দর্য ও আনন্দের গতিময়তা। কেননা, এখানে প্রাণের স্ফুরণ ঘটেছে। শিশু-কিশোরও প্রাণের উচ্ছলতায় সদা চঞ্চল গতিময়।

এ বর্ণের পরিচয়ে কবি এঞ্জিনকে টেনে এনেছেন একটানা চলার ছন্দে শিশুকে মাতিয়ে তুলতে,–

এ চলেছে এঞ্জিনে
এলাচ দানা লং কিনে
থামার কথা নাই যে
একটানা যায় তাই সে॥

এলাচ ও একটানায় এ এর ব্যবহার যথাযথ হলেও এঞ্জিনকে সচরাচর আমরা ইঞ্জিনই বলে থাকি। তবে এলাচ কিনে একটানা যে রেলগাড়ি চলছে তার প্রয়োজনে ইঞ্জিন এঞ্জিন হলেও শিশুর কিছু যায় আসে না বরঞ্চ সেটাই সত্য হয়। কবি এখানেই সার্থক।

ঐ এর জন্য একটা স্বল্প ব্যবহৃত কঠিন শব্দ কবি এনেছেন। কিন্তু সতর্কতার সঙ্গে শিশুদের জন্য শব্দটি ব্যাখ্যা করতে ভোলেননি,-

ঐ ধরেছে ঐকতান,
ব্যাঙরা বলে মজার গান

অনেক মুখে একটা সুর
যায় ছাড়িয়ে পথটা দূর॥

এর পরের বর্ণটাকে পরিচয় করাতে গিয়ে একটা সুন্দর রঙিন ওড়নার বাস্তব ছবির সঙ্গে ও এবং ওদের দু'টি সর্বনাম পদ ব্যবহার করে গল্পের আবহ সৃষ্টি করে ছড়াটি রচনা করেছেন। শিশুদের একান্ত মনের কাছের মানুষ হয়ে এক নিমেষেই তিনি ওদের মন জয় করে নিয়ে বলেছেন,-

ও শুনেছে ওদের কাছে
ওড়না, রাঙা আয়না আছে,
ও ধরেছে বায়না
ওড়না ছেড়ে আয় না॥

ঔষধ ছাড়া ঔ পাওয়া কঠিন। কিন্তু ঔকে কবি ঊষধ থেকে আলাদা করেছেন। আবার ঔকে ঔষধের কাছে আনার জন্য মজার শর্তও জুড়ে দিয়েছেন। ছড়া-ছন্দের যাদুতে ঔকে তিনি কান্না ভোলার উপায় বলে দিয়েছেন,

ঔ কাঁদে রাত দিন
পুরোপুরি সাত দিন,
ঔষধ খায় নি
রোগটাও যায় নি।

ফররুখ আহমদ একজন শক্তিমান কবি। তাই কত সহজে ছড়ার ছন্দে বাংলা বর্ণমালার স্বরবর্ণের ধ্বনিমালার পরিচয় এমনভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন। ছড়াগুলো শোনাতে মজা, শুনতে মজা, বলতে মজা, বলাতেও মজা। আনন্দই এখানে বড় কথা, সেই সঙ্গে রয়েছে তালে তালে একসঙ্গে বলতে বলতে খেলার আনন্দ।

রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠ প্রথম ভাগে যে ভাবনার সূত্রপাত করেছিলেন তারই আনন্দময় সমকালীন জীবন প্রতিফলনের পূর্ণাঙ্গরূপ "হরফের ছড়া।" প্রতিটি হরফ এখানে ছড়ার মধ্যে বাস্তব রূপ ও অবস্থান পেয়ে যেন এক একটি জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছে। শিশুমনের সঙ্গী হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। প্রকৃত কবির আন্তরিক ও সার্থক কাজ এই হরফের ছড়া বইটি। এই বইটি প্রকৃত অর্থে বাংলা বর্ণমালা পরিচয়।

অ-অতসী, অশথ; আ-আম, আনারস, আসমান; (হ্রস্ব) ই-ইলিশ, ইস্টিশন; (দীর্ঘ) ঈ-ঈদ; (হ্রস্ব) উ-উই, উড়োজাহাজ; (দীর্ঘ) ঊ-ঊষা; ঋ-ঋষভ; ঌ (কোন শব্দ নেই কিন্তু পরিচয় আছে। ঌ এর রূপ আকার প্রকৃতির প্রতিরূপ প্রিয় প্রাণী কাঠবিড়ালীর পচিয়ে বিধৃত হয়েছে। 'ঌ কয়' এই বাক্যে ঌ জীবন্ত; এ-এলাচ, এঞ্জিন; ঐ-ঐকতান; ও-ওড়না, ও, ওদের; ঔ-ঔষধ। এসব শব্দে বর্ণের মূল ধ্বনির স্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণ রয়েছে। ছড়াগুলোতে ধ্বনি দ্যোতনা শোনা এবং বলায় সহায়তা করে ও শ্রবণ ও জিহ্বার অনুশীলনে স্পষ্টত আনন্দ সঞ্চার করে। ছড়াগুলো শিশুর পরিচিত

জীবন পরিবেশ থেকে আহরিত শব্দমালা শিশুর নিজস্ব জগতের নিশ্চয়তা এবং এক ধরনের বিশ্বাস সৃষ্টি করতেও সমর্থ হয়েছে। 'সহজ কথা' সহজে বলতে পারার পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ। এখানেই কবি ফররুখ আহমদের সার্থকতা।

ফররুখ আহমদ স্বরবর্ণ ১২টি ও ব্যঞ্জনবর্ণ ৪০টি মেনে নিয়েই তাঁর 'হরফের ছড়া' রচনা করেছেন। মার্চ ১৯৬৮-তে বইটি প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা একাডেমী বইটি প্রকাশ করেছিল। আমাদের প্রস্তাবক্রমে জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড থেকে সাধু ভাষার পরিবর্তে ১৯৭৭ সাল থেকে চলিত প্রমিত রীতিতে পাঠ্যপুস্তক রচনার সূত্রপাত হয়। তাঁর আগে খান মুহাম্মদ মইনুদ্দীনের 'সবুজ সাথী' (সাধু ভাষায় রচিত) ছিল শিশুদের প্রথম পাঠের একমাত্র বই। সেকালে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এ কবির 'হরফের ছড়ায়' প্রাঞ্জল গতিসম্পন্ন চলিত প্রমিত রীতির এ ছড়াসম্ভার তাঁর অনেক অগ্রবর্তী চিন্তার পরিচয় বহন করে।

এ বর্ণমালা মেনে নেওয়ার মধ্যেও তাঁর উদার মনোভাবের পরিচয় মেলে। পরিবর্তনতো চাপিয়ে দেওয়া যায় না। সময়ের স্রোতে গতি পরিবর্তন অনিবার্য। তাঁর বইটিতে অনুশাসন নেই। কেননা তিনি স্মরণে রেখেছেন শিশুমনকে মনে রাখার শাসনে আবদ্ধ করা যায় না। আনন্দ এবং ঔৎসুক্য জাগাতে পারলে মনে যা থাকার তা থাকবে। সেই জন্যই তিনি হ্রস্ব ই, দীর্ঘ ঈ, হ্রস্ব উ, দীর্ঘ ঊ এই সব বর্ণপরিচয়ের ব্যাখ্যা নিয়ে আদৌ উৎকণ্ঠিত হননি।

ব্যঞ্জন বর্ণের ছড়াগুলোর মধ্যেও প্রকৃতি, প্রাণীজগৎ ও শিশুর জীবন পরিবেশের বিচিত্র ছবি, শব্দ ঝঙ্কারে ব্যঙময় হয়ে উঠেছে। ব্যঞ্জন বর্ণের প্রথম বর্ণটি নিয়ে যে ছড়া তা অতুলনীয় মনে হয়,

ক এর পাশে কলমিলতা–
কলমিলতা কয় না কথা,
কোকিল ফিঙে দূর থেকে
কলমিফুলের রঙ দেখে॥

পরের বর্ণ খ সে বুঝি খরগোশের দখলে। তাই কবি বলেছেন,–

খ কে নিয়ে খেকশিয়ালী
যায় পালিয়ে কুমারখালী
পাখ পাখালি খবর পেয়ে
খরগোশকে দেয় জানিয়ে॥

খরগোশেই খ এর মূলধ্বনি স্পষ্ট ভাবে উচ্চারিত। তাই খেকশিয়ালী কুমারখালী গেলেও খ কে পাবে না। যেমন পায়নি পাখ পাখালি। এমন ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অবচেতন মনে স্থির ধ্বনির দ্যোতনা সৃষ্টি না করে কি পারে? ছড়াটিতে পশু পাখির একটি সমাজ চিত্র ফুটে উঠেছে।

শিশুদের খেলাই জীবন, জীবনই খেলা। জসীমউদ্‌দীনের রাখাল ছেলে সহজ সত্য ভাষণ তাই বুঝি অতুলনীয়। লাঙল নিয়ে সারাদিন সে শুধু খেলে, তার আর কোনো কাজ নেই–এই অপবাদ সে হেসে উড়িয়ে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে একটি সত্য–

'খেলা মোদের গান গাওয়া ভাই খেলা লাঙল চষা
সারাটা দিন খেলতে জানি, জানি নাইক বসা।'

ঠিক একই ভাবে গ বর্ণটি শিশু মনে স্থায়ী আসন করে নেয় যখন কবি বলেন,–

গ এর খেলা গোল্লাছুট
জিতলে চানা হারলে বুট
তোমরা খাবে কুটুর কুট
আমরা খাব মুটুর মুট॥

এভাবে সমস্ত ব্যঞ্জন বর্ণ বিচিত্র বর্ণছটায় উজ্জ্বল হয়ে একের পর এক ছড়ার ছন্দে দুলে দুলে শিশুর শ্রবণ মনকে উচ্চকিত করে তুলেছে। এ বই-এর ছড়াগুলো কোনো উপদেশ তথ্য বা জ্ঞান ভারাক্রান্ত নয়। এই বই-এর ছবিগুলো, ছড়াগুলো অপূর্ব দক্ষতায় আরো জীবন্ত করে তুলেছে। শিল্পী মুক্তাদির শিশুমনের কৌতূহল জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

আজকের বাংলাদেশে প্রথম শ্রেণী থেকেই পঠন পাঠন শুরু হচ্ছে। পড়ার প্রস্তুতি বা মন তৈরির যে অপরিহার্য শর্ত তা উপেক্ষা করে যাওয়ার ফলে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত আয়োজনেই গোড়ায় গলদ থেকে যাচ্ছে। পাশাপাশি ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা পাঠক্রমে অন্তত দুই থেকে তিন বছর এ শিক্ষা প্রস্তুতির সুযোগ রয়েছে। বাংলার ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা নেই। ফলে মাতৃভাষা বাংলায় শিক্ষা গ্রহণ ও দান একটি সংকটের মধ্য দিয়ে চলছে। শুধু তাই নয় হরফের ছড়ার মতো একটি আনন্দময় 'ছড়ার বই' শিশুদের হাতে তুলে দেবার মতো কেউ নেই। এ বিষয়ে সর্বস্তরে সচেতনতার অভাব রয়েছে। 'হরফের ছড়া' বইটির প্রাসঙ্গিকতা বাংলা ভাষার প্রাথমিক স্তরে স্থায়ী মূল্যায়নের অপেক্ষা রাখে। আজকের শিশুদের ভারাক্রান্ত নিরাপদ জীবন পরিবেশে এ গ্রন্থের মূল্য অপরিসীম। ◘

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ৮ম সংখ্যা, অক্টোবর, ২০০৩]

# গীতিকার ফররুখ আহমদ

শাহাবুদ্দীন আহমদ

অনেক বিশেষজ্ঞ সমালোচকের মতে বাংলাদেশের গানই বাংলাদেশের কবিতা। কথাটা বলার কারণও হয়ত আছে। বাংলা সাহিত্যের যাঁরা শ্রেষ্ঠ কবি তাঁরা একই সঙ্গে শ্রেষ্ঠ গীতিকার। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের হাজার বছরের ইতিহাসে এর প্রচুর প্রমাণ আছে। শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলীতে ২১৬ জন কবির কবিতা বা পদাবলী সংকলিত হয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকজন মুসলমান পদকর্তাও আছেন যেমন গুণরাজ খান, নাসির মামুদ, সৈয়দ মরতুজা, আকবর ও সৈয়দ আলাওল। আর বলাবাহুল্য, মহাকবি বলে পরিচিত জয়দেব, চণ্ডীদাস (বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস) বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস আছেন।

বিংশ শতাব্দীর রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন এঁরাও একই সঙ্গে কবি ও গীতিকার ছিলেন। এদের অনেক কবিতা গান এবং অনেক গান কবিতা। এ সাহিত্যের ধারায় মুসলিম কবিরাও পিছিয়ে নেই। মীর মশাররফ হোসেন থেকে শুরু করে কবিতার সঙ্গে গান লিখেছেন মেহেরুল্লাহ, কায়কোবাদ, ইসমাইল হোসেন শিরাজী, শেখ ফজলুল করীম, শাহাদাৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ। হিন্দু কবিদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত ও রবীন্দ্রনাথ কাব্যবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গীত বিদ্যাতেও দক্ষ ছিলেন, কাব্যছন্দ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে গীত-ছন্দে পণ্ডিত ছিলেন মুসলিম কবিদের মধ্যে নজরুল, গোলাম মোস্তফাও তা ছিলেন। তারপর গীতি-কবিতার বা লিরিকাল পোয়েট্রি বা কাব্যের যুগ পার হয়ে যখন সঙ্গীত বিক্ষুব্ধ কাব্যের যুগ শুরু হল, কবিতার বিশেষ মিল ও ছন্দ মিলযুক্ত কবিতার পরিবর্তে গদ্য কবিতা, পয়ারও অমিত্রাক্ষর যুক্ত কবিতার প্রাবল্য বৃদ্ধি পেল সেই আধুনিক নামধারী কবিতা থেকে ক্রমে গীতি-লালিত্য বর্জিত হতে শুরু করল। জীবনানন্দ দাস, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, সমর সেন, প্রেমেন্দ্র মিত্ররা যে কবিতা লেখা শুরু করলেন তা থেকে সঙ্গীত ছন্দের প্রায় নির্বাসন ঘটল। এ গীতি-লালিত্য বর্জিত কবিতার চর্চা শুধু ত্রিশের দশকে সীমাবদ্ধ থাকেনি তা চল্লিশ দশক থেকে শুরু করে পরবর্তী দশকগুলোতে সংক্রমিত হলো।

ত্রিশের দশকে গ্রামোফোন কোম্পানির কুঠরীর মধ্যে নজরুল ইসলাম সঙ্গীত সাগর সৃষ্টিতে যখন মগ্ন তখন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিরা সঙ্গীত-লাবণ্য বর্জিত আধুনিক গদ্যধর্মী কবিতা লেখায় ব্যাপৃত। নজরুল ইসলামের সঙ্গে সাহচর্য দিয়ে চলেছিলেন তখন জসীমউদ্‌দীন, বন্দে আলী মিঞার মত দু'একজন কবি। তখনও গোলাম মোস্তফা মাঝে কবিতার সঙ্গে স্বল্প সংখ্যক গীতি কবিতা বা গান লিখেছেন। আর এঁদের সঙ্গে যুক্ত হলেন কবি গীতিকার আজিজুর রহমান এবং সাঈদ

সিদ্দিকীদের মতো স্বল্প ভাণ্ডারী প্রতিভার অধিকারীরা। বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক শুরু হলো। কিন্তু তেমন উঁচুমানের সঙ্গীত-স্রষ্টা হিসেবে কোন প্রবল প্রতিভা চোখে পড়ল না। এ দশকের শ্রেষ্ঠ কবি ফররুখ আহমদ। তিনি গীতিকাব্য লেখার ভার স্কন্ধে নিয়েছিলেন কি?

এ কথা ত অসত্য নয় যে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলা, রজনীকান্ত সেনের মতো জন্ম সঙ্গীত প্রতিভা নিয়ে জন্মাননি। এমনকি গোলাম মোস্তফা যেমন পেশাদার কণ্ঠশিল্পীদের মতো ওস্তাদের কাছে গান শিখেছিলেন ফররুখ আহমদ তা করেননি কিন্তু চাকরির চাহিদা এবং সহজাত কাব্য-প্রতিভার বদৌলতে তিনি অসংখ্য গান লিখেছেন। যেমন গান লিখেছেন তাঁর সমকালীন সিকান্দার আবু জাফর, তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের আবু হেনা মোস্তফা কামাল ও ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। ফররুখ সঙ্গীতবিদ না হলেও তিনি চিত্তাকর্ষক অনেক গান রচনা করেছেন– যা একই সঙ্গে কবিতার ভাবসম্পদে উত্তীর্ণ গান বললে তা অত্যুক্তি হবে না। আর গান শুধু বিপ্লব বোধক, দেশাত্মবোধক, জাগরণীমূলক, ভক্তিমূলক গানই নয়, নয় শুধু ইসলামী গান–তার মধ্যে রোমান্টিক প্রেমের গানও আছে। তবে ইসলাম প্রচারধর্মী গান ও হাম্‌দ, নাত ও মুনাজাতের রস মিশ্রিত তাঁর গানগুলো যে উৎকৃষ্ট কাব্যগীতির উদাহরণ তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর এ ইসলামী চরিত্রের; ইসলামী আদর্শে মথিত কয়েকটি গানের উদ্ধৃতি আমার বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করবে। কয়েকটি উদাহরণ :

**হাম্‌দ**

১. সকল তারিফ তোমার খোদা, –তুমি যে পাকজাত,
মুহাম্মদের স্রষ্টা তুমি এ তব সেফাত ॥
চাঁদ সেতারা হয় না শুমার,
তামাম আলম সৃষ্টি তোমার,
সৃষ্টি তুমি করেছ রব
তামাম মখলুকাত ॥
(মাহফিল)

২. তুমি ছাড়া মাবুদ কেহ ইবাদতের যোগ্য নয়,
আসমান আর জমিনে যা তোমার কাছেই নত হয়,
অশেষ কৃপার অঝোর ধারা;- তোমার রহম চায়
নিখিল তোমার সৃষ্টি দেখে তোমার প্রমাণ পায় সবে!
লাগে না আর প্রমাণ মাবুদ : লা ইলাহা ইল্লাহ্...
(ঐ)

**নাত**

১. তুমি যে রূহ্ মখলুকাতের

"আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"
রাহবর যে সত্য পথের,
আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"...
সেই লা-শরিক আল্লাহ্ যিনি,
যিনি ছাড়া নাই ইলাহ্
বান্দা তুমি সেই মাবুদের,
আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"...
তাঁরি কানুন মানো তুমি
বিশ্ব ধরার রব যিনি,
রাসূল তুমি আল্লাহ্ পাকের,
"আবদুহু ওয়া রাসূলুহু?
কোরান তোমার মোজেজা আর
বোরাক তোমার হয় বাহন,
জানাও কালাম আল্ কুরআনের,
আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"।

(ঐ)

**নামাজ**

১. ওঠ ওঠ, নামাজ পড় হে নামাজী!
অলস থেকে কেন হবে বে-নামাজী ॥
নামাজ কায়েম করো ধরায়
জান্নাতের শান্তি ছায়ায়,
এমন সুযোগ ছাড়ো হেলায়
কে নামাজী?

(ঐ)

২. ওরে গাফিল করিস নে তুই
নামাজে আর শিথিলতা,
নবীর অনুগামী মনে
রাখিস নবীর শেষ বারতা ॥

(ঐ)

৩. নামাজ পড় জামাতে ভাই
কাটবে তোমার আঁধার রাত,
নতুন করে লেখা হবে
ভাগ্য লিপি এই বরাত ॥

(ঐ)

মুনাজাত

১. তোমার মত দরদী আর দয়াল, দাতা নাই মাবুদ
সবাই যখন দেয় সরিয়ে দাও যে তুমি ঠাঁই মাবুদ ॥
কালের ধারায় সবই হারায়, একলা তুমি অচঞ্চল
দাও করুণা, বিলাও দয়া; –তোমায় ডাকি তাই মাবুদ
রং ধনু রঙ ঝিলিমিলি, –এই দুনিয়া বঞ্চনার;
সব ছেড়ে তাই তোমার পথে, তোমার দিকে যাই মাবুদ
(ঐ)

২. 'রহমান' নাম প্রভু তোমার, কেন আমি নিরাশ হবো?
তোমার দয়া অশেষ অপার, কেন আমি নিরাশ হবো?
তোমার রহম দুই জাহানে
সংখ্যা শুমার কেউ না জানে,
বান্দা যত হই গুনাহগার; কেন আমি নিরাশ হবো?
সব কিছু দাও মহান দাতা
তুমি সকল বিপদ ত্রাতা,
দাও নামিয়ে সব গুরুভার;
কেন আমি নিরাশ হবো?
(ঐ)

বলাবাহুল্য ফররুখ আহমদের ছিল একটা শৃঙ্খলাধর্মী, শৃঙ্খলাপ্রেমী মন। একটি পরম লক্ষ্য সামনে রেখে তিনি এগিয়ে চলেছেন। তাঁর ইসলামী কবিতাতেও সে উদ্দেশ্যটি বিচলিত হয়নি। সে জন্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত তাঁর "মাহফিল" গীতিগ্রন্থের গানগুলোকে পরিকল্পিতভাবে সাজিয়েছেন। এ ক্ষুদ্র গীতিগ্রন্থকে তিনি দু'খণ্ডে ভাগ করেছেন। ১ম খণ্ডে আছে হামদ, না'ত ও জেহাদী জাগরণধর্মী গান। আর ২য় খণ্ডে আছে জাগরণ, জেহাদ ও মুনাজাতধর্মী কবিতা। গোটা বইটা একটু মনোযোগী হয়ে দেখলে বোঝা যাবে ফররুখ একটি অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে চেয়ে সকলকে সেই দলে শরীক হতে আহ্বান করেছেন। মুসলিমদের সাংস্কৃতিক পরিচয়টাও যাতে এ গানের মন্ত্রে দীক্ষিত হয় সেদিকেও তাঁর লক্ষ্য ছিল। তবে কবিতায় ও কাব্যে তাঁর যে অসামান্য মৌলিকতা আমরা দেখেছি তাঁর গানে সে সুধার আবে ততটা মাধুর্য ও ঔজ্জ্বল্য নিয়ে প্রকাশিত হয়নি। অবশ্য এরই মধ্যে মুসলিমদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রূপায়িত করতে তিনি পিছু হটেননি। সেজন্যে নামাজ, জুমার নামাজ, ঈদ, মুহার্রম ইত্যাদি বিষয়কেও তিনি গানের কাঠামোয় ধরতে দ্বিধা করেননি। কয়েকটি গানের উদ্ধৃতিতে এটা স্পষ্ট হবে–

**জুমা**

এল জুমার দিন যে ফিরে
এল জুমার দিন!
এ দিন আসে জাগিয়ে দিতে
সত্য পথের চিন্ ॥

**মুহার্রম**

মুহার্রমের চাঁদ উঠেছে হিজ্‌রী সনের খবর নিয়ে।
চাঁদ উঠেছে ধরার নভে দূর গগনের খবর নিয়ে ॥
অশান্ত এ যুগ জামানা, অশান্ত এ জিন্দেগী,
চাঁদ উঠেছে শান্তি, প্রীতি, শুভক্ষণের খবর নিয়ে ॥
বন্দী বিবেক, বিকৃত মন, এই শতকের জিন্দানে,
চাঁদ উঠেছে মুক্ত বিবেক, সুস্থ মনের খবর নিয়ে ॥
ভ্রান্ত মনের আফিম নেশায় রইবে কে আর ঝিমন্ত,
চাঁদ উঠেছে কা'বার পথে জাগরণের খবর নিয়ে ॥
(ঐ)

**ঈদে মিলাদুন্নবী**

মরুর হাওয়া জানায় এসে, "ঈদে মিলাদুন্নবী"
কুল মখলুক বলে হেসে, "ঈদে মিলাদুন্নবী।"
(ঐ)

**জেহাদ**

১. ও তুই-জেহাদী মাঠ দ্যাখ মুজাহিদ
ঐ জেহাদের ডাক আসে!
মরণ নদীর তীরে অধীর
জিন্দেগানীর বাঁক আসে ॥
ধসিয়ে দিতে আবরাহার
মিথ্যা জুলুম অত্যাচার
খোদার ফউজ আসে যেমন
আবাবিলের ঝাঁক আসে ॥
ওরা তাকায় না কেউ পিছন পানে
চলে কেবল সম্মুখে,
সকল বিপদ বাধার পথে
ওরা- যে ভাই যায় রুখে।
যত- অত্যাচারের ছিঁড়তে টুঁটি

ওরা- মানে না কেউ ভয়- ভ্রূকুটি,
লাখ মুজাহিদ হ'লে শহীদ
আবার যে ভাই লাখ আসে ॥
(মাহফিল)

২. এই- জেহাদী জিন্দেগী ভাই
জেহাদ করো ফের।
যারা- জেহাদ দেখে যায় পিছিয়ে
যায় পথে পাপের ॥
মিথ্যাবাদী এত যে জন
জেহাদ দেখে পালায় সে জন,
চিরন্তনী ভূমিকা যে
ঐ মুনাফিকের ॥
খোদার প্রিয় বান্দা যারা
এই পথে ভাই এস তারা,
রাখো সুনাম, সম্মান
নবীর উম্মতের ॥
সেই মালেকুল মুলক যিনি
পূর্ণ বিজয় দেবেন তিনি,
তাঁর অভয়ে নাই তা বারণ
হতাশা ভয়ের ॥

৩. শোন মুজাহিদ! শোন জেহাদের
ঝাণ্ডা যেন রয় উঁচা,
ও তোর জান যায় যাক, দ্বীন ঈমানের
ঝাণ্ডা যেন রয় উঁচা ॥
জানের বদল পাবিরে তুই
চিরকালের জান্নাত ভুঁই,
খোদার নামে কসম নে ফের
ঝাণ্ডা যেন রয় উঁচা ॥
কি লাভ করে, বেঈমানী
মিথ্যাকে চল্ আঘাত হানি,
শোন, হুঁশিয়ার নবীর পথের
ঝাণ্ডা যেন রয় উঁচা ॥
বে-ঈমানী করার কুফল

জিন্দেগানী হবে বিফল,
পাবি সুফল দুই জাহানের
ঝাণ্ডা যেন রয় উঁচা ॥
(ঐ)

**মুনাজাত**

আরজু আমার শোন খোদা
শোন অবিরত,
এই জীবনের মালা থেকে
আর একটা দিন পড়লে খসে
ঝরা ফুলের মত ॥
সত্য পথে জিন্দেগী যার
মরণ পরায় সাতনরী হার
সফলতার দ্বারে,
হাজার ভুলের কালি নিয়ে
দিনগুলি মোর যায় হারিয়ে
রাতের অন্ধকারে,
পাই না আমি পথের দিশা
কালো ছায়ায় বেড়াই ঘুরে যত ॥
নাইতো হিসাব নিকাশ যে নাই
তাই তো শুধু তোমায় জানাই
ওগো দয়াল প্রভু
সকল পাপের গ্লানি থেকে
আলোর পথে নাও গো ডেকে
তোমার দয়ায় রাখো ঘিরে তবু
সত্য পথের দাও ইশারা
পাপের ছায়ায় হই না যেন নত ॥

উল্লেখ্য, ফররুখ আহমদ মূলত কবি, কিন্তু সে সঙ্গে তিনি ছিলেন ইসলামী আদর্শ ও দর্শনের অবিমিশ্র অনুসারী। তিনি বলেননি বটে, নজরুলের মতো, 'হবে দুনিয়াতে আবার ইসলামী ফরমান জারি।' কিন্তু তাঁর সমগ্র জীবন ছিল ইসলামী আদর্শে ও দর্শনে যেমন সমর্পিত তেমনি সেই আদর্শ প্রতিষ্ঠায় উৎসর্গিত। উপরে যে গানগুলোর উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তার মধ্যেই ইসলাম সম্পর্কে তাঁর উৎসাহী, আগ্রহী মানসের পরিচয় ফুটে ওঠেছে। কিন্তু তাঁর গীত-উৎসাহী মানসিকতা কেবলমাত্র ইসলামী গানের মধ্যে একশ ভাগ সীমাবদ্ধ ছিল না। এর একটি সুন্দর প্রমাণ তাঁর

"সাকী নামা"। ১৯৮৬ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাপ্তাহিক পত্রিকা "অগ্রপথিক"-এ এ গীতিকাব্যটি প্রকাশ করি। সম্ভবত তাঁর পুত্র আহমদ আখতার "অগ্রপথিক'-এ প্রকাশের জন্য দিয়েছিলেন। ১৯৮৬-এর "অগ্রপথিক"-এর ১ম বর্ষ ২১ সংখ্যা (ফররুখ স্মরণ সংখ্যায়) এটি প্রকাশিত হয়। এ গীতি বিচিত্রার একটি শীর্ষটিকায় ফররুখ লিখেছিলেন– 'রহস্যসন্ধানী প্রাণ জীবনের অফুরন্ত সফরে আবিষ্কার করে এক আশ্চর্য সুন্দর দেশ। সেখানে সে শোনে ফুল, পাখী, সবুজ পরী আর মুসাফিরের কণ্ঠে জীবনের মূল সুর-প্রেমের অশেষ আকৃতি। কিন্তু ক্ষণিকের বর্ণবিভা মুছে যায়; ক্ষণস্থায়ী প্রেম ঝরে পড়ে। জীবনের শেষ সফরে রহস্যজ্ঞানী প্রাণ খুঁজে পায় অনন্ত রহস্যের মূল। শাশ্বত সময় আর চিরন্তন প্রেম।"

এরপর পনেরটি গানে তিনি তাঁর মানসচিন্তাকে রূপায়িত করেন। 'প্রস্তাবনা' দিয়ে শুরু করে এখানে তিনি 'মুসাফিরের গান', 'পরীর গান', 'কবির গান', 'রহস্য সন্ধানীর গান, 'বুলবুলের গান', 'গোলাবের গান', 'সবুজ পরী ও গোলাবের গান', 'গোলাব ও তারার গান',-এর মাধ্যমে এক পরিব্রাজকের জীবনদর্শনকে উপস্থাপন করেছেন। ১৫ নং গানটি বা সর্বশেষ গানটি 'রহস্য জ্ঞানী পথিকের গান' দিয়ে শেষ করেছেন। যে প্রেম নারী প্রেম দিয়ে শুরু হয়েছিল আল্লাহ প্রেমে তার সমাপ্তি ঘটেছে। যাকে তিনি বলেছেন 'শাশ্বত সময় আর চিরন্তন প্রেম। এখানে ঐসব গানের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে বিষয়টির সংক্ষিপ্ত পরিচয় বোধ হয় কৌতূহলী পাঠকের জন্য উত্তম হবে। 'প্রস্তাবনা'য় কবি লিখেছেন–

কবে দূর ইরানের
গোলাব কানন
শুনেছিল সাক্ষী তব কল-প্রক্ষণ ॥
চঞ্চলা হরিণীরে
মরু পথে খুঁজে ফিরে
আঙুর বনের হাওয়া
হ'ল উম্মন ॥
রুবাই, গজল লিখে
খুঁজে ফিরে দিকে দিকে
হাফিজ, উমর, জামী
আকুল নয়ন ॥

তারপরে মুসাফিরের গান। মুসাফিরের কণ্ঠে কবি বলছেন–

শূন্য এমন কানন পথে
খোঁজে তোমার পায়ের চিন্,
বন এবার কি দিয়ে সেই
শূন্যতারে তা কি আমার!

এরপর পরীর গান। সে গানে ফুটে উঠেছে অনুসন্ধিৎসু মনের রহস্য জিজ্ঞাসা। পরী বলছে–

খুঁজে ফিরি শুধু কোথায় পোশাক
হারানো গান,
বেঁধেছে আমাকে জিঞ্জিরে এক
আশিক প্রাণ ॥
বাঁধন কাটিতে পারি না হায়,
কাটে মোর দিন পথ চাওয়ায়,
বুলবুল সনে কাঁদিয়া হায়
-নয়নে নীর ॥
স্বাপ্নিক আশাবাদী কবি গেয়ে ওঠেন—
তোমার শারাব জাম যদি মোর
কণ্ঠে চলো সাকী,
নও বাহারে উঠবে রেঙে
মরণ বৈশাখী ॥
রুকনাবাদের তীরে আবার
তরুণ প্রেমিক মজাবে তার
প্রিয়ারে নও চাঁদের তাজে
তারার মানায় নাকি ॥

তারপরে 'রহস্যসন্ধানী'র গান'-এ কবি তার কামনার মুখোশ উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন এই বলে—

কেন জাগাও সুরে ছোঁওয়ায়
রক্ত গোলাব দিলরুবা!
যায় মিশে হায় পথের ধুলায়
রঙিন এ খাব্, দিলরুবা ॥
মুখর ছিল কে মনা
তোমার বন ভবন ঘিরে
জাগালে হায় সম্মুখে তার
রাতের বেলার দিলরুবা ॥

শেষ গানটি 'রহস্যজ্ঞানী পথিকের গান'। কবি নিজেও যে আত্মার রহস্যসন্ধানী ছিলেন সেটিও তিনি এ কাব্যের সমস্ত গানের সঙ্গে এ গানটিতে উন্মোচন করেছেন। সমগ্র গানটিই এখানে উদ্ধৃত করলাম—

দাও মুছে এই ঝর্ণা চপল
সুরের আসর সাকী আমার ॥

তোমার রূপের ধ্যানে এবার
করো বিভোর সাকী আমার ॥
নিঃশেষে হায় যায় ফুরায়ে
যেরূপ লেখা দিনশেষে
দাও মুছে সেই রূপের খেয়াল
সেই আঁখি ঘোর, সাকী আমার ॥
দাও মুছে এই ক্ষণ দ্যুতির
চমক লাগা মনো-বিলাস,
চিরন্তনী রূপের সাথে
দাও বেঁধে ডোর, সাকী আমার ॥
পিয়াসী দিল আরশি চাহে
নিত্য তোমার রূপ ছবি
কর গোষ মন মুকুরে এই
রজনী তোর,
সাকী আমার ॥
যে রূপ দেখে মেটে না সাধ
অনন্তকাল সেই রূপে
বিভোর হয়ে রইবে অধীর
চিত্ত চকোর সাকী আমার ॥

এ গীতি-কাব্য সংকলনে ফারসি কাব্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে সেই সাথে তার রূপকল্পের। কিন্তু সেই সাথে আরও কিছু গভীর বক্তব্যের দিকে কবি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। এবং সমাজোর্ধ্ব মানুষের ব্যক্তি জীবনের জিজ্ঞাসারও যে একটা বিশ্ব আছে সেই অদৃশ্য রূপ বিশ্বের দিক থেকে কবি যে তাঁর দৃষ্টি সরিয়ে নেননি সেটা এ "সাকী নামায় ফররুখ দেখিয়েছেন। এটা পড়লে মনে হয় ফররুখের কাব্যে শুধু সমাজ সমস্যার চিন্তা ঠাঁই পায়নি, তাঁর মনোবনেও হরিণের সঞ্চরণ ছিল। যাকে দেখতে কবি তাই এ গান গেয়েছিলেন—

নীরব রাতের মহফিলে তাই
জাগি তারি পথ চেয়ে
আন্‌বে প্রাণের সুর যে পাখায়
বিরান আমার গুল্‌শানে ॥

এখানে আমরা যে প্রেমিক কবিকে দেখি তিনি শাশ্বত প্রেমের কবিও বটে। ◻

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ৮ম সংখ্যা, অক্টোবর, ২০০৩]

# শিশু-কিশোরদের কবি ফররুখ আহমদ ও প্রাসঙ্গিক স্মৃতি

আহমদ-উজ-জামান

১০ জুন বাংলা সাহিত্যের মুসলিম ঐতিহ্যানুরাগী শ্রেষ্ঠতম কবি ফররুখ আহমদের জন্মদিন। ১৯১৮ ঈসায়ী সালে যশোর জেলার মাঝআইল গ্রামে সম্ভ্রান্ত এক সৈয়দ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম খান সাহেব সৈয়দ হাতেম আলী। সে হিসাবে ফররুখ আহমদের পুরো নাম হবে সৈয়দ ফররুখ আহমদ। তাঁর মাতা সাহেবার নাম বেগম রওশন আখতার। কবি ফররুখ আহমদ তাঁর নামের সঙ্গে সৈয়দ লিখতেন না। কেন লিখতেন না, তা জানা যায়নি। তাঁর পূর্ণ জীবনীগ্রন্থ এখনও লেখা হয়নি। তাঁর আত্মজীবনীর কথা ভাবাই যায় না। তিনি আতশী কবি ছিলেন। নিজ জীবনের কথা তো দূরের কথা, তাঁর জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্মৃতিকথা জানতেও অনুসন্ধিৎসুদের সাহস হতো না। তাঁর দুই চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকানো যেত না। দুই চোখ দিয়ে আতশী আত্মার আগুন ঝলকাতো।

কবি ফররুখ আহমদ শিশুদের জন্য অনেক কবিতা রচনা করেছেন। শিশুদের হাসি পাক-পবিত্র ও নির্মল, এটা তাঁর বিশ্বাস ছিল। শিশুদের নিয়ে লেখা তাঁর একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল 'লায়লাতুল বরাত,' হিজরি ১৩৮৯ সনে। ঈসায়ী সন ১৯৬৮। আজ থেকে ৪৩ বছর আগে, বাংলা সাল হবে ১৩৭৫, প্রকাশক ছিলেন মহিউদ্দিন আহমদ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৭নং জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা-১। মূল্য ছিল তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা। বইটির শিশুতোষ ইলাসট্রেশন করেছিলেন শিল্পী রফিকুন নবী। বইটি কবি তাঁর পাঁচ শিশু সন্তান আখতার, বাচ্চু, মন্নু, তিতু ও টিপুকে উপহার দিয়েছিলেন, আব্বা বলে। এরা এখন শিশু নয়। শিশুদের আব্বা কিংবা দাদাজান হয়ে গেছে। বেদনাময় দুনিয়া থেকে দু'জন তারুণ্যের প্রভাতেই ঝরে গিয়েছিল। বইটিতে সূচিপত্র অনুযায়ী পাঁচটি বিভাগে যথা; নতুন লেখা(১৩), রং তামাশা (১৪), সবুজ নিশান (৮), কিসসা শোনার সন্ধ্যা (৩), রাসূলে খোদা (৯) মোট ৪৭টি কবিতা ও ছড়া রয়েছে। ঘন নীল কালিতে ছাপা। নতুন লেখার তেরটি কবিতায় বাংলাদেশের প্রকৃতির মিষ্টিমধুর জলরঙের বর্ণনা রয়েছে। রং-তামাশায় শিশুমনের বিচিত্র কৌতূহল-উদ্রেককর কথা আছে। সবুজ নিশানে-নৈতিক পবিত্র আদর্শের অনুপ্রেরণা রয়েছে। কিস্সা শোনার সন্ধ্যায় আছে রূপকথার মায়াজাল। আরব্যরজনীর আদলে রাসূলে খোদা অংশে আছে- রাসূলুল্লাহ্ (সা:)-এর মক্কা-মদিনার পবিত্র পুষ্পসুবাস, নুর নবীর শৈশবের কথা। বিশ্বাস ও ঈমানের চেরাগ।

কবি ফররুখ আহমদ শিশুসাহিত্যে এসব কবিতা ও ছড়ার সৃষ্টিতে এ দেশে ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর কবিতায় যে বৈশিষ্ট্য তাঁকে অমর করে রেখেছে তা সৃষ্ট উপমা, মেঘডুম্বুর ছন্দ ধ্বনি, দীপ্তিময় শব্দ ও আত্মগত রূহানি নূর। শিশুদের কবিতায় তিনি

ছাপ রেখেছেন শিশুতোষ হৃদয়ের সহজ-সরল কল্পনা-রাজ্যের কথার ঝলমলে মণি-মাণিক্যে। ছড়া ও কবিতায় বাংলাদেশের ঋতু-বৈচিত্র্য ফুটেছে অপূর্ব সুগন্ধে–মেঘ বৃষ্টির ছড়া, বৃষ্টির ছড়া, পয়লা আষাঢ়, বর্ষার গান, ইল্‌শেগুঁড়ি, শ্রাবণের বৃষ্টি, শরতের সকাল, হৈমন্তী সুর, পউষের কথা– প্রতিটি ছড়ায় বাংলা ঋতু-

'খোশবু ছড়ায় বনে বনে
ফুলের আতরদানী',
বর্ষা শেষে শরৎ এলে
'ঝিলমিল, ঝিলমিল, নীল
পরীদের ঐ মনজিল।'
শরৎ শেষে হেমন্ত এলে
'হিম শির শির হেমন্ত মাঠ
কাঠুরিয়া যায় কেটে কাঠ
রাত্রিশেষে ঝলমলে দিন
বেড়ায় মাঠে সোনার হরিণ'
হেমন্তের শেষে 'উত্তরা বায়
এলোমেলো পউষ এলো।
পউষ এলো
হিমেল হাওয়ায় শির শিরিয়ে,
এল অচিন সড়ক দিয়ে, ...

'ছড়ার ছন্দ ও ধ্বনি সুমধুর, কল্পনার রাজ্য সুবিস্তৃত... পাখিদের ছড়ায় আছে শৌখিন পাখি, শ্রমিক পাখি, শীতের পাখি, পাখির, ঝাঁক, পাখি শিশুদের প্রিয়, সেই কৌতূহলী শিশুমন নিয়ে এমন রূপালী ছড়া শিশুচিত্তকে নাড়া না দিয়ে পারে না–

'কাদা খোঁচা পাখি ভাই খায় কাদা খুঁচে
দিন শেষে পাখনার কাদা যায় মুছে...
'পাখিদের ছড়া শেষে এসেছে;
মাঘের শীতে, মাঘ আসে,–
'আবছাড়া কুয়াশার পাখা
ঢেকে ফেলে আসমান কালি ঝুলি মাখা...
আসে ফাল্গুনে শুরু হয় গুণ গুণানি
ভোমরাটা গায় গান ঘুম ভাঙানি

শেষে আসে চৈত্রের কবিতা :

চৈত্র এল ফাগুন শেষে/ভয়ের সাড়া পড়ল দেশে/রঙিন পালক ধুলোয় ছুঁড়ে/দূরের পাখি পালায় উড়ে..... ।

কবি ফররুখ আহমদ তাঁর ছড়া নির্মাণে অন্তমিল রেখেছেন শক্তিশালী ছন্দ জ্ঞানে। ছড়া বলে দুর্বল পাংশু বর্ণের এলোমেলো ভাবচিন্তা নেই। শব্দ যেমন কমনীয়,

তেমনি দৃঢ়। তাঁর নিজ পবিত্রগুণের ঋজুতা ও দৃঢ়তা রয়েছে ছড়া ও শিশু কবিতার ছন্দে ও ভাবে। সবচেয়ে বড় কথা তাঁর ছড়া কবিতা, কৌতূহল, সবই উজ্জ্বল আল্লাহ রাসূলের বিশ্বাসেঃ

'আমিনা মায়ের কোলে এলেন নবী/আঁধারে জাগলো যেন ভোরের রবি/আল্লাহর রহমত এল জাহানে/দুনিয়াটা পেল যেন ভরসা প্রাণে

কবি ফররুখ আহমদ তৎকালীন ভারত ভাগ হয়ে গেলে পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসার পর ঢাকা বেতারে স্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে চুক্তিবদ্ধ কর্মে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। যে আজাদীর জন্য জান কোরবান করে সংগ্রাম করলেন, বাস্তবায়নের পর নিকটজন বৈরী হলেন, তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের কাছে ব্রাত্য হলেন, জিন্দেগির কাব্যিক রৌশন চলে গেল। দারিদ্র্যকে গ্রহণ করা যায় আল্লাহর নিয়ামত হিসেবে, কিন্তু উপেক্ষা? রেডিও পাকিস্তান তথা ব্রিটিশ অল ইন্ডিয়া রেডিও'র স্থপতি মহাপরিচালক (ডিজি) এসএ বোখারী পাক-ভারত উপমহাদেশের সার্ভিসের কিংবদন্তি পুরুষ কী পাস, অর্থাৎ তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা কী ছিল? জীবন শুরু করেছিলেন ভারতের ইংরেজ ফৌজবাহিনীর শিবিরে সৈন্যদের উর্দু ভাষা শিক্ষাদানের মাধ্যমে, তিনি ছিলেন নন-ম্যাট্রিক। ঢাকা বেতার-কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক, পরে দেশ স্বাধীন হলে হলেন মহাপরিচালক (বাংলাদেশ বেতারের অর্গানোগ্রামে) সর্ব উচ্চপদ রাখা হয়েছিল 'পরিচালক'-(ডাইরেক্টর) অর্থাৎ ডাইরেক্টর হলেন আশরাফ-উজ-জামান খান। তিনি নন-ম্যাট্রিক ছিলেন। কবি ফররুখ আহমদ তৎকালীন ক্যালকাটা রিপন কলেজ থেকে আইএ পাস করেছিলেন। স্কটিশ চার্চ কলেজ ও সিটি কলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছেন, তবে ডিগ্রি (গ্রাজুয়েশন) নেননি। তাঁর ইংরেজি ভাষা স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রখরতায় নির্মিত ছিল। ডিজি (অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে) থেকে আর, ডি (রিজিওনাল ডিরেক্টর–তথা মহাপরিচালক) পর্যন্ত বেতারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন কলাবিদ্যার শক্তিতে। তাহলে ফররুখ আহমদ আইএ উত্তীর্ণ প্রখ্যাত কবি হয়ে ঢাকা কেন্দ্রে প্রথমে ক্যাজুয়াল চুক্তিতে আর্টিস্ট-শিল্পীকর্মী, পরে বার্ষিক স্টাফ আর্টিস্ট নিযুক্ত হন কোন যুক্তিতে? তিনি কি বাংলা, ইংরেজি, ফার্সি, আরবি, উর্দু জানতেন না? তিনি যে ইংরেজি জানতেন তা তখনকার ঢাকা কেন্দ্রের উচ্চপদের অধিকারিক জানতেন না। সবাই জানত পাতলা শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখের, কালো শেরওয়ানি পরা ব্যক্তিটি বড়জোর আরবি পর্যন্ত জানে।

তাঁর ছড়া বইয়ে 'অদ্ভুত সংলাপ' নামে একটি ছড়া আছে;

'একটা মানুষ ছিল শুধু করত যে সাজসজ্জা,
অন্য কোনো কাজে সে ভাই পেত যে খুব লজ্জা,
লেবাসটাকে ভাবত সে তার শরাফতের অঙ্গ
মানুষ কেন তাকে নিয়ে করছে এমন রঙ্গ?

অন্য এক ছড়া শেখ সাদীর অনুসরণে লেখা, নাম 'বিচিত্র অভিজ্ঞতা :

কায়দা আদব শেখার কথা

ভেবে যারা হয়রান
পাচ্ছে না ঠিক পথের দিশা
দেখছে ফাঁকা ময়দান

এর পরের পঙ্ক্তিতে জ্ঞানী লোকমানের কথায় বলেছেন–

বে আদবের কাছে আদব
শিখি আদম-সন্তান
কয় যে কথা, করে যে কাজ
আদব হারা অজ্ঞান
বুঝেসুজে সেসব আমি
বাদ দিয়ে যাই সজ্ঞান

কমজোর দিলের এই শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনকারীকে এক সাদা কাগজে লিখেছিলেনঃ ওয়া তাম্মাত কালেমাতু রাব্বেকা–ছেদকাও ওয়া আদলা লা মুবাদ্দেলা লে কালেমাতিহি ওয়া হুওয়াছ ছামিয়োল আলিম (সূরাঃ আনয়াম, ৮ম পারা, ১১৫ আয়াত)। তারপর লিখে দিলেন এর তরজমা ইংরেজিতেঃ The word of thy lord/ doth find its fulfillment/in truth and in justice/non can change his words/ for he is the one who/heareth and knoweth all.– যখন এই পবিত্র কথাগুলো লিখে দিয়েছিলেন, তখন তাঁর ওপরে জালিমের জুলুম ঝঞ্ঝার মতো বয়ে যাচ্ছিল (১৯৭২ সালঃ বাংলাদেশ বেতার বাণিজ্যিক কার্যক্রম অফিস, ১১৬ বেইলি রোড, ঢাকা)। বেতন বন্ধ ছিল, স্টাফ আর্টিস্টের আর্থিকভাবে পাওয়া টাকাকে 'বেতন' বলে না। বলে রিমিউন্যারেশন (Remuneration) বা পারিশ্রমিক। তিলে তিলে ক্ষয় হচ্ছিলেন পূর্ণিমার চাঁদ।... কবি ফররুখ আহমদ তৎসময়ের মাসিক দিশারী সাহিত্যপত্রে (১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা আষাঢ়- ১৯৬০, শ্রাবণ-১৩৬৭, ছফর-১৩৮০)। আল্লামা ইকবালের 'কর্ডোভার মসজিদ' পরিমার্জিত করে ছাপছিলেন। তাঁর নিজ হাতে প্রুফ কবি ওই পত্রিকার ৪ পৃষ্ঠার পরে ৮×৫.৫ সাইজের নিউজপ্রিন্টে সংযুক্ত ছিল। এই লেখককে তিনি কী মনে করে তা দিয়েছিলেন, মনে নেই। তাঁর নিজ হাতে কবিতার যে পরিমার্জন করেছিলেন সেই মূল পাণ্ডুলিপিটিও দিয়েছিলেন। তবে ওই পাণ্ডুলিপিতে সম্পূর্ণ কবিতার পুনর্মাজন ছিল না। দীর্ঘ তিন স্তবকের পর চতুর্থ ছ'লাইন পর্যন্ত ছিল। খুব সম্ভব পত্রিকাটির অক্ষর পরীক্ষা (প্রুফ রিডিং) করে দেয়ার জন্য দিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস লাভ করা আমার রুগ্ন জ্ঞানের দ্বারা সম্ভব ছিল না। তবু পেলাম। কিন্তু তাঁকে ফেরত দিতে পারিনি... (তার ওয়ারিশ চাইলেই সবিনয়ে তাঁর হাতে ফেরত দিয়ে আমি দায়িত্ব মুক্তির অপেক্ষায় থাকলাম): পৃথিবীর তিনজন খ্যাতনামা কবির শেষকাল মানুষকে আজও ভাবায়। পারস্যের বিখ্যাত মহাকাব্য 'শাহনামা' রচয়িতা ফেরদৌসী রাজরোষ এড়াতে আফগান সীমান্তের এক পল্লীতে গিয়ে লুকিয়েছিলেন। বেঈমান বাদশা তাঁকে প্রতারিত করেছিল। ভগ্ন-হৃদয়ে অজ্ঞাত গ্রামে মৃত্যুবরণ করেন। হিন্দুস্থানের শেষ মুঘল বাদশা নিজ দেশে দাফনের জন্য

সাড়ে তিন হাত জায়গা পাননি। নির্বাসিত অবস্থায় মগের দেশে সমাধিস্থ হয়েছিলেন। বাংলাদেশের 'সাত সাগরের মাঝি'র অমর কবি ঢাকায় তাঁর অকাল মৃত্যুর পর সাড়ে তিন হাত ভূমি পাননি দাফনের জন্য। কবি বেনজীর আহমদ তাঁর এস্টেটের মসজিদ প্রাঙ্গণে সাড়ে তিন হাত জায়গা দিয়েছিলেন কবি ফররুখ আহমদকে দাফন করতে। এক কবি আরেক কবিকে এটুকু দয়া প্রদর্শন করে জাতির কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকলেন।

শাহ্জাহানপুরে রেলওয়ে কলোনি ছাড়িয়ে বাইলেনের (তখন বাইলেন নয়) এক রাস্তা ধরে সেই মসজিদ পরিসীমার মধ্যে গিয়ে পৌঁছালে ইমাম সাহেব একটি কবরের আকৃতি দেখিয়ে দেবেন। এঁটেল মাটি। ২০০৮ সালে ওই কবর জিয়ারত করতে গিয়ে দেখা গেল কবরটির চিহ্ন খুব স্পষ্ট নয়। বিলীয়মান। আরও দুটো কবর আছে। কবি বেনজীর ও তাঁর স্ত্রীর। ওখানে আর একটি কবর আছে। কেউ জানে না কার। সে কবর বিশিষ্ট লেখক, কবি ও সাংবাদিক ফজলুল হক সেলবর্ষীর (১৮৯৩-১৯৬৮)। সুনামগঞ্জ জেলার প্রতিভাবান লোক ছিলেন। কবি বেনজীর তাঁকেও তার নিঃস্ব অবস্থায় সেখানে সমাহিত করার ব্যবস্থা করেছিলেন। কবরগুলোর ওপর তৃণ-লতাগুল্ম নেই। মাটি বেশ শক্ত রুক্ষ। কবরগুলোর ওপরে গাছের ডালে পাখির বাসা আছে। ওই শক্ত ভূমির ওপরে তাদের মলত্যাগের চিহ্ন আছে। মনে হয় সাদা রং দিয়ে করা যেন কড়ি ফুল এঁকে রেখেছে। না, কবি ফররুখ আহমদের কবর পাকা করে মাজার নির্মাণ হোক, তা তিনি নিজে জীবিত থাকাকালে যেরূপ চাইতেন না, আমরা তাঁর গুণমুগ্ধরাও চাই না। তবে ওই শক্ত মাটি যেটিতে ফাটল ধরেছে তা ঘাস-মসৃণ, দূর্বাঘাসে ঢেকে রাখতে আপত্তি কি? ওই প্লটটা একটু সৌন্দর্যমণ্ডিত করে রাখলে মন্দ হতো না। ছোট্ট পাথরের ফলকে কবির নামটা খোদিত করে রাখলে আগামী প্রজন্ম দর্শন করতে গিয়ে দোয়া করতে পারত। মুঘল সম্রাট শাহজাহানের কবি দুহিতা জাহানারা বেগমের স্বরচিত একটি কবিতা তাঁর কবরে উৎকীর্ণ হয়ে আছে: 'একমাত্র ঘাস ছাড়া আর যেন কিছু না থাকে আমার সমাধির ওপরে, আমার মতো দীন অভাজনের সেই তো শ্রেষ্ঠ আচ্ছাদন' (দৃষ্টিপাত: যাযাবর)। ঠিক তেমনি এক ফালি সবুজ ঘাসের আচ্ছাদন!!

'কবি ফররুখ আহমদ যখন ঢাকা বেতার কেন্দ্রের 'কিশোর অনুষ্ঠান' পারিচালনা করতেন, এই লেখক তখন অনুষ্ঠানের প্রযোজক ছিলেন। কবি ফররুখ আহমদ যে অনুষ্ঠান ১৯৪৮ সাল থেকে একাধারে পরিচালনা করে আসছিলেন, ১৯৭২ সালে তা থেকে সরিয়ে তাঁর চুক্তিপত্র বাতিল করে পারিশ্রমিক বন্ধ করা হয়। চুক্তিপত্র বাতিল সম্পর্কে তাঁকে লিখিতভাবে না জানিয়ে তাঁর ইনক্রিমেন্টসহ রিমিউনারেশন বন্ধ করে দেয়া হয়। তাঁকে ঢাকা কেন্দ্রের অফিসে আসতে বারণ করা হয় এবং বেইলি রোডে কমার্শিয়াল সার্ভিসে হাজিরা দিতে হুকুম দেয়া হয়। কোনো কারণ না দর্শিয়ে তাঁর মানবিক অধিকার তথা নাগরিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়। লেখক তখন বেইলি রোডে কমার্শিয়াল সার্ভিসের সহকারী পরিচালক। কমার্শিয়াল সার্ভিসে কবির কোনো

কাজ ছিল না। তিনি বিজ্ঞাপন লেখক ছিলেন না। ওই সময় তিনি অভুক্ত অবস্থায় লাঞ্ছিত, বঞ্চিত ও অপমানিত হয়েছেন। ১৯৭৩ সালে নিবন্ধকার ঢাকা বেতার কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আঞ্চলিক পরিচালক পদে নিয়োজিত হলে কবি ফররুখ আহমদ কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালকের (ভারপ্রাপ্ত) মাধ্যমে তৎকালীন মহাপরিচালকের কাছে তাঁর দুর্দশার কথা জানিয়ে বেতন দানের আবেদন করেন। মহাপরিচালক তা মন্ত্রণালয়ে পাঠাননি। কবি দ্বিতীয় আবেদন করলে ভারপ্রাপ্ত আঞ্চলিক পরিচালক তা সরাসরি তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী মরহুম মিজানুর রহমান চৌধুরীর কাছে পাঠিয়ে দেন। কিছুদিন পর মন্ত্রী সেই আবেদন ভারপ্রাপ্ত আঞ্চলিক পরিচালকের বরাবরে পাঠিয়ে দেন। আবেদনের পার্শ্বে মন্ত্রী নিজ হাতে মন্তব্য লিখেছিলেন– 'তার বেতন দেয়া হোক'। যেহেতু এই বেতন দেয়া হবে মহাপরিচালকের পরিদপ্তর কর্তৃক, সেহেতু ভারপ্রাপ্ত আঞ্চলিক পরিচালক মহাপরিচালককে মন্ত্রী মহোদয়ের মন্তব্যের কথা ফোনে জানান। মহাপরিচালক বললেন, এখনই ওই আবেদনপত্রটি আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। তাই করা হলো। কিন্তু কবি ফররুখ আহমদের ভাগ্যে বেতন পাওয়া ঘটেনি। ১৯৭৩ সালের মে মাসে নিবন্ধকার সিলেট বেতার কেন্দ্রে নিজ থেকে ঢাকা কেন্দ্রের দায়িত্বভার ছেড়ে বদলি হয়ে চলে গেলে ওই আবেদনের ওপর স্বয়ং মন্ত্রীর আদেশ কার্যকর করা হয়েছিল কি না তা আর জানা হয়নি। ১৯৭৪ সালের ১৯ অক্টোবর কবি ফররুখ আহমদ এই দুনিয়া ছেড়ে চিরতরে চলে যান না-ফেরার দেশে। যদি তাঁর বকেয়া বেতন সেই সময়ের মহাপরিচালক দিয়েও থাকেন, তা হলে সেই প্রাচীন মহাকবি ফেরদৌসীর মৃত্যুর ঘটনাকে স্মরণ করায়– বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ফররুখ আহমদের মৃতদেহ ইস্কাটন গার্ডেনের এক গেট দিয়ে বের হচ্ছিল দাফনের জন্য। অন্যদিকে শাহবাগের ঢাকা বেতার কেন্দ্রের গেট দিয়ে মহাপরিচালকের হুকুমনামা প্রবেশ করছিল তার কোনো শাহী বাহকের মাধ্যমে। 

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, একুশতম সংখ্যা, অক্টোবর-২০১১]

# ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য

মুহম্মদ মতিউর রহমান

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক প্রতিভাধর শক্তিমান কবি ফররুখ আহমদ। তিনি বৃহত্তর যশোর জেলার মাগুরা মহকুমার (বর্তমানে জেলা) অন্তর্গত মাঝআইল গ্রামে ১৯১৮ সনের ১০ জুন জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সনের ১৯ অক্টোবর তিনি ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। বাংলা কাব্যে তাঁর অবদান বিপুল ও নানা বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যে অনন্যসাধারণ।

ফররুখ আহমদকে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে মূল্যায়ন করার প্রয়াস পেয়েছেন। কেউ তাঁকে 'ইসলামী রেনেসাঁর কবি' কেউ 'মুসলিম নবজাগরণের কবি', কেউ 'মানবতাবাদী কবি' ইত্যাদি নানা অভিধায় বিশেষায়িত করেছেন। এর কোনটিই অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রত্যেকের মূল্যায়নই তথ্যভিত্তিক, যুক্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ফররুখ এক ও অবিভাজ্য-আলাদা আলাদাভাবে তাঁকে বিশ্লেষণ করার সুযোগ নেই। ফররুখের নিকট 'ইসলাম', মুসলিম', 'মানবতাবাদ', এসবই মুদ্রার বিভিন্ন দিক মাত্র। তিনি দৃঢ়ভাবে ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন এবং গভীর নিষ্ঠার সাথে তাঁর জীবনে ও কর্মে এর প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। ইসলামে বিশ্বাসের কারণেই তিনি মুসলিম জাতির নবজাগরণ প্রত্যাশা করেছেন এবং ইসলাম থেকেই তিনি মানবতাবাদের প্রেরণা লাভ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ইসলাম আল্লাহ-প্রদত্ত এক অভ্রান্ত জীবনাদর্শ এবং একমাত্র ইসলামই মানবজাতির সকল সমস্যার সুষ্ঠু, সুন্দর সমাধান দিতে সক্ষম। এতে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষের মুক্তি ও কল্যাণ সুনিশ্চিত। সে কারণেই তিনি একাধারে ইসলামের পুনর্জাগরণ, মুসলিম নবজাগরণ ও মানবতাবাদের বলিষ্ঠ প্রবক্তা।

ইসলামী রেনেসাঁর কবি হিসাবে খ্যাত ফররুখ তাঁর কাব্য-কবিতায় সরাসরি ইসলামের কথা উচ্চারণ করেননি। প্রতীক ও রূপকল্পের মাধ্যমে তিনি তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাব্য-ভাষায়, অসাধারণ কাব্য-কুশলতায় যে বলিষ্ঠ ভাব ও আবেদন ফুটিয়ে তুলেছেন, তা ইসলামের ব্যঞ্জনাকেই প্রমূর্ত করে তোলে। এখানেই তাঁর অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব ও বিস্ময়কর কাব্য-প্রতিভার মহিমময় অত্যুজ্জ্বল প্রকাশ।

আধুনিক বাংলা কাব্য মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) থেকে সমুক্ষত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে (১৮৬১-১৯৪১) এসে পরিণতরূপ লাভ করেছে। কাজী নজরুল ইসলামে (১৮৯৯-১৯৭৬) তা নতুন বাঁক নিয়েছে। ভাব-বিষয়, ভাষা-ব্যঞ্জনায় নজরুল-কাব্য এক অভিনব অভিব্যঞ্জনা লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের সমকালেই পাশ্চাত্য কাব্যাদর্শে অনুপ্রাণিত তিরিশের কবিরা বাংলা কাব্যে

আরেক নতুন সুর ও অনুরণন সৃষ্টি করেছেন। তিরিশের উজ্জ্বলতম কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাস (১৮৯৯-১৯৫৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-৬১), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-৮৬), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-৮৮), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪), বিষ্ণু দে (১৯০৯-৮২), সমর সেন (১৯১৬-৮৭) প্রমুখ স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হওয়া সত্ত্বেও সকলেই চেয়েছিলেন রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে মুক্তি। তাঁরা নজরুলের কাব্যিক উচ্চারণ ও উত্তাপে অনুপ্রাণিত হওয়া সত্ত্বেও নজরুলের ভাব-ভাষার সাথে তাঁরা কখনো সাজুয্য খুঁজে পাননি। নজরুল তাঁর ভিন্ন সামাজিক পটভূমি ও বিশ্বাসের কারণেই তিনি অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছেন।

তিরিশোত্তর যুগে বাংলা কাব্যে আরেক ভিন্ন ধারার কবি জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩-৭৬)। তিনি এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধারার অনুসারী বা প্রর্বতক। তিনি পল্লী-জীবনের চিত্র, পল্লীর সাধারণ মানুষ, ভাব ও বিষয়কে ধারণ করে সাধারণ গণ-মানুষের ভাষায় তাঁর কাব্যের বিচিত্র ভুবন রচনা করেছেন। নজরুলের সাথে তাঁর কিছুটা সাজুয্য থাকলেও ভাব-ভাষা-উচ্চারণ ও কাব্যিক স্নিগ্ধতায় তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক উজ্জ্বল কবি-প্রতিভা। বাংলা সাহিত্যে তিনি 'পল্লীকবি' হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করলেও মূলত তিনি একজন নিজস্ব ধারার আধুনিক কবি।

কাব্য-ক্ষেত্রে ফররুখ আহমদের যখন আবির্ভাব-তখন রবীন্দ্রনাথের জীবনাবসান ঘটেছে, নজরুল বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন। জসীমউদ্‌দীন ও তিরিশোত্তর যুগের কবিদের তখন প্রবল দাপট চলছে। তা সত্ত্বেও ফররুখ আহমদ তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত হয়ে সকলের সপ্রসংশ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর এ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছে কাব্যের বিচিত্র রূপরীতি, শিল্প-নৈপুণ্য, রূপক-উপমা-প্রতীক-রূপকল্পের অভিনব ব্যবহার ও নিজস্ব কাব্য-ভাষা নির্মাণের অসাধারণ সাফল্যের উপর ভিত্তি করে। তিনি একাধারে গীতি কবিতা, সনেট, ব্যঙ্গ কবিতা, গান-গজল, শিশুতোষ কাব্য, মহাকাব্য, কাব্যনাট্য, গীতিনাট্য, ব্যঙ্গনাট্য ইত্যাদি রচনা করেছেন। তিনি মূলত রোমান্টিক, কিন্তু তাঁর কিছু কিছু কাব্য কাবিতায় ধ্রুপদ বৈশিষ্ট্যের ছাপ স্পষ্ট। ইংরাজি সাহিত্যের মেধাবী ছাত্র হিসাবে তিনি একাধারে আধুনিক ইংরাজি সাহিত্যের শিল্প-বৈশিষ্ট্যের সাথে আধুনিক বাংলা কাব্যের উজ্জ্বলতম শিল্প-বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটিয়ে সফল কাব্য-চর্চায় ব্রতী হয়েছেন।

রূপক-উপমা-প্রতীক-রূপকল্পের ব্যবহার কাব্যের সৌন্দর্য ও আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। প্রাচীনকাল থেকেই এসবের ব্যবহার চলে আসছে দুনিয়ার তাবৎ সাহিত্যে। আধুনিক কবিরা এসবের ব্যবহারে অধিকতর সচেতন এবং প্রত্যেকেই তার নিজস্বতার ছাপ রাখায় সচেষ্ট। ফররুখ আহমদ এক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য প্রদর্শন করছেন। এখানে দু একটি উদাহরণ দিচ্ছি–

কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ,
শুনছি আবার নোনা দরিয়ায় ডাক,

ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ,
পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ ব'য়ে আনে নোনা দরিযার ডাক;
নতুন পানিতে সফর এবার, হে মাঝি সিন্দবাদ।

(সিন্দবাদ : সাত সাগরের মাঝি)

সমুদ্র থেকে সমুদ্র ঘোরে দরিয়ার শাদা তাজী!
খুরের হল্‌কা,-ধারালো দাঁড়ের আঘাতে ফুল্‌কি জ্বলে
সমুদ্র থেকে সমুদ্রে ঘোরে দরিয়ায় শাদা তাজী...
কেশর ফোলানো পালে লাগে হাওয়া, মাস্তুলে দোলে চাঁদ,
তারার আগুনে পথ বেছে নেয় স্বপ্নেরা সারারাত,

(সিন্দবাদ : সাত সাগরের মাঝি)

তাজী ছুটে চলে দুরন্ত গতি দুর্বার উচ্ছল;
সারারাত ভরি' তোলপাড় করি' দরিয়ার নোনাজল।
ভেঙে ফেলো আজ খাকের মমতা আকাশে উঠেছে চাঁদ,
দরিয়ার বুকে দামাল জোয়ার ভাঙছে বালুর বাঁধ,
ছিড়ে ফেলে আজ আয়েমী রাতের মখমল-অবসাদ,
নতুন পানিতে হাল খুলে দাও, হে মাঝি সিন্দবাদ!

(বা'র দরিয়ায় : সাত সাগরের মাঝি)

গোধূলি-তরল সেই হরিণের তনিমা পাটল
-অস্থির বিদ্যুৎ, তার বাঁকা শিঙে ভেসে এল চাঁদ,
সাত সাগরের বুকে সেই শুধু, আলোক-চঞ্চল;
অন্ধকার ধনু হাতে তীর ছোঁড়ে রাত্রির নিষাদ।

(বন্দরে সন্ধ্যা : সাত সাগরের মাঝি)

ঐ আসে আসে সেই বিহঙ্গ সাতরঙা তার শ্বেত পাখায়,
আকাশের বুক ঘন হ'য়ে ওঠে নীল মরকত স্বচ্ছতায়,
সোনালী আলোয় শ্বাপদ রাত্রি আহত, লুপ্ত নিমেষ মাঝে;
থির-বিদ্যুৎ আভা তরঙ্গ আলোকের সুর আকাশে বাজে।

(সিরাজাম মুনীরা মুহম্মদ মুস্তফা : সিরাজাম মুনীরা)

আমার হৃদয় স্তব্ধ, বোবা হ'য়ে আছে বেদনায়,
যেমন পদ্মের কুঁড়ি নিরুত্তর থাকে হিমরাতে,
যেমন নিঃসঙ্গ পাখী একা আর ফেরেনা বাসাতে;
তেমনি আমার মন মুক্তি আর খোঁজেনা কথায়।

(ক্লান্তি : মুহূর্তের কবিতা)

অন্ধকার আজদাহার বেষ্টনীতে প্রাণী ও প্রাণের
সাড়া নাই। এখানে জালালাবাদে দেখি এসে
হিম-সিক্ত কম্বলের মত রাত্রি ঢেকেছে নিঃশেষে

সমস্ত আলোক রশ্মি পৃথিবীর সকল পথের।

**(সিলেট স্টেশনে একটি শীতের প্রভাতঃ মুহূর্তের কবিতা )**

উপরে উদ্ধৃত পঙক্তিমালাতে ফররুখের রূপক-উপমা-প্রতীক-রূপকল্প ব্যবহারের অভিনবত্ব ও অসাধারণ কৃতিত্ব সকলকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করে। তিনি রূপক-উপমা-প্রতীক-রূপকল্পের ব্যবহারে গতানুগতিক ধারা ও রীতি অনুসরণ না করে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সৃজনশীলতার ছাপ রেখেছেন। এ সবের ব্যবহারে তিনি একাধারে প্রকৃতি সঞ্জাত, ঐতিহ্যিক ও বুদ্ধিদীপ্ত রীতির অনুসরণ করেছেন। এটা কবি হিসাবে তাঁর সাফল্যের অন্যতম প্রধান চাবিকাঠি।

ফররুখের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সাফল্য সম্ভবত তাঁর নিজস্ব কাব্য-ভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে তিনি অনেকটা নজরুলকে অনুসরণ করলেও তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন। মধ্যযুগে মুসলিম শাসনামলে রচিত সাহিত্যের ভাষাকে একসময় 'মুসলমানী যবান', 'আরবি-ফারসি মিশেল ভাষা' অথবা 'ফারসি বাংলা' হিসাবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে অপাঙতেয় করে রাখা হলেও বাঙালি মুসলমানের সেটাই আসল ও অকৃত্রিম ভাষা। নজরুল সর্বপ্রথম সে ভাষাকে তাঁর কাব্যে স্থান দিলেন। এক্ষেত্রে নজরুলকে অনেকেই অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মধ্যে ফররুখ আহমদ সর্বাধিক সফল। তিনি আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহারে অধিকতর পরিমিতি ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন। তাই তিনি তাঁর কাব্যে নিজস্ব ভাষারীতি চালু করে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছেন। এক্ষেত্রে দু' একটি উদাহরণ দিচ্ছি –

হাজার দ্বীপের বদ রূসমের উপরে লানত হানি'
কিশতীর মুখে ফেরায়েছি মোরা টানি-
বুরাঈর সাথে পেয়েছি ভালাই অফুরাণ জিন্দিগী,
আব্‌লূস-ঘন আঁধারে পেখম খুলেছে রাতের শিখী।
আর থেকে থেকে দমকা বাতাসে নারিকেল শাখে হাওয়া
ভোলায়েছে সব পেরেশানি, শুরু হ'য়েছে গজল গাওয়া
সূরাত জামাল জওয়ানির ঠোঁটে কেটেছে স্বপ্ন রাত
শুনেছি নেশার ঘোর কেটে যেতে এসেছে নয়া প্রভাত।

**(সিন্দবাদ : সাত সাগরের মাঝি)**

কত যে আঁধার পর্দা পারায়ে ভোর হ'ল জানি না তা।
নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা।
দুয়ারে তোমার সাত-সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা।
তবু জাগলে না? তবু তুমি জাগলে না?
সাত-সাগরের মাঝি চেয়ে দেখো দুয়ারে ডাকে জাহাজ,
অচল ছবি সে, তস্‌বির যেন দাঁড়ায়ে রয়েছে আজ।

**(সাত সাগরের মাঝি : সাত সাগরের মাঝি)**

তুমি কি ভুলেছ লবঙ্গ ফুল, এলাচের মৌসুমী,

যেখানে ধূলিতে, কাঁকরে দিনের জাফরান খোলে কলি,
যেখানে মুগ্ধ ইয়াস্‌মিনের শুভ্র ললাট চুমি
পরীর দেশের স্বপ্ন-সেহেলি জাগে গুলে বকাওলী।
**(সাত সাগরের মাঝি : সাত সাগরের মাঝি)**

স্থির হও বাদশা নেকনাম। সামান্য খাদিম আমি
ইন্‌সানের, তবু বলি, এলাহির রেজামন্দি চেয়ে
যে হয় খিদমতগার মানুষের কিম্বা মখলুকের
হয় না সে কোন দিন খ্যাতির পূজারী। যে মুমিন,
মুজাহিদ, বিশ্বাসী যে, হয় না সে আনত কখনো;
হয় না সে নতশির আল্লা ছাড়া অন্য কারো কাছে।
যদি সে প্রলুব্ধ হয় ধ্বংস করে সত্তা সে নিজের,
অসত্যের ভারবাহী মরে সেই গুমরাহ্য প্রাণ
অবরুদ্ধ হয় যদি খ্যাতি, অর্থ, স্বার্থের পিঞ্জরে।
**(নৌফেল ও হাতেম)**

যুগ-চেতনা প্রত্যেক বড় কবির একটি বিশেষ লক্ষণ। যুগ-চেতনা কবির কাব্যকে ব্যাপক জনগণের নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য করে তোলে। বলাবাহুল্য, কালিক ঘটনা পরম্পরার হুবহু বর্ণনাকে বলা হয় ইতিহাস, আর সে বর্ণনা যখন কবির কল্পনা ও অভিজ্ঞতার জারক রসে অভিষিক্ত হয়ে কাব্য-স্বরূপে উপস্থাপিত হয়, তখন তা হয় যথার্থ সাহিত্য। ফররুখ আহমদ প্রকৃত জীবনশিল্পী হিসাবে যুগের চঞ্চলতা ও আবেগকে ধারণ করেছেন, কিন্তু যুগের কলকণ্ঠ উচ্চারণকে তিনি সযত্নে পরিহার করেছেন। যুগ-চেতনা ও আবেগকে হৃদয়ের সূক্ষ্মতন্ত্রীতে ধারণ করে তিনি তা রূপক ও প্রতীকের মাধ্যমে রং-তুলি, সুর-ছন্দের অভিনব ব্যঞ্জনায় বর্ণাঢ্য ও কাব্যিক মহিমায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর সমকালে সংঘটিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫), যুদ্ধজনিত পঞ্চাশের মন্বন্তরে (বাংলা ১৩৫০) লক্ষ লক্ষ নিরন্ন মানুষের করুণ মৃত্যু, ১৯৪০ সালে গৃহীত মুসলিম লীগের 'লাহোর প্রস্তাবে'র ভিত্তিতে পাকিস্তান আন্দোলন, ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত গণভোট, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা (১৯৪৭), ভাষা আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৫২), পাকিস্তানের তৎকালীন শাসকদের শোষণ, দুর্নীতি, বৈষম্য ও আশাহত বঞ্চিত জণগণের নিদারুণ আর্তি, ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধ, লক্ষ লক্ষ জানমাল-ইজ্জতের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়, স্বাধীনতা পরবর্তী কালের ব্যাপক দুর্নীতি, অনাচার ও অরাজকতার ফলে সৃষ্ট ১৯৭৪ সনের দুর্ভিক্ষে অসংখ্য মানুষের করুণ মৃত্যু ইত্যাদি মানবিক আশা-আকাঙ্ক্ষা , সুখ-দুঃখ, সাফল্য ও বিপর্যয় ফররুখ কাব্যে প্রাণবন্ত রূপ লাভ করেছে। এ থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, ফররুখ আহমদ ছিলেন একজন যুগ-সচেতন প্রকৃত জীবনশিল্পী। তাঁর রচিত 'হে বন্য স্বপ্নেরা', 'সাত সাগরের মাঝি', 'আজাদ কর পাকিস্তান', 'সিরাজাম মুনীরা', 'কাফেলা', 'মুহূর্তের কবিতা' ও বিভিন্ন ব্যঙ্গ কাব্য-কবিতায় তিনি ব্যক্তি ও সমাজের

স্বপ্ন-কল্পনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আশাভঙ্গের মর্মন্তুদ অবস্থা নিবিড় অনুষঙ্গে অন্তরঙ্গ অনুভূতির আলোয় প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। একারণে ফররুখ আহমদকে যথার্থই একজন যুগ-সচেতন জীবনশিল্পী হিসাবে আখ্যায়িত করা চলে। তবে তিনি তাঁর কালকে ধারণ করে কালাতীত শিল্পের অক্ষয় নিদর্শন রেখে গেছেন। এতে কবি হিসাবে তাঁর অনন্য শক্তিমত্তার পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ফররুখ আহমদের বিচিত্র রচনা-সম্ভার বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। তিনি প্রধানত কবি। তাই তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে কাব্যের সংখ্যাই অধিক। এছাড়া, তিনি ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক ও কিছুসংখ্যক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। অবশ্য তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলো আজও গ্রন্থবদ্ধ হয়নি। নিচে তাঁর রচনাবলীর একটি তালিকা প্রদান করা হলো :

**গীতিকাব্য :** সাত সাগারর মাঝি (১৯৪৪), আজাদ করো পাকিস্তান (১৯৪৬), সিরাজাম মুনীরা (১৯৫২), ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৭০), হে বন্য স্বপ্নেরা (১৯৭৬), কাফেলা (১৯৮০),হাবেদা মরুর কাহিনী (১৯৮১), কিস্‌সা কাহিনী (১৯৮৪)।

**সনেট :** মুহূর্তের কবিতা (১৯৬৩), দিলরুবা (১৯৯৪), অনুস্বর (ব্যঙ্গ কবিতা)।

**গান :** রক্ত গোলাব, কাব্যগীতি, মহফিল (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৮৭)।

**মহাকাব্য :** হাতেম তা'য়ী (১৯৬৬)।

**কাব্যনাট্য :** নৌফেল ও হাতেম (১৯৬১)।

**গীতিনাট্য :** আনারকলি (১৯৬৬)।

**গদ্য ব্যঙ্গ নাটিকা :** রাজ-রাজরা (১৯৪৮)।

**ব্যঙ্গ কবিতা :** ধোলাই কাব্য (ফারুক মাহমুদ সম্পাদিত) (১৯৬৩), বিসর্গ (রচনাকাল ১৯৪৬-৪৮), ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক কাব্য (১৯৯১), হালকা লেখা, তস্‌বিরনামা, রসরঙ্গ।

**অনুবাদ কাব্য :** ইকবালের নির্বাচিত কবিতা (১৯৮০), কুরআন মঞ্জুষা, আমপারা (কুরআন শরিফের ২৯টি সূরার অনুবাদ)।

**ছোটগল্প :** ফররুখ আহমদের গল্প (১৯৯০)

**উপন্যাস :** সিকান্দার শা'র ঘোড়া (একটি অসম্পূর্ণ উপন্যাস)।

**শিশুতোষ কাব্য :** পাখির বাসা (১৯৬৫), হফরের ছড়া (১৯৬৮), নতুন লেখা (১৯৬৯), ছড়ার আসর-১ (১৯৭০), চিড়িয়াখানা (১৯৮০), ফুলের জলসা (১৯৮৫), হাল্কা লেখা, ছাড়ার আসর-২, ছাড়ার আসর-৩, সাঁঝ সকালের কিস্‌সা, আলোকলতা, খুশির ছড়া, মজার ছড়া, পাখির ছড়া, রং মশাল, জোড় হরফের ছড়া, পড়ার শুরু, পোকামাকড়।

**পাঠ্য-পুস্তক :** নয়া জামাত (প্রথম ভাগ) (১৯৫০), নয়া জামাত (দ্বিতীয় ভাগ) (১৯৫০), নয়া জামাত (তৃতীয় ভাগ) (১৯৫০), নয়া জামাত (চতুর্থ ভাগ) (১৯৫০)

উপরোক্ত গ্রন্থ-তালিকা থেকে ফররুখ আহমদের প্রায় ৫০টি গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। এরমধ্যে তাঁর জীবনকালে অতি অল্পসংখ্যক গ্রন্থই প্রকাশিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর

অধিকাংশ গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও পাণ্ডুলিপি আকারে আরো কিছু গ্রন্থ রয়েছে এবং অগ্রন্থিত বেশ কিছু কবিতা ও নানা ধরনের লেখা রয়েছে, যা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যবশত তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে অল্পসংখ্যক ব্যতীত অন্য সবই দুষ্প্রাপ্য। ফলে ফররুখের পঠন-পাঠন ও মূল্যায়ন করা অনেকটা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। তাই বাংলা সাহিত্যের এত বড় একজন কবি আমাদের অবহেলায় বর্তমানে অনেকটা বিস্মৃত হতে চলেছেন। এক্ষেত্রে সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা এখন সময়ের অপরিহার্য দাবি।

ফররুখের সমগ্র রচনাবলী পর্যালোচনা করে তাঁর প্রতিভার বিশালত্ব, তাঁর রচনার বৈচিত্র্য ও বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা সম্পর্কে সহজেই ধারণা করা চলে। ফররুখ আহমদ একজন শিল্প-সচেতন কবি। বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য বিশেষত বিশ্ববরেণ্য কবি-সাহিত্যিকদের সুবিখ্যাত সাহিত্য-কর্মের সাথে তাঁর পরিচয় ছিল। তিনি সেসব সাহিত্যের ভাব, শিল্পকুশলতা, বর্ণনাভঙ্গী ও সাফল্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে বাংলা ভাষায় যথার্থ শিল্পসুন্দর সাহিত্য-সম্ভার উপহার দিয়েছেন। তবে তিনি কখনো কাউকে অনুকরণ করেননি। যথার্থ মৌলিক প্রতিভা কখনো কাউকে অনুকরণ করে না। তবে তাঁরা উৎকৃষ্ট উদাহরণ ও অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে থাকেন এবং শিল্প-প্রকরণগত বিভিন্ন ভঙ্গি ও দৃষ্টিকে কাজে লাগাবার প্রয়াস পান। ফররুখ আহমদ ছিলেন যথার্থ সৃষ্টিশীল মৌলিক প্রতিভার অধিকারী কবি। তিনি তাঁর ভাব-ভাষা-ব্যঞ্জনা ও আবেদনের দিক দিয়ে কাব্যের এক মহীয়ান, দীপ্তিমান, স্বতন্ত্র ভুবন নির্মাণে সক্ষম হয়েছেন। কবি হিসাবে এটা তাঁর এক অনন্য উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য।

ফররুখ আহমদের কাব্যের বর্ণনা, বিষয় ও উপজীব্য বহু বিচিত্র। তাঁর কাব্যে একদিকে যেমন বাংলার সবুজ প্রকৃতি, নানা ফসলে পূর্ণ মাঠ, নদী-নালা, ফুলের সুবাস, পাখির কলকাকলি, নদীভাঙ্গন, বন্যা-প্লাবন, খরা-বৃষ্টির প্রভাবে সংগ্রামমুখর বাঙালির জীবন-বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে দিগন্ত-বিস্তারী, ধূসর মরুভূমি, আরব্য জনপদ, ঝড়-গতিসম্পন্ন তাজী ঘোড়া, 'মরুভূমির জাহাজ' নামে খ্যাত দ্রুত গতির উট, দিগন্ত-বিস্তারী সবুজ খেজুরবীথি ও সে দেশের বিচিত্র মানুষের জীবন্ত প্রতিকৃতি। আরো রয়েছে দিগন্ত-ছোঁয়া নীল সমুদ্র, উত্তাল তরঙ্গ-বিক্ষোভ, দুঃসাহসী অভিযাত্রিকের সংগ্রামমুখর অবিশ্বাস্য জীবনের দুরন্ত আকৃতি। তাঁর কল্পনার বিশাল ভুবনে মাটি-মানুষ-প্রকৃতি, সমুদ্র, আকাশ ও মরুভূমির সীমাহীন বিস্তার। স্বপ্ন-সাধে সম্পন্ন মানুষ সেখানে নিরন্তর সংগ্রাম-মুখর। এ রোমান্টিক স্বপ্নাচ্ছন্নতা ও জীবনের কঠিন বাস্তবতার সমন্বয়ে ফররুখের কবিতায় এক দুরন্ত আবেগ ও গতিময়তা সৃষ্টি হয়েছে, বাংলা কাব্যে যা নিতান্ত দুর্লভ। বাংলা সাহিত্যে অন্যকোন কবির বর্ণনায় এরূপ বিশাল, বিস্তৃত ইজেলে রং-রূপের বিন্যাস ও বিচিত্র সুরের মোহনীয় ঝংকার দুর্ণিরীক্ষ।

ইসলামী ঐতিহ্য ও ভাবধারা ফররুখ-কাব্যের মূল অনুপ্রেরণা ও কেন্দ্রীয় বিষয়। কিন্তু ধর্মীয় তত্ত্বকথা তাঁর কাব্যে ফুটে ওঠেনি। চিরন্তন মানবতার সুন্দরতম আদর্শ হিসাবে তিনি প্রতীকী দ্যোতনা ও কাব্যিক ব্যঞ্জনায় কাব্যময় করে বাস্তব জীবনানুভূতির

সাথে অবিমিশ্র করে তুলেছেন ইসলামের মূল আদর্শ ও প্রাণ-সম্পদ। ফররুখ আহমদ প্রকৃত জীবন-শিল্পী। তাই তাঁর আদর্শ-চেতনার সাথে মানবিক আর্তি, প্রেম-ভালবাসা, আনন্দ-বেদনা, দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভ ও আর্তির পাশাপাশি ইসলামী চেতনা কেবল স্বাভাবিক ও সহজ-স্বচ্ছন্দ রূপ লাভ করেছে তাই নয়, হতাশাপূর্ণ জীবন-সংগ্রামে ইসলামী আদর্শ অন্ধকার, নিরাকূল, অথৈ সাগরের বুকে ধ্রুবতারার দ্যুতিময় আলোক-রশ্মির বিস্তার ঘটিয়েছে। কবির নিকট ইসলাম কোন প্রথাগত ধর্ম নয়, সমস্যা-সংকুল পৃথিবীতে এটা স্রষ্টা-প্রদত্ত একমাত্র অভ্রান্ত জীবনাদর্শ, যা যুগে যুগে মানব জাতিকে মুক্তির অনিবার্য পথ প্রদর্শন করে এসেছে।

এ ছাড়া, হাল্কা রসিকতা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপপূর্ণ বুদ্ধিদীপ্ত রচনা এবং শিশুতোষমূলক নানা বিষয়ের বিচিত্র সমাহার লক্ষ্য করা যায় তাঁর কাব্যে। ফররুখের উপলব্ধি ও জীবনদৃষ্টি যদিও স্থির ও সন্দেহাতীতরূপে এক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিসারী, হেরার জ্যোর্তিময় আলোক-রশ্মির অনুসারী–তবু তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু ব্যাপক, বর্ণিল ও বৈচিত্র্যে অপরূপ। কবি যদিও কল্পনাচারী ও রোমান্টিক ভাবালুতায় আচ্ছন্ন, তবু তাঁর কাব্য-ভাবনা জীবন-অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার স্পর্শ-বিবর্জিত নয়। তাই দেখা যায়, কবি স্বপ্নচারী, মরুচারী ও সমুদ্রচারী হওয়া সত্ত্বেও বার বার আটপৌরে জীবনের গণ্ডীতে ফিরে এসেছেন, বাংলার পলিমাটির খোলা প্রান্তরে, মেঘমেদুর ছায়াচ্ছন্ন পাখি ডাকা সবুজ প্রকৃতির বুকে স্বচ্ছন্দ বিহার করেছেন, বাংলার নদীভাঙ্গন, খরা-প্লাবন, ঝড়-তাপে বিপর্যস্ত নিরন্ন, বুভুক্ষু, নিপীড়িত মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। ফররুখ আহমদকে তাই কখনো একঘেয়ে মনে হয় না। বিষয়বস্তুর এ ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য ফররুখ-কাব্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। উপরোল্লিখিত গ্রন্থের তালিকা থেকে ফররুখ-প্রতিভার শক্তিমত্তা, তাঁর সৃষ্টির ব্যাপকতা ও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা চলে।

বিষয়বস্তুর সাথে কাব্যের আঙ্গিক ও রূপরীতির ক্ষেত্রেও ফররুখ আহমদ বৈচিত্র্য নিয়ে এসেছেন। আধুনিক বাংলা কাব্যের বিভিন্ন শাখা যেমন মহাকাব্য, সনেট, গীতি কবিতা, শিশুতোষ কবিতা, ব্যঙ্গ-রসাত্মক কবিতা, গান-গজল, নাট্য-কাব্য, ব্যঙ্গ-নাটক ইত্যাদি বিভিন্ন রূপরীতিতে, বিচিত্র ছন্দ-সুর আর শিল্পীত বর্ণাঢ্য উচ্চারণে তাঁর সাহিত্য বৈশিষ্ট্যময় হয়ে উঠেছে। সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে কবির অনুশীলন ও নিপুণ পদচারণা পাঠককে যুগপৎ আনন্দিত ও বিস্ময়-পুলকে অভিভূত করে।

বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ থেকেই কাহিনী কাব্যের ধারা চলে আসছে। কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুকরণে বাংলা কাব্যে মহাকাব্যের সৃষ্টি আধুনিককালে মাইকেল মধুসূদন দত্তের হাতে। মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্য' বাংলা সাহিত্যের প্রথম এবং সার্থক মহাকাব্য। মহাকাব্য রচনার ধারা যখন শেষ হওয়ার পথে তখন ফররুখ আহমদ তাঁর 'হাতেম তা'য়ী' রচনা করে বাংলা সাহিত্যে এক অসাধারণ অবদান রেখেছেন। মধুসূদনের পরে সম্ভবত এটাই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য এবং সার্থক ও সর্বশেষ মহাকাব্য। ফররুখের পরে অন্য কেউ মহাকাব্য রচনায় হাত দেননি, দেয়ার সম্ভাবনা আছে বলেও মনে হয় না। কারণ, বর্তমান যুগ-পরিবেশ মহাকাব্য রচনার উপযোগী নয় বলে ধারণা করা হয়। একারণে বলা যায়,

বাংলা সাহিত্যে প্রথম মহাকাব্যের রচয়িতা হিসাবে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং সর্বশেষ মহাকাব্য রচয়িতা হিসাবে ফররুখ আহমদ স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

বাংলা সাহিত্যে সনেট রচনার ক্ষেত্রে মধুসূদন পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে তিনি সার্থকতম। তাঁর পরে অনেকেই সনেট রচনার প্রয়াস পেয়েছেন। তবে সনেটের সূক্ষ্ম ও দৃঢ়বদ্ধ শিল্পরীতির কারণে এক্ষেত্রে খুব কম সনেট-রচয়িতাই সফল হতে পেরেছেন। তবে সনেট রচয়িতা হিসাবে ফররুখ আহমদের কৃতিত্ব অসামান্য, এ-কথা অনেকেই স্বীকার করেন। ফররুখ আহমদ মূলত রোমান্টিক কবি হওয়া সত্ত্বেও সনেট রচনার ক্ষেত্রে তিনি আশ্চর্যজনকভাবে সফল। সনেট রচনার সংখ্যার দিক দিয়েও ফররুখ অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী। তাঁর রচিত সনেটের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন'শ। সংখ্যা ও মানের বিচারে ফররুখ বাংলা সাহিত্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সনেটিয়ার।

নাট্যকাব্য, গীতিনাট্য, ব্যঙ্গ-নাট্য, গীতি কবিতা, শিশুতোষ কবিতা, ব্যঙ্গ কবিতা, গান-গজল ইত্যাদি কাব্যের বিভিন্ন শাখায় ফররুখ আহমদ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। বাংলা কাব্যের বিভিন্ন রূপরীতিতে তিনি সফল পদচারণা করেছেন এবং সর্বত্র তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। তাঁর রচিত কাব্যনাট্য ও ব্যঙ্গনাট্য এক সময় মঞ্চায়িত হয়ে ব্যাপকভাবে দর্শক-নন্দিত হয়েছে। তাঁর রচিত গান-গজল এক সময় রেডিও-টিভিতে নিয়মিত প্রচারিত হয়ে শ্রোতসাধারণকে মুগ্ধ-অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর গীতিকবিতা নব চৈতন্যের উন্মোষ ঘটিয়ে নব-জাগরণ ও স্বাধীন চিন্তার বিকাশ সাধনে অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। সর্বোপরি তাঁর রচিত ব্যঙ্গ সনেট ও কবিতা এবং শিশু-কিশোর ছড়া-কবিতা বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। ব্যঙ্গ রচনার ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ নেই বললেই চলে আর শিশু-কিশোর ছড়া-কবিতা রচনায় তিনি যে অসাধারণ অবদান রেখেছেন, তা সংখ্যা ও মানের দিক থেকে তুলনাবিরল বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে বলে মনে হয় না।

পরিশেষে বলা চলে, কাব্যক্ষেত্রে ফররুখ সর্বদা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুশীলন করে গেছেন এবং সে জন্যই তিনি একস্থানে কখনো স্থির হয়ে থাকেন নি। কাব্য-সৌন্দর্য ও উৎকর্ষের সন্ধানে কবি সর্বদা ব্যাপৃত থেকেছেন। নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুশীলন-প্রবণতা বড় কবির একটি বিশেষ লক্ষণ। এ লক্ষণ ফররুখের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তাই নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে তিনি তাঁর কাঙ্ক্ষিত মহত্তম শিল্পোৎকর্ষ সাধনে সচেষ্ট ছিলেন। তাই ফররুখ আহমদ এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কালোত্তীর্ণ কবি। বাংলা কাব্যের শ্রেষ্ঠ মৌলিক কবিদের মধ্যে তিনি অন্যতম। ☐

---

**[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ২০তম সংখ্যা, অক্টোবর ২০১০-জুন ২০১১]**

# ফররুখ কাব্যে শিল্পরূপ

মুহম্মদ মতিউর রহমান

ভাব ও কল্পনার সংমিশ্রণে অনুভূতির জারক রসে জারিত হয়ে কোন কিছু যখন সৌন্দর্যময়-ছন্দময়-আনন্দময় হয়ে ইন্দ্রিয়লোকে সাড়া জাগায়, তখন সেটাকে শিল্প রূপে গণ্য করা চলে। শিল্প এমন এক নান্দনিক বিষয় যা মানুষের সুপ্ত কামনা-বাসনা, স্বপ্ন-কল্পনা ও অনুভূতিকে জাগ্রত করে, আলোড়িত-উদ্বোধিত করে এবং মানুষের মানবিক সত্তাকে স্পন্দিত করে তোলে। সে কারণে প্রকৃত শিল্পকে কবিতা বা প্রকৃত কবিতাকে অনায়াসে শিল্প বলা যায়। তবে সব শিল্প যেমন কবিতা নয়, তেমনি সব কবিতাও শিল্প নয়। যদিও সব শিল্প বা কবিতায় শিল্পের মৌল স্বভাবের কিছু না কিছু প্রতিফলন ঘটে থাকে।

ভাব, কল্পনা ও অনুভূতির সংমিশ্রণে শিল্প ও কবিতার সৃষ্টি। শিল্প সৃষ্টিতে অতিরিক্ত উপকরণ হিসাবে প্রয়োজন হয় রং, তুলি ও ইজেল। অন্যদিকে, কবিতা সৃষ্টিতে অতিরিক্ত উপকরণ হিসাবে প্রয়োজন হয় শব্দ, ছন্দ, সুর, উপমা-রূপক-অলংকার ইত্যদির। তবে উভয় ক্ষেত্রে নির্মাতা হিসাবে যিনি কাজ করেন, ভাল-মন্দ বা সাফল্য-ব্যর্থতা নির্ভর করে সম্পূর্ণ তার দক্ষতা, নৈপুণ্য ও প্রতিভার উপর। নির্মাতার কুশলী হাতের ছোঁয়ায় ভাব, কল্পনা ও অনুভূতি শিল্প বা কবিতা হয়ে ওঠে মানব-মনের অন্তহীন, বর্ণহীন, স্বাদ-গন্ধহীন চিরন্তন আনন্দের অফুরন্ত উৎস। এক্ষেত্রে কবিরা তাদের ভাব-কল্পনা-অনুভূতিকে যথাযোগ্য শব্দ, ছন্দ ও উপমা-রূপক-অলংকারের কুশলী ব্যবহারে এক অসাধারণ নান্দনিকতার জন্ম দেন। তাই বলা যায়, অনেকেই কবিতা লিখলেও সবাই কবি নন, আবার সকল কবিতাও শিল্প নয়। তবে প্রকৃত কবিরা একাধারে কবি ও শিল্পী। তারা দেশ-কাল-স্থান-মতাদর্শের উর্ধ্বে অক্ষয় মর্যাদার অধিকারী মহিমান্বিত সত্তা।

ফররুখ আহমদ নিঃসন্দেহে এ বিরল গুণের অধিকারী এক অমর কবি-সত্তা। তিনি একজন যথার্থ শিল্পী-কবি। বিশিষ্ট সাহিত্য-সমালোচক মুজীবুর রহমান খাঁর ভাষায় : "ফররুখ আহমদের আসল পরিচয় হল, তিনি শিল্পী-কবি। রং ও রূপের, বর্ণ এবং তার সাথে গন্ধের আলো ছায়া এবং মোহের আবিষ্টতা নিয়ে যে সব খেলার চাতুরী দেখান, তারাই শিল্পী-কবি। তাঁদের কবিতা চিত্রধর্মী এবং তাঁরা আরো কিছু। ফররুখ আহমদের কবিতা পড়তে পাঠক-মন অলক্ষ্যে ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিক ও তার পরবর্তী প্রি-র‍্যাফেলাইট (Pre-Raphalite) কবিদের রাজ্যে চলে যায়। রোমান্টিক কবিদের মধ্যে কীট্‌সের কবিতার রঙ্গ-প্রাচুর্যের তুলনা নাই। প্রি-র‍্যাফেলইটদের মধ্যে মরিস, সুইনবার্ন এবং দেহাতিসারী স্বপ্নাতুরতা আনতেন, তার সাথে ফররুখ আহমদের গভীর সাদৃশ্য আছে।"

বাংলা কাব্যে ফররুখ আহমদ এ রং, রূপ, আলো ও সুগন্ধির জাল কত অপরূপ সুন্দর কাব্য-ভাষায় শৈল্পিক বৈভবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা ভাবতে বিস্ময়বোধ হয়। দু' একটি উদাহরণ–

কত যে আঁধার পর্দা পারায়ে ভোর হল জানি না তা'
নারঙ্গি বনে কাঁপছে সবুজ পাতা। **(সাত সাগরের মাঝি : সাত সাগরের মাঝি)**

নীল দরিয়ার যেন সে পূর্ণ চাঁদ,
মেঘ তরঙ্গ কেটে কেটে চলে ভেঙ্গে চলে সব বাঁধ। **(ঐ :ঐ)**

তুমি কি ভূলেছ লবঙ্গ ফুল, এলাচের মৌসুমী,
যেখানে ধূলিতে, কাকরে দিনের জাফরান খোলে কলি,
যেখানে মুগ্ধ ইয়াস্‌মিনের শুভ্র ললাট চুমি
পরীর দেশের স্বপ্ন-সেহেলি জাগে গুলে বকাওলী। **(ঐ :ঐ)**

এ নয় জোছনা-নারিকেল শাখে স্বপ্নের মর্মর,
এ নয় পরীর দেশের ঝরোকা নারঙ্গী বন্দর
এবার তোমার রুদ্ধ কপাটে মানুষের হাহাকার
ক্ষুধিত শিশুর কান্নায়, শেষ সেতারের ঝংকার। **(ঐ: ঐ)**

এখানে এখন রাত্রি এসেছে নেমে,
তবু দেখা যায় দূরে বহুদুরে হেরার রাজ-তোরণ,
এখানে প্রবল ক্ষুধায় মানুষ উঠছে কেঁপে
এখানে এখন অজস্র ধারা উঠছে দু' চোখ ছেপে
তবু দেখা যায় দূরে বহু দূরে হেরার রাজ-তোরণ...
কাঁকর বিছানো পথ,
কত বাধা কত সমুদ্র, পর্বত,
মধ্যদিনের পিশাচের হামাগুড়ি,
শকুনি ফেলেছে ছায়া আমাদের মাথার উপরে উড়ি,
ফেলেছি হারায়ে তৃণ ঘন বন, যত পুষ্পিত বন,
তবু দেখা যায় দূরে বহুদূরে হেরার রাজ-তোরণ...
শাহী দরজার সকল কপাট অনেক আগেই খোলা,
অনেক আগেই সেখানে দ্বাদশী জোছনা দিয়েছে দোলা। **(ঐ:ঐ)**

নল বনে জোস্নার বাঁশি/ছড়ায় সুরের আস্তরণ
ঝিম হয়ে আসে সেই সুরে সকল আকাশ/নদী বন।
**(মধুমতীর তীরে : হে বন্য স্বপ্নেরা)**

ফররুখ আহমদের কাব্যে ভাব-কল্পনা ও অনুভূতির কোরক পুষ্পিত হয়েছে নানা বর্ণ, সুষমা, রং ও আলোর অসাধারণ দীপ্তি ও কোমল স্নিগ্ধতায় যথাযোগ্য ও বৈশিষ্ট্যময় শব্দচয়নে, ছন্দ ও সুরের মোহনীয় ব্যঞ্জনায় কবি যে বর্ণ, চিত্র ও অভিনব দ্যোতনা সৃষ্টি করেছেন তা এককথায় অনবদ্য ও শিল্প-সৌকর্যে অপরূপ। কবির বর্ণনায় যে দীপ্তি ও স্নিগ্ধতা ফুটে উঠেছে সেটাকে নানা বর্ণাঢ্যতায় মাধুর্য্যময় করে তুলেছে উপমা-রূপক-প্রতীক-রূপকল্পের নৈপুণ্যময় অভিনব ব্যবহারে।

উপমা-রূপক-প্রতীক সাধারণত তিন প্রকার–প্রকৃতিজাত, বুদ্ধিজাত ও ইতিহাস-ঐতিহ্যসম্পৃক্ত। ফররুখ আহমদ সব ধরনের রূপক-উপমা-প্রতীক ব্যবহার করলেও ঐতিহ্য-সম্পৃক্ত উপমা-রূপক ব্যবহারে তাঁর আগ্রহ সমধিক। তাছাড়া, তিনি গতানুগতিকভাবে কোন কিছু ব্যবহার করেননি, সবকিছুর মধ্যেই তাঁর একটি নিজস্বতা ও অভিনবত্ব বিদ্যমান। ফলে নিজেকে তিনি একজন স্বতন্ত্র ও উজ্জ্বলতর কবি-ব্যক্তিত্ব হিসাবে চিহ্নিত করতে পেরেছেন। এক্ষেত্রে ফররুখ শুধু অনন্যসাধারণ নয়, নিজস্ব পরিচয়ে সমুজ্জ্বল এক বিরল প্রতিভা। এ প্রসঙ্গে দু' একটি উদাহরণ দিচ্ছি–

আল্‌বুর্‌জের চূড়া যেন এক উড়ে আসে কালো দেউ
বজ্রের বেগে পাটাতনে ভাঙ্গে পাহাড়ের মত ঢেউ,
দিনের আকাশে একী জুলমাত মাঝি!

**(বা'র দরিয়ায় : সাত সাগরের মাঝি)**

চাঁদির তখতে চাঁদ ডুবে যায়/পাহাড় পেতেছে জানু,
নতুন আকাশে জীবনের সুর/জাগাও হাসিন বানু।

**(শাহরিয়ার : সাত সাগরের মাঝি)**

রাত্রিভর ডাহুকের ডাক...
এখানে ঘুমের পাড়া, স্তব্ধ দীঘি অতল সুপ্তির।
দীর্ঘ রাত্রি একা জেগে আছি।

**(ডাহুক : সাত সাগরের মাঝি)**

গোধূলী-তরল সেই হরিণের তনিমা পাটল
-অস্থির বিদ্যুৎ, তার বাঁকা শিঙে ভেসে এল চাঁদ

**(বন্দরে সন্ধ্যা : সাত সাগরের মাঝি))**

আল-বোরজের চূড়া পার হ'ল যে স্বর্ণ-ঈগল
গতির বিদ্যুৎ নিয়ে, উদ্দাম ঝড়ের পাখা মেলে,

... ... ... ... ... ...

সূর্য আজ ডুব দিল অক্সাসের তটরেখা পারে,
আসন্ন সন্ধ্যার কালি নিয়ে এল পুঞ্জীভূত শোক,
পাহাড় ভুলের বোঝা রুদ্ধ পথে দাঁড়ালো নির্মম।

এখানে বহেনা হাওয়া এ বিস্তীর্ণ প্রান্তরের ধারে,

এই অজগর রাত্রি গ্রাসিয়াছে সকল আলোক,
সোহরাবের লাশ নিয়ে জেগে আছে নিঃসঙ্গ রুস্তম।

**(স্বর্ণ ঈগল : সাত সাগরের মাঝি)**

কে আসে, কে আসে সাড়া পড়ে যায়,
কে আসে কে আসে নতুন সাড়া।
জাগে সুষপ্ত মৃত জনপদ, জাগে শতাব্দী ঘুমের পাড়া।
হারা সম্বিত ফিরে দিতে বুকে আনো আলো প্রিয় আবহায়াত,
জানি সিরাজাম মুনীরা তোমার রশ্মিতে জাগে কোটি প্রভাত,

**(সিরাজাম মুনীরা হযরত মুহম্মদ (সাঃ) : সিরাজাম মুনীরা)**

প্রত্যেক কবির প্রকাশ-ভঙ্গী তাঁর নিজস্ব। প্রকাশের ক্ষেত্রে কবির স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্বতা যত সুস্পষ্ট হয়, কবিকে সনাক্ত করাও ততটা সহজ হয় এবং সেটাকে তাঁর বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য করা হয়। এ স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্বতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে শব্দ-নির্বাচন একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয়। সুনির্বাচিত, সুসংগত, সুপরিমিত ও শব্দের ব্যবহারে যে কবি তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের পরিচয় সুস্পষ্ট করে তুলতে সক্ষম, প্রকৃতপক্ষে তিনিই বড় কবি। তিনিই নিজস্ব কাব্য-ভাষা নির্মাণে সফল এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁকে একজন মৌলিক কবি বলা যায়। নিজস্ব কাব্যভাষা নির্মাণ কেবল বড় ও মৌলিক কবির পক্ষেই সম্ভব।

উপরোক্ত নিরিখে আধুনিক বাংলা কাব্যে নিজস্ব ও স্বাতন্ত্রিক মহিমায় উজ্জ্বল কাব্য-ভাষা নির্মাণে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্‌দীন প্রমুখ অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার সাথে সাথে বাংলা ভাষাকেও নানাভাবে মাধুর্যময় ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তুলেছেন। নানা রূপরীতি, ছন্দ ও উপমা-রূপক-অলংকারের সৌকর্যে বাংলা ভাষাকে তাঁরা বিচিত্র বর্ণ-সুষমায় সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। তাঁদের পরে নিঃসন্দেহে এক্ষেত্রে সর্বাধিক কৃতিত্বের অধিকারী, ফররুখ আহমদ। ফররুখ আহমদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাব্য-ভাষার দু'একটি উদাহরণ–

কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ,
শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সাফেদ চাঁদির তাজ,
পাহাড়-বুলুন্দ ঢেউ বয়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক;

**(সিন্দবাদ : সাত সাগরের মাঝি)**

আহা, সে নিকষ আকীক বিছানো কতদিন পরে ফিরে,
ডেকেছে আমাকে নীল আকাশের তীরে, (ঐ:ঐ)

ঘন সন্দল কাফুরের বনে ঘোরে এ দিল বেহুঁশ,
হাতীর দাঁতের সাজোয়া পরেছে শিলাদৃঢ় আবলুস,

পিপুল বনের ঝাঁজালো হাওয়ায় চোখে যেন ঘুম নামে,
নামে নির্ভীক সিন্ধু ঈগল দরিয়ার হাম্মামে। (ঐ : ঐ)

রোষে ফুলে ওঠে কালাপানি যেন সুবিশাল আজদাহা
মউজের মুখে কোন স্রোতে মোরা হব ফিরে গুমরাহা
কোথায় খুলবে নওল উষার রশ্মিধারা শফেদ; (ঐ : ঐ)

সেকথা জানি না, মানি না সে কথা দরিয়া ডেকেছে নীল।
খুলি জাহাজের হালে উদ্দাম দিগন্ত ঝিলমিল,
জংগী জোয়ান দাঁড় ফেলে করি দরিয়ার পানি চাষ,
আফতাব ঘোরে মাথার উপরে মাহ্তাব ফেলে দাগ; (ঐ : ঐ)

জড়ো করি লাল, পোখরাজ আর ইয়াকুত ভরা দিন
দরিয়ার বুকে নামায়েছি ফের বে-দেরেগ সংগিন,
সমুদ্র-সিনা ফেড়ে, ছুটে চলে কিশ্‌তী, স্বপ্ন সাধ;
নতুন পানিতে সফর এবার, হে মাঝি সিন্দবাদ।
ভেঙ্গে ফেল আজ খাকের সমতা আকাশে উঠেছে চাঁদ,
দরিয়ার বুকে দামাল জোয়ার ভাঙ্গছে বালুর বাঁধ।
ছিড়ে ফেলে আজ আয়েশী রাতের মখমল-অবসাদ,
নতুন পানিতে হাল খুলে দাও, হে মাঝি সিন্দবাদ।
(ঐ :ঐ)

সিন্ধু ঈগল পাড়ি দেয় পাশে ফেন উত্তাল রাত,
ঝলসায় কালো মেহরাবে তাজা মুক্ত নীল প্রভাত,
(বার দরিয়া : সাত সাগরের মাঝি)

সময়-শাশ্বত, স্থির। শুধু এই খঞ্জন চপল
প্রতিমান মুহূর্তের খরস্রোতে উদ্দাম, অধীর
মৌসুমী পাখীর মত দেখে এসে সমুদ্রের তীর,
সফেদ, জরদ, নীর বর্ণালিতে ভরে পৃথ্বীতল।
সন্ধ্যাগোধূলির রঙে জান্নাতের এই পাখী দল
জীবনের তপ্ত শ্বাসে, হৃদয়ের সান্নিধ্যে নিবিড়,
অচেনা আকাশ ছেড়ে পৃথিবীতে করে আসে ভীড়;
গেয়ে যায় মুক্তকণ্ঠে মৃত্যুহীন সঙ্গীত উচ্ছল। (মুহূর্তের কবিতা : মুহূর্তের কবিতা)

উদ্ধৃতির বাহুল্যে নিবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে কখনো কখনো বক্তব্যের চেয়ে দৃষ্টান্ত অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও চিত্তাকর্ষক হয়। ফররুখ সম্পর্কে এ কথা অধিকতর সত্য যে, তাঁর কবিতা পাঠের মাধ্যমেই তাঁর সম্পর্কে প্রকৃষ্ট ধারণা লাভ সম্ভব। সে কারণেই তাঁর কবিতা থেকে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করা

হলো। এ থেকে ফররুখের শব্দ-নির্বাচন, শব্দের বিচিত্র ও তাৎপর্যময় বিন্যাস এবং বিভিন্ন ধরনের উপমা-প্রতীক-রূপক-রূপকল্পের অসাধারণ নৈপুণ্যময় ব্যবহার কাব্যামোদীদেরকে বিস্ময়-পুলকে অভিভূত করে। তিনি শব্দ-ছন্দ-উপমা-প্রতীক-রূপক-রূপকল্পের সমন্বিত কুশলী বিন্যাসে অসাধারণ সুর ও ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেন, যা শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে হৃদয়-তন্ত্রীতে প্রবিষ্ট হয়ে গভীর অনুরণন সৃষ্টি করে। এখানেই ফররুখের প্রকৃত কৃতিত্ব এবং এজন্যই তাঁর কবিতাকে যথার্থ শিল্পরূপে গণ্য করা হয়।

কবিরা সাধারণত মনের ভাব-কল্পনা-অনুভূতিকে শব্দ, ছন্দ, উপমা-রূপক-অলংকারের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। এ প্রকাশের ক্ষেত্রে সকলেই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু কিছু অভিনবত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়ে থাকেন। এরদ্বারাই তাঁদের কাব্যের মূল্যায়ন করা হয়। বিভিন্নভাবে যে যত বেশি অভিনবত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিতে সক্ষম, কাব্য-বিচারে তিনি তত বেশি সার্থক। প্রকৃত বড় কবি সাধারণত গতানুগতিকতার ঊর্দ্ধে উঠে শব্দ নিয়ে খেলা করেন, শব্দ ভেঙ্গেচুরে ছন্দের জাদুকরী সম্মোহন সৃষ্টি করেন এবং প্রায়ই উপমা-রূপক-অলংকারের নৈপুণ্যময় ব্যবহারে অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা, সুর ও চিত্রল রূপময় ভুবন নির্মাণ করেন। এটা কোনো সাধারণ কাজ নয়, এ অসাধারণ কাজের কারিগরকে শুধু কবি বললে যথার্থ বলা হয় না, তিনি প্রকৃত অর্থে শিল্পী কবি। ফররুখ নিঃসন্দেহে তেমনি একজন অনন্য কবি প্রতিভা। তিনি তাঁর অজস্র শব্দভাণ্ডার থেকে সুনির্বাচিত ও পরিমিত শব্দ দিয়ে নির্মিত কবিতার গতরে ছন্দের সুরেলা স্পন্দন সৃষ্টি করেন, রূপক-উপমা-অলংকারের ব্যতিক্রমী ব্যবহারে চিত্রময়, রূপময়, আলো-গন্ধময় কবিতার এক সুস্নিগ্ধ মায়াবি ভুবন নির্মাণ করেন। সেজন্য এটাকে শুধু কবিতা বললে যথেষ্ট বলা হয় না, এ এক অনিন্দ্য শিল্প।

ফররুখ আহমদ তাই কোনো সাধারণ কবি নন, তিনি কবিদের কবি, একজন অসাধারণ শিল্পী কবি। কেবল বাংলা সাহিত্যে নয়, সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যে এধরনের শিল্পী কবি নিতান্ত বিরল। বাংলা কাব্যে ফররুখ আহমদের পূর্বে মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ দাস ও জসীমউদ্‌দীনকেই কেবল এধরনের শিল্পী কবি বলে আখ্যায়িত করা যায়।

# ফররুখ কাব্যে বৈচিত্র্য

মুহম্মদ মতিউর রহমান

মানুষ বৈচিত্র্য পছন্দ করে। বৈচিত্র্যের মধ্যে যেমন নতুনত্ব থাকে, তেমনি তা নানাভাবে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কবি-শিল্পীরা অধিক মাত্রায় বৈচিত্র্য-প্রয়াসী। বৈচিত্র্যের মাধ্যমে নতুন সৃষ্টি ও অভিনব শিল্প-সৌকর্যের প্রকাশ ঘটে। সৃজনশীলতার ধর্মই বৈচিত্র্য-সাধন। যখন কেউ কোন কিছু সৃষ্টি করতে চায়, তখন সে চায় সেটা তার নিজস্ব হয়ে উঠুক, অন্যদের থেকে তা আলাদা রূপ পরিগ্রহ করুক। কবিদের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের অর্থ হলো ভাব-বিষয়-কল্পনা, প্রকাশ-রীতি, প্রকাশ-ভঙ্গী, শব্দালংকার ও ছন্দ ব্যবহার এবং ব্যঞ্জনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে কুশলতা ও অভিনবত্ব প্রদর্শন। এক্ষেত্রেই প্রতিভার স্ফুরণ ও স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ ঘটে।

কবিতা মূলত শিল্প। শিল্পী যেমন ইজেলে রং-তুলির সাহায্যে কল্পনার আমেজ মিশিয়ে নিজস্ব সৃষ্টি-কর্ম সম্পন্ন করেন, কবিরাও তেমনি শব্দ-অলংকার-ছন্দ ও উপমা-রূপক-চিত্রকল্পের মাধ্যমে নিজস্ব কল্পনার রং-তুলির স্পর্শে কাব্যের স্বকীয় আলাদা ভুবন নির্মাণ করেন। এক্ষেত্রে প্রত্যেক কবিই যে সমান দক্ষ, তা নয়। আবার এসবের ব্যবহারেও প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাব-কল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করে স্বকীয় স্টাইল বা ভঙ্গীর মাধ্যমে নিজস্ব কিছু নির্মাণের প্রয়াস পান। এ স্বতন্ত্র নির্মাণ-কৌশল ও ভঙ্গীর দ্বারাই বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। এ বৈচিত্র্য সৃষ্টির ক্ষমতা যার যত বেশী এবং যার বিচিত্র সৃষ্টি-কৌশল মানুষের মন যত আকর্ষণ করতে সক্ষম, তিনি তত বেশী অসাধারণ বা দক্ষ শিল্পী হিসাবে সমাদৃত হন।

ফররুখ আহমদও বৈচিত্র্য-প্রয়াসী। একজন শক্তিমান মৌলিক কবি হিসাবে তাঁর বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াস অধিকমাত্রায় লক্ষ্যযোগ্য। সেজন্য সাধারণ কবিদের থেকে তিনি হয়ে উঠেছেন বহুলাংশে স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে তাঁর নিজস্বতা বা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, তিনি হয়ে উঠেছেন এক অসাধারণ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ কবি-প্রতিভা। তাঁর কাব্যের ভাব-বিষয়, ভাষা, শব্দ-চয়ন কৌশল, উপমা-রূপক-চিত্রকল্পের ব্যবহার ও সর্বোপরি কাব্যের আবহ ও আবেদন সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর যে স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, সেটাই তাঁকে একজন শক্তিমান মৌলিক কবির শিরোপা দান করেছে।

মূলত প্রত্যেক কবিই কম-বেশী মৌলিকতার অধিকারী। কেননা, একজন কবি বা শিল্পীর সৃষ্টি হুবহু অন্য আর একজনের মতো নয়। প্রত্যেকের চেহারার মধ্যে যেমন ভিন্নতা আছে, প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যেও রয়েছে তেমনি এক ধরনের নিজস্বতা, যা অন্যদের থেকে তাকে আলাদা পরিচয়ে চিহ্নিত করে। শুধু সে অর্থেই ফররুখ আহমদকে একজন মৌলিক কবি বললে যথেষ্ট বলা হয় না। মৌলিকত্বের প্রকাশে

তিনি সর্বক্ষেত্রে অনেকের তুলনায় উজ্জ্বল। তাই তাঁকে বাংলা সাহিত্যের প্রধান মৌলিক কবিদের অন্যতম হিসাবে গণ্য করা হয়। নিঃসন্দেহে তিনি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মৌলিক কবিদের একজন।

প্রথমত ভাব, বিষয় ও কল্পনার ক্ষেত্রে ফররুখ আহমদ যে বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব নিয়ে এসেছেন, তা আলোচনা করা যেতে পারে। আধুনিক বাংলা কাব্যের সূচনা হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-৭৩) হাতে। ইংরাজি ভাষা-সাহিত্য অধ্যয়নের ফলে পাশ্চাত্য রীতির অনুসরণে তিনি বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার প্রবর্তন করেন। তাঁর রচিত এ আধুনিক সাহিত্য ভাবের দিক থেকে প্রাচীনপন্থী, কল্পনার দিক থেকে আধুনিক এবং বিষয়ের দিক থেকে পৌরাণিক। মধুসূদনের পরবর্তী কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৫-১৯০৩), নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) প্রমুখ মধুসূদনকে অনুসরণ করে কাব্য-চর্চা শুরু করলেও বিষয়ের দিক থেকে তাঁরা পৌরাণিক, ভাবের দিক থেকে হিন্দু এবং কল্পনার দিক থেকে প্রাচীনপন্থী।

মহাকবি কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২) কাব্য-চর্চায় পূর্বোক্তদের থেকে কিছুটা বৈচিত্র্য নিয়ে এলেও এ বৈচিত্র্য মূলত বিষয়ের ক্ষেত্রে, অন্য আর কোন ক্ষেত্রে তেমন লক্ষণীয় নয়। বিষয় হিসাবে তিনি গ্রহণ করেন ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্য। ভাবের দিক থেকে তিনি ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসু মুসলিম, তবে কল্পনার দিক থেকে তিনিও অনেকটা প্রাচীনপন্থী। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বিস্ময়করভাবে বহুলাংশে তাঁর পূর্বসূরি মধুসূদনের সমগোত্রীয় অর্থাৎ বিষয়ের দিক থেকে তিনিও পৌরাণিক, ভাবের দিক থেকে অনেকটা পাশ্চাত্যপন্থী এবং কল্পনার দিক থেকে আধুনিক। রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল সাহিত্য চর্চায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন। তাঁর সৃষ্টি-বৈচিত্র্য ও পরিমাণও অন্য সকলের চেয়ে অধিক ও আকর্ষণীয়। তাঁর ভাষা ও প্রকাশ-রীতিও আধুনিক ও তাঁর নিজস্ব ।

রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। বলতে গেলে, তাঁর পূর্বসূরিদের থেকে তিনি সম্পূর্ণ আলাদা। রবীন্দ্র-যুগে জন্মগ্রহণ করে রবীন্দ্র-বলয়ে বেড়ে ওঠা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ থেকে তিনি ভিন্ন। বিষয়ের দিক থেকে তিনি ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যানুসারী, ভাবের দিক থেকে বিপ্লবী, স্বাদেশিক ও নিপীড়িত মানবতার সপক্ষে এবং কল্পনার দিক থেকে সম্পূর্ণ আধুনিক ও রোমান্টিক। তাঁর সৃষ্টি-বৈচিত্র্য অসাধারণ ও আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। তাঁর কাব্যে একদিকে যেমন বিদ্রোহের রণতূর্য নিনাদিত, অন্যদিকে তেমনি সনাতন প্রেমের করুণ-বিধুর রস সঞ্চারিত। তাঁর কাব্যের ভাব-ভাষা-বিষয় ও আবেদন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট।

নজরুলের পরে বাংলা কাব্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কবিদের অন্যতম ফররুখ আহমদ। নজরুলের সাথে ফররুখ আহমদের বহুদিক থেকে সাজুয্য রয়েছে। বিষয়ের দিক থেকে ফররুখ ইসলাম ও মুসলিম ঐতিহ্যের অনুসারী, ভাবের দিক থেকে আধ্যাত্মিক ও মানবতাবাদী, ভাষার দিকে থেকে তিনি অনেকটা নজরুল-অনুসারী,

প্রকাশভঙ্গীর ক্ষেত্রে আধুনিক এবং কল্পনার দিক থেকে তিনি সম্পূর্ণ রোমান্টিক ও পুনর্জাগরণ-প্রয়াসী। ফররুখ আহমদের বিভিন্ন রচনাবলী অধ্যয়ন করলে আমরা এর যথার্থতা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। এ বৈচিত্র্য প্রত্যেক কবি-স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক কবিকে তাঁর স্বমহিমায় সমুদ্ভাসিত করে।

ফররুখ আহমদের সৃষ্টি-বৈচিত্র্যও কম নয়। বাংলা কাব্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে ফররুখের কবি-সত্তা সর্বাধিক উজ্জ্বল। তাঁর কবিতার ভাব, ভাষা, গঠনশৈলী, প্রকাশভঙ্গি ও আবেদন তাঁর নিজস্ব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। তাঁর এ স্বাতন্ত্র্য তাঁকে একজন শ্রেষ্ঠ মৌলিক কবির মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। প্রকাশ-রীতির ক্ষেত্রে ফররুখ বৈচিত্র্য-প্রয়াসী। আধুনিক কাব্য-রীতির প্রায় সব ক্ষেত্রেই তাঁর অনায়াস বিচরণ। গীতি-কবিতা, সনেট, মহাকাব্য, শিশুতোষ-কাব্য, ব্যঙ্গ-কাব্য, নাট্য-কাব্য, গীতি-নাট্য, গান-গজল, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। এর কোন ক্ষেত্রে তাঁর অবদান হয়ত বেশী, কোন ক্ষেত্রে কম, কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই তাঁর অবদান বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, বর্ণাঢ্য ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তিমান। গীতি-কবিতা, সনেট, শিশুতোষ-কাব্য, ব্যঙ্গ-কবিতা, মহাকাব্য, নাট্য-কাব্য ও গীতি-নাট্য রচনার ক্ষেত্রে ফররুখ আহমদের অবদান সম্পর্কে আমরা যদিও অধিক আলোচনা করে থাকি, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর অবদানও মোটেই উপেক্ষণীয় নয়।

বিশেষত প্রকাশ-রীতির ক্ষেত্রে ফররুখের বৈচিত্র্য সর্বজনবিদিত। এক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব উজ্জ্বল ভঙ্গী রয়েছে। তাঁর পূর্বসূরিদের থেকে তিনি এক্ষেত্রে আলাদা, নিজস্ব স্টাইল তৈরিতে তিনি নৈপুণ্য অর্জন করে সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শব্দ-চয়ন, বিভিন্ন ছন্দের অনুশীলন, অলংকার ব্যবহার, রূপক-উপমা-রূপকল্প ইত্যাদির ব্যবহারে ফররুখ তাঁর কাব্যের নিজস্ব রং, বর্ণ ও সৌন্দর্য সৃষ্টিতে পারঙ্গমতা প্রদর্শনে সক্ষম হয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি শুধু একজন দক্ষ শিল্পী নন, বৈচিত্র্য-প্রয়াসী এক অসাধারণ শিল্পী।

শব্দ-চয়ন, অলংকার, উপমা, রূপক, প্রতীকের ব্যবহার ও রূপকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে ফররুখের বিশেষ নৈপুণ্য ও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এক্ষেত্রে তিনি সম্ভবত ইংরাজ কবি টি.এস.এলিয়টকে অনেকটা অনুসরণ করেছেন। তিরিশোত্তর যুগের প্রধান কবি জীবনানন্দ দাসের (১৮৯৯-১৯৫৪) সাথেও এক্ষেত্রে তাঁর অনেকটা মিল লক্ষ্য করা যায়। তবে জীবনানন্দের ঐতিহ্য-চেতনা থেকে ফররুখ আহমদ সম্পূর্ণ ভিন্ন। জীবনানন্দ দাস ব্যক্তি-জীবনে নিরীশ্বরবাদী হলেও, কাব্য-ক্ষেত্রে তিনি হিন্দু-পৌরাণিক ঐতিহ্যের অনুসারী। অন্যদিকে, ফররুখ আহমদ ব্যক্তিজীবনে যেমন নিষ্ঠাবান মুসলিম, তেমনি কাব্যক্ষেত্রেও ইসলামী ভাব ও ঐতিহ্যের অনুসারী। তাই উভয়ের কাব্যে ভিন্ন ঐতিহ্যের প্রতিফলন একান্ত স্বাভাবিক। মূলত উভয় কবির ঐতিহ্য ও ভাব-প্রেরণা ভিন্ন হলেও নিজ নিজ ঐতিহ্য ও ভাব-সম্পদে উভয় কবিই দীপ্ত-সমুজ্জ্বল এবং রূপক-উপমা-চিত্রকল্প ব্যবহারে উভয়

কবির নৈপুণ্য, নিজস্বতা ও পারদর্শিতা সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে।

প্রতীকের ব্যবহারেও উভয়ে স্বতন্ত্র। প্রতীক সাধারণত তিন প্রকার–প্রকৃতিজাত, বুদ্ধিজাত ও ঐতিহ্য-লালিত। এ উভয় প্রকার প্রতীকের ব্যবহারেই জীবনানন্দ যেমন সফল, ফররুখ আহমদও তেমনি। কে বেশী সফল আর কে কম সফল সে বিবেচনা অবান্তর। উভয় কবির মধ্যে অনেক বিষয়ে ভিন্নতা ও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। এ স্বাতন্ত্র্যের গুণেই উভয়েই বড় কবির মর্যাদা পেয়েছেন। তাই তুলনামূলক আলোচনা না করে শুধু এটুকু বলা যায় যে, কবিতার শিল্প-সৌকর্য সম্পর্কে উভয়েই ছিলেন অতিমাত্রায় সচেতন এবং জীবনানন্দ প্রতীকের ব্যবহারে যেমন হিন্দু-ঐতিহ্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, ফররুখ আহমদ তেমনি প্রতীক ব্যবহারে মুসলিম ঐতিহ্যের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতিজাত ও বুদ্ধিসঞ্জাত রূপক-উপমা-প্রতীকের ব্যবহারে উভয়েই গতানুগতিকতা পরিহার করে স্বাতন্ত্র্য ও অভিনবত্ব প্রকাশে সক্ষম হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে উভয়ের পথ ও মানস-প্রকৃতি ভিন্ন হলেও তা সমভাবে প্রশংসনীয়।

ভাবের দিক থেকে ফররুখ আহমদ আধ্যাত্মিক চেতনা-সমৃদ্ধ ও মানবতাবাদী। ইসলামী বিশ্বাস, তৌহিদবাদ ও ইহ-পারলৌকিক চিন্তা-চেতনায় তিনি একান্তভাবে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। তাঁর মানবতাবাদী চেতনার সাথে ইসলামী আদর্শের কোন সংঘাত নেই। বরং ইসলামী আদর্শের মধ্যে যে উদার মানবিক চেতনা বিদ্যমান, ফররুখ আহমদ সে মানবিক চেতনায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী এবং উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, উদার মানবতাবাদ ব্যক্তি জীবনে যেমন কাব্যিক ক্ষেত্রেও তেমনি তাঁকে সর্বদা অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর কাব্য-চর্চায় এর যথার্থ প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। এ কারণে অনেকে তাঁকে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন বলে মনে করেন। এটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ইসলাম কোন সাম্প্রদায়িকতা শিক্ষা দেয় না। ইসলামে সকল মানুষ সমান, মানুষ হিসাবে কেউ ছোট বা বড় নয়। ইসলামে কোন ভেদাভেদ নেই, এটা সকল মানুষের জন্য বিশ্ব-স্রষ্টার দেয়া এক ঐশী বিধান। তাই সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন এখানে সম্পূর্ণ অবান্তর। ফররুখ আহমদের 'হাতেম তায়ী', 'নৌফেল ও হাতেম', এমনকি, 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্য পাঠেও আমরা এর যথার্থতা উপলব্ধি করতে পারি। মূলত শুধু দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা উপরোক্ত তিনটি কাব্যের উল্লেখ করলেও তাঁর সমগ্র রচনাবলীর মধ্যেই এ মানবতার সুর অনুরণিত।

ফররুখ আহমদের লেখায় স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতা-প্রীতির ঐকান্তিক পরিচয় বিদ্যমান। তাঁর কাব্য-চর্চার শুরু বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে। এ সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে সারা দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অনাহারে লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। ফররুখ আহমদ এ দুর্ভিক্ষের বর্ণনা দিয়ে অনেক কবিতা লিখেছেন। মানবতার অবক্ষয় এবং এক শ্রেণীর অল্পসংখ্যক মানুষের সীমাহীন লোভ লক্ষ লক্ষ মানুষকে কীভাবে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে তিনি তাঁর কবিতায় তার মর্মন্তুদ চিত্র অঙ্কন করেছেন। ঐ সময় ইংরাজদের বিরুদ্ধে সমগ্র উপমহাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন

প্রবলভাবে দানা বেঁধে ওঠে। ফররুখ আহমদ তখন নির্লিপ্ত ছিলেন না, স্বাধীনতার পক্ষে তিনি গান-কবিতা লিখেছেন, স্বজাতিকে স্বাধীনতা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। ফররুখ আহমদ যে একজন কাল-সচেতন কবি, এসব থেকে সেটাই প্রমাণিত হয়। কালিক অবস্থা, সমস্যা-সংক্ষোভ, হতাশা-প্রত্যাশা এবং জাতির স্বপ্ন-কল্পনা ইত্যাদি তাঁর কাব্য-কবিতায় প্রবলভাবে সোচ্চারিত।

উপমহাদেশে সমকালীন মুসলমানদের নিকট তখন স্বাধীনতা বলতে শুধু ইংরাজ বিতাড়ন নয়। ইংরাজদের সরিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের অধীনতাপাশে আবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা মুসলমানদের ছিল না। একাধারে ইংরাজ বিতাড়ন ও উপমহাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকা নিয়ে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রত্যাশা ছিল মুসলমানদের। ইংরাজ আমলে উপমহাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠী ছিল বিভিন্নভাবে বঞ্চিত, নিগৃহীত ও উপেক্ষিত। ইসলামের ভিত্তিতে তারা এক স্বতন্ত্র, স্বাধীন, নিজস্ব আবাস-ভূমি গড়ে তোলার স্বপ্নে ছিল বিভোর। ফররুখ আহমদ এ স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে ও মুসলমানদের স্বতন্ত্র, স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে লেখনী পরিচালনা করেন। ঐ সময় মুসলিম কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিক-রাজনীতিবিদ সকলেই এ একই আবেগ-অভীপ্সা ও লক্ষ্য সামনে নিয়ে কাজ করেছেন। ফররুখ আহমদও তাঁদের মতোই তাঁর বিভিন্ন কাব্য-কবিতায় স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতা-প্রীতির প্রবল প্রকাশ ঘটিয়েছেন, মুসলিম নবজাগরণের প্রাণবন্ত অভীপ্সা সেখানে ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' (১৯৪৪), দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'আজাদ করো পাকিস্তান' (১৯৪৬) ও এ সময়ে লেখা বিভিন্ন কবিতায়, যার অধিকাংশ পরবর্তিতে 'হে বন্য স্বপ্নেরা', 'কাফেলা' ইত্যাদি গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে, তাতেও ঐ সময়কার আবেগ-অভীপ্সার বর্ণাঢ্য প্রকাশ ঘটেছে।

এ দিক থেকে ফররুখ আহমদ যথার্থই তাঁর দেশ ও জাতির প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি ছিলেন কাল-সচেতন, গণ-সংশ্লিষ্ট কবি, সমকালের বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনা তাঁর মনে যে আবেগ-অনুভূতির সৃষ্টি করেছে, তিনি তাঁর অকপট প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাঁর কাব্যে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরেও তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে সোচ্চার ছিলেন। মূলত তিনি ছিলেন এক প্রতিবাদী কবি। মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর কলম ছিল শানিত কৃপাণের মতো। কবিরা মূলত স্বাপ্নিক ও দিশারী হিসাবে কাজ করেন। দেশ ও জাতিকে তাঁরা স্বপ্ন দেখান, নতুন পথের হদিস বাতলে দেন। ফররুখ আহমদ তাঁর বিভিন্ন কাব্য-কবিতায় এ স্বপ্নের কথা বলেছেন, স্বদেশবাসীকে তাঁর লেখার মাধ্যমে পথের দিশা দেখিয়েছেন। এভাবে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা , স্বপ্ন-অভীপ্সার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর রচিত কাব্য-কবিতা ও গানে।

পাকিস্তান সৃষ্টির পরেও কিছুটা ভিন্ন আঙ্গিকে তাঁর এ দেশপ্রেম ও স্বদেশ-প্রীতির পরিচয় ফুটে উঠেছে তাঁর বিভিন্ন লেখায়, বিশেষত ব্যঙ্গ কবিতায়। সময় ও পরিস্থিতির কারণেই তিনি এ সময় তাঁর কবিতায় নতুন ফরম বা রীতির আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। ব্যঙ্গ-কবিতার আকারে তিনি এ সময় অসংখ্য কবিতা লিখে সমাজের

বিভিন্ন অনাচার, অনিয়ম, বিশৃংখলা ও অন্যায়-অবিচারের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। উল্লেখ্য যে, ফররুখ আহমদ বাংলা সাহিত্যে সর্বাধিক সংখ্যক ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেন। শুধু সংখ্যার দিক দিয়ে নয়, কাব্য-গুণেও তা উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হতে পারে। বাংলা ব্যঙ্গ কবিতার ধারায় ফররুখ আহমদের এ অবদান যেমন বিস্ময়কর তেমনি অবিস্মরণীয়।

কাব্যে নিজস্ব জীবন-পরিমণ্ডল, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিবরণ ও আবহ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ফররুখ আহমদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে তাঁর কল্পনার দিগন্তচারী অনন্ত বিস্তার ঘটেছে। একদিকে, বাংলার বিচিত্র, সবুজ-শ্যামল প্রকৃতি ফররুখ আহমদের কাব্যে যেমন বর্ণাঢ্যরূপে ধরা দিয়েছে, অন্যদিকে, তেমনি দিগন্ত-বিস্তারী উদার নীলাকাশ, তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সীমাহীন অতল সমুদ্র, সমুদ্রগামী নৌপোত, ধূসর বিস্তীর্ণ মরুভূমি, সবুজ-শ্যামল মনোরম খেজুর বীথি, 'মরুভূমির জাহাজ' নামে খ্যাত উটের বহর, নিঃসীম-নীলাকাশে উড়ে বেড়ানো মুক্ত ঈগল পাখি ও মরুচারী দুরন্ত বেদুইন আরব প্রভৃতি বিচিত্র দৃশ্যপট, জনপ্রাণী ও প্রান্তরের অপরূপ বর্ণনা তাঁর কাব্য-কবিতাকে অসাধারণ মহিমা ও বিচিত্র বর্ণ-সুষমায় সমুজ্জ্বল করে তুলেছে। এমন দিগন্ত-বিস্তারী কবি-কল্পনার অধিকারী অসাধারণ প্রতিভাবান কবি বাংলা সাহিত্যে আর কেউ আছেন কিনা সন্দেহ। এক্ষেত্রে ফররুখ আহমদ যেমন বিস্ময়কর তেমনি অনন্যতায় ভাস্বর। তিনি যেমন বৈচিত্র্য-প্রয়াসী, তেমনি সর্বজনীন ও সর্বকালীন।

ফররুখ আহমদের বিভিন্ন কাব্য-কবিতায় এ সর্বজনীনতা ও চিরন্তনত্বের অবিনাসী সুর প্রতিধ্বনিত। এ সুর মানবতার, এ সুর আধ্যাত্মিকতার, দেশাত্মবোধে পূর্ণ এ সুর নবজাগরণ ও নিপীড়িত-লাঞ্ছিত-ভাগ্যাহত মানুষের মুক্তির সংরাগে পূর্ণ। ফররুখ তাই আমাদের, ফররুখ সকলের। ফররুখ যেমন বর্তমানের, তেমনি কালজয়ী আগামীর।

# ফররুখ আহমদের ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক কাব্য

**মুহম্মদ মতিউর রহমান**

বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্য-সমালোচক আব্দুল মান্নান সৈয়দের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করে আলোচনা শুরু করতে চাই। তিনি বলেন: "ফররুখ আহমদ এক বহুমাতৃক, বহুকক্ষময়, ক্রমবিবর্তিত, আত্মঅতিক্রমী ও গতিশীল কবির নাম।... ফররুখ আহমদের কবিতা তথা সাহিত্য একটির-পর-একটি বৃত্ত অতিক্রম করে গেছে; আপাতভাবে তা সাযুজ্যরহিত; কিন্তু শেষ-অবধি তা একটি মৌচাকেরই বিভিন্ন কোটর।"

ফররুখ আহমদ বাংলা সাহিত্যে অন্যতম প্রধান কবি। তাঁর কবিতা বহুমাত্রিক। কবিতার বিভিন্ন আঙ্গিক, ছন্দ ও শিল্প-নৈপুণ্যে তাঁর নিরন্তর অনুশীলন এবং কুশলতা সকলের সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রকৃত সৃষ্টিশীল প্রতিভা গতানুগতিকতার পথ ছেড়ে নতুন আবিষ্কার ও অনুশীলনের কাজে ব্রতী হন। প্রতিভার প্রকৃত পরিচয় ও সক্ষমতার প্রমাণ এতেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফররুখ আহমদ মূলত ও প্রধানত রোমান্টিক কবি। কিন্তু তাঁর রোমান্টিক আয়োজনের মধ্যেও এক ধরনের ক্লাসিক আয়োজন স্পষ্টগ্রাহ্য। কবিতার বিভিন্ন আঙ্গিক যেমন মহাকাব্য, গীতিকাব্য, সনেট, ব্যঙ্গকাব্য, শিশুতোষ কাব্য, কাব্যনাট্য, গীতিনাট্য, ব্যঙ্গ নাটক ইত্যাদি বিভিন্ন রূপরীতিতে তিনি তাঁর পাঙ্গমতার স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রচলিত ছন্দ-রীতিতে তিনি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম নিয়ে এসেছেন। ফররুখের কাব্য-নৈপুণ্যের প্রধান স্বাক্ষর সম্ভবত তাঁর ভাষা, উপমা-রূপক-প্রতীক ও রূপকল্পের ব্যবহারে। এক্ষেত্রে তাঁর নিজস্বতা ও অভিনবত্ব পাঠকের দৃষ্টিকে সহজেই আকৃষ্ট করে।

ফররুখের এ বহুমাত্রিক প্রতিভার এক অনন্য স্বাক্ষর ধারণ করে আছে তাঁর রচিত অসংখ্য ব্যঙ্গ কবিতা। তিনি অজস্র ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছেন নামে ও বেনামীতে। বেনামীতে লেখা তাঁর ব্যঙ্গ কবিতার সংখ্যাই অধিক। তবে সমস্যা হলো এই যে, কতগুলো ছদ্মনাম তিনি ব্যবহার করেছেন তা সঠিক রূপে নিরূপণ করা কঠিন। এ কারণে ছদ্মনামে লেখা তাঁর অনেক কবিতা এখন হারিয়ে যাওয়ার পথে। তিনি সাধারণত যেসব ছদ্মনামে কবিতা লিখেছেন, সেগুলো মোটামুটি নিম্নরূপ : হায়াত দারাজ খান পাকিস্তানী, মুনশী তেলেসমাত, কোরবান বয়াতী, গদাই পেটা হাজারী, আবদুল্লা বয়াতী, জাহেদ আলী ঘরমী, মানিক পীর, শাহ বেয়াড়া বাউল, ঘুঘুবাজ খান, সরফরাজ খান, শেখ কোরবানউদ্দিন, মোহাম্মদ আবদুল জলিল, আহমদ আবদুল্লা, মাহবুব আবদুল্লাহ প্রভৃতি। এ ছদ্মনামগুলোর মধ্যে হায়াত দারাজ খান পাকিস্তানী নামে তিনি অধিক সংখ্যক কবিতা লিখেছেন। তবে উপরোক্ত ছদ্মনাম

ছাড়াও অন্য আরো বহু নামে তিনি কবিতা লিখেছেন বলে জানা যায়। এমনকি, কোন একটি কবিতা লিখে তাঁর কোন ভক্ত-অনুরক্ত বা অনুজপ্রতিম ব্যক্তিকে দিয়েছেন, সেটা তার নামে পত্রিকায় ছেপে দিতে। এ ধরনের কবিতার সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু এগুলোকে এখন ফররুখ আহমদের নামে চিহ্নিত করা কঠিন।

অসংখ্য বিক্ষিপ্ত ব্যঙ্গ কবিতা ছাড়াও ফররুখ আহমদ কমপক্ষে ৮টি ব্যঙ্গ কবিতা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিলেন বলে জানা যায়। সেগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র 'ধোলাই কাব্য' ফারুক মাহমুদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় কবির জীবনকালে অর্থাৎ ১৯৬৩ সনের জানুয়ারিতে। কিন্তু সে প্রকাশিত গ্রন্থ থেকেও বোঝার উপায় ছিল না যে, সেটি ফররুখ আহমদের রচিত গ্রন্থ। কারণ সেখানে ফররুখ আহমদের নাম কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। তাই সে গ্রন্থ সম্পর্কেও অনেকের সন্দেহের উদ্রেক হওয়া অস্বাভাবিক নয়, কিংবা সম্পাদক হিসাবে সেখানে যার নাম মুদ্রিত হয়েছে, গ্রন্থটি তারই বলে ধারণা করা অসম্ভব নয়। এ সম্পর্কে আমি নিজে একদিন ফররুখ আহমদকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাচ্ছিল্যভরে জবাব দিয়েছিলেন যে, "এসব হালকা লেখা নিয়ে অন্যেরা তাদের নাম জাহির করতে চাইলে করুক, আমার তাতে কিছু এসে যায় না।" তবে ধোলাই কাব্যের 'পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত, অতীব পরিষ্কার' দ্বিতীয় সংস্করণ তথা 'সহীহ বড় সংস্করণে'র জন্য ফররুখ আহমদের একটি ক্ষুদ্র ব্যঙ্গাত্মক ভূমিকা সংবলিত সংস্করণটি ১৯৮৬ সনের জুলাই মাসে প্রকাশিত হওয়ায় বিষয়টি খোলাসা হয়।

ধোলাই কাব্য ব্যতিত ফররুখ আহমদের প্রস্তুতকৃত অন্য ৭টি ব্যঙ্গ কবিতা গ্রন্থের নাম নিম্নরূপ : ১. 'তসবিরনামা', ২. 'টুকরো কবিতা', ৩. 'নসিহতনামা', ৪. 'অনুস্বার', ৫. 'রসরঙ্গ', ৬. 'মজার ছড়া' (শিশু-কিশোর কাব্য), ৭. 'ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য'।

'ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য' (অথ মীর-জাফর সংবাদ) প্রথম প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'আজ' পত্রিকার আজাদী-সংখ্যায় (১৪ আগস্ট ১৯৫৭)। সেখানে এ দীর্ঘ কবিতাটির দু'টি অংশ ছিল– 'মীর-জাফরের কৈফিয়ত' ও 'মীর-জাফরের শিকায়েত' নামে। তাতে রচনাকালের উল্লেখ ছিল ২৪ জুন ১৯৫৭। কবিতাটি পরে কবি পরিশোধন ও পরিবর্ধন করেন। পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত কবিতাটিতে 'হায়াত দারাজের নসিহত' নামে আর একটি অংশ যুক্ত হয়।

ফররুখ আহমদ প্রথম থেকেই ব্যঙ্গ কবিতা লেখায় অভ্যস্ত ছিলেন। সমাজের যে কোন দুর্বলতা, অমানবিকতা ও অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি অনায়াসে ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছেন। এ জাতীয় কবিতার মাধ্যমে সমাজের অসংগতি ও মানব চরিত্রের স্খলন-পতনের বিরুদ্ধে কবি তীব্র শানিত আঘাত হেনেছেন। তবে তাঁর রচিত পাকিস্তান-পূর্ব ও পাকিস্তান-পরবর্তী ব্যঙ্গ কবিতার মধ্যে কিছুটা গুণগত পার্থক্য চোখে পড়ে: পাকিস্তান-পূর্ববর্তী ব্যঙ্গ কবিতার মধ্যে ধনতন্ত্রের উৎসাদন, ধনী-দরিদ্রের

ব্যবধান দূরীকরণ ইত্যাদি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। পরবর্তীকালে রচিত তাঁর ব্যঙ্গ কবিতা আরো অনেক দৃঢ়বদ্ধ ও বিচিত্র বিষয়ভিত্তিক। রাজনৈতিক অনাচার-শোষণ-জুলুম, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও আদর্শিক বিপর্যয় ইত্যাদি তাঁর এ সময়কার কবিতার প্রধান উপজীব্য বিষয়।

পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমিতে বিশেষত ১৯৪০ সনে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের সম্মেলনে 'লাহোর প্রস্তাব' তথা পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার প্রেক্ষাপটে ফররুখ আহমদের কাব্য-চর্চা গতি লাভ করে। তিনি মনে-প্রাণে মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম নবজাগরণে বিশ্বাসী ছিলেন। মুসলিম লীগ তখন উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্য অনেকের মতোই ফররুখ আহমদ সে আন্দোলনকে সমর্থন করেন। এজন্য তিনি অনেক গান-কবিতা রচনা করেন। তবে অন্যদের মতো কেবল একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই তাঁর লক্ষ্য ছিল না। তাঁর ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা ছিল রাসূল (সাঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদার আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রের অনুকরণে উপমহাদেশে মুসলমানদের জন্য একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। তাই পাকিস্তান তাঁর কাছে শুধুমাত্র একটি ভৌগোলিক সত্তার নাম ছিল না, ছিল এক মহৎ স্বপ্ন-কল্পনার এক অপরূপ শাশ্বত জগৎ। সে জগৎ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে তিনি অসংখ্য গান-কবিতা রচনা করেছেন। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে তাঁর রচিত 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্যগ্রন্থের উল্লেখ করা যায়। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন ঘটনা ও শাসকদের কার্যক্রম লক্ষ করে অচিরেই তাঁর আশাভঙ্গ ঘটে। তাঁর স্বপ্ন-কল্পনার সাথে বাস্তবের পাকিস্তানের কোন মিল খুঁজে পান না তিনি। তাই এ আশাভঙ্গের বেদনা তাঁর চিত্তকে রুধিরাক্ত করে তোলে। এ সময় বিভিন্ন ব্যঙ্গ কবিতার মাধ্যমে তিনি তাঁর মনের তিক্ত অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। ফররুখের সমকালীন কবি এবং ফররুখের মতোই আশাভঙ্গের বেদনায় আহত তালিম হোসেনের (১৯১৮-১৯৯৯) একটি মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। তিনি লিখেছেন :

"পাকিস্তানকে ঘিরে যে স্বপ্নকল্পনা নিয়ে এসেছিলাম, ঢাকার জীবনে বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে অতি স্বল্প সময়েই তার মধ্যে আমরা উভয়েই কেবলি আশাভঙ্গের উপাদান দেখতে লাগলাম। পাকিস্তানের ছিল দুটো দিক। একদিকে যারা তার বাস্তবের আরাধনা করেছিলো– তাদের ভাগ্যোন্নয়নের সোনার কাঠি সহজে হস্তগত করার লক্ষ্যে, আর অন্যদিকে ইতিহাস সম্পৃক্ত অথচ বহুকাল নাগালের বাইরে থাকা একটা দুরূহ অথচ মহীয়ান আদর্শবাদের রূপায়ণ-স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের ছোঁয়া লেগেছিলো আমাদের মনে এবং তারই প্রেরণার উদ্দমতায় টালমাটাল হয়েছিলো আমাদের স্বপ্নলোক। তাই নতুন তথাকথিত আদর্শ রাষ্ট্রের প্রথম পর্যায় থেকেই আমাদের বিক্ষুব্ধ হৃদয় কিভাবে কাজ করেছিলো, অল্পদিনের ব্যবধানে পরস্পরকে

নিবেদিত আমাদের দুটি কবিতায় তার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে।" **(দ্রষ্টব্যঃ তালিম হোসেন : 'ফররুখ আহমদ ও আমি', দৈনিক ইনকিলাব', ৩০ আশ্বিন ১৩৯৩)।**

এখানে তালিম হোসেন ফররুখের যে কবিতাটির উল্লেখ করেছেন, তার নাম– 'আহ্বান কবির প্রতি', এ সনেটটি ১৯৫২ সনে দৈনিক 'মিল্লাতে' প্রকাশিত হয়। এ সনেটটির প্রথম চতুষ্কটি ছিল এ রকম :

আত্মবঞ্চনার মাঠে অনুকারী দাসের জীবনে
সত্যের দিশারী কবি– তোমার একান্ত প্রয়োজন।
আমরা পাইনি মুক্তি, শুনি নাই ঝড়ের স্পন্দন
গোলামী জিঞ্জিরে তাই শোকোচ্ছ্বাস ওঠে প্রতি ক্ষণে।

উপরোক্ত কবিতাংশে ফররুখ আহমদের কণ্ঠে আর্তসুর ! যে ফররুখ পাকিস্তান রাষ্ট্রের ব্যাপারে একদিন ছিলেন আবেগ-উচ্ছ্বাসে পূর্ণ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে তিনি 'আজাদ করো পাকিস্তান' (১৯৪৬) নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ভাষার প্রশ্নে কবির মন বিক্ষুব্দ হয়ে ওঠে। তিনি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার জোর দাবী জানান। এ বিষয়ে অনেক গান, কবিতা, ব্যঙ্গ কবিতা এবং প্রবন্ধ রচনা করেন। ভাষার দাবী ছাড়াও তৎকালীন শাসক-সম্প্রদায়ের অনেক অন্যায়-অবিচার-বৈষম্য ও ইসলাম-বিরোধী কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে তিনি অসংখ্য ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেন। মোটকথা, এসময় তাঁর নিদারুণ আশাভঙ্গ ঘটে এবং তিনি পাকিস্তানের তৎকালীন অবস্থা লক্ষ্য করে গভীর হতাশা বোধ করেন। এ আশাভঙ্গের বেদনা ও হতাশার গভীর দীর্ঘশ্বাস তাঁর উপরোক্ত সনেটের প্রতিটি ছত্রে পরিস্ফুট হয়েছে। কবির স্বপ্ন আর বাস্তবতা সাধারণত এক হয় না। তাই বলে কবির কল্পনা সম্পূর্ণ বিলাস-কল্পনাও নয়। তবে স্বপ্নভঙ্গ হলেও কবি হতোদ্যম হননি। তিনি তাঁর স্বপ্নের আলিম্পন মিশিয়ে ঐ ১৯৫২ সনেই রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্যগ্রন্থটি। এতে তাঁর স্বপ্নের পাকিস্তান যে বাস্তব রূপরেখার ভিত্তিতে সত্যিকারের আদর্শ, শান্তি ও কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে, তার সুস্পষ্ট রূপরেখা অঙ্কন করেন। কিন্তু এরপরেও কবির জন্য একের পর এক হতাশা অপেক্ষা করে। যে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, পাকিস্তানের শাসক শ্রেণী, আমলা ও রাজনীতিবিদগণ ক্রমান্বয়ে সে আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েন। ফলে আধুনিক যুগে ইসলামের শাশ্বত আদর্শের ভিত্তিতে যে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল, তা মুখ থুবড়ে পড়ে। ফলে ফররুখ আহমদ আরো বিক্ষুব্ধ হন এবং একের পর এক অসংখ্য ব্যঙ্গ কবিতা লিখে তিনি এর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের প্রতি চরম আঘাত হানার প্রয়াস পান।

'ঐতিহাসিক-অনৈতিকহাসিক কাব্য' মূলত মীর জাফর আলী খানের চরিত্রকে কেন্দ্র করে রচিত। মীর জাফর ইতিহাসে এক কলঙ্কিত ব্যক্তি। বাংলার শেষ স্বাধীন

নবাব সিরাজউদ্দৌলার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও তাঁর প্রধান সেনাপতি হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতার লোভে তিনি বেনিয়া ইংরাজদের সাথে চক্রান্ত করে পলাশী যুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে নবাব বাহিনীকে পরাস্ত করেন। পরাজিত নবাব পরে বন্দি ও নিহত হন। মীর জাফর বাংলার মসনদে বসেন, কিন্তু বাংলার স্বাধীনতা বা প্রকৃত আধিপত্য চলে যায় ইংরাজ বণিকদের হাতে। বাংলা বিহার উড়িষা তাদের অধীনস্ত হয়। পরবর্তীকালে ইংরাজগণ নানা কৌশলে ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সারা ভারতের শাসনভার করায়ত্ত করে। এরপর থেকে মীর জাফর ইতিহাসে একটি কলঙ্কিত নাম হিসাবে সকলের ঘৃণা ও বদনামের পাত্র হিসাবে চিহ্নিত হন। এ কাব্যটিতে কবি এক রাত্রিতে স্বপ্নযোগে মীর জাফরের সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং মীর জাফরের কৈফিয়ত শোনার প্রয়াস পান। কাব্যের শুরুতে কবি এভাবে তার বর্ণনা দিয়েছেন :

মীর-জাফরের সাথে দেখা হল একদা নিশীথে
আশ্চর্য স্বপ্নের মত (অহিফেন ছিল যা শিশিতে
যথারীতি সন্ধ্যারাত্রে করেছিনু নিঃশেষে সাবাড়,
মধুর আমেজ তার পৃথিবীর সীমা করে পার
নিয়েছিল একেবারে মীর-জাফরের দেহলিতে)!
কিছুটা অচেনা আর কিছু চেনা শহরতলীতে
দেখে তারে সারা মন পূর্ণ হল খুশীর মউজে !
জানি না ক'ঘণ্টা ঠিক সে রাত্রে ছিলাম চোখ বুজে
পুরাপুরি ধ্যানমগ্ন (ছিল না হিসাব সময়ের),
শুনেছি যখন দীর্ঘ কৈফিয়ত মীর-জাফরের!

মীর জাফর রক্ত-মাংসে গড়া একজন মানুষ। তার মধ্যে লোভ-লালসা-উচ্চাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি মানবীয় দোষ-গুণ বিদ্যমান ছিল। তিনি তার দুর্বলতার কথা স্বীকার করলেও তার কর্মফলের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ দায়ী মনে করেন না। মূলত দীর্ঘকাল ধরে মুসলিম সমাজে যে অবক্ষয়, আদর্শহীনতা ও নৈতিক স্খলন সৃষ্টি হয়েছে, মীর জাফরের চরিত্রে তারই চরম পরিণতি লক্ষ্য করা যায় মাত্র। মীর জাফর তার দেয়া কৈফিয়তে সেটা এভাবে বর্ণনা করেন :

"কিছু সত্য বলে মানি
অগত্যা আংশিকভাবে, কিন্তু এ-ও ভালোভাবে জানি,
সর্বনাশের দোষ পুরাপুরি চাপাও এ ঘাড়ে
সে ভীষণ সর্বনাশা এসেছিল আগেই দুয়ারে,
উপলক্ষ এ গরীব। ভিত্তি ছিল আগেই দুর্বল,
সমাজের বুনিয়াদে ধরেছিল আগেই ফাটল
পতনের শেষ চিহ্ন। ভাবেনি যা কেউ কোন দিন

বোঝে নাই ঘুণ-ধরা সমাজের অবস্থা সঙ্গিন
সুদুর্লভ ব্যতিক্রম মুষ্টিমেয় জ্ঞানীগুণী ছাড়া
মৌতাতে মগ্ন এ জাতি বোঝেনি সে মৃত্যুর ইশারা।

এরপর মীর জাফর একে একে ইসলামের গৌরব যুগের স্বর্ণময় দিনের স্মৃতিচারণ করেন। পরবর্তীকালে কীভাবে মুসলমানগণ ইসলামের চিরন্তন শাশ্বত আদর্শ থেকে ধীরে ধীরে বিচ্যুত হয়ে চূড়ান্ত পতনের দিকে অগ্রসর হয়েছে, তিনি তার বর্ণনা দিয়েছেন। তার বর্ণনা মতে শাসকশ্রেণী, সমাজপতি, ধর্মীয় নেতা তথা মুসলিম সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে যে নৈতিক পতন ঘটেছে, সে কারণেই মুসলমানদের আজ এ দুর্দশা। মুসলমানদের এ দুর্দশার জন্য মীর জাফর প্রথমত মুসলিম শাসকদেরকেই দায়ী করেছেন। তার ভাষায় :

কৌশলী আমীর বাদশা ছিল এর নিগূঢ় কারণ
ব্যক্তিস্বার্থে মগ্ন যারা চায় নাই ইসলামী জামাত,
ক্রমাগত টেনে শুধু নামায়েছে জাতির বরাত।
নিঃসঙ্গ প্রয়াস যত যে কারণে হয়ে গেল শেষ
প্রকৃত আদর্শবাদী অন্ধকারে হ'ল নিরুদ্দেশ !

যে সত্যের আলো নিয়ে আরবের মরুপ্রান্তর থেকে দীন-প্রচারকগণ সুদূর উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসে অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সংগ্রামের বিনিময়ে ইসলাম প্রচার করেছিলেন, পরবর্তীকালে স্বার্থপর-দুনিয়াদার ভণ্ড তথাকথিত পীর-দরবেশদের কারণে সে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ভুলে উপমহাদেশের মুসলমানগণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কবি এর বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

কি কারণে এসেছিল আউলিয়া, আলেম, দরবেশ
হেজাজের মাটি থেকে বিজাতীয় হিংস্র পরিবেশে ?
তৌহিদের আলো নিয়ে কেন এল অচেনা এ দেশে?
সর্বত্যাগী, সেবাব্রতী চেয়ে কোন্ রোশনি দ্বীনের
বিগত অধ্যায় হল ইতিহাসে ?... হৃদয়হীনের
চক্রান্তে সে সিলসিলা শেষ হ'ল কিভাবে, কখন
বৈশাখী ঝড়ের রাতে ছায়াপথ মিলায় যেমন
জানো তো সে সব কথা।

"জানো আরো হালুয়া মালাই
চেয়ে কারা দুনিয়ায় আদর্শকে ভেবেছে বালাই,
ভাড়াটিয়া মোল্লা, পীর, পাঠান বা মোগল সরকার
আদর্শের পথে কেন করে নাই যা কিছু দরকার,
বরং প্রশ্রয় দিয়ে বাড়ায়েছে নতুন জঞ্জাল !

জেনে রাখো ব্যঙ্গবিদ দিয়ে গেছে সেই তালে তাল
মীর-জাফরের যুগ। কোরানের মানেনি নির্দেশ,
মিথ্যা ও মৃত্যুর দিকে ছিল জেগে আঁখি নির্নিমেষ
ইবলিসের অনুগত।

উপমহাদেশে ইসলামের বিকৃতি ও মুসলমানদের সর্বনাশের মূলে মোগল সম্রাট আকবরের অবদান সর্বাধিক। তিনি 'দীনে এলাহী' নামে এক নতুন ধর্ম প্রবর্তন করে ইসলামের বিকৃতি সাধনের অপপ্রয়াসে লিপ্ত হন। তাঁর দরবারে অসংখ্য হালুয়া-তক্‌মা লোভী তথাকথিত জ্ঞানী-গুণীদের নিয়ে দীনে এলাহীর প্রচারে লিপ্ত হন। হিন্দু ও রাজপুত রমণীদের পাণি গ্রহণ করে তিনি মোগল পরিবারে নতুন সংস্কৃতি আমদানি করেন। হিন্দু ও রাজপুত রমণীগণ তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করেনি, বরং তারা রাজ-পরিবারে পূজা-অর্চনা তথা পৌত্তলিকতার অনুপ্রবেশ ঘটান। রাজ-পরিবারে ইসলামী আদর্শ ও সংস্কৃতির বদলে পৌত্তলিক আদর্শ ও সংস্কৃতির প্রবেশ ঘটে। রাজ-পরিবারের সদস্যগণ অনেকেই ভোগ-বিলাসিতায় নিমগ্ন হয়। তাদের নৈতিক চরিত্রের চরম অধঃপতন ঘটে। ফলে উপমহাদেশের মুসলিম সমাজেও তার প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। কবি এর বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

"বিজাতীয় রমণীর রঙ্গরস হৃদয়ে, মগজে
বিজাতীয় ভাবধারা দিয়েছিল অত্যন্ত সহজে,
বিশেষ রিপুর চক্রে স্থান-ভ্রষ্ট পৌরুষের শিলা
চেয়েছিল রাত্রি দিন অনির্বাণ বৃন্দাবনলীলা,
এবং তা পেয়েছিল সুপ্রচুর স্বর্ণ বিনিময়ে।
মিশ্রণ কাহিনী সেই ভাবি আমি নির্বাক বিস্ময়ে।

"মুক্তপক্ষ শাহবাজ সে নেশায় চড়ুই যেমন
তৌহিদী কালাম ভুলে গেয়েছিল কীর্তন, ভজন।
'কৃষ্টি সমন্বয়ে' ফের জন্মেছিল যে রুগ্ন সন্তান
স্বভাবত ছিল তার কাশী কিংবা কিষ্কিন্ধার টান,
মক্কা মদীনার কথা যে কারণে হ'ল তার ভুল;
বিজাতীয় পরিবেশে পেয়েছিল প্রাধান্য মাতুল।
"বহু পৌত্তলিক প্রথা, দুর্নীতি, শোষণ, অবিচার
পালটিয়ে ভোল শুধু ঢুকে ছিল ঘরে নির্বিকার
অথবা ধরায়েছিল ঈমানে বা বিশ্বাসে ফাটল,
দিয়েছিল শুধু এনে সংশয়ের আঁধার অতল
ভোলায়ে তৌহিদ জ্ঞান দিয়েছিল দেবতা নূতন
দ্বীনের প্রকৃত তথ্য বোঝে নাই সমাজ তখন।

সমাজের যখন এরূপ দুরবস্থা তখন পথভ্রষ্ট একশ্রেণীর আলেমদের কারণে সমাজের অনেকেই বিভ্রান্ত হয়। যে আলেম সমাজের দায়িত্ব ছিল ইসলামী আদর্শকে সমুন্নত করা, তারা স্বার্থান্ধ হয়ে নিজেদের দায়িত্ব ভুলে গিয়েছিল। তাদের সম্পর্কে কবি বলেন :

"ঐশ্বর্য-বিলাস লুব্ধ মেদপুষ্ট অসংখ্য আলেম
শাসকের ইশারায় সেজেছিল তখন জালেম !
তাদের ক্ষমার দ্বার মুক্ত ছিল রইসের তরে,
ক্ষমাহীন ছিল তারা মিসকিন বা দুঃস্থের উপরে,
বৃহৎ ব্যাপার ছেড়ে অতি ক্ষুদ্র ভগ্ন অংশ নিয়ে
ব্যতিব্যস্ত ছিল তারা মূল সত্যে কদলী দেখিয়ে।

"সে দিন কা'বার পথ ছিল জুড়ে অসংখ্য মাজার,
নৃত্য গীত করেছিল কোরানের স্থান অধিকার,
উজ্জ্বল সূর্যের মত ইসলামের মুক্ত মানবতা
বর্ণাশ্রম মেঘে শুধু দেখেছিল বিষম ব্যর্থতা।
উচ্চ নীচ ভেদাভেদ, বহু ক্ষেত্রে বৈষম্য রক্তের
দিয়েছিল ব্যথা প্রাণে মুষ্টিমেয় ইসলাম ভক্তের।
নামত ইসলামী সাম্য মেনে নিয়ে দেখেছি তখন
কার্যক্ষেত্রে ছিল চালু 'মুসলমান শূদ্র বা ব্রাহ্মণ'।

"জীবনের পূর্ণাদর্শ– মূল নীতি ছেড়ে কোরানের
সুবিধাবাদীর পন্থা নেমেছিল অতলে পাপের,
এত্তেবায়ে সুন্নাতের পরিবর্তে শয়তান সেবা
প্রচলিত হয়েছিল বহু কাল ধ'রে। এ দেশে বা
অন্য কোন দূর দেশে রাষ্ট্রাদর্শ ছিল না সে দিন,
খিলাফতে রাশেদার শেষ চিহ্ন তখন বিলীন
দুনিয়া কারবালা মাঠে শত এজিদের অত্যাচারে।

এ অবস্থায় মুসলিম সমাজের বিশেষত রাজা-বাদশা-অভিজাত তথা বিত্তবানদের জীবনে অঢেল খুশির আমেজ লক্ষ্য করা যায়। তারা ঈমান-আকীদা, ইসলামী তাহজীব-তমুদ্দন ও জীবনধারা বিস্মৃত হয়ে অনৈসলামী ভোগমত্ত জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এভাবে কোন জাতি যখন তার নৈতিক চরিত্র হারিয়ে ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হয়, তখন সেজাতি তার স্বাধীনতা রক্ষায় অযোগ্য বিবেচিত হয়। উপমহাদেশে একসময় মুসলমানরা দৌর্দণ্ড প্রতাপের সাথে বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করলেও একসময় তাদের নৈতিক চরিত্র ধ্বংস হওয়ার কারণে তাদের সাম্রাজ্য তথা

স্বাধীনতা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। কবি সে অভিশপ্ত দিনের কথাই এখানে বর্ণনা করেছেন এভাবে :

"ঐশ্বর্য অপরিমাণ, বিলাসের সাজ-সরঞ্জাম
যুগিয়েছে সেই যুগে অফুরন্ত খুশীর আঞ্জাম
অকল্পিত মিহি বস্ত্রে তন্বীদল প্রিয় নগ্ন তনু
দেখিয়েছে অপরূপ সজ্জার বিচিত্র বর্ণধনু
অনুরূপ লেবাসেই নর-রূপী বিলাসী বানর
সদরে, অন্দরে, ঘরে দিয়ে গেছে খুশীর খবর।
অকথ্য, অবর্ণনীয় বিলাসে বা সে রূপ-সজ্জায়
আদ্যোপান্ত এই জাতি মেতে ছিল ফুর্তির হাওয়ায়।
ভাবেনি তখন কেউ দেখা দেবে চরম সংঘাত
আনন্দের মধ্যপথে অকস্মাৎ হবে কিশ্‌তী মাত।
"আজাদীর যে ভূমিকা– কার্যধারা গঠনমূলক
সে ভূমিকা ছেড়ে কর্মী নিয়েছিল পন্থা রসাত্মক।
"হালুয়ার ভাণ্ড পেয়ে যেমন উদ্ভ্রান্ত কানামাছি
সমগ্র পৃথিবী ভুলে সারাক্ষণ ঘোরে কাছাকাছি,
তেমনি মৌতাতে মগ্ন সে দিনের সব ভাগ্যবান
সকল কর্তব্য ভুলে খুঁজেছিল আনন্দ বিতান।
ছিল যে অবৈধ পাপ গুলিস্তাঁয় সাপের মতন
মারাত্মাক বিষ তার কেউ আর বোঝেনি তখন।"

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানগণ কোরআনের শিক্ষা নিয়ে বিশ্ব জয় করেছিল। আল কোরআন শুধু একটি অভ্রান্ত ও পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান দিয়েছে তাই নয়, এর ভিত্তিতে মুসলমানগণ তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেয় এবং মানব সভ্যতার ইতিহাসে ও অগ্রযাত্রায় অবিস্মরণীয় অবদান রাখতে সক্ষম হয়। কিন্তু রাজতন্ত্রের আমলে মুসলমানগণ কোরআনের শিক্ষা ভুলে, জ্ঞান-চর্চার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে পড়ায় তাদের অনিবার্য পতন ঘটে। কবি তার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

"জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, গবেষণা অথবা সন্ধান
দীর্ঘ যুগযুগান্তর পায় নাই কুত্রাপি সম্মান,
মৌলিক মনন শক্তি বাদ দিয়ে বাঁধা বুলি শিখে
কাটায়েছে কাল শুধু পণ্ডিতেরা পাদটিকা লিখে,
যে কারণে দীর্ঘ দিন আবিষ্কার হয়নি নূতন
আলস্য দিয়েছে শুধু আজদাহার কঠিন বাঁধন।

তখন কায়িক শ্রম অভিজাত, শরীফ মহলে
পায়নি প্রশ্রয় কোন, ঘৃণা শুধু পেয়েছে বদলে।
"সে দিন সমাজে শুধু বহুবিধ দুর্নীতির ফাঁদ
মালুম বা বেমালুম ছড়িয়েছে আনন্দ আস্বাদ,
পারেনি যা মুছে দিতে জিন্দা পীর বাদশা আলমগীর,
যে ফাঁদের গ্রন্থি চিনে দেখিয়েছে ফিরিঙ্গি ফিকির,
নৈলে তার সাধ্য কোথা অর্ধ নগ্ন ধূর্ত সে বেনিয়া
কিভাবে সে নিয়ে গেল খাঁচা সুদ্ধ আজাদীর টিয়া ?

"মোগলের যে ঐশ্বর্য আড়ম্বর দু'চোখ ধাঁধানো
দু'দিন পরেই সেটা কেন হল মানুষ কাঁদানো
প্রতিচ্ছায়া ব্যর্থতার ? পাকিস্তানী হায়াত দারাজ
পারো যদি ভেবে দেখো ব্যঙ্গোক্তির ছেড়ে কারুকাজ।
ভেবে দেখো অপমৃত্যু কি ফাটলে, কোন পথ দিয়ে
অত্যন্ত সহজে আসে সভ্যতার আলোক নিভিয়ে
অতিশয় দ্রুত গতি।

এরপর কবি আরো বলেন :

"ঝাণ্ডা খাড়া রেখেছিল দীর্ঘ কাল যারা আজাদীর
যাদের চরিত্র, নীতি এখনো বিস্ময় ধরণীর
সভ্যতার মূলে দান সবচেয়ে উন্নত যাদের,
আজাদী বিকালো জেনো অপদার্থ সন্ততি তাদের।
কেননা ওয়ারিশী সূত্রে পরিত্যক্ত তৈজসের মত
শিক্ষা বা চরিত্রগুণ করায়ত্ত হয় না অন্তত।
নিষ্ফল প্রবাদবাক্য প্রতারণা করে আগাগোড়া
পুরো না পেলেও নাকি পায় কিছু সিপাহীর ঘোড়া,
কিন্তু আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই কোন প্রাপ্তিযোগ
দুর্নীতির খেলা শুধু দিল এনে চূড়ান্ত দুর্ভোগ।

"জেহাদী তরিকা ছেড়ে দীক্ষা নিয়ে 'সহজিয়' পথে
প্রাপ্য যা পেল এ জাতি এক দিন নিজের কিসমতে।
নৈতিক স্বপন আর চারিত্রিক দীনতা অশেষ
ফিরিঙ্গী ডাকুর হাতে তুলে দিল স্বাধীন স্বদেশ
তারপর ডুবে গেল নৈরাশ্যের পাথারে অকূলে।
সে পাপ অথবা দোষ নয় এক জাফরের ভুলে

বহুগুণে যোগ্যতর কিংবা যদি আরো শক্তিমান
সেদিন নেতৃত্ব নিত হত না সে মুশকিল আসান।

"মীর-জাফরের যারা সহযোগী সহকর্মী আর
আজাদীর ফলভোগী নারী বা পুরুষ নির্বিকার,
রাষ্ট্রের বাসিন্দা যত জ্ঞানপ্রাপ্ত কিন্তু উদাসীন
আজাদী রক্ষার পথে; এনেছিল একত্রে দুর্দিন।
নৈলে এক জাফরের এই শক্তি ছিল না অন্তত
সকলের স্বাধীনতা মুছে ফেলে শয়তানের মত।
হারায়ে চরিত্রশক্তি ডোবে জাতি উদ্ভ্রান্ত যখন
বাঁচানো অসাধ্য জেনো সেই মৃগীরোগীরে তখন।

"কি থাকে চরিত্র গেলে ? চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হারালে
কি থাকে এ পৃথিবীতে ? সব ক্ষেত্রে তাল দিয়ে তালে
স্বকীয় স্বভাব ভুলে প্রতিক্ষণে বিবর্তিত রূপে
অপমান, অপমৃত্যু আনে না কি ডেকে চুপে চুপে
মেরুদণ্ডহীন সেই রুগ্ন জাতি অথর্ব, দুর্বল ?
সর্বহারা হয় না কি যে হারায় চরিত্রের বল ?
মীর-জাফরের দোষ হতে পারে এক্ষেত্রে ততটা
ব্যক্তিগত অপরাধে অপরাধী ছিল যে যতটা।"

এভাবে মীর জাফর যখন তার ব্যক্তিগত কৈফিয়ত দিতে গিয়ে মুসলিম জাতির বিশেষত উপমহাদেশের মুসলমানদের অধঃপতন ও পরাধীনতার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে নিজের দোষ বহুলাংশে স্খলনের প্রয়াস পান, তখন 'হায়াত দারাজ' দার্শনিক ভঙ্গিতে মীর জাফরের কৈফিয়ত যে সর্বাংশে সত্য নয় এবং এটা নিজেকে রক্ষা করার জন্য দুর্বল যুক্তি– সেটা প্রমাণ করার জন্য তিনি বলেন :

"বিশ্বাসের সাথে যার আড়াআড়ি, পায় সে যদিও
ষড়যন্ত্রে কাম্য হদী, রবে হয়ে চিরস্মরণীয়
কাল কেতাবের পিঠে কলঙ্কের রঙে বা হরফে,
যাবে না কুখ্যাতি ঝড়ে কিংবা চাপা রবে না বরফে;
কুকীর্তি যাবে না মুছে বর্ষায় বা মাঘের শিশিরে।
কলঙ্ক কাহিনী সেই বর্ষে বর্ষে দেখা দেবে ফিরে
হুঁশিয়ারী পাঠ্য রূপে সংখ্যাহীন পড়ুয়ায় দ্বারে
বিশ্বাসহন্তার বীজ যেন নল ছড়ায় চারধারে,
বিষক্রিয়া তার যেন ঠাঁই আর না পায় অস্থিতে

আজাদীর পথে জাতি থাকে যাতে কিছুটা স্বস্তিতে।

"গদী কিংবা পদপ্রার্থী যে চেয়েছে প্রভুত্ব কেবল
অথবা খুঁজেছে লুণ্ঠন বা শোষণের ছল,
যার ষড়যন্ত্রে গতি রুদ্ধ হল জাতি ও ধর্মের
অন্যের বাহন সেই বেছে নিল পন্থা কুকর্মের।

"ঐতিহাসিকের সাথে এ ব্যাপারে পদ্যলেখকের
হয়নি বিরোধ কোন, কেননা যা বাস্তব সত্যের
অবিকল প্রতিচ্ছায়া গোঁজামিল পাবে না সেখানে;
যদিচ বিস্বাদ সেটা ধূর্ত রাষ্ট্র বিরোধীর প্রাণে।

"মতলবী যে স্বার্থবাদে সে যুগের 'চাহার দরবেশ'
সম্মিলিতভাবে বিক্রি করেছিল স্বাধীন এ দেশ
পড়েনি তা চাপা আর পলাশীর মূক অভিনয়ে
বাধ্য হয়ে সে ইঙ্গিত করি আমি আজ সবিনয়ে।
যেহেতু নিশ্চিত জানি, ঘটনার যে মূল নায়ক
প্রচারের চক্রে আজ হতে চায় সে মূল গায়ক।

"যদিচ চাতুর্য তার সর্বত্র অনন্যসাধারণ
বিশিষ্ট ভূমিকা তার রাখেনি এ জাতি সংগোপন
কারণ আদর্শপন্থী যে কওম কিংবা যে সমাজ
আদর্শের পথ যাত্রী; সর্বদাই চায় হক কাজ।

"এক্ষেত্রে ওজর কিংবা কৈফিয়ত দাও যতভাবে
কুকীর্তির কাহিনীটা যথারীতি হাওয়ায় ছড়াবে।"

'মীর জাফরের কৈফিয়ত' অংশে আমরা মূলত মুসলিম জাতির অতীত গৌরব এবং তা ধীরে ধীরে কীভাবে বিনষ্ট হয়ে মুসলমানগণ অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হয়ে পরাধীনতার গ্লানি ভোগ করে, তার বর্ণনা রয়েছে। প্রসঙ্গত, মীর জাফর একথা বলতেও ভুল করেননি যে, তার বিশ্বাসঘাতকতা বা জাতি-বিরোধী কর্মকাণ্ড কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। মূলত মুসলিম জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর অসংখ্য ব্যক্তি তখন এ ধরনের দুষ্কর্মের সাথে যুক্ত ছিল। কোন জাতি যখন তার নিজস্ব আদর্শ, তাহজিব-তমুদ্দন ও আত্মপরিচয় বিস্মৃত হয়, তখন তার নৈতিক শক্তি ও চারিত্রিক দৃঢ়তা বিনষ্ট হয় এবং সে জাতি তার স্বাধীনতা ও গৌরবের পথ থেকে বিচ্যুত হয়। মুসলমানদের এ পতন একদিনে আসেনি, দীর্ঘ দিনের অবহেলা, আত্মবিস্মৃতি ও আদর্শ-বিচ্যুতির কারণেই জাতির জীবনে দুর্ভাগ্যের অমানিশার আবির্ভাব ঘটে।

মীর জাফর তার সর্বশেষ বয়ান অর্থাৎ 'মীর-জাফরের শিকায়েত' অংশে মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা বর্ণিত হয়েছেন। দীর্ঘ পরাধীনতা যুগের অবসান ঘটিয়ে বহু ত্যাগ ও সংগ্রামের বিনিময়ে উপমহাদেশের মুসলমানগণ 'পাকিস্তান' নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিষ্ঠার পূর্বে নেতাদের প্রতিশ্রুতি ছিল যে, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র হবে আল কোরআন। ইসলামের তাহজিব-তমুদ্দন ও জীবনধারার বিকাশ ঘটিয়ে এটাকে একটি আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত করা হবে। কবির স্বপ্নসাধ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত স্বাধীনতা লাভের পর মুসলমানগণ তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে পড়ে এবং ইসলামের সাথে চরম মুনাফিকী করে বিজাতীয় আদর্শ ও জীবনধারা অনুযায়ী পাকিস্তান রাষ্ট্র পরিচালনার প্রয়াস পায়। ফলে ঈপ্সিত আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন-কল্পনা অপূর্ণ থাকে। মীর জাফর তাই অভিযোগের সুরে বলেন, অতীতে তিনি না হয় ভুল করেছিলেন, কিন্তু বর্তমানে ইতিহাসের তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে সে ভুল সংশোধন না করে মুসলমানগণ পুনর্বার একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করে চলেছে। কবির ভাষায় তার বর্ণনা :

"হায়াত দারাজ খান ! সুকৌশলী কুৎসা রটনায়
চিন্তার দাওয়াই পাবে আশা করি লুপ্ত ঘটনায়।
মিশ্র অভিজ্ঞতা কিংবা সংক্ষিপ্ত এ কাহিনী আমার
লাগে যদি প্রয়োজনে নাই তাতে বিস্ময় অপার,
কিন্তু যা বিস্ময়কর শুরু করি সেই প্রশ্ন দিয়ে
নিজেদের শত ছিদ্র কেন আজ সেই ভাবে করো না স্মরণ ?
"স্খলন, পতন, ত্রুটি, বেঈমানী মীর-জাফরের
যেভাবে সাজিয়ে রাখো সর্বদাই সম্মুখে নাকের,
যেভাবে প্রচার করো শত মুখে বিস্মৃত কুকথা,
রাষ্ট্র বা জাতির প্রতি জাফরের হীন কৃতঘ্নতা;
নিজেদের ত্রুটি কেন সেই ভাবে কারো না স্মরণ ?
আজব দস্তুর বটে ! বিচারের আশ্চার্য ধরন !
"মীর-জাফরের চেয়ে গুণে যদি হও শ্রেষ্ঠতর
খতিয়ান ক'রে তবে যথারীতি সুবিচার করো
অন্যথায় বন্ধ করো গীবতের সাজানো মজলিস,
দিতে পারে প্রতিপক্ষ এই ক্ষেত্রে নিজস্ব নালিশ

কারণ, নিশ্চিত জেনো তোমাদের রাখে সে খবর
প্রতি জুমা রাতে যার দুনিয়ায় রুহানী সফর।
প্রত্যক্ষদর্শীর সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমি আজ

তোমাদের কিছু কীর্তি ব'লে যাব হায়াত দারাজ
অতঃপর অবশিষ্ট থাকে যদি প্রচুর পুলক
তাহ'লে বিচার কোরো চুল-চেরা তুলনামূলক।

"বহু ঘাটে পানি খেয়ে তোমরা হয়েছ হুঁশিয়ার।
প্রকৃত জ্ঞানীর চিহ্ন কোনখানে দেখি না তো আর !
যখন সপ্তাহশেষে ছাড়া পায় রুহু জুমা'রাতে
তোমাদের হাল দেখে দৃষ্টি আর পারি না ফেরাতে।
বে-আমল, বে-লেহাজ, অপদার্থ কিংবা দাগাবাজ
তোমাদের মুখে শুনে আদর্শের বুলন্দ আওয়াজ
গোর-প্রত্যাগত প্রাণ বুঝে ফেলে অবস্থা সঙ্গিন !
ছড়িয়ে আমার কুৎসা খুঁজে পাবে কোন স্বর্ণ দিন ?
সর্বগ্রাসী গর্ত ঢের তোমরা কি খোঁড়োনি আপোষে ?
ঈমানের রাহা ভুলে উঁচু মাথা ঘষোনি পা-পোষে ?

"ভ্রাতৃসমাজের কথা।- সে কি শুধু নয় প্রগলভতা
নীতি, আদর্শের পথে আনোনি কি চরম ব্যর্থতা ?
আজাদী হাসিল ক'রে উল্টা কথা কেন বলো আজ ?
কোন তন্ত্রে, কার মন্ত্রে চাপা পড়ে ইসলামী সমাজ ?
পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব দূরে থাক, মানবিকতার
সামান্য নিশানা, নাম মোছে না কি ধোঁকার সর্দার ?

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আমাদের নেতারা ইসলামী আদর্শ থেকে দূরে সরে আসে। মুসলমানী লেবাস পরে, মুখে ইসলামের কথা বলে বাস্তবে তার উল্টো কাজ করে জনগণকে ধোঁকা দেয়। এটা সম্পূর্ণ মুনাফিকী বা ইবলিসি স্বভাব। এ ধরনের স্বভাব-চরিত্র বিশিষ্ট নেতাদের হাতে মুসলিম জাতি কখনো নিরাপদ নয়। বরং এতে ধ্বংসের পথ হয় অবারিত। কবি এর বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

"পাকিস্তান গড়েছো তো, কিন্তু কেন ভিত্তিমূলে এর
প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করি সুকৌশলী চক্র ইবলিসের ?
কওমের মূল দাবি করে আজ কৌশলে বাতিল
নীতি-নিরপেক্ষ ধাঁচে কারা তোলে স্বার্থের পাঁচিল ?
জাফরের সাথে রাখো কতটুকু ব্যবধান আজ ?
পশ্চিমের তন্ত্র মেনে চাপা দেয় কে ভ্রাতৃ-সমাজ ?
অত্যন্ত কৌশলে ফের আমানত করে খেয়ানত
নির্বিকার ঔদাসীন্যে কে ডোবায় জাতির কিসমত ?

সম্পূর্ণ আদর্শহীন, মানুষের সমস্যা এড়িয়ে
রসাল প্রাপ্তির পথে দু'কদম যায় কে বেড়িয়ে ?
নবীর তরিকা চিনে পলাতক কেন কুয়াশায় ?
আদর্শ রাষ্ট্রের সব প্রতিশ্রুতি হারালো কোথায় ?

"রক্ষণশীলেরা আজো প্রাণহীন বহিরঙ্গ নিয়ে
ভুয়া শরাফতি গাথা গায় নাকি ইনিয়েবিনিয়ে ?
বাঁদী গোলামের স্বপ্নে আজও তারা নয় কি মশগুল ?
'প্রগতিবাদীরা' ফের হয়নি কি অন্যের পুতুল ?
অন্তঃসারশূন্য, তবু অহঙ্কারী মাকালের মত
আগাছার বনে আজ দেয় না কি ভাঁওতা অবিরত ?
অদ্ভুত ব্যাঙের ছাতা, ভুঁইফোড়, নকল-নবীশ
শোষণ সুবাদে আজ খোঁজে না কি চোরাই কিশমিশ ?

"ইব্‌লিসের পুরা ভক্ত মুখে নিয়ে কোরানের বাণী
ফটকাবাজারের পথে করে না কি আজও রাহাজানি ?
ধরা পড়ে মধ্যপথে গোঁজামিল দিয়ে সমস্যায়
রাখে না কি সে কপট ঝাণ্ডা খাড়া ধর্মব্যবসায় ?
কাজের নমুনা দেখে তবু তার মতলবের ঝুলি
ভরিয়ে কি দাও নাই ক'রে ব্যর্থ আকুলিবিকুলি ?

"বলো আজ খোলাখুলি ক্ষুদ্র বা বৃহৎ ফেরাউন
দেয় না কি ইচ্ছামত সমাজের সর্বাঙ্গে আগুন ?
নবতর বর্ণাশ্রম নাওনি কি তোমরা সকলে ?
ইসলামী জামাত আজ পড়েনি কি চাপা সে ধকলে
নিতান্ত নির্লজ্জভাবে বেশুমার হিসাবের মুদী
সমাজের রক্ত শুষে সাজেনি কি 'মুসলিম ইহুদী' ?
কারুণের পন্থা চিনে সর্ব ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী পুঁজ
ছড়িয়ে সমাজে ওরা সহজে কি সাজে না অবুঝ ?

"রাজতন্ত্র ওঠায়েছো ? কিন্তু আজ কি তন্ত্রে পৃথক
অনায়াসে চেপে দাও বেশুমার ইনসানের হক ?
সরিয়ে বাদশা এক বহু বাদশা বসিয়ে গদীতে
ভেবেছো ইসলামী রাষ্ট্র ভাসমান এ মরা নদীতে।
অতটা সহজ নয় খিলাফত, মূল্য তার ঢের,

ঈমানে আমলে শুধু পাওয়া যায় সে রাষ্ট্র সত্যের
ব্যক্তি বা সমাজ সত্তা ধামাচাপা পড়ে না সেখানে
বিকাশের পথ পায় পূর্ণাঙ্গ যা; আমলে ঈমানে।

"তোমরা ঈমানদার কি দরের জানে তা জাহান,
বচন-সর্বস্ব শুধু কর্মটাই করে অন্তর্ধান।
ফরজের চিহ্ন নাই, প্রতি কাজে সুন্নার খেলাপ
অপিচ যায় না শোনা কোন দিন কারু মনস্তাপ,
যদিও সর্বত্র আজ দেখা যায় বহু চামচিকা
ঈমান আমল ছাড়া দিতে চায় ইসলামী তরিকা !
আহা কি অপূর্ব চিন্তা, নিতান্তই নৈর্ব্যক্তিকভাবে
এ যুগের বাক্যবিদ দুনিয়ার সমস্যা ঘুচাবে !

পাকিস্তানের নব্য বুদ্ধিজীবীরা বুদ্ধির বেচাকেনা করেন। তাদের উদ্দেশ্য মানুষকে সঠিক নির্দেশনা প্রদান করা নয়, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা জনগণকে বিভ্রান্ত করে থাকেন। বর্তমান বাংলাদেশেও এ ধরনের বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা ইচ্ছামত ভাড়াটিয়া হিসাবে বিভিন্ন স্বার্থান্ধ মহলের স্বার্থ উদ্ধারে নানাভাবে তৎপর। কবি এ ধরনের চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের স্বভাব বর্ণনা করে বলেন :

"ভাড়াটিয়া চিন্তাবিদ, পেশাদার দুষ্ট বুদ্ধিজীবী
চিরন্তন প্রথামত কুবুদ্ধি বা দুর্বুদ্ধির ঢিবি
এক্ষেত্রে সুযোগ পেয়ে মারে ছুড়ে মতলবের ঢিল,
ইবলিসের খেলা দেখে অতঃপর হাড়ি ও পাতিল !

... ... ... ...

আদর্শের পরিবর্তে চল্‌তি মত কিংবা উত্তেজনা
দিকভ্রান্ত জনতাকে এ জমিনে জোগায় প্রেরণা।
সমস্যা-সংকুল পথে যে কারণে খড়ের আগুন
নিভে যেয়ে মুহূর্তেই অন্ধকার বাড়ায় দ্বিগুণ।

... ... ... ...

"মীর-জাফরের দোষ দিতে আজ সকলে উৎসুক
নিজেদের দোষ দেখে তারপর উঁচু কোরো মুখ,
ছিদ্রান্বেষী প্রাণে যদি অতঃপর থাকে আরো শখ
বলো তবে অকপটে কারা বেশী বিশ্বাসঘাতক !
তোমরা অথবা আমি ? বেঈমানী কে করেছে বেশী ?
বিস্মৃত কাহিনী টেনে কেন ফের করো রেশারেশি ?

"কেন মরো উল্টো চালে ?... বলো আজ স্থির ক'রে মন,
কি কারণে তোমাদের উত্থানের পূর্বাহ্নে পতন ?

"আমাদের ভাগ্যে যেটা জুটেছিল উত্থানের পরে
কিভাবে এল সে এত দ্রুত গতি তোমাদের ঘরে ?
তাজ্জব ব্যাপার বটে, উত্থানের পূর্বেই পতন
অদ্ভুত প্রতিভাবলে অঘটন হয় সংঘটন !
যদিচ মৃত্যুর পরে হ'ল কিন্তু স্মৃতির বিভ্রম
মনে হয় ইতিহাসে দৃষ্টান্তটা রীতিমত কম।

"তাই প্রশ্ন জাগে প্রাণে স্বভাবত, কও 'চিন্তাবিদ',
এই দুর্গতির মূলে আছে কার প্রাণের তাকিদ ?
আমার না তোমাদের ? আদর্শকে লণ্ডভণ্ড করে
কে বা কারা এ জাতিকে নিতে চায় প্রত্যক্ষ কবরে ?

... ... ... ...

"বলো আজ খোলাখুলি এ প্রশ্নের জানাও উত্তর
কার দুর্নীতির ফলে দেখা দেয় সম্মুখে কবর ?
আমরা না তোমাদের ? স্বদল বা স্বজন তোষণে
কে বা কারা এ জাতিকে সর্বস্বান্ত করে প্রাণপণে ?

এরপর কবি যে প্রসঙ্গ অবতারণা করেন, তা তৎকালীন পাকিস্তানের ক্ষেত্রে যতটা প্রযোজ্য বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তা অধিকতর প্রযোজ্য বলে প্রতীয়মান হয়। কবি বলেন :

"জাতীয় ঐতিহ্য কেন অবলুপ্ত ? কেন বেশী মান
পায় আজও পথে ঘাটে ধার-করা বুলির সন্তান ?
বিলাসী বানর যত একমাত্র লেবাসের জোরে
যত্রতত্র চলে ফিরে কেন ঠাঁই পায় সমাদরে ?
কেন দিন অযোগ্যের ? যোগ্যেরা নিখোঁজ কি কারণে ?
প্রকৃত জ্ঞানী ও গুণী কেন পায় পঞ্চত্ব ক্রন্দনে ?
ফিরিঙ্গি, ব্রাহ্মণ কেন জুড়ে থাকে কৃষ্টির ময়দান ?
তোমার নিজস্ব মাঠ কেন আজ নেয় না তরুণ ?
বৈষ্ণব সঙ্গীতে মত্ত মরে কোন ঈশ্‌কের দরুন ?
হও না উপুড় হস্ত, কি কারণে হাত পাতা সার ?
উত্তরাধিকার কেন ছাড়ো নাই গোলামী শিক্ষার ?
পাশ্চাত্যের ন্যাক্‌ড়া কেন গলবন্ধ হ'ল তোমাদের ?

সাহিত্যে, জীবনে কেন চাও ছবি বিদ্যাসুন্দরের ?
কেন গৃহ শান্তিহীন ? কদর্যতা কেন এ রাত্রির ?
মুক্ত পথে কেন ভিড় দুষ্ট নর 'দ্রষ্টব্য নারীর' ?
কেন এ বেহায়া কাণ্ড অনাচার কেন দেশ জুড়ে ?
সামাজিক নৈতিকতা নেমে যায় কেন আস্তাকুঁড়ে ?
উল্টা বুদ্ধি দার্শনিক কেন ছোড়ে শূন্যতায় ঢিল ?
কেন পায় সেরা কক্ষে পুঁজিবাদী কঞ্জুষ বখিল ?
উচ্চাসন পায় কেন নীতিহীন রাজনীতিবিদ ?
ভ্রষ্টের বন্দনা গানে কেন পাও অন্তরে তাকিদ ?
সমাজের সর্বস্তরে কেন দেখি এ হীনমন্যতা ?
চৌর্যে কেন প্রবণতা ? কেন বাড়ে অকাজে দক্ষতা ?
কেন নাই মূল্যবোধ ? ন্যায় নীতি হারালো কোথায় ?
জাতীয় সম্পদ কেন অবলুপ্ত রাত্রির ছায়ায় ?
দু'দিনের ভাগ্যবান ! চতুর্দিকে কেন দেখ আজ
ভূখ মিছিলের সারি ? কেন বাড়ে ভিখারী সমাজ ?
কেন এই মুক্ত দেশ অজ্ঞতা ও আকালের দেশ ?
অভিজ্ঞের পরিবর্তে কেন হ'ল মাকালের দেশ ?

স্বাধীনতা বিকিয়ে দেয়া সহজ। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের জন্য কঠোর ত্যাগ ও সংগ্রামের প্রয়োজন। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আরো কঠোরতর ত্যাগ, তিতিক্ষা, সদা সতর্কতা ও আত্মত্যাগের প্রয়োজন। কবি তাই বলেন :

"ঈমান আনার চেয়ে রাখা তারে যেমন কঠিন/তেমনি কঠিন জেনো রক্ষা করা আজাদীর দিন, /সামান্য শৈথিল্য,ক্রটি দেয় তাকে সহসা নিভিয়ে;/জেনেছি এ কথা আমি স্বোপার্জিত অভিজ্ঞতা দিয়ে।/কিংবা আজাদীর মাঠে যদি আর না থাকে যোগ্যতা/নেমে আসে একদিন অতর্কিতে চরম ব্যর্থতা!/দেখা দিলে বেঈমানী আদর্শের ক্ষেত্রে যথাযথ/গোলামী তক্দির শুধু নেমে আসে লানতের মত;/অতঃপর ব্যর্থ হয় বহুবিধ সংগ্রাম-সাধনা / কলিজার রক্তে শুধু সে পাপের জেনেছি মার্জনা।/"বুঝেছিল এই কথা বেরিলির মুক্ত মুজাদ্দিদ,/আজাদী জেহাদে সেই সিংহ-প্রাণ হয়েছে শহীদ।/তার লক্ষ অনুগামী, মুজাহিদ নির্ভীক, দিলীর/কলিজার তাজা খুন দিয়ে গেছে পথে আজাদীর।/সুবহে উম্মীদের মত পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য প্রাণের/শহীদী জামাতে দেখে ম্লান মুখ মীর-জাফরের/তাদের সম্ভ্রম দেখে পলাতক হই আমি ভয়ে,/তাদের সাফল্য দেখি দূর হত সলজ্জ বিস্ময়ে।

ইসলামের নামে অর্জিত পাকিস্তানের রাজনীতিবিদগণ মূলত আদর্শহীন চরিত্রের অধিকারী হওয়ায় ধর্মের নামে তারা জনগণকে প্রতারিত করেছে। ইসলামের নীতি ও

আদর্শ বাস্তবায়নের পরিবর্তে তারা রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, শাসন-ব্যবস্থা ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে নীতিহীনতার সয়লাব বইয়ে দিয়েছে। ফলে জনগণের দুর্দশা চরম আকার ধারণ করেছে এবং দেশে সর্বত্র হতাশা ও অচলাবস্থা বিরাজ করছে। কবি এখানে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা তৎকালীন অবস্থার সাথে যেমন সঙ্গতিপূর্ণ, বর্তমান প্রেক্ষাপটে তা অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ। কবি বলেন :

"সম্পূর্ণ আদর্শহীন হও যদি এসো ছেড়ে মূর্খের তরিকা,
সঙ্গে দেখ পুঁজিপতি খুলেছে কি নর্দমা পাপের "
আলেমের ভূমিকায় দেখ চেয়ে কারা চুপে চুপে
ধর্মকে চালাতে চায় শোষকের হাতিয়ার রূপে।
অসাধু অসৎ যত ব্যবসায়ী কিংবা কর্মচারী
দেখ জুয়াচুরি ঘুষে খোলে কোন মৃত্যুর কাচারি !
বিশুদ্ধ শিল্পের নামে পুরাপুরি যৌন বিজ্ঞাপন
ইল্লতের কাণ্ডে দেখ কোন বার্তা হয় উদ্ঘাটন।
ভুঁইফোড় খবিসেরা সর্বস্তরে করে আনাগোনা
সমাজ সত্তাকে দেখ কি পন্থায় করে তুলো-ধোনা !
অগ্রগতি দূরে থাক অস্তিত্বটা নিয়ে টানাটানি !
দেখো অপরূপ দৃশ্য– 'প্রগতির' নামে রাহাজানি !

চরম হতাশা ও দুর্দশাগ্রস্ত জাতিকে রক্ষার জন্য কবির সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা–

"জেহাদী শিক্ষার স্মৃতি যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে
করো তাকে মূলধন এ দিনের ঘূর্ণিত বিপাকে,
অতঃপর নেমে এসো সামগ্রিক কঠিন প্রয়াসে;
পাবে না সাফল্য খুঁজে কোনদিন নৈরাশ্যবিলাসে।
ঈমান, আমল ছাড়া কার্যক্ষেত্রে মুক্তিপথ নাই,
নীতি ও সততা বেচে কোনক্রমে পাবে না রেহাই।
বরং সে মূলধন বিক্রি করে নিজেই বিক্রেতা
হ'য়ে যাবে সর্বস্বান্ত ধূর্ত কিংবা মূর্খদের নেতা।

... ... ... ...

"দুর্নীতিটা 'নীতি' আর নীতি হয় যেখানে দুর্নীতি
ভণ্ডামির পরিণতি– সেখানেই ওঠে শোকগীতি।
ইসলামের নাম নিয়ে করে গেছো যে হাত সাফাই
তারি পরিণামে দেখো আজ কোন স্থিতি, শান্তি নাই;
মৌলিক নীতির মাঠে করে নিত্য আত্মপ্রবঞ্চনা
পেয়েছো যা জিন্দেগিতে সে তো আর দেয় না সান্ত্বনা।

... ... ... ...

"কর্মকুণ্ঠ যে কওম দেয় শুধু ভাগ্যের দোহাই
খোদার দুনিয়া মাঝে ক্ষতি ছাড়া প্রাপ্য তার নাই।
জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা, গবেষণা ধামাচাপা দিয়ে
অনাবাদী রেখো মাঠ, কারিগরি শিক্ষাটা তাড়িয়ে
শিল্পকে শিকায় তুলে, চালু রেখে চোরা কারবার
কামিয়াবি চাও যদি পাবে শুধু দেখা ব্যর্থতার।

মীর জাফর আমাদের ইতিহাসের এক কলঙ্কিত নাম। তার বিশ্বাসঘাতকতার কারণে বাংলা বিহার উড়িষার স্বাধীনতা বিপন্ন হয়েছিল। সেজন্য আমরা কথায় কথায় সর্বদা ঘৃণাভরে মীর জাফরের উল্লেখ করে থাকি। কিন্তু বর্তমানে আমাদের সমাজে অসংখ্য মীর জাফর নানা বেশে নানাভাবে সক্রিয় রয়েছে। কেউ আদর্শের প্রতি, কেউ স্বধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি, কেউ দেশ ও সমাজের বিরুদ্ধে সর্বদা বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছে। মীর জাফরের মুনাফিকী চরিত্র আজ আমাদের সমাজে সর্বত্র ব্যাপকভাবে পরিদৃশ্যমান। কিন্তু এখনও আমরা কথায় কথায় কেবল মীর জাফরকে গালি দিয়ে আত্ম-তৃপ্তি লাভ করি, নিজেদের মুনাফিকী ও দুর্বলতার প্রতি কেউ দৃষ্টিপাত করি না। এ ধরনের স্বভাব-চরিত্র বিশিষ্ট মানুষ কখনো সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হয় না। সমাজের অধিকাংশ মানুষ যখন এরূপ স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী হয় তখন সে সমাজের অধঃপতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। ফররুখ আহমদ অত্যন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমাদের জাতীয় চরিত্রের বিশ্লেষণ করে জাতির দুর্দশা ও অধঃপতনের মূল কারণের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। এ কাব্যটিতে কবি ব্যক্তি ও জাতিগত চরিত্রের বিশ্লেষণ করে তিনি তা শুধরানোর যে নোকশা বাতিয়েছেন, তা অত্যন্ত মূল্যবান ও প্রাজ্ঞোচিত। তাঁর এ নির্দেশনা মান্য করলে আমাদের ব্যক্তি ও জাতিগত স্খলন-পতন যেমন রোধ করা সম্ভব, তেমনি আমাদের ভবিষ্যতও উজ্জ্বল সম্ভাবনায় পূর্ণ হয়ে উঠতে বাধ্য।

'ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক' কাব্য মূলত মোট ১২৫৬ চরণ বিশিষ্ট একটি দীর্ঘ কবিতা। এটা বাংলা কাব্যের একটি ভিন্ন আঙ্গিক। ফররুখ আহমদ বিভিন্ন আঙ্গিকে কবিতা রচনা করেছেন, এটা তেমনি এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ভিন্নতর আঙ্গিক। এ দীর্ঘ কবিতায় কবি আমাদের জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং স্খলন-পতনের কাহিনী বিবৃত করেছেন। কবি তাঁর কলমের কষাঘাতে আমাদের ব্যক্তি ও জাতীয় চরিত্রের দুর্বলতার দিকগুলো তুলে ধরে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার সুস্পষ্ট রূপরেখা বর্ণনা করেছেন। আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ব্যক্তি চরিত্রের দুর্বলতার দিকগুলো কবির সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। এটাকে এক ধরনের আত্ম-সমালোচনা ও আত্ম-বিশ্লেষণ বলা যায়। এরূপ আত্ম-বিশ্লেষণের দ্বারা ব্যক্তি বা সমাজ তার দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত ও তা দূরীকরণে সক্ষম হয়। কবির উদ্দেশ্য শুধু

সমালোচনা নয়, বরং সংশোধন। কবি এক উদার ও মহত্তম দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনার এ দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করে তাঁর জাতীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। এতে তাঁর আদর্শপ্রীতি, জাতিপ্রেম ও দেশাত্মবোধের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কবিতা মানেই ব্যক্তি-মনের অনুভূতির প্রকাশ। কিন্তু এ দীর্ঘ কবিতায় শুধু ব্যক্তি-অনুভূতি নয়, জাতিগত অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

'ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য' একটি ব্যঙ্গাত্মক রচনা। তবে ব্যঙ্গাত্মক আমেজের মধ্যে কবির সিরিয়াস মনোভঙ্গি সর্বত্র কাজ করেছে। কবির ইতিহাস-চেতনা, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের স্বভাব-চরিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং সর্বোপরি তাঁর আদর্শদীপ্ত জাতীয়তাবোধ এ গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে প্রকোটিত হয়েছে। ব্যঙ্গ কবিতার মধ্যে এক ধরনের শ্লেষ বা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। কিন্তু সে ক্ষোভ বা শ্লেষটাই শেষ কথা নয়। এর মাধ্যমে আত্ম-জাগৃতি ও আত্ম-সম্বিত ফিরে পাওয়ার উপায় থাকে।

'ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য' নাট্যাকারে রচিত। এটা বক্তব্য প্রধান কবিতা। নাটকে যেমন সংলাপ থাকে, এখানেও তেমনি সংলাপ রয়েছে। তবে এটি কাব্যনাট্য নয়। কাব্যনাটকের যেসব বৈশিষ্ট্য এখানে তা অনুপস্থিত। মূলত কাব্যনাটক হিসাবে এটা রচনা করার কোন অভিপ্রায়ও কবির ছিল না। এতে মাত্র দু'টি চরিত্র। একটি মীর জাফর, অন্যটি কবির ছদ্মনাম–হায়াত দারাজ খান পাকিস্তানী। দ্বিতীয় চরিত্রের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত। মূলত মীর জাফরের চরিত্রই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। ইতিহাসের ঘৃণীত মীর জাফরের চরিত্রকে কবি এখানে বর্ণনা করেছেন, অনেকটা তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে। মীর জাফরকে কবি এখানে সমান্তরালভাবে দাঁড় করিয়ে দেখাবার প্রয়াস পেয়েছেন যে, আমাদের সমাজে তার মতো চরিত্রবিশিষ্ট লোকের অভাব নেই। বরং বাস্তবে তার চেয়েও হীন, কদর্য ও আদর্শহীন চরিত্রের পরিচয় ইতিহাসে আরো বিদ্যমান, বর্তমানে তাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কবি মীর জাফরের জবানীতে তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। ফলে মীর জাফরের বক্তব্যই এ কাব্যের অধিকাংশ স্থান জুড়ে আছে। সেদিক দিয়ে এটাকে সংলাপধর্মী, বক্তব্য প্রধান মনোলোগ জাতীয় রচনা বলা যায়।

আলোচনার শুরুতে বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্য-সমালোচক আবদুল মান্নান সৈয়দের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করছি। তাঁর আরেকটি মন্তব্য উদ্ধৃত করে আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটাতে চাই। তিনি বলেন : "ব্যঙ্গ সৃষ্টি হয় গোপন রোষ থেকে। অসংখ্য ব্যঙ্গকবিতার মধ্য দিয়ে রুষ্ট ফররুখ আহমদ সমকালীন দেশ-কালকে স্পর্শ করেছেন। তবে 'ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য' ঠিক ব্যঙ্গাত্মক কাব্যগ্রন্থ নয়। একটু লঘু ভঙ্গিতে লেখা এই দীর্ঘ কাব্য শেষ পর্যন্ত বক্তব্যে সিরিয়াস–যদিও হালকা টোন শেষ-পর্যন্তই বহাল রেখেছেন কবি। কমলাকান্তী ভঙ্গিতে শুরু ও শেষ–বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-৯৪)

'কমলাকান্তের দপ্তর' ছিলো তাঁর প্রিয় পাঠ্যের অন্তর্গত–এই গ্রন্থে কবিতা ও নাট্যের সমীভবন ঘটেছে। এ বই পুরোটাই আত্মসমালোচনা। যারা 'অপরূপ ধর্মের মুখোশে/ সুযোগসুবিধামত মুনাফার মাঠ খায় চষে' কবি তাদের সেই মুখোশ খুলে দিতে চেয়েছেন। কবি দেখছেন: দেশ-কাল-সমাজ এক সার্বিক অবক্ষয়ে ধ্বস্ত। তাই 'উত্থানের পূর্বাহ্নে পতন' ঠেকাতে চেয়েছেন কবি। 'জামার আস্তিনে, বাহুডোরে' যারা পোকা পোষে, তাদের বিরুদ্ধে এই কলমী জেহাদ ঘোষণা করেছেন কবি। ('হায়াত দারাজ খান পাকিস্তানী' ছদ্মনামে 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় 'নয়া জিন্দেগী' শীর্ষের–কার্তিক ১৩৫৯– একটি কাব্যনাট্যে যে-ভাবে কথোপকথনের ঢং ব্যবহৃত হয়েছিলো, তার সঙ্গে মিল আছে 'ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্যে'র রূপকল্পের। তফাৎ এই : এখানে তিনি বর্ণনাত্মক– ফলে কাব্যনাট্যের ধরন ব্যবহার ক'রেও এই কাব্যনাট্য হলো না– ১৮ মাত্রার মিলান্ত অক্ষরবৃত্তে পুরো বইটি লেখা।) পুরাণ বা ইতিহাস ফররুখ যখনই প্রয়োগ করেছেন, তখনই তার প্রাচীন আখ্যানের মধ্যে ব্যবহার করেছেন নতুন অন্তরাখ্যান। সিন্দবাদ ও হাতেম তা'য়ী–তাঁর এই দুই নায়কের পাশাপাশি ইতিহাসের কুখ্যাত চরিত্র মীর জাফরকে তিনি এনেছেন এখানে। কবির সঙ্গে মীর জাফরের কথোপকথনের মধ্যে (বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর এখানে একটু নতুনরূপে চিহ্নিত) উন্মোচিত হয়েছে সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক 'চরিত্র, চাতুর্য, চুক্তি, চক্রান্ত, বিচিত্র ব্যবহার!' যেন এই কাব্যের মুখ্য চরিত্রের মধ্য দিয়ে উচ্চারিত হ'লো আদর্শবাদী কবির হুঁশিয়ারি। এ গ্রন্থে ফররুখের আদর্শবাদিতারই আরেক দিক প্রকাশিত। স্বপ্নদ্রষ্টা কবির স্বপ্নভঙ্গের আশঙ্কা! এ এক সাহিত্যিক শ্বেতপত্র– কালের কুঠার! এ গ্রন্থ আরেকবার প্রমাণ করলো : ফররুখ যতখানি ব্যক্তির কবি তার চেয়ে বেশি জাতির কবি। ব্যক্তিগত আবেগের চেয়ে জাতিগত আবেগই তাঁকে উন্মথিত রেখেছে চিরকাল। এই কাব্যে তাঁর সেই অব্যক্তিক আবেগের এক বহিঃপ্রকাশ– এক সম্প্রসার। ফলত অচ্ছেদ্য মিল্লাতে'র ভাবনা-বেদনাই ফররুখকে চিরকাল কবি করেছে। (দ্রষ্টব্য : আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত 'ফররুখ আহমদ রচনাবলী', ২য় খন্ড, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা- ৪৭৮-৭৯)। ❐

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ঊনবিংশ সংকলন, জুন ২০১০]

## ফররুখ আহমদের গীতিনাট্য : আনারকলি

**মুহম্মদ মতিউর রহমান**

সংস্কৃত আলংকারিকদের মতে নাটক কাব্য সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। কাব্যকে তাঁরা দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন–একটি দৃশ্যকাব্য অন্যটি শ্রব্যকাব্য। যে কাব্য পাঠের মাধ্যমে রসাস্বাদন করা হয়, তাকে তাঁরা শ্রব্যকাব্য বলেছেন আর যে কাব্য মঞ্চে বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে অভিনয় করে প্রদর্শিত হয়, তা দৃশ্যকাব্যের অন্তর্ভুক্ত। এরদ্বারা আলংকারিকগণ নাটককে কাব্য সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচনা করেছেন। মূলত পূর্বকালে সাহিত্য বলতে ছন্দবদ্ধ রচনাকেই বুঝাত। তখন গদ্যের জন্ম হয়নি, যদিও আদিকাল থেকে মানুষের মুখের ভাষা গদ্যের আদলেই তৈরী। তবু প্রাচীনকালের সকল ভাষার সাহিত্যই ছন্দবদ্ধ কবিতা। গদ্যের ব্যবহার সবদেশের সাহিত্যেই আধুনিককালে শুরু হয়েছে। বাংলা সাহিত্যেও গদ্যের উদ্ভব ইংরাজ আমলে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে। বর্তমানে গদ্যরীতি সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী এবং মানুষের তাবৎ ভাব প্রকাশের জন্য এটা সর্বোকৃষ্ট মাধ্যম।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে নাটক ছন্দবদ্ধভাবে রচিত হলেও তার একটি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নাটককে বস্তুনিষ্ঠ রচনা বলা হয়। অর্থাৎ সাধারণ কবিতায় কবি সরাসরি মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু নাটকে কবি থাকেন অন্তরালে। বিভিন্ন পাত্র-পাত্রী অথবা চরিত্রের মাধ্যমে নাটকের বিষয়বস্তু কবিতার আকারে সংলাপের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এ বস্তুনিষ্ঠতা নাটককে সাহিত্যের অন্য সকল শাখা থেকে একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য দান করেছে। আধুনিককালে এ বস্তুনিষ্ঠতার ক্ষেত্রে নাট্যকার অধিকতর মনোযোগ দিয়ে থাকেন। এজন্য নাটক শুধুমাত্র ব্যক্তিমনের অভিব্যক্তি নয়, এটা অনেকাংশে সামষ্টিক বা সামাজিক অভিব্যক্তি। এতে সমষ্টি তথা সমাজের একটি বক্তব্য বা শক্তিশালীমেসেজ ফুটে ওঠে। ফলে নাটকের আবেদন অনেকটা সর্বজনীন এবং ব্যাপকতর হয়। একারণে নাটক একটি শক্তিশালী ও জনপ্রিয় সাহিত্য-মাধ্যম হিসাবে পরিগণিত।

আধুনিককালে নাটকের ভাষা শুধুমাত্র ছন্দবদ্ধ হয়ে থাকেনি। গদ্যে রচিত নাটকই বর্তমানে বেশী রচিত হয় এবং সেটাই অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তবে গদ্য নাটক ছাড়াও গীতি নাট্য, কাব্য নাট্য, নৃত্য নাট্য, সাংকেতিক নাটক ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর নাটক রয়েছে। প্রত্যেক শ্রেণীর নাটকের একটি আলাদা রীতি-পদ্ধতি রয়েছে। গীতি নাট্য সম্পর্কে জনৈক আলংকারিক বলেন :

"অপেরা' (গীতিনাট্য বা গীতাভিনয়) শব্দটি ইটালি হইতে আগত। ইহা মুখ্যত নৃত্যগীত-সম্বলিত নাটক হইলেও গান এই নাটকে গৌণ নহে, মুখ্য। Gay–এর Beggar's Opera নামক নাটকেও সাহিত্যিক অংশটি মুখ্য নহে, গীতিনাট্য সঙ্গীতই

ইহার প্রাণ। আমাদের দেশে 'অপেরা' শব্দটি 'যাত্রার' প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।" (শ্রীশচন্দ্র দাশ : সাহিত্য-সন্দর্শন, পৃষ্ঠা-৮৪)।

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট হয় যে, গীতিনাট্যের মুখ্য দিক হলো এর গীতিবহুলতা। নৃত্য ও গীতের মাধ্যমে এ নাটক পরিবেশিত হয়। এক ধরনের কাব্যিক আবহ ও ভাবোচ্ছ্বাসের মাধ্যমে গীতিনাট্য অভিনীত হয়ে থাকে। বাংলা ভাষায় এ ধরনের নাটকের উদাহরণ হিসাবে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'কিন্নরী', অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'শিরী ফরহাদ', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ধ্যানভঙ্গ' ও রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' এবং 'ঋতুউৎসব'-সম্পর্কিত নাটকগুলো এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের সকল শাখায় অসাধারণ অবদান রেখে গেছেন। বাংলা গীতিনাট্য শাখায়ও তাঁর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে বাংলায় আবহমানকাল থেকে প্রচলিত যাত্রা বা পালাগানের সাথে আধুনিক গীতিনাট্যের যথাযথ তুলনা চলে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে। যাত্রা ও পালাগান বাংলাদেশের পুরাতন ঐতিহ্য। আধুনিক গীতিনাট্যের প্রচলন ঘটেছে মূলত পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণে।

ফররুখ আহমদ বাংলা কাব্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক প্রতিভার অধিকারী কবি। কবিতার বিভিন্ন রূপাঙ্গীকে তিনি তাঁর অসাধারণ প্রতিভার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়েছেন। গীতি কবিতা, সনেট, মহাকাব্য, শিশুতোষ কাব্য, ব্যঙ্গ কবিতা ইত্যাদি বিভিন্ন রূপ-রীতিতে তিনি কবিতা রচনা করেছেন। তিনি নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও স্বচ্ছন্দ বিচরণ করেছেন। তিনি মোট তিনটি নাটক রচনা করেছেন। তার একটি গদ্যে রচিত ব্যঙ্গ নাটক-'রাজ-রাজড়া', একটি কাব্যনাটক-'নৌফেল হাতেম' এবং অন্যটি গীতিনাট্য– 'আনারকলি'।

ফররুখ আহমদ রচিত 'আনারকলি' গীতি নাট্যটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'পাকিস্তানী খবর' পত্রিকার ৯ এপ্রিল ১৯৬৬ সনে। এটি পুনর্মুদ্রিত হয় 'ফররুখ আহমদ' শীর্ষক সংকলনে (১৯৮৭, সেবা, ঢাকা)। ক্ষুদ্রায়তনের এ নাটকটি মোট ৯ পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ। এতে মোট তিনটি দৃশ্য রয়েছে। নাটকের অংক-বিভাগের রীতি-পদ্ধতি এ তিনটি দৃশ্যের মধ্যে কৌশলে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ক্ষুদ্রায়তনের এ নাটকটিতে এক গভীর অন্তর্ভেদী ও মর্মস্পর্শী মানবিক সংবেদনার শক্তিশালী অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। মুঘল সম্রাট আকবরের পুত্র সেলিম ও ইরানের শাহাজাদী আনাকলির অসাধারণ প্রেম-কাহিনী ও সে প্রেমের করুণ পরিণতি নিয়ে নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে। এতে মোট তিনটি দৃশ্যে ১১ জন চরিত্রের বর্ণনা রয়েছে। কাহিনীর সূত্রপাত ঘটেছে ইরানে এবং এর সময় হলো এক উৎসবের দিন।

প্রথম দৃশ্যে কবি আনারকলি ও তার এক সেহেলি এবং দুজন দ্বাররক্ষীর সংলাপ দিয়ে শুরু করেছেন। দৃশ্যের বর্ণনায় কবি যে গানটি দিয়ে শুরু করেছেন, তা এরূপ:

> ইরানের গুলশান হল উচ্ছল
> মেলে আঁখি নার্গিস: জাগে শতদল।।

পাতায় পাতায় ঘাসে
শিশির কণিকা হাসে,
নিশীথের শবনম
হ'ল উচ্ছল ॥
শুরু হ'ল খোশরোজে খুশীর খেলা,
গোলাবের পাপড়িতে রঙের মেলা ॥
শোনে মন উন্মন
মৌমাছি গুঞ্জন
এ খুশীর খোশরোজে
চির চঞ্চল ॥

উপরে ইরানের ঐতিহ্যবাহী 'নওরোজ' উৎসবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। নওরোজ সাধারণত ইরানের বসন্তকালের শুরুতে উদ্‌যাপিত হয়। তখন প্রকৃতি নবসাজে সজ্জিত হয়ে আনন্দ-চঞ্চল ও মনোরম হয়ে ওঠে। প্রকৃতির আনন্দ মানুষের মনেও খুশির বন্যা বইয়ে দেয়। সে খুশির প্রতিফলন ঘটে মানুষের মনে, বিশেষত প্রেমিক-প্রেমিকারা সে আনন্দে চঞ্চলিত হয়। এখানে বিশেষভাবে কয়েকটি ফারসি শব্দের ব্যবহারে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে আরো মনমুগ্ধকররূপে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যেমন- গুলশান, নার্গিস, শবনম, খোশরোজ ইত্যাদি শব্দের দ্বারা ইরানের প্রাকৃতিক দৃশ্যের অপূর্ব সৌন্দর্যময় চিত্র মনমুগ্ধকররূপে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এগুলোর পরিবর্তে অনুরূপ বাংলা শব্দের ব্যবহারে তা কখনো সম্ভব হত না। অতএব স্থান ও বাস্তবতার কারণে কবি এ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করে তাঁর নৈপুণ্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

উপরে সৌন্দর্যময় প্রকৃতি ও উৎসবের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তাতে আনারকলির চিত্ত সাড়া দেয়নি, কারণ এক গভীর শংকা ও উদ্বেগের ফলে তার চিত্ত-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সে তার ঈপ্সিত প্রেমিকের সান্নিধ্যে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। এ উৎসব-মুখর রাত্রিবেলায় সকলের অলক্ষ্যে তাকে বিপদ-সংকুল পথ পাড়ি দিয়ে তার প্রেমিকের কাছে দূরদেশে যাত্রা করতে হবে। তাই তার মন উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। এটা দেখে তার সেহেলি তাকে জিজ্ঞাসা করছে:

"কি কথা বলিস? শোন সেহেলি
সকলে যখন উঠেছে মেতে,
খোশরোজে তোর বাধা কি যেতে?"

সেহেলির এ কথায় উদ্বিগ্ন আনারকলি উদ্বেগের সাথে বলল:

"লক্ষ বিপদ ঘিরেছে যারে
যেতে হবে যাকে এ দেশ ছেড়ে
এ খুশীর খেলা সাজে না তার।"

একথায় সেহেলিও রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করে:

"কোন দূর দেশে যাবে সেহেলি
সে দেশে কি হায় দুঃখ নাই?"

এর উত্তরে আনারকলি বলে:

"কি আছে উপায় মজলুমের
আলোর ইশারা খুঁজে না পাই।"

সে তখন বলে:

"কাফেলার পথ নাই তো জানা,
তবু শুনবে না তুমি এ মানা
আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

এর উত্তরে । এভাবে কাহিনী এক বিশেষ Suspense বা নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। কাহিনীর সূত্রপাত এবং প্রথম দৃশ্যের প্রথম ভাগের সমাপ্তি ঘটে এখানেই।

এরপর নাটকের প্রথম দৃশ্যের দ্বিতীয় ভাগের শুরু। কাফেলা এগিয়ে চলেছে। কাফেলার সাথে সঙ্গতি রেখে আবহ আনারকলি বলে:

"দূর সুদূরের পথে কাফেলা
ডেকেছে আমাকে অস্ত বেলা,
বিদায় ইরান।–খোদা হাফেজ ॥"

আনারকলি তার অন্তরের ডাকে প্রেমাস্পদের সান্নিধ্যে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল। কিন্তু সে তাঁর ঠিকানা জানেনা, গন্তব্যে পৌছার সুনির্দিষ্ট পথের সন্ধানও তার জানা নেই। তবু অন্তরের ডাকে তাকে সেখানে যেতেই হবে। তার সেহেলিও এভাবে আনাকলিকে একাকী নিরুদ্দেশের পথে যেতে দিতে রাজি নয়। তাই সে তার সঙ্গী হয়। শুরু হয় নিরুদ্দেশের পথে অভিযাত্রাসঙ্গীত পরিবেশিত হচ্ছে। সঙ্গীতটি এরকম:

দিন রজনীর পথে চলে এই কাফেলা
নিত্য ভাসি আঁখি জলে এই কাফেলা ॥
দুঃখ রাতের বেসাত নিয়ে চল্‌ছে হায়
রাতের ছায়া নামলে কাল দিনশেষে
খুঁজবে কি সুর তারার দলে এই কাফেলা ॥
চলার তালে হাজার পথের বাঁক ঘুরে
পাবে কি ভোর ফুল-ফসলে এই কাফেলা ॥
কেউ জানে না কোন্ সে বিজন দূর দেশে
ঠাঁই পাবে কোন আকাশ তবেল এই কাফেলা ॥

আবহ সঙ্গীতের সাথেই প্রথম দৃশ্যের দ্বিতীয় ভাগের পরিসমাপ্তি ঘটে। কাফেলা ইরানের সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতবর্ষে মুগল সম্রাটের সীমান্তের মধ্যে এসে পড়েছে। সীমান্তরক্ষীরা কাফেলাকে থামতে বলে। আগন্তুকদের পরিচয় জানার জন্য এবং

তাদের সঙ্গে যা কিছু আছে তা যথাযথরূপে অনুসন্ধান করার জন্য কাফেলাকে থামতে বলে। সীমান্তরক্ষীদের জবাবে কাফেলা-সালার বলেঃ

"দূরে যাও, দূরে যাও....
এ কাফেলা নয় পণ্যের
এ কাফেলা নয় স্বর্ণের
এ কাফেলা চলে তক্‌দির সন্ধানে।"

এর উত্তরে সীমান্তরক্ষী উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে ওঠেঃ

"কে ঐ রূপকুমারী
কেন নিয়ে যেতে চাও
বুঝিতে না পারি;
ফিরে যাও কাফেলা-সালার।"

উত্তরে কাফেলা-সালার জবাব দেয়ঃ

"আছে আছে গিরি–কান্তার
পথ রেখা নাই ফিরিবার
যে নারী চলেছে সাথে
নিয়ে আঁখি নীর
তার দুরাশায় জাগে
তার তক্‌দির।"

এতে সীমান্তরক্ষী বুঝতে পারে যে, এ কাফেলা কোন সাধারণ কারণে নয়, বরং অন্তরের গভীর প্রেরণায় নিজের তক্‌দির পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা শুরু করেছে। অতএব, সীমান্তরক্ষীরা প্রেমিকা নারীর মনঃস্কামনা পূরণের জন্য তাদেরকে ছেড়ে দেয় এবং অনেকটা আশীর্বাদের সুরে বলে:

"চলে যাও কাফেলা-সালার।
দুঃখের কাল মেঘে
হয়তো বা দেখা দেবে
ক্ষণিকের সুখ স্বর্ণাভা।"

প্রথম দৃশ্যের শেষ এখানেই। এরপর দ্বিতীয় দৃশ্যের অবতারণা হয়। এ দৃশ্যের সূত্রপাত ঘটেছে হিন্দুস্থানের এক জনবসতিপূর্ণ বাজারে। সাধারণত বিদেশ থেকে কোন কাফেলা বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য নিয়ে প্রথমত এ বাজারেই প্রবেশ করে সওদাগরদের কাছে তা বিক্রি করার জন্য। সওদাগরেরাও সেখানে বিভিন্ন ধরনের বিদেশী পণ্য ক্রয়ের আশায় অপেক্ষা করে। কাফেলা আশার সঙ্গে সঙ্গে তাই অপেক্ষমাণ সওদাগরেরা কাফেলাকে ঘিরে তাদের কাছে কী কী পণ্য আছে, তা জানার জন্য উতলা হয়ে ওঠে। তাদের প্রশ্ন:

"ইরানের কোন্ সওদা এনেছ সাথে?

গালিচা?

শারাব?

খঞ্জর?

শামশির?

আনো নাই বাঁদী হাসিন খুব সূরাত?"

তখনকার দিনে প্রাচীন ঐতিহ্যেপূর্ণ ইরান থেকে যেসব পণ্য হিন্দুস্থানে আসত, উপরে সেসব পণ্যেরই উল্লেখ করা হয়েছে। সওদাগরদের এ প্রশ্নের জবাবে কাফেলা-সালার সে একই কথা বলে যে, এটা কোন পণ্য বা স্বর্ণ বহনকারী কাফেলা নয়। এ কাফেলা তক্‌দিরের অনুসন্ধানে বহির্গত হয়েছে। এরপর সওদাগরের জিজ্ঞাসা:

"সুন্দরী নারী কে ঐ পরীর মত।

ওর পরিচয় দিয়ে যাও অন্তত।"

এর জবাবে কাফেলা-সালার অনেকটা দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলে:

"হৃদয় যদি না চিনে নেয় হৃদয়েরে

পারবে না কেউ চিনতে কখনো এরে।"

এ জবাবে সওদাগরেরা সন্তুষ্ট হতে পারে না। তাদের মনে রহস্যের সৃষ্টি হয়। তাই তারা বলে:

"এখানে পাবে না ছাড়া

যেতে হবে শাহী দরবারে।"

দ্বিতীয় দৃশ্যের প্রথম ভাগের সমাপ্তি ঘটে এখানেই। এরপর শাহী দরবারে কাফেলাকে নিয়ে হাজির করা হয়। শাহাজাদা সেলিমের সামনে উপস্থিত হয়ে সওদাগর তার সমীপে আরজ করে যে :

"শোন ফরিয়াদ বাদশাজাদা

চলেছিল দূরে এই কাফেলা

সাথে নিয়ে নারী অপরিচিতা।"

এর জবাবে কাফেলা-সালার বলে:

"নহে লুণ্ঠিতা, অবগুণ্ঠিতা নারী

যে এসেছে তার তকদির সন্ধানে।"

এ কথা শুনে শাহাজাদা সেলিম বলে:

"চিনেছি, চিনেছি আমি

আমার আত্মার

সকল রোশ্‌নি দিয়ে চিনেছি নারীকে,

খুঁজিয়াছি যারে আমি

এল সেই জোহরা সিতারা।"

শাহাজাদা সেলিমের কথা শুনে আনারকলি আশ্বস্ত হয়। সে দীর্ঘদিন তার মনের অপূর্ণ স্বপ্ন-স্বাধ পূরণের জন্য যে বিপদ-সংকুল অজানা পথ কায়-ক্লেশে পাড়ি দিয়েছে, আজ বুঝি তা পূরণ হয়েছে এবং সে তার মঞ্জিল মকসুদে পৌঁছে গেছে। তাই অনেকটা স্বস্তি ও নির্ভরতার সাথে বলে:

"মন যার আশ্রয় পিয়াসী
চিনিয়াছো সেই অচেনারে
দূর যাত্রা পথে কাফেলার।"

আনারকলির একথা শুনে সেলিমের অতৃপ্ত প্রেমিক মনে আশ্বস্তি আসে। তাই সে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পরম প্রেয়সীকে পাওয়ার আনন্দে তাকে সাদরে নিজ হেরেমে স্থান দেয়। দ্বিতীয় দৃশ্যের দ্বিতীয় ভাগের সমাপ্তি এখানেই। এরপর তৃতীয় ভাগের শুরু। কিছুকাল শাহাজাদার হেরেমে তার গভীর প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ থেকে পরম শান্তি ও পরিতৃপ্তির মধ্যেও এক গভীর অতৃপ্তির বেদনা তার মনকে অস্থির করে তোলে। এ প্রসঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত একটি কবিতার কয়েকটি চরণের কথা উল্লেখ করা যায়। কবি বলেছেন, "যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই/যাহা পাই তাহা চাই না।" প্রকৃত প্রেমের এটাই যেন প্রকৃষ্ট সংজ্ঞা। উদ্দিষ্ট প্রাপ্তির আশায় প্রেমিক-প্রেমিকা যতটা ব্যাকুল হয়, পাওয়ার পরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে ব্যাকুলতা ধীরে ধীরে অতৃপ্তি-অধরা ও না পাওয়ার বেদনায় পর্যবসিত হয়। তখন প্রেমিক-প্রেমিকা যেন তা থেকে মুক্তির আশায় দিন গুণতে থাকে। মুঘল হেরেমে পর্যাপ্ত আরাম-আয়েশ ও শাহাজাদার গভীর প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েও আনারকলি এখন মুক্তির আশায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। শাহাজাদা সেলিমও তার কাঙ্ক্ষিতা প্রেমিকাকে একান্ত করে পেয়েও তার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা যে শেষ হয়নি, সে আরও পেতে চায়, এক অতৃপ্তির গভীর দহনে তার হৃদয় যেন দগ্ধীভূত হতে থাকে। উভয়ের সংলাপ থেকে তাদের মনের এ সূক্ষ্ম অনুভূতির বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে:

আনার ॥ "নিঃশেষে আমি দিয়েছি ছিল যা মোর
এখনো তোমার তৃষ্ণা কি মেটে নাই?"
সেলিম ॥ "পিপাসা আমার বেড়ে যায় অবিরত
অন্তবিহীন মরু সাহারার মত,
চেয়োনা জানিতে অকারণে পিছু ডেকে
দাও আরো দাও রূপের সূরাহি থেকে।"
আনার ॥ "সুপ্ত মনের পল্লবদল খুলি
যা ছিল আমার দিয়েছি তো সব তুলি।"
সেলিম ॥ মনে তবু উন্মনা উদাসিনী
কিছু দিলে আর কিছু বুঝি নাহি দিলে,
পেয়েছি তোমাকে মোগল হেরেমে, তবু

মন আছে তব আর কোন্ মন্‌জিলে
আনার ॥ হয়তো বুঝেছ, হয়তো বা বোঝ নাই
শ্রান্ত জীবনে এবার জানতে চাই,
ক্লান্ত আমি এ মোগল হেরেমে আজ
ইরানী হাওয়ায় মুক্তিপরশ চাই।
সেলিম ॥ কাছে এলে তবু ওগো বিদ্যুৎশিখা
চিরদিন তুমি রয়ে গেলে প্রহেলিকা।

এখানে নাটকের ক্লাইম্যাক্স শুরু হয়েছে। আনারকলি তার প্রেমাস্পদকে পেয়ে তাকে তার সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার পরও মনে এক গভীর অতৃপ্তি অনুভব করছে। জন্মভূমি ইরানের মুক্ত হাওয়ার পরশ পেতে তার মন উন্মন হয়ে উঠেছে। তাই মুঘল হেরেমের সীমাহীন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-আয়েশ এবং সেলিমের গভীর প্রেমের বাহু-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েও মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। শাহী পরিবারের নিয়ম-শৃঙ্খলা ও বাধ্যবাধকতার মধ্যে সে যেন বন্দী হয়ে পড়েছে। তাই তার মন মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল। যুবরাজ সেলিমের গভীর প্রেম ও আদর-সোহাগ তার মনের এ অতৃপ্তি দূর করতে পারছে না। ফলে হেরেমের বন্দীশালা থেকে মুক্ত হয়ে ইরানের মুক্ত আলো-হাওয়ার পরিবেশে তার মন ছুটে যেতে চায়। আনারকলির মনের এ অবস্থা উপলব্ধি করে শাহাজাদা সেলিমের মনেও অতৃপ্তির বেদনাবোধ সৃষ্টি হয়েছে। সে মনে করছে আনারকলি হয়তো তাকে সবটা দিতে পারেনি, তার মন হয়তো আরও অন্যখানে অন্য কারো কাছে বন্দী হয়ে আছে। একথা ভেবে সেলিমের মনেও নানা প্রশ্ন-সংশয়-সন্দেহ ও সংক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তাই আনারকলির বিদ্যুৎ শিখার ন্যায় রূপের আগুনে নিজেকে পুড়িয়েও সে যেন তাকে ঠিকমত বুঝতে পারছে না। সে তার কাছে অধরাই রয়ে গেছে। আনারকলিকে তার কাছে 'প্রহেলিকা' বলে মনে হচ্ছে। ফলে সে অনেকটা ক্ষোভ ও অভিমান করে দূরে চলে যায়। আনারকলি তখন হেরেমে রক্ষিত পিঞ্জরে হিরামন পাখির কাছে গিয়ে তাঁর মনের আরজু পেশ করে:

"খাঁচার বাঁধন দিলাম খুলে
শোন হিরামন
ইরানী সেই তূতীর কানে
বোলো নিশুত রাতে
সেহেলি তার বন্দিনী আজ
মোগল হেরেমে ॥"

এখানে উল্লেখ্য যে, প্রাচীন রূপকথা জাতীয় গল্প-কাহিনীতে 'হিরামন', 'তূতী', 'কবুতর' ইত্যাদি নানা জাতীয় পাখির উপস্থিতি অনেকটা অবশ্যম্ভাবী। এসব পাখির মাধ্যমে প্রেমিক-প্রেমিকা তাদের মনের কথা দূরবর্তী স্থানে ঈপ্সিত প্রেমিক বা

প্রেমিকার কাছে পৌঁছে দেয়। তখন ডাক-ব্যবস্থা অথবা আধুনিক যুগের টেলিফোন, মোবাইল বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু মানুষ চিরকালই তার মনের নিগূঢ় কথা দ্রুত দূরবর্তী আপনজনের নিকট পৌঁছাতে চায়। একারণে প্রাচীন ও মধযুগে এসব পাখির ব্যবহার অত্যন্ত সাধারণ ও স্বাভাবিক মনে হয়। বিশেষত অবলা নারীর জন্য এটি এক মোক্ষম মাধ্যম হিসাবে সেকালে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। পাখিরাও যেন মানুষের মনের কথা বুঝতে পারে এবং তার প্রিয় মানুষের কথা অন্যের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছে দিতে সক্ষম।

কিন্তু প্রেমের পথে নানা বাঁধা। প্রেমের পথ কখনো কুসুমাস্তীর্ণ নয়। মুক্তির পথও নানাভাবে কণ্টকাকীর্ণ। তাই আনারকলি হিরামন পাখিকে খাঁচা থেকে বের করে তাকে দূত হিসাবে ইরানে প্রেরণের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় অন্যের চোখে সে ধরা পড়ে যায়। এরপর রত্মা ও আনারকলির মধ্যকার কথপোকথন :

রত্মা ॥ অপরূপ ইরানী তূতীরে
বন্দী কে করেছে এনে এ বালাখানায়,
নারী আমি,
তবু আজ মন ফিরে চায়
পুরুষের রূপ ধরি জানাতে প্রার্থনা।

আনার ॥ কে তুমি? কি চাও এখানে বল
বুঝিতে না পারি কিছু তার।

রত্মা ॥ আমি রত্মা অচেনা তোমার।
কোন মায়াবিনী তুমি বিশ্বের সুষমা
তনু দীপাধারে তব রাখিয়াছো জমা
ঘন অন্ধ নিশীথের উজ্জ্বল তারকা?

আনার ॥ অচেনা? অচেনা নহে, সেহেলি আমার
মুক্ত কর পথ মোর বাহিরে যাওয়ার,
শ্বাস রোধ হয়ে আসে মোগল হেরেমে।

রত্মা ॥ কোস্‌নে ও কথা কোস্‌নে,
আত্মঘাতিনী হোস্‌নে
ওরে বন্দিনী এখানে যে কেউ
স্বপ্নে ও কথা বলে না;
ভুলেও ও পথে চলে না ॥

আনার ॥ শুনবো না আমি শুনবো না,
শাহী তখ্‌তের আড়ালে মনের
রঙিন স্বপন বুনবো না,
মোগল হেরেমে শুধু অপমান,

মেলে না এখানে মানুষের প্রাণ,
পাথরের মত ঘিরে আছে হায়
জুলুমশাহী ॥

এভাবে অসহায় নারী অচেনা রত্মাকে পেয়ে তার মনের দুঃখ-বেদনা ও গোপন পরিকল্পনার বিষয় বলে তা বাস্তবায়নে রত্মার সাহায্য প্রার্থনা করে। নাটকের ক্লাইম্যাক্স বা জটিলতা এতে আরও ঘনীভূত হয়। উভয়ের কথপোকথনের সময় গুপ্তচর উঁকি মেরে তাদের সব আলোচনা ও ষড়যন্ত্রের কথা শোনে। এর যে কী কঠিন পরিণতি হতে পারে তা আনারকলি বুঝতে না পারলেও রত্মার বুঝতে দেরি হয় না। তাই রত্মার উক্তি :

"হায় হায় হায়/একি ভুল তুই করলি?/গুপ্তচরের কানে গেছে কথা,/সে তো বুঝবে না এই ব্যাকুলতা;/নিজের দোষে যে মরলি।"

মোগল হেরেমের কঠোর রীতিনীতি রত্মার জানা আছে। তাই সে শংকিত হয়ে পড়েছে। এখানেই দ্বিতীয় দৃশ্যের তৃতীয় ভাগের সমাপ্তি।

নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যের চতুর্থ ভাগে রত্মার মনের গভীর শংকা কঠোর বাস্তবতা হয়ে দেখা দিল। দরজায় মোগল সম্রাট আকবর ও তার পুত্র যুবরাজ সেলিম আবির্ভূত হলেন। এতদিন পর্যন্ত মোগল হেরেমে আনারকলির উপস্থিতি বাদশাহ আকবর জানতেন না। আজ গুপ্তচরের নিকট অকস্মাৎ সব কথা শুনে আনাকলিকে উদ্দেশ্য করে তিনি বাদশাহী মেজাজে উচ্চারণ করেনঃ

"পথ–প্রান্তে নেমে/কারে আনিয়াছো তুমি মোগল হেরেমে?
সে তোমার যোগ্য নহে, তুমি ঊর্ধ্বে তার।"

একথা শুনে যুবরাজের মনে কঠিন আঘাত লাগে। সে আনারকলিকে যেভাবে পেয়েছে এবং তার রূপ-সৌন্দর্য ও প্রেমে যেভাবে মুগ্ধ ও সমর্পিত হয়েছে, তা সম্রাটের অজানা। তাই সম্রাটের কথার প্রতিবাদ করে সে বলেঃ

"নহি আমি যোগ্য তার/বাদশা নামদার,/অনাদৃতা যে গোলাপ ছিল গুলশানে/
ফুটেছে সে এ জীবনে বিপুল সম্মানে।"

যুবরাজের কথা শুনে সম্রাট ক্রুদ্ধস্বরে বলেনঃ

"মায়াবিনী সে তোমাকে টেনেছে বিপথে/গুপ্তচরী সেই নারী তুমি তা জানো না।"

যুবরাজ এ কথারও প্রতিবাদ করে বলেঃ

"গুপ্তচরী নহে নারী,/বঞ্চিত বাসনা/করিয়াছে ওরে অন্যমনা!/ইরানের হরিণীও/
শাহী মহলের কথা/কিছু শেখে নাই।"

আকবর তখন বাদশাহী মেজাজে দর্পভরে বলেনঃ

"মানে না যে মর্যাদা রাজার/পাবে সাজা, পাবে দণ্ড তার/মোগল হেরেমে তার/
স্থান নাই, কোন স্থান নাই।"

বিপুল ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী বাদশার হুকুম অমান্য করার অধিকার কোন মানুষের নেই। রূপবতী প্রেমিকা নারীর হৃদয়ের অতৃপ্ত কামনা-বাসনা উপলব্ধি করার

শক্তি ক্ষমতাধর বাদশার থাকার কথা নয়। যুবরাজের গভীর প্রেমের মূল্যও তার কাছে নেই। বাদশার দৃষ্টিতে মানুষের মাত্র দুটি পরিচয়–হয়তো সে বাদশার একান্ত অনুগত; নাহলে সে শত্রুপক্ষের অনুচর অথবা শত্রু। এর বাইরে বাদশার কাছে মানুষের আর কোন পরিচয় নেই। তাই এখানে আনারকলি ও সেলিমের মানবিক পরিচয় ও তাদের গভীর প্রেমের কোন মূল্য নেই। কিন্তু প্রেমিক সেলিম বাদশার এ অন্যায় হুকুম মানতে নারাজ। এ পর্যায়ে বাদশাহ ও যুবরাজের মধ্যে যে কথপোকথন হয় তাতে মুগল সম্রাটের কঠোর নিয়ম-কানুন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে। এখানে তাই সে সংলাপগুলো তুলে ধরছি :

সেলিম ॥ বিচারের এই প্রহসন!
বলদর্পী বাদশার
একি তিক্ত অবিচার
মুছে দেয় নিষ্পাপ জীবন?
আকবর ॥ এ আদেশ মোগল বাদশার,
এ আদেশ হুকুমত যার।
সেলিম ॥ মানি না, মানি না আমি এই অবিচার।
আকবর ॥ মূর্খ পুত্র !একি জানা নাই
বজ্রদৃঢ় আদেশ আমার?
সিন্ধু যদি ফিরে যায়
ফিরিবে না তবু আর
এই দণ্ড মোগল বাদশার।
বিষপাত্রে মৃত্যু হবে তার।
সেলিম ॥ দাও সেই বিষ পাত্র
নিঃশেষে করি আমি পান।
আকবর ॥ প্রতিফল পাবে প্রতিদান
যদি আনো ধৃষ্টতা তোমার;
শাস্তি পাবে সেই কুহকিনী
রাজরোষে বন্দিনী আনার ॥

বাদশাহ আকবরের কঠিন হৃদয় যুবরাজের কথায় এতটুকু বিচলিত হয় না। একজন সুন্দরী অবলা প্রেমিকা নারীর হৃদয়ের গভীর মর্মজ্বালা সম্রাটের কঠোর আদেশের কাছে নিতান্ত মূল্যহীন। মানবিক মূল্যবোধ ও চিরন্তন প্রেমের মহত্তম আদর্শ দুনিয়ার ক্ষমতাধর নৃপতির হৃদয়হীন কঠোর আদেশের সামনে নিতান্ত তুচ্ছ বিষয়। দ্বিতীয় দৃশ্যের সমাপ্তি ঘটে এখানেই।

এরপর নাটকের তৃতীয় বা শেষ দৃশ্যে বিষ পানে আনারকলির করুণ মৃত্যুবরণের মর্মন্তুত দৃশ্যের বর্ণনা রয়েছে। তবে সেখানেও নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে। নানা Suspense ও নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে কাহিনী চরম পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে।

নাটকের শেষ দৃশ্যের প্রথম ভাগ। সময় রাত্রির শেষ প্রহর। স্থান মোগল সম্রাটের কারাগার, প্রহরীরা প্রহরায় রত। যুবরাজ সেলিমের চোখে ঘুম নেই। নির্ঘুম রাত কাটিয়ে সে ব্যাকুল চিত্তে রাত্রির শেষ প্রহরে তার প্রেমাস্পদীর কাছে ছুটে এসেছে। প্রহরারত প্রহরীদেরকে বুঝিয়ে সে কারাগারে প্রবেশের সুযোগ পায়। কারাগারে প্রবেশ করে সে সরাসরি আনাকলির কক্ষে প্রবেশ করে। সেখানে বন্দী প্রেমিকার সাথে তার যে কথপোকথন হয় তাতে চিরন্তন প্রেমের ব্যর্থতা ও মর্মন্তুদ বেদনার নিষ্করুণ কাহিনীই ফুটে উঠেছে মাত্র। মৃত্যুপথযাত্রী আনারকলি ও তার প্রেমে ব্যর্থ যুবরাজের মধ্যকার আলাপচারিতা চিরকালীন মানুষের গভীর হতাশা ও বেদনারই বহিঃপ্রকাশ। এখানে তা উদ্ধৃত হলো :

সেলিম ॥ শেষ দীপ নিভিবার আগে
এসেছি আনার শেষ রাতে?
আনার ॥ এসেছো, এসেছো এই রাতে?
নেভে নাই জোহরা সিতারা
ফোটে নাই গোলাব কুঁড়িরা
মরণের হিম সজ্জাতে।
এস এস তুমি এই রাতে।
সেলিম ॥ ক্ষমা নেই যে পাপের
অপরাধী আমি সেই পাপে,
তিক্ত মোর অক্ষমতা
আনিয়াছি এ ব্যর্থতা;
ঝরে ফুল সেই অভিশাপে।
আনার ॥ মুছে নাও মনের ম্লানতা,
ব্যর্থ গ্লানি যাও ভুলে যাও,
শেষ নিমেষের পাত্র
পূর্ণ করি আজ তুলে দাও।
সেলিম ॥ দীপশিখা নিভে যায় যাস
আমি সে ক্লান্ত শামাদান,
গোলাবের দিন শেষে হায়,
বণ্টক-ক্ষত গুলশান
সুখ-স্মৃতি সুদূরে উধাও।

এরপর ঘটনাস্থলে জল্লাদের উপস্থিতি। জল্লাদ বাদশাহর হুকুম ত্বরিত্ গতিতে সম্পন্ন করতে চায়। কিন্তু যুবরাজ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ফলে জল্লাদ তার তলোয়ার কোষমুক্ত করে যুবরাজকে কঠোরভাবে বাদশাহর হুকুমের কথা শোনায়। যুবরাজ এতেও নিবৃত্ত না হলে জল্লাদের ইশারায় প্রহরীরা যুবরাজকে জোরপূর্বক

বন্দী করে। এর পরের ঘটনা যেমন সহজ তেমনি করুণ। জল্লাদ বিষের পাত্র আনারকলির হাতে তুলে দেয় এবং সেও মুহূর্তের মধ্যে তা পান করে মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শে মুক্তির স্বাদ অনুভব করে। শেষ দৃশ্যের দ্বিতীয় ভাগের এখানেই সমাপ্তি।

এরপর শেষ দৃশ্যের তৃতীয় ভাগে আনারকলির কবর দেখানো হয়েছে। কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ভগ্ন হৃদয়ে ব্যথিত ব্যাকুল চিত্তে সেলিম তার প্রেমাস্পদীর উদ্দেশ্যে যে সংলাপ উচ্চারণ করেছে, তার মধ্য দিয়েই নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এ সংলাপে মানবিক চিরন্তন আবেদন ফুটে উঠেছে। এ ট্র্যাজেডি নাটকের বিষাদময় আবহ সৃষ্টি হয়েছে এর মাধ্যমেঃ

সেলিম ॥ মৃত্যুর সমাধি অতলে/সে আজ ফেলেছে হিমশ্বাস,/শিয়রে কাঁদিছে তার/সীমাহীন রাতের আকাশ।/নিরাশা শ্রান্ত মন/জাগে যার মরণ আঁধারে/জীবনের চাওয়া তার/কেঁদে যায় প্রিয়ার মাজারে ॥

'আনারকলি' গীতিনাট্যে ফররুখ আহমদের কাব্য প্রতিভার এক বিশেষ দিকের উন্মোচন ঘটেছে। তিনি প্রধানত কবি। নাটকের ভাব ও বিষয়কে তিনি এখানে ছন্দময় কবিতার ভাষায় অপরূপ গীতিমালায় সাজিয়ে তুলেছেন। কাহিনীর বিন্যাসে নানা চরিত্র, ঘটনা, দৃশ্য ও বর্ণনার অবতারণা ঘটলেও নাটকের কাহিনী এক অবিচ্ছেদ্য ও সংহত রূপ লাভ করেছে। নাটকের ভাব ও বিষয় চিরন্তন মানবিক উপাখ্যানে পূর্ণ। তাই এর ভাব ও কাহিনী পাঠকচিত্তকে দ্রবীভূত করে, রুদ্ধশ্বাসে তাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কাহিনীর পরতে পরতে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও আকস্মিকতার সৃষ্টি হয়েছে, তা পাঠকের মনে সর্বদা একটা Suspense সৃষ্টির মাধ্যমে নাটকের ঘটনা প্রবাহের সাথে তাকে একাত্ম করে নেয়। শেষ পর্যন্ত ট্র্যাজেডির মাধ্যমে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটায় এর আবেদন আরো গভীর ও নিবিড় হয়েছে। ইংরাজ কবি পি,বি, শেলী বলেছেন- "Our Sweetest songs are thouse that tell of saddest thoughts."

ফররুখ আহমদের আনারকলি গীতিনাট্যও তেমনি পাঠকের মনে এক গভীর বেদনা মিশ্রিত আনন্দের সঞ্চার করেছে। তাই এটা তাঁর একমাত্র গীতি নাট্য হলেও তা যে বিশেষভাবে সফল, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ◻

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, চব্বিশতম সংখ্যা, অক্টোবর, ২০১২]

# জাতীয় জাগরণের কবি ফররুখ আহমদ

মুহম্মদ মতিউর রহমান

উনিশ শতকের শুরুতে বাঙালি হিন্দু সমাজ নবজাগরণ ঘটে। অপেক্ষাকৃত অনুন্নত, অধপতিত, শোষিত, বঞ্চিত বাঙালি মুসলমানের নবজাগরণ ঘটে এর অর্ধশতাব্দী পর অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষার্ধে। এসময় নবাব আব্দুল লতিফ (১৮২৬-৯৩), মীর মোশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১১), সৈয়দ আমীর আলী, (১৮৪৯-১৯২৮), মহাকবি কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫১), মোহম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্ন (১৮৬০-১৯২৩), মুনসী মহম্মদ মেহেরউল্লা (১৮৬১-১৯০৭) মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৯-১৯৬৭), আবুদল করিম সাহিত্য বিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩) ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২), ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮), কাজী আব্দুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৫-১৯৬৪), আবুল কালাম শামসুদ্দিন (১৮৯৭-১৯৭৯), আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯), মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪) কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) প্রমুখ বাঙালি মুসলিম নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ ফসল।

১৯০০ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্য-শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাংবাদিকতা ও মননজগতে বাঙালি মুসলমানের পদচারণা তেমন একটা লক্ষ্যযোগ্য নয়। উপরোক্ত খ্যাতনামা ব্যক্তিদের আবির্ভাবের পর যুগপৎ শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি -সাংবাদিকতা ও সমাজ উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানদের পদচারণা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইতঃপূর্বে ইংরাজ আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের তেমন একটা পরিচয় পাওয়া যায়নি। বাঙালি মুসলমানের নবজাগরণের সূচনা-লগ্ন থেকেই বাংলা ভাষা-সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র ধারা সূচিত হয়। কাজী নজরুল ইসলাম এ ধারাার সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্গাতা। নজরুলের ভাব-ভাষা, বিষয়-আংগিক, ঐতিহ্য ও অনুপ্রেরণা সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং মুসলিম জীবনবোধের উচ্চকিত রূপায়ণ। নজরুলের ধারাবাহিকতায় বাংলা সাহিত্যে মুসলিম জীবনধারার বলিষ্ঠ রূপকার কবি ফররুখ আহমদ (জন্ম : ১০ জুন, ১৮১৮-মৃত্যু : ১৯ অক্টোবর, ১৯৭৪)।

যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমার (বর্তমানে জেলা) মাঝআইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিমান মৌলিক প্রতিভাধর কবি ফররুখ আহমদ। গ্রামের স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি কলকাতা মডেল এম.ই. স্কুল ও বালিগঞ্জ হাইস্কুলে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন খুলনা জেলা স্কুল থেকে। স্কুল জীবনে শিক্ষক হিসাবে তিনি সাহচর্য পান বাংলা সাহিত্যের তিন প্রখ্যাত দিক্‌পাল-আবুল ফজল, কবি গোলাম মোস্তফা ও কবি আবুল হাশেমকে। স্কুল জীবনে তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে বিশেষ

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন কবি আহসান হাবিব, কথাশিল্পী আবু রশদ, কবি আবুল হোসেন প্রমুখ। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর ফররুখ আহমদ কলকাতা রিপন কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তিনি তাঁর শিক্ষক হিসাবে পান বাংলা সাহিত্যের তিন প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বস ও প্রমথনাথ বিশীকে। আই, এ পাস করার পর তিনি কলকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন। ঐ সময় তাঁর সহপাঠী ছিলেন প্রখ্যাত কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও প্রখ্যাত অভিনেতা ফতেহ্ লোহানী।

স্কুল জীবনেই ফররুখ কবিতা চর্চা শুরু করেন। স্কুল ও কলেজ জীবনের সহপাঠী ও খ্যাতনামা ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে ফররুখ কবিতা চর্চায় বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করেন। খুলনা জেলা স্কুল ম্যাগাজিনে তাঁর প্রথম কবিতা ছাপা হয় ১৯৩৬ সনে। ১৯৩৭ সনে মোহাম্মদ হবিবুল্লাহ বাহারের সম্পাদিত 'বুলবুল' পত্রিকায় ছাপা হয় 'রাত্রি' কবিতা। কলেজে অধ্যয়নকালে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় তাঁর গুচ্ছ কবিতা ছাপা হয়। এরপর তিনি নিয়মিত কবিতা চর্চায় মনোযোগী হন। ১৯৪৪ সনে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' প্রকাশিত হয়। এটির প্রকাশক ছিলেন প্রখ্যাত কবি বেনজির আহমদ এবং এর প্রচ্ছদ অংকন করেন প্রখ্যাত শিল্পী জয়নুল আবেদিন (পরবর্তীতে শিল্পাচার্য)।

এখানে ফররুখ আহমদের কাব্য-চর্চার পটভূমি বা সমকালিন অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা দরকার। ঐ সময় ১৯৩৯-৪৫ সনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৪৩ সনে যুদ্ধজনিত মন্বন্তর, পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা বিশেষত অধঃপতিত মুসলিম জাতির উত্থানের উদগ্র বাসনা ইত্যাদি তাঁর এ সময়কার লেখায় প্রমূর্ত হয়ে ওঠে। বিশেষত ১৯৪০ সনে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে 'লাহোর প্রস্তাব' (যা পাকিস্তান প্রস্তাব নামেও পরিচিত) গৃহীত হবার পর উপমহাদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দুটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ওঠে। এ স্বাধীনতা আন্দোলন, মুসলিম জাতির উত্থান, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা এবং অবশেষে ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটে ফররুখ আহমদের কাব্য চর্চা বিশেষ গতি লাভ করে। কবি বলেন :

কত যে আঁধার পর্দা পারায়ে ভোর হল জানিনা তা?<br>
নারঙ্গি বনে কাঁপছে সবুজ পাতা।<br>
দুয়ারে তোমার সাত-সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা।<br>
তবু জাগলে না? তবু তুমি জাগলে না?<br>
(সাত সাগরের মাঝি)

এখানে জাগরণের বাণী স্পষ্ট এবং উদাত্ত। অধঃপতিত জাতি অমানিশার ঘনান্ধকারে নিমজ্জিত। অমানিশা ঘেরা এ অন্ধকার ভেদ করে বেঁচে থাকার উদগ্র বাসনা নিয়ে জাতিকে উঠে দাঁড়াবার আহবান কবির কণ্ঠে-

চারদিকে বন মরণ শর্তে জীবনের অধিকার-<br>
এখানে তোমার নিশান ওড়াও হে নিশান বরদার।

ঘন হয়ে এল দুঃখের রাত তিমির নিবিড়তর
এবার তোমার আলোর নিশান এ-পথে প্রকাশ করো,
সূর্যের ঝড়ে এই আঁধারের মরাপাতা ফেলো ছিড়ে
মৃত্যুর তীরে তীরে
ওড়াও তোমার প্রথম উষার দীপ্ত বহ্নি শিখা
আলোর তুফানে ভাসাও জীর্ণ শেহেলা কুজ্ঝটিকা।
(নিশান বরদার : সাত সাগরের মাঝি)

১৩৫০ (ইংরাজি ১৯৪৩) এর মন্বন্তরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অর্থলিপ্সু মানবতাহীন স্বার্থান্ধ মানুষের চক্রান্তে মানব-সৃষ্ট আকালের করালগ্রাসে লক্ষ লক্ষ নিরন্ন মানুষ ক্ষুধা-জ্বরায় মৃত্যুবরণ করে। অনেক কবি-শিল্পীর কলমের আঁচড়ে সে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের করুণ চিত্র ফুটে ওঠে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সে দুর্ভিক্ষের চিত্র এঁকে সমকালীন বিশ্বের হৃদয়বান মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অনেক কবি কবিতা লিখে সে করুণ দিনলিপির বর্ণনা দেন। ফররুখের কবিতায় তার সকরুণ বর্ণনা এভাবে ফুটে ওঠে। দুর্ভিক্ষ নিয়ে কবির লেখা প্রায় ১৯টি কবিতা রয়েছে। এ বিষয়ে লেখা তাঁর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 'লাশ' কবিতায় তিনি লেখেন :

যেখানে প্রশস্ত পথ ঘুরে গেল মোড়
কালো পিচঢালা রঙে লাগে নাই ধূলির আঁচড়,
সেখানে পথের পাশে মুখ গুঁজে পড়ে আছে জমিনের পর
সন্ধ্যার জনতা জানি কোনদিন রাখেনা সে মৃতের খবর।
(লাশ)

১৯৪৪ সনে ফররুখের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' প্রকাশের আগেই পত্র-পত্রিকায় তাঁর দু'একটি কবিতা প্রকাশের সূত্র ধরে কবি হিসাবে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯৪১ সনে বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক আবু রুশদ তাঁর সম্পর্কে প্রথম আলোচনা শুরু করেন। তিনি তাঁর 'আধুনিক কবিতা ও মুসলিম কবিগণ' প্রবন্ধে তৎকালীন মুসলিম তরুণ কবিদের প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। এতে ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, আবুল হোসেন, গোলাম কুদ্দুস ও শওকত ওসমান সম্পর্কে আলোচনা করেন। ফররুখ আহমদ সম্পর্কে তিনি বলেন :

"ফররুখ আহমদ রোমান্টিক কবি, ... তিনি নিঃসন্দেহে আধুনিক। ... তাঁর মেধা এবং সূক্ষ্ম পরিমাণ জ্ঞান বিস্ময়কর এবং তাঁর বয়সের কবির রচনায় অপ্রত্যাশিত। শব্দের নিপুণ চয়নে কল্পনার ব্যাপকতায় এবং গভীর পরিস্ফুট রূপক-মাধুর্যে তাঁর কবিতা সহজেই বিশিষ্টতা অর্জন করেছে।" (সওগাত, ভাদ্র ১৩৪৮)।

এর কয়েক বছর পর প্রখ্যাত কবি-সমালোচক আব্দুল কাদির আকাশবাণী কলকাতায় প্রচারিত এক কথিকায় বলেন :

"ফররুখের উপর যদি কোন আধুনিক কবির প্রভাব থাকে তো তিনি নজরুল ইসলাম; তবে উভয়ের মধ্যকার স্বাতন্ত্র্যও সুস্পষ্ট।... নজরুল বলেছেন :

দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠেছে দীন-ইসলামী লাল মশাল
ওরে বেখবর, তুইও ওঠ জেগে, তুইও তোর প্রাণ-প্রদীপ জ্বাল!

--- --- --- ---

জাগি যদি মোরা দুনিয়া আবার কাঁপিবে চরণে টালমাটাল।

আর ফররুখ বলেছেন ঃ

খঞ্জরে ভাঙো জিঞ্জির ভীতি কাঁপুক দুনিয়া টালমাটাল।

বলাবাহুল্য যে, এই উভয় কবিই মুসলমানের পুনরুজ্জীবন কামনা করেন, তাঁরা উভয়েই রোমান্টিক।" পরে উক্ত কথিকাটি 'সওগাত' পত্রিকার বৈশাখ, ১৩৫৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৯৪৫ সনে পিইএন-আয়োজিত লেখক সম্মেলনে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা বিশিষ্ট সাহিত্যিক কাজী আব্দুল ওদুদ তাঁর ভাষণে প্রসঙ্গত ফররুখ কাব্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে গভীর আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ঐ বছর আব্দুল কাদির ও রেজাউল করীম সম্পাদিত 'কাব্য মালঞ্চে' ফররুখের তিনটি কবিতা সংকলিত হয়। এভাবে কাব্য ক্ষেত্রে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ফররুখ আলোড়ন ও আলোচনার সূত্রপাত ঘটান। এর মূলে যেসব কারণ হয়েছে, সেগুলোকে এভাবে চিহ্নিত করা যায়:

১. ফররুখের কবিতার ভাব ও বিষয়বস্তু বাঙালি মুসলিম সমাজের জীবন-বাস্তবতা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা র সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

২. ফররুখের কাব্য-ভাষার স্বাতন্ত্র্য। নজরুলানুসারি হওয়া সত্ত্বেও লালিত্য-মাধুর্য্য, বুনন-কুশলতায় তা অভিনব ও অনিন্দ্য-সুন্দর।

৩. আধুনিক জীবনবোধ, সমাজ-বাস্তবতা ও গভীর অধ্যাত্মবোধ তাঁর কবিতায় এক চিরকালীন মানবিক সংবেদনার প্রকাশ ঘটিয়েছে।

৪. ফররুখের কবিতায় আধুনিক শিল্পবোধ, রুচি ও সর্বজনীনতার কালজয়ী প্রকাশ ঘটেছে। প্রথম থেকেই তাঁর কবিতা শীলিত, পরিমার্জিত, সুচারু ও শিল্প-সচেতনায় ঋদ্ধ-সমৃদ্ধ।

৫. ফররুখের কবিতায় উপমা-প্রতীক-রূপকের ব্যবহার অসামান্য ও বৈশিষ্টে অনন্য।

এভাবে ফররুখ-কাব্যের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে আরো অনেক বিষয়ের অবতারণা করা যায়। তবে সংক্ষেপে উপরোক্ত কারণসমূহের প্রেক্ষিতে বলা যায়, ফররুখ তাঁর অসামান্য প্রতিভার দীপ্তি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত শুরুতেই দিতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই কাব্য-দিগন্তে তাঁর আবির্ভাবে সকলেই উল্লসিত ও উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন। এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা যায়, তাহলো—ফররুখ আহমদ যখন কাব্য চর্চা শুরু করেন, তখন বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র-প্রভা অস্তমিত প্রায় (রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু ১৯৪১ সনে),বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বিস্ময়কর প্রতিভা নজরুল ইসলাম গুরুতর অসুস্থ হয়ে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে পড়েন (১৯৪২), এবং তার প্রায় এক দশক পূর্বেই তিরিশোত্তর যুগের আবির্ভাব ঘটেছে। পাশ্চাত্য প্রভাবে এবং অনেকটা

সমাজতান্ত্রিক নাস্তিক্যবাদের আশ্লেষে তিরিশোত্তর যুগের কবিরা বাংলা সাহিত্যে রীতিমত ঝড় তুলেছেন। এরই প্রেক্ষাপটে ফররুখ এলেন এক সম্পূর্ণ নতুন আদলে। নাস্তিবাদ অস্বীকার করে আস্তিবাদের ভিত্তিতে তিনি এক নতুন জীবন-চেতনার বিকাশ ঘটালেন। তাঁর কবিতার অন্তরস্বভাব যেমন ভিন্ন, তেমনি কবিতার বহিরঙ্গেও নতুনত্বের সৃষ্টি করলেন। তাই প্রথম থেকেই তিনি স্বতন্ত্র এবং মৌলিকত্বের অধিকারী। এ বিবেচনায় ফররুখ বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কবিদের অন্যতম।

কবিতার প্রধান উপজীব্য হলো-ভাব ও বিষয়। ভাব ও বিষয় প্রকাশের জন্য প্রয়োজন শব্দ, ছন্দ, অলংকার। আর এ প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োজন, এক গভীর সংবেদনশীল শীলিত সূক্ষ্ম শিল্পবোধ। তাহলেই কবিতা হিসাবে তা উত্তীর্ণ হয়। সৌভাগ্যবশত ফররুখ কবিতা রচনায় আগাগোড়াই সে বোধে তাড়িত ছিলেন। তাই তাঁর কবিতা শুধু কবিতা নয়, যথার্থই এক সৌন্দর্যময় শিল্প। দেশ-কালের সীমা অতিক্রম করে তা হয়েছে কালোত্তীর্ণ।

অনেকে কবিতাকে বলেন-'শব্দের শিল্প। Coleridge-এর ভাষায় 'Best words in the best order'. সুনির্বাচিত শব্দের সুপ্রযুক্ত ব্যবহারেই কবিতার সৃষ্টি। শব্দ-চয়ন ও তার সুপ্রযুক্ত ব্যবহারে ফররুখের মুন্সিয়ানা বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য :

কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ,
শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ,
পাহাড় বুলন্দ ঢেউ বয়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক;
নতুন পানিতে সফর এবার, হে মাঝি সিন্দবাদ।

আহা, সে নিকষ আকীক বিছানো কতদিন পরে ফিরে
ডেকেছে আমাকে নীল আকাশের তীরে,
ডেকেছে আমাকে জিন্দেগী আর মওতের মাঝখানে
এবার সফর টানবে আমাকে কোন্ স্রোতে কেবা জানে।
(সিন্দবাদ)

অথবা

এখানে ঘুমের পাড়া, স্তব্ধদীঘি অতল সুপ্তির।
দীর্ঘরাত্রি একা জেগে আছি।
ছলনার পাশা খেলা আজ পড়ে থাক,
ঘুমাক বিশ্রান্ত শাখে দিনের মৌমাছি,
কান পেতে শোন আজ ডাহুকের ডাক।
তারার বন্দর ছেড়ে চাঁদ চলে রাত্রির সাগরে
ক্রমাগত ভেসে ভেসে পালক মেঘের অন্তরালে,
অশ্রান্ত ডুবুরি যেন ক্রমাগত ডুব দিয়ে তোলে

স্বপ্নের প্রবাল।
অবিশ্রাম ঝরে ঝরে পড়ে
শিশির পাখার ঘুম,
গুলে বকৌলির নীল আকাশ মহল
হয়ে আসে নিসাড় নিঝুম,
নিভে যায় কামনা চেরাগ;
অবিশ্রান্ত ওঠে শুধু ডাহুকের ডাক।
(ডাহুক)

কিংবা

গোধূলি-তরল সেই হরিণের তনিমা পাটল
অস্থির বিদ্যুৎ, তার বাঁকা শিঙে ভেসে এল চাঁদ,
সাত সাগরের বুকে সেই শুধু আলোক-চঞ্চল;
অন্ধকার ধনু হাতে তীর ছোড়ে রাত্রির নিষাদ।
আরব সমুদ্র-স্রোতে ক্রমাগত দূরের আহবান,
তরুণীর মুখ থেকে মুছে গেছে দিনের রক্তিমা,
এদিকে হরিণ আনে বাঁকা শিঙে চাঁদঃ রমজান;
ক্ষীর্ণাঙ্গীর প্রতীক্ষায় যৌবনের প্রাচুর্য ঃ পূর্ণিমা।
(বন্দরে সন্ধ্যা)

এখানে ফররুখের শব্দ-চয়ন, সুপ্রযুক্ত শব্দের নৈপুণ্যময় ব্যবহার, ছন্দের চমৎকার কারুকাজ, রূপক-উপমা-প্রতীকের অসাধারণ প্রকাশ যেমন বিস্ময়কর ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, তেমনি অনির্বচনীয় নৈর্ব্যক্তিক অনুভবে তা গভীরতম ব্যঞ্জনায় অভিসিক্ত।

ফররুখের প্রতিভা বহুমাত্রিক। তবে প্রধানত তিনি মৌলিক প্রতিভাধর একজন কবি। তাঁর অবদান গদ্য-পদ্য উভয় রূপরীতিতেই অসামান্য। গদ্যে রচিত হয়েছে তাঁর ছোটগল্প (পাঁচটি), উপন্যাস (অসম্পূর্ণ), ব্যঙ্গ নাটক (রাজ-রাজরা) ও কতিপয় প্রবন্ধ। কাব্য-বন্ধে তাঁর অবদান কলেবর, বৈচিত্র্য ও বর্ণাঢ্যতায় অপরূপ। মহাকাব্য, গীতিকাব্য, ব্যঙ্গ কবিতা, গান, সনেট, কাব্য-নাট্য, গীতি-নাট্য, শিশুতোষ কাব্য ইত্যাদি বিভিন্ন কাব্যাঙ্গিকে তিনি প্রায় অর্ধশত গ্রন্থের রচয়িতা।

ফররুখ আহমদের দুটি কাব্যের পূর্ণাঙ্গ ইংরাজি অনুবাদ ও বিভিন্ন খণ্ড কবিতার ইংরাজি অনুবাদ ইতঃমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো হলোঃ

১. The English Translation of some selected Poems of Farrukh Ahamad by Abdur Rashid Khan, Published by-Muhammad Matiur Rahman, Farrukh Gabeshana Foundation, Dhaka in June 2008 and 2nd edition in June 2012.

২. Accolades (Sirajam Munira) by Yasmin Faruque published by Trafford Publishing, North America, Oxnard, CA, USA in May 2013.

৩. The Sailors of Seven Seas (Saat Sagorer Majhi) by Yasmin Faruque published by Trafford Publishing, North America, Oxnard, CA, USA in June 2013.

এছাড়া, বিভিন্ন সময় ফররুখ আহমদের বিভিন্ন কবিতার যাঁরা অনুবাদ করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেনঃ কথাশিল্পী আবু রুশদ, ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন, প্রফেসর কবির চৌধুরী, প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, প্রফেসর ডক্টর সদরুদ্দিন আহমেদ, ম মিজানুর রহমান প্রমুখ। এসব অনুবাদ কর্মের মাধ্যমে ফররুখ আহমদ বিশ্বব্যাপী কাব্যামোদিদের নিকট অনেকটা পরিচিত হয়েছেন নিঃসন্দেহে।

বাংলা কাব্যে মাইকেল মধুসুদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) প্রথম ও সর্বাধিক সার্থক মহাকাব্য রচয়িতা। অন্যদিকে, ফররুখ সর্বশেষ ও সার্থক মহাকাব্য রচয়িতা হিসাবে খ্যাত। সনেটের ক্ষেত্রেও মধুসুদন প্রথম ও সার্থক রচয়িতা। ফররুখ সর্বাধিক এবং সার্থক সনেটিয়ার হিসাবে খ্যাতিমান। তাঁর সনেটের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিনশো। ব্যঙ্গ কবিতা রচনার ক্ষেত্রেও ফররুখের অবদান অনন্যতুল্য। ব্যঙ্গ কবিতার সংখ্যা ও মানের বিচারে ফররুখ সম্ভবত বাংলা সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর ব্যঙ্গকাব্যের সংখ্যা ছয়টি। শিশুতোষ কাব্য রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অসাধারণ। তাঁর শিশুতোষ কাব্যের সংখ্যা একুশ খানা। শিশুদের উপযোগী ভাব, ভাষা, ছন্দ ও বিষয় নিয়ে তিনি সুপরিকল্পিতভাবে এসব অনবদ্য কাব্য একের পর এক রচনা করেছেন। এছাড়া, তাঁর শিশু-পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা চারটি। তাঁর রচিত নাট্যকাব্য (নওফেল ও হাতেম) এবং গীতিনাট্য (আনার কলি) এগুলোও আধুনিক শিল্পকলার অমূল্য নিদর্শন। বাংলা কাব্যে বিচিত্র রূপাঙ্গিকে তিনি সার্থক শিল্প-কুশলতায় অনবদ্য রচনাবলীর অমর ভাণ্ডার নির্মাণ করে গেছেন।

ফররুখের প্রতিটি রচনা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, সর্বজনপ্রিয় ও গভীর শৈল্পিকবোধে উৎকর্ষমণ্ডিত। তিনি একজন সমাজ-সচেতন,স্বজাতি প্রেমে উদ্বুদ্ধ উদার মানবতাবাদে বিশ্বাসী কবি। আর্ত-মানবতার ক্রন্দনে অভিভূত ফররুখের কাব্য স্বাধীনতা ও মানবতার মুক্তির জয়গানে মুখরিত। ফররুখ কাল-সচেতন, কিন্তু কালোত্তীর্ণ। কালের ক্রন্দন ধ্বনি তাঁর কণ্ঠে নিনাদিত হয়ে মানবিক সংবেদনা ও অসাধারণ শিল্প-বৈভবে তা কালোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে।

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, জুন-অক্টোবর ২০১৩]

# কবি ফররুখ আহমদঃ এক ব্যতিক্রমী কবি

জুবাইদা গুলশান আরা

পৃথিবীর সব দেশই সাহিত্য এক নিরলস বুদ্ধির, বোধির ও পর্যবেক্ষণের ধারা অনুসরণ করে চলে। পাশ্চত্য সাহিত্যে সেক্সপীয়র, বায়রন, মিলটনের পূর্ব ধারা যেমন ক্লাসিক ধারার সাহিত্য-চিন্তা ও চেতনাকে প্রতিফলিত করে সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছে, পরবর্তীকালে নতুন স্রোত, জীবন দর্শন ও ভাব-ভাষা এসে জায়গা করে নিয়েছে। আমাদের দেশে প্রাচীন ধারা এক সময় কৃত্তিবাস, শ্রীকৃষ্ণকীর্তণ থেকে ক্রমশ: সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। চর্যাপদের প্রাচীনতা থেকে আলাওল, হেয়াত মাহমুদ থেকে সে ধারা প্রাচীন পুঁথি সাহিত্য, সূফী সাহিত্যকে অনুসরণ করে পদুমাবত, মনোহর মধুমালতীর রোমান্টিক স্রোতকে পৌছে দিয়েছে ঐতিহ্য ইতিহাস ভিত্তিক কাব্য চর্চায়। গদ্যে নতুন পথ সৃষ্টি হয়েছে। 'ছহি বড় জঙ্গনামা'র পর্যায় থেকে বাংলা সাহিত্য চলমানতার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, কায়কোবাদ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মোজাম্মেল হক, নবীনচন্দ্র সেন, মীর মোশাররফ হোসেন সাহিত্যে নানা ভাব, ভাষা ও বিষয় নিয়ে সৃষ্টি করেছেন মহৎ সাহিত্য। পরিবর্তন আসে সময়ের সঙ্গে জীবনের প্রয়োজনে। তেমনই ফররুখ আহমদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে সাহিত্যের নতুন আবহে এসেছিলেন এক উজ্জ্বলতার প্রতীক হয়ে। তিনি ছিলেন নানা বৈচিত্র্যের অধিকারী। বর্তমান শতকে তিনি প্রাচীন, আধুনিক ও ব্যতিক্রমধর্মী এক কবি। তাঁর সাহিত্য বিচিত্র ও তাৎপর্যপূর্ণ। কবি ফররুখ আহমদকে নিয়ে লিখতে বসে ভাবছি এ অসামান্য কবিকে কোন একটি অভিধায় সীমাবদ্ধ করে বিচার করা কোনমতেই সম্ভব নয়। তিরিশের দশক থেকে আজকের কাব্য-চর্চার বলয়ে তাঁর পরিচয়, বিচিত্র ভাব, ভাষা ও বিষয় নিয়ে বিস্ময়কর এক কাব্য-জগত সৃষ্টি করেছেন, যা প্রাচীনতা, ক্লাসিকেল বিষয় ও রোমান্টিক চিন্তাধারায় এক ব্যাপক ও বিশাল ভাণ্ডার। প্রাচীনতা, মানব-চিত্তের বিচিত্র যুদ্ধতেজী তারুণ্যের স্বপ্নচারিতা এসব কিছুর মধ্যেই তাঁর বিচরণ। একে বোঝা ও বিশ্লেষণে আনন্দ আছে, যদিও পূর্ণ বিশ্লেষণ অনেক গুণী ও বিদ্বজ্জন করে চলেছেন। জটিলতা ও সরলতার মন-মুগ্ধকর তার কল্পনা। সেই সঙ্গে প্রাচীন কাব্য ধারার বিস্ময় চিত্র যেসব রচনায় পাই, সে সম্বন্ধেই আমার ক্ষুদ্র অনুভূতি প্রকাশ করছি।

১৯৪৪ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্য 'সাত সাগরের মাঝি' পড়েছিলাম কৈশোরে। কাব্য নয়, তার মধ্যে যে জাগরণের ডাক তাই তখনকার পাঠককে জাগিয়ে দিয়েছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যেমন বাংলা ভাষাকে দিয়েছিলেন নতুন কাঠামো, পরিচয় এবং ঐতিহ্যাশ্রয়ী লেখার যাত্রাপথ। সেখানে ভিন্ন কাঠামো ও সনেট, ধর্মাধর্ম

এবং আধুনিকতা তাঁর চেতনায় এক নতুন দুয়ার খুলে দিয়েছিলো। নজরুলকে আবার আর এক যুগ সন্ধিক্ষণে পাই। তুলনাবিহীন তীব্রতা, জাগরণ ও প্রগাঢ় রোমান্টিকতার সমন্বয়ে নতুন আবির্ভাব হিসেবে হয়তো বা, তাঁর পৌরাণিক বিষয় ও উপকরণ ব্যবহার, ভাষার সেই নবীনতা, চিন্তার ব্যাপকতায় যে শক্তিমত্তা পাওয়া যায়, সেই তীক্ষ্ণ শক্তিময় তরবারি তিনি রেখে গেলেন তাঁর যোগ্য উত্তরসূরির জন্য। ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি' বিশাল বিশ্বে যাত্রার আহ্বান জানায়। নতুন চৈতন্যের জাগরণে পৃথিবীতে ঈগল পাখীর মত তার যাত্রা, শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক। এ যেন প্রাচীন বীর ইউলিসিসের অভিযানের তৃষ্ণা। ফররুখের বিখ্যাত রচনাগুলেরর মধ্যে সিরাজুম মুনীরা, হাতেম তায়ী, নৌফেল ও হাতেম, কাফেলা, হে বন্য স্বপ্নেরা বিশেষ মূল্যায়নের দাবী রাখে। একদিকে যেমন আধুনিকতার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়, অন্যদিকে এ কালোত্তীর্ণ কাব্যগুলোর গঠন-প্রকৃতি নির্ভর করছে লোক সাহিত্য, আলিফ লায়লা, কাসাসুল আম্বিয়া, চাহার দরবেশ এর ধ্যান-ধারণা। হাতেম তায়ীর মতো বিমাল মহাকাব্য রচনা করা এক দুঃসাহসিক কাব্যকৃতি। কারণ ভাষা এবং ছন্দের প্রচুর নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এ কাব্যের সৃষ্টি। পুঁথি সাহিত্য থেকে ইতিহাস সৃষ্টিতে তিনি পূর্ণভাবে সফল একারণে যে, এ কাব্যে কোন একঘেয়েমি নেই। অমিত্রাক্ষর ছন্দের ১৪ অক্ষরের স্থলে প্রতি পদে তিনি আঠারো অক্ষর ব্যবহার করেছেন। এতে ধনি-গাম্ভীর্য বা অর্থের মাধুর্য ক্ষুণ্ন হয় নাই, বরং আরও সু-গম্ভীর ব্যঞ্জনাময় হয়েছে। এভাবেই প্রাচীন ইউরোপীয় সাহিত্যে গ্যেটের ফাউস্টের মতোই হাতেম তায়ীকে মানবতা, ঔদার্য ও মহত্ত্বের প্রতীক রূপে সৃষ্টি করেছেন। অনেকেই তাঁকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একসময় তাঁকে নানাভাবে সংকীর্ণ চিন্তার দোষ দিতেন, কারণ তিনি ইসলামিক জাগরণে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ৫২'র ভাষা আন্দোলনের সময়ে ভাষার যুদ্ধকে তিনি দেখেছিলেন নতুন আদর্শের গৌরব থেকে। তিনি দুঃখে ক্ষোভে উচ্চারণ করেছেন- "যাদের বুকের রক্তে মাতৃভাষা পেয়েছে সম্মান/সংগিনের মুখে যারা দাঁড়ায়েছে নিস্পাপ অম্লান"-তাঁর মধ্যে যে বিদ্রোহ, তা নানা বিপরীত স্রোতের মুখে দাঁড়িয়ে কবি স্পষ্ট উচ্চারণ করেছেনঃ "সম্মুখে চলার গতি রুদ্ধ হল, বেদনা বিক্ষত হে জীবন্ত মাতৃভাষা, তুমি হলে মৃত্যুর শিকার।" (চলতি ভাষার পুঁথিঃ মুহূর্তের কবিতা)।

এর সঙ্গে তাঁর লেখনীর প্রবল বৈভব লক্ষ্য করার মতো নৌফেল ও হাতেম কাব্যে তীব্র ক্রোধে নৌফেলের যে উচ্চারণ–"কি হবে এ রাজ্য দিয়ে? চাইনিতো হাতেমের তখত হাতেমের যা আমি চেয়েছি জীবনে।"

এক প্রবল শক্তিমত্তায় বাংলা ভাষা পারস্য, মিশর, আরব সভ্যতার শব্দ অনায়াসে মিশে গেছে বাংলার পঙ্‌ক্তিতে। স্রোতবতী নদীর মতোই তা গতিবেগ সৃষ্টি করেছে তাঁর লেখায়। সেই তেজ নিয়েই কবি বলতে পারেন :

ছিড়ে ফেল আজ আয়েশী রাতের/মখমল অবসাদ
নতুন পানিতে হাল খুলে দাও/হে মাঝি সিন্দবাদ
**(বা'র দরিয়ায় : সাত সাগরের মাঝি)**

কবির রোমান্টিক স্বপ্নচারী মন মাটির বন্ধনে থেকেও উর্ধমুখ চাতকের মত সুদূরের পিয়াসী। স্বপ্ন ও জাগরণ, প্রেম-বিরহ, কাম ও লালসা তাঁর লেখায় ঠিক জায়গা করে নিয়েছে। মধ্যরাতে নিঃসঙ্গ ডাহুকের আর্তস্বরের বিষাদ যেমন, তেমনই ছলনার পাশা খেলার বিলাস যে কত অর্থহীন কবি তা মনে করিয়ে দিতে ভোলেন নি।

কবির মধ্যে রোমান্টিক আলো-আঁধারি যেন লুকোচুরি খেলে। কবি বলেন:

নল বনে জোস্নার বাঁশি/ছড়ায় সুরের আস্তরণ
ঝিম হয়ে আসে সেই সুরে সকল আকাশ/নদী বন। **(মধুমতীর তীরে : হে বন্য স্বপ্নেরা)**

বিস্ময়কর হলেও এটি উল্লেখ করা দরকার যে, কবির মধ্যে ছিলো একজন যোদ্ধা, যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নিয়ে পৃথিবীকে দেখতে ভোলেননি। সমকালীন অন্যায়, অনাচারের কথা মনে রেখে তিনি লেখেন ব্যঙ্গ কবিতা। গ্রন্থও রচনা করেছেন। তাতে ব্যঙ্গ আছে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ আছে, কিন্তু বিদ্বেষ নয়-তাকে সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে কবির প্রতিবাদ বলাই সঙ্গত। তিনি উপদেশ দেন :

আমার আদর্শ শোনো,/ছাড় পথ সভ্যতা বোধের
জানো তো কুকুর কভু নাহি চাটে/মাংসহীন হাড়।
যেখানে মাংসের গন্ধ/সেখানেই গতি এ দাসের **(অনুস্বার)**

কিন্তু ফররুখ আহমদ শুধু একদিক থেকে বিশ্ব পরিব্রাজক নন। তাঁর যাত্রা নানা দিক থেকে জীবনকে দেখেছে। তাঁর সত্তায় প্রকৃতি ও মানুষ সমান গুরুত্বপূর্ণ। মানব সভ্যতায় স্থবির মলিনতা তাঁকে ব্যথিত করেছে। 'লাশ' কবিতায় তিনি অশালীন সভ্যতার ধ্বংস কামনা করেছেন। দলিত হতমান মানবতার সামঞ্জস্যহীনতা দেখে তিনি উচ্চারণ করেন :

এখানে মানুষ ছিলো/আজ শুধু পড়ে আছে শব। **(সমাপ্তি : হে বন্য স্বপ্নেরা)**

এ যুদ্ধ জন-মানুষেরই যুদ্ধ। মাঝে মাঝে তাই কবিও ক্রুদ্ধ বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেছেন। অন্যদিকে, তাঁর কবি-হৃদয়ের উপহার বেশ কিছু মনোমুগ্ধকর গানও রয়েছে। শিশুদের জন্য হরফের ছড়া এবং রয়েছে পাখীর বাসা, ঝড়ের গান আরও বহু মনমাতানো শিক্ষামূলক রচনা। মুক্ত বাতায়ন তাঁর হৃদয়কে অবরুদ্ধ করেনি। দীর্ঘদিন ধরে ফররুখ একাডেমীর (ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন) আন্তরিক প্রচেষ্টায় কবিকে প্রকৃত রূপে বোঝার সুযোগ হচ্ছে, এটি অবশ্যই ধন্যবাদের দাবী রাখে। সাহিত্যে ভিন্নমত থাকার কারণে কবিসত্তা ক্ষুব্ধ হয়, কিন্তু কখনও থেমে থাকে না। অন্তর্লীন শক্তি তাঁকে প্রকাশ করবেই। কবি ছিলেন প্রকৃতির অন্তরঙ্গতায় নিমগ্ন। তাঁর শব্দবন্ধ অমিত্রাক্ষর ছন্দের

অক্ষর ব্যবহারের পাশাপাশি যে নূতনত্ব তা বিস্ময়কর ও স্বাধীন। কবির কাব্য-প্রকৃতিও তাই দেশ-কাল সীমানায় বন্দী থাকেনি। বিমুগ্ধ প্রকৃতিলগ্ন উপমা ও চিত্রকল্প তুলে ধরতেই হয়। এক গভীর মুগ্ধ তন্ময়তার ছবি।

ঘাসের সবুজ শীষে অরণ্যের রঙ জেগে আছে/তোমার দু'চোখ নীল মেঘমুক্ত আকাশের আলো **(প্রত্যয় : মুহূর্তের কবিতা)**

প্রকৃতির বিচিত্র আলো, বিদ্যুৎ, বজ্র, নদী, পাহাড়, সাগর, তরঙ্গরাশি তাঁর কাছে নানা রূপে ধরা দিয়েছে।

কবিকে যতটুকু বুঝেছি, আমার মনে হয়েছে তিনি অভিমানী, প্রত্যয়ী, সাহসী নির্ভীক, নিৎসঙ্গ এক পরিব্রাজক, যাঁর যাত্রা নবনব সূর্যালোকে। বজ্রে-বিদ্যুতে, লৌকিক-অলৌকিকের মিশেলে ধাবমান এক আপোষহীন কবি-চিত্ত। তাঁর সঙ্গে পরিচয় এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। তাঁকে বুঝতে গিয়ে বলতে চাই-কাফেলা কাব্য রচনা করতে গিয়ে একদিকে মরুভূমির পটভূমি যেমন ব্যবহার করেছেন, তেমনই বৈশাখ, ঝড় এসব কবিতায় বাংলার প্রাকৃতিক চিত্রকল্পও স্বাধীনভাবে ব্যবহার করছেন :

হে বৈশাখ এস এস স্রষ্টা যিনি লা-শারিক/জব্বার কাহ্‌হার
তার আজ্ঞাবহ তুমি নিয়ে যাও দেশে দেশে/প্রলয় ধ্বংসের সমাচার।
**(বৈশাখ : কাফেলা)।**

আবার পদ্মার স্রোত ও গতি দেখে মুগ্ধ কবি বলেনঃ

কি দুরন্ত গতিবেগ, কি উদ্দাম আনন্দ অম্লান
যৌবনের কলোচ্ছ্বাসে গেয়ে যায় জীবনের গান।
**(আরিচা পার ঘাটে : হে বন্য স্বপ্নেরা)**

ফররুখ আহমদ এমন এক ক্রান্তিকালকে সাথী করে তাঁর পৃথিবী গড়েছিলেন, যেখানে বিদ্রোহ, ক্রোধ আপোষহীন আদর্শ তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন পথে নিয়ে গেছে। অথচ সবকিছুর উপরে তাঁর মুক্ত-চিন্তার প্রতিফলন লক্ষ্য করি। এ কারণে তাঁর চিন্তা ও লেখা যথেষ্ট বিপরীত এক বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। সব কিছুর ওপরে তিনি একক এক যোদ্ধা, যেন তাঁর বিশ্বাস ও চলমানতায় ব্যগ্র অনুশীলন ও নিরীক্ষায় নিবিষ্ট। সিরাজাম মুনীরায় তাঁর স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। তবে মনে হয় সারা বিশ্বকে অনুভব করার পরে কবি ফিরেছেন নিজের পরিমণ্ডলে, যেমন করে :

শস্যদানা ওষ্ঠপুটে যেমন জালালী কবুতর
দূর দারাজের রাহী পাড়ি দিয়ে ফিরে আসে
তার পরিচিত নীড়ে। ফিরিল হাতেম তায়ী
শাহাবাদে, প্রশ্নের উত্তর নিয়ে বক্ষ পুটে।

আমরা জানি, বড় কবি মাত্রই শিকড়-সন্ধানী হবেন। হোমার, আলাওল, মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল সবার মধ্যে ঐতিহ্য, ইতিহাস, ধর্মাশ্রয়ী আদর্শ কাজ করেছে। এদিক থেকে ফররুখও ব্যতিক্রম নন। তাঁর ভাষার গাম্ভীর্য, বৈচিত্র্য ও রোমান্টিকতার পাশাপাশি বঞ্চনা-বিক্ষুব্ধ নাবিকের মুখের ভাষা গভীর আবেগে উৎসারিত হয় :

শুনেছি আমার পুরানো মাটির টান/তারার চেরাগে করেছি আমার দিগন্ত সন্ধান।

**(দরিয়ায় শেষ রাত্রি)**

অথবা অন্যত্র :

অস্থির বিদ্যুৎ তার বাঁকা শিঙে/ভেসে এল চাঁদ **(বন্দরে সন্ধ্যা)**

যেন সুলেমান নবীর শিকলে বন্দি বিশাল জিন

ছাতি চাপড়ায়ে কেঁদেছিলো কাল সারারাত সারারাত

**(দরিয়ায় শেষ রাত্রি।)**

এসব চিত্রকল্প ধরে রাখে এক সাবলাইম অনুভবকে। আনন্দের কথা এই যে, আমাদের দেশে ও বাইরেও কবিকে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন ব্যাপকভাবে অনুভূত ও চর্চার কাজ শুরু হয়েছে। কবি হিসেবে তিনি কত বড় ছিলেন, তা বোঝার জন্য এই কাজ চলবে এটাই আমাদের আশা। সেই সঙ্গে একথাও বলা প্রয়োজন, ব্যাপক পাঠ-চর্চার জন্য স্কুল ও কলেজের পাঠ্য-তালিকায় তাঁর রচনা অবশ্যই অনেক সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শিশুদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে তাঁর অপূর্ব লেখাগুলো। গানের জগতে ছড়িয়ে দিতে হবে তাঁর রচিত গান।

কবি ফররুখ আহমদকে চিনেছি তাঁর সাত সাগরের মাঝি থেকে। পাঞ্জেরী কবিতা থেকে। তার যথার্থ সম্মান ও মূল্যায়ন হচ্ছে দেখে ধন্য মনে করছি। এ দেশ যেন তাঁর যোগ্য সন্তানকে যোগ্য জায়গাটি দিতে পারে এ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে শেষ করছি। কবির প্রতি রইলো গভীর শ্রদ্ধা। ☐

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, চব্বিশতম, সংকলন, অক্টোবর, ২০১২]

# বঙ্গভবনে পাঁচ বছর

## মাহবুব তালুকদার

...রাষ্ট্রপ্রধান একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, ফররুখ আহমদ সাহেব সম্পর্কে তোমার ধারণা কি?

ধারণা কি মানে? আমিও প্রশ্ন করলাম, কবি হিসাবে না মানুষ হিসাবে?

উভয় দিক থেকে।

কবি হিসাবে তিনি অসাধারণ। রবীন্দ্রানাথ, নজরুল ও জীবনানন্দ দাসের পর অমন শক্তিশালী কবি খুব কমই আছেন। তাঁর 'সাত সাগরের মাঝি' অনবদ্য কাব্যগ্রন্থ।

আর মানুষ হিসাবে?

মানুষ হিসাবে তিনি আপোষহীন। তিনি ইসলামপন্থী। তাঁর এবং আমার অবস্থান মাতাদর্শের দিক থেকে বিপরীত মেরুতে হলেও আমি বলব, তিনি অনুদার ব্যক্তি নন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি রাজাকার আলবদরদের মত আস্ফালন করেননি। কারও ক্ষতি করেননি। কিন্তু নিজের আদর্শ বিসর্জন দেননি। প্রায় বক্তৃতার মত ইম কথাগুলো বললাম।

আমি তোমার সঙ্গে একমত। রাষ্ট্রপ্রধান বললেন, ফররুখ আহমদ সাহেব অসুস্থ। রেডিওতে চাকরি করতেন, সেটা বোধ করি গেছে। রেডিও তাঁর প্রতি অত্যন্ত অবহেলা প্রদর্শন করেছে। বর্তমানে তিনি আর্থিক সংকটে আছেন বলে শুনেছি। আমি তাঁকে কিছু সাহায্য করতে চাই।

কিন্তু তিনি আর্থিক সাহায্য নেবেন কিনা জানি না। না নেয়ারই সম্ভাবনা।

তাহলে আর তোমাকে উকিল নিয়োগ করলাম কেন? তিনি হেসে বললেন, চেষ্টা করতে হবে তাঁকে একটা চেক দিয়ে আসতে। তবে প্রথম দিন গিয়েই তাঁকে চেক দিলে হবে না। তোমার উচিত হবে কয়েকদিন তাঁর কাছে যাওয়া। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া, তারপর একদিন বুঝিয়ে শুনিয়ে চেকটা দেবে।

চেষ্টা করে দেখি। আমি বললাম, আমি অবশ্য তাঁকে চিনি।

কবি ফররুখ আহমদ ইস্কাটনে সরকারী বাড়ীতে থাকেন। তাঁর সঙ্গে বাসায় গিয়ে দেখা করলাম। তিনি আমার শ্বশুর সাহিত্যিক মুহম্মদ বরকতুল্লাহর খবরাখবর জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁর প্রসঙ্গে নানান গল্পগুজব করলেন। আর আমি আগাগোড়া এমন ধারণা দিতে থাকলাম যে, তাঁর অসুস্থতার খবর পেয়েই যেন দেখতে এসেছি।

তাঁর চোখে সেই শানিত উজ্জ্বল দৃষ্টি ম্লান। আমার আসার উদ্দেশ্য শুনে বললেন, আজকাল তো কেউ আর দেখতে আসে না।

প্রায় জোর করেই তিনি চা খাওয়ালেন।

আমি ফিরে গিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, কয়েকদিন পর আবার যাবে।

আবার গেলাম তাঁর বাসায়। এবার তিনি একটু বিস্মিত হলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কোথায় কাজ করি? জবাবে জানালাম, আমি রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে আছি। শুনে প্রথমে তিনি ম্রিয়মাণ হলেন। কিন্তু আমি যখন তাঁকে বললাম, রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর কাব্যের অনুরক্ত। তিনি আমাকে তাঁর খবরাখবর নিতে বলেছেন। তখন তিনি মোটেই বিস্মিত হলেন না। বললেন, আবু সাঈদ চৌধুরী সাহেবের সাহিত্যপ্রীতির কথা আমার জানা আছে। তাছাড়া তিনি অত্যন্ত সংবেদনশীল মানুষ।

চা খেতে বলেছিলেন। খেয়ে চলে এলাম। রাষ্ট্রপ্রধানকে আনুপার্বিক সব বললাম। তিনি স্বস্তি প্রকাশ করে চেক নিয়ে যেতে বললেন।

আমি একটা খামের মধ্যে চেকটি ভরে নিয়ে আবার তাঁর বাসায় গিয়ে দেখা করলাম। এবার রাষ্ট্রপ্রাধানের প্রসঙ্গেই বেশী গল্প হল। আমি এক সময়ে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে প্রায় অপরাধ করছি, ভঙ্গীতে চেকটি তাঁর হাতে তুলে দিলাম। তিনি অতীব কুণ্ঠার সঙ্গে সেটা গ্রহণ করলেন। তবে তাঁকে কিছুটা বিচলিত মনে হল।

রাষ্ট্রপ্রধানকে এসে জানাতে তিনি বললেন, আমি জানতাম, তুমি পারবে। তাঁর এই অসুস্থতার মধ্যে আমাদের উচিত ছিল আরও সাহায্য করা।

কবি ফররুখ আহমদের সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয়নি। ১৯ শে অক্টোবর, ইস্কাটনের বাড়ীতে। বেশ কিছু কবি সাহিত্যিক তাঁকে অন্তিম শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এসেছেন। কিন্তু সরকারী কোন ব্যক্তি তাঁর প্রতি সম্মান দেখাতে আসেননি। বিষয়টি খুবই খারাব লাগল। তখন তো আর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী রাষ্ট্রপ্রধান নেই যে, এ বিষয়ে তাঁকে গিয়ে বলব। আমি তথ্য প্রতিমন্ত্রী তাহরেউদ্দীন ঠাকুরকে ফোন করে বললাম, এত বড় একজন কবি ইন্তেকাল করলেন, কোন সরকারী ব্যক্তি বা মন্ত্রী তাঁকে দেখতেও গেলেন না। আমার কথায় প্রতিমন্ত্রী এমন ভাব দেখালেন যে, আমার নিজেরই সেখানে যাওয়া ঠিক হয়নি।

ঘটনার কি অদ্ভুত পরিহাস। মাত্র এক বছর পর বঙ্গবন্ধুর পতন ঘটিয়ে খোন্দকার মুশতাক আহমদ দেশের প্রেসিডেন্ট এবং তাহেরউদ্দীন ঠাকুর সে সময় তাঁরও তথ্য প্রতিমন্ত্রী। দেশের কিছুটা খোলনলচা পালটে ফেলা হয়েছে তখন। জাতীয় পোশাকের বদৌলতে জাতির মাথায় একটি টুপি পরিয়ে দেয়া হয়ে হয়েছে। বাংলাদেশের নতুন সরকার নিজেদের ইসলামী মনোভাব প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। এমতাবস্থায় ১৯৭৫ সনের ১৯ শে অক্টোবর কবি ফররুখ আহমদের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী বিশেষভাবে উদ্‌যাপিত হবে না, তা হতে পারে না। তথ্য প্রতিমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে সরকারী পত্রিকা 'দৈনিক বাংলা' ফররুখ আহমদের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে ক্রোড়পত্র বের করল। কিন্তু দেশের ঐ অবস্থায় কবি সাহিত্যিক কারও লেখা পাওয়া গেল না। অগত্যা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পত্রিকায় ফররুখ আহমদ সম্পর্কে যেসব প্রবন্ধ বেড়িয়েছিল, তাই উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণালী এডভার্টাইজারস-এর সৌজন্যে ক্রোড়পত্রটি প্রকাশিত হল।

নিঃসন্দেহে কবি ফররুখ আহমদ ভাগ্যবান। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে মন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতায় একটি বেসরকারী বিজ্ঞাপনী সংস্থার সৌজন্যে তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে সরকারী পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়েছে। ক'জন

কবির ভাগ্যে এমন অযাচিত মরণোত্তর সম্মান জোটে? কিন্তু ফররুখ আহমদ বেঁচে থাকলে কোন কবির মৃত্যুকে নিয়ে এহেন রাজনৈতিক প্রতারণার তীব্র প্রতিবাদ করতেন বলেই আমার বিশ্বাস।

পুনশ্চঃ এবছর (১৯৭৪) শেষের দিকে চোখের অপারেশনের জন্য আমি হাসপাতালে ভর্তি হই। ঐ সময়ে আমার শ্বশুর সাহিত্যিক মুহম্মদ বরকতুল্লাহ ইন্তেকাল করেন। কাছাকাছি সময়ে ইন্তেকাল করেন রাজনীতিক আবুল হাসেম ও কবি ফররুখ আহমদ। আমি তাঁদের তিনজনেরই মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে স্যারকে (বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী) চিঠি লিখি। তিনি তার জবাবে লেখেন :

Special Represntative
Covernment of The People's
Repuplic of Bangladesh

পরম স্নেহাস্পদেষু

প্যারিস থেকে ফিরে এসে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তোমার চিঠি পড়ি। চোখের অসুস্থতায় তুমি হাসপাতালে-বাংলাদেশের তিনজন প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় সন্তান আর ইহজগতে নাই।

ম্যাট্রিক পাস করার অব্যবহিত পরেই পারস্য প্রতিভার রচয়িতা সুসাহিত্যিক বরকতুল্লাহ সাহেবের সংস্পর্শে আসি। এই শ্রদ্ধেয় পিতৃবন্ধুর কাছ থেকে চিরদিন প্রীতি ও স্নেহ লাভ করছি। অন্তরের এক নিবিড় টানেই বোধকরি কিছুদিন আগে হঠাৎ ঢাকা যাওয়া হয়েছিল এবং তাঁকে দেখে আসতে পেরেছিলম। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান চিরদিন কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকৃত হবে। তাঁকে কাছে থেকে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল বলেই তাঁর নিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও সাধনার কথা আমি অবগত আছি।

আবুল হাসেম সাহেবের সংস্পর্শে আসি তরুণ বয়সে। তাঁর নির্ভীকতা, চিন্তাধার, চিত্তের দৃঢ়তা ও দেশপ্রেম আমাদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

কবি ফররুখ আহমদ সাহেবের বন্ধুত্ব লাভের সৌভাগ্য আমার একই বয়সে হয়েছিল। তাঁর প্রতিভা আমাকে সে সময়ই মুগ্ধ করেছিল। তাঁর অকাল মৃত্যুতে বাংলা ভাষার অপূরণীয় ক্ষতি হলো।

দেশের এই তিনজন কৃতী সন্তানের পরলোকগমনের সংবাদ আমাকে মর্মাহত করেছে। এক নিবিড় বেদনাবোধ আর অন্তরকে আচ্ছন্ন করেছে। তাঁদের আত্মা শান্তি লাভ করুক– পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে এই একমাত্র প্রর্থনা। **(মাহবুব তালুকদার রচিত বঙ্গ ভবনে পাঁচ বছর গ্রন্থের অংশবিশেষ)** ⌂

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, বাইশতম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি-২০১২]

# ফররুখ আহ্‌মদ

## আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

॥ ১ ॥

আমাদের যুগে যেসব ধ্যানধারণা ও বিশ্বাসের মধ্যে আমরা বেড়ে উঠেছিলাম তার সঙ্গে ফররুখ আহ্‌মদের পার্থক্য ছিল দুস্তর। এই ব্যবধানকে দুস্তর না বলে বৈরী বলাই ভালো। ফররুখ আহ্‌মদ জাতি বলতে মোটামুটি নিজস্ব ধর্মের মানুষকেই বুঝতেন, আমরা ধর্মাধর্ম নির্বিশেষে আবহমান বাংলার সকল উত্তরাধিকারীকে। নিজ জাতির উৎস-সন্ধান করেছিলেন তিনি ইসলামের অতীত গৌরবের স্বপ্নিল বর্ণচ্ছটার জগতে, আমরা এদেশের তামাটে আদিম এক জনগোষ্ঠীর ভেতর। এই জাতির সমৃদ্ধির স্বপ্ন তিনি দেখতেন এক পরিত্যক্ত মধ্যযুগীয় জীবনব্যবস্থার ভেতর, আমরা একালের প্রগতিশীল শ্রেণী-সংগ্রামের পথে। এসব পার্থক্য আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাসের মাঝখানেই যে কেবল বিচ্ছিন্নতা ও অপরিচয়ের দেয়াল উঁচু করে তুলেছিল তা নয়, আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ককেও খানিকটা ব্যাহত করেছিল। কিন্তু এতসবের পরেও এই নিরাপোষ, নিঃসঙ্গ মানুষটি যে তাঁর জীবনের দিনগুলোর মত আজও একইভাবে তাঁর প্রতি আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার প্রদীপটিকে জ্বালিয়ে রাখতে পেরেছেন তার কারণ তাঁর দীপান্বিত কবিত্ব। কেবল কবিত্ব নয়, সৎকবি হতে গেলে যে গুটিকয় অযোগ্যতাকে পুঁজি করে একজনকে এগোতেই হয় সেই দুর্লভ জিনিসগুলোর একটি ছিল তাঁর অধিকারে। সেটা হল: হৃদয়ের সঙ্গে মিথ্যাচারের ব্যাপারে তাঁর অক্ষমতা। সততা এবং সত্যবাদিতায় তিনি ছিলেন উজ্জ্বলিত এবং আলোময়। এই সততা তাঁর মধ্যে যে-পরিমাণে উদ্ভাসিত ছিল সে-পরিমাণেই তিনি ছিলেন কবি। যদি তিনি তাঁর সততার সঙ্গে কিছুটা ভুলের মিশেল দিতে পারতেন, তাঁর সহজাত স্বভাবের সঙ্গে যোগ করতে পারতেন নিজেরই বিরুদ্ধ-প্রবৃত্তির বৈরী উপাদানগুলোকে, জীবনের নির্যাতনের বেদনাবিদ্ধ হৃদয়ের দ্বিধা ও অনিশ্চয়তাকে; তাহলে তিনি হয়ত আরও বড় কবি হতেন। সততার অনমনীয় আলো তাঁকে 'কবি' করে তুললেও 'বড় কবি'র শিরোপা থেকে বঞ্চিত করেছিল।

॥ ২ ॥

কেন ফররুখ আহ্‌মদ জাতির খণ্ডিত পরিচয়কে এর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় করে তুলেছিলেন কিংবা কেন তাঁর মতন একজন উদার-হৃদয় মানুষের চেতনায় তাঁর নিজস্ব ধর্মের মানুষ ছাড়া আর সবাই কার্যত অস্তিত্বহীন হয়ে গিয়েছিল। তা নির্ণয় করা কঠিন নয়। তাঁর অধঃপতিত দুঃখী জাতিকে উদ্ধারের নিদ্রাহীন উৎকণ্ঠা তাঁর অস্থি-মজ্জা-মনন-চেতনাকে এমন নিষ্কৃতিহীনভাবে কামড়ে ধরেছিল যে ঐ বিশেষ জাতির অস্তি

ত্বের প্রসঙ্গ ছাড়া আর সবকিছুই তাঁর সামনে থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, ঠিক যেভাবে বিলুপ্ত হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিমের সামনে থেকে তাঁর নিজস্ব ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ ছাড়া আর সবার প্রসঙ্গ কিংবা সুকান্তের কাছে নিপীড়িত মানুষের দুঃখ-বেদনা ছাড়া জীবনের আর সব বিবেচনা।

যে চেতনার ওপর দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল, কবিতার জগতে তিনি ছিলেন সেই বিশ্বাসের প্রতীক। ইচ্ছা করলে তাঁর অবদানের বিনিময়ে আর সবার মতো জাতির কাছ থেকে যে-কোনো জাগতিক সুবিধা আদায় করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। যে মানবিক দুর্বলতা আমার কালের প্রায় প্রতিটি মানুষকে পরাজিত করেছে তিনি ছিলেন তার উর্ধ্বে। নিজের জন্যে তিনি কারো দিকে প্রত্যাশার হাত বাড়িয়ে দেন নি। জীবনে একজন সত্যিকার 'মোমিন' হিসাবে বাঁচতে চেয়েছিলেন তিনি, সত্যিকার মোমিনের মৃত্যুও তিনি পেয়েছিলেন। হয়ত রক্তের গভীরে এমনি একটি মৃত্যুই তিনি খুঁজেছিলেন। শুনেছি মৃত্যুই একজন সত্যকার বিশ্বাসীর মৃত্যু। আমরা প্রতিনিয়ত চারপাশে হাজার হাজার পার্থিব কুকুরের বৈভবদীপ্ত মৃত্যু দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। ফররুখ আহমদের মৃত্যুর এই নিঃস্ব নিঃসঙ্গ দীপ্তি উপলব্ধি করার ক্ষমতাও আজ আমাদের নেই।

নিজের অধঃপতিত জাতির মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি তাঁর কবিতায়। পাকিস্তান আন্দোলনের মূল স্বপ্নও ছিল তাই। এজন্যেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন সেকালীয় পাকিস্তান-আন্দোলনের অনিবার্য প্রতিভূ-'সিন্দবাদ'। যতদিন পাকিস্তান আন্দোলন সক্রিয় ছিল ততদিন তাঁর এই ভূমিকা ছিল অপ্রতিহত ও সজীব। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা তাঁর এই ধারার কাব্যপ্রেরণার ওপর মৃত্যুর স্তব্ধতা ঢেলে দেয়। তাঁর ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষকে যে বলীয়ান জাগরণের দিকে এতকাল তিনি আহ্বান করে চলছিলেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই জাগরণের দায়িত্ব এই নবগঠিত রাষ্ট্রের হাতে চলে আসায় তাঁর ঐ ধারার কবিতা রাতারাতি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। তাঁর দেশকাল তাঁর চোখের সামনে দিয়ে নতুন পথে পা বাড়ায়। ফলে পরবর্তীকালের বাংলাদেশের কাব্যযাত্রাও নতুন উত্তরণের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু এই নতুন পালাবদলের পথে ফররুখ আহমদ আর এগিয়ে এলেন না। তাঁর জাতির একালীয় সিন্দবাদেরা নোনা দরিয়ার নতুন আহবানে সাড়া দিয়ে নতুন সফরে কিশতি ভাসাবার প্রস্তুতি নিল, কিন্তু কবি তাঁর প্রাক্তন অবস্থানে অটল হয়ে রইলেন। জাতির সিন্দবাদের এই নবতম সফরের নতুন অপরিচিত চরিত্রটিকে তিনি যেন ঠিক চিনে উঠতে বা বিশ্বাস করতে পারলেন না-যেমন বিশ্বাস করেছিলেন তাঁর নায়কের আগের অভিযানগুলোর মধ্যযুগীয় চরিত্রটিকে।

ফররুখ আহমদ তাঁর কালের বেদনাকে টের পেয়েছিলেন, সেই দুঃখের উত্তরণকে চিনতে পারেননি। আর এখানেই নতুন দরিয়া-হাওয়ার সমর্থনপুষ্ট পরবর্তী

অভিযাত্রীদের থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। সিন্দবাদের মতোই শক্ত অপরাজেয় হাতে প্রাচীন কিশতির হাল অটুটভাবে ধরে রইলেন তিনি। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসে অন্ধ ও আপোষহীন একালের এই শক্তিমান ও করুণাবহ চরিত্রটি, তাঁর অভিমানী ও আহত হৃদয় নিয়ে দীর্ঘকালের প্রিয় ও পরিচিত সহযোদ্ধাদের বিরুদ্ধ-শিবিরের দিকে হেঁটে যেতে দেখেও, ভাঙা মাস্তুল আর ছেঁড়া পাল নিয়ে প্রতিকূল সমুদ্র-হাওয়ার যাত্রায় একা দাঁড়িয়ে রইলেন-নড়লেন না, সরলেন না, তলিয়ে দেখলেন না যে, সিন্দবাদের প্রত্যেকটি নতুন সফরই জন্ম নিয়েছিল পূর্ববর্তী সমুদ্র-যাত্রাগুলোকে প্রতিবাদ করেই এবং তাঁর এই আধুনিক ও একালীয় অভিযাত্রাটি তাঁর আগের অভিযানগুলোর পরিচিত পথকে প্রত্যাখ্যান করেই নতুন দিগন্ত-সন্ধানে এগিয়ে যেতে পারে কেবল।

নিজেকে বা নিজের যুগকে প্রশ্ন করে তাঁর এই ক্রমবর্ধমান নিঃসঙ্গতার কারণ অন্বেষণেও তিনি থেকে গেলেন সম্পূর্ণ ভ্রুক্ষেপহীন। উজ্জ্বল কিন্তু সীমিত ও একমাত্রিক চৈতন্যের মানুষ ছিলেন তিনি। নিজেকে প্রশ্ন দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে আত্ম-অতিক্রমণের বিষয়টি এই তীব্র ও একগুঁয়ে মানুষটির কাছে পুরো অজানা ছিল। অথবা হয়ত নতুন কোনো ভুবনের জন্ম দেবার মতো সজীব উপাদান আর অবশিষ্ট ছিল না তাঁর মধ্যে। এইভাবে আমাদের কালের সবচেয়ে শক্তিমান এবং সীমিত মানুষটি, সমসাময়িক দেশ ও কালের ভাবনা ভেতর, ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হতে হতে নিঃশব্দে একসময় হারিয়ে গেলেন।

ছোট কবি হলেও 'কবি' ছিলেন ফররুখ আহমদ। জীবনানন্দ দাশ কথিত সেই 'কেউ কেউ কবি'দের একজন। ছোট কিন্তু নিটোল একজন কবির সম্পূর্ণতা ছিল তাঁর মধ্যে। আমার ধারণা ফররুখ আহমদের পর ছোট বা বড় কোনো অর্থেই 'সম্পূর্ণ কবি' আমরা খুব বেশি পাইনি।

॥ ৩ ॥

ফররুখ আহমদকে দেখার প্রথম দিনটির কথা আজও চোখের সামনে সজীব হয়ে আছে। নাজিমউদ্দিন রোডের পুরোনো রেডিও অফিসের উল্টোদিকে একটা ছাপরাঅলা সস্তা রেস্তোরাঁয় অনেকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিবেশে তিনি জমজমাট হয়ে বসে ছিলেন। ছুরির মতো ঝকঝকে চোখের এই মানুষটিকে সেদিন মনে হচ্ছিল সবল প্রাণশক্তিপূর্ণ একজন নিঃসঙ্গ পুরুষ বলে, প্রখর উজ্জ্বলতার মধ্যে যিনি রহস্যময়। সবার ভেতর একজন হয়েই তিনি বসেছিলেন, কিন্তু তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপ্ত কণ্ঠস্বরই যেন বলছিল: এই মানুষটি আলাদা। থেকে থেকে তাঁর স্বভাবসুলভ উদ্দাম বেপরোয়া হাসিতে চারধার কাঁপিয়ে তুলছিলেন তিনি– যেন একটি মানুষের মধ্যে উত্তাল হয়ে উঠছে একটি বিরাট জনতা।

প্রতিভায় তিনি ছিলেন কবি, হৃদয়ের ভেতর অপরিমেয় মানুষ। এ জন্যই একজন সৎকবি হয়ে ওঠার পথে তাঁর কোনো বাধা ছিল না। ব্যক্তিগত মতবাদের সংকীর্ণ গণ্ডি উতরে তাঁর ভেতরকার তপ্ত মানবিক ছোঁয়া অবলীলায় টের পাওয়া যেত। এই নিঃসঙ্গ

মানুষটি অন্যদের এতটুকু আহত না করে তাঁর নিজের স্বজাতির বেদনাভূতির জগতে এমন সৎ ও গভীরভাবে উপ্ত ছিলেন যে নিজের ধর্ম এবং জাতির জন্য যিনিই মমত্ব অনুভব করেন তাঁর পক্ষে তাঁর কবিতাকে নিজের কবিতা বলে ভাবার পথে বাধা থাকে না। এটি সেই কারণ যার ফলে তাঁর আদর্শ বা মতের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর বাসিন্দা হয়েও আমরা তাঁকে ভালোবাসতাম। এটিই একজন সৎকবির ক্ষমতা: বিশ্বাসের পৃথিবীতে যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধপক্ষ, তাঁদেরও তিনি, তাঁর সমর্থকদের মতোই, একই সুধায় আপ্লুত করতে পারেন।

॥ ৪ ॥

আগেই বলেছি ফররুখ আহমদের পর ছোট বা বড় মাপের 'সম্পূর্ণ+ কবি' আমরা খুব একটা পাইনি। কথাটার অল্পস্বল্প ব্যাখ্যা এখানে দিয়ে নিতে চাই। একজন 'সম্পূর্ণ কবি' কে? আমার ধারণা, জীবনানন্দ দাশের 'সকলের কবি নয়, কেউ কেউ কবি'– উক্তিটির ভেতরে এই প্রশ্নের একটা প্রচ্ছন্ন উত্তর আছে। 'সকলেই কবি নয়' কথাটার মধ্যে এমন একটা বক্তব্য অনুক্ত রয়েছে যার অর্থ এরকম: সকলকেই (যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁদের) কবি বলে মনে হতে পারে কিন্তু আসলে (তাঁদের) 'সকলেই কবি নয়।' এখানটায় একটি প্রশ্ন। এই বাক্যের 'সকলে' সত্যিসত্যিই যদি কবি না হন তবে (আপাতভাবে হলেও) তাঁদের কবি মনে হয় কেন? অ-কবিদের নিয়ে তো এ-ধরনের বিভ্রান্তি হবার কথা নয়। তাহলে কি বুঝতে হবে যাঁরাই কবিতা লেখেন তাঁদের রচনায়, যত সামান্যভাবেই হোক, কবিতার কিছু-না-কিছু সম্পন্নতা থেকেই যায় যা কমবেশি কবিতার রক্তিমতায় রাঙা–যা চকিতের জন্যে হলেও পাঠকের মনে কবিতার বিভ্রম জাগায়।

এবার আরেকটু ভেতরে যাই। একজন মানুষ কখন কবিতার আবেগে জেগে ওঠেন? ওঠেন তখনই যখন তাঁর রক্তধারার ভেতর কবিতার আকুতি সবুজ ভূদৃশ্যের মতো পাতা মেলতে চায়, নিজের ভেতর নিজের চেয়ে বড়কিছুর উপস্থিতিকে অনুভব করে তিনি শিউরে ওঠেন। যাঁদের জীবনে এই উপচে-পড়া ঐশ্বর্য নেই, কবিতা লেখার অনর্থক বিড়ম্বনা থেকে তাঁরা প্রাকৃতিক নিয়মেই মুক্ত। কিন্তু যাঁদের জীবনে এইসব মুহূর্ত ঘাতকের মতো ফিরে ফিরে হানা দেয়, তাঁরা তাঁদের ঐ জেগে-ওঠা জীবনকে শব্দে-ছন্দে-উপমায় স্মরণীয় করে রাখার এক অসহায় আবেগে বিস্রস্ত হতে থাকেন। ফলে জীবনের এই বিস্মিত মুহূর্তগুলো তাঁদের কবিতাতে কমবেশি বর্ণিল বিচ্ছুরণ ঘটায়। হয়ত এ কারণেই তাঁদের রচনায় কবিতার কিছু-না-কিছু দীপ্তি, কবিতাগুণের কিছু-না-কিছু রক্তিমতা শেষ পর্যন্ত পেয়েই যাই আমরা। এই অর্থে অ-কবি আসলে ভুল কবি নয়, ছোট কবি।

এসব তথ্য থেকে দুটো সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছাতে পারি। যিনি কবিতা লিখতে চেষ্টা করবেন দুটো জিনিস থাকতেই হবে তাঁর রক্তে। এক : প্রাত্যহিক জীবনের ভেতর 'জীবনের অধিক জীবনের' অপার্থিব আবির্ভাবে শিউরে ওঠার মতো একটা

হৃদয়। দুই : সেই ছাপিয়ে-ওঠা হৃদয়কে কবিতার সম্পন্নতায় ফুটিয়ে তোলার মতো কমবেশি লাবণ্য। এজন্য যাঁরাই কবিতা লেখেন তাঁদের রচনাতেই কবিতার কিছু-না-কিছু বর্ণচ্ছটা–দামি বা সাধারণ–খুঁজে পাওয়া যায়ই। কারো উপমা আমাদের মুগ্ধ করে, কারো শব্দের শক্তি বিস্ময় জাগায়, কারো ছন্দ বা ধ্বনি মনের ওপর লাবণ্য বুলিয়ে যায়, কারো চৈতন্যের দীপ্তি চোখ ধাঁধায়, কারো কবিতায় শিল্পের অনেক দামি মশলা একখানে হয়ে জীবনকে দ্যুতিময় করে।

এখন প্রশ্ন হল : যিনি কবিতার নানা রমণীয় উপাদান দিয়ে এভাবে আমাদের চেতনার ওপর কমবেশি সৌগন্ধ্যা ছড়াতে পারেন তিনিই কি কবি? বা যা আমাদের মনকে নানা বর্ণিল স্পর্শে রঞ্জিত করে তোলে তাই কি কবিতা? মনে আছে, অনেকদিন আগে একজন তরুণ কবির একটি কবিতার বইয়ের আলোচনা করতে গিয়ে আমি লিখেছিলাম যে শব্দ-ছন্দ-উপমা বা কবিতার এক বা একাধিক বিচ্ছিন্ন উপাদান আসলে কবিতা নয় তা সে যত দ্যুতিময়ই হোক না কেন। এরা কবিতার উপাদান মাত্র। কবিতা তখনই কবিতা যখন এগুলো তার ভেতর অবাক সহযোগে এক হয়। একটি কবিতায় ঐসব উপাদান যখন মনোরম সমবায়ে বিবাহিত হয়ে কবিতার অনুভূতিকে নিটোল পূর্ণতায় ফলিয়ে তোলে তখনই তা কবিতা– মাইকেলের ভাষায় 'যম-দমী'–কলোত্তীর্ণ ছোট্ট অনবদ্য একটি ফুটফুটে মুক্তো।

এমনটা যখন হয় তখনই টের পাই আমাদের চারপাশে বিচ্ছিন্নভাবে ছিটিয়ে-থাকা আটপৌরে শব্দ-উপমা-অলংকার বা চেতনার সম্পদগুলো হঠাৎ এক অলীক লীলায় জোড়া লেগে এমন একটি ছোট্ট সুন্দর পৃথিবী রচনা করল, নশ্বর সময়ের হাত কোনোদিন যার নাগাল পাবে না। কবিতা এটিই। কবিতা হচ্ছে তার নিজেরই অনিবার্য উপাদানসমূহের উজ্জ্বলতম সন্নিবেশের নাম। হ্যাঁ, উজ্জ্বল-'তম: কবিতার মধ্যে এমনি একটা 'তম'-র ভূমিকা ভারি জরুরি। 'সম্পূর্ণ কবিতা এই 'তম'-রই অবদান, 'তর'-র ভূমিকা এখানো গৌণ।

এমনকি অলীক সামগ্রিকতায় নিজেকে লতিয়ে তোলা গেলেই কবিতা। কবিতা–একটি রমণীয় স্বর্গীয় ফুল–অনির্বাচনীয়তার ডালে ফুটে-থাকা একমুঠো রক্তগোলাপ। যতক্ষণ না শিল্পের এই সম্পূর্ণতায় কবিতা ফুটে উঠছে ততক্ষণ আদৌ তা কবিতা নয়–বিচ্ছিন্ন ও উজ্জ্বল কিছু কাব্য-উপচারের অপ্রস্তুত সংকলন মাত্র–বিক্ষিপ্ত কিছু রঙিন উপাদানের ছেঁড়াখোঁড়া জগৎ–পৃথিবীতে যারা প্রতিনিয়ত সংখ্যাহীনভাবে জন্মাচ্ছে আবার প্রতিনিয়তই লোকচক্ষুর আড়ালে ঝরে যাচ্ছে। এই শৈল্পিক সম্পূর্ণতা থাকে বলেই কবিতা প্রদীপের মতো জ্বলজ্বল করে, আলো দেয়–যেন সে চারপাশের অসম্পূর্ণ অসন্তোষজনক পৃথিবীর অচরিতার্থ সামগ্রী নয় তখন, সে একটি নিটোলতম পৃথিবী–যার ভেতর দিয়ে বাস্তবের ছেঁড়া-ভাঙা জগৎটাকে আমরা একটা টলটলে প্রতীকের ভেতর দেখতে পাই। কোনোভাবে ঐ

নিটোলতা থেকে স্খলিত হলে তা বিস্রস্ত ও অসংগঠিত হয়ে বিশৃঙ্খল মেঝেতে ছড়িয়ে যায়। তখন তা পৃথিবীর কোটি কোটি অবাঞ্ছিত জিনিসেরই মতো আরেকটা নিরর্থক ব্যাপার।

এ ধরণের শৈল্পিক পূর্ণতায় ফল না-ওঠা পর্যন্ত কবিতা কেবল একটা সম্ভাবনার নাম—নানান মূল্যবান আসবাব উপকরণে সমৃদ্ধ একটি কাব্যিক 'প্রতিশ্রুতি'।

একজন কবির সঙ্গে অ-কবির পার্থক্য এখানেই। একজন অ-কবি তাঁর সব জমকালো দামি উপাদান নিয়েও নিটোলতার জায়গায় ব্যর্থ হওয়ায় কবিতার আলো জ্বালাতে ব্যর্থ হন। ফররুখ আহমদের মধ্যে এই আলো জ্বলেছিল। তাঁর পরবর্তীকালের বাংলাদেশের কবিতায় এই আলো বিচ্ছিন্ন এবং আকস্মিক কিছু সাফল্য দেখালেও পরিপূর্ণভাবে খুব একটা দেখা যায়নি।

ফররুখ আহমদ মাত্র একটি ধারার বেশকিছু কবিতায় কাব্য-উপাদানগুলোকে এমনি শক্তিমান নিটোলতায় ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। তবু ঐটুকু পেরেছিলেন বলেই তিনি কবি। ফররুখ আহমদের কবিত্বে এই ছোট্ট জায়গাটুকু হল সামুদ্রিক অভিযানভিত্তিক তাঁর ইসলামি ধারার কবিতাগুচ্ছ।—সেই নোনা নীল দরিয়া আর 'দমকা বাতাসে নারিকেল শাখে হাওয়া'র জগৎ; সেইসঙ্গে একই প্রবণতার আরও দু-চারটি নিটোল কবিতা, যেখানে আরবি-ফারসি শব্দের সমবায়ে এক জ্বলজ্বলে পৃথিবী তিনি রচনা করেছেন।

শিল্পের এই নিটোলতা জিনিসটি গত পঞ্চাশ বছরে যেসব বাংলা কবিতায় ফুটে উঠেছে, তার একটি অবশ্যই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কেউ কথা রাখেনি' কবিতাটি যা বারবার পড়েও অন্যকে পড়ে শোনাতে ইচ্ছে করে। আল মাহমুদের 'সোনালী কাবিনে'ও রয়েছে এই উর্বর নিটোলতা। ফররুখ আহমদ ঐ ধারার অন্তত আট-নটি কবিতার সুডৌল পরিপূর্ণতার ভেতর এই সম্পূর্ণতাকে স্পর্শ করেছেন। এগুলোর শৈল্পিক সাফল্যের জন্যেই ফররুখ আহমদ শেষঅবধি কবি—বড় নন, কিন্তু কবি। ছোট, কেননা তাঁর কাব্যসাফল্যের সমানুপাতে মানব-অস্তিত্বের বিশাল গহন রহস্যকে তিনি তাঁর কবিতায় মূর্ত করতে পারেননি। জীবনবোধের তলদেশগামিতায় তিনি বিত্তহীন ছিলেন।

শৈল্পিক সাফল্যের শিখর ছুঁতে না-পারলেও নান্দনিক সাফল্যের দিক থেকে বেশকিছু অভিনন্দনযোগ্য কবিতা তিনি লিখেছেন। 'ডাহুক', 'লাশ'-এর মতো খণ্ডিত সাফল্যে উজ্জ্বল ও কাব্য-উপাদানে সমৃদ্ধ বেশকিছু কবিতাসংগ্রহ থেকে এই কবিতাগুলোকে বাদ দিলেও আমার ধারণা কবি হিসেবে তাঁর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে না, যদিও তাঁর চেতনাজগতের বিশদ পরিচয় খণ্ডিত হবে। ফররুখ আহমদ তাঁর কবিতার একটি সীমিত জায়গায় কবিতার শীর্ষ ছুঁতে পেরেছিলেন বলেই আজ তাঁর এসব কাব্যগুণসম্পন্ন অসম্পূর্ণ কবিতাগুলোও আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে, যা অন্যথায় হয়ত উপেক্ষিত হত। কবিতার এই নিটোলতা বা শৈল্পিক পূর্ণতা, যা কবিতার

সবচেয়ে মৌল সম্পদ, একজন কাব্যার্থীকে করে তোলে 'কবি'– মরণীয়কে স্মরণীয়–কবি চলে গেলেও কবিতাকে যা হারিয়ে যেতে দেয় না।

এজন্যেই চারপাশের যেসব কবিযশোপ্রার্থী কবিতার বিচ্ছিন্ন উজ্জ্বল উপকরণ একখানে করে কাব্যের বিচিত্র আস্বাদে আমাদের চিত্তকে প্রতিনিয়ত আনন্দে প্রজ্বলিত করছেন তাঁদের সবাই সবসময় কবি নন–অধিকাংশই কাব্যের 'শোভাবাজারের' দোকানদার শিল্পজগতের বিনোদনকারী। যে শৈল্পিক সম্পূর্ণতাকে আমি কবিতা বা কবির ন্যূনতম সম্পত্তি বলে ভাবতে চেয়েছি, সেই নিরিখে, অল্পকিছু সফল উদাহরণ বাদ দিলে, বাংলাদেশের গত আধ-শতাব্দীর কবিতা একধরণের উচ্চতর বিনোদন ছাড়া কী!

॥ ৫ ॥

একজন সৎ'কবি'কে বুঝতে পারার আরও একটা উপায় আছে। পৃথিবীর প্রতিটি কবির কাব্যই আসলে এককেটি আলাদা জগৎ। শব্দে, চিত্র, রূপকল্পে সজীবতায় তিনি পাঠকের সামনে একটি আলাদা পৃথিবীর ছবি উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরেন। যিনি সত্যিকার কবি তাঁকে এমনি একটা আলাদা জগতের ছবি উপহার দিতেই হবে পাঠককে। স্বকীয়তা, উজ্জ্বলতা এবং সজীবতায় এই জগৎ অন্যদের থেকে এমনই পৃথক এবং আলাদা যে তাঁর আগের বা পরের কোনো কবির রচিত জগতের সঙ্গে তাকে একাকার করা বা গুলিয়ে ফেলা অসম্ভব। দীর্ঘদিন ধরে পঠিত, আস্বাদিত ও আলোচিত হতে হতে তাঁর রচিত এই জগতের সঙ্গে কবি নিজেও পাঠকের চোখে এতটা একাকার হয়ে পড়েন যে ঐ কবির উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সৃজিত জগৎটি এক পলকে চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায়। মাইকেলের নাম উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা শক্তিশালী বলিষ্ঠ ও বৈভবমণ্ডিত জগতের চিত্র আমাদের সামনে ভেসে ওঠে; যেমন সত্যেন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে একটি চপল, রহস্যময়, নিক্বণচটুল পৃথিবী। জসীমউদ্‌দীনের কথা উঠলেই পল্লীবাংলার অকৃত্রিম সরলতাময় একটা নিটোল জগৎকে আমরা চোখের সামনে দেখি, যেমন জীবনানন্দের প্রসঙ্গ মনে হলেই একটা ধূসর নির্জন পৃথিবীকে। কোনো কবির পুঁজি যদি খুব সামান্যও হয় তবু এমনি একটা জগতের ছবি অন্তত তাঁকে উপহার দিতেই হবে পাঠকের সামনে–এমনি একটি উজ্জ্বল সজীব আলাদা পৃথিবীকে–যা কেউ কোনোকালে পাঠকের সামনে তুলে ধরেননি, আগামীতেও ধরবেন না। একজন ন্যূনতম কবি হবার জন্যে এটুকু করতেই হবে তাঁকে। কবি যদি আরও শক্তিশালী হন তবে এ ধরণের একের বেশি পৃথিবী–এমনকি অনেকগুলো জ্বলজ্বলে পৃথিবীকে–তিনি রেখে যাবেন তাঁর কবিতায়। বড় কবিদের কবিতায় তাই আমরা অনেকগুলো আলাদা ভুবন দেখতে পাই–এরকম অনেকগুলো আলাদা জ্বলজ্বলে জগৎ। যেমন দেখি রবীন্দ্রনাথের কবিতায়–এমনি অন্তত ছ'সাতটি আলাদা জগতের উজ্জ্বল ছবি।

আগেই বলেছি, বড় কবি ছিলেন না ফররুখ কিন্তু 'কবি' ছিলেন; তাই এমন একটি ভিন্ন জ্বলজ্বলে জগতের ছবি তিনি উপহার দিয়েছেন আমাদের–'নতুন সফর', 'কিশতি', 'নোনা দরিয়া'র একটি অনন্য আলাদা পৃথিবী। তাই সকলেই কবি না হলেও তিনি কবি হয়েছিলেন। বড় কবি ছিলেন না বলে হয়ত অধিক ভুবন উপহার দিতে পারেন নি এবং রয়ে গেছেন কেবল জীবনের উপরতলের চাঁদনিচকে। তবুও একজন সৎকবির ন্যূনতম শর্তপূরণ করতে পেরেছিলেন তিনি; দ্রষ্টা না হলেও স্রষ্টা হয়েছিলেন। ফররুখ আহমদ ছাড়া আমাদের অন্তত আরও দুজন কবি গত পঞ্চাশ বছরে এমনি নিটোল ও আলাদা ভুবন উপহার দিয়েছেন, তারা হলেন জসীমউদ্‌দীন ও আল মাহমুদ। মানতেই হবে এই সময়কালের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে অনেকের কাছ থেকেই বেশকিছু পরিপূর্ণ কবিতা আমরা পেয়েছি। কিন্তু আবারও বলি, শুধু বিচ্ছিন্ন শিল্পোত্তীর্ণ কবিতার রচয়িতাকে কবি বলে না। কবি তিনিই, যিনি নিজের শৈল্পিক নিটোলতার ভেতর মানুষের জন্য অন্তত একটি উজ্জ্বল ও আলাদা জগৎ রেখে যান। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার কয়েকটি ছোট আকারের সপারগ কবিতা আমাদের উপহার দিয়েছেন পরিপূর্ণ কবি না হয়েও। টি.এস. এলিয়ট লিখেছিলেন : 'কবি না হয়েও একজন ব্যক্তি বিচ্ছিন্নভাবে কিছু ভালো কবিতার স্রষ্টা হতে পারেন।' এই উক্তিটি আমরা যেন ভুলে না যাই। (সংকলিত)

# ফররুখ আহমদ সংকলিত 'চৈত্রের এই দিন'

## আবদুল মান্নান সৈয়দ

কবি ফররুখ আহমদ (১৯১৮-৭৪) সংকলিত 'চৈত্রের এই দিন' পুস্তিকা ষাট বছর পরে এখন প্রকাশিত হচ্ছে। এই প্রথম।

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে ফররুখ আহমদের প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' প্রকাশিত হয়েছিল। তারপরের বছর ১৯৪৫ সনে কলকাতা থেকে এ পুস্তিকাটি বেরিয়েছিল। সেকালের একটি সদভ্যাস ছিল বিবাহ উপলক্ষে ছাপার হরফে কিছু প্রকাশ। আমরাও ছেলেবেলায় এরকম দেখেছি ঢের। এখন এটি লুপ্ত হয়েছে। বিয়ের ব্যাপারটি এখন বেশী আধুনিকতা জড়িত। 'পাকা কথা' ইত্যাদি আগেই নিষ্পন্ন হয়। কমিউনিটি সেন্টারে বিয়ে। নিমন্ত্রিতরা অনেক সময় বর পৌঁছতে দেরি হলে আগেই খেতে বসে যান। সেকালের বিয়ে ব্যাপারটি ছিল অনেক বেশি অনানুষ্ঠানিক, অনেক বেশি মানুষের স্পর্শময়। তার মধ্যে অন্তত কোন কোন লেখক-কবির বিবাহ উপলক্ষে বিবাহের চিহ্নবাহী এক পৃষ্ঠা, দুই পৃষ্ঠা, চার পৃষ্ঠার সংবর্ধনাপত্র ছাপা হতো এবং বিতরিত হতো। কবি অমিয় চক্রবর্তীর বিবাহ উপলক্ষে তিনি নিজের একগুচ্ছ কবিতা 'উপহার' নামে ছেপেছিলেন। কথাশিল্পী আবু রুশ্‌দের বিবাহ উপলক্ষে এরকম একটি পুস্তিকা ছাপা হয়েছিল। আবু রুশ্‌দ তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থে তাঁর বন্ধু-কবিদের লেখা সংবলিত এ সংকলনে ফররুখ আহমদও একটি কবিতা লিখেছিলেন। '৬ জুন' শিরোনামে এ কবিতাটি আমার সম্পাদিত ফররুখ আহমদের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৭৫) গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

কবি হিসাবে, প্রবন্ধকার হিসাবে, গল্পকার এবং (অর্থপূর্ণ) ঔপন্যাসিক হিসাবেও ফররুখ আহমদের পরিচয় আমরা জেনেছি। 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকাও তিনি অল্পকালের জন্য সম্পাদনা করেছিলেন। কিন্তু সেকালের নিয়ম অনুসারে সেখানে তাঁর নাম ছাপা হতো না। সেদিক থেকে এই প্রথম ফররুখ আহমদ সম্পাদিত একটি কোন সাহিত্যকর্মের হদিস পাওয়া গেল। আমরা আগেই কথাশিল্পী শাহেদ আলীকে লেখা ফররুখ আহমদের একটি পত্রের প্রতিলিপি হাতে পেয়েছিলাম। তাতে কথাশিল্পী কাজী আফসার উদ্দিন আহমদের বিবাহ উপলক্ষে ফররুখ তাঁর কাছে কবিতা রচনার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। শাহেদ আলী তখন কবিতা লিখতেন। কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত 'কাব্য-মালঞ্চ' (১৯৪৫) সংগ্রহে প্রতিশ্রুতিশীল কবিদের মধ্যে শাহেদ আলীর নামও ছিল। শওকত ওসমানের মতো শাহেদ আলীও উত্তরকালে পুরোপুরি কথা-সাহিত্যেই মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন কবিতা আর লেখেননি। কাজী আফসার উদ্দিন আহমদ ও বেগম জেবু আহমদ উত্তরকালে শিশু-সাহিত্যিক হিসাবে যশ অর্জন করেছিলেন। 'মৃত্তিকা' নামে একটি অনিয়মিত উৎকৃষ্ট লিটল

ম্যাগাজিন বের করতেন আফসার উদ্দিন আহমদ। এ পত্রিকায় ফররুখ আহমদের গদ্য-পদ্য অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

'চৈত্রের এই দিন' শিরোনামের এই পুস্তিকার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন জুলফিকার হায়দার। পরবর্তীকালে তাঁর নামের আগে 'সূফী' যুক্ত হয়েছিল, সংকলনকর্তা ছিলেন ফররুখ আহমদ, প্রচ্ছদ শিল্পী ছিলেন জয়নুল আবেদিন, প্রচারক : নির্মলকুমার গুহ, ব্যবস্থাপক ঃ মজাফফর হোসেন। পুরো পুস্তিকাটি দুই রঙে ছাপা, পৃষ্ঠাগুলো পাশে অকর্তিত, একটি শর্ষেরঙা রেশমি সুতোয় বাঁধা ছিল। প্রথম প্রচ্ছদ ও শেষ প্রচ্ছদ ছিল একই রকম। মলাটে লেখা– "বেগম জেবু আহমদ কাজি আফসার উদ্দিন আহমদ-কে 'চৈত্রের এই দিন' ১৯ চৈত্র ১৩৫১ : কলকাতা।"

মলাট ব্যতিরেকে ২৪ পৃষ্ঠা। ছিল গদ্য-পদ্য। এ সংকলনের একটি লেখাও অন্যত্র প্রকাশিত হয়নি। খুব সম্ভবত। লেখকসূচি এ রকম :

১. অজ্ঞাতনামা (কবিতা)
২. কাজী আবদুল ওদুদ (কবিতা)
৩. এস ওয়াজেদ আলী (গদ্য)
৪. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (গদ্য)
৫. জুলফিকার হায়দার (কবিতা)
৬. আবদুল কাদির (কবিতা/সনেট)
৭. ফররুখ আহমদ (কবিতা/সনেট)
৮. ফজলুর রহমান (কবিতা)
৯. আহসান হাবীব (কবিতা)
১০. আজিজুর রহমান (কবিতা)
১১. সৈয়দ আলী আহসান (কবিতা)
১২. শামসুদ্দীন হায়দার/কবীর চৌধুরী (কবিতা)
১৩. মতিউল ইসলাম (কবিতা)
১৪. মাহবুবুর রহমান (কবিতা)
১৫. শাহেদ আলী (কবিতা)
১৬. সৈয়দ আলী আহসান/কবীর চৌধুরী (কবিতা)
১৭. মবিন উদ্দীন আহমদ (গদ্য)
১৮. শামসুদ্দীন (কবিতা)
১৯. শোফিন চৌধুরী (কবিতা)
২০. কামাল চৌধুরী (কবিতা)
২১. মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা (কবিতা)
২২. কাজী কাদের নেওয়াজ (কবিতা)

দেখা যাচ্ছে ঃ মধ্য-চল্লিশের দশকে কলকাতায় ফররুখ আহমদ সংকলিত 'চৈত্রের এই দিন' সংকলনে সেকালের সেরা মুসলমান কবি-লেখকরা জমায়েত হয়েছিলেন– বেগম জেবু আহমদ ও কাজী আফসার উদ্দিন আহমদের বিবাহে। পরবর্তীকালে এই লেখক-কবিরা প্রায় সকলেই বিখ্যাত হয়েছিলেন।

ফররুখ আহমদ সংকলিত এ ক্ষুদ্র সংকলনটি ষাট বছর পরে প্রকাশিত হচ্ছে। আমার হাত দিয়েই যে এর প্রকাশ ঘটলো এও পরমাশ্চর্য। সমস্তের জন্য আল্লাহতায়ালার শোকর গোজার করছি। ❐

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, পঞ্চদশ সংখ্যা, অক্টোবর, ২০০৭]

"কাল-লগ্ন বাংলা কবিতার ধ্রুপদী ঐতিহ্যের ব্যতিক্রমোজ্জ্বল কবি কারুকৃত ফররুখ আহমদ। সমকালীন বাংলা কবিতার ছায়া-মেদুর আয়েশী শরীরে তিনি সঞ্চার করেছেন যাযাবর গতিবেগ। কাঁঝালো সে গতি, তবু তা এক দিগ্বিজয়ী মানবগোষ্ঠীর সমরজিৎ শোণিত-স্রোতের নির্দেশক। তাঁর কবিতা নির্মাণের মূলে প্রেরণা এই অনন্য নির্দেশনা, যার অনুবর্তী হয়ে তাঁর কাব্যশরীরে অনায়াস ঠাঁই করে নিয়েছে আপাত-অপরিচিত শব্দ, চিত্রকল্প, সমুদ্র ও মরুপূরাণ। এ কবি এ ভাবেই অধিকার করেছেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক কাব্যভাষা, যা তাঁকে নিঃসন্দেহে বাংলা কাব্যেতিহাসের একজন সফলতম কবির শিরোপা এনে দিয়েছে।"

-আব্দুল মান্নান সৈয়দ

# ফররুখ আহমদ-এর ব্যঙ্গ

## তিতাশ চৌধুরী

ফররুখ আহমদ-এর ব্যঙ্গ কবিতাও চেতনার শিখরস্পর্শী। অন্যান্য কবিতার পাশাপাশি তিনি যে অজস্র ব্যঙ্গ কবিতাও লিখেছেন তার খোঁজ আমরা কজন রাখি? সমাজ-রাজনীতি ও অর্থনীতির অচলায়তন ভেঙে তিনি ব্যঙ্গ কবিতার উৎস-মুখ খুলে দেন। মূলত তাঁর হৃদয়িক যন্ত্রণা ক্ষোভ ও দ্রোহই তাঁকে ব্যঙ্গ রচনার দিকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উস্‌কে দিয়েছে। তিনি ব্যঙ্গ কবিতা রচনায়ও সোনা ফলিয়েছেন।

ফররুখ আহমদ রোমান্টিক কবি।... তাঁর কাব্য-সৌন্দর্যের জয়গান অকুণ্ঠ। সুন্দরের প্রতি আকর্ষণও তাঁর কাব্যের একটি বৈশিষ্ট্য। তিনি নিঃসন্দেহে আধুনিক। তাঁর একটি বলিষ্ঠ সজাগ মন আছে– যা সৌন্দর্যের অস্তিত্বকে স্বীকার করবার সাহস রাখে।... শব্দের নিপুণ চয়নে, কল্পনার বাস্তবতায় এবং গভীর অর্থে পরিপুষ্ট রূপক-মাধুর্য তাঁর কবিতা সহজেই বিশিষ্টতা অর্জন করেছে।[১] বস্তুত ফররুখ আহমদের মধ্যে রোমান্টিক আবেসের উত্তালতা ছিল– তাকে তিনি প্রকাশিত করেছিলেন শব্দে ছন্দে যতনা তার চেয়ে অধিক ইমেজে প্রতীকে।[২]

এই ফররুখ আহমদই ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করে বাঙলা সাহিত্যে সমৃদ্ধি এনেছেন সাহিত্যকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এর উৎস কোথায়? তাঁর ব্যঙ্গ রচনার উৎস যেমন আবদুল মান্নান সৈয়দ উল্লেখ করেন 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতাগুচ্ছ রোমান্টিকতার চূড়াস্পর্শী যেন সেই পাহাড়ের পাদদেশ থেকেই একটি বিচিত্র ঝর্ণা উৎসারিত হয় তার ব্যঙ্গ কবিতা। মধ্য চল্লিশ থেকে শুরু হয় ফররুখের ব্যঙ্গ কবিতার প্রস্রবণ– যা শেষ পর্যন্ত প্রত্যক্ষে তির্যকে অব্যাহত ছিলো। ফররুখের মধ্যে কেবল রোমান্টিকতা– আদর্শিকতা ছিলো না,– ছিলো ব্যক্তি মানুষটির মধ্যে অন্তরঙ্গ মউ-জী চরিত্রের ব্যাপারও। তিনি পূর্বোক্ত আধুনিক বাংলা কবিতার ঘনিষ্ঠ পাঠকতো ছিলেনই- 'শনিবারের চিঠি' ও 'রবিবারের লাঠি'র মতো রঙ্গ ব্যঙ্গাত্মক পত্রিকারও নিয়মিত পাঠক ছিলেন। ছিলেন সুকুমার রায়ে (১৮৮৭-১৯২৩) মুগ্ধ। আর শুধু পাঠকই ছিলেন না নিজেও রঙ্গ ব্যঙ্গ কবিতা লিখে আনন্দ পেতেন ও দিতেন। তাঁর সমকালীন কবিদের মধ্যে আহসান হাবীব (১৯১৭-৮৬), ও আবুল হোসেনও (জন্ম: ১৯২২) প্রচুর হাল্কা কবিতা ও ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছেন। তবে মনে হয় এ ক্ষেত্রে তার সহজীবী আর একজন কবিবন্ধু সিকান্দার আবু জাফরের (১৯১৯-৭৫) সঙ্গেই তাঁর সাযুজ্য ছিলো বেশি : রঙ্গব্যঙ্গের স্বতঃস্ফূর্ত সরস স্বভাবী সাবলীলতায়। তবে ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় অজস্রতায় তিনি সমকালীন সকলকেই অতিক্রম করেছিলেন।[৩]

এর বাইরে বাংলা সাহিত্যে অনেকেই ব্যঙ্গ রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। তন্মধ্যে ভারতচন্দ্র ত্রৈলোকানন্দ, ডি এল রায়, আবুল মনসুর আহমদ, নুরুল মোমেন, শিবরাম চক্রবর্তী, সৈয়দ মুজতবা আলী, আসহাব উদ্দীন আহমদ, তারাপদ রায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে ফররুখ আহমদ মানুষ, সমাজ ও দেশকে গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন। সে ভালোবাসার কলম থেকেই বেরিয়ে এসেছে তাঁর সমাজ ও স্বদেশের যত অসঙ্গতি ও বৈষম্যের চিত্র। তিনি রঙ্গব্যঙ্গ, পরিহাসপ্রিয়তা তির্যকতার মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ করেছিলেন। সেজন্যই তাঁর 'হাল্কা লেখা' তস্‌বিরনামা ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য ইত্যাদি এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তিনি তাঁর রচনাকে তির্যকত্ব ও পরিহাসপ্রিয়তায় এবং ব্যঙ্গ ও বিক্রমে অপূর্ব করে তুলেছেন। ফররুখ আহমদের যেখানে ব্যঙ্গের বিষয় ছিল ধনতন্ত্রের উৎসাদন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয় সেখানে অন্যান্য লেখকদের বিষয়ও স্বদেশ ও স্বসমাজের অসঙ্গতি ও বৈষম্য, কারো ধর্ম আবার কারো রাজনীতি। বিষয়-আশয় অনেক সময় এক হলেও লেখকের বর্ণনার লিপিকুশলতায় ব্যঙ্গ তখন আলাদা মর্যাদা লাভ করে। আমার মনে হয়, ফররুখ আহমদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। জোনাথন সুইফ্‌টও সমাজের অসঙ্গতির বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ করেছিলেন। সব অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও বলতে হয় ফররুখ আহমদই ব্যঙ্গ রচনার অজস্রতায় উপর্যুক্ত ব্যঙ্গ লেখকদের অপেক্ষা অধিকতর দেশ ও সমাজলগ্ন।

ফররুখ আহমদ বিচিত্র বিষয়ে ব্যঙ্গ রচনা তৈরি করেন। ফলে এক সময় তাঁর উপর খড়গ নেমে আসে। দেশ বিভাগের পর ক্রমশ, তাঁর ব্যঙ্গ কবিতা রচনা দৃঢ়মূল ও অজস্রধার হয়ে ওঠে। দেশ বিভাগের আগে তাঁর ব্যঙ্গ কবিতার কেন্দ্রীয় বিষয় ছিলো ধনতন্ত্রের উৎসাদন এবং দেশ বিভাগের পর সামাজিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয়।[৪] একারণে মূলত ১৯৫৭ সালে ফররুখের ব্যঙ্গ কবিতা নিয়ে সরকারি উপর মহলে একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এমনকি কবিকে গা ঢাকা দিয়েও থাকতে হয়েছিল কয়েকদিন– নিজের বাসা ছেড়ে কমলাপুর মামার বাসস্থলে ছিলেন সে সময়। তাঁর ব্যঙ্গ কবিতা যে-প্রতিপক্ষকে আমূল বিদ্ধ করতো, এই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।[৫] সেজন্যই বলা হয়েছে ফররুখ যতখানি ব্যক্তির কবি তার চেয়ে বেশি জাতির কবি। ব্যক্তিগত আবেগের চেয়ে জাতিগত আবেগই তাঁকে উন্মথিত করেছে চিরকাল।[৬]

ফররুখ আহমদের ব্যঙ্গ কবিতার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থ অল্প নয়। কবি আব্দুল মান্নান সৈয়দ-এর ভাষ্য মতে ফররুখ আহমদের ব্যঙ্গ কবিতা গ্রন্থের সংখ্যা সাত। তন্মেধ্যে দুটো প্রকাশিত। তাঁর ব্যঙ্গ কবিতা গ্রন্থের মধ্যে আছে- ১. তসবির নামা, ২. টুকরো কবিতা, ৩. নসিহত নামা, ৪. অনুস্বার, ৫. রসরঙ্গ, ৬. মজার ছড়া ও ৭. ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য।

ফররুখ আহমদের ব্যঙ্গ কবিতার ধারই অন্যরকম এবং ক্ষেত্র বিশেষে অনন্য সাধারণ। তিনি অনায়াসে সমাজকে– সমাজের মানুষকে খোঁচা মেরেছেন– সমাজ ও মানুষের অতল সত্য আবিষ্কারের জন্য। তিনি মূলত সুন্দর ও সত্যকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন– তাঁর ব্যঙ্গ কবিতায় ও গদ্যে। প্রথমে দু'একটি গদ্যের উদাহরণ খাড়া করি।

এক. আমার বইয়ের ভূমিকা আমি নিজেই লিখ্ছি। কারণ কোন খ্যাতনামা ব্যক্তিই অখ্যাত লেখকের ভূমিকা লিখতে চান না আর লিখলেও এমন বাহাদুরি করেন যার ফলে লেখকের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। সুতরাং পেরেশান হাল্কা থাকা সত্ত্বেও আমি ছহীহ্ বাংলা জবানে যে-কিতাব লিখছি সেই কিতাবের ভূমিকা প্রণয়নের দায়িত্ব আমাকে নিজের হাতেই নিতে হয়েছে। অবশ্য পাঠকের বিরক্তি উৎপাদনের জন্য নির্বোধ সাহিত্যিক দলে বুদ্ধিমান পারমাণবিক সদৃশ নরুন বুদ্ধি নাট্যকার জজ বার্নার্ড শয়ের মত দীর্ঘ ভূমিকা আমি লিখবো না। আর বলতে কি শয়ের প্রতিভা আমার চাইতে অনেক উঁচু দরের।

তবে একথা বলাবাহুল্য যে–আমার রচনাও উঁচুদরের। সমঝদার লোকের দুর্ভিক্ষ হওয়ায় আমার রচনার (যথোপযুক্ত দূরে থাকুক) মোটেই তারিফ হচ্ছে না। এই কথাগুলো বলার জন্যেই বিশেষ করে আমার ভূমিকা লেখার প্রয়োজন ছিল।...

এখানে শিক্ষিত সমাজ বলে যে একটা অদ্ভুত সমাজ আছে বে-সরকারি ফার্ম থেকে শুরু করে সরকারি অফিস পর্যন্ত আর বেতনভোগী মন্ত্রীমণ্ডলী থেকে অবৈতনিক ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের দহলিজের পেছন অবধি যাদের আনাগোনা– ঘুষ এবং চুরির একচেটিয়া কারবার ছাড়া অন্য কোন জিনিষের প্রবেশাধিকার যেখানে নেই। সে দেশে উপরোক্ত সমাজের পেট ক্রমাগত মোটা হলেও যাঁরা সাহিত্যিক তাঁদের পাকস্থলী অনাহারে লীলাভূমি অথবা বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার আতশী মঞ্জিল ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। সুতরাং এই সমাজ থেকে সাহিত্য-চর্চা করা মানে আত্মহত্যা করা... যা সম্পূর্ণ শরীয়তবিরোধী। আর আমি নিজে কদাচ শরীয়ত বিরোধিতা করি না।

বলতে ভুলে গেছি যে– আর এক শ্রেণীর মানুষ যাঁরা বড়লোক নামে বিখ্যাত তারাও অনেক সময় সাহিত্যের ময়দানে আসা যাওয়া করে থাকেন। তবে এঁদের অনেকেই লিখতে বসলে কলমের নিপ ভাঙে বলে নিপ বাঁচানোর জন্য মৌলিক সাহিত্যিকদের দুরবস্থার সুযোগে কানাকড়ি দাম দিয়ে লেখা কিনে নিজের নামে প্রকাশ করেন। অনেকে সেটুকু করার প্রয়োজন না থাকায় তাঁদের ফার্মে যে সমস্ত কর্মচারী সাহিত্য-চর্চা করে থাকেন তাদের লেখা চুরি করে অথবা কেড়ে নিয়ে নিজেদের নামে, পুস্তক আকারে বাজারে ছাড়েন। এঁরাও আমাদের মতই স্মরণীয়।[৭]

দুই. তিনি অন্যত্র বলেছেন, আমার বই পড়ে যদি কারোর মনে রচনার সত্যাসত্য, মৌলিকত্ব অথবা অন্য কোন রকম খটকা জাগে তাহলে অকারণে আমাকে

প্রশ্ন করে উত্যক্ত করবেন না। প্রশ্ন করলেও আমি উত্তর দেব না। কারণ একটি সওয়ালের জওয়াব দিলেই হাজার সওয়াল উঠবে। বাহ্যত জনমত ও গণতন্ত্রকে বাচনিক শ্রদ্ধা জানাতে বাধ্য হলেও উপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করি। এ শিক্ষা আমি পেয়েছি ধুরন্ধর মুর্শিদানের কাছে– যাঁরা ইসলামের নাম নিয়ে নির্বিকার চিত্তে ইসলামের বরখেলাফ করে থাকেন। তবে যাঁরা আমার তারিফ করতে চান (আমীরানা জবানে যাকে মোসাহেবী বলা হয়) তাঁরা নিশ্চিত মনে আমার কাছে চিঠি লিখতে পারেন। শুধু মেহেরবানী করে বেয়ারিং চিঠি পাঠাবেন না। [৮]

দ্বিতীয়ত কবিতার উদাহরণ–

কবিতা রচনায়ও ফররুখ আহমদ অজস্র ব্যঙ্গের বিচিত্র ব্যবহার প্রদর্শন করেছেন। এই উদ্দেশ্যমূলক শিল্পে তিনি সাফল্যও অর্জন করেছেন। যেমন–

মীর-জাফরের যারা সহযোগী-সহকর্মী আর
আজাদীর ফলভোগী নারী বা পুরুষ নির্বিকার,
রাষ্ট্রের বাসিন্দা যত জ্ঞানপ্রাপ্ত কিন্তু উদাসীন
আজাদী রক্ষার পথে: এনেছিল একত্রে দুর্দিন।
[ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য]

শকুনি: এই তো এখন এসে গেছি কাছাকাছি
আজ থেকে তবে এক মাযহাবে আছি।
ঈগল: এক মঞ্জিলে মকসুদ যদি হয়
তবে মযহাবে নেই আর সংশয়।
শকুনি: শ্মশান ছাড়া তো অন্য লক্ষ্য নাই।
ঈগল: সাত আসমান পাড়ি দিয়ে যেতে চাই।
[তসবিরনামা]

অনেকেই বলে: হায়াত দারাজ একরোখা
মতান্তরে সে তীর ছুড়ে মারে চোখা চোখা।
কিন্তু কথাটা সত্য কিনা ও কতটুকু
সত্য:– সে কথা ভেবে দেখ আজ এতটুকু।
'অন্যের মুখে ঝাল খেয়ে চাওয়া বাহাদুরী,
হায়াত দারাজ বলে সর্বদা; ডাহাচুরি '।
[হাল্কা লেখা]

গোলামীতে যদি করে কেউ গৌরব
কে বোঝাবে তাকে আজাদীর সৌরভ?
আঁকড়িয়ে থাকে দাগের চিহ্নগুলো

কানে দেয় তুলো: পিঠে খাশা বাঁধে কূলো।।

[টুকরো কবিতা]

বাংলা ভাষা এক যদি 'মুসলমানি বাংলা' কেন কও?
হিন্দুরূপ দিতে তাকে সংস্কৃতের বোঝা কেন বও?

'বাঙালির এক ভাষা' কিভাবে গুরুবাক্য মানি!
ব্রাহ্মণ্যবাদীর 'জল' কি কারণে হয় নাই পানি।।

[টুকরো কবিতা]

**তথ্যসংকেত**


১. সওগাত, সম্পাদক: মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, ভাদ্র ১৩৪৮
২. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত ও বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'ফররুখ আহমদ রচনাবলী'-১, জুন-১৯৯৫, পৃষ্ঠা-দশ।
৩. আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত ও বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'ফররুখ আহমদ রচনাবলী'-২, পৃষ্ঠা-৪৭৬
৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৭৬
৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৭৮
৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৭৯
৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৫-৩৬
৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৭।


---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, পঞ্চদশ সংখ্যা, অক্টোবর, ২০০৭]

# ফররুখ আহমদের 'কাফেলা'

আফজাল চৌধুরী

১৯৮০ সাল তথা ১৪০০ হিজরীর পবিত্র রমজান মাসে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভাগীয় কার্যালয় ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, কবি ফররুখ আহমদের 'কাফেলা' নামের কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ করে। ফররুখ আহমদের নিকটজন ও বর্তমানে অন্যতম ফররুখ-বিশেষজ্ঞ কবি মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখেছেন এবং কালানুক্রমিকভাবে 'কাফেলা'র অবস্থান সম্পর্কিত তথ্যাবলী সন্নিবেশ করে ফররুখ আহমদের এই মরণোত্তর কাব্যগ্রন্থের সুষম ও যথাস্থান নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছেন। কবি মোহাম্মদ মাহ্‌ফুউল্লাহ্‌র প্রতিবেদনটি নিম্নরূপ :

"ফররুখ আহমদ 'কাফেলা' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের বাসনা তাঁর মনে আমৃত্যু লালন করে গেছেন। এই বাসনার জন্ম হয়েছিল বিভাগ পূর্বকালে। ফররুখ আহমদের কাব্য-সাধনার প্রায় প্রাথমিক পর্বেই। এক অর্থে 'কাফেলা' কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি'র সমসাময়িক ও সহযাত্রী, প্রায় একই সময়ে অর্থাৎ বিভাগপূর্ব কালে ১৯৪২-৪৩ সালের দিকেই 'কাফেলা' ও 'সাত সাগরের মাঝি'র পাণ্ডুলিপি কবি তৈরি করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে হয়তো দ্বিতীয় চিন্তার ফলে ফররুখ আহমদ 'কাফেলা'র পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত কিছু কবিতা নিয়ে তৈরি করেন তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সিরাজাম মুনীরা'র পাণ্ডুলিপি।"

ভূমিকাংশে বিবৃত তথ্যে আরও জানা যায়, কবির স্বহস্ত খচিত 'কাফেলা'র পাণ্ডুলিপিতে 'সিরাজাম মুনীরা'র (১৯৫২) বেশ কিছু কবিতা অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং 'সিরাজাম মুনীরা'র ভাবকল্পনা পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত, ফলে 'কাফেলা' ঐ সময়ের কবি প্রেরণার ধারক অন্যতম আদিপত্র, যদিও চল্লিশ দশকের প্রথম দিকে এসব রচনা আজ আশির দশকে প্রকাশিত ও আলোচিত হতে যাচ্ছে। তাও কবির মরণোত্তর পর্বে। হায়রে এদেশের কবি-ভাগ্য ! বিশেষত: ফররুখ আহমদের।

অবশ্য ঐ একই তথ্যের উৎস থেকে জানা গেল যে, 'কাফেলা'র পাণ্ডুলিপিকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল এবং ১৯৪৩-৫৮ সালের মধ্যবর্তী বেশ কিছু রচনা এতে অবস্থান লাভ করেছে। 'ঈদের স্বপ্ন', 'মেঘনা তীরের চাষী'কে, 'বর্ষার পদ্মা', 'আরিচা-পারঘাট', 'বৈশাখ', 'ঝড়' ইত্যাদি প্রতিনিধিত্বমূলক কবিতাবলী, আপন-দেশ-কালে স্বস্তিবোধক এসব রচনা পরবর্তী কালেরই সৃষ্টি। এতে 'কাফেলা' ফররুখ আহমদের কবি ব্যক্তিত্বের প্রসারিত ব্যাপ্তির ধারক একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ– কবি মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র কথায় : "সেকালে প্রকাশিত হলে হয়তো এর (কাফেলার) কবিতা-সূচী অনেকটা অন্যরকম হতো এবং বিভাগ পরবর্তীকালে লেখা অনেক কবিতাই এর

অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ মিলতো না, ফলে ফররুখ আহমদ তাঁর স্বদেশের মাটিতে, ইতিহাস-ঐতিহ্যের ভিতে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশেও যে গভীরভাবে নোঙর বেঁধে রেখেছিলেন তা এ-গ্রন্থের অনেক কবিতা পড়ে উপলব্ধি করার ও অনুভবের সুযোগ মিলতো না। এদিক থেকে বর্তমান গ্রন্থের বিলম্বিত প্রকাশও অনেকটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। শুধু দুঃখ এই, কবি স্বয়ং তাঁর প্রিয় পাণ্ডুলিপি 'কাফেলা'র গ্রন্থরূপ দেখে যেতে পারলেন না।"

আসলে 'কাফেলা' সম্পর্কিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'সিরাজাম মুনীরা' গভীর ও নিকট সম্পর্ক নিয়ে পাশেই হাজির হাজির বলে উপস্থিত হয়ে যমজ সম্পর্ক বিস্তার করে, ফলে কাফেলার সত্তায় 'সিরাজাম মুনীরা'কেও ঝলমল করে জ্বলতে দেখি। এ দু'টি কাব্যগ্রন্থ ইসলাম ও তওহীদ রস-পিপাসু বাংলা ভাষাভাষীর নয়ন যুগলের মত সম্পূর্ণরূপে উন্মুলিত হয়েছে এতদিনে। এত কাল পরে বাঙালি মুসলিম চিত্তবৃত্তির সঞ্চয়ে একই তারকা সকাল ও সন্ধ্যাকাশে দুইরূপ নিয়ে জ্বলজ্বল করে ফুটে উঠেছে যেন, তাই যদি 'সিরাজাম মুনীরা'কে প্রভাতের তারকা রূপে গণ্য করি তবে কাফেলাকে সন্ধ্যাকাশের রূপেই অভিহিত করা যাক। জানি, দু'টি তারা ভিন্ন নয়, একটিই।

মূলত : আধুনিক বাংলা ভাষায় আজ পর্যন্ত বিরচিত তাবৎ কাব্যগ্রন্থে বহু বিষয় আছে, কিন্তু এ দু'টি কাব্যগ্রন্থের বিষয় উপস্থাপনা সম্পূর্ণ অভিনব। ইসলাম-প্রাসঙ্গিক উদ্দীপ্ত কাব্য চর্চা এই প্রথম তা বলছি না, তবে ইসলামের প্রতি গভীর অভিনিবেশ ও আত্মতা বিস্তারের ধ্যানোদৃপ্ত কাব্যরূপ এ দু'টি গ্রন্থে যে সিদ্ধি লাভ করেছে তা অতুলনীয় ও অবিনশ্বর। হ্যাঁ এ দু'টি কাব্যগ্রন্থ ফররুখ আহমদকে ইসলামের কবিরূপেই চিরঞ্জীব হওয়ার সামর্থ্য দান করেছে।

কিন্তু 'ইসলামের কবি' অভিধার অর্থ কি ? চৌদ্দ'শ বছরের দীর্ঘ ইতিহাসের শত শত মুসলিম প্রতিভাবান আরব-অনারব কবিরা যে কাব্যচর্চা করে গেলেন তাঁরা কি জাতিতে মুসলমান হয়েও ইসলামের কবিরূপে গণ্য হতে পারেন না ? একথায় এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়– না। ইসলামকে জীবনমন্ত্ররূপে গ্রহণ করে এই পবিত্র আমানতের সংরক্ষণ ও প্রসারণের গভীর তিতিক্ষা যে কবির কাব্যে প্রতিফলিত হয়নি তাঁকে অবশ্যই আরবি নামধারী ও মুসলিম জনক-জননীর সন্তান হওয়া সত্ত্বেও 'ইসলামের কবি' বলা যায় না কোন মতে। ইসলামকে কেন্দ্র করে কল্পনা ও আবেগের শক্তি যে কবি-চিত্তে দানাবদ্ধ এবং তৌহিদ স্পৃহায় উদ্দীপ্ত হয়ে যিনি নিজেকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গিত গণ্য করেন অবশ্যই তিনি 'ইসলামের কবি'। আর এ গুণ এত সুলভ নয় যে, ঝাঁকে ঝাঁকে নির্গত আরবি নামের সকল কবিকেই এই নামে অভিহিত করা যায়। দৃষ্টান্ত হলো– হযরত হাসান বিন সাবেত (রাঃ) ও হযরত লাবীদ ইবনে রাবিয়া (রাঃ) দু'জন প্রখ্যাত সাহাবী ও কবি যাঁদেরকে 'ইসলামের কবি' রূপে গণ্য করা হয়।

কিন্তু তাঁদের সমসাময়িক মহিলা কবি খানসা ইসলামের জন্য ব্যক্তিগতভাবে প্রচুর কুরবানি করা সত্ত্বেও ইসলামের কবিরূপে গণ্য নন। কেননা, তাঁর কাব্যচর্চায় ইসলামের আলো ফলিত হয়নি। গোত্রীয় স্পৃহার প্রাচীন ঐতিহ্যই বাণীবদ্ধ হয়েছে। অথচ তিনি ছিলেন প্রথম যুগের অত্যন্ত তেজস্বী মুসলিম মহিলা। তেমনি কবি ইবনে যুহায়র মক্কা বিজয়ের পর কুখ্যাত দশজন অপরাধীদের একজন হয়েও পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করে কালজয়ী নাতে রাসূল রচয়িতারূপে এখনো স্মরণীয় হচ্ছেন। ফারসি কবিকুলের ব্যাপারটি ধরা যাক। মুসলমানদের মুখোজ্জ্বলকারী বহু প্রতিভাবান কবিদের অভ্যুদয় হয়েছে সেখানে। কিন্তু ইসলামের জীবনবেদ, এর বিপ্লবী মন্ত্রোচ্চারণ কয়জনার কাব্যের উপজীব্য হয়েছে সেখানে ? হযরত ফরিদ উদ্দিন আত্তার ও মাওলানা জালালউদ্দীন রুমীর কাব্য সম্পদ অথবা শেখ সাদীর শাশ্বত হিতোপদেশ নিঃসন্দেহে আমাদের শ্লাঘার বিষয়। ইসলামের সৌন্দর্যানুভূতির নির্যাস ও প্রগাঢ় তাসাওফ চর্চা ইসলামের অন্তর্শক্তির মহাবিকাশ ঘটিয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে এটি ইসলামের ঐতিহাসিক যুগের সূচনালগ্ন। ফলে প্রাতঃস্মরণীয় মহা কবিকুল নিজেরা প্রচুর ভক্ত সমাদৃত হয়েও ছিলেন আসলে নিঃসঙ্গ। ফলে তাসাওফ চর্চা আত্মরক্ষার ঢালের মত ব্যবহৃত হয়েছে। মানি, জরথুস্ত্র প্লাটিনাস প্রমুখ প্রাচ্য জ্ঞানীদের উত্তরাধিকার ইসলামের বিপ্লবাচরণের সঙ্গে সঙ্গতিশীল না হয়েও এদের ধ্যানযোগে প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রবণতা আসলে প্রাচ্য সম্পদ এবং ফারসি কবিগণ কমবেশী সকলেই এই সম্পদকে আপন চিত্তে ধারণ করেছেন। কেননা, মুসলমানদের শক্তির ভিত্তিমূলে তখন ক্রমান্বয়ে আঘাত করছে বর্বর চেঙ্গিজী সর্বনাশ। তখন সবেমাত্র মুসলিম দুনিয়া ক্রুসেডের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

হাজার বছরের মুজ্জাদ্দেদ শেখ আহমদ সরহিন্দ ইসলামের অভ্যুদয়ের পুরো এক হাজার বছর পর প্রথম তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক থেকে ইসলামের মৌলদর্শনের প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিলেন এই উপমহাদেশে। ইসলামের তাবৎ পুনর্জাগরণ যুগে যুগে মহান সংস্কারকগণের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে আসছিল এবং ইতোপূর্বে মজহাবের চার ইমাম, শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী, ইমাম গাজ্জালী, ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মহান সংস্কার আন্দোলন মুসলিম জাহানের আত্মশক্তিকে জাগ্রত রেখেছিল। বলতে গেলে, কবিতার জগতে এই বিপ্লবী সংস্কার কর্মের চিত্ররূপময় সার্থক প্রতিফলন ঘটল কবি আলতাফ হোসেন হালী ও কবি ইকবালের রচনায় খ্রিষ্টীয় উনিশ ও বিশ শতকের প্রথম পাদে মাত্র। ঐতিহাসিক অবক্ষয় যুগ অতিক্রম ও অবিচ্ছিন্ন মহা সংস্কার আন্দোলনের ফলশ্রুতি দেখা দিয়েছে ঐতিহাসিকভাবে মাত্র সেইদিন। ইতোমধ্যে ইউরোপের গোলামীর শৃঙ্খল তিক্ত অভিজ্ঞতা সূচিত হয়েছে মুসলিম বিশ্বে। আবার নতুন দুনিয়ার অভ্যুদয় হচ্ছে। তাই আবার নতুনভাবে ইসলামের দু'একজন সার্থক কবির আত্মপ্রকাশ হচ্ছে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায়। উপমহাদেশের পশ্চিম প্রান্তে

আলতাফ হোসেন হালী ও ইকবাল এবং পূর্বপ্রান্তে অবিসংবাদিতভাবে ফররুখ আহমদই ইসলামের পুনর্জাগরণের মহান কবিসত্তা। তাঁর 'সিরাজাম মুনীরা' ও 'কাফেলা' গ্রন্থদ্বয় আমাদের এ-দাবীর উজ্জ্বল অভিজ্ঞান মাত্র।

এখানে আসুন, একটি বিষয় আমরা বিচার করি যে, ফররুখ আহমদের আধ্যাত্মিক দীক্ষার ও সবকের যোগসূত্রটি কী ? চারদিকে বিভ্রান্ত মতবাদের শ্বাপদসংকুল দুর্গম পথে তিনি যে মানবমুক্তির দুরূহ লক্ষ্যে একাকী বিচরণ করলেন, সে অবস্থায় তাঁর সত্যসাধনার নিকট-সম্পর্কটি ছিল কাদের সঙ্গে ? মরণোত্তর গ্রন্থ 'কাফেলা'র কোন উৎসর্গ পত্র নেই। 'সাত সাগরের মাঝি' ও 'সিরাজাম মুনীরা'য় তা আছে। 'সাত সাগরের মাঝি' কবি ইকবাল ও 'সিরাজাম মুনীরা' মাওলানা আব্দুল খালেকের প্রতি উৎসর্গিত। ইকবালের ওস্তাদ ও গুরু ছিলেন শামসুল ওলামা মীর হাসান। ইকবাল শিল্পের দুরূহ চড়াই-উৎরাইয়ের গুরু হিসেবে বরণ করেছিলেন মাওলানা জালাল উদ্দীন রূমীকে। ফররুখ শিল্পচর্চার উজ্জ্বল গুরুরূপে বরণ করলেন ইকবালকে এবং আধ্যাত্মিক সাধনার সাক্ষাৎ গুরু হিসেবে পেলেন সূফী অধ্যাপক আব্দুল খালেককে। অধ্যাপক আব্দুল খালেক ছিলেন পীর আবু বকর সিদ্দিকী ফুরফুরা খলিফা এবং ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহও ছিলেন তাই। ফুরফুরার পীর সাহেবের প্রশিষ্যরূপে ফররুখ আহমদের আরেকটি পরিচয় তাঁর ভ্রাতৃপ্রতিম আশেকানের সমাজেও ছিল উজ্জ্বল। এই পটভূমিতে কবি ফুরফুরার পীর সাহেবের তরিকত সাধনার ঐতিহ্য পরম্পরার সঙ্গে ছিলেন গভীরভাবে সংযুক্ত। ফুরফুরার পীর সাহেবের তরিকা ছিল নকশবন্দী মুজাদ্দেদী যার দীক্ষামার্গে হাজার বছরের মুজাদ্দেদ হযরত শেখ আহমদ সরহিন্দের কালজয়ী সাধনা ছিল প্রেরণা ও উদ্দীপনার উৎস। হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দের প্রচারিত তরিকায় মুজাদ্দেদে আলফেসানীর সাধনা সংযুক্ত হওয়ায় উপমহাদেশে এই তরিকা নকশবন্দী মুজাদ্দেদী নামে সুপরিচিতি লাভ করে। পরবর্তীকালে হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী ও সৈয়দ আহমদ বেরলভীর মাধ্যমে ইসলামের এই আধ্যাত্মিক ধারা ইনকেলাবী আন্দোলনে বিস্ফোরিত হয়। ফররুখ আহমদ এই যোগসূত্রেই ইসলামের মৌলবাদের প্রবক্তা কবিরূপে বাংলা ভাষায় যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, নিঃসন্দেহে 'সিরাজাম মুনীরা' ও 'কাফেলা'র কবিতাবলী তার ইশতেহার মাত্র।

'সাত সাগরের মাঝি' পর্যায়ের দুর্বার দুরন্ত সফর 'কাফেলা'য় স্থলপথ অতিক্রম করেছে বিপরীত প্রতীকী ব্যঞ্জনায় যখন–

"উটের সারির পাশে জমা হল একে একে দৃঢ় অচপল,
দূরযাত্রী দল।"

এখানে গতি নিরবচ্ছিন্ন কিন্তু দুরন্ত নয়। বাধার উপলখণ্ডে বিশ্রামের নিশুতি রাতে, 'সাতোয়া আকাশের নীচে' এক ওয়েসিস থেকে অন্য ওয়েসিসে, গোটা মুসলিম

জাহানের বিশাল জনপদসমূহে বিচরণের গভীর অভিজ্ঞতা নিয়ে এখানে কাফেলা শাশ্বত পথ পরিক্রমা করছে। এখানে 'কাফেলা ও মনজিল'—এর দ্বন্দ্ব রাহাগীরের হৃদয়কে পেন্ডুলামের মত দোলাচ্ছে এবং শেষতক পথ, অনন্ত পথই সত্য হয়ে উঠছে। 'তায়েফের পথ', মদিনার মুসাফির'—বৃত্তি, 'খলিফাতুল মুসলেমিন'—এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, 'কারবালার ময়দানে এজিদের ছুরি' ঝলসানোর রূপ প্রত্যক্ষ করণ, শহীদ ইমামের প্রতি উম্মতে মোহাম্মদীর হৃদয়-বিদারক সংলাপ ইত্যাদি মুসলিম হৃদয়বৃত্তির মটিফসমূহ ফররুখ আহমদের তুলিতে সবাক চিত্রের মত মূর্তিরূপ লাভ করেছে। স্থলপথে ফররুখ-চিত্তের এই অধিভ্রমণ 'কাফেলা'র চিত্রাংকনের, বিচিত্র সজ্জার ও অর্থ রূপময়তার এবং প্রতীকী ব্যঞ্জনা বিস্তারের মূলে সার্থকতার সঞ্চার করেছে। আর সমুদ্র সফর যে এ অবস্থায় হেতু ভাসরূপে পরিত্যক্ত হয়েছে তাও নয়। 'কাফেলা'-গ্রন্থে 'দ্বীপ নির্মাণ' শীর্ষক একটি অত্যন্ত সফল কবিতা আছে। আদর্শের ইউটোপিয়া দ্বীপের জন্য কোটি কোটি মানবাত্মার আত্মকুরবানির গভীর কাহিনী এই কবিতাটির প্রতিপাদ্য বিষয়। সমুদ্রের দুরন্ত সফরের অভিজ্ঞতার পরিণত পর্যায়ে কবিকণ্ঠে বিজ্ঞাপিত হয়েছে :

> "প্রবাল দ্বীপের গোড়া পত্তন হবে
> কী করে সে কথা হয়ে গেল জানাজানি
> দল বেঁধে এল অযুত প্রবাল কীট
> কাঁপায়ে দু'পাশে দরিয়ার লোনা পানি।"

এককালে 'সাত সাগরের মাঝি' রূপে সমুদ্রমন্থন করে, মউজের মত্ত চূড়ায় গড়াগড়ি দিয়ে, সিন্দবাদ ও দিগ্বিজয়ী মাল্লার দল সম্পর্কে যে মহা প্রতীকী কাব্য রচনা করেছিলেন কবি, তিনি এখন সমুদ্রের গভীর সৃষ্টি ক্ষমতায় তন্ময় হয়ে প্রবাল দ্বীপ রচনার কালোত্তীর্ণ ছবি অঙ্কন করেছেন ঃ

> "অযুত, লক্ষ, কোটি প্রবালের দেহ
> শত যুগ ধরে সেই দ্বীপ গড়ে ওঠে
> কোটি প্রবালের তনুতে না হয় যদি
> আরো বহুকোটি প্রবাল কীটেরা জোটে
> কবে দূরচারী পথিক পাখিরা এসে
> কাকলী মুখর সে দ্বীপে বাঁধবে ঘর,
> জাগবে কখন প্রবাল দ্বীপের বুকে
> নারিকেল শাখে স্বপ্নের মর্মর।
> প্রবাল দ্বীপের গোড়াপত্তন হবে
> কি করে পেয়েছে তারা সেই হাতছানি
> মৃত্যু যাদের ত্যাগের মহান ছবি

মত্ততাতেই তারা পায় যে জিন্দেগানি।।"

'সাত সাগরের মাঝি'র উত্তাল সমুদ্রগর্জন এখানে নেই; বরং অতল নিস্তব্ধতার মোরাকাবায় ফানা হয়ে যাবার প্রবণতাই বিদ্যমান। 'নতুন সফর' শীর্ষক কবির বিখ্যাত কবিতাটি বর্তমান গ্রন্থভুক্ত কবিতারূপে এখানে আলোচ্য সমুদ্র সফর প্রসঙ্গে পুনরালোচিত হতে পারে। এ কবিতায় নায়ক সিন্দবাদকে সরাসরি কবি কর্তৃক সম্বোধিত হতে দেখি। কবিতাটি 'সাত সাগরের মাঝি' ভুক্ত হলে সঙ্গতিশীল প্রতীয়মান হত। কিন্তু এ সঙ্গতি হত বহিরাঙ্গের। উক্ত গ্রন্থে আদর্শবাদ অনুচ্চারিত, প্রতীকতা প্রাধান্যপ্রাপ্ত। কিন্তু 'সিরাজাম মুনীরা' ও 'কাফেলা'য় আদর্শবাদ সুউচ্চারিত, রূপক প্রতীক সুআরোপিত। বরং 'নতুন সফর' দুরন্ত সমুদ্র-সফরের সুন্দর পরিসমাপ্তি ব্যঞ্জক একটি সফল কবিতা এবং 'দ্বীপ নির্মাণ' শীর্ষক আলোচিত কবিতাটি বরং একটি নতুন মাত্রাযোজক। 'নতুন সফর' কবিতার কিছু উল্লেখযোগ্য পঙ্‌ক্তি দেখুন :

"জীবনের চেয়ে দৃপ্ত মৃত্যু তখনি জানি
শহীদী রক্তে হেসে ওঠে যবে জিন্দেগানি...
কাবাকেন্দ্রিক জীবনের এই পরিক্রমা
ক্লান্ত রাতের সংশয় মনে রেখো না জমা
সব দরিয়াকে বাঁধাবো তোমার ইত্তেহাদ
সব প্রতিরোধ ভাঙবে তোমার এই জিহাদ।
'নতুন সফরে হবে এ কিশ্‌তি দ্বিগ্বীজয়ী।"

কবি-চিত্তের সামগ্রিক ক্যানভাসে 'কাফেলা'র প্রকৃতি বিচারের এই প্রয়াসে এখন যতি টেনে গ্রন্থের মুখ্য কবিতাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপন করা যাক। বিবিধ বক্তব্যের মোট ৩২টি খণ্ড কবিতা ও 'ইবলিস ও বনি আদম' শীর্ষক একটি নাট্য কবিতা 'কাফেলা'য় গ্রন্থিত হয়েছে। তথ্য নির্দেশিকায় প্রায় সকল কবিতার প্রথম প্রকাশকাল ও পত্র-পত্রিকার নাম উল্লেখিত হয়েছে। আসলে লেখাগুলোর সাথে সচেতন ও সন্ধিৎসু পাঠকের পরিচয় হয়তো আগেই ছিল। ফলে 'কাফেলা' এগুলোর সংকলন গ্রন্থের নাম রূপে প্রতীয়মান হতো যদি গ্রন্থের পরিকল্পনাটি স্বয়ং কবির স্বকপোলকল্পিত না হত। 'সিরাজাম মুনীরা'র কবিতাবলীর নির্বিকল্প ভাববাদ কাফেলার আরো লোকবেদ্য সহজ, ব্যাপক, মৃত্তিকা সংলগ্ন হয়েছে তবু, 'কাফেলা', 'তায়েফের পথে', 'মদীনার মুসাফির', 'খলিফাতুল মুসলেমিন', 'এজিদের ছুরি', 'বেলাল', 'আলমগীর', 'নতুন মিনার', 'নতুন সফর', 'কোন বিয়াবানে', 'ঈদের স্বপ্ন', ঈদের কবিতা', নয়াসড়ক', 'বিকেল', 'হে আত্মবিস্মৃত সূর্য', 'জাগো সূর্য প্রদীপ্ত গৌরবে', 'বৈশাখ' ইত্যাদি আদর্শবাদ প্রোথিত কবিতাবলী জাজিরাতুল আরব থেকে বাংলা-আসাম পর্যন্ত সাক্ষাৎ পটভূমিকায় প্রকল্পিত হয়েছে এবং বাকসিদ্ধি লাভ করেছে। 'কিসসা খানির বাজার' ও 'পুঁথির কাহিনী অবলম্বনে' শীর্ষক কবিতাদ্বয়ে তুর্কিস্তানীয় মুসলিম মানস পটভূমিতে জীবনের রহস্য-বিষয়ক, মানবিক সুখ-দুঃখ

বিষয়ক ঐতিহ্যবাহী ভূয়োদর্শনকে উপজীব্য করে অভিনব আঙ্গিকে এক অপসৃত সৌন্দর্যালোকের সন্ধানে যাত্রা করা হয়েছে। 'স্বর্ণ ঈগল', 'সৃষ্টির গান', চতুর্দশপদী', 'ইনকিলাব',-ইত্যাদি কবিতাবলীতে ফররুখ আহমদের বিশ্বদীক্ষা ও স্বপ্নসাধকের সরল উচ্চারণ বাণীরূপ লাভ করেছে। এই ব্যাপারটিতে ইকবালের মতই ফররুখ আহমদ আপন জাতিসত্তার প্রতিনিধি পুরুষের সাবলীল কণ্ঠ লাভ করেছেন। 'ইনকিলাব' কবিতাটি থেকে উদ্ধৃতি পেশ করছি :

"মরু ঝঞ্ঝার মত উড়ে আসে, আসে ইসলামী ইনকিলাব
এ ঝড়ের মুখে মরণ নিদালি কুয়াশা-চাদর টানি কি লাভ
আয় ইনকিলাব
আয় ইনকিলাব।...
আয় !
নির্যাতিতের মৃত্যু শীতের শিয়রে রক্ত দিন ফাগুন
জালিম দলের পাষাণ ভিতের, প্রান্তে বজ্র আয় আগুন
খর তরবার হানরে দুধার করে যা উজার বিষের তূণ
কঠিন আঘাতে পিষে যারে সব মিথ্যাবাদীর ভীরু প্রলাপ
আয় ইনকিলাব
আয় ইনকিলাব।"

এ গ্রন্থের মর্মভেদী কবিতাটির নাম 'দুই মৃত্যু'। কবিতাটিতে হযরত মূসা (আঃ)-কে সম্বোধন করে বর্তমানে পুঁজিবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের মুখোমুখি দণ্ডায়মান ত্রিশংকু মুসলিম বিশ্বের আর্তিকে রূপদান করা হয়েছে :

"দুই মৃত্যুর মাঝখানে মোরা দাঁড়িয়েছি আজ এসে
হে মুসা কালীম ! দেখ চেয়ে পিছু কারুণের বেষ্টনী ;
জাগে ফেরাউন নির্ভীক সম্মুখে।"

কবিতাটির শেষাংশ এইরূপ :

"তুমি জানবে না-শুধু এ বদনা মোর-।
তবুও জানাতে চাই
ফেরাউন আছে, রয়েছে কারুণ
শুধু যে মূসাই নাই।।"

'ঝড়', 'বর্ষায়', 'পদ্মা', 'আরিচা পারঘাটে' শীর্ষক কবিতামালার একগুচ্ছ চতুর্দশপদী মোট ২৪টি আঙ্গিক ও ভাববাচ্যতার ফররুখীয় সনেটরূপে আপন ঔজ্জ্বল্যে দেদীপ্যমান। মুসলিম বিশ্বাস ও জীবনের অনুষঙ্গ এসব প্রকৃতি, জনপদ, মানুষ সম্পর্কিত সনেটগুচ্ছে সাবলীল ব্যবহারে এমন স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছে যেন 'এইতো স্বাভাবিক' বলে ধারণা জন্মায়। সুদক্ষ অন্তমিলের নিপুণ কারিগর হিসাবে কবি ফররুখ আহমদের কাজ এই সনেটগুচ্ছ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং এবং 'কাফেলা'র মৌল সুরের সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন। এই আপাত : ভিন্ন আঙ্গিকের কবিতা নিয়ে প্রকৃতির শক্তিকে

ঐশী ইনকিলাবের অনুকূল গতিরূপেই গণ্য করা হয়েছে। এই গ্রন্থউক্ত প্রকৃতি বিষয়ক বিখ্যাত কবিতা বৈশাখে কবির চিত্তে যে রূপক দানা বদ্ধ তার পরিচয় নিম্নরূপ :-

"মিথ্যা বাতিলের দুর্গ ধ্বংস করি, ধ্বংস করি বিভীষিকা সঞ্চিত রাত্রির
তৌহিদী পয়গাম কণ্ঠে যেমন দাঁড়ালো এসে মর্দে খোদা- জালালী ফকির
মূসা কালীমের মত 'আসা' হাতে তীব্র দৃষ্টি বাংলার প্রান্তরে
চৈত্রের বিভ্রান্তি ভেঙে তেমনি বৈশাখ এস খর রোদ্রে ...এস ঘরে ঘরে,
তোমার সংঘাতে এই পৌত্তলিক জড়তার মৃত্যুম্লান শর্বরী পোহাক,
কালের কুঠার তুমি নিষ্প্রাণ এ জনারণ্যে এস ফিরে হে দৃপ্ত বৈশাখ।"

আলোচ্য সনেটগুচ্ছে আদর্শের ও প্রকৃতির অভিন্ন বাকপ্রতিমা নির্মাণের কৌশল প্রায় সর্বত্র অনুসৃত হয়েছে। এই কাজে ফররুখ আপন বৈশিষ্ট্য এমনভাবে জাজ্বল্যমান করেছেন যে, পূববর্তী কোন কবিই তাঁকে যেন এ ব্যাপারে অতিক্রম করতে পারেন না। ধ্রুপদী স্বজ্ঞায় উদ্দীপ্ত কবি অলংকার শাস্ত্রীয় তাবৎ গুণপনাই স্বীকার করেছেন ষোলআনা, যেন অনায়াসে, বিনা ক্লেশে।

'ইবলিস ও বনি আদম' শীর্ষক সংলাপ-কবিতার পরিসর দীর্ঘ একটি ফর্মা। ইতোপূর্বে 'মোহাম্মদী' ও 'পৃথিবী' পত্রিকায় প্রকাশিত এই অনিন্দ্য নাট্য কবিতায় আকৃষ্ট ও প্রভাবিত হয়েছেন অনেকেই। গ্যাটের ফাউস্ট-নাটকের, ফাউস্ট মেফিস্টোফেলিস কথোপকথনের মত, কবি ইকবালের 'বালই জিব্রীলের' জিব্রীল ও ইবলিস' শীর্ষক সংলাপ-কবিতার আদলে কিংবা 'আর্মুগানই হিজাদ' কাব্যের ইবলিস কি মজলিস ই শূরা' শীর্ষক সংলাপ-কাব্যের ইবলিস-চরিত্রের ভাবমূর্তির পটভূমিতে খচিত এই সংলাপ কবিতায় ইনসান ই কামিলের সাথে কল্পিত যুদ্ধজয়ে শয়তানের শেষ বোঝাপড়ার নাটকীয় তুঙ্গ-মুহূর্তের উপস্থাপনা হয়েছে। বনি আদমের স্বীকৃতির জন্য তার দরিদ্র বস্তিতে শয়তান নৈশ বিহার করছে। কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠ মানব পুত্রের দুর্জয় সংকল্পের কাছে ইবলিসকে মাথা নতই করতে হয়। ভোরের আজান শুনে অপসৃত হয় সে, যখন বনি আদমের কণ্ঠে শোনা যায়-

"- সব অন্ধকারে
সকল সংকটে পাবে ইবলিস-প্রস্তুত আমাকে।"

'ইবলিস ও বনি আদম' শীর্ষক এই নাট্য-কবিতা ভাব, বক্তব্য ও ভাষ্য প্রয়োগে উত্তুঙ্গ সাফল্য লাভ করেছে। 'কাফেলা' গ্রন্থের শেষ অধ্যায়টি ফররুখ আহমদের জীবন সাধনার দুরূহ সংকল্পের কথাই ব্যক্ত করছে। মানবাত্মার এক অবিনশ্বর কল্যাণ যাত্রার পথে শয়তানী ক্রুরজাল ছিন্ন করার প্রয়াস অযুত মানব যাত্রীর কাফেলার পথ পরিক্রমাকে নিষ্কণ্টক করাই যে ফররুখ আহমদের জীবনের ব্রত ছিল- তা এ নাট্য-কবিতায় সহজেই অনুভব করা যায়। ⊟

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা ১১তম সংখ্যা- জুন-২০০৫]

# ফররুখের স্বোপার্জিত ভুবন : 'হাবেদা মরুর কাহিনী'

আফজাল চৌধুরী

শ্রেষ্ঠ কবিতা ও রচনাবলী জাতীয় প্রকাশনা ছাড়া ফররুখ আহমদের মরণোত্তর পর্বের প্রকাশিত দুটি কাব্য গ্রন্থের একটির নাম 'কাফেলা' ও অপরটির নাম 'হাবেদা মরুর কাহিনী'। 'কাফেলা'র প্রকাশকাল আগস্ট ১৯৮০ এবং 'হাবেদা মরুর কাহিনী' ১৯৮১। শেষোক্ত গ্রন্থে দীর্ঘ এক ফর্মার একটি সমৃদ্ধ ভূমিকা আছে কবি মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর। এই গ্রন্থের ভূমিকাংশের সবশেষে, স্বয়ং ফররুখ আহমদের ক্ষুদ্র বক্তব্য 'হাবেদা মরুর কাহিনী'র পাণ্ডুলিপি প্রাথমিকভাবে শেষ করে নোট আকারে তিনি যা লিখেছেন তাও আছে। মন্তব্যটি নিম্নরূপ :

"রূপকথার 'হাবেদা মরুর' অন্য নাম 'হাওয়ার ময়দান'। নিঃসীম শূন্যতা আর হতাশার ব্যঞ্জনা আছে ঐ মাঠের সওয়ালে। 'হাবেদা মরুর কাহিনী'- গদ্যে লেখা রূপক কবিতা। ঈসায়ী উনিশশো সাতান্নর শেষ ভাগে এই বইয়ের সূচনা আর উনিশশো আটান্নর প্রথমার্ধে এর সমাপ্তি। ১৩৭৭ হিজরীর ঈদ-উল-আজহার দিনে এই বইয়ের শেষ কবিতাটি লেখা হয়। দুর্নীতি, অব্যবস্থা আর হতাশা যখন সারা দেশ ছেয়ে ফেলেছিল। আর সেই মারাত্মক নৈরাজ্যের মুখে যখন প্রত্যেক দেশাত্মবোধসম্পন্ন নাগরিক কামনা করেছিলেন একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের।

মোট ঊনপঞ্চাশটি ছন্দ-মুক্ত, অন্তর্মিলহীন কবিতার সঞ্চয়ে এই কাব্যগ্রন্থের অবয়ব নির্মিত। প্রথম কবিতাটিকে উপপাদক রূপে ধরলে মোট কবিতার সংখ্যা দাঁড়ায় আটান্ন। বিশ শতকের আটান্ন সালে গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি সমাপ্ত বলে কবিবাচ্যে সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণও উল্লেখিত। তাই এ আটান্নটি কবিতা বিশ শতকের প্রথম পাদের আচ্ছন্ন আটান্নটি সৌর বছরের খতিয়ান রূপেও সংখ্যা রহস্য ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত হয়ে থাকতে পারে, যে দুর্বহ দুঃসময়ের, কিংবা এর উৎক্রান্তির, অথবা এর পরিণতির সাক্ষী কবি নিজেই। বলা আবশ্যক যে, এ গ্রন্থে কাল-চেতনা কবির অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় অনেক বেশি অরূঢ়, প্রায় অমোঘ, দূরতিক্রম্য, তাই সনিষ্ঠরূপেই বিশ্লেষিত। ব্যগ্র পাঠক নিশ্চয়ই সাক্ষ্য দেবেন যে, কবির মর্মর শোভিত প্রথম গ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' ও অমিত কাল-চেতনায় সংক্রমিত, তবে 'সাত সাগরের মাঝি'তে উত্তুঙ্গ আশার দিগন্তচারী বিচরণ কবির অমিত শক্তির লীলাবিচ্ছুরণ করেছে। আর এই গ্রন্থটি যেন নিউটনের গতির সূত্রের 'ইক্যুয়াল এন্ড অপোজিট রিয়্যাকশন'কে ধারণ করেছে যা 'সাত সাগরের মাঝি'র সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে দণ্ডায়মান। ফলে ফররুখ তন্ত্রের ধীর বিশ্লেষণে, কবি-রহস্যোদঘাটনে এ গ্রন্থ দলিলরূপেই শুধু মূল্যবান নয় বরং এ কবিত্ব কতটুকু কালোত্তীর্ণ তার সৎবিচারও এরই সাহায্যে নিরূপণ করতে হবে। অতএব প্রথা বা 'ক্লিশে' তাত্ত্বিকতা নয় বরং আমূল ও ফররুখীয় একটি নিজস্বমার্গ নির্দেশ

করে 'হাবেদা মরুর কাহিনী'র যথার্থ মূল্যায়নের জন্য আহ্বান জানানো আমরা প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচনা করছি।

দুর্ভাগ্যক্রমে ফররুখ আহমদের ডিকশান নিয়ে যত বাদানুবাদ হয়েছে তার সিকি ভাগও মূল্যায়নধর্মী বিতর্ক আমাদের সমাজে হয়নি। তাঁর অকাল মৃত্যুর পর তাঁর মৃত্যুর উপেক্ষা প্রদর্শনজনিত কারণে জড়িত কুচিহ্নিত ব্যক্তিরাও শোকসভা ও শোকালোচনায় ব্যাপৃত হয়েছেন এবং সিরিয়াস ফররুখ-চর্চায় আগ্রহ দেখানোর আবশ্যকতার দিকে ঝুঁকেছেন। এখন ফররুখ-চর্চায় বিমুখতা দেখানো আর সম্ভব নয়। ফররুখের কাব্যসম্ভার এখন জাতীয় সম্পদ এবং তাঁর বেপরোয়া চরিত্রও একটি মডেল বিশেষ। কিন্তু তাই বলে যে তাঁর শব্দচয়ন নীতি নবীন সমাজে গৃহীত হয়েছে তাও বলা যাবে না। বরং কৃত্রিম পাহারাও প্ররোচনায় নবীন মণ্ডলকে ফররুখের উত্তরাধিকারের স্পর্শ হতে দূরে রাখার সচেতন প্রয়াস আছে। এত বড় প্রতিভাকে ডিঙিয়ে লেসার জিনিয়াসকে তুঙ্গে তোলার একটি জাতীয় ফ্যালাসীর কাল্টও চালু হয়েছে। ফলে সত্যিকার গণমুখিনতা ভুল ব্যাখ্যায় উপেক্ষিত হচ্ছে এবং জাতীয় সাংস্কৃতিক মুক্তি হচ্ছে সুদূরপরাহত। কিন্তু ফররুখ আহমদের বিশেষ ডিকশন কি ফ্যালাসীগ্রস্ত? তাঁর শব্দ চয়ন কি পশ্চাদমুখী? জাতীয় পুরাণ (Myth) রূপে তিনি যা অনুশীলন করেছেন বা গছাতে চেয়েছেন তা কি জবরদস্তিমূলক ও অবৈজ্ঞানিক? এ সমস্ত প্রশ্নের সুন্দর সুরাহা হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং ফররুখ-চর্চার আশু বাধা যে কম্যুনিকেশন গ্যাপ তা বলিষ্ঠ হাতে সরিয়ে ফেলা অত্যন্ত জরুরী। এসব বিতর্কমূলক প্রশ্নের জটিল আবর্তে এখন যাচ্ছি না আমরা। শুধু একটা ঐতিহাসিক বিষয় সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করছি যা ফররুখ আহমদের শব্দচয়ন নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত। বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে ফররুখ আহমদের সহগামী কবি হলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ফররুখের এই সমবয়স্ক কবিদ্বয় নিষ্ঠা ও প্রতিভায় বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ প্রবণতায় শক্ত প্রবক্তা ও প্রতিনিধিত্বশীল কবিরূপে এখন বিশেষভাবে স্বীকৃত ও সম্মানিত । এই চল্লিশের দশকেরই এক দিকে ক্ষয়িষ্ণু নান্দনিকতা (সমর সেনকে যে ধারার ঐ-দশকীয় প্রতিনিধি বলা যায়) ও সুকান্ত-সুভাষ প্রদর্শিত বামপন্থীমুখিতা দ্বন্দ্বমুখর দুটি পথ খুঁজে নেয়। ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ ও আগ্রাসী বামবাদ প্রবেশ করে স্নায়ুযুদ্ধে এবং বুদ্ধদেব বসুর মত মুরব্বীও কাছা এঁটে নেমে পড়েন লড়াইয়ের ময়দানে। কমরেড মুজাফ্ফর আহমদ নজরুল চর্চার অবতারণা করে তাঁর প্রচণ্ড জনপ্রিয়তাকে এ যুদ্ধে নান্দনিকতার বিরুদ্ধে ঢালরূপে ব্যবহার করেন এবং সুভাষগণ নজরুলকে মাথার ওপর ছাতারূপে মেলে ধরেন। এ সময়েই সুভাষদের বন্ধু ফররুখ অমিত বাহুবল নিয়ে সে দলে না ভিড়ে নিঃসঙ্গতায়, সমাধান খুঁজতে লাগলেন। বলাবাহুল্য, ততদিনে শক্তহাতের জন্য তিনি বাম মহলে সুকান্তের চেয়েও অধিক সম্ভাবনাপূর্ণ তরুণ কবি-ব্যক্তিত্ব। কিন্তু এই কি তাঁর গন্তব্য পথ? ফররুখের মনে প্রশ্ন প্রচলিত এ ভাষাতেই তাঁকে সারাজীবন লিখতে হবে কি?

তাঁর মনের দ্বিতীয় প্রশ্ন। এই ঘনঘোর জিজ্ঞাসায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে, মৌন হয়ে গিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত পথ ও পাথেয় দু-ই লাভ করলেন। এ সব কথা তাঁর দুটি একটি সনেটে ব্যক্ত হয়েছে। আর এ ব্যাপারে একমাত্র মধুসূদনের সঙ্গেই তাঁর মিল পাওয়া যায় এবং প্রতিভা ও সামর্থ্যে সত্যই তিনি তো মধু কবির মতই ক্ল্যাসিক ও দিগ্বিজয়ী। শৈলী নির্বাচনে ও বিষয় সন্ধানে তিনি যে সিদ্ধান্ত নিলেন, তাঁর 'কাসাসুল আম্বিয়া' পাঠ, হাতেমতায়ীর পুরাণ গ্রহণ ইত্যাদি তাঁকে ঢাকাকেন্দ্রিক নব বাঙলা সভ্যতার মধুসূদন রূপেই উপস্থাপিত করছে- 'ফররুখ আহমদ' এই নামেই রয়েছে এক অসামান্য দার্ঢ্য ও ব্যঞ্জনা।

ফলে যুগনায়ক রূপে তাঁর মনযিল তাঁকে দূর থেকে ডেকেছে, এক অসামান্য দূরদৃষ্টি নিয়ে তিনি চলেছেন সমসাময়িক সকলের হয়ে সকলের দায় কাঁধে তুলে নিয়ে। দূরদৃষ্টিহীনেরা তাঁকে আজও বুঝতে পারছে না। তাই ফররুখ বিতর্ক আজও চলছে, চলছে তাঁর প্রভাব স্খলনের অপচেষ্টা এবং নিপুণ অন্তর্ঘাত।

বর্তমানে প্রায় বিশ কোটি বাংলাভাষীর মাঝে পনের কোটিই মুসলমান। পনের কোটি মানুষের হৃৎস্পন্দন অনুভূত বাংলা সাহিত্য-চর্চায় স্বাভাবিকভাবে এ জনতার ভাষা, পুরাণ, মটিফসমূহের সুপ্রতিষ্ঠা এবং আধুনিকতার সম্মিলন সাধনের মহাব্রত তিনি পালন করে গেছেন। তাই মহাগণমুখিতা তাঁর অনুগমন করেছে, তাঁকে এর পেছনে ছুটতে হয়নি। বুদ্ধদেব বসুর নান্দনিক স্কুল ও সুভাষ-সুকান্তের গণমুখী নৈশবিদ্যালয়ের সঙ্গে ফররুখের গণমুক্তিও আন্দোলনের মিল ও বেমিল এখানেই। তাঁর সিন্দবাদ-বৃত্তি ও হাতেমতায়ীপনার ব্যাখ্যাসূত্রও এরূপ তুলনামূল্যেই সহজলভ্য বলে আমরা মনে করি।

ফররুখ আহমদ 'সাত সাগরের মাঝি'তে যে উত্তুঙ্গ বিহার করেছিলেন তার শম ঘটেছে 'হাবেদা মরুর কাহিনী'তে। 'সাত সাগরের মাঝি'তে আশা-নৈরাশ্যের প্রচণ্ড দোলাচল আছে, সমুদ্রের বন্দর হতে বন্দরে নোঙ্গরপাত ও গমনাগমন আছে, আছে সমুদ্র ঝড়ের সঙ্গে বলিষ্ঠ পেশীর দ্বন্দ্ব-সংঘাত, এমনকি 'রাত পোহাবার কত দেরী'- এই প্রশ্নের এ ফোঁড় ও ফোঁড় করা দিগন্ত বিদারণ। তবু যৌব-শক্তি হাজার মারখেয়ে সেখানে ক্লান্ত হলেও শ্রান্ত নয়, এক বুক ভরসায় ভাঙ্গা পাটাতনে তবু সেখানে পাল চড়ছে, মহা কুওতে চলছে দাঁড় টানাটানি। কিন্তু 'হাবেদা মরুর কাহিনী'তে শ্রান্ত প্রৌঢ়ত্ব ঐতিহাসিক অভিযাত্রার ত্রুটি-বিচ্যুতির বিচার-বিশ্লেষণে ব্যাপৃত এবং এক নিঃসীম হাওয়ার তেপান্তরে, বাদগর্দ হাম্মামের প্রহেলিকায়, আদিগন্ত নৈরাশ্যের মরীচিকায় পথ হারিয়ে লক্ষ্য করছে-

> এক অন্ধ, আরেক অন্ধকে পথ দেখাবে বলে
> টেনে নিয়ে চলছে গহীন বনের অন্ধকারে
> যেখানে অপমৃত্যুর খাদের মত
> গভীর গড়খাঁই, আর কাঁটা তারের পাহারা।

বিভিন্ন মতবাদ অধ্যুষিত দুনিয়ায়
এই তো বিভ্রান্ত মানুষের চেহারা।

**(চব্বিশ : হাবেদা মরুর কাহিনী)**

এদিকে সমুদ্র পথে যে বিচরণ শুরু হয়েছিল একদা 'সাত সাগরের মাঝি' রূপে সেই ভ্রমণ, স্থলপথে অন্তহীন 'কাফেলা রূপে হেরার রাজতোরণের উদ্দেশ্যে চিত্ররূপময় অভিযাত্রায়, এসে পৌঁছেছে এক নিষ্করুন দশ্‌তে হাবেদায়। বর্ণনাটি এইরূপ-

কাফেলা এসে দাঁড়ালো/হাওয়ার মাঠ দশতে হাবেদায়/জিন্দেগীর সবুজ নিশানা হারিয়ে/খাঁ খাঁ করছে যেখানে দিগন্ত ছোঁয়া ময়দান/যেখানে পোড়া-মাটি-রঙ ফসলের শূন্য মাঠ/বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে গুমরে উঠছে রাত্রি দিন ... /কাফেলা এসে দাঁড়ালো সেই রুক্ষ বিয়াবানে,/সব চেয়ে প্রাণবন্ত চারা গাছ/যে মাটিতে মাথা তুলে/কুঁকড়ে শুকিয়ে মারা গেছে/যে মরা গাছের শুকনো ডালে দেখছি/ঝড়ো সন্ধ্যায় হিংস্র জ্বীনের নর্তন .../সব  চেয়ে বলিষ্ঠ বুক/আর জোরালো ডানার পাখি/যে প্রান্তর পার হওয়ার পথে/ডানা গুটিয়ে হঠাৎ পড়ে গেছে মুখ থুবড়ে/আজদাহার তীব্র দৃষ্টিতে সম্মোহিত শিকারের মত/তারপর আর কোন দিনই তার সাড়া পাওয়া যায়নি।/কাফেলা এসে দাঁড়ালো/হাবেদার সেই মৃত্যু-হিংস্র পান্তরে/একদিনে যার ক্ষুদ্র কহর দরিয়া/অন্যদিকে লুব্ধ বাদগর্দ হাম্মাম,/জেগে আছে দুই ধ্বংসের/দুই অপমৃত্যুর ইশারা নিয়ে/এক অজানা ভয়ে কেঁপে উঠলো সবার মন/আসন্ন মৃত্যুর আভাসে,/সেই দীর্ঘশ্বাসের প্রান্তরে,/হাওয়ার মাঠ দশতে হাবেদার/তপ্ত তামার মত ময়দানে...   **(দুইঃ হাবেদা মরুর কাহিনী)**

এ অবস্থায় যা হবার তাই হয়েছে অর্থাৎ গতি রুদ্ধ হয়েছে, সংকট হয়েছে ঘনীভূত। সচেতন পাঠক ইতিমধ্যে অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন, এ-গ্রন্থের কবিতাগুলোর শিরোনাম নেই (উদ্ধৃতির শেষে নম্বর; যুক্ত শিরোনাম দেয়া হয়েছে এক, দুই, উনপঞ্চাশ ইত্যাদি)। এবং গদ্য-ছন্দ এর বাহন। যে 'সাত সাগরের মাঝি'তে তরঙ্গ দোলার মতই ছন্দের দোল, এখানে তা বেলাভূমির ভাটার চিত্রের মতই অপসৃত। যে 'সাত সাগরের মাঝি'তে রোমাঞ্চকর চিত্ররূপময়তা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্য-কলারূপে উৎকীর্ণ এখানে তা একমাত্র রূপকালংকার ছাড়া আর কোন ভূষণে সজ্জিত নয়। এ ব্যবধান যৌবনের সঙ্গে প্রৌঢ়ত্বের, আবেগের সঙ্গে হিসাবের, সাফল্যের সঙ্গে ব্যর্থতার। কেননা-

জোনাকীজ্বলা বিজন বনের মধ্যে
ক্ষণিক আলো-ছায়ার মত
জ্বলে উঠছে আর নিভে যাচ্ছে
আমাদের সকল আশা, আকাঙ্ক্ষা।
যে আলোয় পথ চিনে নেয়া যায় না
যে অন্ধকারে খুঁজে পাওয়া যায় না পথের নিশানা

সেই অস্বস্তিকর আলো-আঁধারিতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে
আমাদের মৃত্যু তিক্ত দিন
আমাদের মৃত্যু তিক্ত রাত্রি।

এই ভয়ংকর, অমোঘ নেমেসিসের করাল গ্রাসে আমরা সকলে নিপতিত, কিন্তু:

তবু যখন দেখি
শ্রান্ত সাম্পান মাঝির চোখে
হঠাৎ ঝলসে ওঠা

সিন্দবাদের চোখের বিস্মৃত দুর্গতি
তখন আমি আশ্বস্ত হই।
আমি বিশ্বাস করি।
ইসলামের প্রাণ প্রবাহ আবার যাবে ছড়িয়ে
দুনিয়ায় এই প্রান্ত থেকেই সারা জাহানে।
(আঠারো : হাবেদা মরুর কাহিনী)

শেষ পঙ্‌তিটি লক্ষ করার যোগ্য যে, দুনিয়ায় এই প্রান্ত থেকেই সারা জাহানে ইসলামের প্রাণ প্রবাহ আবার যাবে ছড়িয়ে। এ আবার কী উদ্ভট বিশ্বাস কবি-চিত্তে উথলে উঠল? এমনিতেই নৈরাশ্যের ঘনান্ধকার? কিন্তু আলো ফুটবে আবার হেন এক হারানো দিগন্ত হতেই- তা কী ভাবে সম্ভব? না এ-কোন প্রগলভ খেয়ালিপনা নয়, রবং শান্ত আত্মবিশ্বাস, আত্মসত্তা সম্পর্কিত 'বাকা-বিল্লাহ' পর্যায়ে উপনীত এবং ধ্যাননেত্রে স্ফুরিত তার আত্মরূপ দর্শনই এই বিশ্বাসের ভিত্তি, যথা-

সমস্ত ঘুমন্ত শিশুকে বুকে নিয়ে/যখন ঘুমিয়ে পড়ে পৃথিবী
শূন্যে ভাসমান এক বিশাল দেলনার মত/তখন জেগে থাকে শুধু ধ্যানীর দৃষ্টি
অতন্দ্র তারাদের সাথে/রাত জাগা পাখিদের সাথে
স্বপ্নে দেখে সে* হাবেদা মরুর প্রান্তরে/এক নতুন ভোরের,
স্বপ্ন দেখে এক নতুন যুগের/দুচোখ বেয়ে যখন নেমে আসে
দু'ফোঁটা শিশির বিন্দু/দুনিয়ার সব দৌলতের চেয়ে কিম্মতী
সকলের চেয়ে দামী।**(ছেচল্লিশ: হাবেদা মরুর কাহিনী)**

* চিহ্নিত এই সে কে? আমাদের সিদ্ধান্ত তিনি স্বয়ং কবি। মধুসূদনের সঙ্গে তাঁকে আমরা তুলনা করেছি। মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ' কাব্য কবির শক্তি সামর্থ ও উর্ধগতির যে ঝলসানো রূপের ধারক তাঁর সর্বশেষ সৃষ্টি 'মায়াকানন' তাঁর দেউলিয়াত্বের দর্পণ রূপে তাঁর ফতুর দশার অভিজ্ঞান রূপে উত্থান ও পতন নির্দেশ করছে। কিন্তু ফররুখের ক্ষেত্রে এই সাদৃশ্য টানার প্রস্তাব আমরা করি না। কারণ 'হাবেদা মরুর কাহিনী' 'মায়াকাননের' মত ফতুর নয় কিংবা হালকাও নয়। 'হাবেদা মরুর কাহিনী' একটি নিরাভরণ সার্থক রূপক কাব্য। আগাগোড়া এক সীটিংয়ে বসে

দারুন ঔৎসুক্যে এটি পড়তে হয়। আমাদের স্বকাল এতে এমনিরূপে অংকিত যা রূপকে-প্রতীকেও হুবহু তাই। এটি একটি পৃথিবীর রূপকাশ্রয়, একটি সরর রেখায় খচিত, মাত্র একটি ভূষণে ভূষিত। একে 'সাত সাগরের মাঝি'র ভূষণ পরানো অনেকটা অবান্তর। ফররুখ যেহেতু যথাযথ কালচেতনায় প্রাজ্ঞ তাই তিনি তা পারেন না। এখানে কবির প্রতিভার ফতুরত্ব আবিষ্কার নিরর্থক। 'যেমন নূণ-পানি, তেমন কাম জানি' এই হচ্ছে দক্ষ রাঁধুনির বচন। 'যেমন কাল তেমনি তার রূপাংকণ' দক্ষ কবিরই কাজ। যথা উত্তুঙ্গ 'বলাকা' রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছেন 'পুনশ্চ' কাব্য সাদামাটা গদ্যে, কালের সঙ্গে তাল ঠুকে। তেমনি 'সাত সাগরের মাঝি'র কবিও স্বকালের সঙ্গে ঘরোয়া গদ্যের মিতালি পেতেছেন 'হাবেদা মরুর কাহিনী'তে একটি মাত্র কারণেঃ

যেন বঞ্চিত বনি আদমের দীর্ঘশ্বাস/রূপ নিতে পারে শান্তির প্রশ্বাসে
যেন এই তৃষাতপ্ত হাবেদার মরু মাঠ/আবার হতে পারে
সুন্দর শান্তিময় মাটির জান্নাত/দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য
দুনিয়ার সকল মানবীর জন্য। **(উনপঞ্চাশ : হাবেদা মরুর কাহিনী)**

এই গ্রন্থের শেষ কবিতার একেবারে শেষাংশ হতে উদ্ধৃতি নিয়েছি, কবির অশেষ শুভ কামনা, বলিষ্ঠ আশাবাদ, মানবমুক্তির দুর্জয় স্বপ্নসাধের সকল উপকরণই এখানে আছে। এশিয়ার বিশ কোটি জনতা অধ্যুষিত একটি সভ্যমণ্ডলের মুখ্য কবিকণ্ঠরূপে তার এই উচ্চারণ খুব সহজেই বলে দেয় যে, ইনি 'ফররুখ আহমদ'। আমরা তাই কবির মরণোত্তর কালে প্রকাশিত এ কাব্যগ্রন্থকে ফররুখের একটি শ্রেষ্ঠ রূপক কাব্য রূপেই গণ্য করতে চাই।

কবির স্নেহভাজন উত্তরসূরি জনাব মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ গ্রন্থটির সুদীর্ঘ ভূমিকায় এ কাব্যের একটি সুস্পষ্ট ত্রুটি নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন : "মুক্ত ছন্দের কবিতা রচনার ক্ষেত্রে এ শব্দ নির্বাচনের ব্যাপারে অমনোযোগ কিংবা অসতর্কতা কবিতার সুশৃঙ্খল অন্তর প্রকৃতিকে ক্ষুণ্ন করতে পারে। কারণ, গদ্য কবিতার ছন্দ যদিও সুনির্দিষ্ট কিংবা নিরূপিত ছন্দ নয়, তাহলেও ছন্দস্পন্দন (রিদম) এবং যাকে বলা যেতে পারে ছন্দের অন্তঃপ্রবাহ, কিংবা চোরাস্রোত, তা-ও শব্দ নির্বাচনের এই অসতর্কতা ও অমনোযোগের কারণে বিশেষভাবে ব্যাহত হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। ফররুখ আহমদের মতো শব্দ-সচেতন, ভাষা-ব্যবহারে দক্ষ কবির ক্ষেত্রেও যে এমনটি না ঘটেছে, এমন নয়। 'হাবেদা মরুর কাহিনী'তেও তিনি বক্তব্য প্রকাশের অকারণ ঝোঁকে অনেক অকাব্যিক ও নিতান্ত গদ্যাত্মক শব্দ ব্যবহার করেছেন। কবির বদলে হয়ে উঠেছেন বক্তা। তারপর তিনি তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে উদ্ধৃত করেছেন নীচের পঙ্‌ক্তিগুলো :

যেদিন থেকে আমরা নিয়েছি

ঈমানে পরিবর্তে বে-ঈমানী
একতার পরিবর্তে অনৈক্য,
আর শৃঙ্খলার পরিবর্তে বিশৃঙ্খলা
(কদর্য উচ্ছৃঙ্খলা)
শুরু হয়েছে সেদিন থেকেই
আমাদের চূড়ান্ত দুর্গতি।

কবিতাটির ক্রমিক নম্বর বার। উপরের উদ্ধৃতির পর চার ছয়টি পঙ্ক্তির শেষে কবিতাটি শেষ হয়েছে এভাবে–

যে হাত বিলিয়ে দিত সারা দুনিয়ার বুকে
বেশুমার চুনি, পান্না, জমরুদ, জওহেরাতে
সে হাত এখন অন্যের দরজায় কৃপাপ্রার্থী
দুনিয়ার বুকে যে ছিল শ্রেষ্ঠ বন্টনকারী দাতা
সে আজ ভিক্ষা চায় কান্না করুণ কণ্ঠে
একটি সামান্য তামার পয়সা।

কোন বিচারেই উদ্ধৃত ও শেষাংশ অকাব্যিক নয়; বরং সেতারের আলাপ ও মীড়ের আয়াস সাধনের পর বৃষ্টিমুখর ঝালার মত শেষ পঙ্ক্তিগুলো কানে অনশ্বর সঙ্গীতের রবে বাজতে থাকে । বেদনা ও নৈরাশ্যের দারুণ ঘূর্ণাবর্ত রচনাকারী এ-কবিতাটির শেষাংশের সূচনার আলাপ তাই সাদামাটা গদ্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ-তো বরং এক শিল্প কুশলতাই বটে।

তবু কথা থাকে। এ-কাব্যের দুর্ভাগ্য এই যে প্রাথমিক পাণ্ডুলিপি নির্মাণের বার বছর পর কবির ইন্তেকালের পরে এটি প্রকাশিত হয়। তাই তিনি এর উৎকর্ষ বর্ধনের কোন সুযোগ পান নি। একটানে লিখে ফেলে গেছেন, তাই কুড়িয়ে এখন প্রকাশ করা হচ্ছে। যদি 'ফররুখ আহমদ প্রকাশনা বোর্ড' নামক কোন সেল থাকতো তবে কবির হয়ে কিছু পরিমার্জনা করা অধিকারী সেই সেটির হতে পারতো। এখন তাঁর আকরিক পর্যায়ের লেখা সংগ্রহ করে অতি উৎসাহে বিনা মার্জনায় তা প্রকাশ করা একরূপ অপরাধ। আমরা জানি প্রেসের ছাপা বন্ধ করেও বড় লেখকেরা পাণ্ডুলিপি কাটা-ছেড়া করে থাকেন। ফররুখ জীবিত থাকলে কি তাই করতেন না?

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা ১০ম সংখা, অক্টোবর-২০০৪]

# 'সাত সাগরের মাঝি' ফররুখ

আল মুজাহিদী

আপন ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার ভেতর কোনো বীরত্ব বা শৌর্য-বীর্য নেই। বরং ঐতিহ্যকে স্বীকার করে সংরক্ষণ করার ভেতর জাতীয় মর্যাদা (National pride) অর্জিত হতে পারে। "বিশ্বের পূর্ববর্তী সফলজীবন মিলিয়া আমার এই জীবন সৃষ্টি করিয়াছে।" [বিপিন চন্দ্র পাল/সত্তর বৎসর]

আপন ঐতিহ্যে সশ্রদ্ধ হতে পারলে বিশ্ব-সংস্কৃতি যেখানে এসে মিলে যেতে পারে। সম্পৃক্ত হতে পারে মানবজাতির অন্তর্বর্তীকালীন আবহমান কালের সংস্কৃতি। এর সঙ্গে নতুন দিনের সংস্কৃতি ভবিষ্যৎ দিগন্ত সম্প্রসারিত হতে পারে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'চিঠি পত্রে' লিখেছেন ঃ "পিতৃত্ব যে অস্বীকার করতে চাইবে, যে বলবে ঐতিহ্য বলে কিছু নেই - তাকে আমি অসভ্য অমানুষ বলব।"

ফররুখ বাংলা কাব্য ভুবনের অন্যতম প্রধান বাসিন্দা - তিনি আপন ঐতিহ্যের হাজার দুয়ারি বালাখানার ভেতর বসবাস করেছেন। মানব-অস্তিত্ব ও সংস্কৃতি ঐতিহ্যের ভেতরেই যে রয়ে গেছে জীবনের রসদ সকল বৈভব রক্ষার স্বার্থেই সকলকেই বারবার ফিরে যেতে হয় স্ব-ঐতিহ্যের কাছে। সভ্য, সংস্কৃতি প্রাণের প্রাণনের জন্যে। এখানে ফররুখ স্বতন্ত্র ও অনন্যপূর্ব। টি, এস এলিয়েট তাঁর কাব্য সৃষ্টিতে যে জীবন চর্যার অনুশীলন করেছেন, ফররুখ বাংলা কবিতায় সেই ধারাটি যোজনা করেছেন সার্থক রূপকার হিসাবে।

কবির অন্তর্উদ্যানে কালের 'ক্রেদজ কুসুম' অংকুরিত হয়, প্রস্ফুটিত হয়। জাতিক ও বৈশ্বিক বিষ ও বিষাদ কবির অন্তরের অন্তঃস্থলে একটি প্রকট প্রবাহ সৃষ্টি করে - কবির এই কাব্যিক বাস্তবতাকে মেনে নিতে হবে আমাদের। আমরা আমাদের জাতীয় রুচি ও প্রগতিচিন্তার স্রোতকে সঠিক খাতে বইয়ে দেয়ার ইতিবাচকতা অর্জন করতে কবির সমর্পণকে হাত পেতে গ্রহণ করতে পারি। এটাই হবে শিল্পধারার স্বাভাবিক বিকাশের পথে সম্পূর্ণ বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ। জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির এবং বস্তুপুঞ্জের একটা সাক্ষাৎ সন্নিকট সম্পর্ক গড়ে ওঠে কেননা কোনোভাবেই এই জাগতিক সহ-অবস্থানকে অস্বীকার করা যায় না। বরং এই সম্পর্ক উপলব্ধি করে নিয়েই একজন কবিকেও জীবনযাপন করতে হয়। এই প্রাকৃতিক ও জাগতিক অনিবার্য অবস্থানের দোরকোঠায় দাঁড়িয়েই শিল্পের বোদ্ধাদের শিল্পবিচার করতে হয়। শিল্পতত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে হয়। এর বাইরে কবির কাজ বিচারের কাঠগড়া আর কোথায়? যেখানে একজন কবিকে দাঁড় করানো যাবে। কবির ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ভগ্নাংশ নিজের ঝোলায় তুলে নিয়ে তাঁর কবিতা বিক্ষিপ্ত, ভঙ্গ-বিভঙ্গ ক'রে উপভোগ করা সম্ভবপর নয়। শিবনারায়ণ রায় কবি আল মাহমুদের কবিতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন,

"কবির ব্যক্তিগত বিশ্বাসের অংশভাগ অথবা তাঁর বিবিধ ক্রিয়াকলাপের সমর্থক না হয়েও তাঁর কবিতা উপভোগ করা সম্ভব বলেই আমি মনে করি। অনুভবের সততা, কল্পনার মৌলিকতা, শব্দ ব্যবহারের দক্ষতা, উপমা ও ব্যঞ্জিত বাকপ্রতিমার উদ্ভাবনা শক্তি যার কবিতায় প্রত্যক্ষ- তার বিশ্বাস ও ব্যবহার যাই হোক না কেন তাঁর কবিতায় সাড়া দেওয়া কাব্যানুরাগীর পক্ষে স্বাভাবিক।"

অধুনা দেখা যায়, কোনো কোনো অতিউন্নাসিক নিজ দেশ, নিজ জাতি, নিজ সংস্কৃতি, নিজ ধর্ম, নিজ ইতিহাস এবং নিজ ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে বসে। আর এরাও সংস্কৃতি-পাপীদের সনদ-সমর্থন আদায় করে যেতে থাকে। এদের এই অমানবিক, অনতিলক্ষ্যের যোগানদারেরা সংস্কৃতির জ্বালানি কাঠও পোড়াতে থাকে আদ্যোপান্ত। এদের মূল্যায়ন হয় অন্যভাবে, অন্যতর পন্থায়। যেখানে অপ-মৌলবাদের ধুয়া ওঠানো হয় না। কেবল এই কালক্ষেপণ না করে এই একপেশে, সংকীর্ণ- সংস্কৃতিবাদী অপোগণ্ডদের একটি সংগত, সমাজনিষ্ঠ জরিপ কর্ম সম্পাদন করা অতি জরুরি হয়ে পড়েছে এখন।

যে-কবি জাতীয় শক্তির আধার, যে-কবি সমাজ সত্তার অভিপ্রেরণা, যে-কবি মানব-অস্তিত্বের ব্যাখ্যাতা, যে-কবি মানবতাবাদ ও বিশ্বাসবাদের অভিযাত্রিকতার মহান জঙ্গম পুরুষ - তার হিরেখচিত শিল্পশৈলির মূল্যায়ন সময়ের বিবর্তনিক ধারায় স্বাভাবিকভাবেই হয়ে যাবে। এখানে বিশ্বাসের অস্পষ্টতা থাকা সমীচীন নয়। ঐতিহ্যবাদ বিরোধীদের চিন্তার কোটরেও এ স্বচ্ছতা দিন দিন সৃষ্টি হচ্ছে।

ঐতিহ্যকে জীবন সন্ধানের মূল উপজীব্য করে ফররুখ সত্যসন্ধানীর মতো অগ্রসর হয়েছেন। "পুরাতন নিয়মকে উপেক্ষা করিয়া, পুরাতনের উপর পা না ফেলিয়া নতুনে যাওয়া যায় না।" শরৎচন্দ্রের এই উক্তির শরণ নিয়ে বলা যায়, নূতনের দরোজায় পৌঁছুতে হলে পুরাতনের ওপর ভর করেই যেতে হয়। 'কোনো বড় জিনিসই কখনো নিজের অতীতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে, নিজের শক্তির প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে হয় না - হবার জো-ই নেই। শরৎচন্দ্রের এ কথারও শরণ নেবো আমরা।

আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু তাঁর 'আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ' নিবন্ধে বলছেন : "বর্তমান কালের জীব অনন্তের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। তাহার পশ্চাতে যুগযুগান্তর ব্যাপী ইতিহাস ও সম্মুখে অনন্ত ভবিষ্যৎ।"

ইতিহাসের আলোকপথে অতীত জেগে থাকে বর্তমান কালকে ভবিষ্যতের পথে বহুদূরগামী করার লক্ষ্যে। দার্শনিক কনফুসিয়াসও বলেছিলেন -

'We must study the loast,
If we would want to divine our future'

"হুইটম্যানের যেমন 'দি সং অফ দি সেলফ', বোদলেয়রের যেমন 'লা ভয়েজ', নজরুলের যেমন 'বিদ্রোহী', ফররুখ আহমদের তেমনি 'সাত সাগরের মাঝি'তে কবিচিত্তের সুগভীর স্বরূপ অপূর্ব রস ও রূপের মহিমায় উদ্‌ঘাটিত করেছে। 'সাত সাগরের মাঝি'র নেই প্রাক-নজীর-এটিও দৈব প্রতিভার সৃষ্টি।"

কবি আবদুল কাদিরের উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে ফররুখ আহমদের কবি-প্রতিভার শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করা যায়। আমরা কবিচিত্তের অন্তরূপ ও আন্তরূপের অন্তস্থলে প্রবেশ করার সুযোগ পাবো এখানে। আবদুল কাদির ফররুখ কে 'দৈব প্রতিভার সৃষ্টি' বলে চিহ্নিত করেছেন। ফররুখ আহমদ শিল্পের স্বাতন্ত্র্যের ও সাতত্যের এক সার্থক স্রষ্টা। তাঁর শিল্পের তাঁত তাঁর সারা জীবন প্রবাহে বহমান।

ঐতিহ্য চেতনা যে জীবন চৈতন্যের নামান্তর - ঐতিহ্যে আস্থা ও প্রবল বিশ্বাস ফররুখের হৃদয় ছিল পরিপূর্ণ-পরিপূত একেবারে প্লাবিত। কিন্তু তাঁর কাব্যদেহে ধাতব পদার্থের অগ্নি-আভা ছিল অতি অল্প। তাঁর কবিতার পঙ্ক্তিমালায় ছিল ঐতিহ্যের হিরন্ময় বিভা ও বৈভব। আপন সংস্কৃতির নির্যাসটুকু তিনি গ্রহণ করেছিলেন আকণ্ঠ। জড়জগৎ ও জীবনের স্থবিরতা ও ভঙ্গুরতা আপন আশ্চর্য শক্তিতে অতিক্রম করে গিয়েছেন স্বকল্প ও স্বশব্দময় ভাষায়।

ফররুখের কাব্যে যে বিশ্বাসের আতিশয্য দীপ্তমান- সে বিশ্বাস তাঁর ব্যক্তি জীবনের মর্মমূলে প্রথিত ছিল স্বপ্নকে দূরগামী করেছেন তিনি দূর-বলয়ের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে। কিন্তু তিনি বাস্তবের মর্তভূমিতে অবিরাম নিজেকে আত্মস্থ রেখেছেন। আপন ঐতিহ্যের শেকড়ে অবস্থান রেখেছেন। কবি ফররুখ আহমদের জীবন-বীক্ষণ ও এষণায় 'ঐতিহ্যবাদ' ও 'মানবতাবাদ' তাঁর শিল্পের বিরাট ভূখণ্ড দখল করে আছে। তিনি চল্লিশের দুর্ভিক্ষ নিয়ে শিল্পশৈলীমন্ত কবিতা রচনা করেছেন। মুমূর্ষু মানুষের কঙ্কালকরটিকে অলঙ্কৃত করেছেন জীবনবেদ্য শব্দবিভূতি দিয়ে। শিল্পের সকল নিরিখেই ফররুখ আহমদ সর্বতোভাবে মানবতাবাদী কবি। স্বদেশভূমির ধুলোবালি দিয়ে প্রকৃতি ও নৈসর্গের রং-বর্ণ-বিভা-আলো-বাতাস-হরিৎ উদ্ভিদ-গুল্মরাজী দিয়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন এক মৃন্ময়ী, মায়াবী, মর্ত্য-স্বর্গলোক।

ফররুখ আহমদের পৃথিবী এক স্বতন্ত্র পৃথিবী। ফররুখ আহমদের পৃথিবী এক অলোকসুন্দর পৃথিবী। কখনো ধূসরভ। কখনো হরিতাভ। কখনো নক্ষত্রখচিত নীলিমার হাজার দুয়ারী উজ্জ্বল অলিন্দ নির্মিত বিম্বিত ভুবন। তাঁর কাব্যই কখনো মর্ত্য, কখনো স্বর্গ।

আর্তবিবর্তমান-চলমান কবি ফররুখ আহমদ কখনো পৃথিবীর বস্তুর বাহ্য-বিড়ম্বনায় চিন্তা-পীড়িত হননি। জীবন ও জগতের নৈরাশ্যে কখনো মূর্ত্যমান হননি। বরং স্থিতধী ছিলেন সমাজ সংকটের বিপন্ন মুহূর্তে। কবি ফররুখ আহমদ বাংলা কাব্য ভুবনের শীর্ষচুম্বি এক প্রজ্ঞাবান কবি। শিল্পসত্তার ঋদ্ধবন্দতায় এবং স্বাতন্ত্র্যে ফররুখ আহমদ অনন্যপূর্ব। শিল্পের বিচারে তাঁর কবিতা স্বমাতৃক। রোমান্টিক ও ধ্রুবপদিক। কবির সামনে থাকে তাঁর নিজ সমাজ, নিজ সম্প্রদায়, নিজ মাটি ও নিজ মানুষ। নিজ জনগোষ্ঠীকে বিশ্বমানব সমাজের সঙ্গে যিনি শরিক করতে পারেন তিনি মহান শিল্পী। কোন শিল্পই স্বয়ম্ভু, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বতঃশুদ্ধ নয়। তবে স্বয়ম্ভুর দিকে, সম্পূর্ণতার দিকে, স্বতঃশুদ্ধতার দিকে শিল্পীর যাত্রা নিরন্তর। এ যাত্রায় রয়ে যায় তাঁর জীবনের সংগ্রামের স্বেদকণা, রক্তমাংসের অনিবার্য অনুবাদ। সুবিশাল লোকায়তিক জীবনের ঐতিহ্য ও দিনানুদৈনিক সকল

অবস্থানের অস্তিত্ব জেনে থাকে অবিচ্ছেদ্য হয়ে। শিল্পের জন্য জীবনের-জগতের 'ঘরোয়া-জড়োয়া' জহরত-মরকত—অন্যদিকে ধুলোবালি, খড়কুটো, উলুখাগড়া, ইট-সুরকি, 'রাবিশ' সর্বোপরি তৃণমূল সবই জরুরি। তবে শিল্পী তাঁর শৈল্পিক মৌলতা খুঁজে পান তাঁর নিজের ভেতরই। সে কারণে নিজের ভেতরটা বেশ ভালোভাবে বারবার যাচাই করে নিতে হয় জহুরীর মতো। অধুনা জীবনকে জানার মাধ্যম বেড়ে গেছে। ধাতব মাধ্যমের সম্প্রসার ঘটছে প্রতিক্ষণ। একজন 'পেইন্টার'ও এখন নানা 'মেটালিক মিডিয়া'য় অভ্যস্ত। যেমন আয়রন কাস্টিং (Iron Casting), ব্রোঞ্জ কাস্টিং (Bronze Casting), সিলভার কাস্টিং (Silver Casting), গোল্ড কাস্টিং (Gold Casting), কপার (Copper Casting) ও জিংক কাস্টিং (Zinc Casting) -এছাড়াও ধাতব মাধ্যমের আরও কিছু স্তর রয়েছে। শিল্প-প্রগতি ও সভ্যতার বহুধাবিধ বিবর্তনিক বিক্রিয়ায় শিল্পের প্রাণবায়ু যেমন বিভক্ত হয়ে উঠেছে, তেমনি বিষাক্ত-বিপ্লুত। সেই ধাতব ঐশ্বর্যে ফররুখ কখনো নিজেকে সমৃদ্ধমান করতে যাননি। বরং নিখিল আস্তির 'পরমানন্দে' (ecastay) যোগ দিতে প্রয়াস করেছেন নিরন্তর।

ফররুখ কাব্যের জড়তা-জাঠ্যতা ভেঙে ফেলে দিয়ে নতুন রক্তস্রোতে স্পন্দ্যমান করলেন বাংলা কবিতার শারীর কাঠামো। তাঁর কবিতার ষড়যন্ত্র যোজিত হল নতুন শহর-নতুন শব্দ শনন। ডেকাডেন্স-এর অচলায়তন ভেঙে দিয়ে ফররুখ কাব্যদেহে স্পন্দিত হতে লাগলো রুধির জীবন্তধারা। অনেকদিন ধরে যা ছিল স্থবির-ভঙ্গুর সেই কবিতাদেহে ফররুখ সঞ্চালন করলেন নতুন রক্তপেশীর ধারা।

এশিয়ার এপ্রান্তে, বাংলাদেশে কাব্যে ফররুখ ঐতিহ্য, আন্তর্জাতিক মিথ ও ঐতিহাসিক জীবনগাথার মিথক্রিয়া প্রয়োগ করে বাংলা কবিতাকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জীবিত করলেন। ত্রিশের পরে এ ধারাটি খুবই সচল সুজীবন্ত একটি গতিরেখ। জীবনযুদ্ধে সংগ্রামী মানুষের অভিযাত্রা তো বিরাম বিশ্রামহীন। এর সংগ্রাম কখনো থেমে যাবার নয়। স্তব্ধ হয়ে যাবার নয়। রক্তচক্ষুর ভ্রুকুটি, বিদ্বেষ-অপমান, পীড়ন-নিপীড়ন কখনো দ্রোহী আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না। ফররুখ আহমদের ব্যক্তি-সত্তা ও কবি আত্মাকে কোনো দাঁতাল শক্তি দংশন করতে পারেনি। কেননা 'মানুষের চরম সত্তা' কে উঁচুস্তম্ভে স্থাপন করেছিলেন ফররুখ। কবি প্রশ্ন তুলেছেন, কোন ইবলিস 'মানুষেরে' 'মৃত্যুপাকে' ফেলে 'পরিহার' করে? মানুষের 'পৈশাচিক লোভ' বিলোপ করছে 'শাশ্বত মানবসত্তা' মানুষের প্রাপ্য অধিকার। "স্ফীতদের বর্বর সভ্যতা- এ পাশবিকতা, শতাব্দীর ক্রুরতম এই অভিশাপ" দিন রাত্রির পৃথিবী ও আকাশকে বিষমথিত করে তুলছে। ফররুখের এ বিদ্রোহ-গোটা পৃথিবীর বিদ্রোহ সারা পৃথিবীবাসীর জন্য। তার তেরশো পঞ্চাশের ওপর রচিত 'লাশ' কবিতাটি আমার এ বক্তব্যের অগ্নিস্মারক। আমার এ সংক্ষিপ্ত লেখাটি কবি ফররুখের কাব্যসত্তার প্রধান দিকচিহ্ন নির্ধারক কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতা নিয়েই সীমাবদ্ধ থাকবে।

ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি' (১৯৪৪) প্রথম প্রকাশিত হওয়ার সংগে সংগেই বাংলার কাব্যাকাশে প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল। এ ঝড়ে বজ্র-বিদ্যুৎ, আলো-অন্ধকার

জেগে উঠেছিল। সাত সাগরের পথে, দুর্যোগের ঘনঘটায় লক্ষ তারার ঝলকানি লেগেছিল।

**সাত-সাগরের মাঝি**

কত যে আঁধার পর্দা পারায়ে ভোর হ'ল জানিনা তা'।
নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা।
দুয়ারে তোমার সাত-সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা।
তবু জাগলে না ? তবু তুমি জাগলে না ?
সাত-সাগরের মাঝি চেয়ে দেখো দুয়ারে ডাকে জাহাজ,
অচল ছবি সে, তস্‌বির যেন দাঁড়ায়ে রয়েছে আজ।
হালে পানি নাই, পাল তার ওড়ে নাকো,
হে নাবিক ! তুমি মিনতি আমার রাখো ঃ
তুমি উঠে এসো, তুমি উঠে এসো মাঝিমাল্লার দলে
দেখবে তোমার কিশ্‌তী আবার ভেসেছে সাগর জলে,
নীল দরিয়ায় যেন সে পূর্ণ চাঁদ,
মেঘ-তরঙ্গ কেটে কেটে চলে ভেঙ্গে চলে সব বাঁধ।
তবে তুমি জাগো, কখন সকালে ঝ'রেছে হাস্‌নাহেনা
এখনো তোমার ঘুম ভাঙলো না ? তবু তুমি জাগলে না ?

দুয়ারে সাপের গর্জন শোন নাকি ?
কত অসংখ্য ক্ষুধিতের সেথা ভিড়,
হে মাঝি ! তোমার বেসাতি ছড়াও, শোন;
নইলে যে সব ভেঙে হবে চৌচির।

তুমি দেখ্‌ছোনা, এরা চলে কোন্‌ আলেয়ার পিছে পিছে ?
চলে ক্রমাগত পথ ছেড়ে আরো নিচে।
হে মাঝি ! তোমার সেতারা নেভেনি একথা জানো তো তুমি,
তোমার চাঁদনি রাতের স্বপ্ন দেখছে এ মরুভূমি,
দেখ জমা হ'লো লালা, রায়হান তোমার দিগন্তরে;
তবু কেন তুমি ভয় পাও, কেন কাঁপো অজ্ঞাত ডরে !
তোমার জাহাজ হয়েছে কি বানচাল ?
মেঘ কি তোমার সেতারা করে আড়াল ?
তাই কি অচল জাহাজের ভাঙা হাল,
তাই কি কাঁপছে সমুদ্রে ক্ষুধাতুর

এ দেশের চিত্রকর কামরুল হাসান ফররুখের মৃত্যুতে লিখেছিলেন-"...প্রায় সকলের চোখের অন্তরালে থেকেই তিনি চির অমরত্বের লীলাভূমিতে চলে গেলেন, চলে গেলেন বিনা নোটিশেই। কবি ফররুখ আহমদ বাংলাদেশের সাহিত্যিক জগতে

যেমন ছিলেন একক এবং অদ্বিতীয়, তেমনি ছিলেন বিতর্কের উজানে শক্ত পেশীবহুল বৈঠা মেরে নৌকা বেয়ে যাওয়ার নাইয়া।"

সাত সাগরের মাঝিকে ফররুখ ডাকছেন। আহ্বান জানাচ্ছেন। 'প্রবাল দ্বীপের নারিকেল শাখা' বাতাসে নিক্কন ধ্বনি তুলছে। 'নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা।' রাত্রির ঝড়ের কালো উচ্ছৃঙ্খলা তো এক সময় শেষ হয়ে যাবে; কবি তাঁর সাত সাগরের মাঝিকে আত্মার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছেন। দিব্য জাগরণের। জেগে ওঠার।

"বাতাসে ফাঁপানো তোমার ও ফাঁকা পাল ?
জানিনা, তবুও ডাক্‌ছি তোমাকে সাত দরিয়ার মাঝি,
প্রবাল দ্বীপের নারিকেল শাখা বাতাসে উঠেছে বাজি'।
এ ঘুমে তোমার মাঝি-মাল্লার ধৈর্য নেইকো আর,
সাত সমুদ্রে নীল আক্রোশে তোলে বিষ ফেনভার,
এদিকে অচেনা যাত্রী চলেছে আকাশের পথ ধ'রে
নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা।
বেসাতী তোমার পূর্ণ করে কে মারজানে মর্মরে ?
ঘুমঘোরে তুমি শুনছো কেবল দুঃস্বপ্নের গাঁথা।
উচ্ছৃঙ্খল রাত্রির আজ্যে মেটেনি কি সব দেনা ?
সকাল হ'য়েছে। তবু জাগলে না ?
তবু তুমি জাগলে না ?

তুমি কি ভুলেছ' লবঙ্গ ফুল, এলাচের মৌসুমী,
যেখানে ধূলিতে, কাঁকরে দিনের জাফরান খোলে কলি,
যেখানে মুগ্ধ ইয়াস্‌মিনের শুভ্র ললাট চুমি'
পরীর দেশের স্বপ্ন-সেহেলি জাগে গুলে বকাওলী !
ভুলেছ' কি সেই প্রথম সফর জাহাজ চ'লেছে ভেসে
অজানা ফুলের দেশে,
ভুলেছ' কি সেই জামরুদ-তোলা স্বপ্ন সবার চেখে
ঝলসে চন্দ্রালোকে,
পাল তুলে কোথা জাহাজ চ'লেছে কেটে কেটে নোনা পানি,
অ-শ্রান্ত সন্ধানী
দিগন্ত নীল-পর্দা ফেলে সে ছিঁড়ে
সাত সাগরের নোনা পানি চিরে চিরে।

কোন্‌ অজ্ঞাত বন্দরে এসে লাগলো সেই জাহাজ
মনে পড়ে নাকো আজ,
তবুও সেখানে ভ'রেছে জাহাজ মারজানে মর্মরে
এইটুকু মনে পড়ে।"

কবি এখানে একটি স্বাপ্নিক আবহও সৃষ্টি করেছেন। এক কাব্যিক অনিবার্যতায়। নান্দনিক অমোঘতায়। রাত্রির আঁধারের গিলাফ বিদীর্ণ করে শুকতারা জেগে উঠেছে। আবার রাত্রিশেষে প্রত্যুষের আলো ফুটে উঠেছে। 'অশ্রান্ত-সন্ধানী' সাত সাগরের মাঝিকে দিব্য দৃষ্টি মেলে দেখতে আহ্বান জানাচ্ছেন 'অজ্ঞাত', অজানা কোন বন্দরে জাহাজ এসে নোঙর ফেলেছে-দিগন্তের নীল-পর্দা ছিঁড়ে ফেলে, সমুদ্রের নোনা পানি চিরে চিরে।'

ফররুখের নাবিক কোনো মৃত্যুর বন্দরে নোঙর করেনি। জীবনের বন্দরে পৌঁছানোর যাত্রায় ছিলো চির ভ্রাম্যমাণ। নাবিকের ভ্রাম্যনতা সুদূরের পথে। এবং দূরের লক্ষ্যে।

কবে যে তোমার পাল ফেটে গেছে উচ্ছৃঙ্খল ঝড়ে,
তোমার স্বপ্নে আজ অজগর দুঃস্বপ্নেরা ফেরে !
তারা ফণা তোলে জীর্ণ তোমার মৃত্যুর বন্দরে
তারা বিষাক্ত করেছে তোমার নুয়ে পড়া আকাশেরে।

তবু শুন্‌বে কি, তবু শুনবে কি সাত-সাগরের মাঝি
শুকনো বাতাসে তোমার রুদ্ধ কপাট উঠেছে বাজি;
এ নয় পরীর দেশের ঝরোকা নারঙ্গী বন্দর
এবার তোমার রুদ্ধ কপাটে মানুষের হাহাকার,
ক্ষুধিত শিশুর কান্নায় শেষ সেতারের ঝংকার !

আজকে তোমার পাল ওঠাতেই হবে,
ছেঁড়া পালে আজ জুড়তেই হবে তালি,
ভাঙা মাস্তুল দেখে দিক করতালি,
তবুও জাহাজ আজ ছোটাতেই হবে।

কে জানে কখন কেটেছে তোমার স্বপ্নমুগ্ধ রাত,
আজকে কঠিন ঝড়ের বাতাস দ্বারে করে কশাঘাত,
সর্প-চিকন জিহ্বায় তার মৃত্যুর ইঙ্গিত,
প্রবল পুচ্ছ আঘাতে তোমার রঙীন মিনার ভাঙে।
হে মাঝি ! তবুও থেমো না দেখে এ মৃত্যুর ইঙ্গিত,
তবুও জাহাজ ভাসাতে হবে এ শতাব্দী মরা গাঙে।
এখানে এখন রাত্রি এসেছে নেমে,
তবু দেখা যায় দূরে বহুদূরে হেরার রাজ-তোরণ,
এখানে এখন প্রবল ক্ষুধায় মানুষ উঠছে কেঁপে,
এখানে এখন অজস্র ধারা উঠছে দু'চোখ ছেপে
তবু দেখা যায় দূরে বহুদূরে হেরার রাজ-তোরণ....

কাঁকর বিছানো পথ,

কত বাধা, কত সমুদ্র, পর্বত,

কবি সতত শুনতে পেয়েছেন মানুষের আর্ত-হাহাকার। ক্ষুধিত শিশুর ক্রন্দন, সেখানেও 'শেষ সেতারের ঝংকার'। কঠিন ঝড়ের বাতাস দ্বারে দ্বারে কশাঘাতের শব্দ শুনতে পেয়েছেন কবি। মৃত্যুর ইংগিত দেখেও তো নাবিক থেমে যেতে পারে না। তাকে উত্তুঙ্গ তরংগমালা অতিক্রম করে যেতেই হবে। 'শতাব্দীর মরা গাঙে' জাহাজ ভাসাতেই হবে। নাবিকের কোনো পিছুটান থাকতে পারে না। যাত্রা পথের মধ্যদিনে পিশাচের হামাগুড়ি দেখে নাবিক তো ভীত-সন্ত্রস্ত হতে পারে না।

মধ্যদিনের পিশাচের হামাগুড়ি,
শকুনি ফেলেছে ছায়া আমাদের মাথার উপরে উড়ি',
ফেলেছি হারায়ে তৃণঘন বন, যত পুষ্পিত বন,
তবু দেখা যায় দূরে বহুদূরে হেরার রাজ-তোরণ....
শাহী দরজার সকল কপাট অনেক আগেই খোলা,
অনেক আগেই সেখানে দ্বাদশী জোছনা দিয়েছে দোলা।

হে মাঝি ! তোমার নোঙ্গর তুল্‌বে না ?
এখনো কি আছে দেরী ?
হে মাঝি ! তোমার পাল আজ খুলবে না ?
এখনো কি তার দেরী ?

বাতাসে কাঁপছে তোমার সকল পাল
এবার কোরো না দেরী,
নোনা পানি যদি ছুঁয়েছে তোমার হাল
তাহলে কোরো না দেরী,
এবার তা'হলে বাজাও তোমার যাত্রার জয়ভেরী,
আসুক যাত্রী পথিক, হে মাঝি এবার কোরো না দেরী।

দেরী হয়ে গেছে অনেক জানো তা তুমি,
ফিরে গেছে কত জাহাজ-ভাসানো দরিয়ার মৌসুমী,
কত এলাচের দানা উড়ে গেছে ঝড়ে
দারুচিনি-শাখা ভেঙেছে বনান্তরে,
মেশ্‌কের বাস বাতাশ নিয়েছে লুটি'
মৃত্যু এখন ধ'রেছে তোমার টুঁটি,
দুয়ারে জোয়ার ফেনা ;
আগে বহু আগে ঝরেছে তোমার সকল হাস্‌নাহেনা।
সকল খোশবু ঝরে গেছে বুস্তানে,
নারঙ্গী বনে যদিও সবুজ পাতা—

তবু তার দিন শেষ হয়ে আসে ক্রমে—
অজানা মাটির অতল গভীর টানে

দরিয়ার মৌসুমী বাতাস অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কবির চোখে এটাও তো দীপ্তমান যে 'দারুচিনি-শাখা ভেঙেছে বনান্তরে।' 'দুয়ারে জোয়ার ফেনা এসে পড়েছে। তবু মাঝি প্রতিহত করেই তার যাত্রা অব্যাহত রাখবে। এখানে আবার ফিরে এসেছে কবির রোমান্টিক মনের এক 'সবুজ স্বপ্ন ধূসরতা'। কী এক অনাবিল আশ্চার্য, স্বভাবত আততির আবহ।

সবুজ স্বপ্ন ধূসরতা ব'য়ে আনে
এ কথা সে জানে
এ কথা সে জানে।

তবু সে জাগবে সব সঞ্চয়ে নারঙ্গী রক্তিম,
যদিও বাতাসে ঝরছে ধূসর পাতা ;
যদিও বাতাসে ঝ'রছে মৃত্যু হিম,
এখনো যে তার জ্বলে অফুরান আশা ;
এখনো যে তার স্বপ্ন অপরিসীম।

হে মাঝি! এবার তুমিও পেয়োনা ভয়,
তুমিও কুড়াও হেরার পথিক-তারকার বিস্ময়,
ঝরুক এ ঝড়ে নারঙ্গী পাতা, তবু পাতা অগণন
ভিড় করে-যেথা জাগছে হেরার রাজ-তোরণ।

সে পথে যদিও পার হতে হবে মরু
সে পথে যদিও দরিয়ার নোনা পানি
তবুও সে পথে আছে মঞ্জিল, জানি আছে ছায়াতরু
পথে আছে মিঠেপানি।

তবে পাল খোলো, তবে নোঙ্গর তোলো ;
এবার অনেক পথ শেষে সন্ধানী !
হেরার তোরণ মিলবে সমুখে জানি।
তবে নোঙ্গর তোলো
তবে তুমি পাল খোলো,
তবে তুমি পাল খোলো ॥

নাবিকের প্রতি উদাত্ত আহ্বান কবির-নোঙর তোলার, পাল খুলে কপিকাল সাজানোর। কোথায় হেরার তোরণ ? দূরে, বহুদূরে, সুদূরে...।

তবুও জীবনের মহান গন্তব্যে পৌঁছাতে দৃঢ়কল্প, দৃঢ় প্রাণ হতে হবে। এটাই ছিলো মানবিক ও প্রাতস্যিক প্রয়াস কবি ফররুখ আহমদের।

আমরা সততই লক্ষ্য করে থাকবো ফররুখের ঐতিহ্য-বিশ্বাস ছিলো প্রবল। এতে মধ্যবিত্তের কোনো মানসিক-পীড়ন থাকার কথা ছিলো না। কিন্তু এখানে এটা স্বকপোলকল্পিত বুদ্ধিপাপীদের ভেতর কেমন শেকড় গেড়ে রয়েছে। কোনো বিশ্বাসবাদ কবির জন্যে অপ্রীতিকর কিছুই নয়। তার পাশে তো বিজ্ঞান রয়েছে, সমাজ রয়েছে, রাষ্ট্র রয়েছে আনুগত্যের নয়-সেখানে কবির বিশ্বাসবাদ কোনোই অনুদার ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না। বরং তার ব্যক্তিগত অথবা আত্মগত ভূগোলখানি দখল করে বসবাস করে সমাজের আর সকলের মতোই। ফররুখের 'ধর্ম-বিশ্বাস' কিংবা 'বিশ্বাসবাদ' সমাজের কারুর জন্যে কোনো ক্ষতির বা বিনাশের কারণ হতে পারে না, কোনোক্রমেই। অত্যন্ত উদার, গণতান্ত্রিক এবং সামাজিক পৃথিবীতে 'ধর্মাধিকার' বা 'বিশ্বাসতন্ত্র' প্রাতিস্বিক মর্যাদা ও সম্মান অর্জন করেছে। এ কারণেই এখানে কোনো পথের যে কোনো ধরনের বাড়াবাড়িই বাতুলতা মাত্র। একজন কবির কাছে তার কবিতাই আমাদের আরাধ্য। কবির বিকল্প কবিতা। এ মানবিক-সহিষ্ণুতা যেখানে অনুপস্থিত সেখানে কোনো কবির কাব্যিক সান্নিধ্যের সুষমার সুধা কোনো পানপাত্র ঠাঁই পেতে পারে না। কবিতা 'মানবিক নির্মাণ', সেখানে 'বিশ্বাসতন্ত্রের' জারকরস কবিতার নির্যাস, বিশুদ্ধ সুধারসকে কখনো অপাঙক্তেয় করে তুলতে পারে না। ফররুখ আহমদ শিল্পের সকল আঙ্গিক, অর্থে, মাত্রায় একজন বিশুদ্ধ কবি। কাব্যের এই বিশুদ্ধতা কবির আত্মাকে কখনো পঙ্কিলাবর্তে নিক্ষেপ করতে পারে না। বরং বারবার পবিত্র শিখর স্পর্শের জয়াশায় উচ্চকিত করতে পারে। কবির হৃদয়তন্ত্রীকে নিরন্তর ঝংকৃত হতে থাকে বেটোফেনের বিরল সিম্ফনির ঝংকারধ্বনি। কবির হৃৎবারিধি বক্ষে নৃত্যপর শুধু তরঙ্গরাজি। অনিন্দ্য অলোক মাতাল ইন্দ্রিয় স্পর্শনে একজন কবি সতত ব্যাকুল। সেই কবিকে বিশ্বাসাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করা - একেবারেই দণ্ডনীয় অপরাধ। আমাদের উদার, উন্মুক্ত মানসিকতা কখনো কি এরকম মিথ্যা অভিযোগ থেকে কবিকে মুক্ত করতে পারবে না ? এ প্রশ্ন আমি সংকীর্ণবাদী অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধে উত্থাপন করছি। ফররুখ আহমদের সমগ্র কাব্যচৈতন্য যে বিশ্বাসবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত সেটা মানবিক অনুসান্ধিৎসার সহজ সরলীকরণ। এখানে অন্য কোনো অনির্বচনীয়তার জটিল ঘূর্ণাবর্ত নেই। সেই নিরিখেই ফররুখ আহমদের শিল্পবিচারের অমোঘতা দাবি করে।

ফররুখ আহমদের জীবনবাদ ও কাব্যিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্বের কাছে সমস্ত বৈরীশক্তির পরাভব ঘটছে। এটা আজ দিনের আলো-উদীচীপ্রভার মতো সত্য-জাজ্বল্যমান। ফররুখ সমুদ্রশক্তির কবি। সূর্য-কিরীটের কবি। ঝড়-ঝঞ্ঝা, মেঘ-বিদ্যুৎ বাহনের কবি। সে কবি কখনো নিঃসঙ্গ-নির্জন বিজিত নয়, বরং বার বার বিজয়ী। বিজয়ের শিরোপা তাঁরই উচ্চশিরে শোভা পায়।

ফররুখ বাংলা সাহিত্যের শক্তিশালী স্রষ্টা। আমাদের কাব্যভুবনের এমন একজন মহত্তম পুরুষকে আমরা একসময় অনাহার আর উপোসে বেয়ে মৃত্যুর দোর গোড়ার দিকে ঠেলে দিয়েছি। জানি না আমাদের এ 'ভ্রান্তিবিলাস', অপনেয় অপরাধ ক্ষমার্হ কি না !

ফররুখ আহমদের ৮৪তম জন্মদিনে আমি এ মানবিক ইশতেহার পাঠ করতে

চাইছি, "ইতিহাস, হে কালের কাঠগড়ার বিচারক ফররুখের মৃন্ময় মানবদেহের হত্যাকারীদের একবার শুধু ক্ষমা করো। উচ্চারণ করো ক্ষমার বাণী।"

ফররুখ আহমদের গতিময় জীবন ছিলো। সমুদ্র সংসর্গের জীবনাদর্শ ছিলো। কেবল জীবনাদর্শের জন্যেই কি তাঁকে বিবেচনাহীন যূপকাষ্ঠে বলির বস্তু কিংবা নিমিত্ত হতে হবে। জীবনাদর্শই কি তাঁর একমাত্র অপরাধ ? নাকি তার শিল্পের ঐন্দ্রজালিক অনন্যপূর্ব শক্তি ? এই সত্যান্বেষা, এই মানবিক হিতৈষণাকে কোনো অসুর-দানবীয় শক্তিই কখনো কোনদিনই ধ্বংস করতে পারে না। ফররুখ কাপালিক কালের ভ্রূদৃষ্টি উপেক্ষা করেই সমুদ্র-জাহাজে মাস্তুলে পাল খাটিয়ে মহানাবিকের মতো যাত্রা করেছেন তাঁর এ যাত্রা সমুদ্র থেকে সমুদ্রে। তাঁর কালের কারাভার গন্তব্য আলোকোজ্জ্বল অনির্দিষ্ট অথবা নির্দিষ্ট কোথাও। সুদূরের ঐ বন্দর তাঁর তারার মঞ্জিল। ফররুখ আহমদ আমাদের সংস্কৃতির রাজপুত্র, রাজন্য পুরুষ। তাঁর তুলনা-প্রতিতুলনা ফররুখ নিজেই। আমাদের আধুনিক কাব্যধারায় পথ নির্মাণে ফররুখ আহমদ, নিঃসন্দেহে একজন প্রতিভূপুরুষ। ফররুখ ঐতিহ্যবাদী, জীবনবাদী এবং স্বকীয় সংস্কৃতিবাদী কবি। তাঁর চেতনার মৃত্তিকা উজ্জ্বল, প্রোজ্জ্বল এবং সতত প্রাণবন্ত। হাসান হাফিজুর রহমার বলেছেন, "ঐতিহ্যবোধ ফররুখ আহমদের মজ্জাগত। ঐতিহ্যবোধে উজ্জীবিত হতে না পারলে ফররুখ আহমদ লিখতেও পারেন না। ঐতিহ্যের জগতই তাঁর স্বাভাবিক জগত।" ঐতিহ্যের স্পন্দনের মধ্যে গোটা পৃথিবীর সভ্যতার চক্রনেমি ঘূর্ণায়মান। ঐতিহ্যের পেন্ডুলাম স্তব্ধ হ'য়ে গেলে মানব প্রগতি-ধারাও স্থবির হয়ে পড়বে। ফররুখ তাঁর জীবন দিয়ে সেটার স্বাক্ষর রেখে গেলেন।

কোনো রকমের ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা এবং শূন্যতাবোধ ফররুখ আহমদকে আক্রান্ত করতে পারেনি। সময়ের নির্মমতাকে সংহার করতে চেয়েছেন তিনি। কারণ সময়ের মুহূর্তগুলো নানা আবর্তে পীড়িত, পিষ্ট এবং পিত্তপরিকীর্ণ। T.S. Eliot তাই স্পষ্ট করে বলেছেন :- "Our time is not corrupt particularly, to my mind, all times are corrupt" ফররুখ বাংলা কবিতার ভুবনে এবং জীবন কক্ষে নিরন্তর শুদ্ধতা এবং স্বর্গীয়তার যোজনা করেছেন। আমরা এ ক্ষুদ্র, বিনীত নিবন্ধটির উপসংহার টানবার আগে বলবো- "My words fly up, my thought remain below words without thought never to heven go." -Shakespeare : (Hamlet, Act III, Scene III). ❐

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, সপ্তদশ সংখ্যা, জুন-২০০৯]

# একজন শনাক্তকারী কবি

## মুহম্মদ নূরুল হুদা

ফররুখ আহমদের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব বোধকরি এই যে, তিনি নিজেকে যথার্থভাবে শনাক্ত করতে পেরেছিলেন। একজন প্রকৃত শিল্পীর জন্যে এই শনাক্তকরণের বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি। এই শনাক্তকরণের ফলেই একদিকে তাঁর শিল্পী-সত্তার দ্রুত স্ফুরণ ঘটে, অন্যদিকে তিনি তাঁর পরিপার্শ্বের মধ্যে নিজের ভূমিকাটি যথার্থভাবে চিহ্নিত করার সুযোগ পান। জ্ঞাতে হোক অজ্ঞাতে হোক, ফররুখ কবি-জীবনের শুরুতেই এই কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন বলে মনে হয়।

ফররুখের শনাক্তকরণের বিষয়টি কয়েকটি স্তরে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত, তিনি নিজেকে শনাক্ত করেছেন সৃষ্টির একটি স্পন্দমান অংশ হিসাবে। দ্বিতীয়ত, তিনি একজন ব্যক্তি-মানুষ হিসাবে নিজের ব্যক্তি-সীমাকে শনাক্ত করেছেন, তৃতীয়ত, একজন শিল্পীকে কবি হিসাবে তিনি তাঁর শিল্প-সীমাকে শনাক্ত করেছেন; এবং সবশেষে একজন সামাজিক মানুষ হিসাবে নিজের ভূমিকা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছেন।

ফররুখের প্রথম উপলব্ধিটি অবশ্যই দর্শন-সঞ্জাত, নিজেকে সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার মধ্যে উপস্থাপনা করাটাই তো একজন দার্শনিকের কাজ। ফররুখ দার্শনিক ছিলেন না কোনো মতে। কিন্তু তাঁর উপলব্ধিতে দর্শনের ছায়াপাত ছিল স্পষ্টভাবেই। তবে 'প্রশ্নে প্রশ্নে বিদ্ধ' হওয়ার চেয়ে সারবান সত্যের কাছে নত হওয়াই যেহেতু তিনি শ্রেয় বলে জানতেন, সেহেতু তাঁর কবিতায় বা তাঁর দর্শন-চিন্তায় দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। অর্থাৎ ফররুখ আহমদ শুরুতেই নিজেকে শনাক্ত করেছিলেন একজন বিশ্বাসীরূপে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এই বিশ্বাসের মর্যাদা অটুট রাখার সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। এর ফলে তাঁকে কম মূল্য দিতে হয়নি। কিন্তু ফররুখ যেহেতু বেছে নিয়েছিলেন সাধনার দুরূহ দুর্গম পথ, সেহেতু তাঁর ফেরার পথ ছিল বন্ধ। জিকিররত ডাহুকের মতো ফররুখ, তাই, আজীবন আত্ম-সত্তার বিশ্বাসী গান গেয়ে গেয়ে নিজেকে বৃহত্তর সৃষ্টির একটি সচেতন ও স্বতোৎসারিত অংশ হিসাবে উপলব্ধি করে গেলেন। কোনো লৌকিক সাফল্যের প্রত্যাশী হলেন না।

ফররুখের দ্বিতীয় সাফল্য আগেই বলেছি, তিনি একজন ব্যক্তি মানুষ হিসাবে নিজের ব্যক্তি-সত্তাকেও শনাক্ত করতে পেরেছিলেন। যে যুগে কবি শিল্পীদের প্রধান প্রবণতা ছিল নিজেকে না চেনার ভান করা, সে যুগে ফররুখের এই প্রত্যয়দীপ্ত আত্মবিশ্লেষণ স্বভাবত বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। বহিরঙ্গে ক্লাসিক পরিমিতির পরিচয় বিধৃত থাকলেও ফররুখ আহমদের কবিতার অন্তরঙ্গ রোমান্টিকতার বাঁধনহারা

প্রবাহ। আর রোমান্টিকতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে নিজেকে না চেনা। ফররুখ নিজের পরিচয়কে শনাক্ত করার সৎসাহস দেখিয়ে এই সব প্রবহমান প্রবণতারই বিরুদ্ধাচরণ করেননি, পক্ষান্তরে নিজের আসনটিও স্পষ্টতই স্বতন্ত্র করে তুললেন। শনাক্তকারী হিসাবে প্রথমে তিনি শনাক্ত করেছিলেন স্রষ্টার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। অতঃপর তিনি শনাক্ত করলেন সৃষ্টির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। স্বজাতি ও স্বগোত্রের মানুষের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করলেন এবং কোনোরূপ দ্বিধা ব্যতিরেকেই তিনি তাঁর ব্যক্তি-জীবন স্পষ্ট করে তুললেন। বলাবাহুল্য, ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে শনাক্ত করার ক্ষেত্রে ফররুখ যে জিনিসটির উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন বলে মনে হয়, সেটি হলো একটি বিশেষ আদর্শবাদ। কোনো ভৌগোলিক সীমার সংকীর্ণতার ভিতর আবদ্ধ থেকে কেবল প্রকৃতির বন্দনা বা বর্ণনার মাধ্যমে দেশীয় ঐতিহ্যের কবি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করার প্রবণতা, এ কারণেই ফররুখের মধ্যে অনুপস্থিত। তিনি যে আদর্শবাদে বিশ্বাস করেছিলেন, তা দেশ ও কালের সীমাকে অতিক্রম করে যুগ যুগ ধরে দেশে দেশে জীবন্ত। ফররুখ এই জীবন্ত আদর্শের নিরিখে নিজের ব্যক্তিক পরিচয়কে তুলে ধরেছিলেন একজন সংস্কারমুক্ত ধার্মিক হিসাবে। তিনি তাঁর জাতির, তাঁর আদর্শভুক্ত লোকদের গৌরবময় অতীতের পাশাপাশি হতাশাক্লিষ্ট বর্তমানের স্বরূপ সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। তাই তিনি অতীতকে উজ্জীবিত করার কথা বলে প্রকারান্তরে বর্তমানেরই পুনঃনির্মাণে ব্রতী হয়েছেন। ফলত, ফররুখ নিজের ব্যক্তি-ভূমিকা শনাক্ত করতে গিয়ে নিজেকে কতকাংশে একজন সংস্কারক হিসাবেও চিহ্নিত করেছেন আসলে ফররুখ সারাজীবনই নীরব সাধনার মধ্যে একধরনের গোপন সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করেছেন ।

ব্যক্তি-সত্তাকে শনাক্ত করতে গিয়েই ফররুখ প্রকারান্তরে নিজের শিল্পী-সত্তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর প্রধান কারণও সেই আদর্শবাদ। একজন আদর্শবাদীর কাছে একজন মানুষের দু'মুখো পরিচয় থাকতে পারে না। সর্বাবস্থায় সর্বক্ষেত্রে সর্বকাজে একজন আদর্শবাদী একটি অভিন্ন সূত্রে নিজের সবকিছুকে গ্রথিত করে রাখেন। একজন নিবেদিতপ্রাণ আদর্শবাদী হিসাবে ফররুখও তাই করেছেন। ফররুখ জীবনে যা করেছেন তার সবটাই সেই আদর্শের প্রচার ও প্রসারের জন্য। ফলত, ব্যক্তি ফররুখের সঙ্গে কবি ফররুকের খুব বেশি ফারাক নেই। যেটুকু আছে সেটুকু না থাকলে তো এই দুই অভিধায় তাঁকে তুলনা করা সম্ভব হতো না। অথচ শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাধারণত এমনটি ঘটে না। যে কোনো বিখ্যাত শিল্পীর জীবন বিচার করলে দেখা যায় তাঁর ব্যক্তি-জীবন, কর্ম-জীবন ও শিল্পী-জীবনের মধ্যে বৈচিত্র্যপূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান। এরফলে একজন কবি বা শিল্পীর জীবনী বেশ চমকপ্রদ ও রসালো হয়ে ওঠে। কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এরফলে একজন শিল্পীর মধ্যে সামগ্রিক জীবন-চিন্তার ঐক্যসূত্র খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। কথায়, কাজে ও শিল্পে অসঙ্গতির কারণে প্রায়শ তাঁর মূল্যায়নের সামগ্রিক প্রচেষ্টাটি ব্যাহত হতে থাকে। ফররুখ এরকম সমস্যা থেকে মুক্ত। এরফলে যেটিকে আপাতত

নেতিবাচক দিক বলে মনে হতে পারে সেটি হলো এই যে, ফররুখের জীবন বৈচিত্র্যহীন। কিন্তু এই তথাকথিত বৈচিত্র্যহীনতাই বলা যায়, ফররুখের ব্যক্তি-জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল–বিভিন্নতার মধ্যে নয়, একটি একক অকৃত্রিমতার মধ্যেই তিনি নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। তাই তাঁর জীবন আলোচনা করলে দেখা যায়–প্রক্রিয়াটিকে জীবনাচরণে তিনি কখনো বহির্মুখী ছিলেন না। ফলত তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর প্রচার হয়েছে অত্যন্ত কম-কবি হিসাবে স্বীকৃত হয়েও সামাজিক প্রতিষ্ঠার স্বর্ণশিখরে আরোহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি তাঁর পক্ষে।

কেউ কেউ বলবেন, ফররুখ চরিত্রের এই অন্তর্মুখী প্রবণতা আসলে এক ধরনের পলায়নপরতা! আমাদের মতে ফররুখ চরিত্রের এই দিকটিকে অন্যদিক থেকে বিবেচনা করলে একটি বৈশিষ্ট্যমূলক গুণ হিসাবে চিহ্নিত করা চলে। অবশ্য এর জন্য যেটি বিশেষভাবে প্রয়োজন, সেটি হলো তাঁর সাহিত্যকর্মের মূল সুরটিকে অনুধাবন। আমরা দেখেছি ফররুখ নিজের সমাজ-পরিবেশকে শনাক্ত করতে গিয়ে জীবনের শুরুতেই এই পরিবেশকে ভোগ-সর্বস্ব বস্তুবাদী জড় সভ্যতার একটি অভিশপ্ত পরিবেশ হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। অতঃপর সারাজীবন তিনি তাঁর কাব্যকর্মে নানাভাবে নানাভঙ্গিতে নানাআঙ্গিকে এ বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করে এই পরিবেশ থেকে মুক্তিলাভের উপায় অন্বেষণ করেছেন। ফররুখের কাছে এই মুক্তির অন্যতম পথ হচ্ছে, এই ঘৃণিত পরিবেশকে এড়িয়ে চলা এবং মানুষের মহত্তম প্রবৃত্তিগুলোর জাগরণ অত্যাসন্ন করে তোলা। আর এ কারণেই এই বাহ্যিক সভ্যতার প্রচার-সর্বস্ব পরিবেশ থেকে স্বেচ্ছায় নিজেকে নির্বাসিত করেছিলেন। এ স্বেচ্ছা-নির্বাসন আসলে তাঁর নীরব বিদ্রোহেরই নামান্তর।

একজন সামাজিক মানুষ হিসাবে ফররুখের আত্মশনাক্তকরণও উপরোক্ত কারণে সবিশেষ তাৎপর্যবহ। তিনি নিজেকে যে সমাজের লোক হিসাবে শনাক্ত করেছিলেন, ভাব-লোকেই তার অস্তিত্ব ছিল; তার অস্তিত্ব ছিল না যুগের বর্তমানে, তার অস্তিত্ব ছিল না তাঁর চারপাশের ঢিলে-ঢালা ব্যক্তিক বন্ধনের মধ্যে। কিন্তু তাই বলে, তিনি ছিলেন না কোনো বৈদিক ঋষি বা ভক্তিপরায়ণ সুফী। ধ্যানলোকে লালিত .যে আদর্শবাদী সমাজব্যবস্থায় তিনি একজন নিমগ্ন সাধক, তাতে ছিল না কোনো অন্ধ সংস্কার, ছিল না কোনো ধর্মের গোঁড়ামি। তাই তো তাঁর কবি-জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সৃষ্টির নাম 'হাতের তা'য়ী', প্রাক-ইসলামিক যুগের একজন সত্যান্বেষী মানবতাবাদী হিসাবেই যাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। আরো একটু এগিয়ে বলা যেতে পারে ফররুখ আহমদ ও হাতেম তা'য়ী দুই যুগের হয়েও একযুগের, দুই ভিন্ন ব্যক্তি হয়েও আসলে একই ব্যক্তি। ফলত, ফররুখ নিজেকে সর্বাংশে শনাক্ত করেছেন একজন বিশুদ্ধ মানবতাবাদী হিসাবেই এই পরিচয়ের কাছে অন্যসব পরিচয় নিতান্তই তুচ্ছ। ◘

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, বিংশ সংখ্যা, অক্টোবর ২০১০-জুন ২০১১]

# ফররুখ আহমদ ঃ তিনি কেমন কবি

## ডক্টর মাহবুব হাসান

ফররুখ আহমদ কেমন কবি? প্রশ্নটা হাস্যকর। কেননা, কবিতার পাঠক মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলামের পর ফররুখ আহমদকেই বিশিষ্ট চিহ্নে চিত্রিত করেছে। সে সব মন্তব্য নিশ্চয় পাঠকের অধীত। অতএব 'কেমন কবি' ফররুখ আহমদ এ প্রশ্ন বালসুলভ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম যে মৌলিকত্ব নির্মাণ করেছেন, ফররুখের মৌলিকত্ব তাদের ধারা-স্নাত না হলেও কক্ষ বহির্ভূত নয়। 'ফররুখ আহমদ প্রথম থেকেই 'তিমির বিদারী কবি'–এ মন্তব্য কবি-সমালোচক আবদুল মান্নান সৈয়দের। এ মন্তব্য 'হে বন্য স্বপ্নেরা' কাব্যগ্রন্থ প্রসঙ্গে। "উত্তরকালে ফররুখ আহমদের কবিতার কেন্দ্রীয় স্বর হিসেবে যা পরিচিহ্নিত– ইসলামী পুনরুজ্জীবন, পুঁথির পুনর্ব্যবহার, আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার, অতীতচারিতা"-এ মন্তব্যও আবদুল মান্নান সৈয়দেরই। ফররুখ আহমদের কবিতা-জীবন শুরু হয়েছে ১৯৩৬-৩৭ সালে। 'হে বন্য স্বপ্নেরা' সে সময়কার কবিতার সংকলন। তিনি যে পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিলেন সেখানে বলা হয়েছে এ গ্রন্থের কবিতাগুলোর রচনাকাল ১৯৩৬-৫০ সাল। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "সাত সাগরের মাঝি" প্রকাশ পায় ১৯৪৪ সালে। আর প্রথম পরিকল্পিত পাণ্ডুলিপি 'হে বন্য স্বপ্নেরা' প্রথম প্রকাশ পায় তার মৃত্যুর পর ১৯৭৬ সালে কবি-সমালোচক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর সম্পাদনায়। 'হে বন্য স্বপ্নেরা'র কথা আগে বললাম এজন্যে যে, এ গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলো 'উত্তরকালে পরিচিহ্নিত কবি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে একেবারে মেলে না। তার সেই প্রথম পর্যায়েও ফররুখ ছন্দময়। এ সময় গদ্য-ছন্দের প্রবল প্রতাপ চলছে। কিন্তু দেখা যাবে ফররুখ কবিতা লিখছেন ছন্দ-মিলিয়েই, এমন কি তখনি তাঁর প্রবল ঝোঁক সনেটীয় সংগঠনের কবিতা রচনায়। তবে ধ্রুপদের দিকে টান সত্ত্বেও এ কাব্যেও ফররুখ প্রবল রোমান্টিক। বাস্তবতা ও রোমান্টিকতার মিশেলে 'হে বন্য স্বপ্নেরা' ফররুখ কাব্যে এক ভিন্ন স্বতন্ত্র মর্যাদায় আসীন। **[আ. মা. সৈয়দ ফ-র রচনাবলী-২-এর ভূমিকা]**

ক. জননীর সম্ভ্রম লুটানো ধূলিতলে,  
শিশুর কান্নার বেগে শান্ত করি দিল মৃত্যু ঘুম।  
নাগরিক আঘাতের বর্শা আর রুখিল না জলে  
অগর্জন শবদেহে তুলিল সে মৃত্যুর মৌসুম।

**[পদ্মার ভাঙ্গন]**

খ. নীল স্রোতে ভাসমান সংখ্যাহীন জয়ের স্বাক্ষর  
বন্দরের রশি ছিঁড়ে শুরু হল নতুন সফর।

**[জোয়ার]**

নাগরিক জীবনবোধ সব সাময়িককালের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষত, দুর্ভিক্ষের করাল থাবার সঙ্গে পরাক্রমশালী রোমান্টিক হাহাকার ছাপিয়ে স্বপ্নময় চেতনার ছাপ লক্ষ্য করা যায় 'হে বন্য স্বপ্নেরা'য়। ফররুখের অন্য কাব্যগ্রন্থের নামের পাশে এ গ্রন্থের নামও চমক সৃষ্টি করার মতো। ঐতিহ্য শাসনের লালিত ধ্রুপদী মননের অধিকারী ফররুখের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও ধর্মীয় উপলব্ধি অনুশাসন ও রিচুয়ালের সঙ্গে খাপ খায় না এ নাম। তারপরও আমরা যদি নিবিড় অধ্যয়নের ভেতর দিয়ে কবিতাগুলোর পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, দেখবো–ফররুখ আহমদ তাঁর জীবন ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ-বেষ্টিত। অর্থাৎ পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মদর্শনজাত সত্তার অন্তর্গত শব্দপুঞ্জ তাঁর মননধর্মে নিহিত ছিল। তাঁর 'যৌবসেনা' 'মধুমতী তীরে', 'নাবিক', 'নৈরাজ্য' 'শূন্য মাঠ', 'মরা ঘাস', 'কালো দাগ', 'শাহেরজাদী' প্রভৃতি কবিতায় ব্যবহৃত পঙ্‌ক্তিগুচ্ছ তাঁর মানস-প্যাটার্ন আমাদের নতুন কাব্যধারার ইঙ্গিত দেয়। তিনি যে মুসলিম ঐতিহ্যের দিকে ঝুঁকবেন বা তাঁর নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে আত্মস্থ হবেন, 'হে বন্য স্বপ্নেরা'র কবিতায় ব্যবহৃত শব্দে মন্দে তার পরিচয় প্রস্ফুটিত।

ফররুখ আহমদ সম্পর্কে অন্যান্যের মতামত উদ্ধৃত করা যাক। কবি-সমালোচক মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ লিখেছেন, "সাহিত্য ক্ষেত্রে একজন রোমান্টিক কবি এবং সুদক্ষ সনেটকার হিসেবেই ফররুখ আহমদের আবির্ভাব এবং প্রথম প্রতিষ্ঠা, তা হলেও তাঁর কাব্যসাধনার শ্রেষ্ঠতর ফসল তিনি উপহার দিয়েছেন মুসলিম ঐতিহ্য, বিশেষ করে পুঁথি সাহিত্যের নবব্যবহার ও রূপায়ণের মাধ্যমেই। এ পথেই তিনি অর্জন করেছেন কাব্যে 'প্রতীক' ও 'রূপক' ব্যবহারের কৌশল, কবিতার ভাষা, উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্পে প্রাণ-সজীবতা ও ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টির শৈল্পিক ধ্রুতি।" **[মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ : ফররুখের কবিতা : তার শিল্পরূপ]।**

সৈয়দ আবুল মকসুদের ভাষায়, "ফররুখ ছিলেন মৌলিক ও নিরীক্ষাধর্মী কবি। ইসলামের পুনর্জাগরণের কবি হিসেবে তাঁকে অভিহিত করা হয় এবং তা সঙ্গতভাবেই।" **[সৈয়দ আবুল মকসুদ : তাঁর স্বপ্নরাজ্যে তিনি একা]**

সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের বিবেচনায়, "ফররুখ আহমদের কবিতায় সমুদ্র মন্থনের শব্দ শোনা যায়। ... সুদূরপ্রসারী কল্যাণ, নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে আটল-বিশ্বাস, মুসলিম রেনেসাঁর দিগন্ত উন্মোচন, এসব তাঁর কবিতাকে চিহ্নিত করার জন্য তাঁর কাব্যসাধনার শুরু থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ...তাঁর কাব্যের মতোই, সমসাময়িক কাব্য আন্দোলনসমূহের সঙ্গে অসঙ্গতিজনিত। তার বড় কারণ ফররুখ আহমদ অত্যন্ত সচেতন শিল্পী। আত্মসচেতন ও স্বতন্ত্র।" **[সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম : কাল-সচেতন ফররুখ : তাঁর কবিতা]**

সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন, "কবিকে অবশ্যই তার বক্তব্যের জন্যে একটি প্রত্যয়যোগ্য ভাষা এবং ছন্দ আবিষ্কার করতে হবে। ফররুখের 'সাত সাগরের

মাঝি'–এর ভাষা বিষয়বস্তু উপস্থাপনার দিক থেকে বৈলক্ষ্যহীন এবং সুনিশ্চিত।"
**[সৈয়দ আলী আহসান : ফররুখ আহমদ]**

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ লিখেছেন ঃ "কবি জীবনের প্রথম স্তর তিনি সভ্যতার এ বিকৃত রূপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। দ্বিতীয় স্তরে এ পচনশীল গ্লানি ও মোহান্ধ আত্মহত্যা থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় নির্দেশ করেছেন। তাঁর মানসের ক্রমবিকাশ ধারায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে, তিনি ইসলামের ব্যাপক আদর্শের প্রতি ক্রমশই আসক্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁ মনের আগাছা-পরগাছাগুলো ক্রমেই উজাড় হয়ে পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছে ইসলামের সত্যিকার জ্যোতি ধারণের জন্যে।" **[দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ঃ বাংলা কাব্যে কবি ফররুখ আহমদ]** মাহবুবা সিদ্দিকী লিখেছেন, "প্রকৃতপক্ষে ইসলামী ঐতিহ্য এবং ইসলামী আদর্শের আলোকে জীবন বিকাশের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন ফররুখ আহমদ, তাতে ধর্মীয় চিন্তাধারা প্রবল থাকলেও তা সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণতার দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল না।"
**[মাহবুবা সিদ্দিকী : আধুনিক বাংলা কবিতা : ফররুখ আহমদ]**

কবি শামসুর রাহমান বলেছেন-"আরবি-ফারসি শব্দের সুনিপুণ ব্যবহার, পুঁথি সাহিত্য থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তিনি নিজস্ব একটা ডিকশন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন।"

আমাদের আলোচিত কবি তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, "বাংলা ভাষাকে যে ইসলামী ভাবধারার শ্রেষ্ঠ আধারে পরিণত করা যায় এ বিষয়েও আমার কোনো সন্দেহ নেই।"

উদ্ধৃতিমালা থেকে কবি ফররুখ আহমদের কাব্যিক চৈতন্য-আধার কোন কোন উপাদান এবং কিরূপ পরিগ্রহ করেছেন, তা সম্যক উপলব্ধি করা যায়। উদ্ধৃতি থেকে এবং অনুস্কৃত অনেক কাব্য-সমালোচকের মন্তব্য থেকেও ফররুখের মানস গঠনের পরিচয় মেলে।

নজরুল মিথ-ঐতিহ্য ব্যবহারে যে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তা তাঁর মানবিক সাংস্কৃতিক প্যাটার্নের সঙ্গে চলমান সমাজ প্রতিবেশের অন্তর্গত ছিলো বিধায় তিনি সফল হয়েছেন। 'হে বন্য স্বপ্নেরা'র কবিতা চলমান জীবনসত্য যতটা প্রকাশ পেয়েছে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিজস্ব জীবনসংস্কৃতির শব্দ পরিবেশ-সুষমা। তবে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি সর্বাঙ্গীণ আনুগত্য প্রকাশের সূচনা ঘটে 'সাত সাগরের মাঝি'র মধ্য দিয়ে। 'হে বন্য স্বপ্নেরা'র চৈতন্য আর 'সাত সাগরের মাঝি'র চৈতন্যে ঐক্য আছে মানবিকবোধের কিন্তু নির্মাণ-কৌশল ও উপমা-রূপক, চিত্রকল্পের পরিবেশ-পরিধি অনেকটাই ভিন্ন হয়ে গেছে। 'আজাদ করো পাকিস্তান' ১৯৪৬; 'সিরাজাম মুনীরা' ১৯৫২; 'নৌফেল ও হাতেম' ১৯৬১; 'মুহূর্তের কবিতা' ১৯৬৩; 'হাতেম তা'য়ী' ১৯৬৬ এবং 'অনুস্বার', 'কাফেলা' ১৯৮৬; 'ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক কাব্য' ১৯৯১; 'দিলরুবা' ১৯৯৪– প্রভৃতি কাব্যে তাঁর মানস পটভূমি চিহ্নিত ও চিত্রিত ইসলামী ও মুসলিম মনন-মনীষার পুনরুজ্জীবন বা রূপায়ণ পুঁথি-কাহিনীর নব

ভুবন নির্মাণের মাধ্যমে এবং তিনি লোকবাংলার নিরক্ষর জনসমাজের ধর্মচেতনার সারাৎসার উৎকীর্ণ করতে চেয়েছেন এবং এ কাজে তিনি সফল হয়েছেন।

ইসলাম ও মুসলিম জীবনচর্যা ফররুখ আহমদের নৈতিক মানবিক সৃজনী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ওতপ্রোত। এজন্যে ইসলামী ঐতিহ্যের কবি হিসেবে তাঁকে বিবেচনা করে সবাই, যেহেতু তিনি উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাই স্বাজাত্যবোধ তাঁর মধ্যে প্রগাঢ়ভাবে ছিলো। এসব কারণে তাঁর কবিতা বিচার করতে গিয়ে অনেকে তাঁকে মুসলিম মানসের প্রতিভূ কবি হিসেবে চিত্রিত করেন। সন্দেহ নেই, বিশ্বাস ও রিচুয়াল পালনের মধ্য দিয়ে ফররুখ আহমদ নিজেকে মুসলমান করে চিত্রিত করেছেন তেমনি শত শত বছরের মুসলিম ঐতিহ্যের সাংস্কৃতিক বোধসত্তাকে তিনি পুনর্নির্মাণ করে নতুন কবিতা সৃষ্টি করেছেন। সেই কবিতা বিচার করতে হলে লোকায়ত সাহিত্যের অর্থাৎ পুঁথি সাহিত্যের মুসলিম কিংবদন্তি সম্পর্কে জানা দরকার। জানা দরকার মিথ-কিংবদন্তি রূপকথা ইত্যাদি।

মিথ হচ্ছে আদিম দর্শন, লেজেন্ড আদিম ইতিহাস আশ্রিত আর রূপকথা আনন্দ উৎসবের কাহিনী–এ ব্যাখ্যা বার্ণিক রায়ের **[কবিতায় মিথঃ বার্ণিক রায় ঃ ১১]**। মিথের মধ্যে যুগের ভাষা ও সাংস্কৃতিক চৈতন্যে সমষ্টিগত অবচেতন ক্রিয়াশীল থাকে। এই ক্রিয়াশীলতা ও যুগভাষা লক্ষ্য করে কর্ডওয়েল একে বলেছেন কালেকটিভ ইমোশন বা সমষ্টিগত অনুভূতি। ফররুখ আহমদ যে বাংলা ভাষা সাহিত্যের মধ্যযুগী পুঁথিসাহিত্যের মিথ প্রবর্তনাগুলোতে ডুব দিয়েছিলেন, তার কারণ তাঁর ভেতরে বিপুলভাবে ক্রিয়াশীল ছিলো সমষ্টিগত অনুভূতি বা কালেকটিভ ইমোশন। "বিশ্বজগতের বস্তুর ছবির ছাপ বা চিত্রকল্প আর্কেটাইলের মতো আদিত ও আদিম মানুষের রক্তের মধ্যে আলোছায়া তৈরি করে। ঐ ছবিগুলোর মধ্যে অথবা ছবিগুলোই বাসনার অনুরাগে শক্তি হয়ে কাজ করে মানুষের অবচেতনে; এই ছবিগুলো ব্যক্তি মানুষের নয়, সমষ্টিগত মানুষের বলেই একটি দেশের ও জাতির। দেশ ও জাতির মিথের মধ্যে ভৌগোলিক কারণে ছবির স্পষ্টতায় পৃথক হতে বাধ্য।" **[বার্ণিক রায় ঃ কবিতায় মিথ : ১৫]**

আমরা যদি ফররুখ আহমদের সকল সৃজনের দিকে দৃষ্টি ফেরাই দেখবো পুঁথিবাহিত কাহিনীগুলো যে দেশ-কাল আর সমাজ থেকেই আহৃত হয়ে থাক না কেন, বাংলাদেশে এসে তার আকার আকরণ ও প্রতিবেশ পরিবেশ বর্ণনায় অনেকটাই পাল্টে গেছে। সমষ্টিগত অনুভূতির আনুকূল্য থাকলেও ফররুখ আহমদ তাঁর নিজস্ব জীবনদৃষ্টি দিয়ে উপমা ও প্রতীকের সাহায্যে তাকে একটি সর্বজনীন সত্যে নিয়ে গেছেন। কাহিনীর মধ্যে সঙ্কেত, তাৎপর্য, শব্দ ও ছবির প্রতীক এমনভাবে মিশে থাকে যে সেই মিলিত রূপের রহস্য সর্বত্র বিস্তার লাভ করে। মানুষের কল্পনা তখন বেহেশত দোযখ, আকাশ পাতালব্যাপী ঘুরে বেড়াতে দ্বিধাবোধ করে না। মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্যের মধ্যেও এ কালেকটিভ ইমোশনের সর্বজনীন প্রেক্ষণ লক্ষ্য করছি আমরা। 'হাতেম তায়ী' চরিত্রের শেষ কথায় দেখা যায় মানবধর্মবোধই অনন্য হয়ে উঠেছে

সন্ততিরা–আসে নাই যারা আজও পৃথিবীর বুকে/অস্পষ্ট আলোর মত দেখি আমি নিশানা যাদের/(দূর নীহারিকা লোকে), মুক্তি যেন পায় সে আউলাদ/সকল বিভ্রান্তি, পাপ, অত্যাচার অবিচার থেকে।/বহু খণ্ডে বিখণ্ডিত মানুষের বিচ্ছিন্ন সমাজে/সকল বিভেদ মুছে করে যেন শান্তির আবাদ/সকল বিশ্বাসী প্রাণ–ইনসানে কামিল। আর যারা /পড়ে আছে লুণ্ঠিত ধূলায়, নির্যাতিত সেই সব/মজলুমান পায় যেন বাঁচার অকুণ্ঠ অধিকার;/সব মানুষের সাথে জীবনের পূর্ণতার পথে/চল যেন যে মিছিল কেবলি সম্মুখে [হাতেম তা'য়ী]

হাতেম তা'য়ীর উচ্চারণ কি শুধু তার? না, এ উচ্চারণ বিশ্বমানবতায় বিশ্বাসী কবি ফররুখ আহমদের। আর কালেকটিভ ইমোশনের চৈতন্য প্রেক্ষিত থেকে এ বিশ্বাস বিশ্ব মানবসমাজের। এ থেকে প্রতীয়মান হয় ফররুখ আহমদ নিজ জাতি-ধর্মসত্তার উদ্বোধন প্রত্যাশী হয়েও সমষ্টিগত চৈতন্যের প্রেক্ষণ থেকে দূরে যাননি। তিনি লোকবাংলার লোকভাষা-ভঙ্গিকে গ্রহণ করলেও, পরিবেশ রচনায় উভয় প্রেক্ষাপট মনে রেখে শব্দ প্রয়োগ করেছেন।

একজন কবির মানস-প্যাটার্ন প্রকাশ পায় তার কবিতায় ব্যবহৃত শব্দপুঞ্জের ভেতর দিয়ে। সে হোক কালেকটিভ ইমোশনজাত, হোক নিজস্ব ধর্ম-সংস্কৃতি-দর্শনজাত, হোক পরিবেশ-প্রতিবেশজাত। আমি তাই ফররুখ আহমদের কবিতা থেকে শব্দপুঞ্জ উল্লেখ করবো, যা আমাদের লোকবাংলার জীবনাচারে নিত্যব্যবহৃত।

ক. ধূলির তুফান তুলি ওরা চলে রাত্রিদিন মরুর হাওয়ায়
ক্রমাগত ছায়া ফেলে ঘন জলপাই বনে, খেজুর শাখায়,
কোথায় চলেছে তারা কোন দূর ওয়েসিস কিংবা সাহারায়;
জানি না কোথায়? **[কাফেলা : কাফেলা]**

খ. ঘুমের সময় হ'ল রুদ্ধদ্বার। পাখি
উজাড় করিয়া সুর বনপ্রান্তে ফিরিছে একাকী
শূন্য নীড়ে।
কোন নীড়ে?
যেখানে মৃত্যুর ছায়া ঢাকিয়াছে সে পাখির সুর
প্রান্তরের শেষ সীমা যেথা হ'ল কাঁকর-বন্ধুর
রাত্রির পর্দায়
সব জ্বালা ঢেলে যেথা পড়ে আছে কঙ্কালের কামনা নির্বিষ
সেখানে ঘুমের পাখি, আবছায়া হয়ে আসে
তন্দ্রাতুর দোয়েলের শিস।। **[দোয়েলের শিস : হে বন্য স্বপ্নেরা]**

গ. শুধু গাফিলতে, শুধু খেয়ালের ভুলে
দরিয়া অথই ভ্রান্তি নিয়েছি তুলে,
আমাদেরি ভুলে পানির কিনারে মুসাফির দল বসি

দেখেছে সভয়ে অস্ত গিয়েছে তাদের সেতারা শশী;
মোদের খেলায় ধুলায় লুটায়ে পড়ি
কেঁদেছে তাদের দুর্ভাগ্যের বিস্বাদ শর্বরী। **[পাঞ্জেরী : সাত সাগরের মাঝি]**

ঘ. রক্ত শোষণের পালা চলেনি কি অব্যাহত আজও
এই পৃথিবীতে? সভ্যতা গর্বিত মন জনপদে
দেখে নাকি রাত্রিদিন সংখ্যাহীন যন্ত্র শোষণের
ষড়যন্ত্র বেড়াজাল শোষকের? দেখে নাকি চারপাশে
অনাহারক্লিষ্ট প্রাণ ভারগ্রস্ত মরে? মাটি মাঠ
কিম্বা অরণ্যের প্রান্তে ছিল যত কৃষাণ, সহজ
সরল জীবন নিয়ে প্রকৃতির মতন উদার,
উজ্জ্বল আনন্দময় পরিতুষ্ট শ্রমের ফসলে
পড়েনি কি তারা আজ শোষকের ফাঁদে **[হাতেম তা'য়ী]**

ঙ. নিস্তরঙ্গ জীবন সে তো মৃত্যু মোর,
তুফান তুরঙ্গমে আনো প্রাণ সেথায়,
আকাশ জুড়ে ছড়াও ঝড়ের বর্ণ ঘোর
মৃত্যু নিবিড় বর্ণে পাংশুল রং কে চায়?
দস্যু তুমি প্রলয় আলো নও তো চোর
মৃত্যু মদির জীবন আলো ঝড়-শিখায়। **[বৈশাখ : হে বন্য স্বপ্নেরা]**

এখন দেখা যাক, এ প্রবন্ধে উদ্ধৃত কবিতার শব্দপুঞ্জ ফররুখ-মানসের কি পরিচয় তুলে ধরেছে। আউলা, বিভ্রান্তি, পাপ, অত্যাচার, খণ্ডে বিখণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন সমাজ, আবাদ, বিশ্বাসী প্রাণ, ইনসানে কামিল, লুণ্ঠিত ধূলায়, নির্যাতিত, মজলুমান, অকুণ্ঠ অধিকার, ধূলির তুফান, রাত্রিদিন, মরুর হাওয়া, ঘন জলপাই বনে, খেজুর শাখায়, ওয়েসিস কিংবা সাহারায়, কাফেলা, রুদ্ধদ্বার, বনপ্রান্তে, মৃত্যুর ছায়া, কাঁকর-বন্ধুর, রাত্রির পর্দায়, কঙ্কালের কামনা নির্বিষ, তন্দ্রাতুর, দোয়েলের শিস, গাফিলতে, খেয়ালের ভুলে, দরিয়া অথই, ভ্রান্তি, মুসাফির, অস্ত, সেতারা শশী, বিস্বাদ শর্বরী, রক্ত শোষণের পালা, রাত্রিদিন সংখ্যাহীন, ষড়যন্ত্র, অনাহারক্লিষ্ট প্রাণ, ভারগ্রস্ত, কৃষাণ, উজ্জ্বল আনন্দময়, পরিতুষ্ট শ্রমের, শোষকের ফাঁদে, নিস্তরঙ্গ জীবন, তুফান তুরঙ্গমে, জড়ের বর্ণ ঘোর, পাংশুল রং, প্রলয়, মৃত্যু-মদির, ঝড়-শিখায়, বৈশাখ, পাঞ্জেরী– এ শব্দগুচ্ছ কি প্রমাণ দেয়? উল্লিখিত শব্দপুঞ্জ হতে তার মনন-পরিসরকে বাংলা-সংস্কৃতি শব্দমালায়ই সজ্জিত, তা কিন্তু স্পষ্ট হয়। তার আরবি-ফারসি শব্দ-প্রীতির সঙ্গে সংস্কৃতজাত শব্দ-প্রীতি কিন্তু কম নয়। উদ্ধৃত কবিতাংশে তার যেমন প্রমাণ মেলে, তেমনি তাঁর সমগ্র কাব্যে রয়েছে তার নিদর্শন। 'কাফেলা' কাব্যের 'এজিদের ছুরি' কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যাক।

আমার দুঃস্বপ্নে আজ ফেরে ক্রুর এজিদের ছুরি

আজ সীমারের তীক্ষ্ণ খঞ্জরের নীচে কাঁপে সংখ্যাহীন
ভারাক্রান্ত প্রাণ
আবার সম্মুখে মোর ঘনালো এ কোন্ মৃত্যু কারবালা ময়দান?
মানুষের মুক্তমাঠে আনিয়াছে কা'রা
এজিদের ছুরির পাহারা!
সম্মুখে মৃত্যুর বাধা পশ্চাতে ক্রন্দন অগণন...
হে ইমাম! করো মৃত্যু পণ
পরো আজ শহীদী লেবাস
মা ফাতেমার কান্না ভরায় আকাশ
তোলে তীর-খাওয়া শিশু মৃত আসগর
কাঁদে আজ স্বৈরাচারী তামসিকতায়
মানুষের আজাদীর ঘর।
ঢাকা পড়ে গেছে আজ নর্তকীর নূপুর নিক্কনে
কোরানের ধ্বনি
জালিমের বজ্রমুষ্টি ঢাকিয়াছে নবীজীর উন্মুক্ত সরণি।
মদিনার মুক্ত খিলাফত
বালুকায় হারায়েছে পথ...
হারায়েছে ফোরাতের তটপ্রান্তে, মানুষ সকল অধিকার
গোলামী জিঞ্জিরে শোনো ক্রমাগত ওঠে হাহাকার
অযুত প্রাণের নাভিশ্বাস!
তোমাকে ডাকিছে আজ হে ইমাম! কারবালা আকাশ
তোমাকে ডাকিছে আজ অবরুদ্ধ ফোরাতের তীর
তোমাকে ডাকিছে আজ মারণাস্ত্র এজিদের দুর্ধষ সান্ত্রীর।

ইসলামের ইতিহাসে এজিদের রাজনৈতিক নৃশংসতার কথা ফররুখ আহমদ তাঁর সমকালীন জীবন পরিপ্রেক্ষিতে দেখেছেন বলেই প্রথম পঙক্তিতেই উচ্চারণ করেছেন সে দুঃস্বপ্নের কথা, যেন সে এজিদী ছুরি পাহারা বসিয়েছে আজ মুক্ত মানুষের মাঠে, আঙ্গিনায়। নর্তকীর নূপুর নিক্কনের নিচে কোরানের তেলাওয়াতের ধ্বনি চাপা পড়ে গেছে, জালিমের বজ্রমুষ্টি যেমন ঢেকেছিলো নবীজীর পথ, মরুবালুকায় যেমন ডুবে যায় পরিচিত পথ তেমনি মদিনার খেলাফত হারিয়ে গেছে এজিদের হাতের রক্তগঙ্গায়। ফোরাতের অববাহিকার মানুষ এভাবেই হারায় তাদের রাজনৈতিক অধিকার। ফররুখ ব্যবহৃত শব্দপুঞ্জ পাঠে শাদা চোখে আরবি-ফারসি শব্দের প্রাধান্য থাকলেও মুসলিম মানসে এবং উপমহাদেশিক সাংস্কৃতিক বীক্ষণে ওই শব্দগুচ্ছ অজানা-অচেনা নয়। সাতশো বছরের মুসলিম শাসনামলে গোটা উপমহাদেশের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ছিলো ইসলাম। ইসলামী শব্দ তাই আরবির মাধ্যমে বাংলা ভাষা-সাহিত্যে যেমন এসেছে তেমনি এসেছে রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক কারণেও।

জীবনধারণের প্রয়োজনে যেমন উপমহাদেশের ভাষায় আরবি-ফারসি এসেছে তেমনি এসেছে ল্যাটিন বর্ণাক্ষরের মাধ্যমে পুর্তুগিজ, ফরাসি ও ইংরেজি। দেশি শব্দ ভাণ্ডারে এসে সেসব ভাষার শব্দপুঞ্জ যোগ হওয়ায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। এ বিবেচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, বাংলা ভাষার গ্রহণ ক্ষমতা যেমন বিপুল তেমনি তার সাহিত্যের স্বভার ও সম্ভারও বিপুলায়তন।

হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারাস্নান শেষে ফররুখ আহমদ পর্যন্ত কবিতা শিল্পের যাত্রাপথ যদি অবলোকন করা যায় তাহলে দেখবো মধ্যযুগের সাহিত্য নতুন বীক্ষাকাশ নির্মাণ করেছে। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা বা শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের পর মানবীয় গুণসম্পন্ন মানবিক প্রেমের কাব্য রচিত হয়েছে মুসলমান লেখকদের হাতে। তারা ফারসি প্রেম-উপাখ্যানমূলক কাহিনীকাব্য, অনুবাদের মাধ্যমে দেবী-দেবতানির্ভর অবাস্তব কাহিনী-নির্ভর সাহিত্য সৃষ্টিকে মানবনির্ভর প্রেমাখ্যান রচনা করে মর্ত্যের বাস্তবতাকে রাঙিয়ে তুলেছেন। আমরা ফররুখের কবিতায়, গুলে বকাওলী, শাহেরজাদী, জাফরানী, গোলাব, বাঁদী, লালী, রুধিরে, মুজাহিদ, দ্বীনী, নিশানা, দুনিয়া জাহান, শহীদী, আসমান, জেহাদ, হযরত আলী, আল্লার রেজামন্দির, নবীর খলিফা, খুন, আজদাহা, জাহান্নাম, জালিম, মজলুম, খিদমত, কিশতি, হালাল, সওয়ার, সফর, জিন্দেগী, আল্লাহ, ইবলিস, বনি আদম, আল-হেলাল, খঞ্জর, নকীব, ইসরাফিল, সূরা, ফেরাউন, মুসাফির, খোর্মা, খলীফা ওমর, আলী হায়দর, সিদ্দিক, মিনার, আজাব, ওসমান, সওদাগর, সিন্দবাদ, খলিফাতুল মুসলেমিন, মদীনার শামাদানে প্রভৃতি শব্দপুঞ্জ এন্তার ব্যবহৃত হতে দেখি তা কি আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনাচারে বহু শতাব্দী ধরে গণ-জীবনে ব্যবহৃত নয়? যে কোনো মু'মিন মুসলমান এ সকল শব্দ ও শব্দার্থ জানেন, তেমনি জিন্দেগীভর সে সব শব্দ ব্যবহার করে আসছেন। ফররুখ আহমদ সে গণশব্দপুঞ্জই তার ধর্মবিশ্বাস ও রিচুয়াল-কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক স্রোতস্বিনী থেকে কবিতায় ব্যবহার করেছেন। ফলে তাঁর কাব্যচিন্তা, ধর্মচিন্তা ও সৃজনচিন্তা একই সূত্রে হয়েছে। তিনি মূলত মজলুম জনতার নন্দিত কবি। গণমানুষের কথাই তাঁর কবিতায় সম্যক উচ্চারিত হয়েছে। আমরা যদি তাঁর কবিতার পূর্বাপর অবলোকন করি, দেখবো, শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত, অবহেলিত মানুষের পক্ষে কথা বলছেন তিনি। আর প্রতিবাদ করছেন এজিদতুল্য শাসক-শোষক গোষ্ঠীর। এ সাম্যচেতন কবিকে সে জন্যেই একান্ত আমাদের, গণমানুষের কবি বলে মনে হয়। সে সঙ্গে কবি শামসুর রাহমানের বক্তব্যের সূত্র ধরে বলি-তিনি কবিতায় নতুন ডিকশন রচয়িতা। ❐

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ৯ম সংখ্যা, জুন, ২০০৪]

# কবিকীর্তি

## সাযযাদ কাদির

আমাদের প্রধান কবিদের একজন হলেও আমাদের সাহিত্যচর্চার প্রধান ধারাতে প্রায় অনুপস্থিত ফররুখ আহমদ (১৯১৮-৭৪)। তাঁর কবিকীর্তির প্রকৃত মূল্যায়ন-বিশ্লেষণ, আলোচনা-গবেষণা চোখে পড়ে না তেমন। তাঁকে স্মরণ করে দু-চারটি যে অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় তা-ও গতানুগতিকতায় অনুজ্জ্বল, অনেকটা দায়সারা গোছের। এসবও আবার সীমাবদ্ধ বিশেষ মহলের কর্যক্রম-কর্মসূচির মধ্যে।

ফররুখ আহমদের রচনাবলি দুষ্প্রাপ্য দীর্ঘ দিন ধরে। ২০০৯ সনে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'কবিতাসমগ্র' (অনন্য, ঢাকা)। 'সমগ্র' বলা হলেও এটি আসলে জীবৎকালে প্রকাশিত তাঁর ছয়টি কবিতাগ্রন্থের সঙ্কলন। এ কবিতাগ্রন্থগুলো হচ্ছে- সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪); আজাদ করো পাকিস্তান (১৯৪৬); সিরাজাম মুনীরা (১৯৫০২), মুহূর্তের কবিতা (১৯৬৩) এবং হাতেম তা'য়ী (১৯৬৬)। মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর অন্তত দু'টি কাব্যগ্রন্থ–হে বন্য স্বপ্নেরা (১৯৭৬); হাবেদা মরুর কাহিনী (১৯৮১) স্থান পায়নি এতে। এ ছাড়া অপ্রকাশিত রয়েছে অন্তত পাঁচটি ব্যঙ্গ কবিতাগ্রন্থ– অনুস্বার বিসর্গ; ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য; হালকা লেখা; তসবিরনামা; রসরঙ্গ। ফররুখ আহমদের অনূদিত কবিতা, শিশুতোষ ছড়া-কবিতা ও গীতিকবিতাগুলোও দাবি রাখে কবিতাসমগ্র-এ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার। এসব কবিতা নিয়ে প্রকাশিত-অপ্রকাশিত মিলিয়ে রয়েছে তাঁর বেশ কয়েকটি গ্রন্থ– পাখীর বাসা (১৯৬৫), নতুন লেখা (১৯৬৯), হরফের ছড়া (১৯৭০), ছড়ার আসর (১৯৭০), চিড়িয়াখানা (১৯৮০), কাফেলা (১৯৮০), দিলরুবা, ফুলের জলসা, ছড়ার আসর, আলোকলাত, খুশীর ছড়া, ছড়াছবির দেশে, মজার ছড়া, পাখীর ছড়া, রঙমশাল; ইকবালের নির্বাচিত কবিতা (১৯৮০); কাব্যগীতি, রক্ত-গোলাব, মাহফিল প্রভৃতি।

ফররুখ আহমদ ও তাঁর কবিতা অনালোচিত থাকার বিশেষ কারণ রচনাবলির এই দুষ্প্রাপ্যতা। আরেকটি কারণ সম্ভবত কোনো এক ধরনের মানসিক বাধা। কবিতাসমগ্রর সম্পাদক প্রবেশক নামের নাতিদীর্ঘ ভূমিকায় বহু বিশিষ্টজনের মন্তব্যই সঙ্কলন করেছেন শুধু নিজে করেননি কোনো মন্তব্য মূল্যায়ন-বিশ্লেষণ তো দূরের কথা!

এ রকম নগ্ন উপেক্ষার জন্য সাধারণ পাঠকরা দায়ী করেন ফররুখ আহমদ সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত ভাবমূর্তিকে। সে ভাবমূর্তিটি কেমন? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত এবং রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ আবু জাফর ও আবুল কাসেম ফজলুল হক সম্পাদিত কবিতা সংগ্রহ (১৯৯২)-এর কবি পরিচিতিতে ফররুখ আহমদ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে–"... বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে ফররুখ আহমদ গুরুত্বপূর্ণ

আসনে অধিষ্ঠিত। ফররুখ আহমদ ইসলামি ভাবধারায় পুষ্ট এবং বাংলাদেশের কাব্যধারায় প্রথম সারির একজন কবি। তাঁর কাব্যে আরবি-ফারসি শব্দ এবং ইসলামি ঐতিহ্যের ব্যবহার খুব বেশি। সনেট রচনায়ও তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।"

বাংলা একাডেমী প্রকাশিত এবং সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম সম্পাদিত চরিতাভিধান (১৯৯৭)-এ প্রায় একই ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে- "(ফররুখ আহমদ) মুসলিম পুনরুজ্জীবনবাদী কবি। পাকিস্তানবাদ, ইসলামিক আদর্শ এবং আরব-ইরানের ঐতিহ্য তাঁর কবিতায় উজ্জ্বলভাবে প্রস্ফুটিত। আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ নৈপুণ্যে, বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের অভিনবত্বে তাঁর কবিতা এক বিশিষ্ট সৃষ্টি। ব্যঙ্গকবিতা ও সনেট রচনায় তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।"

এই পাকিস্তান, ইসলাম, আরবি-ফারসি, আরব-ইরান প্রভৃতির লেবেল এঁটে প্রায় স্থায়ীভাবে দেয়া হয়েছে ফররুখ আহমদ ও তাঁর কবিতার ওপর। যেখানে মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে পাকিস্তান নামের মিথটি বিপর্যস্ত, ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতা (Pseudo secularism) ও জঙ্গিত্বের দৌরাত্ম্যে ইসলাম আক্রান্ত সেখানে তাঁকে নিয়ে সুশীল মহলের অস্বস্তি এবং সাধারণ পাঠকসমাজে বিমুখতা সৃষ্টি হয়েছে সহজে অনুমেয় কারণেই। এটা ঘটেছে লেবেলের মহিমায়। ড্যানিশ দার্শনিক আবাই সোরেন কিয়েরকেগার্ড (১৮১৩-১৮৫৫) বলেছেন, Once you label me, you negate me. লেবেল আঁটা এক ধরনের অস্বীকৃতি বটে। রবীন্দ্রনাথকে প্রেম ও প্রকৃতির কবি, নজরুলকে বিদ্রোহী কবি, জীবনানন্দকে রূপসী বাংলার কবি, জসীমউদ্‌দীনকে পল্লীকবি এবং আরো অনেককে এ ধরনের নানা রকম লেবেল আঁটা আমাদের অভ্যাস। এতে তাঁদের খণ্ডিত, সেই সঙ্গে তাঁদের সামগ্রিকতাকে প্রকারান্তরে অস্বীকারই করি আমরা। একইভাবে ইসলামি রেনেসাঁর কবি লেবেল দিয়ে অবমূল্যায়িত করা হয়েছে ফররুখ আহমদকে।

কেমন ছিল ফররুখ আহমদের পাকিস্তানবাদিতা? অধ্যাপক ডক্টর রফিকুল ইসলাম লিখেছেন, "ফররুখভাই পাকিস্তান ও ইসলামি আদর্শের অনুরাগী ও অনুসারী বরাবর, কিন্তু তদানীন্তন পাকিস্তানি ও পূর্ব পাকিস্তানি শাসকেরা ইসলামের নামে যা করছিলেন তাতে তাঁদের ওপর সবচেয়ে বেশি ক্রুদ্ধ ছিলেন ফররুখ ভাই। তিনি ওই শাসকদের ব্যঙ্গ করে রাজরাজড়া নামে একটি নাটক লিখেছিলেন এবং তা বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিনীত হয়েছিল। বেনজীর আহমদ ও আবু জাফর শামসুদ্দীন সম্পাদিত নয়া সড়ক সঙ্কলনে নাটকটি অভিনীত হয়েছিল।" (**'অনন্য পুরস্কার', ফররুখ আহমদঃ ব্যক্তি ও কবি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪**)

নিজস্ব চিন্তাধারা, ধ্যানধারণা, আদর্শের প্রতি ফররুখ আহমদের ছিল অবিচল আস্থা। সেখানে তিনি ছিলেন আদ্যন্ত সৎ। অধ্যাপক ডক্টর রফিকুল ইসলাম আরো লিখেছেন, "... ফররুখ ভাই প্রেসিডেন্ট পুরস্কার (প্রাইড অব পারফরম্যান্স, ১৯৬১)

পাওয়ার চেয়ে বেশি খুশি হয়েছিলেন আমাদের সংবর্ধনা পেয়ে। বস্তুত তিনি আইয়ুব খানের কাছ থেকে আদমজী পুরস্কার আনতে করাচি যেতে রাজি ছিলেন না। পাকিস্তানি শাসকদের ইসলামের নামে অনৈসলামিক কার্যকলাপে ফররুখ ভাই এতই ক্ষুব্দ ছিলেন যে, তাঁকে কখনো রাইটার্স গিল্ডের কোনো কনফারেন্সে পশ্চিম পাকিস্তানে নেয়া যায়নি।..." **(প্রাগুক্ত)**

কেমন মানুষ ছিলেন কবি ফররুখ আহমদ? অধ্যাপক ডক্টর রফিকুল ইসলাম লিখেছেন, "... ফররুখ ভাইয়ের আপসহীন স্বাধীনতা নির্লোভ আদর্শবাদী চরিত্রের সামনে সব সুবিধাবাদীই মাথা নিচু করে চলতেন। ফররুখ ভাই ব্যক্তিগত স্বার্থ ও লোভের উর্ধ্বে ছিলেন।" **(প্রাগুক্ত)**

আসলে মুখে চিন্তার স্বাধীনতা, বাক্স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ইত্যাদি বললেও আমরা চাই ঐকমত্য– সবাইকে হ্যাঁ বলাতে চাই আমাদের মত ও চিন্তার পক্ষে। এ জন্য ভিন্নমতাবলম্বীকে সহ্য করতে চাই না আমরা– তা তিনি যতই সৎ ও আদর্শবাদী হোন না কেন। অথচ লোভী দুর্বৃত্ত অনেককে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে চলি নিজ দলের বলে।

ফররুখ আহমদের আদর্শবাদ ছিল প্রকৃত মঙ্গলবোধে ও জনকল্যাণে উজ্জীবিত। তাই তাঁর প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন উনিশ শতকের রেনেসাঁস-পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। কবি শামসুর রাহমান লিখেছেন,..."উনিশ শতকী বাংলার অন্যতম প্রধান গুরু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতিও ফররুখ আহমদের অবিচল শ্রদ্ধা ছিল। তিনি প্রায়শই বলতেন, 'বুঝলে শামসুর রাহমান, এই বিদ্যাসাগরের মতো, এক-দেড় জন ব্যক্তি আমাদের সমাজে জন্মালে এই পচা-গলা সমাজের চেহারাটাই পালটে যেতো।..." **(নতুন পানিতে সফর এবার, দৈনিক বাংলা, ২০ অক্টোবর ১৯৭৪)**

কবিতায় আরব-ইরানের ঐতিহ্য, আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করায় ফররুখ আহমদকে চিহ্নিত করা হয়েছে এক বিশেষ লেবেল এঁটে। এ লেবেলের মাধ্যমে তাঁর কবিকীর্তিকে খণ্ডিত, এক অর্থে অস্বীকারও করা হয়েছে। নিজের বোধ ও চেতনাগত অবস্থান থেকে তিনি কবিতায় ব্যবহার করেছেন মধ্যপ্রাচ্যের মিথগুলোকে। তাঁর এ ব্যবহার যেন অকাব্যিক, যেন-ধর্মবোধ-তাড়িত ! অথচ ইউরো-আমেরিকার কবিরা গ্রিক -রোমান মিথ ব্যবহার করে আসছেন, প্রাচীন ভারতের মিথ ব্যবহার করেছেন মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ। এখানে কবিতায় এমন মিথের ব্যবহার প্রচুর। সেখানে খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্মবোধের প্রসঙ্গ আসে না আলোচনা-সমালোচনায়।

ফররুখ আহমদের মিথের ব্যবহারের নেপথ্যে রয়েছে শেলি, কিটস, মধুসূদন প্রমুখ কবির প্রতি তার তীব্র অনুরাগ। মূলত তিনি রোমান্টিক কবি। তবে গীতলতার বদলে বেছে নিয়েছিলেন মহাকাব্যের ধীরোদত্ত ভাষাদর্শ। কবি শামসুর রাহমান লিখেছেন, "ইংরেজি রোমান্টিক কবিকুল তাঁর মন হরণ করেছিলেন। তাঁর কণ্ঠে

যখন-তখন ধ্বনিত হতো শেলি, কিটস-এর অবিনাশী পঙ্ক্তিমালা। যখন তিনি আবৃত্তি করতেন, তাঁর দীর্ঘ এলোমেলো চুল নেমে আসত কপালে, ধারালো উজ্জ্বল চোখ হয়ে উঠত উজ্জ্বলতর। তাঁর আরেকটি প্রিয় প্রসঙ্গ ছিল মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতা। মধুসূদনের কথা বলতে গেলেই তাঁর কণ্ঠে বেজে উঠত অন্য রকম সুর। মধুসূদনের কবিতা অনর্গল মুখস্থ বলে যেতে পারতেন তিনি।"

কেবল মধ্যপ্রাচ্যের মিথ নয়, আবহমান বাংলার মিথগুলোও দীপ্ত করেছে ফররুখ আহমদের অনেক কবিতাকে। বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য এখানে উল্লেখ করছি তাঁর কয়েকটি কবিতার নাম– কোকিল, ফাল্গুনে, বৈশাখী, বৃষ্টি, বর্ষার বিষণ্ন চাঁদ, ময়নামতীর মাঠে গাথা ও গান, দীউয়ানা মদিনা, মোতিঝিল, জিঞ্জিরা, লালবাগ কেল্লা, সোনারগাঁও: একটি প্রাচীন স্মৃতি, নদীর দেশ, ধানের কবিতা, চিরাগি পাহাড়, জালালী কবুতর, চলতি ভাষার পুঁথি, শাহ গরীবুল্লাহ প্রভৃতি। মুশকিল হলো আমরা এমন এক সমাজমানসিকতায় ভুগছি যখন একজন দলনেতা সম্পর্কে নিকৃষ্ট কবিতা লিখেও বাহবা মেলে, কিন্তু একজন ঐতিহ্যিক কবি সম্পর্কে উৎকৃষ্ট কবিতা লিখে জোটে বঞ্চনা ও গঞ্জনা।

কবিতা জন্ম নেয় হঠাৎ কোনো এক মুহূর্তের প্রেরণায়– বিশ্বাস করতেন ফররুখ আহমদ। তাঁর আশঙ্কা ছিল এমন রচনায় হয়তো পূর্ণতা থাকবে না, হয়তো সার্থকতাও থাকবে না। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলেছেন, এ যেন সামান্য শক্তি নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দেয়ার দুঃসাহস। "মুহূর্তের কবিতায়" তিনি লিখেছেন,

> " ...মুহূর্তের এ কবিতা, মুহূর্তের এ কলতান
> হয়তো পাবে না কণ্ঠে পরিপূর্ণ সে সুর সম্ভার,
> হয়তো পাবে না খুঁজে সাফল্যের, পথের সন্ধান,
> সামান্য সঞ্চয় নিয়ে সে চেয়েছে সমুদ্রের পার;
> তবু মনে রেখো তুমি নগণ্য এ ক্ষণিকের গান
> মিনারের দম্ভ ছেড়ে মূল্য চায় ধূলিকণিকার।"

তবে কবিতার পাঠকমাত্রেই জানেন, ফররুখ আহমদের সৃষ্টি সবসময়েই মূল্যায়িত হবে কালোত্তর মহিমাকে ধারণ করে। (সংকলিত)

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, একুশতম সংখ্যা, অক্টোবর-২০১১]

# আমার চোখে ফররুখ ভাই

মুস্তাফা জামান আব্বাসী

মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে যিনি ভালোবেসেছেন তিনি মহত্ত্বের স্পর্শ পেয়েছেন। তিনি মানুষদের মধ্যে মহান। তিনি যদি কবি হন, তাহলে তাঁর মনে বিশ্বনিয়ন্তার নিয়মের আড়ালে এর সুন্দর পবিত্র রূপটি আরও সুন্দরতর হয়ে প্রতিভাত হয়েছে, জগতের শ্রেষ্ঠ মহান কবিদের কাব্যগাঁথায় তা পাঠ করে আনন্দিত হই, শিহরিত হই, বারবার চরণগুলো পাঠ করেও ক্লান্ত হই না আমরা। মানুষের মনের কন্দরে খেলা করে যে অনুভূতিগুলো সহজে তা বের করে আনেন কবিরা, আহা! এগুলো যে আমারই মনের কথা, কেমন করে কবি সহজ সুন্দর প্রকাশে এই আকুতিগুলো গজলে, রুবাইতে, সনেটে সিক্ষনিতে ছড়িয়ে দিলেন মুক্তোর মতোন। যারা কবিতা ভালোবাসেন, তারা কবিকেও ভালোবাসতে শুরু করেন, কারণ কবিদের চোখ দিয়েই তখন বিশ্বকে আরও রূপময় হয়ে ওঠে পাঠকের দৃষ্টি।

ফররুখের 'সাত সাগরের মাঝি'র কবিতাগুলোর রচনাকাল ১৯৪২-৪৪। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পর 'সাত সাগরের মাঝি' বইটি খুলে যখন একটির পর একটি কবিতার মধ্যে কবিকে খুঁজতে যাই, তখন মনে হয় কবির 'নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা', চোখের সামনে কত জীবন্ত, কত বাঙ্ময়, কত হিল্লোলিত, যেন কবিকে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, যেন কবি প্রতিটি কবিতা নিজেই আবৃত্তি করে আমাকে শোনাচ্ছেন, কবির উজ্জ্বল চোখ দুটো ঈষৎ বন্ধ করে, বলছেন, আব্বাসী, এই জায়গাটা আরেকবার পড় তো :

> আমরা মরি না, সুখা মা'টী শুধু শুধু তাকায় শংকাকুল,
> দরিয়ার ডাকে এক লহমায় ভাঙে আমাদের ভুল,
> প্রকাশিত নীল দিন :
> দেখে সফরের প্রসারিত পথ দিগন্ত স্রোতলীন।

ফররুখ আহমদ, আমার ফররুখ ভাই মরেননি। তাঁর মৃত্যু অকালমৃত্যু নয়, আল্লাহ-নির্ধারিত মর্দে মুমীনের মৃত্যু, মুজাদ্দিদের মৃত্যু, যার নাম ইন্তেকাল। তাঁর কবিতার মাঝেই তিনি বর্তমান। হাজার বছরেও এই কবিতার সুঘ্রাণ কমে যাবে না, বরং মেশকের মতো, কস্তুরীর মতো এর ঘ্রাণ আরও দূর থেকে দূরান্তরের দিগন্তকে স্পর্শ করবে, যেমনটি আমি লিখেছিলাম নজরুল সম্পর্কে :

> "তোমার কারুকার্যময়, বীণাটি স্ফটিকসম স্ফূর্তি পেল
> শতবর্ষ অতিক্রম করে
> সমরখন্দের সন্তুর যেমন
> যতই বয়স্ক, আওয়াজ ততই সুমধুর গম্ভীর"
> **(তোমার জন্মদিনের মেলায়, আমি : সুফি কবিতা, পৃ. ৮৬)**

আমি আজ সারারাত এই কবিতাগুলো পাঠ করে ফররুখ ভাইয়ের আত্মার সঙ্গে কাটিয়েছি। যারা ফররুখকে কাছে পেতে চান, তাদের প্রয়োজন হবে না বেনজীর

আহমদের বাড়ির চত্বরে তাঁর কবরগাহে যাওয়ার, প্রয়োজন হবে না সংবাদপত্রের পাতায় সমালোচকদের কৃপণ-অকৃপণ দাঁড়িপাল্লার বাটখারা, ওগুলো তোলা থাক কালের জন্য। তোমাদের বাটখারায় যা ধরে বা না ধরে তার চেয়েও অনেক মহৎ ফররুখ ভাই। প্রয়োজন, শুধু তাঁর কাব্যপাঠের। মাঝে মাঝে উদাস হয়ে ভাবি, পল্লীগ্রাম থেকে গত পঞ্চাশ বছরে কত কবি, কবিয়াল, ঝাঁকড়া চুলের বাউল আমাদের পুরানা পল্টনের 'হীরামন মনজিলে' আমার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছেন, তাঁদের দিকে ভালো করে তাকাই নি, অবহেলা ভরে বলেছি, "আপনার গান ভালোই তো হয়েছে, এগুলোর মধ্যে পঁচিশটি গান রেডিওতে পাঠিয়ে দিন, আমি দেখবো।" অথচ এরই মধ্যে ছিলেন বিজয় সরকার, ছিলেন জালালউদ্দিন খান, রেজাবউদ্দীন ফকির, আবদুল মজিদ তালুকদার, শত শত কত নাম বলবো। এঁদের পায়ের নখের যোগ্যও তো আমি নই। এখন বুঝি, এঁরা কত উচ্চ স্তরের কবি ও গীতিকার ছিলেন, যাঁদের আমরা আঁধবোঁজা চোখে তাকাই।

মৃত্যুর সাতশো বছর পরে যখন সমগ্র পৃথিবীব্যাপী জালাল উদ্দীন রুমির খোঁজ পড়ে, আমেরিকাতেই পঞ্চাশটির বেশি 'রুমি ক্লাব' তৈরি হয়, ইন্টারনেটে শত শত কাব্যপ্রেমিক রুমির মসনবী পাঠ করার জন্য 'Chat Club' -এ এসে প্রতি সকাল সন্ধ্যায় মিলিত হন, তখন বোঝা যায় রুমি কত বড়। অথচ আমরা বাঙালীরা এখনও ঘুমিয়ে, ঝিমিয়ে।

মাঝে মাঝে আমার এ-ও মনে হয়, আমরা ফররুখের যোগ্য নই। এক 'সিন্দবাদ' কবিতায় যে শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন তিনি বাংলা ভাষায় আর কোন কবি এত লালিত্যময়, রোমান্টিক শব্দ আর কি ব্যবহার করেছেন ? যেমন : মখমল দিন, নতুন সফর, নোনা দরিয়ার ডাক, সফেদ চাঁদির তাজ, পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ, আকীক বিছানো, ঘন সন্দল কাফুরের বনে, সিন্ধু ঈগল, দরিয়া হান্মামে, কিশ্তীর পাটাতন, আবলুস-ঘন আঁধার, সূরাত জামাল জওয়ানি, গলিজ-শহরতলীতে, আয়েশী রাতের ফাঁদ, মাতমী লেবাস, দরিয়ার ডাক, দামাল জোয়ার, মখমল-অবসাদ।

বলুন, একটি মাত্র কবিতায় আর কোনো বাঙালি কবি কি এতোগুলো নতুন শব্দ, উপমা, রূপক তুলে এনে সম্পূর্ণ নতুন অনাস্বাদিত এক জগতের সন্ধান দিয়েছেন? আরবি ফারসির কণ্টকময়, আরবি ফারসির মধুর আবহ, রঙিন মনের মাতাল আবেশ এর মধ্যে তীরের নির্দিষ্ট ঠিকানা। অনেক কবি ঠিকানা হারিয়ে তারপরও গন্তব্যে পৌঁছেন, অনেকে মাতাল হয়ে মায়খানাতেই শয্যা নেন, আবার কেউ হন ফররুখ, জাতে মাতাল, অর্থাৎ কাব্যে মাতাল, অথচ তালে ঠিক, গন্তব্যে নির্ভুল।

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আবৃত্তিতে আমি ছিলাম প্রথম। পরে আর Pursue করিনি। গোলাম মোস্তফা, হাসান ইমাম, এঁরা হতেন দ্বিতীয় অথবা তৃতীয়। মুহাম্মদ আবদুল হাই, মুনীর চৌধুরী, এঁরা বিচারক। এঁরা বলতেন রবীন্দ্রনাথের 'যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে', আব্বাসী Scanning টা বুঝতে পেরেছে, কারণ ও গান জানে। ফররুখের 'সাত সাগরের মাঝি' আবৃত্তিতে আমিই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়নের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায়। কতবার কবিতাটি পড়েছি, নাটকীয় করার চেষ্টা করেছি, পরে দেখলাম এর মধ্যে আছে এমন এক অনাস্বাদিত রোমান্টিকতা, যা

আমার হলুদ পাঞ্জাবী, কালো চশমার ফ্রেম ও একহারা দুরন্ত চুলের মধ্যে মিশে আমাকে বানিয়েছে এক নীল দরিয়ার সওয়ারী যাতে আছে জমরুদ তোলা স্বপ্ন, যাতে আছে প্রবাল দ্বীপের নারিকেল শাখায় সরস শব্দ, আছে দ্বাদশী জোছনার মিঠে দোলা, দারুচিনি শাখার মরমর শব্দ, মেশকের সুবাস।

আমি যাকে ভালোবাসি সে আমার সামনেই বসে আছে, সে আমার শ্রোতা, আমার কণ্ঠের সবটুকু Bass, লালিত্য, ঝংকার মিলিয়ে বললাম ঃ

"হে মাঝি! এবার তুমিও পেয়োনা ভয়
তুমিও কুড়াও হেরার পথিক-তারকার বিস্ময়
ঝরুক এ ঝড়ে নারঙ্গী পাতা, তবু পাতা অগণন
ভিড় করে– যেথা জাগছে আকাশে হেরার রাজ-তোরণ।"

একি বিস্ময়! কবিতা পাঠ করে আমি অনেক কিছু জয় করলাম। প্রথম পুরস্কার। তা কোথায় হারিয়ে গেছে এতদিনে জানি না। সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার : 'হেরার রাজতোরণে' যিনি, আমার জীবন সায়াহ্নে আমার জীবন-তরী পার করাবেন, মুহাম্মদের (সা) আমি জীবনীকার। যারা এই রাজতোরণ চিনিয়েছেন তাঁরা : জালালউদ্দীন রুমি, সাদি, ইকবাল, নজরুল ও ফররুখ। 'সাত সাগরের মাঝি'র কবি আমার ভরা নদীর বাঁকে দেখিয়েছেন পথের দিশা।

"তবে পাল তোলো, তবে নোঙ্গর তোলো
এবার অনেক পথ শেষে সন্ধানী
হেরার তোরণ মিলবে সমুখে জানি।"

যে বড় কবিরা মুহাম্মদকে (সা) পাঠ করেননি, তাঁদের জন্য আমার দুঃখবোধ হয়, তাঁরাও মহৎ, তাঁরাও বড়। কিন্তু তাঁরা মহত্তম, শুদ্ধতম, পবিত্রতম নয় আমার কাছে। রাবেয়া বসরী আল্লাহতায়ালাতে এতখানিই সমর্পিত ছিলেন যে, তিনি বলেছিলেন, আমার আর কাউকে প্রয়োজন নেই, যাঁকে আরাধনা করার তাঁকে পেয়ে গেছি। মানুষের মধ্যে যিনি মহত্তম তাঁর সঙ্গে আল্লাহাতায়ালাই তাঁর যোগাযোগ করে দিয়েছিলেন, সুফি সাহিত্যে এর উল্লেখ দেখি। অথচ, যাকে কাছে পাই তিনিই মুহাম্মদ (সা), হেরার পথ কাছের পথ। সর্বোত্তম পথ, সোজা পথ মুহাম্মদের (সা)। ফররুখ আরেকজন আসবেন না। নজরুল-ও একজনই। রবীন্দ্রনাথের 'বৈশাখ' আবৃত্তি করতে করতে আমি একবার স্বগতই ফররুখের 'বৈশাখ' (কাফেলা কাব্যগ্রন্থ) কবিতাটি পাঠ করি টেলিভিশনের একটি রিহার্সালে। প্রডিউসার বললেন, আপনি যে কবিতাটি এখন বললেন, সেটি তো আগে কখনও শুনিনি। আপনার পুরোটা মনে আছে ? বললাম : নেই, তবু যেটুকু স্মৃতিতে আছে তাই শুনুন।

"এস তুমি সাড়া দিয়ে বিজয়ী বীরের মত, এস, স্বর্ণশ্যেণ
বাজায়ে নাকাড়া কাড়া
এস তুমি দিগ্বিজয়ী জুলকারনায়েন
আচ্ছন্ন আকাশ নীলে ওড়ায়ে বিশাল ঝাণ্ডা শক্তিমত্ত ও প্রাবল্যে প্রাণের
সকল প্রকার, বাধা চূর্ণ করি মুক্ত কর পৃথিবীতে সরণি প্রাণের

সকল দীনতা, ক্লেদ লুপ্ত কর, জড়তার চিহ্ন মুছে যাক
বিজয়ী বীরের মত নির্ভীক সেনানী তুমি
এস ফিরে হে দৃপ্ত বৈশাখ।"

টেলিভিশনে এই কবিতাটি প্রথম আবৃত্তি করার সৌভাগ্য অর্জন করি। তারিখ মনে নেই। ফররুখের পরের পথ কী? নতুনতর কবিদের কাব্য পাঠে আমার মাঝে মাঝে আশার সঞ্চার হয় বৈ কী, আবার তা কুয়াচ্ছন্ন মনে হয় মাঝে মাঝে।

কোরআনের নির্যাস মসনভী,
কোরআনের হাফেজ, হাফিজ
কোরআনের বার্তাবহ সাদি
কোরআনের প্রদীপ হাতে ইকবাল
আমার ভাঙা ঘরের সামনে সামান্য আরবী ফারসীর সম্ভার
হাতে 'দুখুমিয়া' নজরুল, যিনি বাংলা সাহিত্যে রাসূলের
আবহনির্মাতাদের মধ্যে সর্বাগ্রে গণ্য।
তারপর সম্পূর্ণ নতুন সাজ পরে ফররুখ।

নতুনদের আরবি-ফারসি করায়ত্ত করতে হবে। তা না হলে পথ রুদ্ধ। হাজার বছরের বাংলা আধুনিকতার ছোঁয়া যদিও পেল ইউরোপীয় মুক্ত হাওয়ায়, কিন্তু সে আধুনিকতার সঙ্গে আত্মার সংযোগ ক্ষীণ। এই আত্মার খবর আছে আরবি ফারসির মহান কবিদের আত্মার খাঁচায়। ফররুখের উত্তরাধিকারীকে তাই হতে হবে শুদ্ধ আত্মার মালিক। নইলে নতুন দিনের মানুষ সে কবির মধ্যে নতুন কিছু খুঁজে পাবে না।

ফররুখ ভাই অনেক দিন আমাদের বাসায় এসেছেন। কত স্মৃতি চোখের সামনে ভেসে যাচ্ছে। আব্বাকে সম্মান করতেন অসম্ভব রকম। আমার ছোট বোনকে স্নেহ করতেন খুব। দেখা হলেই প্রথম কথা : ফেরদৌসী কেমন আছে ? রেডিও অফিসে প্রায়ই দেখা হতো। তিনি পান, চা ও বিস্কুট খেতেন, খাওয়াতেন আর বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতেন, আর বসে বসে লিখতেন রেডিওর Script. তাঁর খুব কাছাকাছি যাইনি। উনি ডেল কার্নেগি পড়েননি, তাই আমাকে পাননি। কিন্তু আজ বুঝি, তিনি কে ছিলেন। তিনি ছিলেন 'নিশানবর্দার।' সিরাজুম মুনীরার প্রেমিক।

সর্বোত্তম মানুষ, শুদ্ধতম মানুষ, পবিত্রতম মানুষকে না চিনলে পূর্ণতা আসে না। সৃষ্টির সেরা মানুষ যার চোখে ধরা পড়েছে তিনিই ফররুখ। কবিতাপ্রেমিক মানুষ, দিনকতক এই পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শে আমোদিত হবে বৈকী। কিন্তু যখন পৃথিবীর কোলাহল থেমে যায়, যখন আমার নিভৃত অবসর, যখন আমি একা, তখন আমি যাকে খুঁজি, তারই অন্বেষণ শ্রেষ্ঠ অন্বেষণ, যখন সেরা মানুষের খোঁজ, মহান আল্লার সেরা সৃষ্টি খোদার হাবীবকে খোঁজার চেষ্টা। যারা হাবীবকে খুঁজেছে তেমন কবিদের যেমন পৃথিবী খুঁজেছে রুমি, সাদি, হাফিজ, ইকবালের মধ্যে, তেমনি খুঁজবে ফররুখের মধ্যে। ◻

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, অক্টোবর, ২০০১]

# রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী?

## মুস্তফা জামান আব্বাসী

কবি ফররুখ আহমদের বিখ্যাত একটি কবিতার কয়েকটি লাইনঃ

কেটেছে রঙিন মখমল দিন নতুন সফর আজ
শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক
ভাসে জোরওয়ার মৌজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ
পাহাড় বুলন্দ ঢেউ বয়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক
নতুন পানিতে সফর এবার,
হে মাঝি সিন্দবাদ

যিনি এ কবিতা লিখেছেন, তাঁকে মনে করতেই হবে। তিনি বাংলা ভাষার একজন শ্রেষ্ঠ কবি। যারা পড়েনি এ কবিতা, তারা নতুন দিনের সওয়ারী 'পাঞ্জেরী', 'সিন্দবাদ' 'শাহরিয়ার'কে চেনেননি । তাই যখন পড়ি:

রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী?/এখনো তোমার আসমান ভরা মেঘে?
সেতারা, হেলাল এখনো ওঠেনি জেগে?/তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে;
অসীম কুয়াশা জাগে শূন্যতা ঘেরি ।/রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী?
পথহারা এই দরিয়া-সোঁতায় ঘুরে/চলেছি কোথায়? কোন সীমাহীন দূরে?
মুসাফির দল ব'সে আছে কুল ঘেরি ।/তুমি মাস্তুলে আমি দাঁড় টানি ভুলে;
একাকী রাতের ম্লান জুলমাত হেরি ।/রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী?
শুধু গাফলতে, শুধু খেয়ালের ভুলে/দরিয়া-অথই ভ্রান্তি নিয়াছি তুলে,
আমাদের ভুলে পানির কিনারে মুসাফির দল বসি'/দেখেছে সভয়ে অস্ত গিয়াছে তাদের সেতারা, শশী;
মোদের খেলায় ধূলায় লুটায়ে পড়ি'/কেঁদেছে তাদের দুর্ভাগ্যের বিস্বাদ শর্বরী।

কবিতাটি লেখার সত্তর বছর পর যারা পড়ছেন তারা এর থেকে কতটুকু রস পাচ্ছেন তা নির্ভর করে তারা কোন রসের পিয়াসী তার উপর। বাংলা সাহিত্যের নতুন কাণ্ডারী যারা, তাদের সর্বাগ্রে ফররুখ। এ নৌকার পাল তুলেছিলেন ইসমাইল হোসেন শিরাজী, তারপর নজরুল ইসলাম ও সাত সাগরের মাঝির কবি ফররুখ। 'সওগাত' ও 'মোহাম্মাদী'তে যারা তার প্রথম কবিতাগুলো পাঠ করেছেন তারা বুঝতে পেরেছেন, বাংলা কবিতা এবার কোন দিকে মোড় নেবে।

ফুল নিয়ে লেখা ফররুখের ২৭টি কবিতা ক'জন পড়েছে জানি না। নতুন প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তকে ফররুখ-এর নাম খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। অথচ শাপলা শালুক, পদ্ম ফুল, কদম কেয়া, কাঁটালী চাঁপা, রজনীগন্ধা, রক্ত করবী, ঝুমকোজবা, সূর্যমুখী, রঙ্গন, চাঁপা ফুল, ভুঁই চাঁপা, গাঁদা ফুল, গোলাপ, ডালিয়া, গুলমোহর, রাতের ফুল, সন্ধ্যামণি, হাসনাহেনা, শিউলি, অর্কিড ফুল, গন্ধরাজ, বকুল, এদের চেনাবার জন্য ফুলের কাছে নিয়ে যেতে ফররুখের উপরোক্ত নামের কবিতাগুলো আবৃত্তি করাই যথেষ্ট। ফররুখ-এর সঙ্গে তখন মিশে যায় আমার নাতি-নাতনি, তাদের বাংলার হরেক রকম ফুল চেনা হয়। দশ বছরের সারিনা বলে, নানা

ফুলগুলো চেনার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিকে চেনা এ একটি মজার খেলা বটে। আমি দুষ্টমি করে ছ'বছরের নাতি আলভিকে বলি, তোমার কোনটা ভালো লাগে, গুলমেহের না কৃষ্ণচূড়া। নাতি বলল, নানা কৃষ্ণ কে? বললাম, এর চেয়ে বল গুলমেহের। হাসনু হেনার কবিতাটি সারিনার সবচেয়ে পছন্দের।

হাসনু হেনা হাসনু হেনা/খুশবুতে ঠিক যায় যে চেনা
রঙের বাহার নাইতো মোটে/মানুষ তবু আপনি জোটে
খুশবুটা তার পরাণ ভরা/খুশবুটা তার পাগল করা

ফররুখ কেন প্রয়োজন, তার জবাব এক কথায় এই যে-আল্লাহ ও রাসূলকে যিনি চেনেন না, তার কবিতার প্রয়োজন নেই। আমার কবি নন তিনি। যে কারণে নজরুল আমাদের জাতীয় কবি। সে কারণেই ফররুখ জীবনের নিশানবর্দার। পুঁথি সাহিত্যে, আরবি ফারসির শব্দের সমাহার ও নবীর নির্ভুল ঠিকানা, তার কাব্যপাঠের আনন্দ। মানবিক প্রেম, ক্ষুধিত মানুষের দাবি ছাপিয়ে সেখানে অনন্য দৃষ্টিভঙ্গির সওদা, যা সংগৃহীত খলিফা ওমরের কাছ থেকে। তাঁর রোমান্টিক কাব্যভঙ্গির সঙ্গে একাত্ম হয়েছে মুসলিম জীবন চেতনা। অল্প একটু সময় আমাদের হাতে। নানা গ্রন্থ পড়ে আছে চারদিকে। কি পড়ব তারও দিকদর্শন চাই বৈকি। যদি দিকটি হয় আল্লাহর, তাহলে অবশ্যই আগে পড়তে হবে আল-কোরআন। যদি হয় রাসূলের প্রতি মুহব্বত পড়বঃ রাসূলের হাদিস। নিজের জীবনে তা প্রতিফলিত করার চেষ্টা থাকবে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। যদি দিকদর্শন হয় অন্য আদর্শের অনুসরণে ও অনুকরণ বা পৌত্তলিকতা, তা মুসলমানদের জন্য আত্মঘাতী। এ ধরনের প্রতিটি কাজ আল্লাহ ও রাসূলের পথের অপর দিক। তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। এখানে কথা উঠতে পারে, মানবিক ও প্রেমের অনুসঙ্গে রচিত মানবতাভিত্তিক সাহিত্য কর্মের। এতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু প্রজন্মকে সঠিক পথে রাখতে হলে একমাত্র উপজীব্য হলো কোরআন ও হাদিস। যে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, উপাখ্যান রাসূলের পথের পরিপন্থী তা মুসলমানের কাজে আসবে, এটা বিশ্বাস করা কঠিন। ব্যক্তিগতভাবে আমি এ জন্য একটি সেকেন্ডও ব্যয় করার পক্ষে নই। কারণ মুমিনের জন্য একেকটি সেকেন্ড মহামূল্যবান।

বর্তমানে আমরা এমন একটি সময় অতিবাহিত করছি, যখন মুসলমান ছেলেদের শেখানো হচ্ছে পত্রিকা মারফত কিভাবে ধুতি পরতে হয়। টেলিভিশনে নাট্যানুষ্ঠানে মেয়েরা আলতা লিপস্টিক বা টিপ ব্যবহার করে, খানিকটা মেনে নিতে হয় স্টাইলের বিবর্তনের কারণে। কিন্তু যখন কপালে সিদুঁর দেয়া শুরু করে, বোঝা যায় ব্যাপারটি আর স্টাইলের পর্যায়ে রইল না। পরিত্যক্ত 'বাবু কালচার' গ্রহণ করব কিনা তা টেলিভিশনের কর্তা ব্যক্তিদের বুঝাবে। ধোপে টিকবে না এগুলো এবং মুসলমানরা সব রকমের অন্যায় আরোপকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। কাউকে ঘৃণা করব না, মুসলমানদের কাছে অগ্রহণযোগ্য আরোপিত বিজাতীয় অপসংস্কৃতি গ্রহণযোগ্য হবে না।

ফররুখ-এর মৃত্যুদিবসে কোনো বাড়তি আয়োজন নেই। আয়োজন একটিইঃ তাহলো তাঁর জন্য দোয়া করা, তাঁর কবিতা পাঠ ও তাঁর দর্শনকে সামনে নিয়ে আসা, পথের জঞ্জাল সাফ করা।

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, জুন-অক্টোবর ২০১৩]

# ফররুখ আহমদ : 'মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ'

**ডক্টর মোহাম্মদ আবদুল মজিদ**

ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) এমন একজন বিরলপ্রজ কবি প্রতিভা যার সাহিত্যিক অভিনিবেশ ছিল ঐকান্তিক নিষ্ঠায় নিবেদিত। সমকালীন সাহিত্যে যখন নিরঙ্কুশ আদর্শবাদ ছিল সঙ্কুচিত, মূল্যবোধে আস্থা ছিল ক্ষীয়মাণ, আসলের সঙ্গে নকলের, খাঁটির সঙ্গে মেকির মিশেলে পরিস্থিতি ছিল বিভ্রান্তিকর, তখন ফররুখ আহমদ ছিলেন এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। বাঙালি মুসলমানের ঐতিহ্যিক স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ফররুখ মূল্যবোধের বুনিয়াদ দৃঢ় করার সাধনায় এবং নিরীক্ষাধর্মী প্রয়াসের মাধ্যমে বাংলা কবিতার আঙ্গিক, বিষয়-সম্পদ ও প্রাকরণিক প্রকর্ষ বিধানে ছিলেন নিবেদিত। সাংস্কৃতিক রুচিকে পরিশীলিত তীক্ষ্ণতায় উজ্জ্বল করে তোলার ব্যাপারে তার প্রয়াস ছিল আন্তরিক। ঐতিহ্যের সঙ্গে অভিজ্ঞানের, উত্তরাধিকারের সাথে নতুন অর্জনের সমন্বয় সাধনে তিনি ছিলেন উৎসাহী। প্রবহমান ঐতিহ্যধারাকে উপাদান হিসাবে গ্রহণ করে তিনি এমন এক উপলব্ধির জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন, যেখানে স্থবিরতা ও উৎকেন্দ্রিকতা ছিল না। ফলে তিনি বিগত শতকের চল্লিশের দশকে অর্থাৎ উপমহাদেশীয় রাষ্ট্রনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যতের আশা ও সম্ভাবনাকে সুস্পষ্ট করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফররুখ আহমদ বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক রূপকার, দার্শনিক মহাকবি আল্লামা ইকবালের এ বাণীর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন ঃ 'আপনি দুনইয়া আপ পয়দা কর, আগার নিন্দো মে হ্যায় সিরে আদম হ্যায় ও জমিনে, কুন ফকা হায় জিন্দেগি।' অর্থাৎ নিজের পৃথিবী তুমি নিজে সৃষ্টি করো, যদি তুমি জীবিতদের মধ্যে হও, জীবন হচ্ছে আদমের গুপ্ততত্ত্ব, বিশ্বসৃজনকারী বিবেক।

এক সুমহান ব্যাপ্তি ও আদর্শ নিয়ে, গতানুগতিকতার সাথে সন্ধি না করে, ভিন্নতর পদ্ধতিতে ফররুখ আহমদ তাঁর আপন কাব্যভুবন রচনা করে গেছেন। মুসলিম বিশ্ব আত্মা তথা মানবতার নিঃশর্ত কল্যাণ কামনাই ছিল তাঁর আরাধ্য সাধনা। তাঁর এ জীবন সাধনার পেছনে ছিল সিরাজাম মুনিরার আদর্শ, সিন্দবাদের নিরলস অভিমানী মদদ আর হাতেম তাঈর মতো শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী পৌরষিত ব্যক্তিত্ব। নৌফেল ও হাতেম (১৯৬১) কাব্যনাটিকার শায়েরের মুখ দিয়ে তাঁর নিজের কথাই যেন ধ্বনিত হয়-

> 'কাব্য নয়, গান নয়, শিল্প নয়-শুধু / সে মানুষ/নিঃস্বার্থ ত্যাগী ও কর্মী
> সেবাব্রতী, পারে যে জাগাতে / সমস্ত ঘুমন্ত প্রাণ; ঘুম ঘোরে যখন বেঁহুশ;
> জ্বালাতে পারে সে আলো / ঝড় ক্ষুব্ধ অন্ধকার রাতে।'

ফররুখ আহমদ বিশ শতকের ত্রিশোত্তরকালের কবি। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক চিন্তাচেতনার জগতে তখন হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেখা দিয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবিতে সোচ্চার। ফররুখ আহমদ এ মাহেন্দ্রক্ষণে সাহিত্যে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের মন্ত্র বীজ উপ্ত করেন। 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের' কর্মযোগী ও অন্যতম স্থপতি কাজী আবদুল ওদুদের (১৮৯৪-১৯৭০) ভাষায়- ভারতীয় মুসলমানদের তমসাচ্ছন্ন পরিবেশ প্রতিবেশে দার্শনিক কবি ইকবাল এবং কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব ছিল ঐতিহাসিক ঘটনা। ইকবালের সম্মোহনী গান এবং নজরুলের তীব্র হুঙ্কার ঘুমন্তপ্রাণ মুসলিমকে চমকে দিয়েছিল। ধাক্কা খাওয়া মুসলমানদের আত্মস্থ করতে এবং সঠিক নতুন পথ চিনিয়ে দিতে এগিয়ে আসেন ফররুখ আহমদ। তিনি ভারতীয় মুসলমানের রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করেন।

ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণে নিপীড়িত উপমহাদেশের মুসলমান তাদের গৌরবময় অতীত ঐতিহ্য, শৌযবীর্যের কথা ভুলে গিয়েছিল। মুক্তচিন্তার সকল দুয়ার বন্ধ করে তারা 'আয়েশী রাতের প্রহর গুনে' চলছিল। অন্ধকারে হাবুডুবু খাওয়া ছাড়া তাদের আর কোনো গত্যন্তর ছিল না। বিশ্বের সর্বত্র যখন প্রগতির জয়যাত্রা শুরু হয়েছে ভারতীয় মুসলমান তখনো ঘুমন্ত। তাদের ধিক্কার দিয়ে জাগরণের উদ্দীপ্ত প্রেরণা সৃষ্টি করেন ফররুখ আহমদ -

কত যে আঁধার পর্দা পারায়ে ভোর হল জানি না তা;
নারঙ্গীবনে কাঁপছে সবুজ পাতা।
দুয়ারে তোমার সাত-সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা।
তবু তুমি জাগলে না? তবু তুমি জাগলে না?

ফররুখ আহমদ বুঝেছিলেন ইসলামি ঐতিহ্য ও আদর্শবোধে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে মুসলমানদের সম্বিত ফিরে আসবে। তিনি তাই মুসলিম ইতিহাস থেকে ঘটনা বেছে নিয়ে সেখানকার আদর্শ চরিত্রাবলিকে তাঁর কাব্যের আদর্শ হিসাবে বিনির্মাণ করেন। তিনি চেয়েছিলেন ইসলামি চিন্তধারার নবমূল্যায়ন করতে এবং তার মাধ্যমে অতীতমুখী মুসলমানদের প্রগতিমুখী করতে।

ফররুখ আহমদ তাঁর কাব্যের উপকরণ সংগ্রহ করেন পুঁথিসাহিত্য, আরবি ফারসি উপন্যাস, ইকবাল, সাদী, রুমী, আর মুসলিম সাধক পুরুষদের জীবনেতিহাস থেকে। সাহিত্যের উপকরণ খুঁজতে যেয়ে তিনি পুঁথিসাহিত্যের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বলে অনেকে তাঁকে সেকেলে অভিধায় আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু এটা ভাবা অসঙ্গত হবে যে পুঁথিসাহিত্যের হাতেম তাঈ এবং ফররুখ আহমদের হাতেম তাঈ এক। যদিও উভয়ে একই ইয়েমেন দেশের অধিবাসী তবু ভাব, ভাষা, পরিবেশ, প্রতিবেশ, জীবনবোধ সর্বদিক দিয়ে তাদের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান বিদ্যমান।

শিল্পের খাতিরে পুঁথিসাহিত্যের ঐতিহ্য রক্ষা ফররুখ আহমদের উদ্দেশ্য ছিল না- তার আসল অভিপ্রায় ছিল এ সমস্ত বিষয়াবলিকে এমনভাবে উপস্থাপন করা যাতে করে মুসলমানদের মধ্যে অনুসরণীয় আদর্শ রয়েছে তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যায়। হাতেম তাঈকে তিনি এঁকেছেন মানবতাবাদী সমাজসেবী মহৎপ্রাণ ব্যক্তি হিসাবে। প্রকারান্তরে তিনি এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, মুসলিম পুনরুজ্জীবন সম্ভবপর হতে পারে মানবতার নিঃস্বার্থ সেবার মাধ্যমে।

১৯৪৩-৪৪ সনে রচিত হয় কবির 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্য। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে স্বাধিকার চেতনার উন্মেষ সবেমাত্র তখন দেখা দিয়েছে। এ কাব্যের অধিকাংশ কবিতাতেই কবির আদর্শ ও ঐতিহ্যপ্রীতির পরিচয় ফুটে উঠেছে। 'পাঞ্জেরী' কবিতায় হতাশাগ্রস্ত মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ ও সঠিক চলার পথ প্রার্থনা করে তীব্র ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ বর্ণনায় বলা হয়েছে–

শুধু গাফলতে, শুধু খেয়ালের ভুলে
দরিয়া অথই ভ্রান্তি নিয়াছি তুলে
আমাদেরি ভুলে পানির কিনারে মুসাফির দল বসি
দেখেছে সভয়ে অস্ত গিয়াছে তাদের সেতারা শশী।

মুসলিম জাতি এখন 'অনিমেষ নিরুদ্দেশ যাত্রী'। তারা এখন দীঘল রাতের শ্রান্ত সফর শেষে কাল দরিয়ার কাল দিগন্তে এসে পড়েছে। তরীর পাইলট 'পাঞ্জেরী'কে কবির আকুল জিজ্ঞাসা –

রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী?/ এখনো তোমার আসমান ভরা মেঘে?
সেতারা হেলাল এখনো ওঠেনি জেগে? / তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে;
অসীম কুয়াশা জাগে শূন্যতা ঘেরি! / 'রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী?

মানবতার ধর্ম ইসলাম। ইসলাম যে সাম্যনীতি ঘোষণা করেছে বিশ্ববাসীর শান্তি পূর্ণ জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য তা সকলের জন্যই মহাকল্যাণকর। কিন্তু আধুনিক বিশ্বমানবতার অবমাননা দেখে কবি ক্ষুব্দ, মর্মাহত। তাই কবিতায় কবির সে করুণ আর্তি প্রকাশ পেয়েছে-

'পড়ে আছে মৃত মানবতা
তারি সাথে পথে মুখগুঁজে
পশাচিক লোভ
করিছে বিলোপ
শাশ্বত মানবসত্তা মানুষের প্রাপ্য অধিকার
ক্ষুধিত মুখের গ্রাস কেড়ে নেয় রুধিয়া দুয়ার
মানুষের হাড় দিয়ে তারা আজ গড়ে খেলাঘর

সাক্ষ্য তার পড়ে আছে মুখ গুঁজে ধরণীর পর'।

কবি মানবতার এ অপমান দেখে শুধু বিলাপ করে ক্ষান্ত হননি। কবিকণ্ঠে পরিশেষে ধ্বনিত হয়েছে প্রতিবাদ, অভিশাপ আর সংগ্রামী হুঙ্কার ঃ

হে জড় সভ্যতা! / মৃত সভ্যতার দাস স্ফীতমেদ শোষক সমাজ?

মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ / তারপর আসিলে সময় বিশ্বময়

তোমার শৃঙ্খলগত মাংসপিণ্ডে পদাঘাত হানি / নিয়ে যাব জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে টানি।

ফররুখ আহমদ শুধু ইসলামি জীবন ইতিহাস ও তার পরিমণ্ডলীয় উপকরণ নিয়ে কবিতা লিখে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেননি– আরবি-ফারসি শব্দাবলি তাঁর কব্যে সুনিপুণভাবে প্রয়োগ করে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারকে সম্পদশালী করেছেন। ফলে বাংলা কাব্যে রাম-লক্ষণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ, সীতা-সাবিত্রীর পাশাপাশি ইউনুস নবী, সোলায়মান নবী, খিজির, হাতেম তাঈ, রুস্তম, নমরূদ, কারুন, জোলেখা, লায়লী, শিরি, রাবেয়া, হাজেরা প্রমুখের নাম পাওয়া যায়। এটা মুসলিম ঐতিহ্যের প্রতিফলন। ফররুখ কাব্যের ভাব, ভাষা, বিষয় এবং আবেদন সবকিছুর মধ্যেই এ ঐতিহ্যবোধ সুস্পষ্ট।

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, জুন-অক্টোবর ২০১৩]

# আমার দেখা কবি ফররুখ আহমদ

**মাহবুবুল হক**

ছাত্রজীবনেই কবি ফররুখ আহমদ-এর কাব্যের সাথে পরিচিতি লাভ করেছি। ষাটের দশকটাই ছিল বোধহয় শেষ নান্দনিক দশক। শিল্প, সাহিত্য সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক কর্ম-চাঞ্চল্যে তখন স্থূলতার পরিবর্তে সূক্ষ্মতার প্রাধান্যই ছিল লক্ষণীয়। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ছাত্র প্রতিষ্ঠানের পোস্টার ছিল দৃষ্টিগ্রাহ্য ও শোভন। কাব্যের লাইন দিয়ে পোস্টারের অবয়ব গড়ে উঠতো। ছাত্র ইউনিয়ন প্রায়শ সুকান্ত, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কাব্যগাঁথা দিয়ে অনিন্দসুন্দর পোস্টার তৈরি করতো। দেখা-দেখি ইসলামী ছাত্র সংঘও নজরুল ও ফররুখের কাব্যমালা দিয়ে দৃষ্টি-নন্দন পোস্টার বানাতো। বলতে দ্বিধা নেই, নজরুলকে তখনও মধ্যবিত্ত সমাজ এখানকার মতো এতো আপন করে নিতে পারেনি। নজরুলকে ঘিরে একটা আড়ষ্টতা ছিল। অস্পষ্টতা ছিল। অস্পষ্টতার সেই অপচ্ছায়া তরুণদের মাঝেও বিরাজমান ছিল। এ কারণে ইসলামী আন্দোলনের সাথে যুক্ত সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনের কর্মীরা ফররুখ আহমদ-এর 'সাত সাগরের মাঝি', 'সিরাজাম মুনীরা', 'হাতেম তায়ী', 'নৌফেল ও হাতেম' তন্ন তন্ন করে সাযুজ্যময় পঙ্ক্তিমালা আহরণ করতো এবং নানা রঙ্গের কালির আঁচড়ে কাব্যময় পোস্টার গড়ে তুলতো। এ প্রক্রিয়ায় ফররুখ কাব্যের সাথে আমার পরিচয়। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট হলেও এর মাঝে সাংস্কৃতিক সুষমা বিদ্যমান ছিল। অপ্রাসঙ্গিক হলেও সত্য, এই সামান্য শিল্পচর্চার মাধ্যমে ইসলামী ছাত্র সংঘ ষাটের দশকে পূর্ববাংলার মেধাবী তরুণদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। পরবর্তীতে শিল্পচর্চার সেই সূক্ষ্ম ও অমিত রূপটি ধূলিমলিন হয়ে যায়।

ষাটের দশকে তরুণদের চোখে ফররুখ ছিলেন অমিততেজা সিন্দবাদ। দুর্জয়ী, দিগ্বিজয়ী, স্বপ্নাচারী সিন্দবাদ। মাত্র দস্যু মোহন ও বাহরাম-এর থ্রিল থেকে বেরিয়ে সিন্দবাদের থ্রিলে আমরা যুক্ত হয়েছি। এর মাঝেই ৬৯-এ আমার ঢাকা আগমন। প্রকাশিতব্য একটি দৈনিকে শিক্ষানবিসী এবং সেই সাথে 'মুক্তবুদ্ধি' নামে সাহিত্য আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ততা। আমার ওপর মেধাবী ছাত্র আবদুল মালেকের শাহাদাতের ওপর 'নিবেদিত প্রাণ অনির্বাণ' নামে কাব্য সংকলন প্রকাশের দায়িত্ব অর্পিত হয়। বন্ধু সানাউল্লাহর সৌজন্যে শাহবাগ এলাকার রেডিও অফিসে গিয়ে কবি ফররুখ আহমদ-এর সামনে হাজির হলাম। উদ্দেশ্য কবিতা সংগ্রহ থাকলেও মূল উদ্দেশ্য ছিল জিন্দা-সিন্দবাদ দর্শন। তাম্বুল-রাগ রঞ্জিত প্রস্ফুটিত মুখ, বড় ঘরানার চশমাচ্ছাদিত বিশাল বিশাল মায়াবী চোখ মহান শিল্পীর মতো লম্বা লম্বা চুল, মানানসই তথা মননশীল দাড়ি সব মিলিয়ে স্বপ্নাবিষ্ট ও দুর্দমনীয় অভিযাত্রী বলেই আমার মনে হয়েছে। মনে আছে আবেগের আতিশয্যে কথা বলতে পারছিলাম না। এত বড় কবি। এত সাধারণ! চা-সিংগাড়া খাওয়ালেন। দিনাজপুরের কবি-সাহিত্যিকদের খোঁজ খবর নিলেন। বলা বাহুল্য, দিনাজপুরের লোককবি নূরুল আমিনের জামাতা হেমায়েত হোসেন ছিলেন কবির সহকর্মী। দু'জনে একই রুমে বসতেন। কবি তাঁর সাথেও আমাদের আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিলেন। পদ-মর্যাদায়

বড় হলেও আমাদের সামনে হেমায়েত সাহেব কবিকে যথাযথভাবে সমীহই করলেন তা ফজল-এ-খোদাও এসে দাঁড়ালেন কবি-রাজের সামনে কবি-প্রজার মতো। অনেক কথা বলছিলেন, আজ আর কিচ্ছু মনে নাই। শুধু এটুকু মনে আছে তিনি ঘুরে ফিরে নতুন সফরের কথা, দিগ্বিজয়ের কথা এবং আকাশ-পাতাল স্বপ্নের কথা বলছিলেন।

সত্তর দশকের শুরুতে বৃহত্তর অঙ্গনে কাজ করবার আহ্বান জানালেন ঋদ্ধ পুরুষ ড. হাসান জামান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক, বিশিষ্ট মনীষী ড. জামান তখন ডেপুটেশনে জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থায়। লেখা সংগ্রহের কাজ পেলাম। ডান-বাম-মধ্যম সব ধরনের লেখক ও বুদ্ধিজীবীর কাছ থেকে পাণ্ডুলিপি নিচ্ছি। এ সময় লেখা বা পাণ্ডুলিপি দিতে অস্বীকার করলেন প্রথিতযশা মাত্র তিনজন কবি ও লেখক। ফররুখ আহমদ, শামসুর রাহমান ও আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী। পরবর্তীতে কবি শামসুর রাহমানের 'তিনটি গোলাপ' নামের একটি চটি কাব্য গ্রন্থ জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সেটা তাঁর অনুমতি ছাড়া প্রকাশ পেয়েছে বলে আমি মনে করি না। বলা বাহুল্য, শামসুর রাহমানের উক্ত পঙ্‌ক্তিমালা ছিল ৬৫-এর যুদ্ধকেন্দ্রিক। কাব্যমালার ২টি পঙ্‌ক্তি এখনও আমার মনে আছে।

এই দিন চিরদিন জনতার চোখে জ্বলবে,
সোনা ঝরা আগামীর রূপময় কথা বলবে।

একদিন ডক্টর হাসান জামান আমাকে ডেকে বললেন : আমার মামার (কবি ফররুখ আহমদ) কাছ থেকে পাণ্ডুলিপি আনলেন না? বললাম : না স্যার এখনও যাইনি। তবে শুনছি, তিনি আমাদের কাছে পাণ্ডুলিপি দিবেন না। সরকারের দাওয়াত, উপাধি ও অর্থ তিনি যেভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন, ঠিক একইভাবে তিনি আমাদেরও ফিরিয়ে দেবেন। হাসান জামান বললেন : আপনার অ্যাপ্রোচ ভালো আছে। যান। দুটো গাল শুনলেও মামার পাণ্ডুলিপিগুলো নিয়ে আসুন। বড় কাজ হবে। দেখুন না, কবি জসীমউদ্‌দীনের সব পাণ্ডুলিপি নিয়েছি। তাঁকে ৬৫,০০০ টাকা দিয়েছি। তিনি তাঁর গাঁয়ে একটা বড় স্কুল করার অঙ্গীকার করেছেন। বললাম : কবির কাছে আপনি যান স্যার। আপনি গেলে পাণ্ডুলিপি পাবেন। আপনাকে ফেরাবেন না। বললেন : পাগল হয়েছেন। আমাকে মার দিবেন! আমার দ্বারা হবে না। আপনি অন্য কাউকে নিয়ে যান।

আমি অনেক চিন্তা করে 'পাকিস্তান দরদী সংঘের' সভাপতি এডভোকেট এ.টি. সাদীর ছোট ভাই আমার সহকর্মী আবুল ফজল সাদীকে সাথে নিয়ে কবি ভবনে যাই। আমাদের পেয়ে কবি খুব খুশী। তবে সংবাদপত্র ছেড়ে সরকারী চাকরিতে ঢুকেছি বলে ভর্ৎসনা করলেন। জাতীয় পুনর্গঠনের নাম শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন : গাছের গোড়া কেটে ওরা আগায় পানি ঢালছে। ওরা ইসলাম শেষ করে দিয়েছে। স্বৈরাচারীদের দ্বারা ইসলামের কাজ হবে না। আমি আম্‌তা আম্‌তা করে জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার প্রকাশনীর ব্যাপক ও বিশাল দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করতেই তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন : স্বৈরাচারের ভালো কাজে সহায়তা করাও হারাম। স্বৈরাচারীর কোন ভালো কাজ থাকতে পারে না। আমরা পাপী, অপরাধী ও আসামীর মত চুপ করে রইলাম। বললেন : চুপ করে আছ কেন ? বল কী জন্যে এসেছো। আমরা চুপ করেই থাকলাম। বললেন : বুঝেছি। ও পাঠিয়েছে। পাণ্ডুলিপির জন্য। খবরদার এ জন্য আর কখনও আসবে না। জামানকে আসতে

বলবে। আমরা চুপিসারে দুধ ও মাছ খাওয়া অপরাধী বেড়ালের মতো সুর সুর করে বেরিয়ে এলাম।

মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতীয় আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদ থেকে মুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে কবির বেনামে কিছু লেখা ড. হাসান জামানকে দিয়েছিলেন। তিনি সেসব কাজেও লাগিয়েছিলেন। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে সেসব এক অভিনব ও যৌক্তিক মাত্রা সংযোজন করেছিল, আপাত বিচারে সে সব ছিল বিরোধী ও ভিন্নধর্মী।

স্বাধীনতার পর 'সোনার বাংলা' প্রকাশ করে কবির সামনে হাজির হয়েছি। আবেগের রাজ-পুরুষ দু'বাহু মেলে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন : শাহেদ আলী, আজরফ সাহেব, গফুর সাহেব, মীর ফখরুজ্জামান এঁদের সাথে যোগাযোগ কর। করলাম। এঁদেরই কেউ কেউ মুসলিম বাংলার আওয়াজে শান দিচ্ছেন। 'সোনার বাংলা'ও মুসলিম বাংলার থিম নিয়ে কিছুদিন কাজ করেছে। সে কাজ ছিল নিঃস্বার্থভাবে এবং জাতিগত স্বার্থে। এই পটভূমি ও পর্যায়ে যতদিন আমরা কবির সান্নিধ্যে গিয়েছি ততদিন আমরা হেরার রাজতোরণের উচ্চাশায় উদ্বেলিত হয়েছি। কবির ধ্যান-ধারণায় ইসলাম ছিল মুখ্য, কোনো বিশেষ দেশ বা ভূমি কখনও মুখ্য ছিল না। কবি পাকিস্তান চেয়েছিলেন ইসলামের জন্য। যে পাকিস্তানে ইসলাম ছিল না, সে পাকিস্তানের জন্য তাঁর কোনো আগ্রহ বা আর্তি ছিল না। একইভাবে ইসলামহীন মাতৃভূমিও তাঁর কাছে অসহনীয় এবং অকল্পনীয় ছিল। আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মহিমায় উজ্জ্বল এক নবতর সমাজ ছিল তাঁর কাম্য ও আরাধনার ধন। তাঁর কাব্য সমগ্র বিশেষ করে 'সিরাজাম মুনীরা'র প্রতি পরতে পরতে তা' বিধৃত। চিন্তায়, চেতনায়, বৈদগ্ধে, বিশ্বাসে ও কর্মে এবং আচরণে এমন স্বচ্ছতা মেলা ভার।

জীবনের সব কিছু নিয়েই মত-ভিন্নতা বা মতদ্বৈততা থাকতে পারে। থাকাটাই, স্বাভাবিকতা। একটি বাগানে এক রকম ফুল থাকলে সে বাগান কখনও দৃষ্টি-নন্দন বা দৃষ্টিগ্রাহ্য বলে প্রতিভাত হয় না। নানা জাতের নানা রঙ্গের ফুলের সমারোহে একটি বাগান পূর্ণতা লাভ করে। পূর্ণতর সে সমাজ নির্মাণের আগেই অনেকটা অবহেলায় কবি আমাদের ছেড়ে গেলেন। আমাদের সমাজে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বা ভিন্নমত পোষণকারীদের মধ্যে ঐক্য-সূত্র একেবারেই নেই, এমন তো নয়। একটা উদার ও মানবিক মুসলিম সমাজেও এক সময় সংকীর্ণতা বাসা বেঁধেছিল। কবি নিঃসন্দেহে সেই অপসময়ের শিকার। সে সময়ে কবি ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন। অবহেলিত হয়েছেন। কোনো ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা পাননি। পরপারে যাত্রার কালেও দেশ, জাতি বা সরকারের কাছে কোনো সহায়তা কবি পাননি। পেয়েছেন কবি বেনজীর আহমদ ও সুরকার আজাদ রহমানসহ হাতেগোনা কয়েকজন কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীর ঐতিহাসিক সহায়তা ও সহানুভূতি।

কবি ধীরে ধীরে ছাই-চাপা আগুনের মতো জ্বলে উঠছেন। তাঁর কাব্য শুধু নয়, গান নিয়ে গবেষণা চলছে, গানের স্বরলিপি তৈরি হচ্ছে। এমন দিন হয়তো বেশি দূরে নয় যখন নজরুল গীতির পর ফররুখ গীতি নিয়ে আমরা মাতোয়ারা হবো। জাতীয় কবি নজরুলের পাশাপাশি মানবতার কবি ফররুখকে নিয়ে গৌরব প্রকাশ করবো। ▭

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ৫ম সংখ্যা, জুন, ২০০২]

# ফররুখ আহমদের সময় : স্বভাব ও তাঁর আদর্শ

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

১৯৯৭ সালের জুন মাসে আমি সৌদি আরবের তাবুক ও হাইল সফর করি। হাইল নগরী রিয়াদ ও তাবুকের মাঝামাঝি অবস্থিত। দু'দিক থেকেই দূরত্ব প্রায় সাতশ কিলোমিটার। নফুদ আল কবির মরুভূমির প্রান্ত ঘেঁষে অবস্থিত হাইল থেকে মদীনার দূরত্ব সাড়ে চারশো কিলোমিটার। নহরে জোবায়দার জন্য বিখ্যাত এই হাইল। এই হাইল হয়েই 'রোড টু মক্কা'র লেখক মুহাম্মদ আসাদ সৌদি আরবে প্রবেশ করেছিলেন। হাইল সৌদি আরবের অন্যতম গেইটওয়ে হিসাবে বিবেচিত।

হাইল সফরে গিয়ে প্রথম জানলাম, শহর থেকে ষাট-সত্তর কিলোমিটার দূরেই শাম্মার পর্বতমালার এক দুর্গম উপত্যকায় তায়ী এলাকায় রয়েছে হাতেম তা'য়ীর বাড়ি। তাঁর কবরটিও সেখানে এখনো সুচিহ্নিত। সৈয়দ হামজার পুঁথি 'হাতেম তায়ী' আমি পড়িনি। তবে 'য়েমনের শাহজাদা তায়ীপুত্র হাতেম'-এর মহত্ত্ব-গাথা আমি পাঠ করেছি কবি ফররুখ আহমদ বিরচিত 'নৌফেল ও হাতেম' কাব্যনাট্যে এবং 'হাতেম তায়ী' মহাকাব্যে। সেই য়েমনের শাহজাদা শুয়ে আছেন, হাইল শহরের কাছে! জেনে মনটা এক নতুন এডভেঞ্চারের আবেগে নেচে ওঠলো। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে ইয়েমেন নানা কারণে প্রাধান্য পেয়েছে। বোধ করি সে কারণেই হাইলের হাতেম আমাদের কাছে পরিচিত হয়েছেন 'য়েমনের শাহজাদা' রূপে।

দুর্লংঘ পার্বত্য পথের বাধা অতিক্রম করে সুউচ্চ পর্বত সারির মাঝখানে এক সমতল চত্বরে হাতেম তা'য়ীর প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরনো বাড়ি। বাড়ির কক্ষগুলো এখনো চিহ্নিত করা যায়। বাড়ির এক পাশে একটি মাটির বুরুজ এখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। উত্তর ও দক্ষিণে দুটি কূ'য়া, এখন পরিত্যক্ত। দক্ষিণ-পশ্চিমে পর্বতের কোল ঘেঁষে প্রাচীর-ঘেরা একটি জায়গা। সেখানে দুটি প্রাচীন কবর, একটি হাতেম তায়ীর, অন্যটি তাঁর মায়ের। ফররুখ আহমদের কাব্য পাঠে জেনেছি, হাতেম তায়ী ছিলেন ত্যাগ ও সাহসে দীপ্ত, প্রত্যয়ে দৃঢ় ও বিশ্বাসে বলীয়ান এমন এক ব্যক্তিত্ব, যাঁর মাথা শাম্মারের গিরি-চূড়া ভেদ করে আকাশের নীলিমাকে যেন স্পর্শ করে। হাতেম তায়ী ফররুখ আহমদের মানবতাবাদী আদর্শের এক সমুন্নত পতাকা। 'নৌফেল ও হাতেম' কাব্য-নাট্যে হাতেমের মহৎ কর্ম সম্পাদনের পথে নৌফেল চরিত্রটি অন্যায়-জুলুম-লোভ-কামনা ও হিংসার বিরুদ্ধে এক প্রবল দেয়াল। অন্যদিকে, হাতেম তায়ী সকল বাধা-বিঘ্নের দেয়াল গুঁড়িয়ে মানবতার কল্যাণ সাধনে এগিয়ে যান আপন লক্ষ্যপানে।

এভাবেই ফররুখ আহমদ অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়কে, মিথ্যার উপর সত্যকে, লোভের উপর ত্যাগের শক্তিকে উচ্চকিত করেন। ফররুখ আহমদ তাঁর অনন্য হাতেম-প্রতীকে মানবতাবাদী আদর্শের বিজয়কে চিহ্নিত করেছেন। মানব-মুক্তির জয়গান গাওয়া কোন অলস, কর্মবিমুখ ভীরু, লোভী ও প্রবৃত্তির দাসত্ব-শৃংখলে আবদ্ধ

ব্যক্তির কর্ম নয়, বরং সংগ্রামী ও সাধক মানুষের ব্রত এটি, একথাও তিনি তুলে ধরেছেন। আবুল কালাম শামসুদ্দীন, কবি আবদুল কাদির, সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ 'হাতেম তা'য়ী' মহাকাব্যকে বাংলা সাহিত্যে ফররুখ আহমদের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান বলে উল্লেখ করেছেন। ফররুখ আহমদ তাঁর এই কাব্যে লিখেছেন :

"য়েমনের শাহজাদা তা'য়ী' পুত্র হাতেম যেদিন
আত্মজিজ্ঞাসার মুখে খুঁজে পেল পথের নির্দেশ
ইনসানের খিদমত আর মুক্ত প্রজ্ঞার সন্ধান
বিশ্ব রহস্যের মাঝে তন্দ্রাহারা মোরাকাবা শেষে
সত্যের ইশারা পেয়ে জেগে ওঠে উল্লাসে যেমন
ধ্যানী পাঠকের আত্মা। সেইমত য়েমনী হাতেম
সঙ্কীর্ণতা মুক্ত চিত্তে পেল ফিরে দীপ্ত অনুভূতি জীবনের;"

'নওফেল ও হাতেম' কাব্যনাট্যেও আমরা হাতেমকে খেদমতগার রূপে উন্নত শির মর্দে-মুমিন রূপে দেখি :

এলাহীর রেজামন্দি চেয়ে
যে হয় খিদমতগার মানুষের কিংবা মখলুকের
হয় না সে কোনদিন খ্যাতির পূজারী, যে মু'মিন
মুজাহিদ, বিশ্বাসী সে, হয় না সে নতশির
আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে।
একথা ভেবনা তুমি, অত্যাচারী জালিমের ভয়ে
থেমে যাবে মানুষের মনুষ্যত্ব। জুলুমশাহীর
শাসনে হয়নি শেষ কোন দিন ধর্ম, নীতি, শুধু
মিটে গেছে জালিমের নাম ও নিশানা!"

হাতেম তা'য়ীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফররুখ আহমদকে, তাঁর আদর্শিক পরিচয়ের ব্যাপ্তিতে স্পষ্টভাবেই চিহ্নিত করা যায়। হাতেম তায়ীর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আমারও মনে হয়েছিল যেন আমি ফররুখের কবরের পাশেই দাঁড়িয়ে আছি।

ফররুখ আহমদের কাব্যের আরেক প্রতাপদীপ্ত প্রতীকের নাম সিন্দবাদ। ফররুখের কবিতার অনেকখানি ঠাঁই জুড়ে আছেন এ দূর নির্ভীক নাবিক। সাগর থেকে সাগরে ভেসে, পাহাড় সমান ঢেউয়ের সাথে লড়াই করে নব জীবনের সন্ধান করেন সিন্দবাদ। সিন্দবাদের প্রতীকে ফররুখ তাঁর জাতির নিদ্রিত আত্মাকে ডাকছেন ঃ

ছিঁড়ে ফেলো আজ আয়েশী রাতের মখমল অবসাদ
নতুন পানিতে হাল খুলে দাও হে মাঝি সিন্দবাদ।

হাতেম তা'য়ীর মতোই সিন্দবাদ চরিত্রটি ফররুখ আহমদকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে। জীবন সংগ্রামী সিন্দবাদকে প্রতীকরূপে ব্যবহার করে তিনি ঘুমন্ত প্রায় মুসলিম জাতিকে আয়েশী রাতের মখমল-অবসাদ ছিন্ন করে সাহসী সংগ্রামী নাবিকরূপে নব জীবনের উজানে কিশ্‌তী ভাসানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

"সাত সাগরের মাঝি চেয়ে দেখো দুয়ারে ডাকে জাহাজ
অচল ছবি সে, তসবির যেন দাঁড়ায়ে রয়েছে আজ

হালে পানি নেই, পাল তার ওড়ে নাকো
হে নাবিক! তুমি মিনতি আমার রাখো।"

ফররুখ আহমদ মানবতাবাদী কবি, জীবনবাদী কবি। পলায়নবাদ তাঁর আত্মাকে কখনো স্পর্শ করেনি। কঠোর বাধা-বিপদের কোনো তুফান-সয়লাব তাঁকে তাঁর আদর্শের পথ থেকে টলাতে পারেনি। আবদুল কাদিরের ভাষায়, "অকুতোভয় চলার আনন্দই তাঁর কাব্যকে করেছে সৌন্দর্যের সামগ্রী।" **(ফররুখ আহমদ : ব্যক্তি ও কবি)**। উৎপীড়িত মানব সমাজের মুক্তির জন্য তিনি যে সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছেন, সে মুক্তির অবয়বও ক্রমশ তাঁর কাছে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।

জাতীয় পতিত দশার মধ্যেও তাঁর সামনে ক্রমেই মুক্তির মঞ্জিল দৃষ্টিগোচর হয় :

"ফেলেছি হারায়ে তৃণঘন বন, যত পুষ্পিত বন–
তবু দেখা যায় দূরে বহু দূরে হেরার রাজতোরণ।"

এরপর ফররুখ তাঁর আদর্শিক লক্ষ্যবিন্দুর আরো নিকটবর্তী হন। ...

"ডাক দিল আজ হেরার শিখর চূড়া
ডেরার কপাট খোল আজ বন্ধুরা।"

ফররুখ তাঁর কবিতায় ঐতিহ্যের ভাণ্ডার মন্থন করে তুলে আনেন একেকটি অসামান্য প্রতীক। ত্যাগে ও সংগ্রামে, সাহস ও দৃঢ়তায় হাতেম ও সিন্দবাদ প্রতীকের জুড়ি বাংলার কাব্যভুবনে অতিশয় বিরল। ফররুখের কবিতায় দশ দিগন্ত আলোকিত করে উদ্ভাসিত হয় 'সিরাজাম মুনীরা'– মানবতার মহত্তম আদর্শ রূপে। 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যে কবির যে জীবনবোধ, জীবন-দৃষ্টি, স্বপ্ন-কল্পনা ও ধ্যান-ধারণা ফুটে উঠেছে, 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্যে তা অধিকতর পূর্ণতা পেয়েছে।

ফররুখ আহমদ মধ্য তিরিশ থেকে ১৯৭৪ সালে তাঁর মৃত্যুকাল অবধি একটানা লিখেছেন। চল্লিশের দশকে তাঁর কাব্য প্রতিভার দীপ্তি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আবদুল মান্নান সৈয়দ লিখেছেন : "তিরিশের দশকের কবিরা ছিলেন মূলত ব্যক্তিক : ব্যক্তির ভিতরে দিয়ে অগ্রসর হয়েই তাঁরা সত্যের সন্নিধানে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু চল্লিশের কবিরা মূলত আদর্শিক : এঁরা আত্মাকে দমিত রেখে দৈশিক, সামাজিক বা জাতিগত কোন আদর্শিক টানে কবিতা লিখেছিলেন। এক মহাযুদ্ধ পেরিয়ে আসা, আরেক মহাযুদ্ধের আসন্নতার মধ্যবর্তী অপেক্ষাকৃত শান্ত এক উপত্যকায় তিরিশের কবিরা উন্মীলিত হয়েছিলেন, কিন্তু চল্লিশের কবিরা প্রথম যৌবনেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঝড়ো কালো দিনগুলিকে– যুদ্ধে দু'পক্ষের দাঙ্গায় তাদের উন্মীলনের মুহূর্ত বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। ফলে একটি ধ্বংসশীল পৃথিবীতে বাস করে তাঁরা আসলে ভবিষ্যতের ভরসায় বুক বেঁধেছিলেন। এরা যে জাতিগত ভাবনা বেদনায় অঙ্গীকৃত হবেন, তা ছিল আসলে সময় স্বভাবের।" **(প্রেক্ষণ, ফররুখ সংখ্যা, ১৯৯৪)**

কবি ফররুখ আহমদের সময়-স্বভাব সম্পর্কে বলতে গেলে আমাদের ইতিহাসের আরো গভীরে দৃষ্টিপাত করতে হবে। 'নজরুল সাহিত্যের পটভূমি' শীর্ষক একটি লেখায় ফররুখ আহমদ তাঁর ভাষায়, 'ওহাবী আন্দোলনের ব্যর্থতা'র কারণে 'জাতীয় জীবনে মারাত্মক নৈরাশ্য আর অবসাদের কথা বলেছেন, ১৯০৫ সালে এসে সে 'নৈরাশ্যের মাঝে কিছুটা আলোর ইশারা' লক্ষ্য করেছেন, 'আত্মবিস্মৃত জাতির

জীবনে খিলাফত আন্দোলনের দুকূল-প্লাবী বন্যা'র কথা বলেছেন এবং 'বহু শতাব্দী ধরে আরবি ফারসির মিশেলে গড়ে ওঠা বাঙালি মুসলমানের বাংলা জবানের বিরুদ্ধে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ষড়যন্ত্রের কথা বলেছেন। 'নজরুল প্রসঙ্গ' নামে আরেকটি প্রবন্ধে কবি লিখেছেন : "পলাশীর আম্রকাননে মুসলমানের যে সৌভাগ্য-সূর্য পরাজয়ের যবনিকায় ঢাকা পড়েছিল, ওহাবী আন্দালন ও সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতায় মুসলমানের সেই যৌবনে যে তুহিন পাথর নেমেছিল, সেই স্থবিরত্বে অধীর গতিবেগ সঞ্চার করলেন কবি নজরুল ইসলাম। ভারতের পশ্চিম প্রান্তে মহাকবি ইকবাল অবশ্য অনেক আগেই সন্ধান দিয়েছিলেন আবে-হায়াতের।"

এই দু'টি লেখাতে ফররুখ আহমদ নজরুলের সময় ও স্বভাবের যে ঐতিহাসিক পটভূমি তুলে ধরেছেন, সে পটভূমি তাঁর নিজের জন্যও সত্য। ফররুখ মনে করেন, বাঙালি মুসলমানরা তাদের নিজের দর্শন, জীবনবোধ ও ইতিহাসের যে অভিব্যক্তি চেয়েছিল, কবি নজরুলের কবিতায় তা তারা সবটুকু পায়নি। ইসলামী চেতনা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠায় কবি-জীবনের লক্ষ্যকে যতটা কেন্দ্রীভূত ও স্থিত করা দরকার, নজরুলের কাব্যাদর্শ সেভাবে গড়ে ওঠেনি, এ অভিযোগ ফররুখ আহমদের। ফররুখ আহমদের কাব্যাদর্শ ও জীবনাদর্শ মূল্যায়নে এ তথ্যটি গুরুত্বপূর্ণ।

নজরুলের প্রতি ফররুখের অশেষ কৃতজ্ঞতা ছিল, কিন্তু ফররুখ তাঁর আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ প্রতিফলন লক্ষ্য করেছিলেন আল্লামা ইকবালের মধ্যে। স্বাপ্নিক ও দার্শনিক, 'আসরারে খুদী' ও 'রমুজ-ই বেখুদী'র স্রষ্টা আল্লামা ইকবালের কাব্যের অনুরাগী পাঠক ছিলেন ফররুখ আহমদ। ইকবালের কবিতায় আশাবাদ, স্বপ্ন, আনন্দ, গভীর জীবনদৃষ্টি, ব্যক্তিত্ববাদ ও সংগ্রামী চেতনায় ফররুখ আজীবন বিমুগ্ধ ছিলেন। ফররুখের মানবতাবাদ ইসলামী জীবনবাদের মধ্যে স্পষ্টত লীন হয়েছে এবং সময়-স্বভাবকে অতিক্রম করেছেন। তা অনেকখানি ইকবালের প্রভাবজাত বলেই মনে হয়। ফররুখ আহমদ ইকবালের বহু কবিতা শুধু যে সার্থকভাবে অনুবাদ করেছেন তাই নয়, তাঁর 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থ তিনি ইকবালকে উৎসর্গ করেছেন। ফররুখের চোখে ইকবাল ছিলেন স্বর্ণ ঈগল।

ইকবাল জীবনবোধের গভীরতা এবং দার্শনিক প্রজ্ঞায় সময়ের তুলনায় অগ্রণী ছিলেন। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ আবিষ্কারে তাঁর অবদান ছিল মুজতাহিদের পর্যায়ের। ইকবাল আন্তর্জাতিক মানবিকতার যে বাণী শুনিয়েছেন, ফররুখের কাব্যে তা পূর্ণরূপে কল্লোলিত হতে দেখা যায়। ইকবাল তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন : পবিত্র ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা সর্বপ্রথম বিশ্ব-মানবকে এই বাণী শুনিয়েছে যে, ধর্মের ভিত্তি জাতীয়তা বা গোত্র-বর্ণের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং তা নিছক ব্যক্তিগত বা আধ্যাত্মিকও নয়, বরং তা আন্তর্জাতিক মানবতাকেন্দ্রিক। সমগ্র মানব জাতিকে সকল প্রকার প্রকৃতিগত বৈষম্য সত্ত্বেও একই জীবন বিধানের অধীনে সংঘবদ্ধ করাই ধর্মের প্রধান লক্ষ্য। আর যে ধর্মের ভিত্তি এরূপ ব্যাপক ও সুবিস্তৃত, তা নিছক কতিপয় আকিদা-বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানমালার মধ্যে সীমিত থাকতে পারে না। তার কর্মক্ষেত্র সমান ব্যাপক ও বিস্তৃত, তেমনি এর লক্ষ্যও ব্যাপক ও সামগ্রিক।" **(আল্লামা ইকবাল : গৌরবের উৎস মহানবী; আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকা, জুলাই-ডিসেম্বর ৯৪)**

আন্দোলন বাংলার মুসলিম সমাজে সৃষ্টি করে কূলপ্লাবী জোয়ার। ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) জাতীয় জাগরণের একটি আকাঙ্ক্ষা তাঁর রচনায় উচ্চকিত করেছেন, নজরুল (১৮৯৯-১৯৭৬) এ ক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছেন এক বলিষ্ঠ ও বেগবান ধারা। গালির বদলে গালি দেয়ার পরিবর্তে ইতিবাচক, গঠনমূলক এবং গভীরতর দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটতে থাকে তিরিশের দশকের মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের রচনায়। এ পটভূমিতেই ফররুখ আহমদের আবির্ভাব। এ সময় ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনের ভিত্তিতে ১৯৩৭ সালে মুসলিম সংখ্যাগুরু বাংলায় ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষকপ্রজা লীগ ও মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভা গঠিত হবার ফলে বাংলার মুসলমানরা পৌনে দু'শ বছর পর আবার শাসন ক্ষমতা ফিরে পাবার গৌরব অনুভব করে। এ শাসনামলে বঙ্গীয় কৃষিখাতক আইন, কুসীদজীবী আইন, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধন আইন এবং ঋণ শালিশী বোর্ডের সুফল জনগণ ভোগ করতে থাকে। বাংলার কৃষক-প্রজাদের উপর দেড়শ বছর ধরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যে জগদ্দল পাথর চেপে বসেছিল এ সময় তা একের পর এক অপসারিত হতে থাকে।

এ অভিজ্ঞতা বাংলার মুসলমানদের স্বতন্ত্র মঞ্জিল চিহ্নিত করাকে সহজ করে দেয়। চল্লিশ কোটি জনসংখ্যার দেশ ভারতের গণতন্ত্রে নয় কোটি মুসলমানের জন্য রক্ষাকবচ লাভের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর ১৯৪০ সালে মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। নিজেদের স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে প্রবল গণ-জোয়ার তখন উত্তাল তরঙ্গের রূপ লাভ করে সর্বত্র আছড়ে পড়তে থাকে। মুসলিম কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিক-গায়ক-শিল্পী-ক্রীড়াবিদ-ছাত্র-শিক্ষক-কৃষক-শ্রমিক-সকল স্তরের মানুষ এ সময় নবনির্মাণের আনন্দ-উত্তেজনায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন। কলকাত্তাকেন্দ্রিক হিন্দুদের সাথে দীর্ঘকালের সাংস্কৃতিক বৈরিতার পটভূমিতে পাকিস্তান আন্দোলনের সাংস্কৃতিক প্রেরণা ছিল তীব্রতর। এজন্য ঢাকা ও কলকাতার মুসলিম সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক কর্মীগণ গঠন করেছিলেন বিভিন্ন সমিতি ও সোসাইটি। সাংস্কৃতিক কর্মীগণ এ সময় উপলব্ধি করেছিলেন, "রাজনৈতিক 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠা যদি সম্ভব না-ও হয়, সাংস্কৃতিক পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হতেই হবে"।

ফররুখ আহমদ এ আন্দোলনের এক আপসহীন কলম সৈনিক ছিলেন। ১৯৪৩-পূর্ববর্তী সময়ে দুর্গত ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের অন্তহীন নিগ্রহ তাঁর কবিতায় হতাশা ও সংশয়ের সুর ধ্বনিত করে। কিন্তু শীঘ্রই তিনি সংশয় ও নৈরাশ্যের প্রান্তর পাড়ি দিয়ে এমন এক জীবনাদর্শের আবেহায়াতের সাথে পরিচিত হন, যা শঙ্কামুক্ত নতুন প্রভাতের সূর্য-প্রভা তাঁর সামনে স্পষ্ট করে তোলে। তেতাল্লিশ-পূর্ববর্তী কবিতায় ফররুখ-এর মন প্রশ্নভারে দোলায়িত :

> এই রাত্রি দীর্ণ করি
> আসিবে কি দীপ্ত কণা সূর্যের লাঙ্গল
> মাঠে মাঠে কোনদিন দোলাবে কি
> স্বর্ণশীষ সবুজ ফসল...।

এর পরবর্তীতে কবি বাধা-প্রতিবন্ধকতাজনিত হতাশার অন্ধকারেও আলোর প্রতিভাস লক্ষ্য করেন :

এখানে এখন রাত্রি এসেছে নেমে,
তবু দেখা যায় দূরে বহু দূরে হেরার রাজতোরণ
...      ...      ...
কাঁকর বিছানো পথ
কত বাধা কত সমুদ্র, পর্বত,
মধ্যদিনে পিশাচের হামাগুঁড়ি
শকুনী ফেলিছে ছায়া আমাদের মাথার উপরে উড়ি',
ফেলেছি হারায়ে তৃণ ঘন বন, যত পুষ্পিত বন,
তবু দেখা যায়, দূরে বহু দূরে হেরার রাজতোরণ ...

মুসলমানদের স্বতন্ত্র স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সকল বিপদ-বাধা উপেক্ষা করার প্রেরণা তিনি লাভ করেছেন হেরার রাজ-তোরণ থেকে। হেরার শিখর চূড়ায় তিনি লক্ষ্য করেছেন মানবতার মুক্তির উড্ডীন নিশান।

"ডাক দিল আজ হেরার শিখর চূড়া
ডেরার কপাট খোলো আজ বন্ধুরা।"

ফররুখ আহমদ মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামী আদর্শবাদের রূপায়ণের জন্যই স্বাধীন আবাসভূমিরূপে আদর্শিক পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর স্বপ্নের সে পাকিস্তান নিছক কোন ভৌগোলিক এলাকার নাম ছিল না। ছিল একটি আদর্শের নাম। পাকিস্তানের জন্মের মুহূর্তেই কবি তাঁর আদর্শকে সেখানে মুখ থুবড়ে পড়তে দেখেছেন। ফররুখ আহমদ স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাঁর স্বপ্নের পাকিস্তানে ফোর্ট উইলিয়মীয় ষড়যন্ত্রের প্রতিবিধান হবে। মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমানদের সৃষ্ট ভাষা বাংলা হবে ইসলামের মানবতাবাদী আদর্শ প্রচারের বাহন। কিন্তু সে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার পরপরই বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে নতুন ষড়যন্ত্র শুরু হলে এ অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে আবার গর্জে ওঠে ফররুখ আহমদের কলম।

ফররুখ আহমদের স্বপ্নের পাকিস্তানের সাথে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী যে আচরণ করেছেন, তার প্রতিবাদ করেছেন কবি তাঁর কবিতায়। মুসলিম লীগ শাসনামলের অনাচার ও দুর্নীতির চিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন 'রাজরাজড়া' নামক বিখ্যাত প্রহসনে। মীর জাফরের জবানীতে পাকিস্তানী শাসকদের মুনাফেকী ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে তিনি 'হায়াত দারাজ খান পাকিস্তানী' ছদ্মনামে লিখেছেন 'ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য'। এ কারণে শাসকগোষ্ঠীর কেউ কেউ কবিকে কম্যুনিস্ট আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। শাসকদের তীব্র ভ্রূকুটি কবিকে টলাতে পারেনি। 'তসবির নামা', 'নসিহত নামা' প্রভৃতি কাব্যের মাধ্যমে তিনি তাদের জবাব দিয়েছেন।

ফররুখ আহমদের আদর্শিক স্বপ্ন অনুযায়ী একদিনের জন্যও পাকিস্তান পরিচালিত হয়নি। এ যেন ছিল তাঁর স্বপ্নের অপমৃত্যু। কবি তাঁর স্বপ্নের অপমৃত্যুতে যে আঘাত পেয়েছেন তার প্রতিধ্বনি বেজেছে তাঁর বহু কবিতায়। তাঁর মনোবেদনার এমনি একটি চিত্র 'ক্লান্তি' নামক সনেটে ফুটে উঠেছে :

আমার হৃদয় স্তব্ধ, বোবা হয়ে আছে বেদনায়

ফররুখ আহমদ তাঁর মানবিক চেতনাকে ইসলামের এ সামগ্রিকতার আলোকেই পরিগঠন করেন এবং তাঁর ইসলামী রেনেসাঁর আকাঙ্ক্ষা এ লক্ষ্যবিন্দুতে স্থিত ছিল। ফররুখ তাঁর কবি-মানসে ও জীবন-সত্তায় ইসলামী মানবতাবাদের এ আদর্শকে আপসহীনভাবে ধারণ করেছিলেন। তাঁর ধর্মীয় চেতনা ও রাজনৈতিক মতাদর্শের মধ্যে যেমন ভিন্নতা ছিল না, তেমনি কোন ফাঁক-ফোকরও ছিল না।

আবদুল মান্নান সৈয়দ চল্লিশের কবিদের যে সময়-স্বভাবের কথা বলেছেন, ফররুখ তা থেকে বহুদূর অগ্রণী ছিলেন। জাতীয় জীবনের দুশ বছরের নৈরাশ্যজনক ইতিহাস তাঁর সামনে স্পষ্ট ছিল এবং তিনি ইসলামী রেনেসাঁর তূর্য-বাদকের যে ভূমিকা পালন করেন, তাও ছিল তাঁর সময় থেকে অনেক অগ্রবর্তী।

আঠারো শতকের মধ্যভাগ থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, সূর্যাস্ত আইন, লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত আইন, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর-একটির পর একটি ঘটনা বাংলার জনজীবনকে শোষণ-লুণ্ঠনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে পরিণত করেছিল। উনিশ শতকের গোড়ার দিকেই কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু শ্রেণীটি হিন্দু রিভাইভালিজমের সকল আয়োজন সম্পন্ন করেছিল। ১৭৬৩ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত মীর কাসিমের প্রতিরোধ সংগ্রাম, ফকীর মজনু শাহর ফকির বিদ্রোহ থেকে শুরু করে একটির পর একটি কৃষক বিদ্রোহ সমগ্র বাংলাকে যখন আলোড়িত করে, তখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের (১৮০০) মাধ্যমে আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ বর্জিত এক নতুন গদ্য-ধারার প্রবর্তন করা হয়।

জিহাদ আন্দোলনের পতাকাবাহী সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী (১৭৮৬-১৮৩১) বালাকোটে এবং সৈয়দ নেসার আলী তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১) নারকেলবেরিয়ায় ১৮৩১ সালে যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ করেন, তখন রামমোহন রায়ের চেষ্টায় ১৮৩৭ সালে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষা করে সরকারি চাকরির ক্ষেত্র থেকে মুসলমানদের উৎখাত করা হয়। এ সময় হিন্দু জমিদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য 'জমিদার সভা' গঠন করা হয়। জেহাদ ও ফরায়েজী আন্দোলনের পতাকাতলে বাংলার কৃষক-কামার-কুমার-কলু-জেলেরা যখন আপসহীন সংগ্রামে লিপ্ত, তখন ১৮৪৩ সালে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি এবং ১৮৫৩ সালে বেঙ্গল ল্যান্ডলর্ডস এসোসিয়েশন গঠন করে কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীটি নিজেদের শক্তিকে সংহত করে এবং তারা হিন্দু রিভাইভ্যালিজমেরও পতাকা ওড়ায়। প্রায় একই সময়ে সিপাহী বিপ্লবের প্রাক্কালে ১৮৫৬ সালে কলকাতার নবউত্থিত বর্ণ হিন্দু নেতৃত্ব ইঙ্গ-হিন্দু স্বার্থের দুর্গরূপে প্রতিষ্ঠা করে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন। এ সময় রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের নেতৃত্বে নবউত্থিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনে রেনেসাঁর সৃষ্টি হয়।

উইলিয়াম জোনস, ম্যাক্সমুলার, কর্নেল টড প্রমুখ ইংরেজ লেখকের চরম মুসলিম-বিদ্বেষী ও প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্যভিত্তিক রচনাসমূহকে উপজীব্য করে উনিশ শতকের মধ্যভাগে বর্ণ-বৈষম্যপূর্ণ হিন্দু সমাজে ধর্মীয় পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় জাতীয়তার উন্মেষ ঘটে এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-চেতনার ভিত্তিতে তাদের জাতীয় মানস গড়ে উঠতে থাকে। রাজনারায়ণ বসু, ননীগোপাল মিত্র প্রমুখ হিন্দু জাতীয়তাবাদের এ নতুন বাণী-বাহকদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন ঈশ্বরগুপ্ত, রঙ্গলাল

বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ তখন ভারতবর্ষে সাড়ে পাঁচশ বছরের মুসলিম শাসনকে অত্যাচারী শাসন বলে আখ্যায়িত করেন। তাঁরা ইংরেজ শাসনের প্রশস্তি গেয়ে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে যেসব রাজপুত, মারাঠা ও শিখ বিদ্রোহ করেছিল, তাদের বীরের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন। বস্তুত উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের বৃহৎ অংশ জুড়ে এ রূপটিই প্রকটিত হয়ে ওঠে।

হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চেতনায় অনুপ্রাণিত লেখকগণ তাদের নাটকে, গানে, কবিতায় মুসলিম-বিদ্বেষের বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিতে থাকেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে এবং সমাজ সংগঠনের সকল পর্যায়ে যখন তাঁরা সংগঠিত হচ্ছেন এবং এ হিন্দু জাগরণের পতাকা যখন এলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে, সে সময় কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলার স্বার্থের সেতুবন্ধ তৈরি হচ্ছিল মারাঠা ব্রাহ্মণদের সাথে। কুড়ি দশকের গোড়ার দিকে ১৯০২ সালে কলকাতায় শিবাজী উৎসব চালু হয়। কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদীদের নাটক-কবিতা-গানগুলো এ সময় থেকে ছত্রপতি শিবাজীর বন্দনায় মুখর হয়ে ওঠে। বস্তুত উনিশ শতকের শেষ নাগাদ হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন তার চূড়া স্পর্শ করে।

ইতোমধ্যে উনিশ শতকের সত্তরের দশকে স্যার সৈয়দ আহমদ (১৮১৭-৯৮), নওয়াব আবদুল লতিফ (১৮২৮-৯৩) ও সৈয়দ আমীর আলীর (১৮৪৯-১৯২৮) ভূমিকার ফলে মুসলিম সমাজে নৈরাশ্য কাটিয়ে ওঠার একটি প্রেরণা সৃষ্টি হয়। বিশ্ব ইসলামী পুনর্জাগরণের নকীব, প্যান ইসলামী আন্দালনের নেতা সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানীর আন্দোলন এ ক্ষেত্রে নতুন গতি ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের একটি নির্দেশনা প্রদান করে। ১৮৮৪ সালে আফগানীর কলকাতা সফর ও তাঁর আলবার্ট হলের ভাষণ বাংলার জাগরণকামী মুসলমানদের গভীরভাবে আলোড়িত করে। এ পটভূমিতে বাংলার শিক্ষিত মুসলমানগণ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রকাশের কাজে উদ্বুদ্ধ হন এবং নসীহতমূলক, ইসলামী ইতিহাস-ঐতিহ্যমূলক ও জাতীয় জাগরণমূলক বইপত্র লিখতে শুরু করেন। হিন্দু লেখকদের সাম্প্রদায়িক বিষোদ্গারের কিছু কিছু জবাবও এ সময় কোন কোন মুসলিম লেখকের কলম থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে। তিলক যে বছর শিবাজী উৎসব প্রবর্তন করেন, সে বছরই ১৮৯৫ সালে কায়কোবাদের 'অশ্রুমালা' প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের লেখা হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী 'কথা ও কাহিনী' ১৮৯৯ সালে প্রকাশের পরপরই ১৯০১ সালে ওসমান আলীর 'দেবলা' কাব্য প্রকাশিত হয়। ১৯০৪ সালে রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী উৎসব' কবিতা প্রকাশের বছর ওসমান আলীর 'আলোকসভা' ও কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান' প্রকাশিত হয়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে "বাংলার হিন্দু লেখকেরা (সাম্প্রদায়িকতার) সূত্রপাত করেন। তারপর মুসলমান লেখকরা গালির বদলে গালি দিতে শুরু করেন"।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের মধ্য দিয়ে পৌনে দু'শ বছর পর মুঘল আমলের প্রাচীন রাজধানী ঢাকা আবার রাজধানীর মর্যাদা ফিরে পায়। ফলে ঢাকাকে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলার কৃষক মুসলমানদের জীবনে নতুন আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বঙ্গভঙ্গ রদের রাজকীয় ক্ষতিপূরণ হিসাবে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, পূর্ব বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্ত বিকাশের সূতিকাগার রূপে। আর এ সময় খিলাফত

যেমন পদ্মের কুঁড়ি নিরুত্তর থাকে হিমরাতে
যেমন নিঃসঙ্গ পাখী একা আর ফিরে না বাসাতে,
তেমনি আমার মন মুক্তি আর খোঁজে না কথায়।

আদর্শিক পাকিস্তানের যে স্বপ্ন কবি দেখেছেন, সে স্বপ্ন ভেঙ্গে যাওয়ার যাতনার চেয়ে ভৌগোলিক পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়ার কষ্ট কবির কাছে সম্ভবত বেশি মর্মান্তিক ছিল না। যে আদর্শের দীপ্তিতে ব্যক্তি ফররুখের জীবন ছিল উজ্জ্বল, জীবনের সকল সড়কে কবি সে আদর্শের জয়গান গেয়েছেন। ফররুখ আহমদ কবি হিসাবে, মানুষ হিসাবে এবং মানবতাবাদী হিসাবে সকল আদর্শবাদীর জন্য এক অত্যুজ্জ্বল আদর্শ। মানুষের কাছে এবং মানুষ সম্পর্কে ফররুখ আহমদের প্রত্যাশা ছিল :

প্রত্যেক মানুষ যেন হয় প্রজ্ঞাবান–
ইনসানে কামিল, মজলুম পায় যেন বাঁচার অধিকার

ফররুখ আহমদ ছিলেন একজন ইনসানে কামিল। 'নৌফেল ও হাতেম' কাব্যনাট্যের নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিতে তাঁর জীবনের আদর্শ চমৎকারভাবে উচ্চারিত হয়েছে:

"মুমিনের মৃত্যুই চেয়েছি
দীর্ঘদিন এ জীবনে আল্লাহর দরগাহে। অসত্যের
অন্যায়ের পদপ্রান্তে চাইনা আত্মসমর্পণ পৃথিবীতে।"

ফররুখ আহমদের জীবনে আত্মসমর্পণের কোন গ্লানি নেই। মুমিনের মৃত্যু কামনার পাশাপাশি শহীদী মৃত্যু তিনি প্রত্যাশা করেছেন। ১৯৬৯ সালে ইসলামী শিক্ষার অধিকারের পক্ষে কথা বলার কারণে রমনা রেসকোর্স ময়দানে জীবন দিতে হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রনেতা আবদুল মালেককে। ফররুখ আহমদ এ শহীদী মৃত্যুকে সংবর্ধিত করে লিখেছেন ঃ

"জীবনের চেয়ে দীপ্ত মৃত্যু তখনি জানি
শহীদী রক্তে হেসে ওঠে যবে জিন্দেগানী।" ❐

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, অক্টোবর, ২০০২]

# একান্ত অনুভবে ফররুখ আহমদ

## মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

কবি ফররুখ আহমদকে কাছে থেকে প্রথম দেখি ১৯৬৮ সালে। পুরনো ঢাকার ১৩ নং কারকুন বাড়ি লেনে সাপ্তাহিক 'জাহানে নও' অফিসে বসে কবি কথা বলছিলেন কজন মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতার সাথে। পত্রিকা অফিসের ক্ষুদ্র কক্ষটি বাংলা কাব্য-গগনের এ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে ধারণ করে যেন আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছিল। আমিও তাতে যোগ দিলাম। 'সাত সাগরের মাঝি'র অমর স্রষ্টা, 'হাতেম তায়ী'র মহান রূপকার, 'লাশ', 'ডাহুক' আর 'ঝরোকার' কবি আমার এত কাছে বসে বাবরী চুল আন্দোলিত করে কথা বলছেন, এ ছিল আমার কাছে এক অনাস্বাদিত স্বপ্নের মতো। কবি-সন্দর্শনের এ ঘটনা ছিল আমার জীবনের এক পরম শুভ লগ্ন।

প্রথমেই কবির যে জিনিসটি আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল, তা তাঁর রাতজাগা পাখির মতো উজ্জ্বল দুটি চোখ। সে চোখে ছিল এক প্রচণ্ড অস্থিরতা। আরব্যোপন্যাসের সিন্দবাদ নাবিকের মতোই কবির সারা অবয়ব জুড়ে গভীর অতৃপ্তি, আর সুদূরচারী কল্পনার সীমাহীন আর্তি। বিস্মিত আনন্দিত পলকহীন চোখে আমি সমুদ্রচারী কবিকে দেখছিলাম। কবি কথা বলছিলেন, আর ধীরে ধীরে তাঁর রাতজাগা চোখের অস্থিরতা মিলিয়ে গিয়ে সেখানে তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর জিজ্ঞাসার বিদ্যুতমোহন দ্যুতি যেন ঠিকরে ঠিকরে পড়ছিল। কথা বলতে বলতে তিনি কখনো আনন্দ-উদ্দীপনায় চঞ্চল হচ্ছিলেন, আবার কখনো বেদনামথিত হাহাকার তাঁকে যেন অস্থির করে তুলছিল। কবি-হৃদয়ের আবেগ-উত্তাপে আমরা সবাই কখন যে গলে গলে একাকার হয়ে গিয়েছিলাম, টের পাইনি। কবিকে কাছে থেকে প্রথম দেখার সেদিনের সেই স্মৃতি আমার হৃদয়ে আজো আলোর পাখির মতো ডানা ঝাপ্‌টায়।

সেই প্রথম দেখার পর বারবার আমি কবির কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি। কখনো কারো সঙ্গী হয়ে, কখনো দল বেঁধে, আবার কখনো একাকী ছুটে গেছি তাঁর কাছে। একটা উপলক্ষ জুটে গেলে সে সুযোগ হাতছাড়া করিনি পারতপক্ষে। তাঁর সাথে প্রতিটি সাক্ষাৎকার ছিল প্রত্যয় ও প্রত্যাশার এক অনির্বচনীয় আনন্দধারায় অবগাহনের মতো। স্বপ্নচারী কবি নিজে শুধু স্বপ্ন দেখতেন না, তাঁর কাছে যাঁরা যেতেন, সবাইকে তিনি স্বপ্নের সে আনন্দলোকে ভ্রমণ করিয়ে আনতেন। কবি ফররুখের চেয়ে মানুষ ফররুখ এভাবেই আমার কাছে হয়ে উঠেছে মহত্তর অনুপ্রেরণা। এমন প্রাণময়, ওজস্বী, উদ্দীপ্ত ও বেগবান কোনো মানুষের সাথে আমার আর কখনো দেখা হয়নি।

ফররুখ আহমদ ছিলেন বিশাল কবি-সত্তার অধিকারী। প্রচণ্ড আত্মসম্মানবোধ-সম্পন্ন মানুষ। চিন্তা ও কর্মে, কথায় ও বাস্তব জীবনাচরণে অসামান্য সংহতি ছিল

ফররুখ-চরিত্রের সর্বাপেক্ষা জ্যোতির্ময় বৈশিষ্ট্য। কবি-মানস ও ব্যক্তি মানসের অনুপম সামঞ্জস্যের কারণে ফররুখ আহমদ ছিলেন ধনুকের ছিলার মতো সটান মানুষ। আগে জানতাম, পর্বত দেখতে দূর থেকেই সুন্দর। অনেক বড় মাপের মানুষের ক্ষেত্রেও দেখেছি এ কথাই প্রযোজ্য। কিন্তু কবি ফররুখ আহমদ দূর থেকে যত সুন্দর ছিলেন, মানুষ ফররুখকে কাছে গিয়ে দেখেছি তার চে' এতটুকু কম আকর্ষণীয় নন।

ফররুখ আহমদ কবিতা লিখেছেন মানুষের জন্য। মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন আজীবন। তাঁর প্রেরণা ছিল 'হেরার রাজতোরণ'। আজীবন তিনি সাধারণ মানুষের মাঝখানে থেকেছেন। রাজানুকূল্যের কোনো লোভনীয় হাতছানিই কবিকে তাঁর অবস্থান থেকে কখনো টলাতে পারেনি এক চুল। সরকারি খেতাব 'প্রাইড অব পারফরম্যান্স' তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। পয়ষট্টি সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় জাতিকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতে কবির অক্লান্ত পরিশ্রম ও অমূল্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' দেয়া হয়েছিল। কবি সে সম্মানও প্রত্যাখ্যান করেন। সরকারি মেহমান হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে সংহতি সফর কিংবা সরকারের ভ্রাম্যমাণ দূতরূপে বিশ্ব ভ্রমণের আমন্ত্রণ নিয়ে পাকিস্তানের 'লৌহ মানব' আইউব খানের বিশেষ দূত তাঁর বাসায় ছুটে গেছেন। সে প্রস্তাবও কবি বিনা বাক্য ব্যয়ে দৃঢ়তার সাথে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। জাতির খেদমত আর সরকারের সেবা তাঁর কাছে ছিল দুটি ভিন্ন জিনিস। সরকারি কবি ও দরবারী কবিদের প্রাদুর্ভাবের যুগেও কবি নিজেকে স্বতন্ত্র মহিমায় মহিমান্বিত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পাকিস্তান আমলের শেষ দিকে জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা (বি এন আর) থেকে বই প্রকাশ করেননি, এমন কবি-সাহিত্যিক খুব কম ছিলেন। কিছু কিছু বড় মাপের কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীকে জানি, বই লেখার নামে বি এন আর থেকে তখনকার দিনের ষাট-সত্তর হাজার টাকা আগাম নিয়েছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির বিবেকরূপে চিহ্নিত হয়েছেন। কেউ বা মন্ত্রীও হয়েছেন। কিন্তু ফররুখ আহমদ এক্ষেত্রেও ছিলেন ব্যতিক্রম। তাঁর ভাগ্নে ডক্টর হাসান জামান বি এন আর-এর পরিচালক ছিলেন। তিনি মত-পথ নির্বিচারে সকলের বইপত্র প্রকাশ করে খ্যাত-অখ্যাত বহু লেখকের হাতে প্রচুর টাকা তুলে দিয়েছেন। সমকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি ফররুখ আহমদের রচনা সমগ্র প্রকাশ করতেও তিনি আগ্রহী ছিলেন। কবির অধিকাংশ বই তখনও অপ্রকাশিত ছিল। কিন্তু অনেক অনুরোধ করেও ডক্টর হাসান জামান এ ব্যাপারে কবিকে রাজি করাতে পারেননি। ফররুখ আহমদ চাইলে বিএনআর-এর রয়্যালটির টাকায় তখন ঢাকায় বাড়ি বানাতে পারতেন এবং তাঁর সন্তানদের জন্য মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই রেখে যেতে পারতেন।

ফররুখ আহমদ রেডিওর চাকরি থেকে যে আয় করতেন তার পরিমাণ ছিল সামান্য। কিন্তু সে আয় থেকে এমন সব কাজ তিনি করেছেন যার সাথে তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'হাতেম তা'য়ী'র চরিত্রেরই শুধু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর মৃত্যুর পর 'কবি ফররুখ আহমদ কেন্দ্রীয় স্মৃতি কমিটি'র উদ্যোগে ইসলামিক একাডেমী

মিলনায়তনে আয়োজিত শোকসভায় দৈনিক ইত্তেফাকের তৎকালীন বার্তা সম্পাদক আসফউদ্দৌলাহ রেজা এমনি একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। আইউব আমলে দৈনিক ইত্তেফাক বন্ধ করে দেয়া হয়। সাংবাদিকরা বেকার হন। এ সময় আসফউদ্দৌলাহ একটি খাম পেলেন। তাতে দুটি একশ টাকার নোট আর একটি চিরকুট। চিরকুটে ফররুখ আহমদ লিখেছেন : 'রেজা, আমার কাছে বেশী নেই। থাকলে তোর এই প্রয়োজনের সময় আরো বেশী দিতাম।' এ রূপ খাম জনাব সিরাজউদ্দীন হোসেনের কাছেও কবি পাঠিয়েছিলেন। এ তথ্য প্রকাশ করার সময় রেজা সাহেবের ভরাট কণ্ঠ ছিল বাষ্পরুদ্ধ। তাঁর বক্তৃতা থেমে গিয়েছিল। এমনি ধরনের অসংখ্য ছোট ছোট ঘটনার মধ্যে অনেক বড় মাপের মানুষ ফররুখ আহমদ নিজেকে ঢেকে রেখেছিলেন।

কবি ফররুখ আহমদ হাতেম-হাতে বিলিয়ে গেছেন সারাজীবন। কিন্তু কারো দান তিনি গ্রহণ করেননি কখনো। জীবনের শেষ দিনগুলিতে তাঁর অর্থকষ্ট ছিল চরম। তাঁর বড় মেয়ে অর্থাভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা গেছেন। এ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় কিছু লেখালেখি হয়। ভক্ত-অনুরক্তরা অনেকে ছুটে গেছেন কবিকে সাহায্য করার জন্য। কবি তাদের আগমনের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে এমনভাবে কথা বলেছেন, যার ফলে সাহায্যের কথা তাঁরা মুখে আনতেও সাহসী হননি। অর্থ-সংকটের কারণে কেউ তাঁকে সাহায্য করুক, এটা অসামান্য আর মর্যাদাবোধসম্পন্ন কবিকে দারুণভাবে আহত করতো। দাতার হাতকে গ্রহীতার হাতে রূপান্তরিত করেননি তিনি কখনো।

ফররুখ আহমদ ছিলেন প্রচারবিমুখ। সস্তা জনপ্রিয়তায় তাঁর আস্থা ছিল না। স্তাবকতাকে তিনি প্রবলভাবে ঘৃণা করতেন। সস্তা প্রশংসা-স্তুতিতে তিনি বিরক্ত হতেন। সাহিত্য-চর্চা ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের ব্যাপারে সকলকে উৎসাহ দিতেন তিনি। কিন্তু সাহিত্য সভা-সমাবেশকে পারতপক্ষে এড়িয়ে চলতেন। তাঁকে কেন্দ্র করে কোনো অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুমতি তিনি কাউকে দিতেন না। কবি হয়তো বিশেষ কোন সাহিত্য-পুরস্কার পেয়েছেন। ভক্তরা পরম উৎসাহে সংবর্ধনা সভার আয়োজন করতে চেয়েছেন। এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনে সময় ব্যয় না করে মৌলিক সাহিত্য-কর্মে মনোযোগী হওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়ে তিনি তাদেরকে বিদায় করেছেন। কবির এ পরামর্শ উৎসাহী অনুরাগী-উদ্যোক্তাদের মনঃকষ্টের কারণ হয়েছে অনেক সময়। কিন্তু কবির মত পরিবর্তনের সাধ্য কারো ছিলো না। ফররুখ আহমদ বুঝতেন, সংবর্ধনা নয়, মৌলিক সৃষ্টি-কর্মই কবিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

কোনো অনুষ্ঠানে কবিকে প্রধান অতিথি বা সভাপতি হবার অনুরোধ জানাতে গেলে উদ্যোক্তাদেরকে কবি অনেক সময় খোলা দরোজা দেখিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, কবির শুভাকাঙ্ক্ষীরা নয়, শত্রুরাই এমন প্রস্তাব নিয়ে আসতে পারে। একবার একটি অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদেরকে কবি বলেছিলেন, কবিতার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করার যে তাগিদ, তা বক্তৃতা দিতে দিতে দুর্বল হয়ে যায়। ফলে কবিতা লেখার তীব্র বেদনা আর থাকে না। প্রধান অতিথি আর সভাপতির বক্তৃতার বাণী আওড়াতে আওড়াতে নিজেকে কাব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করার তাগিদ ফুরিয়ে

যায়। তিনি মনে করতেন, নিজেদের আদর্শিক প্রয়োজনে সভা-সমিতিতে প্রধান অতিথি আর সভাপতি করে বেগম সুফিয়া কামালের মতো কবি প্রতিভাকে বামপন্থীরা নষ্ট করেছেন। আর ডানপন্থীরা এভাবেই শেষ করেছেন দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফকে। তাঁর ধারণা ছিল, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সর্বপল্লী রাধা-কৃষ্ণাণের মতো বিশ্বখ্যাত দার্শনিক হতে পারতেন। কিন্তু সভাপতি আর প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করার কাজে ব্যস্ত থাকার ফলে আজরফ সাহেবের পক্ষে তাঁর যোগ্যতানুযায়ী কোনো বড় মাপের কাজ করা সম্ভব হয়নি।

ফররুখ আহমদের বিশ্বাস ও আদর্শ ভাষা পেয়েছে তাঁর কবিতায়। বক্তব্য প্রকাশে কবি অন্য কোনো মাধ্যমকে অবলম্বন করেননি। পত্র-পত্রিকায় বক্তৃতা বা সাক্ষাৎকার ছেপে প্রচার করা তিনি কবির কাজ মনে করতেন না। এ ব্যাপারে বিভিন্ন জনের কাছে অনেক কিছু শুনেছি। আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও আছে এ ব্যাপারে। ছোট্ট সে অভিজ্ঞতার কথা এখানে উল্লেখ করছি। ১৯৬৯ সালে নূর খান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে খুব হৈ চৈ হয়েছিল। একটি ঘটনায় প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদের হাতে শহীদ হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রনেতা আবদুল মালেক। সে ঘটনার জের চললো অনেক দিন। ১৯৭০ সালে এসেও শিক্ষানীতির বিষয়টি আলোচিত হচ্ছিল। দেশের ভবিষ্যৎ শিক্ষানীতি সম্পর্কে 'ইয়ং পাকিস্তান' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় তখন ধারাবাহিকভাবে সাক্ষাৎকার ছাপা হচ্ছিল দেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাবিদ-কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের। এ সাক্ষাৎকার গ্রহণের কাজে আমি নিয়োজিত হয়েছিলাম। সম্পাদক আমাদেরকে কবি ফররুখ আহমদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের দায়িত্ব দিলেন। তিনি বললেন, এ কাজে সফল হলে তা হবে বিরাট কৃতিত্ব। তবে সে সাফল্যের ব্যাপারে সম্পাদক সাহেব আশাবাদী ছিলেন না।

কবির সাথে কিছু দিনের পরিচয়ের সুবাদে আমার ধারণা ছিল অন্য রকম। তেমন একটা ভাব নিয়েই পত্রিকার রিপোর্টার শওকত সাহেবসহ হাজির হলাম কবির নিউ ইস্কাটনের বাসায়। কবি নিজেই দরোজা খুলে আন্তরিকভাবে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর বরাবরের মতোই নানা প্রসঙ্গে আমাদের কাছ থেকে খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন। খবরতো ভালো-মন্দ সব রকমই থাকে। আমরা সচেতনভাবে যথাসম্ভব ভালো খবরগুলি পরিবেশন করে কবিকে খুশি করতে চাইলাম। ইতোমধ্যে চা এলো। সেই সাথে ফিরনী। চা-নাশতা খেতে খেতে কবির সাথে কথা বলছিলাম। আমাদের সাথে আলোচনায় কবির চোখে-মুখে খুশির আভাস স্পষ্ট দেখতে পেলাম। সুযোগ বুঝে আসল প্রসংগ তুলতে চেষ্টা করলাম। বললাম, শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে ইয়ং পাকিস্তানে কয়েকটি সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে, আপনি দেখেছেন কি? কবি সেগুলি দেখেছেন। ভালো বলে প্রশংসা করলেন। সেই সাথে দুঃখ করে বললেন, দেশটার তেইশ বছর বয়স হলো। ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য আজো একটা শিক্ষানীতি হলো না। আদর্শহীন, লক্ষ্য-বঞ্চিত শিক্ষা নিয়ে জাতি আগে বাড়বে কিভাবে? তিনি আমাদের সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে কিছু মূল্যবান পরামর্শ দিলেন।

এবারে সাহসী হয়ে আমতা আমতা করে বললাম, সম্পাদক সাহেব আমাদের আপনার কাছে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি এ সম্পর্কে কিছু কথা বলেন, জাতির জন্য খুবই মূল্যবান হবে...। আমার কথা শেষ করার সুযোগ পেলাম না। ধনুকের ছিলায় যেন আচমকা টান পড়লো। কবি সোজা উঠে গিয়ে দরজার ছিটকিনি খুলে দিলেন। তারপর সিঁড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে কঠোর কণ্ঠে গর্জে উঠলেন ঃ 'বেরোও!' আমরা দ্বিতীয় কোন কথা বলার সাহস না পেয়ে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে অনুচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করলাম : আসসালামু আলাইকুম।

ঘটনাটি ছিল একটি সুন্দর স্বপ্ন থেকে হঠাৎ জেগে ওঠার মতো। কিছুক্ষণ আগেও কবি কাছে বসিয়ে আদর করে কথা বলছিলেন। স্নেহ-মাখা হাতে ফিরনী তুলে দিচ্ছিলেন পাতে। আর এই তো কিছু দিন আগে কবির সাথে আমার দেখা হয়েছিল রমনা রেসকোর্স ময়দানের পাশে। ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটের অদূরে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে কবি তাকিয়েছিলেন রেসকোর্সের ঘন সবুজঘেরা বিশাল চত্বরের দিকে। একটি বিশেষ জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তাঁর। কিছুদিন আগে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে বিতর্কের জের হিসাবে এ স্থানটিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র আবদুল মালেককে আহত করা হয়। সে আঘাতের তিন দিন পর পনেরোই আগস্ট তাঁর মৃত্যু হয়। ফররুখ আহমদ সাদা পাজামা-পাঞ্জাবির উপর একটা চাদর জড়িয়ে অপলক চোখে তাকিয়েছিলেন সেদিকে। কি কাজে সে পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম আমি। তাঁকে দেখে দূর থেকে ছুটে গেলাম কাছে। সালাম দিলাম। কবি ফিরে তাকালেন আমার দিকে। আবেগের সাথে উচ্চারণ করলেন, ১৯৪২ সালে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আদর্শিক কারণে শহীদ হয়েছিলেন নযীর আহমদ নামক একজন ছাত্রনেতা। তখনকার পটভূমি ভিন্ন ছিল। এতগুলি বছর পর আবদুল মালেক এখানে জীবন দিলেন ইসলামী আদর্শ তথা ইসলামী-শিক্ষা ব্যবস্থার দাবি পূরণের লক্ষ্যে। আদর্শহীন শাসকদের ভুলের চড়া মাশুল এভাবেই জাতিকে শুধতে হবে। কবির হৃদয়-মথিত হাহাকার সেদিনও আমার অন্তর স্পর্শ করেছিল।

এই তো কবি ফররুখ আহমদ। জাতির সকল স্পর্শকাতর বিষয়ে সদা সজাগ-সচেতন মানুষ। তাঁর সাথে ব্যক্তিগত আলাপ-চারিতায় দেখেছি, সব সময় উঠে এসেছে মানুষের দুঃখ-বেদনার কথা। মানুষের মুক্তির কথা। জাতির জাগরণের কথা। বিশ্বের মজলুম মানবতার অন্তর্ভেদী ফরিয়াদ ভাষা পেয়েছে তাঁর কথায়, তাঁর গানে, তাঁর কবিতায়। তিনি অস্থিমজ্জায় কবি ছিলেন বলে তাঁর সাহিত্য-ভাবনা, সংস্কৃতি-চেতনা ও সমাজ-ভাবনা এবং সব রকমের সংস্কার উদ্যোগে কবিতাই ছিল অবলম্বন। কবিতাকেই তাঁর জীবনাদর্শ প্রচার এবং সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠন কাজের হাতিয়ার মনে করেছেন। আবদুল মালেককে নিয়েও তিনি বেশ কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন। তাঁর কবিতা আমাদের আলোড়িত করেছিল দারুণভাবে। তখনকার একটি সংকলনে কবির কয়েকটি কবিতা ছাপা হয়েছিল বিভিন্ন নামে। সাহিত্যের সামাজিক ভূমিকায় গভীর প্রত্যয়ী থেকে বিশ্বাসের বাণী প্রচার ও প্রতিষ্ঠার

তাগিদে কবিতা ছাড়া অন্য কোনো হাতিয়ারকে অবলম্বন করেননি তিনি। সে কথা কিছুটা দেরিতে হলেও বুঝতে পেরেছি বলে সে দিনের সাক্ষাৎকার গ্রহণের ব্যর্থতার কথা ভাবতে আজ আমার আশ্চর্য রকমের ভালো লাগে।

ফররুখ আহ্মদ রাজনৈতিক সুবিধাবাদ কিংবা বুদ্ধিবৃত্তিক সুবিধাবাদের কঠোর সমালোচক ছিলেন। যা বিশ্বাস করতেন, স্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তা প্রকাশ করতেন। কবি ছিলেন ইসলামী রেনেসাঁর তর্যবাদক। মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামী আদর্শবাদের রূপায়ণের জন্যই তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন মুসলমানদের স্বাধীন আবাসভূমি আদর্শিক পাকিস্তানের। তাঁর স্বপ্নের সে পাকিস্তান নিছক কোনো ভৌগোলিক এলাকার নাম ছিল না। ছিল একটি আদর্শের নাম। পাকিস্তানের জন্মের কিছুদিনের মধ্যেই কবি দেখেছেন তাঁর আদর্শ সেখানে মুখ থুবড়ে পড়ছে। তাঁর সে স্বপ্নের মৃত্যুতে কবি যে আঘাত পেয়েছেন, সে আঘাতের প্রতিধ্বনি বেজেছে তাঁর অসংখ্য কবিতায়। তাঁর সে মনোবেদনা ফুটে উঠেছে নিম্নোদ্ধৃত 'ক্লান্তি' নামক অসাধারণ একটি সনেটে এবং অন্যান্য অনেক রচনায়।

আমার হৃদয় স্তব্ধ, বোবা হয়ে আছে বেদনায়,
যেমন পদ্মের কুঁড়ি নিরুত্তর থাকে হিম রাতে,
যেমন নিঃসঙ্গ পাখী একা আর ফিরে না বাসাতে;
তেমনি আমার মন মুক্তি আর খোঁজে না কথায়।
যখন সকল সুর থেমে যায়, তারা-রা হারায়,
নিভে যায় অনুভূতি– আঘাতে, কঠিন প্রতিঘাতে,
নিঃস্পন্দ নিঃসাড় হয়ে থাকে পাখী পায়না পাখাতে
সমুদ্রপারের ঝড় ক্ষিপ্রগতি নিশান্ত হাওয়ায়।
মুখ গুঁজে পড়ে আছে সে পাখীর মত এ হৃদয়
রক্তক্ষরা। ভারগ্রস্ত এ জীবন আজ ফিরে চায়
প্রাণের মূর্ছনা আর নবতর সৃষ্টির বিস্ময়,
উদ্দাম অবাধ গতি, বজ্রবেগ প্রমুক্ত হাওয়ায়
অথচ এখানে এই মৃত্যুস্তব্ধ রাত্রির ছায়ায়
রুদ্ধ আবেষ্ঠনে আজ লুপ্ত হয় সকল সঞ্চয়।।

ফররুখ আহমদের স্বপ্নের পাকিস্তানের সাথে পাকিস্তানী শাসকগণ যে আচরণ করেছেন, তার প্রতিবাদ করেছেন কবি তাঁর বিভিন্ন কবিতায়। মুসলিম লীগ শাসনামলের অনাচার ও দুর্নীতির চিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন 'রাজ-রাজড়া' নামক বিখ্যাত প্রহসনে। মীর জাফরের জবানিতে পাকিস্তানী শাসকদের মুনাফেকী ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে তিনি 'হায়াত দারাজ খান পাকিস্তানী' ছদ্মনামে লিখেছিলেন 'ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য'। এ কারণে শাসকগোষ্ঠীর কেউ কেউ কবিকে কম্যুনিস্ট আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। শাসকদের

তীব্র ভ্রুকুটি কবিকে টলাতে পারেনি। 'তসবির নামা', 'নসিহত নামা' প্রভৃতি কাব্যের মাধ্যমে কবি তাদের জবাব দিয়েছেন।

আদর্শিক পাকিস্তানের যে স্বপ্ন কবি দেখেছেন, সে স্বপ্ন-ভঙ্গের যাতনা থেকে ভৌগোলিক পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হওয়ার কষ্ট কবির কাছে সম্ভবত বেশি মর্মান্তিক ছিল না। বাংলাদেশ আমলে সীমাহীন ষড়যন্ত্রের শিকার হন কবি। তাঁর বিরুদ্ধে অবরোধের দেয়াল তোলা হয়। রেডিওর চাকরিটিও তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল; কিন্তু চতুর্মুখী প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কবি আত্মসমর্পণ করেননি কোনো শক্তির কাছে। ঘরে বসে একান্ত মনে তিনি কবিতার ডালি সাজিয়েছেন। এ সময়ে কবি স্বনামে কোথাও কোনো কবিতা ছাপতে দিয়েছেন বলে মনে পড়ে না।

বাংলাদেশ আমলে ফররুখ আহমদের কিছু কবিতা আমরা সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা'য় ছেপেছি তাঁর দেয়া ছদ্মনামে। কবির মৃত্যুর প্রাক্কালে সোনার বাংলার ঈদ সংখ্যায় কবির একটি কবিতা ছাপা হয় আহমদ আবদুল্লাহ্ ছদ্ম নামে। কবি অসুস্থ শরীরে এ কবিতাটি লিখে দিয়েছিলেন আমাদের। সম্ভবত এটিই ছিল তাঁর লেখা শেষ কবিতা। এর আগে অবশ্য আমরা তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা 'সোনার বাংলা'য় মুদ্রণ করেছিলাম। বাংলা নববর্ষের একটি বিশেষ সংখ্যায় আমরা একই পাতায় এক পাশে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যদিকে ফররুখ আহমদের 'বৈশাখ' কবিতা ছাপলে বিষয়টি তখন বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। কবির মৃত্যুর কিছুদিন আগে চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের মৃত্যুছায়া গ্রাস করেছিল বাংলাদেশকে। তখন আমরা 'সোনার বাংলা'য় ছেপেছিলাম ফররুখ আহমদের 'লাশ'। মনে হয়েছিল, কবি যেন এই মাত্র কবিতাটি লিখেছেন। বাংলাদেশ তখন কার্যত একটি বড় লাশে রূপান্তরিত। ফররুখ-এর 'লাশ' তারই সমান্তরালে দাঁড়িয়েছিল 'মৃত সভ্যতার দাস'দের প্রতি অভিশাপ উচ্চারণে। এর কদিন পর কবি নিজেই লাশ হলেন। ১৯৭৪ সালের ১৯ অক্টোবর সন্ধ্যায় নারিন্দায় এক চাচার বাসায় বসে টিভিতে খবর দেখছিলাম। হঠাৎ যেন বজ্রপাত হলো। বিটিভিতে গত ক'বছরে একবারও যে কবির নাম শুনতে পাইনি, সেই টিভির পর্দা জুড়ে কবি ফররুখ আহমদের ছবি ভেসে উঠলো। কাউকে কিছু না বলে ছুটে বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে।

পরদিন সকালে কবিকে তাঁর ইস্কাটনের সরকারি বাসার ভেতর গোসল করানো হলো। সাদা কাফনে আবৃত কবিকে তিন তলা থেকে স্বল্প প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে কোলে করে নীচে নামানোর দায়িত্বটা রুদ্ধ আবেগে ছিনিয়ে নিলাম। চারদিক থেকে ভক্তরা এসে জড়ো হচ্ছিলেন নিউ ইস্কাটন মসজিদের সামনে। সরকারি দায়িত্বশীলরা কেউ আসেননি। কবি আজীবন রাজ-রাজড়াদেরকে এড়িয়ে চলেছেন। সেটা বুঝতে পেরেই বোধ হয় তাঁরা কবির লাশের কাছে ঘেঁষতে সাহস করলেন না।

কবির কবর কোথায় হবে তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল সকাল থেকেই। অনেকের ইচ্ছা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে কিংবা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর

মাযারের পাশে কবর দেওয়া হবে কবিকে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সাড়া মিললো না। কবি শহরের বুকে কোনো জায়গা রেখে যাননি যেখানে তাঁর কবর হতে পারে। এ সময় ছুটে এলেন কবি বেনজীর আহমদ। দু'হাত বাড়িয়ে চিৎকার করে বললেন : 'আমার ভাইকে আমার কাছে নিয়ে যেতে দিন।' এভাবেই বিষয়টির নিষ্পত্তি হলো। জানাযা শুরু হবে। এ সময় এক ব্যক্তি ছুটে এলেন। তাঁর হাতে একটি আতরের শিশি। 'সিরাজাম মুনীরা'র কবিকে উপহার দেয়ার জন্য কে যেন এ আতর পাঠিয়েছেন নবীর মদীনা থেকে। সে আতরে কবির কাফন সিক্ত হলো। জানাযার পর লাশ নিয়ে মিছিল শুরু হলো শাহজাহানপুরে কবি বেনজীর আহমদের বাড়ির উদ্দেশ্যে।

ফররুখ আহমদ প্রথমবার ঢাকা এসে উঠেছিলেন কবি বেনজীর আহমদের বাসায়, আগা মসিহ লেনে। কবির প্রথম কাব্য 'সাত-সাগরে মাঝি' কবি বেনজীর আহমদের উদ্যোগেই ছাপা হয়েছিল। তাঁর শেষ শয্যাও রচিত হলো বেনজীর আহমদের শাহজাহানপুরস্থ বাড়ির সবুজ-শ্যামল, ছায়া-ঘেরা, শান্ত-সুশীতল আম্রকাননে। কবির লাশ কবরে নামানোর সময় সামরিক বাদ্যযন্ত্রে লাস্ট পোস্টের সুর মূর্ছিত হলো না। কিন্তু হাজারো অশ্রুসিক্ত ভক্তের সাথে সমগ্র প্রকৃতি নিথর দাঁড়িয়ে সমুদ্রযাত্রী সিন্দবাদ নাবিককে গভীর আবেগে ও পরম শ্রদ্ধায় বিদায়ী সালাম জানালো। পরবর্তীতে কবি বেনজীর আহমদও শেষ শয্যা গ্রহণ করেন কবি ফররুখ আহমদের কবরের পাশেই। 

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ৯ম সংখ্যা, জুন, ২০০৪]

# আব্বাকে যেমন দেখেছি

## সৈয়দ আবদুল্লাহিল মাহমুদ

আমার আব্বা কবি ফররুখ আহমদ। জন্ম ১৯১৮ সালের ১০ জুন যশোরের মাঝাইল গ্রামে। এ তারিখটা আমি পেয়েছি আব্বার নিজের হাতের লেখায় ম্যাট্রিক সিলেকশনের একখানা বাংলা কবিতার বইতে। আমার দাদা খান সাহেব সৈয়দ হাতেম আলী ছিলেন একজন সৎ, অধ্যয়নশীল, ধর্মের কঠোর অনুশীলনকারী লোক। সৎ ও দক্ষভাবে পুলিশের চাকরি করার জন্য তিনি 'খান সাহেব' উপাধি পেয়েছিলেন এবং তাঁর মায়ের আদেশে তিনি দীর্ঘকাল পুলিশের চাকরি করলেও কোনদিন ঘুষ খাননি। সে সময় পুলিশের লোকেরা ঘুষ খেতো। এমনি এক সময়ে তিনি একদিন তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের জিজ্ঞাসা করলেন যে, তারা কেন ঘুষ খায়। তারা তাঁকে বলেছিল যে, ঘুষ না খেলে তাদের সংসার চলে না। আমার দাদা তাদের বলেছিলেন তাদের বেতন বাড়াবার জন্য আন্দোলন করতে। তারা তাদের অক্ষমতা জানালে তিনি তাদের সঙ্গে থেকে কর্তৃপক্ষের কাছে পুলিশ কর্মচারীদের বেতন বাড়াবার জন্য আন্দোলন করেন। তখন এদেশে ইংরেজের রাজত্বকাল। ইংল্যান্ডের সম্রাট তখন ৫ম জর্জ। সে ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে কর্মচারীদেরকে আন্দোলনে উৎসাহিত করার জন্য দাদার বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসক মামলা দায়ের করল। (Crown vs Syed Hatem Ali) দাদার বিরুদ্ধে (সেক্রেটারিয়েটের) গোপন কক্ষে ফাইলের পর ফাইল উমে উঠল। আমার দাদা তখন তাঁর কাজের ফলস্বরূপ সরকারি মামলার সম্মুখীন হয়ে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। দাদার বন্ধু ছিলেন বিখ্যাত ওলি মাওলানা সফিউল্লাহ (রঃ)-এর জামাই 'খান সাহেব' ডাক্তার আবুল খায়ের। তিনি একদিন দাদাকে অত্যন্ত চিন্তিত দেখে বললেন, "তুই এত চিন্তিত কেন?" তখন দাদা তাঁকে সব কথা খুলে বললে তিনি বললেন, তাহলে তুই চল আমার শ্বশুরের কাছে। আমার দাদা অত্যন্ত শরীয়াপন্থী ছিলেন এবং পীর সাহেবের কাছে যাওয়া প্রথমে পছন্দ করতেন না। তবে বন্ধুর পীড়াপীড়িতে তিনি মাওলানা সফিউল্লাহ (রঃ)-এর কাছে যান। আমার দাদার স্বাস্থ্য আমাদের বা আব্বার মত frail ছিল না। তিনি ছিলেন দীর্ঘদেহী ভারী গঠনের লোক।

মাওলানা সফিউল্লাহ (রঃ) তাঁর কথা শোনার পর আমার দাদাকে বিস্মিত করে– বিড়ালের বাচ্চাকে সহজে যেমন ছুড়ে ফেলা যায় তেমনিভাবে ঘরের মধ্যে কয়েকবার ছুঁড়ে ফেলে বললেন, 'যাও'। এ ঘটনার পরে (সেক্রেটারিয়েটের) গোপন কক্ষে রক্ষিত দাদার বিরুদ্ধে জমা ফাইলগুলো অদৃশ্য হয়ে যায়। সেগুলোর আর কোন পাত্তাও পাওয়া যায়নি। ফলে দাদার বিরুদ্ধে মামলা আর চলেনি। এ ঘটনাটা আমরা আব্বার কাছে কয়েকবার শুনেছি। এ ঘটনার পর দাদা পীর-দরবেশদের প্রতি

অবজ্ঞার ভাব থেকে মুক্ত হন। এ রকম ব্যক্তির সাথে আব্বাও নীতির ব্যাপারে অনমনীয়তার শিক্ষা তাঁর আব্বার কাছেই পেয়েছিলেন।

আব্বার কাছ থেকে তাঁর জীবনের আরও অনেক কিছুই আমরা জানতে পেরেছি। তবে এ ব্যাপারে তিনি স্বেচ্ছায় কিছু না বললে আমরা তাঁর কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহস পেতাম না। যখন তিনি প্রফুল্ল mood এ থাকতেন তখন তিনি একটানা বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে কথা বলতেন। আমরা তাঁর কথা শুনে যেতাম। তাঁর কথার বিরুদ্ধে কিছু বলার ক্ষমতা বা সাহস আমাদের ছিল না।

আমার দাদা চাকরির জন্য প্রায়ই বদলী হতেন। এজন্য আব্বাও তাঁর সাথে থাকতেন। আব্বা ছোট বয়সেই দাদার সাথে কলকাতায় চলে আসেন। তবে তারিখটা তিনি কখনোই বলেন নি। কলকাতায় থাকার সময়ে আব্বা বালিগঞ্জ মডেল স্কুলে ভর্তি হন। তখন কেবল ধনী অভিজাত হিন্দুদের ছেলেরাই ঐ স্কুলে পড়তো। আব্বা তাঁর ক্লাসে একমাত্র মুসলমান ছাত্র ছিলেন। আব্বা ছোটবেলা থেকেই পড়াশুনায় মনোযোগী ছিলেন। একদিন ক্লাসে বাংলার এক শিক্ষক ছেলেদের একটা সংস্কৃত শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করলে কেবল আব্বাই ঐ শব্দের অর্থ বলতে পারলে– বাংলার শিক্ষক বিস্মিত হন। ঐ বছরই ক্লাসের পরীক্ষায় বাংলায় প্রথম হয়ে তিনি আরো বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন।

কলকাতায় তখন ফুল-পাখি ইত্যাদি বিক্রির বাজার ছিল। আব্বা প্রায় সেখানে গিয়ে তাঁর কৌতুহল নিবৃত্ত করার প্রয়াস পেতেন। এছাড়া গ্রামে থাকার সময় বাড়ির এক চাকরের সঙ্গে পাখির বাসা দেখার জন্য দূর-দূরান্তে ঘুরে বেড়াতেন। তাছাড়া ফুলের বাগান করাটাও তাঁর একটা শখ ছিল। আব্বার দাদী ছিলেন একজন স্নেহশীল পরম ধার্মিকা এবং সংসারের কাজে সুদক্ষ মহিলা। তিনি বুড়ো বয়সেও সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকতেন এবং নাতিপুতিদের দুরন্তপনা অনায়াসে সহ্য করতেন। বাল্যেই মাতৃহীন হয়েও তাই আব্বা মায়ের অভাব তেমন অনুভব করেন নি। একবার আব্বার মাথায় টমাস এডিসনের মত খেয়াল চাপে যে, মুরগীরা ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফুটালে তিনি কেন তা পারবেন না। এ ধরনের ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি এক রাতে কিছু ডিম নিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকেন। সকালে তাঁর দাদী দেখেন বিছানায় ভাঙা ডিমের লালা ও কুসুম নষ্ট হয়ে গেছে। আব্বার দাদীর আর মুরগীর বাচ্চা ফুটানো হল না। তাছাড়া আব্বা তাঁর ছোট ভাই সৈয়দ মুশির আহমদের সঙ্গে নিত্য-নতুন নানা দুরন্তপনা আবিষ্কারে ব্যস্ত থাকতেন।

স্কুলে পড়ার সময় তিনি কবিতা লেখা আরম্ভ করলেও তাঁর প্রথম কবিতা কবে, কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল তা আমি জানি না। কারণ তিনি নিজের সাহিত্য চর্চাসম্বন্ধে আমাদের সাথে বিশেষ আলোচনা করতেন না। তিনি মনে করতেন যার যা কাজ সে তাই ভাল করে করবে, অন্য কিছুতে নাক গলাতেন না। বিভিন্ন পেশা সম্বন্ধেও তাঁর নিজের বিশেষ ধারণা ছিল এবং সব সময় একটা কর্তৃত্বশীল মনোভাব তাঁর মধ্যে ছিল।

তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী পেয়ে পাস করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন

খুলনা জেলা স্কুল থেকে। ঐ স্কুলে ছাত্র থাকার সময় প্রখ্যাত লেখক আবুল ফজল (পরবর্তীতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ও বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা) তাঁর শিক্ষক ছিলেন। আবুল ফজল তাঁর 'রেখাচিত্রে' আব্বার পড়াশুনা সম্পর্কে একটা ঘটনার উল্লেখ করেছেন। আব্বা ছোটবেলায় অত্যন্ত দুরন্ত হলেও লেখাপড়ায় খুবই মনোযোগী ছিলেন। স্কুলে থাকাকালেই তিনি বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যের অনেক বই ভালভাবে পড়ে ফেলেছিলেন। মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্য' তাঁর মুখস্থ ছিল।

আব্বা ছোটবেলা থেকেই একটু অন্য ধরনের লোক ছিলেন। সে সময়ের মধ্যবিত্ত সমাজের রক্ষণশীলতা, বংশ গৌরব ও বুর্জোয়া মনোবৃত্তি তাঁকে পীড়া দিত। এজন্য কলেজে পড়ার সময়ে তিনি তাঁর নাম থেকে 'সৈয়দ' শব্দ বাদ দেন এবং কমরেড এম.এন. রায়ের সংস্পর্শে আসেন। আব্বা মাঝে মাঝে কমরেড এম.এন.রায়ের পাণ্ডিত্যের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতেন। কমরেড এম.এন. রায় লেনিনের ডান হাতের মত ছিলেন। পরে তিনি সমাজতন্ত্রে আস্থা হারিয়ে 'হিউম্যানিজমে' বিশ্বাসী হয়ে পড়েন। আব্বা কলেজে পড়ার সময়ে কমরেড রায়ের চিন্তায় প্রভাবিত হন।

তারও বেশ কিছু পরে আব্বার চিন্তা মোড় নেয় তাঁর পীর সাহেব মাওলানা আবদুল খালেকের সংস্পর্শে এসে। তিনি ছিলেন ফুরফুরার বিখ্যাত পীর মাওলানা আবু বকর ছিদ্দিকী (রঃ)-এর খলিফা এবং লেডী ব্রাবোর্ন কলেজে অধ্যাপনা করতেন। পরে মাঝে মাঝে আব্বা তাঁর পীরের কথা গভীর শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করতেন। আল্লাহর উপর আব্বার অত্যন্ত গভীর বিশ্বাস ছিল। এত দুর্বিপাক, দুর্যোগ তাঁর উপর দিয়ে গেছে কিন্তু কখনই তাঁকে আল্লাহর নামে অনুযোগ করতে শুনি নি। বরং কেউ ভুলক্রমেও আল্লাহর নামে কোন খারাপ কথা বলে ফেললে তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হতেন ও এ সম্বন্ধে সাবধানে কথা বলার উপদেশ দিতেন।

তিনি নিজের দেশকেও সেভাবে ভালবেসেছেন এবং দেশ ও মসজিদকে একই দৃষ্টিতে দেখতেন। তিনি সব সময়ই নিয়ত বিশুদ্ধ রাখার উপরে জোর দিতেন। এজন্য ছোটকালে তাঁকে আমাদের বাসায়  কোরবানি দিতে বা মিলাদ পড়তে দেখিনি। দরকার হলে তিনি অন্য কোথাও তা করতেন। পরে অবশ্য তিনি বাড়িতে কোরবানি দিয়েছেন ও মিলাদ পড়িয়েছেন। মিথ্যা কথা বলাকে তিনি তীব্রভাবে ঘৃণা করতেন। তবে তিনি নিজে কুরআন, হাদীস ও অন্যান্য serious ব্যাপার ছাড়া অন্য সাধারণ ব্যাপারে কথা বলতে গেলে exaggeration করার প্রবণতা থাকলেও অন্যের কাছে কথা ও কাজে Precision, ideality & perfection আশা করতেন। এজন্য প্রাচীন ও বর্তমানের কোন কোন মুসলিম মনীষীর চরিত্রকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। যদি কেউ তাঁর সামনে সাবধানে কথা না বলত তবে তাকে পদে পদে তাঁর কাছে অপদস্থ হতে হতো। তাঁর সঙ্গে খুবই হিসাব করে কথা বলতে হতো।

আব্বা আল্লামা ইকবালের একটা কথা বলতেন। যে ছেলে পৈতৃক সম্পত্তির আশা করে সে ভিক্ষুক। আব্বাকে ছোটবেলায় দেখেছি অল্পই। কারণ তিনি সাধারণত বিকালে বা সন্ধ্যায় অফিসে যেতেন এবং বেশ রাতে বাড়িতে ফিরতেন এবং সকালের দিকে ঘুমাতেন। আমরা স্কুলে চলে যেতাম। এজন্য তাঁর সঙ্গে দেখা হত কমই। তাছাড়া তিনি লেখার সময় ব্যস্ত থাকলে তিনি না ডাকলে কেউ তাঁর কাছে যেত না। তাঁর লেখার সময়ে কোন রকম শব্দ বা হৈচৈ করা, তাঁর সামনে যাওয়া কার্যত নিষেধ ছিল।

সময় পেলে তিনি নিজেই মাঝে মাঝে বাজার করতেন। ছোটবেলায় তাঁকে বাজারে দাম করতে দেখিনি। তাঁকে দেখলেই তরকারি ও মাছ বিক্রেতাদের মাঝে ফূর্তির ঢেউ বয়ে যেত এবং তারা তাদের জিনিসপত্র তাঁকে গুছিয়ে দেয়ার প্রয়াস পেতো। অনেক সময় বাড়িতেও তারা এসে তাদের জিনিস দিয়ে যেতো। আব্বা রিকশাওয়ালা, মুদি, তরকারিওয়ালা ইত্যাদি শ্রেণীর লোকদের সাথে অসংকোচে মিশতে পারতেন এবং তাদের সঙ্গে কথ্যভাষায় কথা বলতেন। এজন্য কোন রকম অহমিকা তাঁর মনে স্থান পেত না।

তিনি খুব সাহসী লোক ছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই। ঢাকা বেতারের প্রাক্তন R.D জনাব Z.A.Bokheri, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান প্রমুখ ব্যক্তিদের সাথে তিনি যেভাবে বিভিন্ন বিষয়ে সাহসিকতার সাথে স্পষ্ট কথা বলেছেন, তাতে তাঁরা বিস্মিত হয়েছেন।

ছেলেপেলেরা স্কুল থেকে বা কোথাও বেড়াতে গেলে ফিরে আসতে দেরী করলে আব্বা অস্থির হয়ে পড়তেন। এমনকি কলেজে পড়া ছেলের ব্যাপারেও তাঁর এ উদ্বিগ্নতা অত্যন্ত প্রকট ছিল। তাঁর স্নেহের প্রকাশ ছোটকালে আমরা তেমন বুঝিনি! যদিও উপরের ঘটনায় ছেলেমেয়েদের প্রতি তাঁর স্নেহ ও উদ্বিগ্নতা নির্দেশ করে তবু তাঁর সম্ভাব্য ধমক বা কটু কথাগুলোর ভয়ে মনে হতো না যে তাঁর মধ্যে কোন স্নেহ আছে। অবশ্য আমার ও ভাইবোনদের অসুখ-বিসুখ হলে তিনি নিজে এসে খোঁজ-খবর নিতেন। মাঝে মাঝে আবার ধমকও দিতেন।

তবে ১৯৫৬ ও ৫৭ সালে আমার ছোট দুই ভাইবোনের মৃত্যু হলে তাঁর স্নেহের প্রকাশ পাওয়া যায় পরবর্তীতে জন্মগ্রহণকারী আমার ছোট ভাইদের উপরে। আমার ছোট ভাইবোনদের ব্যাপারে শেষে Discipline, লেখাপড়া-আদব-কায়দা ইত্যাদির কড়াকড়ি বেশ শিথিল করে ফেলেছিলেন। ফলে তিনি দুপুরে শুয়ে চিন্তা করার সময়ে তাঁর মাথার কাছে হৈ-চৈ করে খেলার সাহস পেতো যা আমরা তাঁর বড় ছেলেমেয়েরা কখনো কল্পনাও করতে পারতাম না। নামায না পড়াটাকে তীব্রভাবে ঘৃণা করতেন তিনি। কারো নামাজ না পড়ার কথা জানতে পারলে তাকে প্রচণ্ড বকা দিতেন।

তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল অত্যন্ত উঁচু। তিনি চাইতেন, তাঁর প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েই যেন এক এক ক্ষেত্রে দিকপাল হয়ে মানুষের সেবা করে। তাঁর নির্দেশ পালনে কেউ অসমর্থ হলে তিনি তার উপরে অসম্ভব রকমের চটে যেতেন।

তিনি ছেলেমেয়েদের ও বাইরের লোকদের মধ্যে কথা বলার বিষয় ও কাজের শ্রেণী বিভাগ করে নিয়েছিলেন। এরজন্য তিনি কারো সাথে সাহিত্য, আবার কারো সাথে সুফীবাদ, আবার কারো সাথে সমাজ-রাজনীতি নিয়েও আলোচনা করতেন। তিনি কথাবার্তায় খুবই দক্ষ ও সুন্দরভাবে বলে যেতে পারতেন এবং কেউ তাঁর কথার উপরে কথা বলতেন না এবং সেটার অবকাশও থাকত না।

সাধারণত মগজের চেয়ে হৃদয়ই ছিল তাঁর চালিকা শক্তি! তবে তিনি কোন সিদ্ধান্ত নিলে তাতে অবিচলিত থাকতেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলে তা পালন করতেন। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে তিনি তাঁর বড় ভাই সৈয়দ সিদ্দিক আহমেদকে সবচেয়ে শ্রদ্ধা করতেন ও তাঁর প্রশংসা করতেন এবং সারাজীবন তার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন।

তিনি সুফীদের কথা বলতে খুবই ভালবাসতেন এবং অনেক সময় তাঁদের কথা বলার সময় তাঁর চোখ ছলছল করে উঠতো। হযরত শায়খ আহমদ সিরহিন্দী, মুজাদ্দিদ আলফেসানীর (রাঃ) একজন পরম ভক্ত ছিলেন তিনি এবং তাঁর তরীকাকে সকল তরীকার তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলতেন। তিনি আরো বলতেন যে, ইমাম মেহেদী ঐ তরীকারই একজন সাধক হবেন।

হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর সাহাবাদের সম্পর্কে তাঁর অত্যন্ত উঁচু ধারণা ছিল। সাহাবাদের কারুর সম্পর্কে কোন সমালোচনা তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন যে, সাহাবাদের চরিত্রের অনুসরণ একমাত্র সুফীরাই করতে পেরেছেন। তিনি কবি ইকবালকে খুব শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁকে তাঁর ওস্তাদ মনে করতেন।

কোন রকম বিলাসিতা আব্বা পছন্দ করতেন না। বিজাতীয় পোশাক তাঁকে কখনোই পরতে দেখিনি। সারাজীবন লংক্লথের পায়জামা ও লংক্লথ বা সাধারণ পপলিনের পাঞ্জাবীই পরেছেন। তবে ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন থাকার জন্য শেরোয়ানী পরাটা পছন্দ করতেন। জর্দাসহ পান ও চা ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। রাত জাগার অভ্যাস ছিল তাঁর এবং রাতে তিনি তাঁর কবিতা পড়তেন ও অনেক কবিতা লিখেছেন। অবশ্য জীবনের শেষ দিকে লেখা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। তিনি না বললে কেউ তাঁর বই বা পাণ্ডুলিপিতে হাত দিতো না। পাণ্ডুলিপির গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে তিনি খুব সচেতন ছিলেন। এক ধরনের সন্দেহের ভাব তাঁর মনে ছিল! অফিস বা অন্য কোথাও থেকে বাড়িতে ফিরলে জিজ্ঞাসা করতেন, কেউ তাঁর খাতাপত্র বা বই ধরেছে কিনা। তাঁর চৌকি ও টেবিল বই-খাতা ইত্যাদিতে অগোছালোভাবে ভরা থাকতো। কেউ ওগুলোকে ঠিক মতো সাজালেও চটে যেতেন।

ফারসি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের সম্পর্কে তাঁর খুব উঁচু ধারণা ছিল। শেখ সাদী সম্পর্কে পাশ্চাত্যের কোন এক লেখকের বক্তব্য প্রায়ই উদ্ধৃত করতেন, সেটি হচ্ছে : "Wisdom and beauty hand in hand that is Sadi!"

জার্মান কবি Goethe-এর একটি উক্তিও তিনি মাঝে মাঝে বলতেন : সে উক্তিটি

হচ্ছে : জামী ও রুমী উভয়েই পারশ্য কবি– এ দু'জনের মধ্যে যিনি Inferior তাঁদের একজনের সমান হলেও আমি ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কবি হতে পারতাম।

এসবই তিনি বলতেন যখন তাঁর মন ভাল থাকতো। তাঁর চেহারায় তাঁর প্রত্যেকটি অনুভূতিই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধরা পড়তো। তিনি তা লুকাতেন না বা লুকাতে চাইলেও পারতেন না।

তিনি রেগে গেলে তাঁর সামনে যাওয়ার সাহস আমাদের কারো থাকত না। রেগে যাওয়া মাত্রই তাঁর চেহারার দারুণ পরিবর্তন দেখা দিত। এমনিতেই তাঁর চোখ ছিল বড় ও তীক্ষ্ণ ও ঈগলের ঠোঁটের মত নাক। রাগলে তাঁর চোখ মুখ দিয়ে যেন আগুনের বৃষ্টি ঝরতো। আর তাঁর রাগেও অনেক সময় তালমান পাওয়া যেত না। এই ভাল আছেন আবার একটু পরেই কোন সামান্য কারণেই হয়তো চটে গেলেন : যদিও বাইরের লোকেরা তাঁকে শুধু একজন Angel মনে করতেন এবং সে অনুযায়ী ধারণা করে থাকবেন।

তাঁর অনেক Ambitous Plan ছিল। কিন্তু অনেক কিছুই তাঁর হয়ে ওঠেনি টাকা-পয়সা ও সুযোগের অভাবে। কিন্তু তাই বলে তিনি নীতি বিসর্জন দিয়ে টাকা রোজগারের কথা ভাবতেও পারতেন না। তাঁর সীমিত আয়ের মধ্যেও তিনি যাকাত দিতেন, গোপনে দান করতেন।

আব্বা অত্যন্ত খুঁতখুঁতে স্বভাবের লোক ছিলেন। কথাবার্তা, চালচলন, রান্নাবান্না বা অন্য কোন ব্যাপারে কোন রকম ত্রুটি তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তিনি নিজে যা ভাল মনে করতেন তা প্রচার করা থেকে কখনোই বিরত বা কোন কারণেই নিবৃত্ত হতেন না।

ফুল, আতর, ছোট শিশু ও তাদের ফুর্তি করা পছন্দ করতেন। কিন্তু পাকসাফ থাকার ব্যাপারে খুঁতখুঁতে স্বভাবের জন্য বেশীক্ষণ ছেলেপেলেদের কোলে রাখতেন না। যে বাসায় ছোট ছেলেপেলে নেই সে বাসাকে তিনি ভূতের বাড়ির মত মনে করতেন।

আব্বা নিজের সন্তান ও অন্যের সন্তানের মধ্যে কোন রকম পার্থক্য করতেন না। বরং গুণসম্পন্ন থাকলেও অন্যের সন্তানকে নিজের সন্তানের চেয়েও বেশী ভালবাসতেন। সব সময় তিনি নিজের সাথে অন্যের সন্তানের উন্নতি কামনা করেছেন। ভৃত্য ভিখারী এদের সাথেও তিনি ভাল ব্যবহার করতেন।

আব্বা বিড়াল, কুকুর, পশু-পাখি ভালবাসতেন এবং তাদের নামকরণও করতেন। বিড়াল নিয়ে তিনি বেশ কয়েকটা কবিতা ও ছড়া লিখেছেন। এ ধরনের একটা ছড়া 'ধুলমিয়া বেপারী' নামে কবি আজিজুর রহমান সম্পাদিত আলাপনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬০ কিংবা'৬১ সালে। কবি আজিজুর রহমান সাহেবকে ঐ বিড়ালটাকে আব্বা দেখিয়েছিলেন। আব্বা Humour পছন্দ করতেন। এজন্যে সব আলোচনার পরে বিড়ালের গল্প করে বা বিড়ালকে Personify করে গল্প করে কথা শেষ করতেন।

আব্বার সমালোচনা থেকে রেহাই পেয়েছে এমন লোক কম। তবে সুফীদের

সম্বন্ধে তাঁর কাছ থেকে কোন সমালোচনা শোনা যায় নি।

শেষের দিকে সাধারণ সাহিত্য চর্চায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। কোরআন শরীফের কিছু সূরার অনুবাদ করা, হামদ, নাত ইত্যাদি রচনা করা, তফসির পড়া, তসবী পড়া ইত্যাদিতেই ব্যস্ত থাকতেন। যদিও নফল ইবাদত চুপেচাপেই করতেন।

তিনি কেবল কবিতা বা ধর্মোন্নতির কথাই বলতেন না। দেশের শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যও চিন্তা করতেন। দেশের উদ্ভিজ, প্রাণীজ, খনিজ ইত্যাদি সম্পদের সদ্ব্যবহার করে দেশের উন্নয়ন এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়ে ঐসব জিনিসের নতুন নতুন প্রয়োগ আবিষ্কারের কথাও চিন্তা করতেন। ইংরেজদের চরিত্রের কিছু গুণ যেমন পরিশ্রমশীলতা, সততা, নিয়মানুবর্তিতা ও স্বাবলম্বন ইত্যাদির প্রশংসা করতেন।

প্রখ্যাত বামপন্থী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁকে দাদা বলে সম্বোধন করতেন এবং সুকান্তের অনুরোধে আব্বা তাঁর (সুকান্তের) অনেক কবিতাই প্রকাশ করেছিলেন। তাছাড়া আব্বার কাছে উৎসাহ পেয়ে অদ্বৈতমল্ল বর্মণ 'তিতাস একটি নদীর নাম' দিয়ে একখানা উপন্যাস রচনা করেন।

আব্বা কলকাতায় থাকাকালে অরণি, পরিচয়, নবযুগ, চতুরঙ্গ, কবিতা, মৃত্তিকা, মোহাম্মদী, সওগাত ও অন্যান্য পত্রিকায় লিখতেন এবং সেজন্য তৎকালের বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল।

মৃত্যুর শীতল স্পর্শ কবিতা ও অনুভূতির এ অগ্নিগিরিকে হঠাৎ সকলকে অভিভূত করে চিরদিনের মত নিভিয়ে দিল। তবে তাঁর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত অনেক রচনাই ভবিষ্যতে মূল্যবান রত্নের মত মানুষের সৌন্দর্যবোধকে উজ্জীবিত করবে। আল্লাহতায়ালা তাঁর আত্মাকে শান্তিতে রাখুন এবং তাঁর সমগ্র রচনাকে সূর্যের আলোর মতো চারিদিকে ছড়িয়ে দিন। ◻

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ঊনবিংশ সংকলন, জুন ২০১০]

# আব্বার কথা

## আহমদ আখতার

আমরা অর্থাৎ ছোটরা যখন বড় হচ্ছি তখন আব্বার (কবি ফররুখ আহমদ) লেখালেখির জগও খানিক পাল্টাচ্ছে। বদলাচ্ছে দৃশ্যপট। আব্বার লেখাতেও এর একটি সূত্র মেলে। যখন শুনি: 'কালবেশাখীর দেশে চল তবে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে/বাসা বাঁধি।' আসলেও তাই 'অনেক ঝড়ের দোলা পার হয়ে' আব্বার তখন স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনা। 'আমরা চলেছি আলফাডাঙার মাঠে'। 'অতসী ফুলের দেশে'। অর্থাৎ বাংলাদেশ। আরও আছে সাইবেরিয়ার বুনোহাঁসের খবর। আছে সমুদ্র-পাখি আলবাট্রস। এমনটি 'ক্রিসানথিমাম'ও হয়ে ওঠে পরিচিত ফুল। সবটাই অন্যরকম। এককথায় ছোটদের জন্য আব্বার গড়া ভুবনটি বিশাল, বৈচিত্র্যময়। সময়টা ষাটের দশকের মাঝামাঝি। আমরা তখন মালিবাগে। আজকের মালিবাগের সঙ্গে তার ব্যবধান বিস্তর। কেননা, তখনও বিদুৎ আসেনি। সন্ধ্যা হলেই পরিচিত সব কিছুতেই রহস্য জড়িয়ে থাকে। হারিকেনের আলোর রহস্যময় সেই জগৎ । আব্বা এ সময়ে শিশু-কিশোরদের জন্যে দু'হাতে লিখছেন। পাণ্ডুলিপির পর পাণ্ডুলিপি তৈরি হচ্ছে। অফিস যাবার পথে কড়া নির্দেশ থাকত বাইরের কেউ যেন তাঁর ঘরে না ঢোকে। অসম্ভব যত্নবান ছিলেন নিজ লেখালেখি সংরক্ষণে । একই লেখার একাধিক কপি করতেন এমন কি বই প্রকাশের আগে পরিকল্পিত বইয়ের নাম প্রকাশেও ছিল ঘোরতর আপত্তি।

আমরা তখন ছোট। আব্বাও লিখছেন ছোটদের জন্যে। তখন ভাবিনি। ভাবতে পারাটা সম্ভবও ছিল না। আজ মনে হয় অনেককিছু থেকেই আব্বা লেখার রসদ সংগ্রহ করতেন কোনকিছু ভালো না লাগলে পাল্টা লেখা দাঁড় করাতেন। ছোট্ট একটা ঘটনা বলি। বৈঠকখানায় মাস্টার সাহেবের, সে সময়ে আমরা সবাই তাই বলি, কাছে বসে পড়ছি 'এ চলেছে এক্কা গাড়ি' জাতীয় একটা কিছু। সেদিন সন্ধ্যায় আব্বা বাসায়। পাশের ঘর থেকে উঠে এলেন। স্পষ্ট মনে আছে, মাস্টার সাহেবের সঙ্গে আলাপ করলেন 'এক্কা' নিয়ে। বিরক্তি প্রকাশ করলেন এ ধরনের সেকেলে প্রয়োগ। পরে যখন পড়েছি আব্বারই লেখা 'এ চলেছে এঞ্জিন/এলাচ দানা লং কিনে' তখন আগের সেই দৃশ্যটি মনে ভেসেছে। আব্বা সব আবেগই লেখায় ধারণ করতেন। তবে মুখে মুখে ছড়া কাটারও অভ্যাস ছিল। এমন কি শ্লোক জাতীয় উক্তিও করতেন মাঝে মধ্যে। মনে পড়ে এরকম দু'একটি উক্তি: 'সব বেটাকে ছেড়ে দিয়ে বেড়ে বেটাকে ধর।' 'জেলেদের ছেলে ঘুমায় জাল মুড়ি দিয়ে' ইত্যাদি। এসব বলতেন যখন খুব মুডে থাকতেন কেবল তখনই।

সে সময় যুক্তাক্ষর বর্জনে অত্যুৎসাহী কেউ কেউ 'ক্ষ' বর্ণটি বাদ দেয়ার কথা উঠিয়েছিলেন। এ নিয়েও আব্বা মুখে মুখে ব্যঙ্গ ছড়া কাটেন। ছড়াটি মনে নেই। মনে আছে অধ্যক্ষ বানানের সেই শোচনীয় রূপটি অ-দ-ধ-ক-খ।

বই বেরুলে আব্বা খুব খুশি হতেন। ভাল বই পেলেও খুশির অন্ত থাকত না। ১৯৭৩ সাল। নানাজান বেড়াতে এসেছেন। সেই সঙ্গে বয়ে এনেছেন সুদূর পল্লী থেকে একটি প্রাচীন বাংলা অভিধান। বেশ ওজনদার। তবে দেখতে পছন্দই নয় মোটেও। বড্ড ম্লান। বিবর্ণ। তবুও নেড়েচেড়ে দেখছিলাম। আব্বা কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন খেয়াল করি নি। তবে বুঝলাম জহ্‌রী জহর চিনেছে। নানাজান বলতে চাচ্ছিলেন কিছু একটা। তারই কোনো নাতির জন্য...। না, আব্বা বগলদাবা করলেন অভিধানখানা। যেন কোনো হীরা জহরত। পরে নানাজান বলেছিলেন, তোর আব্বা লাখ টাকা পেলেও অত খুশি হতো না। এরপরেও দেখেছি আব্বাকে অভিধান কিনতে। তখন বাজারে কলকাতার সংসদ অভিধান বাংলা থেকে বাংলা, বাংলা থেকে ইংরেজি দুটি অভিধানই পাওয়া যাচ্ছে। আব্বা লোক মারফত দুটি অভিধানই কিনেছিলেন।

বলছিলাম ছোটবেলার কথা। আব্বাই একদিন আনলেন অসম্ভব সুন্দর একটি সংকলন 'ছড়ায় ছড়ায়-ছন্দ'। আর একটু বড় হলে পড়তে দিলেন গল্প সংকলন 'ঝিকিমিকি'। দারুণ মজার সব গল্প ছিল সংকলনটিতে। আব্বার প্রিয় চরিত্র সুকুমার রায়ের 'পাগলা দাশু'। আমরাও তার গুণপনায় মুগ্ধ। ততদিনে হাতে পেয়েছি 'পাখীর বাসা'। গুমোট গরমে কতবার মনের ভেতর হেঁকে গেছে সেই পঙক্তিটি-'আয় গো তোরা ঝিমিয়ে পড়া দিনটাতে/পাখীর বাসা খুঁজতে যাব একসাথে'।

প্রসঙ্গত একটি টুকরো স্মৃতির উল্লেখ না করলেই নয়। আব্বার তখন চোখ উঠেছে। আর তাই পড়ালেখা আপাতত বারণ। এ সময়ে মেজো ভাইয়ের [মরুহুম সৈয়দ আবদুল্লাহেল মাসুদ] শিক্ষা বিষয়ক একটি লেখা কোনো পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। আব্বা লেখাটি তাঁকে পড়ে শোনাবার হুকুম দিলেন। অগত্যা পড়তেই হবে। মুশকিল হলো প্রবন্ধটির কয়েক জায়গায় ইংরেজি কোটেশন রয়েছে। বিপত্তি সেখানে। তাই ঠিক করলাম [আব্বা যেহেতু দেখছেন না] ইংরেজি কোটেশন বাদ দিয়েই পড়ে শোনাই। শেষমেশ করলামও তাই। পরে বড়দের কারো কাছ থেকে আব্বার পরোক্ষ মন্তব্য শুনেছি। আব্বা সেদিন বলেছিলেন: আক্কাটা [অর্থাৎ আমি] ফাঁকি রপ্ত করেছে। তবে ভুল পাঠ, ভুল উচ্চারণ আব্বার কাছে ছিল অসহ্য। ছোট আপা তখন সম্ভবত ক্লাস নাইনে। পাশের ঘরে তারস্বরে পড়ছে ও Captain, My Captain, আব্বা তাঁর ঘর থেকে গম্ভীর স্বরে ডাকলেন: 'ইয়াসমিন"। খানিক বিরক্ত। তারপর কবিতাটি পড়লেন নিজস্ব ভঙ্গিতে। আজো যেন আবৃত্তির সেই গমক কানে বাজে। পরে জেনেছি, আব্বার আকৈশোরের প্রিয় কবি হুইটম্যান-তার লেখা কবিতা এটি।

আব্বা চাইতেন আমরা মানুষ হই। মানুষ-এই শব্দটিতে বরাবরই অসম্ভব জোর দিতেন। কোন্ মানুষ সে সময় বুঝিনি। আজও কি বুঝি? এ ব্যাপারে ঘোরতর সন্দেহ আছে। তাঁর সর্বাধিক প্রিয় বিষয় ছিল-মানুষ। এই একটি জায়গায় সাহিত্য জীবনের শুরু থেকে আমৃত্যু আব্বা ছিলেন অচঞ্চল, অনড়। ◻

---

**[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, বিংশ সংখ্যা, অক্টোবর ২০১০-জুন ২০১১]**

# অজানা ফররুখ

আহমদ আখতার

॥ এক ॥

হাজার ওলি আউলিয়া দেন জ্বালিয়ে যেথা রং মশাল,
যে দেশে ভাই দ্বীনের আলো আনেন বয়ে শাহ্ জালাল,
ইয়েমেন দেশের মাটির মতো
যার মাটিতে জুড়ায় প্রাণ... ।'

শিশু-কিশোরদের জন্য রচিত এ পঙ্ক্তিমালার রচয়িতা কে হতে পারেন... যদি বলি 'ডাহুক'-এর কবি ফররুখ আহমদ, খুব একটা অন্যথা হবে না। কেননা, 'সাত সাগরের মাঝি'ভুক্ত 'ডাহুক' ফররুখের অধ্যাত্ম-ভাবনার চূড়ান্ত শৈল্পিক নিদর্শন। সেই আধ্যাত্মিকতা তাঁর পরবর্তী কাব্যে পেয়েছে যথার্থ স্থান। 'সিরাজাম মুনিরা'ভুক্ত 'আজ সংগ্রাম', 'এই সংগ্রাম', 'প্রেমপন্থী', 'অশ্রুবিন্দু', 'গাউসুল আজম', 'সুলতানুল হিন্দ', 'খাজা নকশবন্দ', 'মুজাদ্দিদ আলফেসানি', শীর্ষক কবিতাগুচ্ছেই শুধু নয়, নাম কবিতাতেও তাদের উল্লেখ তাৎপর্যপূর্ণ। নবী শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ সা. এর প্রকৃত অনুসারী হিসাবেই কবি সকল যুগের সেরা সুফী-সাধকদের মূল্যায়ন করেছেন এভাবেঃ

চলেছে ধ্যানের জ্ঞান-শিখা বয়ে জিলানের বীর, চিশতি বীর,
রঙ্গিন করি মাটির সূরাহি নকশবন্দের নয়নে নীর,
জ্ঞানের প্রেমের নিশান তুলেছে হাজার সালের মুজাদ্দিদ,
রায়বেরেলীর জঙ্গি দিল্লির ভেঙ্গেছে লক্ষ রাতের নিদ,
ওরা গেছে বহি তোমার নিশান রেখে গেছে পথে সেই নিশানি,
তবু সে চলার শেষ নাই আর, কোন দিন শেষ হবে না জানি।

'সিরাজাম মুনিরা' উৎসর্গীকৃত 'পরম শ্রদ্ধাভাজন আলহাজ্ব মাওলানা আব্দুল খালেক' হচ্ছেন আব্বার আধ্যাত্মিক গুরু-তাঁর কথায় পীর সাহেব।

॥ দুই ॥

এতোদিন ঠিক খেয়াল করিনি-আর তাই 'মাসিক মোহাম্মদী'র শ্রাবণ ১৩৪৮ সংখ্যার বিভিন্ন পৃষ্ঠায় হাতে-লেখা আব্বার খেয়ালি ভাবনা সংবলিত টুকরো কবিতাগুলো আমার চোখকে ফাঁকি দিয়েছে। পত্রিকাটির উল্লেখিত সংখ্যার প্রথম পাতায় মুদ্রিত কবি শাহাদাৎ হোসেনের 'বাণী চিরন্তনী' কবিতাটি নাম সমেত কেটে আব্বা সেখানে 'আল্লার দান' শিরোনামে ভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। শিরোনামের নিচে এভাবে সন-তারিখ দেওয়া...

ঈদ। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ।
" ।হিজরী। " ।১৩৪৮ বাংলা সন।

সন তারিখের বিষয়টি নানাবিধ কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এই ১৯৪১ সালে আব্বার জীবনে আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে। আব্বা দীক্ষা নেন আধ্যাত্মিকতায়। তারই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার সুস্পষ্ট উদাহরণ হচ্ছে এ সময়ে 'মাসিক মোহাম্মদী' ও 'সওগাতে' প্রকাশিত কোরআন শরীফের বিশেষত আমপারার বিভিন্ন সূরা, সূরা ইয়াসিন ও সূরা আর-রহমান এর কাব্যনুবাদ।

'আল্লার দান' শিরোনামের নিচে লেখা রয়েছে 'সর্বগুণাধার যিনি'। এর পর নবী রাসূল সাহাবীসহ বিভিন্ন বুজুর্গ ব্যক্তির নামের পাশাপাশি তাদের মৌলিক গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে। বিষয়টি আকর্ষণীয় বিধায় এখানে উদ্ধৃত হলো :

১. রসূলুল্লাহ (সা.)-আল্লার প্রতি প্রেম
২. হযরত খিজির আ.–জ্ঞান
৩. হযরত আলী–চিত্তের দৃঢ়তা, সাধনা একাগ্র তপস্যা-
৪. হযরত মুছা আ.–প্রেমের বিনীত আকুলতা (আল্লাহর)
৫. হজরত দাউদ আ.–প্রভু বন্দনা সুর
৬. হজরত ইউছুফ আ.–রূপ, সংযম
৭. হজরত নূহ আ.-কষ্টসহিষ্ণুতা
৮. হজরত ইলিয়াস আ.-কর্ম
৯. বড় পীর সাহেব-আদর (আল্লাহর প্রতি)
১০. মায়ের– স্নেহ
১১. ভাইয়েরা– প্রেমবিহ্বল তন্ময়তা
১২. কারবালার শহীদান– ত্যাগ
১৩. রসূলুল্লাহর কাছ থেকে– যেমন রহমত তিনি পেয়েছেন আল্লাহর কাছ থেকে পূর্ণতা
১৪. হজরত ইব্রাহিম আ.-কুফরী ও নাস্তিকতার বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করার শক্তি ও জ্ঞান
১৫. বড় নানা-নীরব ছবর, ঈমান আর সত্যবাদিতা
১৬. হজরত উমর ফারুক–দারাজদিল, মহত্ত্ব আর মানব সেবাব্রত সকলের জন্য বেদনাবোধ, দুঃখানুভূতি, ন্যায়
১৭. বড় ভাই– পৌরুষ
১৮. সমস্ত মুসলমানের কাছে পরিপূর্ণ ভালোবাসা
১৯. আল্লার কাছে–তাঁকে এবং তাঁর সৃষ্টিকে পরিপূর্ণ ভালোবাসব
২০. হজরত আমীর হামজা–বীরত্ব, তেজ, শারীরিক ও মানসিক শক্তি

আর 'মাসিক মোহাম্মদী' শিরোনামের বাঁয়ে-কাঠপেন্সিলে-লেখা রয়েছে:
আল্লার চিরকালের দাস হবো এবং প্রভু আল্লাহ্ তায়ালার-
অনন্ত দয়া, ক্ষমা, শান্তি
রূপ, রস, প্রেম, আনন্দ, শক্তি

জ্ঞান এবং সর্বগুণময়
নিবিড়তম অনন্ত সান্নিধ্য পাবো।

অপরদিকে ডানে-কালিকলমে- 'সকল প্রশংসাই আল্লার' শিরোনামে লেখা :

যিনি নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক।
আমরা একমাত্র তাঁর দাসত্ব করি
এবং তাঁরই শক্তি প্রার্থনা করি।
হে প্রভু আমাদের সেই পথে চালাও
যে পথ তোমার প্রীতিভাজন
দাসদের জন্য নির্দিষ্ট,
সে পথে চালিও না
যে পথ তোমার ক্রোধভাজন অভিশপ্তদের জন্য।

আব্বার আধ্যাত্মিকতা ব্যক্তিতে লীন হয়নি। বরং তা বিশ্বমানবতার বিশাল আয়োজনে সম্পৃক্ত। আর তাই ১৩৫০-এর মন্বন্তর তাঁর মানসে, রচনায় সুদূরপ্রসারী ছায়া ফ্যালে। ব্যক্তি নিগড়ে নয়–জাতীয় চৈতন্যে তাঁর অধিবাস। তবে ফররুখের প্রথম আধ্যাত্মিক কবিতা– খানিক অনুবাদধর্মী– হচ্ছে 'একটি উক্তি'। প্রকাশিত হয় 'সওগাত'-এর আশ্বিন ১৩৪৮ সংখ্যা। এখানে সেই টুকরো কবিতাটি উদ্ধৃত হলো :

[বায়েজীদ বোস্তামীর উক্তি হইতে]
প্রভু বলিলেন, লোকে ভাবে আমি
তাহাদেরি মতো তাহাদেরি একজন
অদৃশ্য লোকে আমার স্বরূপ
উহারা কখনো করে যদি দর্শন,
লভিবে তখনই মৃত্যু চিরন্তন।
আমি অতুলন–
মনে করো এক বিপুল প্রস্রবণ;
আদি নাই যার অন্তহীন সে গভীরতা অগণন।

এক মহান সাধকের উক্তিকে কেন্দ্র করে আব্বার প্রথম এ জাতীয় কবিতা লেখা- আর এক দরবেশকে নিবেদিত দীর্ঘ কবিতার অনুবাদের এক বছর পর আব্বার ইন্তেকাল। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, মওলানা শফিউল্লাহ্ দাদাজী রহ.-কে নিবেদিত 'নজরে আকীদাত' শীর্ষক সদ্য অনূদিত কবিতাটি আব্বা ১৯৭৩-এর সেপ্টেম্বরে বড়ো ভাইয়ার [শান্তিনগরের বাড়িতে] এক মাহফিলে পাঠ করে শোনান। ঘটনাক্রমে সেখানে কবি বেনজীর আহমদ উপস্থিত ছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতে আব্বা সেদিন খুব খুশি হয়েছিলেন। সম্ভবত জীবৎকালে বাসার বাইরে এটাই ছিল আব্বার সর্বশেষ কবিতা পাঠের ঘটনা।

এই প্রসঙ্গে আর একটু না-বললেই নয়। আব্বা ইন্তেকালের বছরখানেক পূর্বে মোজাদ্দেদীয় তরীকা-র সর্বশেষ সবক গ্রহণ করেন। আব্বাকে সবক দেন-'চাচা

পীরসাহেব' হযরত শাহ্ সগীরুদ্দীন। এই পৌরুষদৃপ্ত, স্পষ্টভাষী সুফী সাধক আব্বার ইন্তেকালের পরও পাবনা থেকে ঢাকায় এলে আমাদের বাসায় এসেছেন। আব্বার কবর জেয়ারত করেছেন। তিনি আব্বাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করতেন।

আব্বার কাগজপত্রের মধ্যে তাঁরই লেখা একটি চিঠির সন্ধান পেয়েছি। যত্নে-রাখা চিঠিটি অবশ্য সগীরউদ্দিন সাহেব তার পুত্র মওলানা মোহাম্মদ সাদেককে লেখেন। চিঠিটির উল্টোপৃষ্ঠায় আব্বা লিখেছেন : 'চাচা পীর সাহেব [জনাব হজরত শাহ্ সগীরউদ্দীন সাহেবের] চিঠি'।

পাবনা থেকে ২৬ শে রমজান ৯৩ হিজরীতে [ইংরাজি ১৯৭৩] লেখা পত্রের প্রাসঙ্গিক অংশঃ "প্রিয় মুহম্মদ বাবাজী

...আমার দোওয়া ও ছালাম তথায় সকল মুরীদ মতাকেদগণকে পৌঁছাইবা। খাছ করিয়া ফররুখ আহমদ বাবাজী, ছুফি আলী আহমদ বাবাজী ও ইনসপেক্টর ছাহেবকে পৌঁছাইবা। ঈদের পর একবার তোমাদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতে যাইতে পারি।... [স্বাক্ষর আরবিতে]

হ্যাঁ, শাহ্ সাহেব এসেছিলেন। ইস্কাটনের বাসায় আব্বাকে সর্বশেষ সবক দিয়েছিলেন। আব্বা সবকিছুতেই ছিলেন পূর্ণতার পক্ষপাতী। এক্ষেত্রেও আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর আরজু অপূর্ণ রাখেননি।

এখানে একটি কথা জোর দিয়ে বলবো, এ যাবৎ অপ্রকাশিত এই কবিতাগুচ্ছ একেবারেই খসড়া। শিল্পমূল্য নয়-বিশেষ সময়-পরিধিতে কবির মানস উত্তরণের উদাহরণ হিসেবেই এর গুরুত্ব সমধিক। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় 'মাসিক মোহাম্মদী'র ৬৫০ পৃষ্ঠার মার্জিনে কাঁঠপেন্সিলে লেখা চারটি পঙ্‌ক্তি :

ওগো রঙিন গোলাব রক্ত গোলাব
কোন রঙেতে রাঙা
পাপড়ি সুবাস ভাঙা।

৬৫৫ পৃষ্ঠায় কাঠপেন্সিলে লেখা রয়েছে :

যদি গানের মালা যোগ্য না হয় তাঁর–
তবে তুমি ক্ষমা চেয়ো
যদি– অকুলান হয় বুক ভরা প্রেম ভার
তবে তুমি ক্ষমা চেয়ো–
চেয়ে নিয়ো–
তাঁর, আরো দানসম্ভার, প্রেম ভার
ক্ষমা চেয়ো॥

পত্রিকার ৬৫৯ পৃষ্ঠায় 'টহল' গল্পশেষে লেখা রয়েছে একটি গান। গানের শেষে লেখা রয়েছে : 'কার্তিক ১৩৪৮। ঈদ পর্ব-২।' লেখাটি এখানে উদ্ধৃত হলো :

এই গোলাবের মৌসুমে
ফুল নিলো নাকে।

ওগো ফুটেছে মরা মালঞ্চে
হায়, নিলো না কে।
কে গেলো রিক্ত হাতে অভাগ্য সে
হেরো মালঞ্চ হতে কি গন্ধ আসে
হায় নিলো না কে।

৬৭২ পৃষ্ঠায় আরো চারটি পঙক্তি। সবশেষে কবি-প্রদত্ত তারিখ : 'ঈদ রাতের আগে/১৩৪৮। চারটি পঙক্তি হচ্ছে :

ওগো তুমি ভুল কোরো না ভুল বুঝো না মনে
তিনি দিলেন–পরম দাতা-দেন যে জনে জনে
তাঁরি পায়ে লুটাও। এবার এই সুর এই সংগীতহার-
হৃদয়খানি লুটাও তারি পায়ে, প্রেম ভরা॥

৬৮০ পৃষ্ঠায় লেখা কবিতার ওপর ব্রাকেটে ১ লেখা রয়েছে। পঙক্তি ক'টি হচ্ছে :

এবার ঘুচলো তোমার কাঙালপনা
সবার দ্বারে ঘোরা–
তাঁরি ঘরে ঠাঁই দিলেন, যে
সকল পরান হরা–
ভিক্ষা মাগি নিখিলব্যাপী
শঙ্কাতে মন উঠতো কাঁপি
এবার আমার দুয়ার-পাশে
জাগে নিখিল ধরা।

৬৮৯ পৃষ্ঠায় আরো দু'টি কবিতা-কাঠপেন্সিলে লেখা। রচনাকাল : '২১ শে অক্টোবর, ১৯৪১'-

[এক]

তাঁরি নামে গানের কলি ফোটে
তাঁরি পায়ে নিখিল ধরা ললাটে।
নিদহারা তার নয়ন 'পরে
অঝোর ধারায় করুণা ঝরে
বন্দনা তাঁর, প্রশংসা তাঁর
সবই তাঁহার-ধরার গোঠে।
**[ঈদের আগের রাতে, ১৩৪৮, কার্তিক]**

[দুই]

সে-দিন এলো সুর
প্রথম সুরের বাণী
তাঁরই দেওয়া সুরে আমার

কাঁপল হৃদয়খানি।
বন্দনা তাঁর, জানাই তাঁরি পায়ে
শান্তি গভীর কৃতজ্ঞতা ছায়ে
এবার শুরু, শেষও তাতেই
জানি আমি জানি॥

আব্বার যাপিত জীবন ও চেতনার গভীরে ছিলো সুফী-সাধকদের হিরন্ময়ী অর্জনের দ্যুতি। এ কারণে যে কোনো বৈষয়িক প্রলোভনকে তিনি অনায়াসে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন। সেই সাথে যুক্ত হয়েছে সাম্যবাদী চেতনা-ইনসানিয়াত। তিনি চেয়েছেন মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ ঃ 'মানবতা হোক নির্যাতিতের মাথার তাজ'।

সেই প্রাথমিক পর্বের কাব্যানুবাদ কতখানি সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সেটি উপলব্ধির জন্য অন্তত একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করছি। বলা প্রয়োজন– এই অনুবাদকালে ফররুখ কলেজ-ছাত্র। সালটা ১৯৪১। এরও বহু বছর পর মনীষী কাজী আবদুল ওদুদ তার স্নেহভাজন 'মাহে নও' সম্পাদক কবি আবদুল কাদিরকে মোসাদ্দাস-ই-হালীর তরজমা প্রসঙ্গে বিষয়টির অবতারণা করেন। সেকালে কবি গোলাম মোস্তফা মোসাদ্দাস-ই-হালীর কাব্যানুবাদ করেন। গোল বাধে সেখানেই। আবদুল ওদুদের সেই তরজমা পছন্দ নয়। ১৩.০৯.১৯৫৭ তারিখে কাদির সাহেবকে পত্রাঘাত করে লেখেন : 'তুমি গোলাম মোস্তফার অনুবাদের সুখ্যাতি করতে পারলে কেমন করে?' ওতে ত মূলের সারল্য আর গাম্ভীর্যের অপূর্ব সম্মিলন বরবাদ হয়ে গেছে।' এই প্রসঙ্গের জের ধরে একই পথে কাজী আবদুল তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে লিখেছেন : 'ফররুখ আহমদ আজকাল কি করছেন। ভদ্রলোক কোরআনের ভাল অনুবাদ করছিলেন। ওর ভাষা ও ছন্দ দুয়েরই উপরে ভাল দখল, হালীর অনুবাদে-পদ্যানুবাদে লেগে থাকলে ভাল করতেন।' [(আবুল আহসান চৌধুরী) সংকলিত ও সম্পাদিত কাজী আবদুল ওদুদের পত্রাবলী (১৯৯৯) পৃ. ১৫৭] ◈

---

লেখক : কবিপুত্র, কবি ও সাংবাদিক।
**[ফররুখ একাডেমী পত্রিকার ২৬তম সংকলন, জুন-২০১৪ সংখ্যায় মুদ্রিত]**

# ফররুখ আহমদের ইসলামী গান-গজল

## মুকুল চৌধুরী

ইসলামী রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদের (১৯১৮-১৯৭৪) বহুমাত্রিকতা সুবিদিত। কবিতা, কাব্য গল্প, প্রবন্ধ ছাড়াও তিনি বিপুল সংখ্যক গানও লিখেছেন। তাঁর রচনাবলীর বৃহদাংশ এখনও অগ্রন্থিত। (বাংলা একাডেমী থেকে ২ খণ্ড রচনাবলী প্রকাশের পর অজ্ঞাত কারণে অপর খণ্ডগুলো এখনও আলোর মুখ দেখিনি।) এ কারণে তাঁর সকল গানও আমাদের সামনে আসেনি। এখনও তা লোকচক্ষুর অন্ত রালেই রয়ে গেছে। তবে আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত 'ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা'র (প্রকাশক : ফররুখ স্মৃতি তহবিল, চট্টগ্রাম: প্রকাশকাল: ১০ জুন ১৯৭৫) পরিশিষ্টে মুদ্রিত তাঁর ইসলামী গানের তালিকা দেখে সর্বপ্রথম তাঁর গানের ভাণ্ডার সম্পর্কে উৎসাহী সকলের ঔৎসুক্য জাগে। (অবশ্য এর আগেই কবি সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত 'নব দিগন্তের গান' এবং নাট্যকার আসকার ইবনে শাইখ সম্পাদিত 'নব জীবনের গান' সংকলনে ফররুখ আহমদের অনেক কাব্যগীতি অন্তর্ভুক্ত হয়।) যাই হোক, এ ঔৎসুক্য থেকেই ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর একমাত্র ও একক গানের বই 'মাহফিল'। প্রকাশ করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর প্রকাশনা বিভাগ। দীর্ঘদিন পর ফেব্রুয়ারি ২০০৪-এ এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

বর্তমানে গানের জগতে ইসলামী গান একটি পৃথক মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্যে ভাস্কর। ইসলামের প্রতি সাধারণ মানুষের ঝোঁক-প্রবণতা বৃদ্ধির কারণে ইসলামী গানের প্রতিও তাদের আগ্রহ ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের পর এ ধারায় আমাদের অর্জন খুব একটা উল্লেখ করার মতো নয়। তাই এক্ষেত্রে কবি ফররুখ আহমদের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশ্য ফররুখ আহমদ ইসলামী গান-গজল ছাড়াও অসংখ্য দেশাত্মবোধক ও প্রেমের গানও রচনা করেছেন। তাঁর রচিত ইসলামী গান এ বিশেষ স্বতন্ত্র ধারাকে সমৃদ্ধ করেছে। এখনও তাঁর অনেক গান সংগৃহীত হয়নি বলে আমরা জানি। বেতার-এর প্রয়োজনে রচিত তাঁর অনেক গানই কণ্ঠশিল্পীদের সংগ্রহে আছে বলে জানা যায়। তাই তাঁর 'গীতি সমগ্র' প্রকাশিত হলে এ ধারাটি আরও সমৃদ্ধি অর্জন করবে এবং এক্ষেত্রে ফররুখ আহমদের অবদান সম্পর্কেও আমরা সম্যক অবগত হতে পারবো। যে সকল কণ্ঠশিল্পী কবির গানে সুরারোপ করেছেন ও কণ্ঠ দিয়েছেন, এঁরা অনেকেই লোকান্তরিত। বাকীরাও বয়োবৃদ্ধ। তাই তাঁরা জীবিত ও কর্মক্ষম থাকা অবস্থায় এসব গান সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। এ বিষয়ে কবি পরিবার, বিশেষভাবে ইসলামী গানের সংগঠনগুলো এগিয়ে আসতে পারে। তারা প্রস্তাবিত 'গীতি সমগ্র' মুদ্রণের উদ্যোগ নিলে একটি বড় জাতীয় দায়িত্ব সম্পন্ন হবে। আলোচ্য 'মাহফিল' গ্রন্থটি দু'টি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে পাঁচটি বিভাগ। বিভাগগুলো হচ্ছে : হামদ, নাত, নামাজ, জুমা ও মুহার্রাম। 'হামদ' বিভাগে ৩১টি হামদ, 'নাত' অংশে ১২টি নাত এবং 'নামাজ' অংশে ৫টি, 'জুমা'

অংশে ৪টি ও 'মুহার্রাম' অংশে ৬টি গজল মুদ্রিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ভাগে রবিউল আউয়াল, ঈদে মিলাদুন্নবী বিষয়ক গজলসহ অন্যান্য ৩৩টি ইসলামী গান এবং দ্বিতীয় ভাগে ৩৫টি দোওয়া ও মুনাজাত স্থান পেয়েছে। গ্রন্থে মুদ্রিত গানের সর্বমোট সংখ্যা ১২৬টি।

এসব গানের বাণীতে ফররুখ আহমদের আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি প্রেম এবং ইসলামের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগ ও বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটেছে। একজন ঈর্ষনীয় কবি কবিসত্তার শক্তিমত্তারও বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। অন্যান্য রচনাবলীর মতো গানের ক্ষেত্রেও তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। গ্রন্থে মুদ্রিত 'মহাপরিচালকের কথা'য় সাবেক সচিব, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক, বিশিষ্ট লেখক এ জেড এম শামসুল আলম যথার্থই বলেছেন ঃ "এসব সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর প্রেমের যে আন্তরিকতাময় প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, তা নিখাদ ও হৃদয়ের গভীর উপলব্ধিজাত। ঈমানী আলোকে হৃদয় পরিপূর্ণভাবে উদ্ভাসিত না হলে কারো পক্ষে এ ধরনের সঙ্গীত রচনা করা সম্ভব নয়। ফররুখ আহমদ ব্যক্তি-জীবনে ও আচার-আচরণে ছিলেন ইসলামী জীবনাদর্শের একনিষ্ঠ অনুসারী। সে কারণেই তাঁর পক্ষে এত নিবিড় অনুভূতিজাত ইসলামী সঙ্গীত রচনা হওয়া সম্ভব হয়েছে।" **(মাহফিল, পৃ. ৩)**

'মাহফিল' গ্রন্থে মুদ্রিত ১২৬টি ইসলামী গানের শুরুতে যে হামদটি স্থান পেয়েছে তা সূরা ফাতেহার ভাবানুবাদঃ

"সকল তারিফ তোমারি আল্লাহ-রাব্বুল আ'লামীন
তুমি রহমান, রহীম তোমার রহমত শেষহীন।
কুল আলমের পালক হে প্রভু! তুমি দাতা, দয়াময়
রোজ কিয়ামতে বিচার দিনের মালিক অসংশয়,
তব অধিকার হাশরের মাঠঃ- শেষ বিচারের দিন।
করি বন্দেগী তোমারি হে রব! করি তব ইবাদত
তোমারি সমীপে চাহি মোরা শুধু মদদ ও হিম্মৎ
পাঠাও মদদ মোদের জীবনে হে প্রভু রজনী দিন।
চালাও মোদের তাদের সুপথে নেযামত পেল যারা,
চির সত্যের সুদৃঢ় পথে সফল হয়েছে তারা,
তোমার রাসূলঃ নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহীন।
চালায়ো না তুমি মোদেরে হে প্রভু তাহাদের ভুল পথে,
ভ্রান্তিতে লীন যারা পেল শুধু ব্যর্থতা কিস্‌মতে,
যাদের উপরে আছে অভিশাপ রাত্রি ছায়া মলিন।
**(হামদঃ এক- পৃ. ৯)।**

গ্রন্থভুক্ত শেষ গানটি একটি মোনাজাত, শিরোনামঃ 'আরজ শোন খোদা'-

"আরজ শোন খোদা, আমায় খাতেমা বিল খায়ের করো।
শেষ হলে দিন এই দুনিয়ার;-খাতেমা বিল খায়ের করো।

সংশয়েরি ঘূর্ণি হায় কম্‌জোর আজ ঈমান মোর,

দাও ঈমানে পূর্ণতা আর; খাতেমা বিল খায়ের করো।

লোভ লালসায় বদ্ধ জীবন অন্ধ ভয়ের জিন্দানে,
ভঙো আগল ভয় ভীরুতায়;-খাতেমা বিল খায়ের করো।

মুনাফিকের মৃত্যু যেন না আসে মোর তকদিরে,
দাও গো সুযোগ শহীদ হওয়ার,- খাতেমা বিল খায়ের করো।

পূর্ণ করো হৃদয় আমার নবীর প্রেমের খোশবুতে
তৌফিক দাও তোমায় চেনার; খাতেমা বিল খায়ের করো।
এই দুনিয়ার সর্দারী দাও মুহাম্মদের উম্মতে,
আরজু আমার পুরো এবার–খাতেমা বিল খায়ের করো।
**(আরজ শোন খোদা। পৃ.১১৫)।**

একটি বিষয় এখানে লক্ষণীয়। বাংলা ভাষায় মধ্যযুগ থেকে বিপুল সংখ্যক নাতে রাসূল (সা) রচিত হয়েছে। এসব নাতে ভক্তির আতিশয্যে রাসূলুল্লাহর (সা)-এর উপর অবতারত্ব আরোপের একটি ক্ষীণ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। সেই সাথে 'মীম' শব্দের অপব্যাখ্যাও হয়েছে যথেচ্ছভাবে। এ বিষয়ে কবি ফররুখ আহমদের সচেতনা উল্লেখ না করে পারা যায় না। গ্রন্থের ৩৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত তিন সংখ্যক 'নাত'-এর দুটি পঙক্তি হচ্ছে: "ইঞ্জিলে দেন ঈসা নবী তোমার আসার সুসংবাদ / আহমদের রয় গোপন কি; আর রাহমাতুল্লিল আলামীন।"–এখানে কবি 'আহমদ' শব্দটিতে একটি টীকা সংযোজন করে লিখেছেন, 'আহমদ শব্দে 'মীম' হরফের অপব্যাখ্যা পাওয়া যায় কোন কোন ক্ষেত্রে। শরীয়তপন্থী সাধকদের মতে 'মীমে'র অর্থে মাখলুকাত বা সৃষ্টিসমূহের প্রতি ঈঙ্গিত। রাসূলে করীম (সা.) সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এ কথাই এতে প্রমাণিত হয়। কবির এ টীকা সংযোজন থেকে প্রতীয়মান হয়, ফররুখ আহমদ তাঁর হামদ, নাত, গজল ও ইসলামী গান রচনায় ইসলামী শরীয়তের শুদ্ধতার প্রতি অত্যন্ত মুখলেছ ও মনোযোগী ছিলেন।

যাই হোক, 'মাহফিল' গ্রন্থটি দীর্ঘদিন পর পুনর্মুদ্রিত হওয়ায় ফররুখ ভক্তরা প্রভূত উপকৃত হয়েছেন। বিশেষত যারা ইসলামী গানের জগতে কাজ করেছেন, তারা কবির অনেকগুলো গান (১২৬টি) একত্রে পেয়ে গেলেন। সেই সাথে কবি ফররুখ আহমদের বহুমাত্রিকতার আরেকটি দিকও উন্মোচিত হল।

সবশেষে কবির রচিত একটি মুনাজাতের নিজের চারটি পঙক্তি উদ্ধৃত করে মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি

"রোজ হাশরে তোমার নবী মুহাম্মদের সম্মুখে
দিয়ো না রব লজ্জা আবার;- তওবা আমার কবুল করো।
জীবনব্যাপী যে পাপ আমার তোমার নবীর উসিলায়
মাফ করে সব দাও গো এবার;– তওবা আমার কবুল করো।
**(দ্বার খুলে রব দাও গো তোমার। পৃ. ১৩৩, ১১৪)।** ☐

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা বাইশতম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি-২০১২]

# ফররুখ ঃ সাহিত্যের অনুষঙ্গে

## মোশাররফ হোসেন খান

কবি ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) এক অসাধারণ আত্মপ্রত্যয়দীপ্ত সাহসী পুরুষ। আদর্শের প্রতি তাঁর যেমন ছিলো সুদৃঢ় অঙ্গীকার, যেমন ছিল ঐতিহ্যের প্রতি দায়বদ্ধতা, তেমনি তিনি কবিতার প্রতি ছিলেন সম্পূর্ণ নিবেদিত, বিশ্বস্ত এবং আন্ত রিক। ফররুখে যেমন নেই চালাকি, কৃত্রিমতা কিংবা স্খলন, তেমনি তাঁর উচ্চারণে নেই কোনো দ্বিধা বা সংশয়। তাঁর কবিতায় স্বপ্ন আছে, দূর যাত্রার ব্যাকুলতা আছে, রোমান্টিকতা আছে। কিন্তু তার পাশাপাশি সমাজ, দেশ, বৃহৎ অর্থে মানুষও আছে। রোমান্টিকতার সাথে বাস্তবতা–ফররুখের কবিতায় এটাও একটি অনিবার্য উপস্থিতি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো যে, কবি বলেন–

ধূলির তুফান তুলি ওরা চলে রাত্রিদিন মরুর হাওয়ায়
ক্রমাগত ছায়া ফেলে ঘন জলপাই বনে, খেজুর শাখায়,
কোথায় চলেছে তারা কোন্ দূর ওয়েসিসে কিংবা সাহারায়;
জানিনা কোথায়।

(কাফেলা)

'আরিচা-ঘাটে' আবার তিনিই উচ্চারণ করেন সম্পূর্ণ বিপরীত, সম্পূর্ণ ভিন্ন সূরে–

বর্ষার মেঘের নীচে ছায়াচ্ছন্ন আরিচায় এসে
মনে হলো পারঘাট যেন এক নিষ্প্রাণ কবর
(জীবনের সব চিহ্ন মুছে গেছে এখানে নিঃশেষে)।
প্রতীক্ষার ক্ষণ তাই মনে হয় তিক্ত, ক্লান্তিকর,
পারে না জাগাতে আর কারো বুকে প্রাণের স্পন্দন,
বিমর্ষ প্রকৃতি, মেঘ গতিহীন, সময় মন্থর।

কবিতায় ফররুখ আহমদ ছিলেন বহুমাত্রিক এবং বহু বর্ণিল। একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ফররুখের কবিতায় যে ধরণের বাঁক আছে সে ধরণের বাঁক তাঁর সমকালীন আর কোনো কবির কবিতায় নেই। যে কবি লিখেছেন –

জিহাদের মাঝে জানি শুধু আছে যিন্দিগানি,
চলো সেই পথে মুক্ত প্রাণের হে সন্ধানী!
পাড়ি দাও স্রোত কঠিন প্রয়াসে অকুতোভয়;
এই নিশীথের তীরে হবে ফের সূর্যোদয়।

(নতুন সফর)

তিনিই আবার ব্যথাভরা কণ্ঠে গাইছেন 'বিরান সড়কের গান'–

এখানে রয়েছে জমা লোভের লোলুপ হাতছানি,
এখানে রয়েছে জমা ক্ষুধাতুর শিশুর গোঙানি।
এখানে রয়েছে জমা মানুষের লক্ষ কাতরানি ...
এসব পাথর বুজে মাঝরাতে জেগে কা'রা
করে কানাকানি ...

কিংবা সেই বিখ্যাত কবিতা 'সাত সাগরের মাঝি'র কবিই কি আবার 'লাশ' লেখেন নি? লিখেছেন বটে। লিখেছেন প্রতিবাদী কবিতাও। যেমন –

জীবনের এ ব্যর্থতা (জানি তুমি) পারো মুছে দিতে
পিশাচের জয়ধ্বনি নিমেষে আমারে দিতে পারো
আকাশ জ্বালাতে পারো প্রলয়ের শিক্ষা দিয়ে তুমি
পৃথিবী গড়িতে পারো মরণের উন্মত্ত পাথরে!
তবু কেন সয়ে যাও নিয়মের এই ব্যভিচার?
কতকাল আর সয়ে যাবে?
হে আত্মবিস্মৃত সূর্য! সংগোপনে রবে কত কাল?

**(হে আত্মবিস্মৃত সূর্য)**

কিন্তু এর পরও ফররুখের বিস্তৃতি আছে। আছে ব্যাপ্তি ও ব্যাপকতা। যেমন তাঁর দিলরুবার (প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪) কথাই ধরা যাক। দিলরুবা প্রকাশের আগে অনেকের কাছে ফররুখ আহমদের একাংশ প্রায় অজ্ঞাতই রয়ে গিয়েছিল। সে বিষয়টি হলো – প্রেম। আমরা জানি – প্রেম হলো কবিতার একটি অনিবার্য অনুষঙ্গ। প্রেম অর্থ কোন কিছুর প্রতি হৃদয়ের প্রবল আকর্ষণ। সেটা শারীরিক হতে পারে, অশরীরী বা আধ্যাত্মিক হতে পারে। এছাড়া, প্রেম একান্ত প্রিয়জন যেমন– ভালবাসার মানুষ, প্রেমিকা, স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব হতে পারে, আবার সাধারণভাবে মানবিক প্রেম, প্রকৃতি প্রেম, আল্লাহ্ প্রেম বা অন্য যে কোন কিছুর প্রতি হৃদয়ের গভীর আকর্ষণকে প্রেম বলা যায়। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, ফররুখ আহমদের 'দিলরুবা' এ সকল প্রেমের সমষ্টিতে এক অমরগাঁথায় রূপ নিয়েছে। দু'টি খণ্ডচিত্র এখানে তুলে ধরছি–

(ক) সৃষ্টি-সম্ভাবনা-দীপ্ত সে নিশীথে প্রোজ্জ্বল উৎসাহে
প্রেম এসেছিল কাছে, শতাব্দীর যে বন্ধ্যা মৃত্তিকা
জ্বলিয়াছে এতকাল তৃষিত মনের অন্তর্দাহে–
সে-ও চেয়েছিল তার মৃত স্বপ্নে তারকার শিখা;

আ-দিগন্ত জীবনের স্পর্শলুব্ধ সুপ্ত নীহারিকা
নিজেরে বিলায়ে দিতে চেয়েছিল উত্তাল প্রবাহে
(দিলরুবা ঃ এক)

(খ) কালবৈশাখীর দেশে চলো তবে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে
বাসা বাঁধি। অনাবাদী সন্দ্বীপের অথবা পদ্মার
কোনো এক বালুচরে – বৈশাখের ঝড়ে বারবার
কৃষাণ কুটিরে যেথা হানা দিয়ে ক্ষুব্ধ পরাজয়ে
ফিরে যায় হতাশ্বাস, মৃত্যু ফেরে বিমূঢ় বিস্ময়ে
যেখানে সম্পূর্ণ দেখে প্রেমের তরঙ্গ শতধার
সেখানে মাটির বুকে বেঁধে নেব তোমার আমার
বহু আকাঙ্ক্ষিত নীড়–পূর্ণতার পথে অসংশয়ে।
**(দিলরুবা : পাঁচ)**

মাসিক 'নতুন কলম' জুন ১৯৯৮ সংখ্যায় ফররুখের একটি অপ্রকাশিত কবিতা 'পরাজিত দিন' প্রকাশিত হয়েছে। সার্বিক অর্থে কবিতাটি অসাধারণ। কবির 'লাশ' ও 'ডাহুক' পর্বে রচিত 'পরাজিত দিন' কবিতাতে ১৩৫০-এর সেই মন্বন্তরের হাহাকার এবং রোমান্টিকতার আবেশ একাকার হয়ে আছে। সম্পূর্ণ কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করলে আমরা বুঝতে পারবো কবির মানসপরিক্রমা :

যে-দিন স্বপ্নের মতো এসেছিল চঞ্চল হাওয়ায়/রেখে গেছে হায়
পাথরের ভার/ঝরানো মহুয়া গন্ধে কংকালের করোটি মিনার!
আজ তার/দুঃসহ সে বোঝা
ভগ্ন শারাবের জামে রক্তসুরা খোঁজা/যদিও,
সেই পরাজিত দিন একদা যে সবচেয়ে প্রিয়,/ ভুলের পিছল পথে মৃত্যুবর্ণ ছড়ায়ে পাখার
হ'ল আজ পাথরের ভার।/যে ভুল নিয়েছে টেনে
নিয়েছে যে মৃত্যু –পরাজয়/পাতাঝরা-বনে আজি তারি লাগি 'আহত-বিস্ময়
তিক্ততায় ভরা - ।/নগ্ন বনানীর শাখা ধরিয়াছে ব্যর্থতার অপূর্ণ পশরা।
আজ তার শাখায় শাখায়/বিষাক্ত গহ্বর
আজ তার ঝরানো পাতায়/অসংখ্য কবর,
আজ তার জ্বরার শিথানে/পরাজিত স্বর
বহে অন্ধকার/পাথরের ভার।
সে জানে পউষ শেষে/আছে তার নতুন ফাল্গুন

নবীন শাখার তীর/নতুন যাত্রীর।
তবু যে ফুলের তৃণ যে আগুন/হেলায় করেছে একাকার
শেষ কোথা তার?/যদিও আসিছে দিন
যদিও পথের বাধা ছিঁড়িছে সংগিন/তবু সেই পশ্চাতের জ্বালা
বিষাইছে আকাশের ডালা,/মনের কিনার
পরাজিত দিনের স্মৃতিতে/দুঃসহ সে পাথরের ভার

**(পরাজিত দিন ॥ নতুন কলম : জুন ১৯৯৮)**

এভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ফররুখ আহমদ বাংলা কবিতায় কী বিপুল-বিস্ময়করভাবে উপস্থিত হয়েছেন। কত বিচিত্র তাঁর পরিভ্রমণ। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর হলো, প্রতিটি বাঁকেই রয়ে গেছে ফররুখ আহমদের সেই একক কণ্ঠস্বর, যে কণ্ঠস্বর সহস্র ভিড়েও সম্পূর্ণ একা-পৃথক। শুধু তাঁর অবদানের বিপুলতায় নয়, বহু বৈচিত্র্য, শব্দ ব্যবহার ও স্বতন্ত্র শিল্প-নৈপুণ্যের কারণেও ফররুখ আহমদ বাংলা কবিতায় এক অনিবার্য প্রবাদ পুরুষ। আমাদের আদর্শে, ঐতিহ্যে, আমাদের জাগরণে কিংবা স্বপ্ন-সম্ভাবনায় ও সংকটে কোথায় নেই ফররুখ আহমদ? তিনি একাত্ম হয়ে আছেন আমাদের মন-মানস, চিন্তা-কল্পনা, আশা-অভীপ্সা ও জীবনের কর্মচঞ্চলতায়। ফররুখ আহমদ তাই যেমন প্রাসঙ্গিক, তেমনি একান্ত অপরিহার্য।

মূলত ফররুখ আহমদ আজ ও আগামী দিনের কবি। কাল এবং কালান্তরের কবি। বাংলা সাহিত্যের এক অপরিহার্য দীপ্তিমান কবি প্রতিভা। ◈

---

**[ফররুখ একাডেমী পত্রিকার ২৬তম সংকলন, জুন-২০১৪ সংখ্যায় মুদ্রিত**

# ফররুখ আহমদের কবিতা : সমকালীন সমাজ ও জীবন-চেতনা

ডক্টর ফজলুল হক সৈকত

ফররুখ আহমদ (১৯১৮-৭৪) ইসলামী পুনরুজ্জীবনের কবি হিসাবে বিশেষভাবে খ্যাত। সমকালীন মুসলিম জনতার ধর্মাচরণের শিথিলতা আর ইসলামের অবমূল্যায়ন ও বিভ্রান্তির ব্যাপক সংকটের সময় তিনি বাংলা কবিতায় আনলেন নবতর প্রবণতা– আবেদনময় আহ্বান। তবে একথা এখন আর মানতে বাধা নেই যে, ইসলামের জন্য তাঁর চেতনা বিলোড়িত হলেও এদেশের মানুষের জাতীয়তাবোধ, সমাজ-চিন্তা এবং জীবন-সংকট তাঁর কাব্য-ভাবনার বিরাট পরিসর জুড়ে স্থিত। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, স্বমহিমায় প্রোজ্জ্বল ফররুখ আহমদের কাব্য-চিন্তার এবং প্রকাশ-প্রক্রিয়া ও পরিপ্রেক্ষিত বিষয়ে যথার্থ মূল্যায়ন আজও প্রায় উপেক্ষিত। মানবতাবোধ আর জীবন-যন্ত্রণার সঙ্গে যে ফররুখ একাত্ম, তাঁকে আমরা খণ্ডিত-মূল্যায়নে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি 'ইসলামী পুনর্জাগরণের কবি' পরিচিতি-ব্যাপকতার অন্তরালে। চল্লিশের দশকের বাংলা কবিতার এ প্রধান কবি সমকালীন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জোয়ার থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন নি। সময়ের আঘাতের চিহ্ন, যন্ত্রণার রক্তের দাগ, অস্থিরতার প্রচণ্ডতা তাঁর কবিতাকে স্পর্শ করেছে। কাজেই মুসলমানদের প্রাতিস্বিক-বলয় ব্যাখ্যায় আন্তরিক থাকলেও তিনি মূলত মানুষের কবি– সকলের কবি। কবিতায় তাঁর ব্যক্তিতার যে প্রকাশ প্রচেষ্টা, জনতার হৃদয়ের পুঞ্জীভূত যে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ, তা এখন আর অপ্রকাশ নয়। ইসলামী পুনর্জাগরণের কবি হিসাবে চিহ্নিত করতে গিয়ে সমকালীন সংকটের ভাষ্যকার ফররুখকে আমরা চিনতে ভুল করি। আর তাঁর প্রবল প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরটিও তাই আমাদের বোধগম্যতার আড়ালেই পড়ে থাকে দারুণ অবহেলায়। ফররুখ আহমদ একটি বিশেষ আদর্শিক চিন্তার ধারক হলেও কবিতার বিচারে তিনি স্বাদেশিক এবং আন্তর্জাতিক মননের অধিকারী।

বিশ শতকের তিরিশের দশকের শেষপ্রান্তে আবির্ভূত কবি ফররুখ কবিতা-চর্চার প্রথম দিকে পাকিস্তান আন্দোলন এবং সমাজতান্ত্রিক চেতনার দ্বারা তাড়িত হয়েছিলেন। সমাজ ও সভ্যতা সম্পর্কে সে সময় তিনি তীক্ষ্ণ বক্তব্যও প্রকাশ করেছেন। ভাবালুতা তাড়িত উচ্ছ্বাস নয়, সেদিন তাঁর কবিতায় ছিল স্বকীয় চিন্তা-বস্তুর যথার্থতা। প্রতিবাদী, মানবতাবাদী কবি ফররুখকে আমরা পাই যন্ত্রণা আর ক্ষোভ প্রকাশক কবিতায়। যেমন :

> "হে জড় সভ্যতা !
> মৃত-সভ্যতার দাস স্ফীতমেদ শোষক সমাজ !
> মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ;
> তারপর আসিলে সময়
> বিশ্বময়

তোমার শৃংখলগত মাংসপিণ্ডে পদাঘাত হানি
নিয়ে যাব জাহান্নাম দ্বারপ্রান্তে টানি;
আজ এই উৎপীড়িত মৃত্যু-দীর্ণ নিখিলের অভিশাপ বওঃ
ধ্বংস হও
তুমি ধ্বংস হও॥”
**(লাশ : সাত সাগরের মাঝি)**

ফররুখের অশান্ত-অতৃপ্ত কবি-আত্মা উপলব্ধি করেছে- 'শতাব্দী মিশেছে ফের সময়ের ঘন অন্ধকারে।' শিশিরের কান্নায় তিনি প্রাণবন্ত পাখা মেলার নতুন আশার উদ্বোধন দেখতে পেয়েছেন যেন। চারিদিকে শুধু ম্লান মৃত্যুর গভীর হাতছানি। রাত্রি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে মহাসংকটের প্রতীকে। সবুজ পাতায় প্রাণ শুকোনোর অবসরে তিনি সাবধানে দেখে নেন জীবনের জটিলতা। ক্লান্তির অথৈ তরঙ্গ তাঁর কবিতা-ভাবনায় পুঞ্জিত আক্রোশে আঘাত হানে। রিক্ততা আর নিশ্চলতাই যেন জীবনের ধর্ম। 'দূরচারী মুসাফির কাফেলার ঘন্টার ধ্বনিতে' শুভ্রতার আহ্বানে বিভোর ফররুখের কবি-ভাবনায় তাই লক্ষ্য করি :

“বৃষ্টি এল... বহু প্রতীক্ষিত বৃষ্টি ! – পদ্মা মেঘনার
দু'পাশে আবাদী গ্রামে, বৃষ্টি এল পুবের হাওয়ায়;
বিদ্যুৎ-রূপসী পরী মেঘে মেঘে হয়েছে হাওয়ার।”
**(বৃষ্টি : মুহূর্তের কবিতা)**

ফররুখ আহমদ জীবনের কবি। জীবনকে দেখেছেন তিনি যাপিত জীবনের কোন এক নিটোল প্রহরের আঙিনায় দাঁড়িয়ে। অশান্ত পৃথিবীর দুর্বোধ্যতা তাঁর সামনে ছিল। আর ছিল শান্তিহারা মানুষের ব্যাধিগ্রস্ত মনের মাতম। কোন সান্ত্বনা-বাণী কিংবা জৌলুসের বাহারি আয়োজনও এ দুঃসহ যন্ত্রণা লাঘবে ব্যর্থ। মানুষে মানুষে সংশয়-সন্দেহ, জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্ব আর ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অবিশ্বাসের বহর পৃথিবীকে করেছে রক্তাক্ত- এ ছবি ফররুখ অবলোকন করেছেন তাঁর কবি-জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে। তাই তিনি খুঁজেছেন এর অবসান কিংবা এর থেকে পরিত্রাণ। মানবতার বিপর্যস্ত স্বরূপতা, বীভৎসতা আর 'সর্বগ্রাসী সঞ্চয়ের লোভ' ও 'বিলাস বাসনা' তিনি অন্বেষণ করেছেন নাগরিকতার মেকি মোড়কে। দৃষ্টান্ত :

“ওখানে শহর যেন লাস্যময়ী তরুণ গণিকা
ভাগ্যবান অতিথিকে প্রতিক্ষণে জানায় আহ্বান
অর্ধাবৃত তনু হতে ওঠে যার যৌবনের গান;
দিনে সে উদ্ধত আর সন্ধ্যায় উদগ্র সাহসিকা !
অজস্র ভোগের রাজ্যে জ্বলে তার বাসনার শিখা
জোগায় ধমনী প্রান্তে উল্লাসের প্রমত্ত তুফান !
নির্লজ্জ, লালসাতুর জাগে তার অপাঙ্গে অম্লান
সুতীব্র সম্ভোগ-লিপ্সা; প্রতি অঙ্গে যৌবন লিপিকা।”

(একটি আধুনিক শহর : ওই)

বহুভোগ্যা নারীর অস্তিত্ব সংকটের সাথে সহজেই তুলনীয় বহু শাসন-শোষণের দৌরাত্ম্যে বিপর্যস্ত আমাদের এ মাতৃভূমির মর্যাদা-সম্ভ্রম। বহু জাতি, ধর্মের নানা পেশা-শ্রেণীর মানুষের বসতিস্থল ভারত উপমহাদেশের ধর্মভিত্তিক বিভাজন চেয়েছিলেন ফররুখ। পাকিস্তানের স্বাধীনতাও ছিল তাঁর কাম্য। উপমহাদেশের সব মুসলমানের হৃদয়ের পরম প্রত্যাশা ছিল এটাই। ফররুখ তাঁর কবিতার ভাষায় সে প্রত্যাশারই সুদীপ্ত প্রকাশ ঘটিয়েছেন। বিদেশী শাসকের, বিধর্মীর দাপটের জাল থেকে মুক্তিকামী মানুষের আর্তনাদকে তিনি কবিতায় স্থান দিলেন পরম মমতায়। যেমন :

"আনো সাম্যের নতুন গান / আনো মানুষের নতুন প্রাণ / আনো উদ্দাম ঝঞ্ঝার গতি।" (ওড়াও ঝান্ডা : আজাদ করো পাকিস্তান)

অত্যাচারী শাসক-শোষকের হাত থেকে মানবতার মুক্তিকামী কবি ফররুখ বাতাসে বাতাসে ভাসমান ব্যর্থতার আহাজারি থেকে আদম সন্তানদের, উৎপীড়িতের ঘৃণাঘন জীবনের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। বর্ণচোরা এ সভ্যতার গায়ে তিনি দেখেছেন ঠগপ্রবণতার স্পষ্ট দাগ। আবার ইউরোপের প্রগতির আড়ালে ফাঁপা-সভ্যতার স্বপ্নস্বর্গ দেখতেও তিনি ভুল করেননি। 'তনুময় নগ্নতার সে কী সমারোহ।' স্বাধীনতার নামে ব্যভিচার-স্বেচ্ছাচারকে ফররুখ কখনোই মান্য ভাবতে পারেন নি। যৌবনের পাশবিকতা আর ন্যুডিজম থেকে তিনি মুক্তি কামনা করেছেন পিছিয়ে-পড়া স্বদেশবাসীর, স্বজাতির। সভ্যতা নামক হতাশা বায়ুর প্রতিকূলতা ফররুখ নির্দেশ করেছেন হতদরিদ্র, খেটে-খাওয়া অমানুষ বলে বিবেচিত মানুষের জবানীতে। সভ্যতার রক্তচোষক রূপ অগণন বিভ্রান্ত প্রাণে জাগায় স্বপ্নমূর্তি আর জন্ম নিতে থাকে সংকোচ ও শরম ভঙ্গের উদগ্র বাসনা। সলাজ সত্য প্রকাশে যেন উদগ্রীব প্রসাধন-সমাজের অবহেলিত মানবতা। যেমন :

"ঘেয়ো কুকুরের ডাকে ক্রমাগত ঘুমের ব্যাঘাত,
থেকে থেকে উঠে আসে পথচারী ভিখারীর স্বর,
মনে হয় ডাস্টবিনে কাড়াকাড়ি চলে অতঃপর !
বিষম বিপদ এ যে ! যতবার পণ্যস্ত্রীর হাত
নিশ্চিত বিলাসে টানে ততবারই বিরক্তি-সংঘাত।
শুনি বৃদ্ধ ভৃত্য মুখে এবার কঠিন মন্বন্তর
কী আমার আসে যায় যদি ডোবে পল্লী ও শহর ?

(অভিজাত-তন্দ্রা : অনস্বার)

ফররুখ বুঝেছেন 'কু-প্রবৃত্তি অভিমুখে আমাদের শ্রান্তিহীন গতি।' অথচ সত্য প্রকাশে কী দারুণ অপারগতা। মানবতার কারবারী আর গণতন্ত্র ব্যবসায়ী সম্প্রদায় কী সহজেই জনসেবা ব্রত কাঁধে নিয়ে কারুণ্য কুড়ানোর প্রতিযোগিতায় নেমেছে। 'ধরা না-পড়ার বিদ্যায়' পারদর্শী এসব তথাকথিত মানবতা-কর্মী ভাতকে প্রসাদ যেনে কিংবা প্রসাদকে ভাত বানিয়ে বালকপ্রধান সমাজকে করেছে হঠকারিতার উজ্জ্বল

সভাস্থল। ফররুখ পরিহাস করেছেন ওই সভ্যতাকে, ওই সভ্যতার বাহক-নিয়ন্ত্রক প্রগলভতার বজ্রাঘাতকে। তাঁর এ ক্ষোভ প্রকাশে ব্যঙ্গোক্তি বিশেষ মন্ত্র হিসাবে ক্রিয়াশীল। ফররুখ লিখেছেন :

"সাবধান থেক বন্ধু, কেননা সর্বদা হুঁশিয়ার
উপরোক্ত কুলীনেরা কাছেই করেন ঘোরাঘুরি,
সুযোগ সুবিধা মত যথাস্থানে চালাইয়া ছুরি
সর্বদা রাখেন চাল ক্যাপিটালহীন কারবার।
বিশিষ্ট প্রগতিপন্থী এ সকল সাধু মহাত্মার
নৈব্যক্তিক আয়োজনে সৃজিত এ শাসালো চাকুরি
সামান্য ব্লেডেই চলে, লাগে নাকো শাবল হাতুড়ি,
প্রয়োজন মত শুধু সিঁদকাঠি হয় দরকার।"

**(চোর, জুয়াচোর এবং পকেটমারের দৌরাত্ম্য : ঐ)**

যন্ত্র-সভ্যতার অবক্ষয়ী নেতিবাচকতায় বর্তমানের সম্ভাব্যতায় প্রত্যাবর্তনের পটভূমি তৈরির ইতিবাচকতায় ফররুখ স্বতন্ত্র। সমাজ ও জীবনের সাথে একাত্মতা তাঁর কবিতাকে ক্রমাগত স্বদেশ এবং ব্যক্তি-প্রত্যাশার টানাপড়েন অতিক্রম করে একটা নিশ্চিত চিরায়ত উপলব্ধিতে দাঁড় করাতে সচেষ্ট থেকেছে। সমকালীন বাস্তবতা, প্রত্যাশিত আলো-বাতাস যন্ত্র-সভ্যতার বেড়াজাল থেকে মানবসত্তার স্বরূপ অবলোকন ফররুখের কবিতাকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত রেখেছে। তাঁর অনুভব :

"টাকা শক্তি মান এই তিন স্বপ্নে হল তিন মন
সুতরাং মান্যবর ব্যতিব্যস্ত তিনের সংঘাতে
পান না সময় খুঁজে, কাজ তিনি করেন কখন ?
মস্তিষ্ক উত্তপ্ত থাকে সমভাবে রাত্রে ও প্রভাতে।

**(মান্যবরেষু : ওই)**

আপন কাব্য সত্যে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টায় ফররুখ প্রতিনিয়ত তৎপর ছিলেন। তাই তিনি সাজানো ভাববৃত্তে প্রবেশ করাতে থাকেন সমাজের চলমান দৃশ্যবলী আর অন্বেষণ করতে থাকেন যাত্রাপথের বৈচিত্র্যকে। তিরিশোত্তর বাংলা কবিতায় সিদ্ধান্তহীনতার যে অস্থির উন্মাদনা বিরাজ করছিল, পাশ্চাত্য প্রভাবিত সে অবক্ষয় থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে প্রাতিস্বিক কাব্যবলয় নির্মাণ করা ছিল একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার। বিস্ময়ের ও আনন্দের ব্যাপার ওই প্রবল প্রবাহের পটভূমিতে দাঁড়িয়েও ফররুখ একটা নিজস্ব কবিতাজমিন তৈরি করতে পেরেছেন। কেননা বিষয়-ভাবনায় তিনি ছিলেন সমাজ সত্যের গভীর অনুভবের খুব নিকটে। তাঁর বিষয়-চেতনায় সমাজ কখনো নিবিড়ভাবে, কখনো গৌণভাবে আবার কখনো রূপায়িত হয়েছে প্রতীকী অবয়বে। প্রতীকী সমাজ-ভাবনার একটা চিত্ররূপ পাই নিম্নোক্ত অনুভবে :

"রাত্রির অরণ্যতটে হে অশ্রান্ত পাখি/যাও ডাকি ডাকি/অবাধ মুক্তির মতো

ভারানত/আমরা শিকলে/শুনি না তোমার সুর, নিজেদেরি বিষাক্ত ছোবলে/তনুমন আহত। (**ডাহুক : সাত সাগরের মাঝি**)

ফররুখের কেন্দ্রীয় স্বর ইসলামী পুনরুজ্জীবন আর অতীতচারিতাকে বাদ দিলে তাঁর কবিতার বিরাট ক্যানভাস জুড়ে ছায়া বিস্তার করে আছে নাগরিক জীবন, সমকাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের অভিঘাত। আর আছে স্বপ্নাচ্ছন্নতা তাঁর সংগীতময় স্বপ্নালুতা বাস্তাবের কঠিন জমিন থেকেই উদ্ভূত। বস্তুত বাস্তবতা আর রোমান্টিকতার সংশ্লেষে নির্মিত ফররুখের কাব্যভুবন এক স্বতন্ত্র মহিমায় সমুজ্জ্বল। তাঁর সে চিন্তাভাষ্য সচেতন কবিতা পাঠককেও ভাবনাগ্রস্ত করে যাপিত জীবনের পাথর-কঠিন বাস্তবতায়, প্রতিনিয়ত। দৃষ্টান্ত :

ক. "জননীর সম্ভ্রম লুটালো ধূলিতলে,
শিশুর কান্নার বেগে শান্ত করি দিল মৃত্যু ঘুম।
নাগরিক আঘাতের বর্শা আর রুখিল না জলে
অগণন শবদেহে তুলিল সে মৃত্যুর মৌসুম।"
(**পদ্মার ভাঙন : হে বন্য স্বপ্নেরা**)

খ. "রুদ্ধশ্বাস নিশীথের বিষাক্ত প্রশ্বাস কালো দাগ
চুপি চুপি ঘোরে-ফেরে অন্তরীক্ষে পাহাড় ও জলে,
সূর্যের মিনার মুছে, গুঁড়ায়ে সূর্যের অনুরাগ
যেন আলেয়ার শিখা দিকভ্রান্ত করি একা চলে।
ঘনতর অন্ধকারে (কোথা পাবো মুক্তির পরাগ ?)
মানুষের মৃত্যু হল বিকৃত পশুর পদতলে।"
(**কালো দাগ : ঐ**)

'অন্ধকার' অনুষঙ্গে ফররুখ নির্দেশ করতে চেয়েছেন সামাজিক কৃষ্ণত্ব। তাঁর কবিতায় প্রকৃতি ও প্রেম বর্ণনায় যেমন অন্ধকার বিদ্যমান, তেমনি স্বপ্ন আর বাস্তবতার দ্বন্দ্বের অন্তরালে, মর্বিড চেতনার বিপরীতে রয়েছে বৃষ্টিস্নাত বাতাস– সুশান্ত অবসানের প্রতীক্ষা আর আলোর বিজয়। ইংরেজ শাসনের সমূহ যন্ত্রণা, অপ্রাপ্তি; স্বাধীনতা প্রত্যাশার ব্যাকুলতা আর প্রাপ্তিনেশা তাঁর কবিতাকে হাতছানি দিয়েছে। তিনি দেখেছেন ক্ষুধা, হতাশা আর নির্মমতার দাগ মুছে নির্মলতা আগমনের আশ্বাস। যেমন:

"দু'শো বছরের খেলা। বলে গেল হাড়ের মিছিল
দু'শো বছরের মারীরোগ। সম্পূর্ণ রাখিয়াছিল
অন্তঃসার শূন্য করি। দেরী ছিল চরম পঙ্কিল
আঘাতের।
(**পদ্মার ফাটল : ওই**)

নির্জিতের জন্যে মর্মবেদনা, বাংলাদেশের আলো-হাওয়ায় বেড়ে ওঠা মানুষের আশাহত হবার বেদনার পরিপ্রেক্ষিতে নির্মিত হয়েছে ফররুখের মানবতাবাদ। মানবপ্রেমের কবি তাই এদেশের শ্যামল-নির্মলতায় আঁকতে চেয়েছেন উদাস ক্লান্ত

মন্থরতা আর ধেয়ে চলার বিবাদসমূহের হিসাব-নিকাশ। শয়তানের সঙ্গে দ্বন্দ্বে মানুষের জয় যেমন চিরন্তন, তেমনি শোষকের সঙ্গে শোষিতের বিবাদেও শেষত জয় হয় শোষিতের। ফররুখ লিখেছেন :

"আমি চলি ইন্‌সানের শেষহীন সম্ভাবনা নিয়ে।
তোমার সুতিক্ত দ্বন্দ্ব তীব্রতর হোক, তবু জেনো
এখানে মাটির বুকে সর্বশেষ জয় মানুষেরি।"
**(ইবলিস ও বনি আদম : কাফেলা)**

ইতিহাসের স্বপ্নভঙ্গ সত্যেরই অপর নাম। আশাভঙ্গের ক্ষিপ্রতাও সত্য। বহু প্রত্যাশিত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আজাদকামী মানুষের মন ভারাক্রান্ত হয়েছিল প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মিল না ঘটায়। নতুন দেশে নতুন জীবনধারা সংগ্রামী মানুষের কাছে অচেনা লাগলো। তখন নতুন করে দানা বাঁধতে থাকলো নতুনতর সংগ্রামের। ১৯৮১ সনে প্রকাশিত 'হাবেদা মরুর কাহিনী' গ্রন্থে পাণ্ডুলিপির কবি-প্রণীত প্রবেশক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কবির ভাষ্য :

"রূপকথার 'হাবেদা মরু'র অন্য নাম 'হাওয়ার ময়দান'। নিঃসীম শূন্যতা আর হতাশার ব্যঞ্জনা আছে ঐ মাঠের সওয়ালে। 'হাবেদা মরুর কাহিনী' গদ্যে লেখা রূপক কবিতা। ঈসায়ী উনিশশো সাতান্নোর শেষ ভাগে এই বইয়ের সূচনা আর উনিশশো আটান্নোর প্রথমার্ধে এর সমাপ্তি। ১৩৭৭ হিজরীর ঈদ-উল-আজহার দিনে এই বইয়ের শেষ কবিতাটি লেখা হয়। দুর্নীতি, অব্যবস্থা আর হতাশা যখন সারা দেশ ছেয়ে ফেলেছিল। আর সেই মারাত্মক নৈরাশ্যের মুখে তখন প্রত্যেক দেশাত্মবোধসম্পন্ন নাগরিক কামনা করেছিলেন একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের।"

সুবিধাভোগী শ্রেণী সমাজে দোর্দণ্ড প্রতাপে বিচরণশীল– এ তথ্য ফররুখের জন্য কোনো সুখকর বিষয় নয়। ব্যঙ্গের আড়ালে কবি সেসব মানুষের স্বরূপ উন্মোচন করতে চেয়েছেন, যারা ফাঁকিবাজি আর ছলচাতুরী করে মানুষের জীবনকে বিষময় করে তুলেছে। পরনির্ভরশীলতা থেকে আত্ম-নির্ভরতার দিকে অবগাহন ছাড়া 'গোলামীবৃত্তির আর চাতুরীপ্রবণতা থেকে মানুষের মুক্তি নেই– এও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। ভিনদেশী কৃষ্টির প্রতি মোহ, তল্পী বহন বাতিক, তৈলমর্দনে আগ্রহ, তথাকথিত প্রগতি ভাবনা, ব্যক্তিত্ব-বিসর্জন, আদর্শচ্যুক্তি, প্রবঞ্চনা পেশা, মধ্যবিত্ত সুলভ সংকোচ, গতির অধিক অগ্রগতির স্বপ্ন প্রভৃতি ফররুখকে বিচলিত করেছে। তাই এসব বিষয়াদি থেকে স্বস্তি চেয়েছেন তিনি– দূরত্বে নিশ্চিত স্থিত অবস্থানে। সুবিধাবাদীদের চারিত্র্য-চিত্রণে ফররুখের ভাবনা-প্রকাশ :

"এদিকেও নই, ওদিকেও নই, আছি মাঝখানে,
যখন যেদিকে লাভ খুঁজে পাই, অশ্ব ছোটাই,
রঙিন মড়কে কড়িও জোটাই নামও ফোটাই;
সুবিধাবাদের পন্থা যে চেনে শুধু সেই জানে।"

(সংলাপ : হাল্কা লেখা)

"আহা চটো কেন? চটলে তোমার আসল চেহারা হয় প্রকাশ
অপকর্মের মাঝে তুমি নাই, রেখেছি আমরা এ বিশ্বাস।
আমরা বলিনি মুরগি চুরির ঘটনায় ছিল তোমার নাম,
কাজীর আঙুল ঘুরবার সাথে পুরলো হাতির মনস্কাম।
লুকাতে পালক তুমি আচানক হাত দিলে খালি মাথায়
বৃথা আমাদের দোষ দাও আজ, নিজেই গড়ালে কাল খাতায়।"

(ইরানী কিস্‌সা : ঐ)

যুদ্ধ, হতাশা, মহামারী, মন্বন্তর, আশাভঙ্গের নিদারুণ কষ্টবোধ ফররুখের কবিতার অন্যতম প্রধান প্রবণতা। জীবনের এমনকি কাব্যচর্চার শেষপাদে এসেও কবিকে বারবার তাড়া করেছে সমকালীন এসব প্রসঙ্গ। স্বাধীন বাংলাদেশেও তিনি দেখেছেন জনতার অপ্রাপ্তিবোধের ব্যাপকতা। চারদিকে যেন তিনি অবলোকন করছেন 'নির্লজ্জের রঙ্গ মঞ্চে অকল্পিত বিলাসের ঘর'। 'জীবনের উদ্দাম প্রহর' আর অন্তরালের অবসন্নতা তাঁকে প্রসন্নতায় অবগাহন করতে প্রেরণা যুগিয়েছে মাটির মমতা রসের মতো। মৃত্যুর মাত্র দু'মাস আগে রচিত, এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, তাঁর শেষ কবিতায়ও চিত্রিত হয়েছে সমকালীন জীবন-যন্ত্রণার দাগ। তিনি লিখেছেন:

"স্বপ্নের অধ্যায় শেষ। দুঃস্বপ্নের এই বন্দী শিবির
সাত কোটি মানুষের বধ্যভূমি। দেখ এ বাংলার
প্রতি গৃহে অপমৃত্যু ফেলে ছায়া তিক্ত হতাশার,
দুর্ভিক্ষের বার্তা আসে, আসে মৃত্যু নিরন্ধ্র, রাত্রির।
বাষট্টি হাজার গ্রাম উৎকণ্ঠিত, নিভৃত পল্লীর
প্রতি পথে ওঠে আজ হাহাকার তীব্র বুভুক্ষার
চোখে ভাসে চারদিকে অন্ধকার– কালো অন্ধকার;
ক্ষুধা, মৃত্যু, ভাগ্য আজ স্তিমিত ভ্রান্ত জাতির।"

(১৯৭৪ : অগ্রন্থিত)

ফররুখ আহমদ জীবনের কবি, মানুষের কবি। তাঁর কবিতায় বর্ণিত দেশীয় প্রসঙ্গ ও বিষয়াদি চেতনালেপন ও ভাবনা প্রকাশের কৌশলে আন্তর্জাতিক মানের হয়ে উঠেছে। সমকাল– কালের প্রবাহ, আঘাত ও আশ্বাস তাঁর কবিতার বিশেষ ক্ষুর। যেন তিনি মানবতা নামক ছাদে দাঁড়িয়ে দেখছেন কবিতা-উঠোনের যাবতীয় নৃত্যকলা আর বর্ণনা তুলে ধরেছেন তাঁর আলোকিত কবিতা সভায়। ❐

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ত্রয়োদশ সংখ্যা, জুন-২০০৬]
লেখক : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক।

# আমাদের জাতীয় সাহিত্য এবং ফররুখ-সাহিত্যে ইতিবাচকতা

ডক্টর ফজলুল হক সৈকত

**"রাত্রে ঝড় উঠিয়াছিল; সুবেসাদিকের ম্লান রোশ্নিতে সমুদ্রের বুক এখন শান্ত। কয়েকজন বিমর্ষ মাল্লা সিন্দবাদকে ঘিরিয়া জাহাজের পাটাতনে আসিয়া দাঁড়াইল।" - ফররুখ আহমদ**

দার্শনিক কবি, মানবতার কবি, প্রেমের কবি আর শুভবোধের কবি ফররুখ আহমদ (১৯১৮-৭৪)। সৃজনশীলতা আর ক্রম-অগ্রসরতা তাঁর আরাধ্য। প্রতীক-রূপক তাঁর আশ্রয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে অল্প কয়জন সাধক জাতীয় সাহিত্য আর ইতিবাচক সভ্যতা-ভাবনায় প্রাতিস্বিকতার পরিচয় আঁকতে পেরেছেন, তাঁদের মধ্যে ফররুখ আহমদ একটি বিশেষ নাম। এ ভূখণ্ডের মানুষের প্রবণতা, এ সমাজের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি আর প্রত্যাশাকে সাহিত্য পাতায় রূপ দিতে ফররুখ ছিলেন আন্তরিক এবং পরিশ্রমী। কল্পনা আর সাধনায় তিনি সাহিত্য সাধনার পুরো সময় আমাদের জাতীয় সাহিত্যের প্রধান ফটকে ঠাঁয় দাঁড়িয়েছিলেন।

প্রাচীন সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য– সব মিলিয়ে যে বাংলা সাহিত্য, তার শরীরে বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান– প্রায় সব ধর্মের আর নানান সংস্কৃতির ছাপ বেশ প্রবল। বৌদ্ধ দর্শন, হিন্দু দর্শনের পালা পেরিয়ে, মুসলিম শাসনের ব্যাপক পরিসরে প্রবেশ করে বাংলা সাহিত্যের যাত্রাপথ। তারপর আসে ভিনদেশী-ভিন্নভাষার শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা ও রোষানল। এরপর মুক্তিকামনা পরাধীনতা থেকে। আর এভাবেই পথ এগোতে এগোতে বাংলা সাহিত্য পেতে থাকে তার প্রকৃত রূপ– বাংলাভাষী মানুষ অর্জন করে তাদের জাতীয় সাহিত্য। জাতির ভালো-মন্দ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, প্রত্যাশা-আশাভঙ্গ আর শিল্পবোধ-শুভবোধ যুক্ত হয় সাহিত্যের গণ্ডিতে। বাংলাদেশের জাতীয় সাহিত্যের এ স্বচ্ছ পরিসরে সচেতনভাবে স্থান করে নেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মীর মশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, গোলাম মোস্তফা, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, মানিক বন্দোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, আহসান হাবীব, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, ফররুখ আহমদ প্রমুখ সমাজ-সচেতন, সভ্যতা ও শিল্প সচেতন সাহিত্যিক।

রাষ্ট্রভাষা, মাতৃভাষা আর সাহিত্যের ভাষাকে আলাদা করে দেখতে গেলে যে বিপত্তি এবং বিভ্রান্তির কবলে পড়তে হতে পারে, সে বিষয়ে ফররুখ আহমদ ওয়াকিবহাল ছিলেন। এদেশের জাতীয় সাহিত্য যখন তার পথ তৈরি করছিল, তখন সৃষ্ট হওয়া ভাষা-সংকট তাকে ভাবিয়ে তুলেছিল স্বাভাবিকভাবেই। তিনি সাহিত্যের ভাষা বিষয়ক চিন্তা প্রকাশ করেছেন এভাবে—

"রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় সাহিত্য গড়ে তোলার প্রথম পদক্ষেপে বিত্তবানের সহযোগিতা কামনাকে কেউ যদি পুঁজিবাদের সমর্থন মনে করেন, তাহলে ভুল করবেন। কারণ ইসলামী রাষ্ট্রের বা পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ শত্রু বলে সর্বপ্রথম গণ্য হতে পারে কুফরী ও ক্যাপিটালিজম। আর ঐ দুটোর বিরুদ্ধেই বৈরী মনোভাব নিয়ে আমাদের জাতীয় সাহিত্য গড়ে উঠবে বলেই আমার বিশ্বাস। সুতরাং পাকিস্তান রাষ্ট্রে রাষ্ট্রভাষা ও আমাদের জাতীয় সাহিত্য গড়ে তুলতে সহযোগিতা (সাহায্য নয়) করতে পারেন কেবলমাত্র তারাই, যাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামী গণতন্ত্রের আলোক-দীপ্ত। ...

ন্যায়সঙ্গত দাবীর বলেই পাকিস্তানের জনগণ শুধু আহার্যের নয়– সংস্কৃতি ও ভাষার অধিকার কেড়ে নেবে। গণতান্ত্রিক বিচারে যেখানে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হওয়া উচিত সেখানে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষাকে পর্যন্ত যারা অন্য একটি প্রাদেশিক ভাষায় রূপান্তরিত করতে চান তাঁদের উদ্দেশ্য অসৎ।' **(পাকিস্তান : রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য)**।

জাতীয় সংকটে ফররুখ খুব বেশি চিন্তিত হয়েছেন জনতার হাহাকার আর যথার্থ নেতৃত্বের অভাবের কথা ভেবে। কেননা প্রকৃত ও সাহসী নেতাই কেবল পারে পথহারা কিংবা বিভ্রান্তর জাতিকে সঠিক পথ-নির্দেশনা দিতে। এ ব্যাপারে ফররুখের আকুলতা তাঁর কবিতায়—

বন্দরে বসে যাত্রীরা দিন গোনে,
বুঝি মৌসুমী হাওয়ায় মোদের জাহাজের ধ্বনি শোনে;
বুঝি কুয়াশায়, জোছনা-মায়ায় জাহাজের পাল দেখে।
আহা পেরেশান মুসাফির দল
দরিয়া কিনারে জাগে তক্‌দিরে
নিরাশার ছবি এঁকে।

**(পাঞ্জেরী: সাত সাগরের মাঝি)**

রাত্রিশেষে প্রত্যাশার কবি ফররুখ তাঁর দেশবাসীর সমূহ অশান্তির আর যন্ত্রণার বিলোপ কামনা করেছেন প্রতিনিয়ত। সাম্যবাদও তাঁর কবিতার এক অনন্য অনুষঙ্গ। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে মানুষের ভাগ্যে কী দিনযাপন অপেক্ষা করছে, তার জন্য তাঁর ব্যাকুলতা ছিল প্রাণান্ত। তিনি দেখেছেন 'যুগ-সন্ধ্যায়' জীর্ণ প্রথার গতানুগতিকতায় প্রাণশক্তির পূর্ণতার ইশারা। অবলোকন করেছেন উদ্দাম উচ্ছ্বাস আর সংকীর্ণ গণ্ডি ভেঙে দূর পথে এগিয়ে যাবার আশ্বাস। ভ্রান্তি আর মিথ্যার জাল ছিঁড়ে মানবমুখী এক সভ্যতা নির্মাণে তাই তিনি প্রবল প্রত্যয়ী। দৃষ্টান্ত–

'দুঃস্বপ্নের রাত্রি শেষে তাই জাগে সুর প্রার্থনার
স্বর্ণ ঈগলের মত মুক্ত হোক এই বন্দী মন,
আসুক পল্লবে ফিরে জীবনের বিপুল স্পন্দন

দীনতার সব গণ্ডী ভেঙে যাক প্রাণের জোয়ার;
সব ভ্রান্তি দূরে যাক, পুড়ে যাক মিথ্যার বন্ধন;
বলে যাব মুক্ত কণ্ঠে এ পৃথিবী তোমার আমার॥'

**(মুক্তি স্বপ্নঃ মুহূর্তের কবিতা)**

আপন সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য আর আপন ভুবন এসবের প্রতি ফররুখের মমতা ছিল অশেষ। তিনি চাননি দেশীয় শিল্প-সংস্কৃতিকে গ্রাস করুক ভিনদেশী সংস্কৃতির প্রবল ছোবল। ভ্রাতৃত্ববোধের বদলে বিচ্ছিন্নতাবাদ এদেশের পরিবার ও সমাজ কাঠামোয় কালো দাগ ফেলুক এ তিনি ভাবতেও পারেননি। নিজস্ব শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির বুনিয়াদ দৃঢ় করার জন্য তার সাহিত্য যে উদ্দীপনা জাগায় আমাদের চিন্তায় তা সত্যিই বিস্ময়কর। ভ্রাতৃসমাজ সমুন্নত হোক, দূর হোক যাবতীয় স্খলন-ত্রুটি-বেঈমানী, এদেশে প্রতিষ্ঠা পাক মাদকতা-পরবর্তী নির্বিকার স্বপ্নজমিন- এই ছিল ফররুখের দেশলগ্নতার প্রতি দায়বদ্ধতার সাহিত্যিক প্রতিভাস। ফেলে-আসা দিনের পঙ্কিলতার পাটাতনে তিনি গড়ে তুলতে চান নতুন ইমারত, নবতর প্রাণ-স্পন্দন-

পাকিস্তান গড়েছো তো, কিন্তু কেন ভিত্তিমূলে এর
প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করি সুকৌশলী চক্র ইবলিসের?
কওমের মূল দাবি করে আজ কৌশলে বাতিল
নীতি-নিরপেক্ষ ধাঁচে কারা তোলে স্বার্থের পাঁচিল?
জাফরের সাথে রাখো কতটুকু ব্যবধান আজ?
পশ্চিমের তন্ত্র মেনে চাপা দেয় কে ভ্রাতৃ-সমাজ?

**(মীর জাফরের শিকায়েতঃ ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য)**

'রাত্রি' ফররুখের কবিতার একটি প্রধান অনুষঙ্গ। শুরু থেকেই এ শব্দ ও চিন্তার সুতোটি তাঁর সাহিত্যচর্চার নিত্যসঙ্গী। 'রাত্রি' মূলত অন্ধকার, অনগ্রসরতা, অস্বচ্ছতা, অজ্ঞতা, হতাশা, বিভ্রান্তি তার পাপবোধের ফলকচিত্র। ফররুখ আহমদ দেখেছেন আমাদের ভেতরে এক প্রবল অন্ধকার, দিনের আলোর অন্তরালে এক প্রকট অস্বচ্ছতা লুকিয়ে আছে। তাকে তিনি প্রকাশ করতে চান- মুক্তি দিতে চান 'রাত্রির' ভয়াবহতা থেকে। চলে যেতে চান রাত্রিশেষের প্রবল আলোর বন্যায়। আত্মগ্লানি আর পিছিয়ে-পড়া প্রবণতার কড়া সমালোচক তিনি- সাহসী প্রকাশকও বটে। তিনি বলেছেন-

"আজাদী পাওয়ার পর আমরা এমন এক উৎকট ভব্যতার শিকারে পরিণত হয়েছি, যেখানে কার্পেট-বিছানো ড্রয়িংরুমের একপাশে দামি সেলফে রেক্সিনে বাঁধানো অনেক অনেক বই সাজানো থাকে। কোনোদিন সে সব বইয়ের পাতা খোলা হয় না। সেখানে শুধু আলোচনা হয় হাল ফ্যাশনের বাড়ি-গাড়ি আর শাড়ি সম্পর্কে। লেখকদের উপরেও এখন ঐ তথাকথিত অভিজাত সম্প্রদায় প্রভাব বিস্তার করছেন, যার ফলে কঠিন শ্রম-সাধনার পথ ছেড়ে অনেক লেখক বাড়ি-গাড়ির স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়েছেন।' **(সাক্ষাৎকার, বই, জুন ১৯৬৮)**।

নতুন পাকিস্তান সংগঠনে এ অর্থ-মোহতা আর খুব প্রাসঙ্গিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির

সাথে শিক্ষা, সংস্কৃতি, দেশরক্ষা ও অন্যান্য বিবিধ বিষয় ফররুখ আহ্‌মদকে ভাবিয়ে তুলেছিল। বহুদিনের বহুশোষণের বিচিত্র বাঁক উত্তরণের পর দেশী-বিদেশী শাসকের ভোগ-বিলাসের উত্তাল ক্ষেত্র এ দেশ যখন মুক্তির আনন্দে মাতোয়ারা, তখন কবি ফররুখ দেখেছেন এদেশের মাটির ভাঁজে ভাঁজে ক্ষতের দাগ আর প্রত্যাশার আলোকচ্ছটার বীজ। বাতাসে বাতাসে প্রবহমান দেখেছেন সম্ভাবনার বন্যা। যেন 'রুদ্ধশ্বাসে নিশিথের বিষাক্ত প্রশ্বাস কালো দাগ। চুপি চুপি ঘোরেফেরে অন্তরীক্ষে পাহাড়ে ও জলে' আর 'সূর্যের মিনার মুছে' 'ঘনতর অন্ধকারে' যেন উঁকি দেয় আলোর ফোয়ারা, প্রশান্তির গান। কবি অবিচল দেখতে থাকেন–

পুরোনো সমাধিস্তম্ভে পার হয়ে কারখানা, প্রাচীন দেয়াল।
বিশীর্ণ ক্ষুধার ছায়া, কৃষাণের ক্লান্তদেহ, শ্রমিক-কঙ্কাল,
নুয়েপড়া শ্রান্ত মূর্তি শ্রমজীবী কেরানীর, বুভুক্ষু নিখিল,
অবসন্ন বসুন্ধরা খোলে কর্মজগতের খিল।
এসেছে প্রভাত।
সারাদিন, সারারাত
দশদিক ঘিরে পড়ে মেদস্ফীত শোষকের ঊর্ণনাভ-জাল
জনতার রক্তস্রোত কেটে কেটে চলে তার জাহাজের হাল,
ওড়ে তার বিজয় পতাকা
শোষিত-করোটি-চিহ্ন-আঁকা। **(প্রেক্ষণ: হে বন্য স্বপ্নেরা)**

জাতির চিন্তাকাশে বেঈমানী, অনৈক্য আর বিশৃঙ্খলার কদর্যতা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করায় মানব সভ্যতা তথা দেশীয় সভ্যতা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। আমরা এক চূড়ান্ত দুর্গতির সমাবেশে যোগ দিয়েছি যেন নিজেরই অজান্তে। ব্যাহত অগ্রগতির যাঁতাকলে দ্বন্দ্ব-সংশয় স্বার্থপরতার ঘূর্ণিতে পাক খেয়ে, আমরা এগিয়ে চলেছি হীনতা দৈন্য আর অপমৃত্যুর 'নিকষ কালো অন্ধকারে'। আর এ বোধে তাড়িত ফররুখ আহ্‌মদ নিরাবেগ কণ্ঠে উচ্চারণ করেন–

হিংসা ও হিংস্রতা যদি দেয় শান্তি-সাম্যের দোহাই
মনে রেখ অশান্তির, অসাম্যের জের মেটে নাই।
**(টুকরো কবিতা-দোহাই : হাল্কা লেখা)**

সবকিছু দেখে-শুনে-বুঝে ফররুখ আহমদ কখনো আক্রান্ত হয়েছেন হতাশা ও অবসন্নতায়, কখনো হয়েছেন প্রতিবাদী, কখনো বা মহাকালের অমোঘ সত্যের কাছে নিজেকে করেছেন সমর্পণ। 'জড়-সভ্যতা আর শোষক-সমাজের' প্রতি তাঁর প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ পায় অভিশাপের বাণী হয়ে। যেন তিনি সময়ের অপেক্ষায় প্রহর গুনতে থাকা কোনো শ্রান্ত যাত্রী– সময় এলে পদাঘাতে-আঘাতে ওই সভ্যতা ও সমাজকে তিনি নিয়ে যাবেন ধ্বংসের আস্তাকুঁড়ে। কিন্তু যতই শক্ত থাকতে চান কবি, ততই মানুষের ম্লানতা আর অসহায়তা তাকে ক্লান্ত করে। তিনি ভাবেন–

হায়রে মানুষ! কভু পথের সন্ধান নাহি পেলে

চলেছো তো কতকাল বলিবার নাহি হল শেষ
তবুও বেদনা-শ্রান্ত বেলাশেষে ম্লান আঁখি মেলে
বলেছ– আমরা যাত্রী আমাদের পথ নিরুদ্দেশ।
দিগন্তে হারায় পথ স্বপ্নশেষ ছায়া দিকে দিকে
তোমার মুহূর্ত ভিক্ষা তারে বাধা দেয় মহাকাল।

**(শ্রান্তঃ হে বন্য স্বপ্নেরা)**

পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে এদেশবাসীর মানসিক মুক্তি ঘটেনি স্বাধীনতার অব্যবহিত-পরবর্তীকালে। মানসিক দাসত্বে তখন ও এদেশের কোটি কোটি মানুষ নিঃশর্তে জোয়ালের নিচে তার গর্দান রাখতে প্রস্তুত। বিগত দিনের স্মৃতির চর্বিতচর্বণ ছাড়া আর যেন নতুন কিছু ভাববার নেই তাদের। এভাবেই সদ্যস্বাধীন একটি দেশের অনগ্রসর মানব সমাজ নির্মাণ করতে থাকে অকল্পিত এ খোলসের সভ্যতা। গোলামীর গৌরবে চাপা পড়তে থাকে আজাদীর সৌরভ। কানে তুলো আর পিঠে কুলো বেঁধে যেন জাতি দাঁড়ায় কালো দাগের চিহ্ন সারির সামনে– প্রার্থনার ভঙ্গিতে। নিজস্ব ঐতিহ্যের সঙ্গে বিবাদ করে বিদেশী কারবার আর বিদেশীর মনোরঞ্জনে আমাদের সময়পাত হতে থাকে। ফররুখ ভাবেন রোগের প্রতিকার হয়তো পাওয়া যাবে বইপত্র ঘাটলে কিন্তু মূর্খতার অজ্ঞানতার কোনো চিকিৎসা তো নাই। সকল অনগ্রগতির কারণ এ মূর্খতার অভিশাপ থেকে রেহাই চান তিনি। তাই তাঁর জিজ্ঞাসা–

জাতীয় ঐতিহ্য কেন অবলুপ্ত? কেন বেশী মান
পায় আজও পথে ঘাটে ধার করা বুলির সন্তান?
বিলাসী বানর যত একমাত্র লেবাসের জোরে
যত্রতত্র চলে ফিরে কেন ঠাই পায় সমাদরে?
কেন দিন অযোগ্যে? যোগ্যরা নিখোঁজ কি কারণে!

**(মীর জাফরের শিকায়েত : ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য)**

অবশ্য ফররুখের কাব্য পরিসরের বিশিষ্টতাসমূহ হতাশা-ক্লান্তির অন্তরালে প্রবল আশাবাদের প্রহরান্তরে। তিনি জানেন সকল স্তব্ধতা অন্ধকার পেরিয়ে আমরা এক সময় ইতিবাচক অধ্যায়ে প্রবেশ করবো। তিনি ভাবতেন রাত্রির স্তব্ধতা ভেঙে এ মাটিতে নেমে আসবে আলোকের নবতর প্রস্বর। আকাশ মাঠ পেরিয়ে সে পাখি চাঁদ আর স্বপ্নের বারতা তা যেন আমাদের হাতের নাগালের মধ্যে। যেন আসমানে আসমানে কুয়াশা পর্দা ছিঁড়ে দেখা দিয়েছে ফাল্গুনের নবসৃষ্টির গান। ব্যর্থতার গ্লানিবহরে আসীন হয়েছে হায়াত দারাজের প্রশস্তি। ফররুখ স্বদেশের মাটিতে ইতিহাস-ঐতিহ্যের ভিতে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশেও গভীর নোঙর বেঁধেছেন–তাঁর কবিতার পাতায় পাতায় সে আভাস। নুররেজ ফুলের প্রতীকে বর্তমান সভ্যতার অবসন্নতা দূর হবার অনেক আলোক-নির্দেশ অবলোকন করেছেন তিনি। তাঁর আহ্বান–

এ জীবন এই মেঘে নামুক সে বজ্রের আভাস
শূন্য শুষ্ক মৃত মাঠে তার এক কঠাক্ষ ইংগিত

নিমেষে থামায়ে দিক তৃণের চটুল পরিহাস?
বন হতে বনান্তরে ছুটে যাক উদ্দাম সংগীত;
জাগুক আঘাত ক্ষীণ দূর্বাদলে বনানীর শ্বাস
সব পরিহাস শেষে জীবনের বলিষ্ঠ ইংগিত।

**(শেষ : অনুস্বার)**

নদীর বহমানতা, স্রোত অপার আর রাশি রাশি জলের ধারায় ফররুখ আহমদ খুঁজে ফেরেন পূর্ণতার অসীম বারতা। তাঁর দেখা 'ফসলের শূন্য শুষ্ক মাঠ পেলে তায় সোনালি আশ্বাস। আশা জাগে মনে যৌবনের স্বপ্ন নীল হাওয়ায় ফাল্গুনের বন্যায় স্বর্ণশীষ সবুজ ফসলে ভূমি ছাওয়ার। তিনি লেখেন সে আশার কথা–

সমাধির বুক ঢাকো। দিন আসে সেদিন ফুরায়।
তবু তিমিরের বুকে তারকা স্মরণ স্বয়ম্বর
বিগত দিনের স্মৃতি। হারানো সুরের বীথিকায়
গানের সন্ধান করো, ভেঙে যায় সুরের নির্ভর
তবুও স্মরণে জাগে। কত গান আসে আর যায়
কত পথ-ভোলা গান রেখে যায় অটুট স্বাক্ষর।

**(স্মরণ : হে বন্য স্বপ্নরা )**

ফররুখ আহমদ জাতীয় জীবনে এবং কবিতা ভুবনে ইতিবাচক প্রবণতার কবি। যতদিন পৃথিবীতে সংঘাত-শংকা আঘাত-সংকট থাকবে আর থাকবে সবকিছু ডিঙিয়ে সম্ভাবনার পথে এগিয়ে যাবার প্রত্যাশা, ততদিন থাকবে ফররুখের কবিতার প্রাসঙ্গিকতা, তাঁর কবিতার আবেদন। কবি ফররুখ আমাদের জাতীয় সাহিত্যে এক অবশ্যাস্মরণীয় কবি, আমাদের সমস্ত আশাহীনতার পিঠে আশার আশ্বাস বহনের কবি।

---

**[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, পঞ্চদশ সংখ্যা, অক্টোবর, ২০০৭]**

# ফররুখ আহমদ : সমকালে ও উত্তরকালে

**ডক্টর ফজলুল হক সৈকত**

দক্ষিণ আমেরিকার চিলির প্রখ্যাত কবি পাবলো নেরুদা (১৯০৪-১৯৭৩) তাঁর নোবেল ভাষণে বলেছিলেন: 'কবিতা লেখার কোনো ফর্মুলা আমি কখনো কোনো বইয়ে পাইনি, অগত্যা আমি লিখিতভাবে উপদেশসূচক একটি শব্দও কি কোনো পদ্ধতি বা কোনো শৈলীর কথা উচ্চারণ করার ইচ্ছা পোষণ করি না যাতে তরুণ কবিকুল আমার নিকট থেকে প্রত্যাশিত জ্ঞানের ছিটেফোঁটাও পেতে পারেন।... দূরগামী যাত্রাপথে কবিতা রচনার ব্যবস্থাপত্র আমি পেয়ে গিয়েছিলাম। মৃত্তিকা ও আত্মার ভিতর থেকে উৎসারিত দান আশিস হিসাবে আমার ওপর অর্পিত হয়েছিল। আমার বিশ্বাস এই যে, কবিতা হলো এক পবিত্র ক্ষণস্থায়ী কর্মানুষ্ঠান, যার ভিতরে নৈঃসঙ্গ্য ও ঐক্য, আবেগ ও সকর্মতা, কারো একান্ত পৃথিবী, মানুষের একান্ত পৃথিবী ও প্রকৃতির গোপন উন্মোচন সমভাবে সমপরিমাণে অংশ নিয়ে থাকে। অনুরূপভাবে আমি সংশয়হীন এই ধারণায় উপনীত হয়েছি যে, এসব কিছুই– মানুষ ও তার অতীত, মানুষ ও তার অঙ্গীকার, মানুষ ও তার কাব্য সংরক্ষিত হয়ে থাকে সর্বদা প্রসারমান জনগোষ্ঠীর ভিতরে, এমন এক কর্মপ্রণোদনার মধ্যে যা কোনো একদিন বাস্তবতা ও স্বপ্নকে এক অখণ্ড সমগ্রতায় গেঁথে নেবে, কারণ এভাবেই তো তারা পরস্পরে মিলিত হয়।' (মামুদ, ২০০৮, পৃষ্ঠা: ৭৩-৭৪)– বাঙালির ঐতিহ্য এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের চেতনা ধারণ ও লালনকারী কবি ফররুখ আহমদের চিন্তা, সমকালে এবং উত্তরকালে কিভাবে আমাদের জন্য আগ্রহ ও প্রেরণার বিষয় হয়ে উঠেছে, তা অনুধাবন করতে হলে কবির প্রতিবেশের ভিতর দিয়ে আত্মার আলোড়ন ও বেড়ে ওঠার সমগ্রতার ছবি পাঠ করাটা অত্যন্ত জরুরি। আবেগ ও বাস্তবতাকে স্বীকার করে ফররুখ ক্রমাগত যে অর্পিত কাজের বয়ান ও বয়ন অব্যাহত রেখেছেন, সে বিষয়ে নিবিড় পর্যবেক্ষণ এখন সময়ের দাবী।

ফররুখ আহমদের প্রথম কবিতা 'রাত্রি' ছাপা হয় ১৯৩৭ সালে (বুলবুল, শ্রাবণ, ১৩৪৪)। কবিতাটির বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট ও সরল এবং তা সমকালে সমাজ-রূপান্তরের প্রেরণার এক অনন্য ধারক। কবিতাটির পাঠ নেওয়া যাক:

ওরে পাখি, জেগে ওঠ জেগে ওঠ রাত্রি এল বুঝি
ঘুমাবার কাল এল, জাগিবার সময় যে যায়
ওরে জাগ্ জাগ্ তবু অকারণে। রাত্রির ভেলায়
কোন অন্ধ তিমিরের স্রোতে আসা নিরুদ্দেশ যুঝি
হে বিহঙ্গ, দিকভ্রষ্ট নাহি হোয়ে যেন পথ খুঁজি
অবেলায়। এখানে সমুখে আছে ঝড়, আছে ভয়
এখনো আনন্দ আছে খুঁজিবার দূরন্ত বিস্ময়

তবু অন্ধকার এল দেখিলাম রিক্ত মোর পুঁজী।
এখনো যায়নি অস্ত সূর্য মোর ব্যথা আকুলিয়া
এখনো রয়েছে তার শেষ রশ্মি পাতায় পাতায়
তবু অন্ধকার এল, এল মোর আনন্দ ভুলিয়া
অনন্ত বেদনা সম রিক্ততার কঠোর ব্যথায়;
প্রতি পল্লবের বুকে জাগিল তিমির শ্যামলিমা
এ আমার স্বপ্ন নহে, এই কালো মোর মৃত্যুসীমা ॥

পরবর্তীকালে ফররুখের কবিতায় 'রাত্রি'কে একটি প্রধান অনুষঙ্গ হিসাবে পাই আমরা। শুরু থেকেই এই শব্দ ও চিন্তার সুতোটি তাঁর সাহিত্যচর্চার নিত্যসঙ্গী। 'রাত্রি' মূলত অন্ধকার, অনগ্রসরতা, অস্বচ্ছতা, অজ্ঞতা, হতাশা, বিভ্রান্তি আর পাপবোধের ফলকচিত্র। ফররুখ আহমদ দেখেছেন আমাদের ভিতরে এক প্রচল অন্ধকার, দিনের আলোকের অন্তরালে এক প্রকট অস্বচ্ছতা লুকিয়ে আছে। তাকে তিনি প্রকাশ করতে চান, মুক্তি পেতে চান 'রাত্রি'র সমূহ ভয়াবহতা থেকে। চলে যেতে চান রাত্রিশেষের প্রবল আলোর বন্যায়। আত্মগ্লানি আর পিছিয়ে-পড়া প্রবণতার কড়া সমালোচক ফররুখ; সাহসী প্রকাশকও বটে। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন :

"আজাদী পাওয়ার পর আমরা এমন এক উৎকট ভব্যতার শিকারে পরিণত হয়েছি, যেখানে কার্পেট-বিছানো ড্রয়িংরুমের একপাশে দামি শেলফে রেক্সিনে বাঁধানো অনেক অনেক বই সাজানো থাকে। কোনোদিন সে সব বইয়ের পাতা খোলা হয় না। সেখানে শুধু আলোচনা হয় হাল ফ্যাশনের বাড়ি-গাড়ি আর শাড়ি সম্পর্কে। লেখকদের উপরেও এখন ঐ তথাকথিত অভিজাত সম্প্রদায় প্রভাব বিস্তার করছেন, যার ফলে কঠিন শ্রম-সাধনার পথ ছেড়ে অনেক লেখক বাড়ি-গাড়ির স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়েছেন।" (*বই*, ১৯৬৮)

কবি ফররুখ রিপন কলেজে ও স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যয়নকালে ফ্যাসিবিরোধী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রচনা করেন *হে বন্য স্বপ্নেরা* কবিতাগুচ্ছ। কিন্তু ১৯৪১ সালে তাঁর চেতনাজগতে পরিবর্তন আসে– ১৯৪০ সালে গৃহীত ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে। সে বছর স্কটিশ চার্চ কলেজ ছেড়ে ইংরাজি সাহিত্যে বি. এ ক্লাসে ভর্তি হন কলকাতা সিটি কলেজে– প্রকাশ করেন 'কাব্যে কোরআন' শিরোনামে *মোহাম্মদী* ও *সওগাত*-এ বেশকিছু সূরার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। (সৈয়দ, ১৯৯৩, ৬৪-৬৬) একথা প্রায় সর্বজনবিদিত যে, ভারতবর্ষে মুসলমানদের উত্থানের দশকে (১৯৩৭-১৯৪৭) সাহিত্যে পাকিস্তানবাদ প্রচারের জন্য দু'টি সংগঠন গড়ে ওঠে–একটি কলকাতায়, অপরটি ঢাকায়। ১৯৪২ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি'; তাঁদের তত্ত্ব বা দর্শন প্রচারে ব্যবহৃত হয় *মাসিক মোহাম্মদী*। লক্ষ্যঃ জাতীয় রেনেসাঁর উদ্বোধক পাকিস্তানবাদের সাহিত্যিক রূপায়ণ, হিন্দুদের থেকে পৃথক মুসলমানদের জীবনভিত্তিক আরবি-উর্দু শব্দবহুল বাংলা সাহিত্য রচনা এবং ভাষা সংস্কার করে নতুন ভাষা নির্মাণ। ধর্ম গৃহীত হয় সংস্কৃতির মূল ভিত্তি হিশাবে। খাজা নাজিমুদ্দিনের (১৮৯৪-১৯৬৪) নেতৃত্বে মুসলিমলীগ ক্ষমতারোহণের বৎসরে (১৯৪৩) ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'। *পাক্ষিক*

*পাকিস্তান* ছিল ওই সংসদের মুখপত্র। পরে, পাকিস্তান-পর্বে, সরকারি *মাহে-নও* সাময়িকপত্রটি পাকিস্তানবাদী সাহিত্যতত্ত্ব প্রচারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। 'ফররুখ আহমদ পাকিস্তানবাদী' (জাহাঙ্গীরি, ২০০৪, ৯৯) কবি। ১৯৩৭-১৯৪৭ কালপর্বে ফররুখ আহমদের কবিতায় মুসলিম পুরাণের প্রয়োগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ফজলুল হকের পতনের পর নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত হয় মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভা (১৯৪৩-১৯৪৫)–এই সময়-পরিধিতে রচিত ফররুখের কবিতাফসল হলো সাত সাগরের মাঝি (রচনা: ১৯৪৩-৪৪)। 'সিন্দবাদ', 'বা'র দরিয়ায়', 'দরিয়ায় শেষরাত্রি', 'আকাশ-নাবিক', 'স্বর্ণ-ঈগল', 'পাঞ্জেরী', 'সাত সাগরের মাঝি', 'তুফান', 'নিশান' প্রভৃতি কবিতা– মুসলিম লীগ ও পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির অতীত ইতিহাস ভূগোলে প্রস্থানের সাক্ষ্য বহন করে। নজরুলের কবিতার জাতীয়তাবাদী বীর কামাল পাশা বা আনোয়ার নয়, আরব্যোপন্যাসের সিন্দবাদ হয়েছে তাঁর কাব্যের নায়ক।

কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ,
শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ,
পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ ব'য়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক;
নতুন পানিতে সফর এবার, হে মাঝি সিন্দবাদ!

('সিন্দবাদ': *সাত সাগরের মাঝি*; ফররুখ আহমদ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, ১৯৯৫)

ভাষাকে কবিতার জন্য আকৃত করার একটি অনন্য পদ্ধতি হলো ভাষার মণ্ডন– প্রমুখন, সম্মুখন বা সম্মুখাপন ঘটানো। চেক ভাষাবিজ্ঞানী ইয়ান মুকারোভস্কি এবং হাব্রালেকের মতে, 'সাধারণ যোগাযোগ রক্ষার বার্তায় ভাষিক উপাদানগুলি স্বচলিত আর কবিতায় তারা গতি-স্বচলিত। স্বচলনের ভাষিক উপাদানগুলো তাদের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় না, তারা কেবল যোগাযোগ রক্ষা করে। অন্যদিকে মণ্ডিত ভাষিক উপাদানগুলো তার নিজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।' (লেভিন, ১৯৬২, ১৭; সূত্র: মুসা, ১৯৯৪, ১৮১) এ বিষয়ে–কবিতার ভাষা-পদ্ধতি ও সামাজিক সামর্থ্য সম্পর্কে মত প্রকাশ করতে গিয়ে সাহিত্য সমালোচক পবিত্র সরকার প্রসঙ্গত মুকারোভস্কির উদ্ধৃতি টেনেছেন: 'কবিতার ভাষা ভাষার একটা norm থেকে সরে যায়, সরে যায় সৌন্দর্য সৃষ্টির কতকগুলো বিশেষ প্রকরণ সমাধা করার জন্য। স্ট্যান্ডার্ড ভাষাই সে norm– কবিতার ভাষা সেই norm ভাঙ্গে।' (সরকার, ১৯৮৫, ২২) মনে রাখতে হবে– ভাষার মণ্ডন ঘটানো কবিতার একটি লক্ষণ, বাধ্যতামূলক লক্ষণ নয়। তবে, সমাজসচেতন ও প্রখর-ভাষাবোধসম্পন্ন কবি কবিতার ভাষাকে মণ্ডনের দিকে গভীর অভিনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। তাঁর কবিতার আবৃত্তি-যোগ্যতা এবং সমকালীন ও উত্তরকালীন প্রাসঙ্গিকতা তারই প্রমাণ।

রবীন্দ্র-পরবর্তী, রবীন্দ্র-স্বতন্ত্রাভিমুখী সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল ও কাজী নজরুল ইসলাম ১৯১৮-১৯২৬ কালপর্বে ভূগোলের নতুন পথে মধ্যপ্রাচ্যের দিকে অভিযাত্রী হয়েছিলেন। এই মধ্যপ্রাচ্যচেতনা পরবর্তীকালে পরিপুষ্টি লাভ করে ফররুখ আহমদের কবিতায়। কিন্তু বায়ান্ন-উত্তরকালে তাঁর কবিতায় প্রহরান্তের পাশফেরা

লক্ষ্যযোগ্য হয়ে ওঠে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার তিনবছর আগে, ১৯৪৪-এ (আজাদ, ২০০৫, ২৮) বাংলা ভাষাকে সমর্থন করে ফররুখ আহমদ লেখেন :

দুইশো পঁচিশ মুদ্রা যে অবধি হয়েছে বেতন
বাংলাকে তালাক দিয়া উর্দুকেই করিয়াছি নিকা,
বাপান্ত শ্রমের ফলে উড়েছে আশার চামচিকা
উর্দু নীল আভিজাত্যে (জানে তা নিকট বন্ধুগণ)।
('উর্দু বনাম বাংলা': *মাসিক মোহাম্মদী*, জৈষ্ঠ্য ১৩৫২; পরবর্তীকালে *অনুস্বার* গ্রন্থভুক্ত)

*মুহূর্তের কবিতার* (১৯৬৩) সনেট শতকে বিশেষত 'কোকিল', 'ফাল্গুনে', 'বৈশাখী', 'ময়নামতীর মাঠে', 'গাথা ও গান', 'দীউয়ানা মদিনা', 'সোনারগাঁও', 'ধানের কবিতা', 'নদীর দেশ', 'সিলেট স্টেশনে একটি শীতের প্রভাত'– প্রভৃতিতে ফররুখের নব-উদ্বোধন বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য এবং বাংলাদেশ চেতনা প্রবলভাবে আভাসিত।

বিশ শতকের প্রথম তিন দশক বাংলা কাব্যে কতকগুলো মানবিক, সামাজিক এবং শৈল্পিক মূল্যবোধে সংস্থিত হওয়ার যুগ। এই মূল্যবোধসমূহ জীবনচেতনা, সমাজচেতনা, যুগচেতনা, অধিকারচেতনা, শ্রেণীচেতনা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যচেতনা, প্রকৃতিচেতনা, আধ্যাত্মচেতনা, ভোগবাদ, ঐতিহ্যপ্রীতি, নীতি-সজাগতা, আঙ্গিক-সজাগতা, সৌন্দর্যবোধ, আত্ম-উপলব্ধি এবং রুচি ও বৈদগ্ধ্য পরিচর্যা প্রভৃতির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তিরিশের যুগে সূচনা হলো বিদ্রোহের–সাহিত্যের-শিল্পের বিদ্রোহ। মন ও প্রবৃত্তির প্রশ্নাতীত প্রসারণের সময় তখন। এই প্রবণতা অনেক প্রচলিতকে, প্রথাবদ্ধতাকে ভাঙতে; অনেক বিধি-নিষেধ, নীতি-নির্দেশনা লঙ্ঘন করতে ছিল উদগ্রীব। তবে সৌভাগ্যের বিষয় যে, এই বিদ্রোহ-উদ্যম মানবিকতার মৌলিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করে অগ্রসর হতে চায়নি। বস্তুত বাংলা কাব্যের তিরিশ-পরবর্তী সময়কালটা আত্ম-সম্প্রসারণ তাড়নায় বিদ্রোহী হলেও অনেকটা গঠনমূলক। আর এর নিশ্চিত চারিত্র্য লাভ ঘটে চল্লিশের দশকেই। এই পর্যায়ের মূল বৈশিষ্ট্য হলো প্রেক্ষিত-পরম্পর্য-সঞ্চালনা– বিশ্লেষণমূলকতা এবং সর্বাত্মক বিশিষ্টতা। এই কাল-পরিসরে–এই বিশেষ প্রবণতায় ও ঐতিহ্যের ডানায় ফররুখ আহমদের আবির্ভাব ও বিচরণ। 'ঐতিহ্যবোধটা ফররুখ আহমদের মজ্জাগত। ঐতিহ্যবোধে উজ্জীবিত হতে না পারলে ফররুখ আহমদ লিখতেও পারেন না। ঐতিহ্যের জগৎই তার স্বাভাবিক স্বস্তির জগৎ। আরব্য-উপন্যাস, ইরান ও আরবের সংস্কৃতি ও পুরাকথা এবং কোরানে উল্লিখিত কাহিনীর ঐতিহ্য একদিকে এবং অন্যদিকে মুসলিম অভ্যুত্থান যুগের ব্যক্তিত্ব ও ভাবধারার ঐতিহ্য তার কাব্যকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।' (রহমান, ২০০০, ১৩৬)

অবিভক্ত বঙ্গে ক্রমশ 'পাকিস্তান প্রস্তাব' উঠে এলে যে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলটি ভারতবর্ষে মুসলিম চেতনায় ভিন্নমাত্রা তৈরি করলো তা ব্যক্তি-মুসলমান বা সমকালের মুসলিম-মানসকে একটি চেতনায় উদ্বুদ্ধ করলো–যেখানে স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতা কিংবা মর্যাদার বিষয়টি অনুপুঙ্খভাবে জড়িত। কাজী নজরুল ইসলাম মুসলমানদের ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত করেছেন আধুনিক দৃষ্টিচেতনা থেকে। সেখানে জাতিত্বের

পরিচয় বিধৃত থাকলেও সর্বজনীন মানবতাবোধ কিংবা অসাম্প্রদায়িক চেতনাটাই বিশেষরূপে কাজ করেছে। ফররুখ কবি-ভাষাটি নির্মিত হয়েছে একদিকে তিরিশোত্তর কাব্যধারার উত্তরাধিকার হিসাবে–যেখানে প্রেমেন্দ্রমিত্রের ভাবচেতনা কাজ করেছে অন্যদিকে নজরুলীয় রোম্যান্টিকতা–যিনি অনিবার্যরূপে কবিতায় ধারণ করেছেন সমাজ-রূপান্তরের প্রস্তুতি ও যুদ্ধজয়ের স্বপ্নকে। সমকালে ফররুখ আহমদ এভাবেই কাব্যধারায় নিবেদিত ছিলেন। প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই তিনি আত্মস্থ করেছেন বাংলা কবিতার সমকালীন মূলধারা। সমকালীন কাব্যধারা, সমালোচনা, চেতনা-প্রেরণা এবং ফররুখের অবস্থান সম্পর্কে জানতে আবু হেনা মোস্তফা কামালের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করছি :

> "গোলাম মোস্তফা পরামর্শ দিলেন যে নজরুল কাব্যের একটি বিরাট অংশ যেহেতু পাকিস্তানী আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, অতএব নজরুল ইসলামের কবিতাবলির একটি সংশোধিত পাকিস্তানী সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া উচিত। নবীনদের মধ্যে সৈয়দ আলী আহসান আরো একধাপ এগিয়ে বললেন যে, প্রয়োজন হলে রবীন্দ্র-সাহিত্য বর্জন করেই নতুন রাষ্ট্রের সংস্কৃতি পরিকল্পিত হবে। ফররুখ আহমদ কোনো বিতর্কে অংশ নিলেন না। কিন্তু কাব্যের পটভূমি সরিয়ে নিলেন মধ্যপ্রাচ্যে, আর শব্দসম্ভারের সন্ধানে গেলেন দোভাষী পুঁথির বিস্মৃত জগতে। কখনো সেইসব বিষয় ও শব্দ আন্তরিক আবেগের সন্নিপাতে সার্থক কবিতা হয়ে উঠলো, আবার কখনো তা আরোপিত বিশ্বাসের ভার সইতে না-পেরে হারিয়ে গেল মহাসমুদ্রে।" (কামাল, ২০০১, ৩৯৭)

ফররুখ আহমদ চল্লিশের দশকের কবিতাচর্চার ভিতরে যে কবি-স্বীকৃতি লাভ করেছেন তার প্রধান কারণ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যচেতনা। প্রসঙ্গত, সমকালে সামাজিক বা শাস্ত্রীয় অনুশাসনের বৃত্তে ব্যক্তিচেতনা বন্দী ছিল। ইউরোপে রেনেসাঁসের ভিতর দিয়ে এর প্রকাশ ঘটে। বস্তুত রোমান্টিকতার সূত্রপাতও সেখান থেকেই। এর সংজ্ঞার্থ সম্বন্ধে কবি ও সাহিত্য-সমালোচক বুদ্ধদেব বসু বলেছেনঃ 'মানুষের একটি মৌলিক, স্থায়ী ও অবিচ্ছেদ্য চিত্তবৃত্তি–তারই নাম রোমান্টিকতা। যা ব্যক্তি-মানুষকে মুক্তি দান করে, স্বীকার করে নেয়–শুধু ইস্ত্রি-করা এটিকেট-মানা সামাজিক জীবটিকে নয়, নির্ভয়ে মানুষের অবিকল ও সমগ্র ব্যক্তিত্বকে; তার মধ্যে যা-কিছু গোপন, পাপোন্মুখ ও অকথ্য, ঐশ্বরিক ও অনির্বচনীয়– সেই বিশাল স্বতোবিরোধময় বিস্ময়ের সামনে, সন্দেহ নেই, মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তির নামই রোমান্টিকতা।' (বসু, ১৯৯৫, ১৮২) ফররুখ আহমদ এমন কালের মাত্রাকে তাঁর কবিতায় প্রবিষ্ট করতে চেয়েছিলেন। যেখানে তিরিশোত্তর কবিচেতনার অনুসারী হয়েও তিনি প্রবলভাবে আত্মসচেতন হয়ে ওঠেন। সমগ্র বিশ্বের লুক্কায়িত সম্বন্ধগুলোকে আবিষ্কারের জন্য প্রণোদিত হয়ে ওঠেন। এমন আত্মসচেতনতাই তাঁর রোমান্টিক কবিচেতনার উৎসভূমি। তবে, সমকালীন বাস্তবতা ও প্রাসঙ্গিকতার ভিতর দিয়ে তাঁর কবিতাযাত্রা অনেকভাবে ব্যাপক অভিজ্ঞতাকে আত্মস্থ করে অগ্রসর হয়েছে। নিজস্ব বিশ্বাস ও আস্থায় তিনি সবসময় ছিলেন অবিচল। 'চল্লিশের দশক থেকে শুরু করে যে অভিজ্ঞতাকে তিনি

প্রকরণে সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন, সেটা যে কোনো বিশেষ স্বার্থবুদ্ধি কিংবা ধর্মবুদ্ধি থেকে অবশ্যই নয়। যে আধিক্য বা আদর্শবোধটি তাঁর মধ্যে ছিল তা নিজস্ব এবং রোম্যান্টিকতার বিষয়টিও সে মেধাবুদ্ধির ভিতর দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে।... বিশেষ করে যে পরিপ্রেক্ষিতে ফররুখ কবিমানস বিবর্ধিত হয়েছে সেখানে তিনি যখন অনেকভাবে বিভ্রান্ত বা বিশেষ গোষ্ঠীর তকমা কারণে-অকারণে তাঁর ভাগ্যে জুটে গিয়েছিল। এবং এখনও তা অব্যাহত আছে। তবে, সবকিছুর উর্ধ্বে যে তিনি বড় রোম্যান্টিক প্রেরণার কবি, নিরঙ্কুশ আবেগে তিনি যে বাঙালির লৌকিক পরিক্রমার স্রোতধারারই অন্যতম পথিক সেটাতো কিছুতেই ভুললে চলে না।' (ইকবাল, ২০০৮, ১১২-১১৩)

ফররুখের সমকালে এবং উত্তরকালেও আমরা সামাজিক অন্ধকারের প্রহর পার করেছি ও করছি। ডুবে আছি অনুভব এবং জ্ঞানের আঁধারেও। বাস্তবতার অন্তরালে আমরা প্রতিনিয়ত যাপন করছি প্রবলতর বিভ্রান্তি। তিনি এই সত্যের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। 'অন্ধকার' অনুষঙ্গে ফররুখ নির্দেশ করতে চেয়েছেন সামাজিক কৃষ্ণত্ব। তাঁর কবিতায় প্রকৃতি ও প্রেম বর্ণনায় যেমন 'অন্ধকার' বিদ্যমান, তেমনি স্বপ্ন আর বাস্তবতার দ্বন্দ্বের আড়ালে রয়েছে আলোর উদ্বোধনের ইশারা। ইংরাজ শাসনের সমূহ যন্ত্রণা, অপ্রাপ্তি; স্বাধীনতা প্রত্যাশার ব্যাকুলতা আর প্রাপ্তিনেশা তাঁর কবিতাকে আচ্ছন্ন করেছে। তিনি দেখেছেন ক্ষুধা, হতাশা আর নির্মমতার দাগ মুছে নির্মলতা আগমনের আশ্বাস। যেমন :

দু'শো বছরের খেলা। বলে গেল হাড়ের মিছিল
দু'শো বছরের মারীরোগ। সম্পূর্ণ রাখিয়াছিল
অন্তঃসার শূন্য করি। দেরী ছিল চরম পঙ্কিল
আঘাতের।
('পদ্মার ফাটল': *হে বন্য স্বপ্নেরা*)

আপন-ভুবনের আলো-হাওয়ায় বেড়ে ওঠা মানুষের আশাহত হবার বেদনার পরিপ্রেক্ষিতে নির্মিতি পেয়েছে ফররুখের মানবতাবাদ। মানবপ্রেমের কবি তাই এদেশের শ্যামল-নির্মলতায় আঁকতে চেয়েছেন উদাস ক্লান্ত মন্থরতা আর ধেয়ে চলার বিবাদসমূহের হিসাব-নিকাশ। শয়তানের সঙ্গে দ্বন্দ্বে মানুষের জয় যেমন চিরন্তন, তেমনি শোষকের সঙ্গে শোষিতের বিবাদেও শেষত লাভবান ও জয়ী হয় শোষিতরা। ফররুখ লিখেছেন :

আমি চলি ইন্‌সানের শেষহীন সম্ভাবনা নিয়ে।
তোমার সুতিক্ত দ্বন্দ্ব তীব্রতর হোক, তবু জেনো
এখানে মাটির বুকে সর্বশেষ জয় মানুষেরি।
('ইবলিস ও বনি আদম': *কাফেলা*)

পৃথিবীখ্যাত দার্শনিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্লেটোর ছাত্র আরিস্টটল শিল্পের অনুকরণ, কাব্যের উদ্ভব ও বিকাশ, ভাষা ব্যবহার ও ভাষারীতি, কাব্যের সত্য, কাব্য ও ইতিহাসের পার্থক্য, কাব্যের নিজস্ব নিয়ম ও কাব্যের সমালোচনা পদ্ধতি (আরিস্টটল, ২০০২, ১৯) বিষয়ে যে দিগ্বিজয়ী ধারণা প্রচার করে গেছেন তার ধাঁচে ফেলে আমরা যদি ফররুখের কবিতার বিবেচনা করি তাহলে তাঁকে একই সাথে সমকালীন ও

উত্তরকালীন কবি-প্রতিভা হিসাবে চিহ্নিত করা চলে। ঐতিহ্য, সমাজ-বাস্তবতা, ভাষা-প্রকরণ, বিষয়-বৈচিত্র্য ও প্রকাশশৈলী– প্রভৃতিতে ফররুখ অনন্য ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি সত্য ও মিথ্যাকে, সামাজিকতা ও মানবিকতাকে, কাব্যের কাঠামো ও প্রকাশরীতিকে আয়ত্ত্ব করেছিলেন শিল্পের দায় থেকে। আমরা জানি, 'এ বিশ্ব-সভ্যতার তাবত জ্ঞানের যে বিকাশ তার সূত্রগুলো; তার সোপানগুলো থরে থরে নানা প্রতীক আর নানা ধাঁধার আড়ালে সাজানো রয়েছে মিথের গভীরে। পৌরাণিক সেই চরিত্রগুলোর নানা প্রতীকের অন্তরালে লুকোনো সেই অভিজ্ঞানের হদিস যিনি পেয়েছেন মিথের বর্ণাঢ্য কাহিনীগুলো তার কাছে আর নিছক রূপকথা মনে হবে না।' (সুজন, ৭) সেখান থেকে তিনি গ্রহণ করবেন প্রেরণা, শক্তি, সামর্থ্য আর সাফল্য-ব্যর্থতার সমাচার। নিজস্ব ভুবন সাজিয়ে তুলবেন সেই আলোকের প্রভায়। কবি-সাহিত্যিকরা মিথের; ধর্মীয় ও সামাজিক ঐতিহ্যের আর মানব-বিজ্ঞান ও ইতিহাসের উপাদান ব্যবহার করেছেন নানান কৌশলে ও প্রয়োজনে। কবি এজরা পাউন্ড বীরের আদর্শ খুঁজেছিলেন জেফারসন ও হেনরি অ্যাডামসের মধ্যে; ফররুখ আহমদ আরব-বীরদের মধ্যে অনুসন্ধান করেন দুঃসাহসী মুসলমানের প্রতীক। *সিরাজাম মুনিরায়* আরব্যোপন্যাসের জগৎ নয় ইসলামের ইতিহাসচেতনা প্রবল; ত্যাগ, সেবা ও সংযমের আদর্শ কবি খুঁজে পেয়েছেন সিরাজাম মুনিরা, আবু বকর সিদ্দিক, ওমর-দরাজ দিল, ওস্‌মান গনি, আলী হায়দার, গাওছুল আজম, খা'জা নকশ্‌বন্দ, সুলতানুল হিন্দ ও মোজাদ্দিদ আলফেসানীর মধ্যে। ইসলামের সূর্যের রশ্মি সম্পাতিত করার মাধ্যমে দূরীভূত করে দিতে চেয়েছেন মুসলমানদের জীবনের সমূহ অন্ধকার ও অনগ্রসরতা। তাঁর চিন্তার প্রকাশ থেকে খানিকটা পাঠ নিচ্ছি :

> এই নিরন্ধ্র শর্বরীর অন্ধকারে তীব্র দ্যুতি হানি
> তমিস্রা-বিমুক্ত নভে জাগাও নূতন সূর্যোদয়!
> বলিষ্ঠ সিংহের মত শক্তিমান,
> একান্ত নির্ভয়
> জীলান সূর্যের রশ্মি যাক্‌ আজ খররশ্মি দানি।
> ('গাওছুল আজম': *সিরাজাম মুনিরা*)

ফররুখের *আজাদ করো পাকিস্তান* (১৯৪৬) কাব্যগ্রন্থে শোনা যায় পাকিস্তানবাদের যুদ্ধবাদী স্বর: 'সাম্‌নে চল্‌: সাম্‌নে চল্‌/ তৌহেদেরি শান্ত্রী দল/ 'সাম্‌নে চল্ : সাম্‌নে চল্' ('ফৌজের গান')। *অনুস্বার* (রচনা: ১৯৪৪-৪৬) ও *বিসর্গ* (রচনা: ১৯৪৬-১৯৪৮) কাব্যগ্রন্থের সামাজিক বাস্তবতার ধারায় মুখ্য হয়েছে উঠেছে ব্যঙ্গবিদ্রূপ-প্রবণতা। এসব ব্যঙ্গকবিতার কেন্দ্রীয় বিষয় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অসংগতি, ধনতন্ত্র-বিদ্বেষ ও পুঁজিবাদী শোষণের রূপ। পাকিস্তানবাদী সাহিত্যতত্ত্ব অনুযায়ী মুসলমানের মুখের ভাষা অর্থাৎ আরবি-ফারসি-উর্দু মিশ্রিত ভাষায় কাব্য রচনা করেন কবি ফররুখ আহমদ। পুরাণচেতনায় তিনি বেছে নেন পুঁথি ও আরব্যোপন্যাসকে। ছন্দের ক্ষেত্রে মুক্তক অক্ষরবৃত্তে নির্মাণ করেন পাকিস্তানবাদী বাস্তবতার আশা-নীল জগৎ। ইসলামি আদর্শ, মুসলিম ঐতিহ্য ও পাকিস্তানের জাতীয়চেতনার ভিত্তিতে যে

আবেগ কবির মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল, তা সমকালে ছিল অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং উদ্দীপনা-ভরা।

'আধুনিক বাঙলা কবিতার বিষয়বস্তু অ-সীম। জীবন মনন ও মানসের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং পরিচিত যাবতীয় বিষয় তার উপজীব্য।... বাঙলা কবিতা এই স্বতন্ত্র স্বরূপতায় দিনে দিনে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। সে দ্বিধাগ্রস্ত নয়, প্রত্যয়সম্পন্ন; প্রতিধ্বনি নয়, নতুন একটি ধ্বনি। সে নতুনত্ব যেমন বিষয়বৈচিত্র্যে তেমনি প্রকাশরীতিতেও। তার ভাষায় সহজ-সারল্যের চমৎকৃত তীর্যক দীপ্তি, বাক্য-বাক্যাংশ-শব্দ প্রয়োগে ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনার গভীরতা।' (গুরুদাস, ২০০৬, ১০২)– গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকের প্রধানতম কবি ফররুখ আহমদের কবিতার আঙ্গিক-বিবেচনার সময় এই কথাগুলো বিশেষভাবে স্মরণ রাখার প্রয়োজন পড়ে। ভাগ্যবান কবি ফররুখকে খ্যাতির জন্য প্রবীণতার সীমানা ছুঁতে হয়নি কিংবা পেরুতে হয়নি মরণের মহাপ্রাচীর। সমকালে এবং প্রখর তারুণ্যে তিনি ঈর্ষনীয় কবি-স্বীকৃতি ও সাফল্য পেয়েছেন। পাঠকের কাছে, অনুজপ্রতিমদের কাছে তিনি হয়ে উঠতে পেরেছিলেন আদর্শ। ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভায় তিনি সমকালের সকল সাফল্যের বারান্দায় হেঁটেছেন দাপটের সাথে। সাধনা এবং চর্চাতো ছিল তাঁর সার্বক্ষণিক সঙ্গী। তবে, প্রতিভাটা যে বিধাতাপ্রদত্ত, সে কথা অস্বীকার করা চলে না। প্রসঙ্গত, নোবেল বিজয়ী বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথের কথা আমরা এখানে টানতে পারি। সৃষ্টিকর্তার সহানুভূতি যে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন, তা তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। তাঁর প্রতিভা যে 'গড-গিফটেড' তার অনুভব রয়েছে 'গীতাঞ্জলি'র ৫৬ সংখ্যক কবিতায়। তিনি বলছেন : 'তব সিংহাসনের আসন হতে/ এলে তুমি নেমে–/ মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে/ দাঁড়ালে, নাথ, থেমে।' (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৩, ৭৯) কবির বাণীর মধ্য দিয়ে স্রষ্টা যেন নিজেকে প্রচার করে চলেছেন– এমন আভাস পাওয়া যাবে 'গীতাঞ্জলি'র ১০১ সংখ্যক কবিতায়ও: 'আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি/ রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী।/ তারি সাথে, প্রভু, মিলিয়া তোমার প্রীতি/ জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি,/ আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে/ আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।/ হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ।/ কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।' (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৩, ১২৫) এমন অনুভবের প্রবাহে পাঠকের মনে হয়তো প্রশ্ন জাগে– 'পোয়েট' কি 'প্রোফেট'-এর 'নবতর' কোনো প্রতিনিধি? সৃষ্টিকর্তা কি তাহলে কবিদের মাধ্যমে নবীদের বাণী প্রচার করে চলেছেন? মনের গভীরে উঁকে-দেয়া প্রশ্ন হয়তো শেষত নিরুত্তরই থেকে যায়।

*বাঙালি মুসলমানের মন* নামক নিবন্ধগ্রন্থে আহমদ ছফা বলেছিলেনঃ 'মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো হয়তো চর্বিত চর্বণ নয়তো ধর্মীয় পুনর্জাগরণ। এর বাইরে চিন্তা, যুক্তি এবং মনীষার সাহায্যে সামাজিক ডগ্‌মা বা বদ্ধমতসমূহের অসারতা প্রমাণ করেছেন, তেমন লেখক কবি মুসলমান সমাজে আসেননি। বাঙালি মুসলমান সমাজ স্বাধীন চিন্তাকেই সবচেয়ে ভয় করে। তার মনের আদিম সংস্কারগুলো কাটেনি। সে কিছুই গ্রহণ করে না মনের গভীরে। ভাসা ভাসা ভাবে, অনেক কিছুই জানার ভান করে, আসলে তার জানাশোনার পরিধি খুবই

সংকুচিত।... বাঙালি মুসলমান বিমূর্তভাবে চিন্তা করতেই জানে না এবং জানে না এই কথাটি ঢেকে রাখার যাবতীয় প্রয়াসকে তার কৃষ্টি কালচার বলে পরিচিত করতে কুণ্ঠিত হয় না।' (ছফা, ১৯৯৬, ২২-২৩) এ প্রসঙ্গে কথানির্মাতা ও সাহিত্য-বিশ্লেষক হুমায়ুন কবিরের মন্তব্যও প্রায় একই ধরনের। খানিকটা পাঠ নিচ্ছি : 'সাম্প্রতিক বাঙালি মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রায় সকলেই পশ্চাদমুখী এবং নূতনের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রাচীনপন্থী। সাহিত্যের আঙ্গিক নিয়ে নূতন পরীক্ষা করবার উদ্যম তাঁদের নাই, সমাজব্যবস্থার রূপান্তরে নূতন নূতন পরিস্থিতির উদ্ভাবনায়ও তাঁদের কল্পনা বিমুখ।' (কবির, ২০১০, ৬১-৬২)– এখানে বলে রাখা ভালো, উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের মন্তব্য একেবারেই ব্যক্তিগত, পক্ষপাতদুষ্ট এবং খানিকটা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। তথাকথিত প্রগতিশীলতার নামে আমাদের বিদ্বৎসমাজের একটি অংশ সবসময়ই খণ্ডিত মূল্যায়নে এবং বিরূপ সমালোচনায় অভ্যস্ত। বাংলা ভাষায় মুসলমান সাহিত্যিকদের অবদান খুব সরলভাবে বিবেচনায় নিলেও এসব মূল্যায়ন স্রেফ অবমূল্যায়ন বলেই প্রতীয়মান হবে। বিশেষত, কাজী নজরুল ইসলাম, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, হাসান আজিজুল হক, সরদার জয়েনউদ্দীন, শওকত ওসমান, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, আবুল হোসেন, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, শহীদ কাদরী প্রমুখের রচনাপাঠে তাঁদের এইসব মন্তব্য অসাড় বলেই প্রমাণিত হয়।

'কাব্যের আত্মা তার শব্দার্থময় কথা-শরীর নয়, তার বাচ্যের বিশিষ্টতা নয়, তার রচনারীতির চমৎকারিত্ব নয়, অলংকারের সৌকুমার্য নয়। কাব্যের আত্মা এ সবার অতিরিক্ত আনন্দস্বরূপ বস্তু, অর্থাৎ রস।' (গুপ্ত, ২০০৫, ৩৪) নিবিড় পাঠে লক্ষ্য করা যাবে যে, ফররুখের কবিতায় আছে আনন্দধারার অবিরাম প্রবাহ। তিনি লালন করেছেন জাতীয় চেতনা। 'ফররুখের কবিতায় ইসলামের সৌন্দর্য, শক্তি ও অতীত গৌরবের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, মুসলমানদের অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।' (রহমান, ২০০২, ১৪৯) ফররুখের কবিতার তাত্ত্বিক বিবেচনা হয়তো কম হয়েছে। কিন্তু যদি তাঁর কবিতার কাঠামো, সমকালীন ও উত্তরকালীন প্রাসঙ্গিকতা ও গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্ন ওঠে, তাহলে নিশ্চিতভাবে উত্তীর্ণ কবি। কবিতার বিশ্লেষণ আজ আর কেবল সমাজ-পরিসরে সীমাবদ্ধ নয়– এর সাথে যুক্ত হয়েছে বহুবিধ নিরীক্ষা। 'গঠনবাদ, গঠন-উত্তরবাদ, বিনির্মাণবাদ এমন অনেক কোণ থেকে কবিতার আলোচনায় আলো এসে পড়েছে। মনস্তত্ত্ব, সংস্কৃতিবীক্ষা, ভাবনার ইতিহাস, নারীবাদ, মার্কসবাদের নানা স্তর থেকে কবিতার তলশায়ী ভাব-ভাষা ভাসিয়ে তোলার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। তবু বৈদিক উচ্চারণে 'অবয়ব' শব্দটিতে অ স্বরধ্বনিটিই আছে; আর কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি নেই যেন, নিরবয়ব ব্যঞ্জনা আছে, একমাত্র। প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বেকার পাণিনির সময় থেকে ভারতে শব্দবিদ্যা বিজ্ঞান। মানবিকী-বিদ্যায় দীক্ষিত ভাষাবিদ হীনম্মন্যতার বোধ থেকে ভাষাতত্ত্বকে ভাষাবিজ্ঞান আখ্যা দিতে আগ্রহী। ভাষা মানুষের অভিভাবিকা, মানসের মাঝখানে বিকশিত মূর্তিতে তার অধিষ্ঠান স্বাভাবিক।

ভাষার অংশ কবিতা, কবিতা-সমালোচনা ভাষা এবং রীতিরও বিশ্লেষণ। এ-বিশ্লেষণ প্রাচীন ব্যাকরণ-নিরুক্ত ছন্দ-অলংকার নির্ভর নয় শুধু আর, অতিআধুনিক যন্ত্রগণকের উপাত্ত থেকে গৃহীত সিদ্ধান্তও এর অবলম্বনের একক সূত্র নয়।' (ভট্টাচার্য, ২০০৪, ৫) কবিতার বিবেচনায় এখন উত্তর-উপনেশিকতা, বিনির্মাণতত্ত্ব এমনকি ফর্মালিজমও প্রাসঙ্গিক বিষয়। আর আছে সমাজ-ভাষা এবং সমাজ-মনস্তত্ত্বের মতো কঠিন কিছু বিষয়াদিও। তাই, ফররুখের কবিতাকে কেবল ঐতিহ্যের অনুসারী কিংবা নবজাগরণের ডালায় ভরে না রেখে উত্তরকালীন সমালোচনায় পাল্লায় তুলে দেখতে হবে। তাঁর ভাষা ও প্রকরণ, কাঠামো ও পরিবেশনা আমাদের কালে কিভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে রইল, তা হালকাভাবে দেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে ফররুখ-প্রতিভার প্রতি একপ্রকারের অবিচারই করা হয় বৈকি! কোনো কোনো ক্ষেত্রে, তার পরিসীমা কতটুকু তা নিরূপণ না করেও বলা চলে, কবি ফররুখ আহমদের ভাষা, কাঠামো এবং প্রকাশভঙ্গি বর্তমান প্রজন্মের কবিদের কাছে অনুকরণীয় হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন সাহিত্য-সংগঠন ফররুখের চেতনাকে লালন করে চলেছে নীরবে ও প্রকাশ্যে। ফররুখের ভাষা যেন উত্তরকালে একটি প্রজন্মের সাহিত্যভাষার মর্যাদা পেয়েছে। কেননা, 'ভাষা মানুষের মানসিক অ্যাবস্ট্রাক্ট আচরণগুলোকে একটি অর্থময় অবয়ব দিলেও ভাষা কিন্তু একটি সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল সত্তা নয়। মানে ভাষা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, সামাজিক সংগঠন বা বস্তু নিরপেক্ষ নয়।' (উত্তরাধিকার, ২০১২, ৫১)

ফররুখ বাংলা কবিতার এক বাতিঘর। 'ফররুখ আহমদ জীবনের কবি, মানুষের কবি। তাঁর কবিতায় বর্ণিত দেশীয় প্রসঙ্গ ও বিষয়াদি চেতনালেপন ও ভাবনা-প্রকাশের কৌশলে আন্তর্জাতিক। সমকালের প্রবাহ, আঘাত ও আশ্বাস তাঁর কবিতার বিশেষ প্রবণতা। যেন তিনি মানবতা নামক ছাদে দাঁড়িয়ে দেখছেন কবিতা-উঠোনের যাবতীয় নৃত্যকলা আর বর্ণনা তুলে ধরছেন তাঁর আলোকিত কবিতা-সভায়। ফররুখ আহমদ জাতীয় জীবনে এবং কবিতা-ভুবনে ইতিবাচক প্রবণতার কবি। যতদিন পৃথিবীতে সংঘাত-শঙ্কা, আঘাত-সংকট থাকবে আর থাকবে সবকিছু ডিঙিয়ে সম্ভাবনার পথে এগিয়ে যাবার প্রত্যাশা, ততদিন থাকবে ফররুখের কবিতার প্রাসঙ্গিকতা, তাঁর কবিতার আবেদন। তিনি আমাদের জাতীয় সাহিত্যে এক অবশ্য-স্মরণীয় কবি, আমাদের সমস্ত আশাহীনতার পিঠে আশার আশ্বাস বহনের সাধক ও কারিগর।' (সৈকত, ২০০৩, ১০৬)– প্রসঙ্গত ফররুখের দুটি কবিতা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :

> এক.
> হায়রে মানুষ! কভু পথের সন্ধান নাহি পেলে
> চলেছো তো কতকাল চলিবার নাহি হল শেষ
> তবুও বেদনা-শ্রান্ত বেলাশেষে ম্লান আঁখি মেলে
> বলেছ– আমরা যাত্রী আমাদের পথ নিরুদ্দেশ।
> দিগন্তে হারায় পথ স্বপ্ন-শেষ ছায়া দিকে দিকে
> তোমার মুহূর্ত ভিক্ষা 'তারে বাধা দেয় মহাকাল।'
> ('শ্রান্ত': *হে বন্য স্বপ্নেরা*)

দুই.
সাবধান থেক বন্ধু, কেননা সর্বদা হুঁশিয়ার
উপরোক্ত কুলীনেরা কাছেই করেন ঘোরাঘুরি,
সুযোগ সুবিধা মত যথাস্থানে চালাইয়া ছুরি
সর্বদা রাখেন চাল ক্যাপিটালহীন কারবার।
বিশিষ্ট প্রগতিপন্থী এ সকল সাধু মহাত্মার
নৈর্ব্যক্তিক আয়োজনে সৃজিত এ শাসালো চাকুরি
সামান্য ব্লেডেই চলে, লাগে নাকো শাবল হাতুড়ি,
প্রয়োজন মত শুধু সিঁদকাঠি হয় দরকার।
('চোর, জুয়াচোর এবং পকেটমারের দৌরাত্ম্য': *অনুস্বার*)

ইরানের জনপ্রিয় কবি ফখরুদ্দিন ইরাকি তাঁর পাঠককে– সমকালের এবং উত্তরকালের সাহিত্য-সাধকদের ও সমাজ-রূপান্তরের করিগরদের পরামর্শ দিয়েছেন 'অনুভবজ্ঞানে পরিশুদ্ধ' হওয়ার জন্য। পেরুর প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক মারিও ভারগাস য়োসা পরিণত বয়সে বলেছেন– বাম ও ডান পন্থা পরিহার করে জ্ঞানপন্থায় আস্থাশীল হওয়াটা মানুষের জন্য খুব জরুরি প্রসঙ্গ। আমরা যখন ফররুখ-সাহিত্য পাঠ করি তখন বোধহয় অজান্তেই নীরবে কিংবা প্রকাশ্যে নিবিড় অনুভবশক্তি আর জ্ঞানভুবনের আহ্বান শুনতে পাই।

---

**সহায়ক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা:**


১। হায়াৎ মামুদ (সম্পাদিত), *নোবেল-ভাষণ: বাক্ থেকে পামুক* (পাঁচ মহাদেশের দশ সাহিত্যরথী), ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ একুশে বইমেলা ২০০৮
২। ফররুখ আহমদ, (সাক্ষাৎকার) *বই*, সরদার জয়েনউদ্‌দীন সম্পাদিত, ন্যাশনাল বুক সেন্টার, ঢাকা, জুন ১৯৬৮
৩। বিস্তারিত পাঠের জন্য দ্রষ্টব্য: আবদুল মান্নান সৈয়দ, *ফররুখ আহমদ: জীবন ও সাহিত্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠাঃ ৬৪-৬৬
৪। মাহমুদ নাসির জাহাঙ্গীরি, *বাংলাদেশের কবিতা: উত্তরাধিকার ও স্বরূপ* (১৯৫২-১৯৭১), ঐতিহ্য, ঢাকা, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ২০০৪
৫। ফররুখ আহমদ, *ফররুখ আহমদ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড-, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৫; দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৬ (বর্তমান নিবন্ধে ফররুখ আহমদের কবিতার সকল পাঠ উল্লিখিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে।)
৬। মনসুর মুসা সম্পাদিত, *বাঙালীর বাঙলাভাষা চিন্তা*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, প্রকাশকাল জুন ১৯৯৪
৭। পবিত্র সরকার, *গদ্যরীতি পদ্যরীতি*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্রকাশকাল ১৯৮৫
৮। হুমায়ুন আজাদ, *ভাষা-আন্দোলন: সাহিত্যিক পটভূমি*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৫
৯। হাসান হাফিজুর রহমান, *আধুনিক কবি ও কবিতা*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০০০
১০। আবু হেনা মোস্তফা কামাল, 'বাংলাদেশের কবিতা: এক', *আবু হেনা মোস্তফা কামাল রচনাবলী: প্রথম খণ্ড*, আনিসুজ্জামান ও বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রকাশকাল ২০০১

১১। বুদ্ধদেব বসু, *প্রবন্ধ সংকলন*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৯৫
১২। শহীদ ইকবাল, *বাংলাদেশের কবিতার সংকেত ও ধারা*, চিহ্ন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০০৮
১৩। আরিস্টটল, *কাব্যতত্ত্ব*, (অনুবাদঃ শিশিরকুমার দাশ), প্যাপিরাস, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ ২০০২
১৪। সুজন কবির, *মিথ*, ঐতিহ্য, ঢাকা, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ২০০৬
১৫। গুরুদাস ভট্টাচার্য, *সাহিত্যের কথা*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, নবযুগ সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০০৬ (প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৫৯)
১৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতাঞ্জলি*, (ভূমিকাঃ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী) কালান্তর প্রকাশনী, কালান্তর প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৩
১৭। আহমদ ছফা, *বাঙালি মুসলমানের মন*, বুক পয়েন্ট, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬
১৮। হুমায়ুন কবির, *বাঙলার কাব্য*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম শোভা প্রকাশ মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১০
১৯। অতুলচন্দ্র গুপ্ত, *কাব্য-জিজ্ঞাসা*, কল্লোল প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৫
২০। মুহম্মদ মতিউর রহমান, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০২
২১। বীতশোক ভট্টাচার্য, *কবিতার ভাষা, কবিতায় ভাষা*, বাণীশিল্প, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৪
২২। *উত্তরাধিকার* (মাসিক), শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, মুদ্রণকাল মে ২০১২
২৩। ফজলুল হক সৈকত, *কবিতায় সমাজ ও রাষ্ট্র*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ২০১৩

---

[ফররুখ আহমদ-এর ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে 'ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন' আয়োজিত অনুষ্ঠানে পাঠের জন্য রচিত এবং ১৮ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠানে পঠিত।]

# ফররুখের কবিতা 'লাশ' : নয়া ইতিহাসবাদী পাঠ

কে আহমেদ আলম

ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) বাংলা সাহিত্যের একজন শক্তিমান কবি। তাঁকে বিশেষভাবে বলা হয় মুসলিম রেনেসাঁর কবি। কারণ মুসলিম ঐতিহ্য ও পুঁথি সাহিত্য থেকে উপাদান নিয়ে তাঁর কবিতায় নান্দনিকভাবে চিত্রকল্প, প্রতীক ও মিথ নির্মাণ করে বৃটিশ ভারতে অবহেলিত ও নিপীড়িত মুসলমানদের জন্য তিনি মুক্তির স্বপ্ন দেখতেন। পরাধীনতার অন্ধকার রাত পোহার প্রহর গুনতেন। অবশ্যই তিনি সমকালীন যুগ-যন্ত্রণা ও দাবিকে উপেক্ষা করে ইউটোপিয়ান রাজ্যে বসবাসের স্বপ্ন দেখতেন না। দেখতেন না নিছক অতীতের সুখ স্মৃতিকে ধারণ করে রোমান্টিক রাজ্য নির্মাণ করে বসবাস করতে। তিনি ব্যক্তিগত প্রেম, আবেগ ও অনুভূতিকে নিয়ে লিখেছেন অসাধারণ প্রেমের সনেট গ্রন্থ 'দিলরুবা'। তিনি সমকালীন বাস্তব অবস্থাকেও তাঁর কাব্যের উপজীব্য করেছেন। এরকম একটি কবিতা 'লাশ' ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দ বা ১৩৫০ বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষকে বিষয়বস্তু করে অসাধারণ একটি কবিতা লিখেছেন। এ কবিতাটিকে নিছক **New Criticism** (নয়াসমালোচনা তত্ত্ব) বা **Formalism** (আঙ্গিকতাবাদ) এর আলোকে পাঠ করলে কবিতাটির প্রতি সুবিচার নাও হতে পারে। অর্থাৎ নিরপেক্ষ ও নির্মোহভাবে নয় বরং সমকালীন সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কবিতাটি পাঠ করা উচিত। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণকে আমলে নিয়ে কবিতাটি পাঠ করা যথার্থ হবে। কেননা, **"Literary texts cannot be read and understood in isolation"** (তিওয়ারী ও চন্দ্র ৭৯)।

ফরাসি সমাজতত্ত্ববিদ ও তাত্ত্বিক মিশেল ফুকো প্রভাবিত নয়া ইতিহাসবাদ **(New Historicism)** নামে সাহিত্য পাঠ ও বিশ্লেষণের নতুন একটি তাত্ত্বিক পদ্ধতির আবির্ভাব ঘটে ১৯৭০ ও ৮০-এর দশকে। এর মুখ্য ব্যাখ্যাকারী স্টিফেন গ্রীনব্লাটের মতে, সাহিত্যকর্ম হলো সময়, স্থান ও পরিস্থিতির উৎপাদন (তিওয়ারী ও চন্দ্র ৭৯)। আরেক তাত্ত্বিক মনট্রোসের মতে সাহিত্যের টেক্সট হলো সামাজিক তাৎপর্যের আরেকটি রূপ যা সমাজ কর্তৃক উৎপাদিত এবং এটি সংশ্লিষ্ট সমাজের সংস্কৃতিকে নির্মাণ করে (ডোগান ৮০)। পিটার বেরির মতে সাহিত্য ইতিহাসকে প্রতিপালন করে এবং ইতিহাস সাহিত্য কর্ম ও চিত্রকল্প নির্মাণে আলোড়িত ভূমিকা পালন করে (বেরি ১৮০)। আবার ঐতিহাসিক সমালোচনা তত্ত্বের পুরোধা ব্যক্তিত্ব হিপোলাট টাইনের মতে, সাহিত্য যতখানি না লেখকের কল্পনার ফসল তার চাইতে বেশি সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত কর্তৃক সৃষ্ট ফসল। আবার নয়া ইতিহাসবাদের মত সাংস্কৃতিক বস্তুবাদ **(cultural materialism)** হারানো ইতিহাস পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট এবং নির্যাতন ও নিবর্তনের বিভিন্ন কৌশলগুলোকে চিহ্নিত করে। মনট্রোসের দৃঢ়প্রত্যয় হলো **"It [Literature] centers upon the historicity of the text and the textuality of history"** (বেরি, ১৭৯)। অল্পকথায়, সাহিত্য বা টেক্স্ট ইতিহাসকে

গ্রন্থনা করে এবং একই সঙ্গে টেক্সস্টকে ইতিহাসায়ন করে (**Texualising the History and Historicising the Text**)। এটা স্পষ্ট যে, সাহিত্যপাঠের এ দৃষ্টিভঙ্গি নয়া সমালোচনাতত্ত্ব (**New Criticism**) এবং আঙ্গিকতাবাদ (**Formalism**) থেকে স্বতন্ত্র ।

উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ফররুখের সমকালীন প্রেক্ষিত ও কবি-মানস নিয়ে আলোকপাত করা যাক। ১৯৪৩ সালে তৎকালীন বৃটিশ উপনেশবাদী শাসনের অধীনে অবিভক্ত বাংলায় এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়। ১৯৪৩ সালে ফররুখ তখন ২৫ বছরের বুদ্ধিদীপ্ত সচেতন যুবক। এর আগে ১৯৩৯ সালে কলকাতার রিপন কলেজ থেকে আইএ পাস করেন ও পরে স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শন ও ইংরাজিতে স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি হন। ডিগ্রি সমাপ্ত না করে তিনি এম এন রায়ের (প্রখ্যাত মার্কসবাদী সংগঠক ও লেনিনের সহকর্মী) র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম ধারণার সাথে পরিচিত হন ও প্রভাবিত হন। অবশ্য পরে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন ঘটে। ১৯৪২ সালে বিশিষ্ট কামেল অধ্যাপক মওলানা আব্দুল খালেকের সংস্পর্শে এসে তিনি মহানবীর (সাঃ) জীবনাদর্শ ও ইসলামের প্রতি দৃঢ়ভাবে আকৃষ্ট হন এবং তখন থেকেই তাঁর চিন্তাধারায় ইসলাম ও মুসলমানদের উন্নতির বিষয় প্রাধান্য পায়। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি'র কবিতাসমূহ এ সময়েই রচিত হয় (১৯৪২-৪৪)। 'লাশ' কবিতা এ কাব্যগ্রন্থেরই অন্তর্ভুক্ত। ঐ সময় থেকে তিনি বামপন্থী চিন্তাধারা পরিহার করেন এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রকে তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র হিসাবে দেখেন ও এ আন্দোলনকে তিনি সমর্থন করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি প্রিজন অফিসে যোগ দেন ও পরের বছর সিভিল সার্ভিস অফিসে যোগ দেন। আবার ১৯৪৫ সালে মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। (বাংলাপেডিয়া) সুতরাং এটা সহজে অনুমেয় যে, ফররুখের কবি-মানস সচেতন ও সমকালীন পরিস্থিতির প্রগাঢ় পর্যবেক্ষক। টাইসন যথার্থই বলেছেন, **"Our subjectivity of selfhood is shaped by and shapes the culture into which we were born (284)."**

বলা প্রাসঙ্গিক, ১৯৪৩ সালের ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ বা পঞ্চাশের মন্বন্তরকে উপজীব্য করে বিভূতিভূষণ তাঁর উপন্যাস 'অশনি সংকেত' লেখেন, পরবর্তীতে সত্যজিৎ রায় সেটাকে একই শিরোনামে সিনেমায় রূপান্তর করেন। বামপন্থী কবি সুকান্ত মুখোপাধ্যায়ও দুর্ভিক্ষ নিয়ে তাঁর বিখ্যাত 'আকাল' কবিতা রচনা করেন। দুর্ভিক্ষ নিয়ে আঁকা শিল্পাচার্য জয়নুল আবদীনের ছবি সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে। আরো কবি-শিল্পীর সৃষ্টিতে দুর্ভিক্ষ বিশেষ গুরুত্ব পায়। অমর্ত্য সেনও মন্বন্তর সম্পর্কে লিখেছেন। তাঁর মতে এটি হল **"man-made famine"** অর্থাৎ এ দুর্ভিক্ষটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে সংঘটিত হয়নি। বরং বৃটিশ উপনিবেশবাদী অপশাসন ও শোষণের কারণে এ দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, অবিভক্ত বাংলা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় চার লাখ মানুষ অনাহার, অপুষ্টি ও দুর্ভিক্ষে করুণ মৃত্যুবরণ করেন। এটা ছিল বৈশ্বিকভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময় (১৯৩৯-৪৫)।

এ প্রেক্ষাপটকে সামনে নিয়ে নয়া ইতিহাসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ফররুখের 'লাশ' কবিতাটি বিশ্লেষণ করা সঙ্গত হবে। 'লাশ' কবিতাটির প্রথম স্তবকে বলা হয়েছে "সেখানে পথের পাশে মুখ গুঁজে পড়ে আছে জমিনের 'পর"। সেখানে পথের পাশে বলতে কলকাতা নগরের রাজপথকে বিশেষভাবে বোঝানো হয়েছে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের শুরুতে গ্রামীণ জনতা শহরে বন্দরে ভিড় করে খাদ্যের সন্ধানে। খাদ্যের সন্ধানে ছুটে আসে শহরে। প্রথমে শহরের নাগরিকেরা তাদের সহায়তা করলেও পরে তাদের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। কলকাতার ফুটপাতে দেখা যায় অনাহারে মৃত মানুষের লাশের মিছিল। এ প্রেক্ষাপটটি কবিতা নির্মাণের জন্য ভূমিকা পালন করেছে। ফররুখ কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে বলেছেন,"জানি মানুষের লাশ মুখ গুঁজে প'ড়ে আছে ধরণীর 'পর/ ক্ষুধিত অসাড় তনু বত্রিশ নাড়ীর তাপে প'ড়ে আছে"। কিন্তু এ লাশের সারিকে উপেক্ষা করে "পাশ দিয়ে চলে যায় সজ্জিত পিশাচ, নারী নর"।

এ নারী ও নর কারা? এদের কোন সংবেদনশীলতা নেই এসব নিপীড়িত মানুষের প্রতি। এরা হলেন শহুরে ধনিক, বণিক, মুৎসুদ্দি, বুর্জোয়া ও ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা সুবিধাভোগীরা। এদের মনোরঞ্জনের জন্য "সজ্জিতা নিপুণা নটী বারাঙ্গনা খুলিয়াছে দ্বার/ মধুর ভাষণে"। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে দুর্ভিক্ষের সময়ে ঔপনিবেশিক শাসক, প্রশাসক ও তাদের সহযোগীদের বিনোদনের জন্য নগরীতে নারী ব্যবসা ছিল রমরমা। মক্ষিরাণীরা বসিয়েছে তাদের পশরা। অভাবের তাড়নায় ক্ষুধার্ত নারীরা জীবনধারণের প্রয়োজনে নিজ ঘর-সংসার পরিত্যাগ করে  ইজ্জত-সম্ভ্রম বিক্রি করে প্রকাশ দিবালোকে রাজপথে তারা দেহের পশরা সাজিয়েছে। একদিকে বিনোদন, আরেকদিকে বিপন্ন, ক্ষুধিত, বঞ্চিত, নিরন্ন মানুষের লাশে পরিণত হওয়া। ইতিহাসের এ নির্মম বাস্তবতাকে ফররুখ তাঁর কবিতায় নান্দনিকভাবে **extualisation** করেছেন। তিনি লিখেছেন, "পৃথিবী চষিছে কারা শোষণে, শাসনে/ সাক্ষ্য তার রাজপথে জমিনের 'পর/ সাড়ে তিন হাত হাড় রচিতেছে মানুষের অন্তিম কবর"। কবি এখানে উপনিবেশবাদী শাসকদের কথা বলেছেন, তাদের নির্মম শোষণের কথা বলেছেন। আর এ শোষণের ফলশ্রুতিতে অসংখ্য প্রাণহানির কথা বলেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম হোতা তৎকালিন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ও তাঁর সহযোগীরা পৃথিবীকে শাসন করেছিলেন, শোষণ করেছিলেন দোর্দণ্ড-প্রতাপে। তিনি এ দুর্ভিক্ষের পক্ষে নির্লজ্জভাবে সাফাই গেয়েছেন। তাঁর মতে এদেশীদের জন্ম হয় খরগোশ প্রজননের মত **(breed like rabbit). "I hate Indians. They are a beastly people with a beastly religion." (Shashi Tharoor, "The Ugly Briton").** উপনিশবাদীদের কাছে উপনিবেশিতরা হলো **other (Said, Orientalism).** সুতরাং তাদের জীবন, জীবিকা ও অস্তিত্বের প্রশ্ন উপনিবেশবাদীদের কাছে গৌণ। শুধু তাদের দায়িত্ব হল **"To civilize (?) the native "**।

কবি যথার্থ অনুধাবন করেছেন নিরন্ন মানুষদের মৃত্যু গোটা মানবতার মৃত্যু। ঔপনিবেশকদের মনুষ্যবোধের মৃত্যু। কবি লিখেছেন, "পড়ে আছে মৃত

মানবতা/তারি সাথে পথে মুখ গুঁজে।" আজ উদারতার আকাশ চার্চিলের মত উপনেশবাদীদের দাম্ভিকতায় যেন অদৃশ্য হচ্ছে। ফররুখের চিত্রকল্পটি অসাধারণ: "আকাশ অদৃশ্য হ'ল দাম্ভিকের খিলানে, গম্বুজে/নিত্য স্ফীতোদর"।

ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী শাসন ও শোষণ শুরুর পূর্বে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ হতো অনাবৃষ্টি ও খরার কারণে। দেশীয় শাসকদের তরিত ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে বিপর্যয়কর অবস্থা থেকে মানুষ মুক্তি পেত। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকদের নির্মম ও নির্দয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ফলে দেশীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে যায়। ড. গিডিওন পলিয়ার মতে ব্রিটিশ শাসনামলে প্রায় দু' ডজন দুর্ভিক্ষের কবলে ভারতবর্ষ নিপতিত হয়। ১৭৭০ এর মন্বন্তরে বাংলার এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ১ কোটি মানুষ খাদ্যাভাবে মৃত্যুবরণ করেন। এছাড়াও ১৭৮৩, ১৮৬৬, ১৮৭৩-৭৪, ১৮৯২, ১৮৯৭ ও ১৯৪৩-৪৪ সালে দূর্ভিক্ষের স্মৃতি এখনও এদেশের বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিক ও ইতিহাস-সচেতন মানুষের নিকট দুঃস্বপ্নের স্মৃতি হয়ে আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান কর্তৃক বার্মাসহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া দখলের ফলে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী প্রশাসকের গৃহীত কৌশলের কারণে অবিভক্ত বাংলায় খাদ্যের অভাব প্রকট রূপ ধারণ করে। বার্মা থেকে চাল আমদানি বন্ধ ও এ দেশে মাড়ওয়ারী মওজুদদার ও অতিরিক্ত মুনাফাখোরদের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণহীনতা দুর্ভিক্ষকে আরও বেশি ভয়াবহ করে তোলে। ঢাকায় ১৯৪৩ এর মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত চালের মূল্য চারগুণ বৃদ্ধি পায়। ফলে বাংলার ভূমিহীন কৃষকদের ৩০ শতাংশ অনাহারে মারা যান।

জাপানী দখলদারিত্ব ঠেকানোর জন্য বাংলার নৌপথকে অকার্যকর করা হয়। হাজার হাজার নৌযানকে বিনষ্ট অথবা অধিগ্রহণ করে ব্রিটিশ প্রশাসক। ফলে চাল পরিবহন কার্যত বন্ধ হয়ে পড়ে। তাছাড়াও বাংলার কোন কোন অঞ্চলের উদ্বৃত্ত উৎপাদিত চালকে সরকার জব্দ করে রাজবন্দীকে অভাবমুক্ত রাখার প্রচেষ্টা, সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্য মওজুদ ও ১৯৪১ সালে গৃহীত নীতিমালার কারণে অন্য প্রদেশ থেকে চাল রফতানি বন্ধ-এ সব কারণে বাংলায় ১৩৫০ বঙ্গাব্দে দুর্ভিক্ষ বা পঞ্চাশের মন্বন্তর সংঘটিত হয়। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন ভূমিহীন কৃষক ও জেলে সম্প্রদায়। নিরন্ন মানুষ কলকাতা নগরীতে ভিড় জমান। ফুটপাথে মারা যান হাজার হাজার মানুষ। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ১৯৪৩ এর শেষের দিকে নিরন্ন অসহায় মানুষদের শহর থেকে তাড়িয়ে দেয়। দৃশ্যের অন্তরালে কতশত মানুষ সেদিন মারা গিয়েছিল- যারা কলকাতায় নাগরিকদের কাছে শুধু ফ্যানটুকু চেয়েছিল- ভাত নয়। কবি ফররুখ ঠিকই দেখেছিলেন, "এখানে মাটিতে এরা মুখ গুঁজে মরিতেছে ধরণীর পর!"

লিনলিথগৌ, জন হার্বাট, ওয়াভেল, চার্চিল, রুজভেল্ট গং শাশ্বত মানব সত্তাকে ভূলুণ্ঠিত করে "মানুষের প্রাপ্য অধিকার,/ক্ষুধিত মুখের গ্রাস কেড়ে নেয় রুধিয়া দুয়ার,/ মানুষের হাড় দিয়ে তারা আজ গড়ে খেলা ঘর।" বাংলার নিরন্ন মানুষের জন্য সেদিন বিশ্বযুদ্ধে উন্মত্ত সাম্রাজ্যবাদী নেতৃত্বের কাছে সুভাষ বোস প্রস্তাব দিয়েছিলেন, বার্মা থেকে তিনি পাঠাতে চান ১০০,০০০ টন চাল। তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখাত হয়েছিল।

কারণ সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের উদর স্ফীত করার মহান ব্রত নিয়ে তাদের সভ্যতার (?) নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ফররুখ তাদের এক হাত নিয়েছিলেন এভাবে ঃ "স্ফীতোদর বর্বর সভ্যতা-/ এ পাশবিকতা,/ শতাব্দীর ক্রূরতম এই অভিশাপ/ বিষাইছে দিনের পৃথিবী;/ রাত্রির আকাশ।" সত্যি, এ সভ্যতার আবেক নাম বর্বতা, পাশবিকতা ও নিষ্ঠুর অভিশাপ। এ তথাকথিত সভ্যতা জল-স্থল-অন্তরীক্ষের জন্য ভয়ংকর। নিঃসন্দেহে কবি সাহসিকতার সঙ্গে এর নেতৃত্বকে ইবলিস ও আজাজিলের সাথে একাত্ম করে নান্দনিক উৎপ্রেক্ষা নির্মাণ করেছেন।

এর পরের চারটি স্তবকে কবি সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার ব্যবচ্ছেদ করেছেন। ভোগবাদই হচ্ছে এ সভ্যতার প্রাণ। এ সভ্যতার ধারকবাহকেরাই সভ্যতার দাস- "যাদের পায়ের চাপে ডুকুরিয়া কেঁদে ওঠে পৃথিবী, আকাশ /.../ তাদের সমগ্র সত্তা পশুদের মাঝে চলে মিশে!" কবি শেষ স্তবকে এ সভ্যতার পরিচয় পুনরুল্লেখ করেছেন। এ সভ্যতা জড় সভ্যতা- বস্তুবাদী সভ্যতা, ভোগবাদী সভ্যতা যা ইলিয়টের ভাষায় **"Waste Land"**। এ সংবেদনহীন, আত্মাহীন সভ্যতার বৈশিষ্ট্য হলো শোষণ- "মৃত- সভ্যতার দাস স্ফীতোমেদ শোষক সমাজ!"। যে সমাজ উপহার দেয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, বিপন্ন অসহায় নারীদেরকে কামাতুর নরপশুদের লালসার বস্তুতে পরিণত করে আর ক্ষুধিত নিরন্ন মানুষকে পরিণত করে লাশে।

কবিতাটির শেষে কবি যুগপৎভাবে আশাবাদী ও প্রতিবাদী। কবি টেনিসন তাঁর **"Locksley Hall"** কবিতার **Uniersal law** বা শাশ্বত বিধানের স্বপ্ন দেখেছেন যার মাধ্যমে পৃথিবী বস্তুবাদ, ভোগবাদ ও মানতাবিধ্বংসী যুদ্ধ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে শান্তি র কোলে আশ্রয় নেবে। কিন্তু সে বিধান বা সুদিনের তিনি পরিষ্কার ব্যাখ্যা দেননি। সেটা কী যীশুর দ্বিতীয় আগমন, সর্বহারাদের রাজ না জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণা? একইভাবে ফররুখও সুদিনের প্রত্যাশী: "তারপর আসিলে সময় / বিশ্বময় / তোমার শৃঙ্খলগত মাংসপিণ্ডে পদাঘাত হানি/ নিয়ে যাব জাহান্নামের দ্বার-প্রান্তে টানি"। সে 'সময়/ বিশ্বময়' কী কমিউনিজমের আদর্শে সর্বহারাদের রাজ, র‍্যাডিকাল হিউমানিজমের উত্থান না প্যান-ইসলামিজম প্রতিষ্ঠা? কিন্তু এটা তো সত্যি, প্রতিবাদী কবি এ শোষক উপনিবেশবাদী সভ্যতাকে শৃংখলে বন্দী করতে চান, পদাঘাত করতে চান, চান সেটার চরম ভয়ঙ্কর পরিণতি।

টেনিসন সভ্যতার (?) প্রতি অভিশাপ বাণী উচ্চারণ করেছেন :

**"Cursed be the social wants that sin against the strength of youth!**

**Cursed be the social lies that warp us from the living truth!**

**Cursed be the sickly forms that err from honest Nature's rule!**

**Cursed be the gold that gilds the straiten'd forehead of the fool!**

ফররুখের অভিশাপ উচ্চারিত হচ্ছে এভাবে: "আজ এই উৎপীড়িত মৃত্যুদীর্ণ নিখিলের অভিশাপ বত্তঃ/ ধ্বংস হও/ তুমি ধ্বংস হও।"

কবিতা নির্মাণের প্রেক্ষাপটকে গৌণ বিবেচনা করে কবিতাটির নিগূঢ় পাঠ করে চিত্রকল্প, প্রতীক ও উৎপ্রেক্ষার তাৎপর্য আবিষ্কার করা-এটি কবিতার অর্থ অনুধাবনকে সীমায়িত করে। এজন্য নয়া ইতিহাসবাদী পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ বিশ্লেষণে আমরা দেখি কবি কবিতাটিতে উপনিবেশবাদীদের মুখোশ যেভাবে উন্মোচন করেছেন, তা ইতিহাস গ্রন্থের পক্ষেও সহজসাধ্য নয়। সংক্ষেপে বলা যায়, কবিতাটিতে বস্তুবাদী সভ্যতার স্বরূপ ও তার সৃষ্ট দুর্ভিক্ষকে কাব্যিক ইতিহাসায়ন করেছেন কবি শৈল্পিকভাবেই। এটি সত্যিই **"Historicity of text ও textuality of History"** এর নিখুঁত উপস্থাপনা।

তাই 'লাশ' কবিতাটিতে শুধু বাংলা সাহিত্যের নয়, বিশ্ব সাহিত্যের এক অনবদ্য সৃষ্টি। ◈

---

**লেখক পরিচিত** : নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এর ইরাজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও পিএইচডি গবেষক Email: kahmedalamnub@gmail.com

**সহায়ক সূত্র :**

১. আহমদ, ফররুখ। 'লাশ' বাংলাপেডিয়া

2. **Barry, Peter. Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory. Manchester & New York: Manchester University Press, 1995.**

3. **Doğan, Evrim. "New Historicism and Renaissance Culture", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 45,1 :2005. 10 May 2012 <dergiler.ankara.edu.tr/ dergiler/26/1257/144 61.pdf>**

4. **Polya, Gideon. "The Forgotten Holocaust- The 1943/ 45 Bengal Famine". Website.**

5. **Tennyson, Alfred. "Locksley Hall"**

6. **Tyson, Lois. Critical Theory Today: A User-Friendly Guide .NY: Routledge, 2006.**

7. **Tiwary, N. and Chandra, N.D.R. "New Historicism and Arundhati Roy's Works". Journal of Literature, Culture and Media Studies Number 1 Summer June 2009.**

8. **<www.inflibnet.ac.in/ojs/index.php/JLCMS/article/view/8/7 >**

9. **Said, Edward. Orientalism. New Delhi: Penguin, 1995.**

**Tharoor, Shashi. "The Ugly Briton", Time. Nov. 29, 2010.**

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিক, ছাব্বিশতম সংকলন, জুন-২০১৪]

# ফররুখ কাব্যে ইসলামী ঐতিহ্য

## মুহাম্মদ বিনী আমীন ফেরদৌস

পৃথিবীর সব বড় কবিই কোনো-না-কোন এক ঐতিহ্যের অনুসারী। 'হোমার, গেটে্য, মিল্টন, শেক্সপীয়র, টি.এস.এলিয়ট, শেখ সাদী, রুমী, জামী, খৈয়াম, ফেরদৌসী, ইকবাল, সবাই স্ব-স্ব ঐতিহ্যের অনুসারী।'[১] বাংলা সাহিত্যের বড় কবি মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), কায়কোবাদ (১৮৮৫-১৯৫২), শাহাদত হোসেন (১৮৯৪-১৯৫৩), গোলাম মোস্তফা (১৮৯৫-১৯৬৪), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬), ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) এঁরা সবাই নিজ নিজ ঐতিহ্য অনুসরণ করে কবিতা লিখে বড় কবির মর্যাদা লাভ করেছেন। বরীন্দ্রনাথ বেদ-উপনিষদের চিন্তা, দর্শন ও শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সাহিত্যচর্চা করেছেন।[২] জীবনানন্দ দাশও প্রাচীন ভারতের হিন্দু-দর্শন, ইতিহাস, স্থাপত্য থেকে অনুপ্রেরণা ও উপাদান সংগ্রহ করে তাঁর কাব্যের মায়াবী ভুবন রচনা করেছেন। অপরদিকে মহাকবি কায়কোবাদ, শাহাদত হোসেন, গোলাম মোস্তফা, কাজী নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্‌দীন এঁরা ছিলেন ইসলাম ও মুসলিম ঐতিহ্যের কবি। এঁদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম কাব্য-কবিতা-গানের মাধ্যমে ঘুমন্ত ও অধঃপতিত মুসলিম জাতিকে জাগিয়ে তোলেন। জসীমউদ্‌দীন গ্রাম-বাংলার সাধারণ আটপৌরে জীবন, ফররুখ আহমদ মুসলিম ঐতিহ্যমণ্ডিত পুঁথি সাহিত্যের কাহিনী গাঁথা ও লোক-ভাষার সমন্বয়ে আধুনিক অথচ ভিন্ন স্বাদের রসগ্রাহী কাব্য রচনা করেছেন।[৩] ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যেমন নিষ্ঠার সাথে ইসলামের অনুসরণ করেছেন, কবিতা রচনার ক্ষেত্রেও তেমনি পুরাপুরি ইসলামী ভাব, আদর্শ ও ঐতিহ্যের ঘনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। কথায় এবং কাজে, চিন্তা ও অনুশীলনে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন। মনে-প্রাণে তিনি ইসলামী আদর্শ ঐতিহ্যের অনুসারী এক কালজয়ী কবি প্রতিভা। তাঁর অধিকাংশ কাব্যের উপজীব্য বিষয় ইসলামী আদর্শ, ভাবধারা ও ঐতিহ্য। ইসলামী ঐতিহ্য-কৃষ্টি-সভ্যতা ও মূল্যবোধকে তিনি বাংলা কবিতায় নতুন আঙ্গিকে ও ঐশ্বর্যে রূপদান করেছেন। বর্তমান নিবন্ধে ফররুখ আহমদের সংক্ষিপ্ত পরিচিত, সাহিত্যকর্ম ও ইসলামী ঐতিহ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

**ক. জন্ম ও বংশ পরিচিতি :** বৃহত্তর যশোর জেলার (বর্তমান মাগুরা জেলার) মধুমতী নদীর তীরে মাঝআইল গ্রামে এক অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯১৮ খ্রি. ১০ জুন ফররুখ আহমদ জন্মগ্রহণ করে। পিতার নাম সৈয়দ হাতেম আলী। তিনি খান সাহেব[৪] নামে খ্যাত ছিলেন। মায়ের নাম বেগম রওশন আখতার।

পিতামহ সৈয়দ আব্বাস আলী। পিতৃদত্ত নাম সৈয়দ ফররুখ আহমদ।[৫] দাদীমা তাঁকে আদর করে রমজান[৬] বলে ডাকতেন।

**খ. শিক্ষা ও কর্মজীবন :** যশোর জেলার মাঝআইল গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষা সমাপ্ত করে ফররুখ কলকাতা মডেল এম.ই স্কুলে ভর্তি হন। মডেল এম.ই. স্কুলটি কলকাতার তালতলা এলাকায় ইউরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেন-এ এক বিরাট জমিদার বাড়িতে অবস্থিত ছিল।[৭] মডেল এম.ই স্কুল থেকে পঞ্চম শ্রেণী পাস করে ফররুখ ভর্তি হন কলকাতা বালিগঞ্জ হাইস্কুলে। বালিগঞ্জ স্কুলে লেখাপড়া করলেও ফররুখ ১৯৩৭ খ্রি. খুলনা জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবুল ফজল ও কবি আবুল হাশেম ছিলেন তাঁর শিক্ষক। স্কুল জীবনেই কবি এ সকল মনীষীদের কাছ থেকে সাহিত্য সৃষ্টির উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করেন।[৮] ১৯৩৯ খ্রি. ফররুখ কলকাতা রিপন কলেজ থেকে আই.এ. পাস করেন। এরপর তিনি প্রথমে দর্শন ও পরে ইংরাজিতে অনার্স নিয়ে কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ ও পরে সিটি কলেজে ভর্তি হন।[৯] পরবর্তীতে বি.এ পরীক্ষা দিতে পারেননি।

জীবিকান্বেষণের জন্য কবি বিভিন্ন চাকরিতে যোগদান করেন। কিন্তু সবগুলোই অস্থায়ী। ১৯৪৩ খ্রি. কলকাতার আই.জি প্রিজন অফিসে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৪৪ খ্রি. সিভিল সাপ্লাইতে, ১৯৪৫ খ্রি. 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এবং ১৯৪৬ খ্রি. জলপাইগুড়িতে একটি প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করেন।[১০] ১৯৪৮ খ্রি. শেষের দিকে তিনি ঢাকায় এসে প্রথমে অনিয়মিত (১৯৪৮) ও পরে নিয়মিত (১৯৫২) আর্টিস্ট বা নিজস্ব শিল্পী হিসাবে ঢাকা বেতারে যোগদান করেন। বেতারের স্টাফ আর্টিস্ট হিসাবে ফররুখ আহমদ দীর্ঘদিন ছোটদের আসর 'কিশোর মজলিস' পরিচালনাসহ বিভিন্ন সাহিত্য আসর পরিচালনা করেছেন।[১১] বেতারের প্রয়োজনে তিনি অসংখ্য গান, কবিতা, নাটিকা, শিশুতোষ রচনা, গীতিনাট্য, গীতিবিচিত্রা ইত্যাদি লিখেছেন। আমৃত্যু তিনি এ চাকরিতে বহাল ছিলেন। ১৯ অক্টোবর, (২৭ রমজান) ১৯৭৪ খ্রি. শনিবার ঢাকার ইস্কাটন গার্ডেনে তিনি ইন্তেকাল করেন।[১২]

**গ. সাহিত্যকর্ম ও রচনাবলী :** ফররুখ আহমদের সাহিত্যজীবনকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এক. কলকাতায়, দুই. ঢাকায়। অবশ্য তাঁর মধ্যে সাহিত্যের বীজ গ্রথিত হয়েছে শৈশবেই। এ সম্পর্কে আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেন : "শৈশবে দাদীর কাছে ফররুখ আহমদ শুনতেন 'পুঁথির কাহিনী' 'তাজকিরাতুল আউলিয়া' এবং 'কাসাসুল আম্বিয়া'।"[১৩]

কিন্তু গ্রামে যা তিনি পাননি, তা পেলেন কলকাতায়, সাহিত্য জগতের দুয়ার খুলে গেল। স্কুলে পড়তেই কবিতা লেখা শুরু করেন। তিনি বালিগঞ্জ স্কুলে পড়া অবস্থায়

বিকালে দিলকুশা পাবলিক লাইব্রেরিতে বই পড়তে যেতেন, সাহিত্যালোচনা করতেন। নিরালায় দরাজ কণ্ঠে আবৃত্তি করতেন শেলি, কীটস ও নজরুলের কবিতা।[১৪] খুলনা জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে ফররুখ আহমদ কলকাতা পড়তে যান। আর এখান থেকেই ফররুখ সত্যিকারভাবে সাহিত্যে আত্মনিয়োগ করেন।[১৫] ফররুখ আহমদ রচিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা মোট ৫২টি।[১৬] তন্মধ্যে প্রকাশিত ৩৩, অপ্রকাশিত ১৯টি গ্রন্থ।

**ফররুখ কাব্যে ইসলামী ঐতিহ্য :** ক. মহৎ বা কালজয়ী কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী তাঁদের ব্যক্তিগত অনুভূতির মধ্যে সমষ্টিগত জীবন-ব্যঞ্জনার অভিব্যক্তি ঘটান। সমকালীন জীবন অভিজ্ঞতার মধ্যে তাঁরা যুগচিত্ত বা যুগধারাকে উপলব্ধি করেন। বর্তমানটাই নয় বহু যুগের দীর্ঘ বিস্তৃত অতীতের অভিজ্ঞতা, সাধনা, সংগ্রাম ও অর্জনের উপর বর্তমানের চিরচঞ্চল ভিত সংস্থাপিত। আজ যা বর্তমান, কাল তা অতীত। এভাবে আমাদের জীবন-অভিজ্ঞতা গড়িয়ে চলছে অন্তহীন ভবিষ্যতের দিকে। ভবিষ্যতও প্রতিনিয়ত তার অবগুণ্ঠন মুক্ত করে দিয়ে বর্তমান হয়ে অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এ চিরায়ত মহাকাল সর্বব্যাপী সবকিছুকে ধারণ করে আছে।

এ মহাকালের অনন্ত বিস্তার ও অভিজ্ঞতাকে বলা যায় ঐতিহ্য।[১৭] মানুষ যেমন তাঁর নিজেকে অস্বীকার করতে পারে না, ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা তেমনি দুঃসাধ্য। এ সম্পর্কে ইংরাজ সমালোচক Sampson এর উক্তিটি উল্লেখযোগ্য,[১৮] তিনি বলেন : "An artist of the first rank accepts tradition and enriches it, an artist of the lower rank accepts traditions and repears it, an artist of the lower rank reject tradition and strives for originality." "অর্থাৎ প্রথম সারির শিল্পীরা ঐতিহ্যকে গ্রহণ করেন ও তাকে সমৃদ্ধ করে তোলেন, দ্বিতীয় সারির শিল্পীরা ঐতিহ্য গ্রহণ ও তার পুনরাবৃত্তি করেন এবং তৃতীয় সারি অর্থাৎ নিম্নস্তরের শিল্পীরা ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে নিজেদের মৌলিকত্ব বিকাশে যত্নবান হন।[১৯] তাই দেখা যায় সবদেশের সবযুগের সব বড় কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীই কোনো-না-কোনো ঐতিহ্যের শুধু অনুসারীই নয় বরং নিজ ঐতিহ্য থেকে অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করে তাঁরা তাদের অমর সৃষ্টিকর্মে ব্রতী হয়েছেন।

**খ. ফররুখ কাব্যে ইসলামী ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপট ঃ**

সাহিত্যের ঐতিহ্য প্রধানত তার ভাষা ও বিষয়ে। কাব্যের বিষয় ও ভাব গৃহীত হয় মূলত: কবির মানস গঠন চিন্তা ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার থেকে। বাংলা কাব্যে ইসলামী প্রভাব লক্ষ্য করা যায় এভাবেই। মুসলিম কবিরা শুধু বাংলা ভাষার ঐতিহ্যকেই গ্রহণ করেননি, কাব্যক্ষেত্রে বিষয়ের স্বাতন্ত্র্যকেও স্বীকার করে নিয়েছেন। পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার বহুকাল আগে থেকেই আরব বণিক ও পীর আওলিয়াদের মারফত ইসলামের প্রচার শুরু হয়। বহু সুফী সাধকের

উন্নত চরিত্র ও কারামত দেখে এদেশের অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করেন। শেখ জালাল উদ্দিন তাবরিজী, হযরত শাহজালাল, মুজররই-য়্যমনী, হযরত নূর, কুতুবে আলম ও মাওলানা কেরামত আলী, এ চারজন ধর্মীয় নেতার ভূমিকা এদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।[২০] তাদের কর্মক্ষেত্র পূর্ব-পাকিস্তান, অথচ পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। ফলে দেশের এ দুই অবিচ্ছেদ্য অংশের মধ্যে একটি সাধারণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গঠনে স্বভাবতই তাদের ভূমিকা ছিল প্রভূত গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী।[২১] এর ধারাবাহিকতায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ইসলামী ঐতিহ্যের অনুপ্রবেশ।

ইসলামের ধর্মীয় আদর্শ ও মুসলিম সংস্কৃতির হাত ধরে বাংলা কাব্যে ইসলামী ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটে। শুধু রাজনৈতিক কারণে নয়, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কারণে স্বভাবতই কাব্যক্ষেত্রে মুসলিম কবিরা ইসলামী ঐতিহ্য ব্যবহারে প্রবৃত্ত হন। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের বিষয় বিবর্তন ও রূপনীতির পরিবর্তনে মুসলিম কবিদের ভূমিকা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক পরিবর্তনের পটভূমিতে সাহিত্যের বিবর্তন সাধিত হয়েছে। সাহিত্যের বিবর্তনে মোড়ে মোড়ে আমরা যে মুসলিম মানসিকতার দীপানন লক্ষ্য করি, তারই বিচ্ছুরিত জ্যোতি ছড়িয়ে আছে সমগ্র বাংলা সাহিত্যে। বাংলা পুঁথি-সাহিত্যের প্রাচীনতম মুসলিম কবি শাহ মুহাম্মদ সগীরও তাঁর রচনায় আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেননি, তবে তিনি মুসলিম ঐতিহ্যের রীতিই অনুসরণ করেছেন। তাই তাঁর রচনায় ইসলামী বিশ্বাস ও জীবনাচরণের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের প্রথম উদগাতা হিসাবে নয়, ইসলামী বিশ্বাসের রূপকার হিসাবে শাহ মুহাম্মদ সগীর সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২২]

এ সময়ে কাব্যের বাহিরঙ্গ কিংবা প্রকাশরীতির ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত না হলেও ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক জীবনধারায় বাংলা কাব্য ক্রমাগতভাবে একটি স্বতন্ত্র রূপ অঙ্গে ধারণ করে নেয়। বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মবাদের সর্বগ্রাসী প্রভাব এড়িয়ে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ধ্যান-ধারণায় এবং তৌহিদবাদী চিন্তাধারায় বাংলা কাব্য তখন ক্রমবিকাশমান। এরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে শেখ চান্দের রচনায়–

> পীর ফকিরের পায় তালিম হইয়া
> কহিতে লাগিল শিষ্য আকিদা পুরিয়া।
> তোমার চরণে পীর বিকাইলাম আহি
> ভব তরিবারে জ্ঞান মোরে দেও তোহি
> তোহি যদি আমা প্রতি না কৈলে আদর
> আখেরে আল্লার আগে কি দিমু উত্তর।[২৩]

মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে ইসলামী ঐতিহ্য-চেতনাসমৃদ্ধ কবিতা রচনার ফলে মুসলিম কবি-সাহিত্যিক শৈল্পিক রূপায়ণের ক্ষেত্রে যে স্বতন্ত্র বুনিয়াদ রচনা করে গেছেন তার উপর ভিত্তি করেই আধুনিক ইসলামী কাব্যধারা সম্প্রসারিত ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন আঙ্গিকে বাংলা কাব্য যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধারণ করেছে; তাকে একটি সামগ্রিক ও বিশেষ সাংস্কৃতিক পরিচয়ে চিহ্নিত করা কঠিন। বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিম প্রধানত এ তিন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধারণ করে বাংলা কাব্য রচিত হয়েছে।[২৪] এ ত্রয়ী ধ্যান-ধারণার সমীকরণের মধ্য দিয়ে এক বিশিষ্ট বাঙালি সংস্কৃতির রূপায়ণ প্রয়াসও বাংলা কাব্যে লক্ষণীয়। এ ধারাটি মধ্যযুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত।

আধুনিক বাংলা কাব্যে ইসলামী ঐতিহ্যের রূপায়ণে উত্তরাধিকার সূত্রে এ ধারাগুলো অনুসৃত হয়েছে। আর সে সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব। স্যার সৈয়দ আহমদের আলীগড় আন্দোলন ও সৈয়দ আমীর আলীর আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের মূলে কাব্য সাহিত্যের প্রভাব লক্ষণীয়।[২৫] উর্দু কবি হালী ও ইকবাল (১৮৭৩-১৯৩৮) এর কাব্য শুধু সাহিত্যিক ঐতিহ্যের পুনর্গঠন করেনি, বুদ্ধিজীবীদের মনোবিকাশের ধারাতেও বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

আধুনিক বাংলা কাব্যে কাজী নজরুল ইসলাম মুসলিম ঐতিহ্যের রূপকার হলেও তাঁর রচনায় আমরা দু'টি রূপ প্রত্যক্ষ করি। বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি একদিকে যেমন মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য ও আদর্শের অনুসন্ধান করেছেন, অন্যদিকে তেমনি হিন্দু আদর্শ-ইতিহাস ও ঐতিহ্যেরও রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। ভাষা ব্যবহারেও তাঁর রচনায় দু'টি স্বতন্ত্ররূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। একটি আরবি-ফারসি শব্দ সম্বলিত 'মুসলমানি জবান', যেটা তিনি বিশেষত তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছেন, অন্যটি সংস্কৃতবহুল সাধারণ বাংলা, যেটা বিশেষভাবে তিনি তাঁর গদ্য রচনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। আরবি-ফারসি সম্বলিত তাঁর মুসলমানি জবান ব্যবহারের ফলে অনেকে তাঁকে মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের উত্তরাধিকারী বলে মনে করেন। আর এ মানসিকতার ফলে মুসলিম কবির রচনায় বৌদ্ধধর্মের শূন্যবাদ এবং হিন্দুধর্মের প্রেরণার সারৎসার কিংবা জাতীয় বীরের প্রতীক রূপে প্রসার পেয়েছে।[২৬] মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের স্বতন্ত্র কাব্য সাধনার ধারাকে খণ্ডিত করেছে। ঠিক সে মানসিকতার প্রভাবে নজরুল কাব্যে হিন্দু মুসলিম উভয় ঐতিহ্যের রূপায়ণ ঘটেছে। মুসলিম ঐতিহ্যের রূপকার হিসাবে নজরুল যেমন তাঁর কাব্যে পীর-পয়গম্বর, আওলিয়া-দরবেশ ও মুসলিম বীরদের মহীয়ান চরিত্র রূপায়ণ করেছেন, তেমনি ইসলামের ধর্মীয় আদর্শ ও আচরণগত বিষয়াদিকে কাব্যের অঙ্গীভূত করেছেন। ইসলামী ঐতিহ্যের কবি ফররুখ আহমদকেও এ ধারার কবি রূপে চিহ্নিত করা যায়।

## গ. ফররুখ কাব্যে ইসলামী ঐতিহ্যের উপাদান :

ফররুখ কাব্যে ঐতিহ্য নিয়ে আলোচনার প্রারম্ভে তাঁর পূর্ববর্তী প্রখ্যাত দু'জন কবি– আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল (১৮৭৩-১৯৩৮) ও কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) নাম স্মরণ করছি। দু'জনই উপমহাদেশের মুসলিম জাতিসত্তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। আল্লামা ইকবাল গভীর জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও দর্শনের মাধ্যমে কয়েক শতকের অধঃপতিত, হতাশাগ্রস্ত মুসলিম মানসে আস্থা ফিরিয়ে এনেছেন। কবি নজরুল ইসলাম তাঁর আবেগ ও অনুভূতির গভীরতা দিয়ে সমগ্র মুসলিম জাতিসত্তাকে আলোড়িত করেছেন। একই পথ ধরে কাব্য-জগতে ফররুখ আহমদ মুসলিম সমাজের নবজাগরণে প্রভূত অবদান রেখেছেন। তিনি তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে মুসলিম জাতির মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি ও তাঁদের অধিকার পুনরুদ্ধারে প্রেরণা যুগিয়েছেন। তিনি ইসলামী ঐতিহ্যানুসারী কবি। তাঁর ঐতিহ্যচেতনা প্রায় সমগ্র কাব্য পরিমণ্ডলকেই ঘিরে আছে।[২৭] নবজাগরণের উদ্দীপনামূলক কবিতা ছাড়াও প্রকৃতি ও প্রেম-বিষয়ক কবিতায়ও ঐতিহ্য-চেতনার পরিচয় ফুটে উঠেছে। বিশেষত 'সাত সাগরের মাঝি' (১৯৪৪), 'সিরাজাম মুনীরা' (১৯৫২), 'কাফেলা' (১৯৪৩-৫৮), 'নৌফেল ও হাতেম' (১৯৬১), 'হাতেম তা'য়ী' (১৯৬৬), ও 'কুরআন মুঞ্জুষা'[২৮] প্রভৃতি গ্রন্থে।

'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যের অধিকাংশ কবিতায় কবির ঐতিহ্য-প্রীতি ও ইসলামী ধর্মাদর্শের মহত্ত্বে অকুণ্ঠ বিশ্বাস ও অনুরাগের পরিচয় পরিস্ফুট। এ ঐতিহ্য ও ধর্মাদর্শের আলোতে কবি মুসলমানদের জীবন-সমস্যা ও তার সমাধানের পথ খুঁজেছেন। যেমন :

> কত যে আঁধার পর্দা পারায়ে ভোর হ'ল জানি না
>
> নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজপাতা।
>
> দুয়ারে তোমার সাত সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা।
>
> তবু জাগলে না? তবু তুমি জাগলে না।[২৯]

উল্লিখিত পঙ্‌ক্তিমালায় নারঙ্গী বনের কম্পমান সবুজ পাতা যেন আমাদের আশা-ভরসার-রূপ প্রতীক হয়ে বাতাসে দুলছে। 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যে 'সিন্দবাদ' কবিতায় কবি আব্বাসীয় যুগে রচিত আরব্যোপন্যাসের দুঃসাহসিক ও রোমঞ্চ কর কাহিনীর নায়ক সিন্দবাদকে অতীত গৌরবময় ইসলামী যুগের মুসলিম জাতির শৌর্য-বীর্যের প্রতীক হিসাবে রূপায়িত করেছেন এবং নিজেদের অতীত গৌরবময় দিনের কথা স্মরণ করিয়ে তাদেরকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান ও নবজাগরণের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। যেমন :

'কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ,

শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক

ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ,

পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ ব'য়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক;

নতুন পানিতে সফর এবার, হে মাঝি সিন্দবাদ।[৩০]

'সিরাজাম মুনীরা'[৩১] (১৯৫২) কাব্যে মুহাম্মদ সা. থেকে শুরু করে তাঁর চার খলিফা আবু বকর সিদ্দিক রা., উমর ফারুক রা., ওসমান গনি রা. ও আলী হায়দার রা. এঁদের উজ্জ্বল জীবনাদর্শ এবং আবদুল কাদির জিলানী রহ., খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী, খাজা নকশবন্দ ও মুজাদ্দিদ আলফেসানী রহ. প্রমুখ মুসলিম মনীষীদের জীবনকথা অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের সত্য-সুন্দর ও সংগ্রামের দিকগুলো পুঙখানুপঙ্খভাবে তুলে ধরেছেন এবং অধঃপতিত মুসলিম সমাজে ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়নে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি ও সংগ্রাম চালিয়ে যাবার আহ্বান জানিয়েছেন। মুহাম্মদ সা.-র এ ধরাবক্ষে আবির্ভাবকে মহান আল্লাহর অসীম দয়া ও রহমত হিসাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন :

হে অচেনা পাখী কোন আকাশের গভীরতা হতে এসেছ উঠি?

তোমার পক্ষ-সঞ্চারে ভাষা ভাবের কুসুম উঠিছে ফুটি;

তোমার জরিন জরির ফিতায় নিখিল মানস করো জরিপ

কত অজ্ঞাত সাগরে সহসা ভেসে ওঠে সোনার দ্বীপ।[৩২]

উল্লেখ্য, 'কাফেলা' (১৯৪৩-৫৮) কাব্যগ্রন্থে ফররুখ আহমদ দুঃসাহসিক নাবিক 'সিন্দবাদ'-র পর একদল 'কাফেলা'-র প্রয়োজনবোধ করেছেন। তাই তিনি 'কাফেলা' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ মুসলিম জাতিকে উপহার দিয়েছেন। বাংলার নিসর্গ পলিমাটি ছাড়িয়ে দূর-মরুভূমির উষর প্রান্তরে জাজিরাতুল আরবে চলে গেছেন। ভৌগোলিক দিক থেকে এটা যেমন পৃথিবীর কেন্দ্রভূমি, মানব সভ্যতা তথা আদি মানবের লীলাভূমি হিসাবেও এ স্থানটি চিহ্নিত। কবির মতে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে আমরা সবাই ক্ষণিকের পথিক-যাযাবর। সবাইকে এ নশ্বর পৃথিবীর সওদা শেষে চলে যেতে হবে আদি আসল ঠিকানায়। তাই কবি কাফেলাকে কিছু নেকসামান যোগাড় করার জন্য বার বার তাগিদ দিয়েছেন। কবি তার 'কাফেলা' কে বলেন ঃ

উটের পায়ের শব্দে যাযাবর মরুতট হয়েছে বিভোল,
রাত্রিভরা সেতারার আলো আর মালাতার বুকে দেয় দোল,
শারাবান-তহুরার সন্ধানে যাদের দিন হয়েছে নিখোঁজ-খুঁজে নওরোজ।[৩৩]

যাযাবরের মত 'কাফেলা'-র দলে মিশে কবি সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে পৃথিবীর দিক-দিগন্ত পরিভ্রমণ করে আলোর দ্যুতিমালা আহরণ করে মানবজাতিকে তা উপহার দিয়েছেন। কবির দার্শনিক অনুভবে এ কবিতার ভাব ও বিষয়-বৈভব এক স্থায়ী আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।[৩৪]

'নৌফেল ও হাতেম' (১৯৬১) ও 'হাতেম তা'য়ী' (১৯৬৬) গ্রন্থদ্বয় কবির ঐতিহ্যপ্রীতির একটি নতুন ফসল। এখানে তিনি পুঁথির কাহিনীকে আশ্রয় করে তার ঐতিহ্য এবং আদর্শবাদ প্রচার করেছেন। কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র 'হাতেম'-র মানবতা, বিশ্বস্ততা, জ্ঞানানুসন্ধিৎসা এবং আল্লাহ-প্রেমের মধ্যেই ফররুখের আদর্শ ভাবনা রূপায়িত হয়েছে। তাঁর অনূদিত সূরাগুলোর মধ্যে সূরা মুনাফিকুন, সূরা তাগাবুন, সূরা মূলক ও সূরা মুজাম্মিল উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও পবিত্র কুরআনের সূরা কমর (চাঁদ) ও সূরা ইয়াসিনের বাংলা তরজমা করেছেন।[৩৫]

ফররুখ আহমদ ইসলামী আদর্শ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য ভিত্তিক আরো অনেক কবিতা লিখেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ 'আলমগীর', 'কোন বিয়াবানে', 'নতুন মিনার', 'চতুর্দশপদী', 'দুইমৃত্যু', হে আত্মবিস্মৃত সূর্য, 'জাগো সূর্য প্রদীপ্ত গৌরবে', 'স্বর্ণ ঈগল', 'ইনকিলাব' ইত্যাদি। এসকল কবিতায় মুসলিম চরিত্র, ইসলামী আদর্শ-ঐতিহ্য ও নবজাগরণের উদ্দীপ্ত চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর কাব্য আলোচনা-পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করলে ইসলামী ঐতিহ্যের উপাদানে ভরপুর মধু ভাণ্ডার খুঁজে পাওয়া যাবে।

### ঘ. ফররুখ কাব্যে আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ :

পৃথিবীতে অসংখ্য জীব নিজ নিজ ভঙ্গিতে আপন মনোভাব প্রকাশ করে। কেবলমাত্র মানবজাতি কথা বা ভাষার মাধ্যমে তাদের মনোভাব প্রকাশ করে। ভাষার মাধ্যমে তার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, দৃষ্টিভঙ্গি, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, আত্মবিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটায়। গড়ে ওঠে সাহিত্য ও সংস্কৃতি। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষা, আবহাওয়া ও স্বতন্ত্র জীবনধারার উপর ভিত্তি করে তাদের নিজ নিজ স্বতন্ত্র সাহিত্য ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। ভাষাবিজ্ঞানী ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) বলেছেন, পৃথিবীতে মোট ১৭৯৬টি ভাষা আছে।[৩৬] বৈদেশিক ভাষা ও সভ্যতার প্রতি যদি কোনো জাতি অত্যধিক অনুরক্ত হয় যা ভাষার পার্থক্যকে গৌণভাবে দেখে, তাহলে পরস্পরের মধ্যে মেলামেশা না থাকলেও শুধু আলোচনার দ্বারাই বৈদেশিক ভাষার প্রভাব দেশীয় ভাষার উপর পড়ে থাকে। যেমন : ইংরাজি ভাষায় ল্যাটিন এবং মুসলমানদের বিভিন্ন ভাষায় আরবি-ফারসি ভাষার প্রভাব পড়েছে। কালের প্রবাহে ভাষার মধ্যে উৎকর্ষতা এসেছে এবং তা এখনো চলছে। যুগে যুগে বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ ভাষায়ও বিভিন্ন ভাষার শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। গবেষকদের মতে বাংলা ভাষায় মোট শব্দ সংখ্যার প্রায় অর্ধেক শব্দই বিভিন্ন

ভাষা যেমন : সংস্কৃত, আরবি-ফারসি, ইংরাজি, পর্তুগিজ ইত্যাদি থেকে এসেছে।[৩৭] প্রায় সহস্র বছর ধরে বাংলাদেশে ইসলামের যে চর্চা হয়ে আসছে, তাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আরবি-ফারসি ভাষা বিরাট প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে।

১২০৪ খ্রি. বাংলার মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করার সময় থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে এ এলাকায় আরবি-ফারসি শিক্ষার সূচনা হয়।[৩৮] অদ্যাবধি এ দেশে আরবি-ফারসি ভাষার চর্চা হয়ে আসছে। এ সুদীর্ঘ সময়ে এ অঞ্চলের কবি-সাহিত্যিকগণ আরবি-ফারসি ভাষায় কাব্যচর্চা করেছেন এবং প্রচুর গ্রন্থ আরবি-ফারসি ভাষায় লেখা হয়েছে।[৩৯] আরবি ভাষার সাথে বাঙালিদের পরিচয় লাভের পর থেকেই বাঙালি কবি-সাহিত্যিক, লেখক, বক্তা, গল্পকার, নাট্যকার, গায়ক প্রমুখ বাংলা ভাষায় ব্যাপক হারে আরবি-ফারসি শব্দাবলী ব্যবহার করে আসছেন। বাংলা পুঁথি সাহিত্যেও গাজী-কালু, চম্পাবতী, ছয়ফুল মূলক, খায়রুল হাশর, ইউসুফ-জুলেখা, বানেছা পরী ইত্যাদির মত বাউল সঙ্গীত, মুর্শিদী গান এবং মুসলমানদের বিজয় গাঁথা ও ধর্মীয় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিষয়াবলীর উপর লিখিত অসংখ্য রচনাবলী আজও তার সাক্ষ্য বহন করছে।

আধুনিক বাংলা কবিতায় বিদেশী প্রচলিত শব্দ ব্যবহারে দু'জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একজন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-৬০), অন্যজন ফররুখ আহমদ (১৯১৮-৭৪)। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পরীক্ষা করেছেন সংস্কৃত শব্দ নিয়ে, আর ফররুখ পরীক্ষা করেছেন আরবি-ফারসি শব্দ নিয়ে।[৪০] তবে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রথম আরবি-ফারসি শব্দের সফল প্রয়োগ করেছেন কথাশিল্পী মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৬০-১৯২২)। এরপর আধুনিক বাংলা কাব্যে আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ দেখিয়েছেন ছান্দসিক কবি সতেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯১২)।[৪১] তিনি তাঁর 'কবর-ই-নূরজাহান' ও 'আখেরী' কবিতায় সর্বাধিক সংখ্যক আরবি শব্দ ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে বাংলা কাব্যে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যাপক ব্যবহারে কাজী নজরুল ইসলাম সর্বাধিক সফল। এ নাজরুলিক ধারার সফল ও সার্থক কবি ফররুখ আহমদ। তাঁর অধিকাংশ কাব্যে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার রয়েছে।[৪২]

ফররুখ আহমদের যে সব কাব্যে আরবি-ফারসি শব্দের সর্বাধিক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়, তন্মধ্যে সাত সাগরের মাঝি (১৯৪০), সিরাজাম মুনীরা (১৯৫২), কাফেলা (১৯৬১), নৌফেল ও হাতেম (১৯৬১) এবং হাতেম তা'য়ী (১৯৬৬) উল্লেখযোগ্য। তাঁর কাব্যে আমরা উপলব্ধি করেছি মুসলিম সংস্কৃতি ও আরবি-ফারসি শব্দের অধিক ব্যবহার। পেয়েছি ঈশ্বরের পরিবর্তে আল্লাহ্-খোদা, উপবাসের পরিবর্তে রোজা, উপাসনার পরিবর্তে নামাজ, প্রার্থনার পরিবর্তে মোনাজাত প্রভৃতি শব্দাবলী। তবে তাঁর কবিতায় পরিচিত শব্দ, বিশেষ করে মুসলিম সমাজের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত

আরবি-ফারসি শব্দের বেশি প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন ঃ কাফেলা, সূরাইয়া, হামমাম, আদম-সূরাত, কুতুবতারা, কিশতী, মাল্লা, খিজির প্রভৃতি শব্দ। যেমন ঃ

তবে শাহাদাত আঙ্গুলী আজও ফিরদৌসের ইশারা করে

নিখিল ব্যতীত উম্মত লাগি এখানে তোমার অশ্রু ঝরে।[৪৩]

অথবা

তামাম আমলে দেখি বেশুমার রহমত খোদার-

যে রহমত পেয়ে বাঁচে জিন ও ইনসান-আশরাফুল

মাখলুকাত দু'জাহানে।[৪৪]

এখানে লক্ষণীয় যে, উল্লিখিত কবিতাংশে আরবি-ফারসি শব্দ কবি সহজ ও স্বাভাবিকভাবে প্রয়োগ করেছেন। ইসলামী ঐতিহ্য সম্বলিত সকল কাব্যগ্রন্থ স্বল্প পরিসরে বিশ্লেষণ না করে কেবলমাত্র কাব্যগ্রন্থের আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার করেছেন উদাহরণস্বরূপ তার একটি সমীক্ষা নিম্নে প্রদান করা হল।

**আরবি শব্দাবলী :** আল্লাহু আকবার, আরশ, আহাদ, আরবী, আজম, আশিক, আমীরুল মুমেনীন, আমির, আবুতুরাব, ইশারা, ইবলিস, ইসলাম, ইসলামী, ঈমান, ইলম, উম্মী, এলহান, ওহুদ, ওজ্জা, কোরান (কুরআন), কাফেলা, কামালৎ, কওসার, কাফের (কাফির), কাসেদ, কওমী, খামী, খলিফা, খলিফাতুল মুসলেমীন, খেলাফত (খিলাফত), খাদেম, (খাদিম), খেয়ানত, খবিস, খাস, গরীব, গণি, জুলুম, জুলফিকার, জয়তুন, জান্নাত, জান্নাতী, জান্নাতুল ফিরদাউস, তকদির, তকবির (তাকবির), তসবী, তারেক, তাজাল্লি, তাছাওফ, তৌহিদ, তূর, নেকাব, নূর, নবী, নার, নকবী, ফাতহুমমুবিন, ফিরদৌস, বুলবুল, বোরাক, বদর, বায়তুলমাল, মুসাফির, মদীনার, মিনার, মাশুক, মুজাদ্দিদ, মারেফত, মাহবুব, রসুল, মুবারক, রুহানী, রহমাতুল্লিল 'আলামিন', লা'নত, লা-শরীক, লা'লা, সাইমুন, সুফ্‌ফা, সুফী ইত্যাদি।

**ফারসি শব্দাবলী :** সিন্দবাদ, মারজান, আনার, আবহায়াত, জাফরানী, আনার, শামাদান, কিশতি, বুস্তান, গুলশান, আদমসুরত, রওশন, কাফেলা, সালার, আতশের, খোমা, দারাজ, দস্তে, শারাব, নওশোয়ার, ঈশান, জরদ, সাইমুমে, খোশ-এলাহে, সারাং, দরাজ, জিন্দিগী, খোশরোজ, সবজা, খুনির দরিয়া, আহাজারি, জাহান, তেগ (তলোয়ার), শামিয়ানা, খঞ্জর, নিশান, ফারানের শুক্লা, তুফান, তকতে, অপুরান, ওয়েসিস, সরোবর, বিভা, হেনার, হাসনাহেনা, মেশকী, শিরে, তিমির, সেতারা, চেরাগ, গুলমোহর, নার্গিস, শাহী, বালাখানা, ইয়াকুত, পোখরাজ, মরকত, কোহিনুর, শাহী, খিমা, তাজী, রোশনি, রাহে, শির, কলিজা, লোহু, সফেদ, জায় নামাজ, সাকী, দরিয়া, আম্বরে, ইশকে, আতশী, জরদ, শিরীণ ইত্যাদি।

পরিশেষে বলা যায়, ফররুখ আহমদ তাঁর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত ৫২টি গ্রন্থের মধ্যে 'সাত সাগরের মাঝি', 'সিরাজাম মুনীরা', 'কাফেলা', 'নৌফেল ও হাতেম' ও 'হাতেম তা'য়ী প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ মুসলিম সংস্কৃতি ও ইসলামী ঐতিহ্যের পথ-নির্দেশনায় রচনা করেছেন। মুসলিম জাতির গৌরব পুনরুদ্ধারে তিনি ইসলামী ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সভ্যতা ও মূল্যবোধকে বাংলা কবিতায় নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন। ইসলামী ঐতিহ্যমণ্ডিত উপাদান ও আরবি-ফারসি শব্দ প্রয়োগ করে তিনি সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও মুসলিম জাতিকে নবজাগরণের চেতনায় উজ্জীবিত করেছেন। ◈

---

লেখক পরিচিতি : পিএইচ.ডি গবেষক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

তথ্যসূত্র :

১. মুহাম্মদ মতিউর রহমান, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য, ঢাকা; বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০২ খ্রি., পৃ. ১৪৬।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭।

৪. কবি ফররুখ আহমদের পিতা সৈয়দ হাতেম আলী পুলিশ ইন্সপেক্টর ছিলেন। আই.এ পাশ করে তিনি চাকরিতে যোগদান করেন, খুলনা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় দায়িত্ব পালন করেন। মাঝে মাঝে আই.জি পুলিশ অফিসে রিপোর্ট দাখিল করতে কলকাতায় যেতেন। তিনি শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমনা ব্যক্তি ছিলেন। শেষাবধি ব্রিটিশ সরকার তার ব্যক্তিত্বে সম্মান প্রদর্শন করে 'খান সাহেব' উপাধিতে ভূষিত করেন। (দ্র. আসাদ বিন হাফিজ, নাম তাঁর ফররুখ, ঢাকা, প্রীতি প্রকাশন-১৯৯৭ খ্রি., পৃ. ১১।)

৫. পিতৃদত্ত নাম 'সৈয়দ ফররুখ আহমদ'। কবি নিজেই 'সৈয়দ' শব্দটি পরিত্যাগ করেন। কবি ছিলেন অত্যন্ত নিরহঙ্কারী ও সাদাসিধে, সে জন্যই হয়তো তাঁর নামের আগে কখনো সৈয়দ ব্যবহার করতে দেখা যেত না। (দ্র. গোলাম মঈনুদ্দিন, কবি ফররুখ আহমদঃ ঐতিহ্যের নবমূল্যায়ন, ১৯৮০ খ্রি. পৃ. ৩৪।)

৬. খান সাহেব সৈয়দ হাতেম আলীর তিন কন্যা সন্তানের জন্মের পর ফররুখ আহমদের জন্ম হয় রমজান মাসে। তাই দাদীমা আদর করে নাম রাখেন রমজান। (দ্র. আবদুল মান্নান সৈয়দ, ফররুখ আহমদ জীবন ও সাহিত্য, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩ খ্রি. পৃ. ৩।)

৭. কামরুল হাসান, পটুয়ার পট-চিত্র, ঢাকা, ঈদসংখ্যা, সচিত্র-সন্ধানী, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ।

৮. গোলাম মঈনুদ্দিন, কবি ফররুখ আহমদঃ ঐতিহ্যের নবমূল্যায়ন, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ খ্রি. পৃ. ৩৫।

৯. মুহম্মদ মতিউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮; আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পাঃ), ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ১৯৭৫ খ্রি. পরিশিষ্টাংশ।

১১. গোলাম মঈনুদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

১২. আসাদ বিন হাফিজ, নাম তাঁর ফররুখ, ঢাকা, প্রীতি প্রকাশন, ১৯৯৭ খ্রি. পৃ. ৮৮।

১৩. আবদুল মান্নান সৈয়দ, ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩ খ্রি. পৃ. ১১।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

১৬. মুহম্মদ মতিউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০।

১৭. মুহম্মদ মতিউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

২০. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য, ঢাকা : ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮১ খ্রি. পৃ. ১৬।

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

২৩. আবদুল কাদির (সম্পা:) কাব্য মালঞ্চ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৫৪ খ্রি. পৃ. ৯।

২৪. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।

২৭. গোলাম মঈনুদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

২৮. কুরআন মঞ্জুষা, এটি কবির একটি অনুবাদ কর্ম, যা বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর অনূদিত।

২৯. আবদুল মান্নান সৈয়দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

৩০. মুহম্মদ মতিউর রহমান, ফররুখ প্রতিভা, ঢাকা, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯১ খ্রি. পৃ. ৮৯।

৩১. 'সিরাজাম মুনীরা'-র অর্থ আলোকবর্তিকা, 'উজ্জ্বল প্রদীপ'। পবিত্র কুরআন থেকে চয়নিত দু'টি শব্দ। আল্লামা ইউসুফ আলী অনূদিত The Holy Quran এর অনুবাদ করা হয়েছে A Lamp spreading light এর সকল অনুবাদ থেকে স্পষ্ট যে 'সিরাজাম মুনীরা' সেই আলোর উৎস যা অন্ধকার দূর করে মানুষকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করে। বিশ্বের অন্ধকার দূর করতেই মহানবী সাঃ এর আবির্ভাব। তিনি অন্ধকার দূরকারী আলোকবর্তিকা বা 'সিরাজাম মুনীরা'। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "হে নবী আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদ বাহকরূপে, সতর্ককারীরূপে, আহ্বানকারীরূপে ও উজ্জ্বলবর্তিকা বা 'সিরাজাম মুনীরা' স্বরূপ।" (আল কুরআন, সূরা আহযাব, আয়াত ঃ ৪৫-৪৬)। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে 'সিরাজাম মুনীরা' কবি ফররুখ আহমদ রচিত বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ যা তমদ্দুন প্রেস সংস্থা কর্তৃক ঢাকা হতে ১৯৫২ খ্রি. প্রকাশিত হয়।

৩২. গোলাম মঈনুদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

৩৩. আবদুল মান্নান সৈয়দ, রচনাবলী ২য় খণ্ড (কাফেলা), ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৬, পৃ. ৪৩।

৩৪. মুহম্মদ মতিউর রহমান, ফররুখ প্রতিভা, ঢাকা : বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯১, পৃ. ৪৭।

৩৫. আবদুল মান্নান সৈয়দ, ফররুখ আহমদ জীবন ও সাহিত্য, ঢাকা : বাংলা একাডেমী ১৯৯৩, পৃ. ১৬৩, গোলাম মঈনুদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

## ফররুখ আহমদ ও তাঁর ভাষাবীক্ষণ-১

মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম

১.০০ ॥ একজন কবি তাঁর স্বদেশ, সমাজ ও সংস্কৃতির লালন ও উৎকর্ষ সাধনে মনোনিবেশ করবেন এটাই স্বাভাবিক। মানবতার জয়গান, ভালবাসার জয়গান, সুকুমার বৃত্তির চর্চায় সুন্দর পৃথিবীর বিনির্মাণে তিনি একজন কুশলী কারিগর। অবশ্য এক্ষেত্রে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক দু'টি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সামনে আসে। মানবতাবাদ দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় প্রেক্ষাপটেই এক উচ্চমানের কাম্য আদর্শ। তবে উভয় ক্ষেত্রেই যে আদর্শ কবিকে মানবতাবাদে উদ্বুদ্ধ করে তার নিরিখটিও জানা দরকার। কবির ভাষায় :

"জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
একই রবী শশী মোদের সাথী।"

এই যে কবির উপলব্ধি, সেখানে কিন্তু সারা দুনিয়ার মানুষকে একটি জাতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বয়ং আল্লাহ পাক তাঁর সৃষ্ট মানুষের প্রতি যে দরদ দেখিয়েছেন তার প্রতিফলন তাঁরই সৃষ্ট মানুষের– কবিদের মাঝে হবে এটাই ফিতরাত। আল্লাহ মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আর সৃষ্টির সেরা হিসেবে তাঁদের দায়-দায়িত্বও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। "কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন্নাছি তা'মুরুনা বিল মা'রুফ ওয়াতান হাওনা আনিল মুনকার।" অর্থাৎ তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ জাতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তোমাদের দায়িত্ব হলো লোকদেরকে ন্যায়ের পথে আহ্বান করবে এবং অন্যায় প্রতিরোধ করবে। পৃথিবীর যেকোন ধর্মাবলম্বী এবং যেকোন বিবেকবান মানুষের কাছে এটি অনুকরণীয়-অনুসরণীয় এক অমোঘ বাণী। এ ধরনের কোন কথা বা বাণী যেখান থেকেই উৎসারিত হোক না কেন, যদি তা দুনিয়ার সকল মানুষের কল্যাণে নিবেদিত হয় তাহলেই কেবল তা বিশ্বমানবতার আদর্শে পরিণত হতে পারে।

সত্য এবং মিথ্যার সাথে ন্যায় ও অন্যায়ের তুলনাকে আলো ও আঁধারের উপমায় যদি আলোচনা করি তাহলে দেখবো বিবেকবান মানুষ আঁধার ভেদ করে আলোর পানে ছুটছে। ফররুখ কাব্যে সত্যের এ অন্বেষা আমরা প্রায় সর্বত্রই লক্ষ্য করি। তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'পাঞ্জেরী'-তে।

"রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী ?
এখনও তোমার আসমান ভরা মেঘে ?

সেতারা, হেলাল এখনো ওঠেনি জেগে ?
তুমি মাস্তুলে, আমি দাঁড় টানি ভুলে ;
অসীম কুয়াশা জাগে শূন্যতা ঘেরি।
জাগো বন্দরে কৈফিয়তের তীব্র ভ্রুকুটি হেরি;
জাগো অগণন ক্ষুধিত মুখের নীরব ভ্রুকুটি হেরি;
দেখ চেয়ে দেখ সূর্য ওঠার কত দেরী, কত দেরী ॥"

২.০০ ॥ একটি জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা তাঁর নিজস্ব পরিচয় ও সত্তার বাহন। অন্যান্য সকল বিষয়ের ন্যায় মাতৃভাষার প্রসঙ্গেও আল্লাহর বিধান সর্বজনীন এবং বিশ্বজনীন। সূরা ইবরাহীমে আল্লাহ পাক বলেন- "ওয়ামা আরসালনা মির রাসূলিন ইল্লা বি লিসানি কাওমিহি।" অর্থাৎ আমি প্রত্যেক জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি সেই কওমের ভাষা দিয়ে।" এর মাধ্যমে একটি জাতির মাতৃভাষাকে স্বয়ং আল্লাহ পাক স্বীকৃতি দিয়েছেন। এক্ষেত্রে এখানকার কোটারি স্বার্থ সংরক্ষণকারী অন্ধগলির কিছু লোক দেশীয় ভাষায় ধর্ম চর্চার উপর চরম নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। তারা বাংলা ভাষাকে 'পক্ষীর ভাষা' আখ্যা দিয়ে এ ভাষায় ধর্ম চর্চা করলে 'রৌরব' নরকে ঠাঁই হবার ফতোয়া দেয়। কিন্তু আল কুরআনের উদার আন্তর্জাতিক মানবতাবাদী নির্দেশে প্রভাবিত মুসলিম লেখকগণ বাংলা ভাষায় কাব্য ও ধর্ম চর্চার মাধ্যমে স্থানীয় প্রথা ভেঙ্গে এক বিপ্লব সাধন করেন। মুসলিম শাসকগণের পৃষ্ঠপোষকতায় অন্য ধর্মগুলোও বাংলা ভাষায় অনুবাদের সুযোগ পায়।

মধ্যযুগ থেকে এভাবে মাতৃভাষা চর্চার একটি ধারা তৈরী করেন মুসলমান কবি-সাহিত্যিকগণ। এক্ষেত্রে কবি শাহ মুহম্মদ সগীর, জৈনুদ্দিন, মুজম্মিল, শেখ পরান, সৈয়দ সুলতান, আবদুল হাকিম, শেখ মুত্তালিব, আবদুল নবী, সৈয়দ নুরুদ্দিন, সৈয়দ হামজা, মুহম্মদ কাসিম, মুহম্মদ হামীদুল্লাহ খান, মুহম্মদ জান, মুনশী আজিমুদ্দিন, মুনশী মোহাম্মদ হাতেম প্রমুখ সকলেই মাতৃভাষায় কাব্য সাধনার পাশাপাশি এ ভাষার সপক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তিও পেশ করেছেন। পরবর্তীতে এ ধারায় পণ্ডিত রেয়াজ আলদীন মাশাহাদী, মীর মশাররফ হোসেন, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ যে ভূমিকা রাখেন তা ঐতিহ্য অনুসরণের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। এ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের কবি- সাহিত্যিকগণ সুদূর মধ্যযুগ থেকেই মাতৃভাষায় তাদের সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। বাংলা সাহিত্যে মাতৃভাষা চর্চার এ ঐতিহ্যবাহী ধারারই অনুসরণ করেছেন ফররুখ। ইসলামের বিশ্বজনীন আদর্শের বিশুদ্ধ অনুসারী ফররুখকে তাই দেখি ভাষা আন্দোলনের সূচনারও আগে মাতৃভাষার সপক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে। এ ভূমিকা পালনে তিনি ত্রিবিধ পন্থা অবলম্বন করেছেন।

২.১ ॥ বাংলা ভাষার শেকড়ের অনুসন্ধান করে লোকমুখে ব্যবহৃত ও প্রচলিত জনগ্রাহ্য শব্দ-সম্ভারের প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলা ভাষার উৎকর্ষ সাধন ও এর শব্দ ভাণ্ডারকে স্ফীতকরণ।

২.২ ॥ ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় সময়ের চেয়ে অগ্রবর্তী চিন্তা এবং গোটা জাতিকে এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা দান। মাতৃভাষার সপক্ষে কলম ধারণ করে প্রবন্ধ ও কবিতা রচনার মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি। এ ব্যাপারে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গিকে তোয়াক্কা বা ভয় না করে নির্ভীক সৈনিকের ন্যায় আপন গতিতে এগিয়ে যাওয়া।

২.৩ ॥ ভাষা আন্দোলনের শহীদানের স্মরণে কবিতা রচনা। এছাড়া কবিতার মাধ্যমে বিশ্ব আসনে মাতৃভাষার অবস্থান নিরূপণের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মূল্যায়ন; এবং এর গর্বে গরীয়ান আমাদেরকে বিশ্বমুখী হবার প্রেরণা দান এবং বিশ্ব ভাষা মজলুমদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রেরণা দান।

২.১.১ ॥ তিনি এটা চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন যে দীর্ঘ দুশ' বছরের ইংরেজ শাসনের ফলে মধ্যযুগে মুসলমানরা বাংলা সাহিত্যের যে একটি উৎকর্ষের ধারা সূচনা করেছিলেন সেটা স্তিমিত প্রায়। এ দু'শ বছরের দীর্ঘ সময়ে এ দেশের শত শত পুঁথিকার পুঁথি সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষের মুখের ভাষায় মুসলিম সাহিত্য চর্চার উৎকর্ষের ধারাটি ধরে রাখার আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়েছিলেন। ফররুখ আহমদ পুঁথির শব্দ সম্ভার ও কাহিনীকে অবলম্বন করে আধুনিক টেকনিকে সাহিত্য রচনার মাধ্যমে ঐতিহ্যের উজ্জীবনে এক স্বতন্ত্র ধারার সূচনা করলেন। এ ধারায় তিনি এমন সব সাহিত্য রচনা করলেন যা বাংলা সাহিত্যেই কেবল কালজয়ী নয়; বিশ্ব সাহিত্যের সম্ভারেও এক নতুন সংযোজন।

২.১.২ ॥ ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি ১৯৪৭ সন থেকেই কলম ধরেন। এ সময় থেকেই মূলত ভাষা আন্দোলনেরও সূচনা। সেই সূচনালগ্নে যে কয়জন মুষ্টিমেয় মাতৃভাষাপ্রেমী মাতৃভাষার সপক্ষে কলম ধরেন ফররুখ আহমদ তাঁদের একজন। ১৯৪৭ সনের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দিন লিখিত তাঁর "পাকিস্তান : রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধটি পরের মাসে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সংখ্যা 'মাসিক সওগাতে' প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধে আমরা ফররুখ আহমদের যে নির্ভীক সত্য ভাষণ লক্ষ্য করি তা ভাষা আন্দোলনের শুরুর সূচনায় মৌলিক অবদান রাখে। সেদিন তিনি তাঁর এ প্রবন্ধে স্পষ্ট করে বলেছিলেন- "পাকিস্তানের জনগণের বৃহৎ অংশের মতানুযায়ী পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নির্বাচিত হবে। যদি তাই হয় তাহলে এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, বাংলা ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে।"

"বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষায় রূপায়িত করলে ইসলামী ঐতিহ্যের সর্বনাশ হবে" বলে যারা বলেছেন তিনি তাঁদের এ ধারণাকে "কুৎসিত পরাজয়ী মনোবৃত্তি" বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, "জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবীকে চেপে রাখা কারুর সাধ্যেই কুলোবে না। ঐ ন্যায়সঙ্গত দাবীর বলেই পাকিস্তানের জনগণ শুধু আহার্যের নয়- সংস্কৃতি ও ভাষার অধিকার কেড়ে নেবে।"

২.১.৩ ॥ ১৯৫২ সনে আমরা দেখতে পাই বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে সচেতন জনতা তাদের সেই অধিকার ঠিকই কেড়ে নিয়েছিল। আর এ অধিকার প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যৎ-বক্তা ছিলেন ভাষাসৈনিক ফররুখ আহমদ। সে আন্দোলনের পথ ধরেই ১৯৭১ সনে আমরা লাভ করি বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

২.১.৪ ॥ ফররুখ আহমদের ভাষা বিষয়ক অন্যান্য রচনাবলীর মধ্যে–

ব্রিটিশ আমলে (১৩৫২ বাংলা) ১৯৪৫ সনে রচিত তাঁর 'উর্দু বনাম বাংলা' কবিতাটি এক ঐতিহাসিক বাস্তবতার স্বাক্ষর। তিনি এখানকার কিছু শরীফ (?) লোকদের উর্দু-প্রীতিকে কটাক্ষ করে রচনা করেন এ সনেট কবিতাটি।

"দুই শো পঁচিশ মুদ্রা যে অবধি হয়েছে বেতন
বাংলাকে তালাক দিয়া উর্দুকেই করিয়াছি নিকা,
বাপান্ত শ্রমের ফলে উড়েছে আশার চামচিকা
উর্দু নীল আভিজাত্যে (জানে তা নিকট বন্ধুগণ)।"

তাঁর এ কবিতাটি প্রথমে মাসিক মোহাম্মদী জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২ সংখ্যায় ছাপা হয়। পরবর্তীতে এটি 'অনুস্বার' কাব্যগ্রন্থে স্থান পায়। এরও পূর্বে ফাল্গুন ১৩৫১ সংখ্যায় সওগাত পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর 'আসন্ন ফাল্গুনে' কবিতা। ভাদ্র ১৩৬০ সংখ্যা মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত হয় তাঁর শহীদ দিবস উপলক্ষে কবিতা। তিনি 'যাদের বুকের রক্তে মাতৃভাষা পেয়েছে সম্মান' কবিতায় বলেন–

"যাদের বুকের রক্তে মাতৃভাষা পেয়েছে সম্মান
সংগিনের মুখে যারা দাঁড়ায়েছে নিষ্পাপ, অম্লান
মানে নাই কোন বাধা, মৃত্যু ভয় মানে নাই যারা
তাদের স্মরণ চিহ্ন এ মিনার, –কালের পাহারা,
এখানে দাঁড়াও এসে মনে কর তাদেরি সে-দান
যাদের বুকের রক্তে মাতৃভাষা পেয়েছে সম্মান ॥"

ভাদ্র ১৩৬৩ সনে আবদুল কাদির সম্পাদিত মাসিক 'মাহেনও' পত্রিকায় ফররুখের ভাষা বিষয়ক সনেট গুচ্ছ পাক বাংলা, বাংলা ভাষার প্রতি, চলতি ভাষার পুঁথি ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। একই পত্রিকার ফাল্গুন ১৩৬৩ সংখ্যায় ফররুখের মাতৃভাষার গান প্রকাশিত হয়। এ গানটির সুর আবদুল হালিম চৌধুরী, স্বরলিপি-আবেদ হোসেন খান, ২৯.১১.১৯৫৬ সনে রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়। গানটিতে অংশগ্রহণ করেন হুসনা বানু খানম, রওশান আরা বেগম ও মাসুদ আলী।

সাপ্তাহিক সৈনিক ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩ ভাষা আন্দোলন ও শহীদ সংখ্যায় 'ধাত্রী চোরার জারী গান' এবং পত্রিকার ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ সংখ্যা শিরোনামহীনভাবে শহীদ স্মরণে কবিতা প্রকাশিত হয়। এছাড়াও লায়লা আর্জুমান্দ বানুও তাঁর ভাষা

বিষয়ক গানের স্বরলিপি করেন এবং মাসিক পূবালী পত্রিকায় তাঁর ভাষা বিষয়ক সনেট প্রকাশিত হয়। এছাড়া, পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা 'বাংলা না সংস্কৃত' বিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি লেখার উপরও তাঁর প্রতিক্রিয়ামূলক লেখা প্রকাশিত হয়।

৩.১.১ ॥ ফররুখ তাঁর সাহিত্যে বিশ্ব-বীক্ষার যে প্রভাব রেখেছেন তাঁর মূলে রয়েছে শেলী (১৭৯২-১৮২২), কীটস (১৭৯৫-১৮২১), এলিয়ট (১৮৮৮-১৯৬৫), ইয়েটস (১৮৬৫-১৯৩৯) প্রমুখ ঐতিহ্যবাদী কবিদের প্রভাব। অন্যদিকে, বিশ্ব সাহিত্যে ফার্সি-উর্দুর প্রভাব সৃষ্টিকারী মানবতাবাদী কবি আল্লামা মুহম্মদ ইকবাল, মাইকেল মধুসূদন এবং কাজী নজরুলের প্রভাবও রয়েছে তাঁর উপর।

৩.১.২ ॥ তাঁর কাব্যে বিশ্ব সাহিত্যের চারিত্র্য লক্ষণের মধ্যে এডভেঞ্চার, দুঃসাহসিক অভিযাত্রা, ভ্রমণ ইত্যাদি রয়েছে। রোমান্টিকতা ও আদর্শিকতার সম্মিলন ঘটিয়ে সিন্দবাদ, হাতেম ইত্যাদি বিশ্ব সাহিত্যের সত্যসন্ধ নায়কদের তিনি বিচরণ করিয়েছেন সাহিত্যের মহাসমুদ্রে। সর্বত্রই বিশ্বমানবতার মুক্তি সন্ধানে, অন্ধকারের বিপরীতে আলোর সন্ধান খুঁজে ফিরেছে তাঁর কাব্য নায়করা।

৩.১.৩ ॥ ভাষার প্রশ্নে ফররুখের বিশ্ব-বীক্ষার আরেকটি দিক হলো মাতৃভাষা বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাঁর উচ্চ আশাবাদ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দার্শনিক অভিব্যক্তি। তিনি তাঁর 'বাংলা ভাষার গান'-এ বলেন–

"ও আমার
মাতৃভাষা ; বাংলা ভাষা
খোদার সেরা দান
বিশ্ব ভাষার সভায় তোমার
রূপ যে অনির্বাণ ॥

.....
প্রতীচি আর প্রাচী এসে
ডাকলো তোমায় ভালবেসে,
দিল তোমার কালকেশে ফুলের অবদান ॥

....
কালের পথে ঝলক দিয়ে
মুক্ত ধারা যাও বিলিয়ে
জগৎ সভায় সুর মিলিয়ে শোনাও কলগান ॥

....
তোমার সুরের পরশ লেগে
ইনসানিয়াত উঠুক জেগে
তোমার আলোয় উঠুক রেঙে দুনিয়া জাহান ॥"

কবি বিশ্ব ভাষায় বাংলা ভাষার রূপ অনির্বাণ বলে যে মন্তব্য করেছেন তারই যথার্থ বাস্তবায়ন আমরা লক্ষ্য করছি এতদিন পর। সারা বিশ্বের কয়েক হাজার ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষার অবস্থান সপ্তমে। এটি বিশ্ব সভায় আমাদের একটি সংহত অবস্থানের পরিচায়ক। কিন্তু সারা বিশ্বে আমাদের ভাষা আন্দোলনের সফলতা লাভের স্মরণীয় দিন ২১ ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে'র মর্যাদা লাভ করায় ফররুখের সেই আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান মন্তব্যই যেন বাস্তবে রূপ নিল।

পৃথিবীর সকল অবহেলিত ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী আজ বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলনের চেতনায় নিজেদের ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠার প্রেরণা লাভ করছে। সত্যিকার অর্থেই ফররুখ আহমদের গানের এ কলিগুলো আজ বিশ্ববাসীর জাগানিয়া পঙ্ক্তির মর্যাদায় অভিষিক্ত।

৪.০০ ॥ কবি ফররুখ আহমদের সাহিত্যকে আজও আমরা অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বসভায় তুলে ধরতে পারিনি। আন্তর্জাতিক মানবতার লালনে, শোষিতের বিরুদ্ধে মজলুমের জাগরণে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় ফররুখের কাব্য নায়ক 'সিন্দবাদ', 'হাতেম তায়ী' বিশ্ব জয় করতে পারে। সে জন্য আমাদের উচিত তাঁর রচনাবলীকে আন্তর্জাতিক ভাষাগুলোতে অনুবাদের ব্যবস্থা করে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া। তাহলেই ফররুখ আহমদ মাতৃভাষা ভক্তির যে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আত্মবিশ্বাস লালন করে গেছেন তার যথাযথ শুভ ফল বাংলা ভাষা তথা আমাদের জাতি লাভ করবে। ধন্য হবে সারা বিশ্ব।

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, অক্টোবর, ২০০১]

# ফররুখ আহমদ ও তাঁর ভাষাবীক্ষণ-২

মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম

২৫ অক্টোবর ১৯৫৯ সালে আসকার ইবনে শাইখ সম্পাদিত এবং বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত 'নব-জীবনের গান' গ্রন্থে কবি ফররুখ আহমদের মাতৃভাষা বিষয়ক বা একুশে বিষয়ক একটি গান স্থান পায়। নব-জীবনে স্বরলিপিসহ গানটি ছাপা হয়। গানটির শেষে লেখা রয়েছে- কথাঃ ফররুখ আহমদ, সুর : আবদুল হালিম চৌধুরী। স্বরলিপি- আবেদ হোসেন খান। গানটির স্বরলিপির শিরোভাগে লেখা 'তাল কাহারবা' উক্ত বইয়ের ১৩১-১৩৪। পৃষ্ঠাব্যাপী গান ও স্বরলিপি ছাপা হয়। '॥ বত্রিশ ॥' সংখ্যক সিরিয়ালে ছাপা গানটির কোন শিরোনাম নেই।

কবি ফররুখ আহমদের 'ও, আমার মাতৃভাষা বাংলাভাষা খোদার সেরা দান' ..... গানটির ন্যায় এ গানটি ব্যাপক প্রচার পায়নি। তবে স্বরলিপি ও সুরকারের নাম থাকায় এ গানটি রেডিওতে গাওয়া হয়েছে বলে ধারণা জন্মে। কারণ ফররুখের গান তখন রেডিওর ঢাকা কেন্দ্র থেকে নিয়মিত পরিবেশন করা হতো। ফররুখের ভাষা বিষয়ক গানগুলোর সংগ্রহ অভিযানে তাঁর এ গানটি এখানে পত্রস্থ হলো-

'মধুর চেয়ে মধুর যে ভাই আমার দেশের ভাষা,
এই ভাষাতে ফোটে আমার দুঃখ-দরদ আশা ॥

এই ভাষাতে পুঁথি-গাথা মারেফতী লিখি,
এই ভাষাতে ভাটিয়ালী ভাওয়াইয়া গান শিখি,
এই ভাষাতে মেটে আমার মনের পিপাসা ॥

এই ভাষাতে ফোটে রে ভাই সকল কান্না-হাসি,
এই ভাষাতে দুঃখে গাই যে বারমাসী,
এই ভাষাতে যায় রে বাবের আঁধার-কুয়াশা ॥

(ওরে) হরিণ চেনে বন যে গহীন, নদী চেনে মাছ,
পাখ-পাখালির বুলি চেনে সকল চারা গাছ,
(আর) আমি চিনি যে ভাষাতে প্রাণের ভালবাসা ॥

পাক জমিনের মত আমার পাক বাংলার মান,
না শুনিলে মাতৃভাষা মন করে অ্যানচান,
মায়ের ভাষা শুনলে মনে না থাকে নৈরাশা' ॥

ফররুখ আহমদ মাতৃভাষার পক্ষে বরাবরই লড়াই করেছেন। আর এ লড়াইয়ের প্রেরণা তিনি লাভ করেন তাঁর কাব্য প্রতিভা প্রকাশের আগেই। একজন কবির বিশেষ

করে যিনি চলমান ধারা থেকে স্বাতন্ত্র্য নির্মাণে একটি কাব্য মনন এবং নিজস্ব কাব্য-ভাষা তৈরি করেন তাঁর জন্য ভাষা চর্চার প্রসঙ্গ এবং পরিধিও হয় ভিন্ন এবং প্রশস্ত তর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে জারি করা সংস্কৃত পণ্ডিতদের 'অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানিচ :' .... শ্লোকটি সবারই জানা। কিন্তু বাংলা ভাষার সুদিনে তারাই আবার বলতে লাগলো বাংলা ভাষা সংস্কৃতের দুহিতা!'

বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের এসব ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে ফররুখ আহমদ ছিলেন খুবই সজাগ। সে কারণেই তাঁর কবিতায় আমরা এ সবের স্বতঃস্ফূর্ত জবাব খুঁজে পাই। ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত কবির কাব্যগ্রন্থ 'মুহূর্তের কবিতা'য় কবির 'বাংলা ভাষার প্রতি' কবিতায় আমরা সে দৃশ্য চিত্রণই লক্ষ্য করি।

**বাংলা ভাষার প্রতি**

কে জানে দুহিতা কার ? কোথায় বা সে মৃতা জননী
গিয়েছিল পথে রেখে যে কেবলি বাড়ায়ে জঞ্জাল ?
কলঙ্ক কাহিনী নিয়ে ছিলে জেগে তুমি কত কাল
কে জানে সে কথা ? আর প্রতীক্ষার দীর্ঘ রাত গনি
কাটায়েছো কত কাল জীবনের চেয়ে পদধ্বনি
অস্পৃশ্য নারীর মতো বর্ণাশ্রম শৃঙ্খলে পীড়িতা
পরিত্যক্ত 'পক্ষি ভাষা'? পাদপিষ্টা, মৃত্যুভয়ে ভীতা
কখন পিঞ্জরে প্রাণ উঠিল আবার রণরণি ?

কখন দুয়ারে এল আরবের শা'জাদা তোমার
সব গ্লানি মুছে দিতে (মুছে দিতে ব্যর্থতার দাহ) ?
কখন অপূর্ণ সত্তা পেল খুঁজে রশ্মি পূর্ণতার,
আবদ্ধ জিন্দান থেকে মুক্তি পেল কখন প্রবাহ
(কলহাস্যময়ী আর প্রাণোচ্ছল) ? অচেনা সখার
সাথে হল কোন লগ্নে তনু-মন প্রাণের উদ্বাহ ॥

কৃত্রিম সংস্কৃত ভাষার বেড়াজালে গণমানুষের মুখের ভাষা চাপা পড়ে গেলেও 'জীবন্ত মাতৃভাষা' কি দুর্দমনীয় শক্তি ও গতিতে আপন অবস্থান আবিষ্কার করে নেয় সে ঐতিহ্য চিত্রায়িত হয়েছে কবির 'চলতি ভাষার পুঁথি' শিরোনামের সনেটটিতে।

**চলতি ভাষার পুঁথি**

যে-দিন কৃত্রিম ভাষা দুর্বিষহ লানতের মত
কিম্বা দুঃস্বপ্নের মত শ্বাসরোধ করিল তোমার
(সংস্কৃত সাধু ভাষায় বেড়াজাল করিল তৈয়ার,
টোলের পণ্ডিত; পুঁথি), সেই দিন ভারঅবনত

সম্মুখে চলার গতি রুদ্ধ হল, বেদনা-বিক্ষত
হে জীবন্ত মাতৃভাষা! হলে তুমি মৃত্যুর শিকার।
দুই চোখে নেমে এলো কাল সিয়া রাত্রির আঁধার
অচেনা পিঞ্জরে দেখি রক্তমাখা প্রাণ শরাহত!
দুঃসহ দুঃখের পালা শেষ হ'ল একদা, যেদিন
মুক্তি পেল জীবনের ভাষা, আর নিরুদ্ধ জবান
জিন্দানের রাত্রিশেষে পেল খুঁজে রোশ্‌নি অমলিন;
জিন্দানের রাত্রিশেষে যেন সে উচ্ছল বহমান
কূলপ্লাবী নদী এক পূর্ণতার পথে সুরঙ্গিন
জীবন্ত ভাষায় দীপ্ত পরিপূর্ণ যৌবনের গান ॥

মৃত ভাষা সংস্কৃত মধ্যযুগেই বাংলা ভাষার জন্য পথ করে দিয়েছে। স্বাধীন সুলতানী আমলে বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ্‌র সময়ে একটি সাঁকো তৈরির শিলালিপিতে এর স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। ঐ শিলালিপিটির ভাষা সংস্কৃত কিন্তু হরফ বাংলা। এ ধারা দিন দিন পুষ্ট হয়েছে। সে কারণেই মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগের যুগ-সন্ধিক্ষণের কবি হিসেবে পরিচিত কবি ভারতচন্দ্রও দেশী মানুষের জনপ্রিয় ভাষায় কাব্য রচনার লোভ সামলাতে পারেননি। তিনি বলেন :

"না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে
যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যরস লয়ে।"

কিন্তু ইংরেজ আমলে ফোর্ট উইলিয়ামের পণ্ডিতদের অত্যাচারে নতুন করে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের ষড়যন্ত্রের জালে আটকানোর অপচেষ্টা চলে। আর সে দুর্দিনে পুঁথি রচয়িতাগণ তাঁদের রচনার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাকে ধরে রাখেন।

এভাবেই মাতৃভাষা বাংলা ভাষা চর্চার তোড়ে সংস্কৃত ভাষা ধীরে ধীরে লোপ পায়। ফররুখ আহমদ এসব পুঁথি কাব্যের এক একজন রচয়িতাকে আমাদের আবহমান কালের মাতৃভাষা চর্চার এক একজন সেনাপতির মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। পুঁথির 'বীররস' তিনি পরিবেশন করেছেন তাঁর চুতর্দশপদী সনেটে। কবির রচিত 'শাহ গরীবুল্লাহ' সনেটে আমরা মাতৃভাষার সে বিজয়ের দামামা ধ্বনির অনুরণন লক্ষ্য করি।

**শাহ্ গরীবুল্লাহ**

যখন কাহিনী তুমি গেয়ে গেলে চলিত জবানে
(মুহব্বত-নামা আর জঙ্গনামা-আমীরের গান)
আবরের ছায়া দেখে যেন মত্ত ময়ূরের প্রাণ

আনন্দে উধাও হ'লে নিমেষে বিস্মৃত মেঘ পানে।
ইউসুফের রূপ দেখে অপরূপ, মোহমুগ্ধ প্রাণে
যেমন সম্বিতহারা মিসরের সহস্র সুন্দরী
চেয়েছিল নিষ্পলক ; –তৃষ্ণাতপ্ত কর্ণপুট ভরি
শুনিল কাহিনী তার বঙ্গভাষী মুগ্ধ কলগানে।
জীবন্ত ভাষার স্রোতে ভেসে গেল কোথায় তখন
মৃত ভাষা (গুরুভার সংস্কৃতের শিলা জগদ্দল)
সিন্দবাদ জাহাজীর স্কন্ধ হ'তে জয়ীফ যেমন
জমিনে লুটায়ে পড়ে দিল ছেড়ে বাধার অর্গল
চঞ্চল ঝর্ণার মত প্রচলিত ভাষার উচ্ছল
গতিতে উন্মুখ হলে রসান্বেষী জনসাধারণ।

মাতৃভাষার প্রতিষ্ঠায় কালে কালে চলে আসা এ আন্দোলনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁরা চিরদিন স্মরণীয় বরণীয়। এ কারণেই শহীদদের স্মরণে তৈরি মিনার কোন দুর্বৃত্ত ভেঙ্গে ফেললেও তা যে ক্ষণস্থায়ী হবে সে কথা শুনতে পাই তাঁর কবিতায়। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষার জন্য শাহাদাত বরণকারী বীরদের স্মরণে ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২-তে নির্মিত প্রথম শহীদ মিনার ২৬ ফেব্রুয়ারি দুর্বৃত্তরা ভেঙ্গে ফেললে কবি রচনা করেন 'যাদের বুকের রক্তে মাতৃভাষা পেয়েছে সম্মান' নামক কবিতাটি। এটি ১৯৫৩ সালে (১৩৬০ ভাদ্র সংখ্যা) 'মাসিক মোহাম্মদীতে ছাপা হয়। কবি তাঁর কবিতায় বলেন :

"যাদের বুকের রক্তে মাতৃভাষা পেয়েছে সম্মান
সংগীনের মুখে যারা দাঁড়ায়েছে নিষ্পাপ, অম্লান
মানে নাই কোন বাধা, মৃত্যু ভয় মানে নাই যারা,
তাদের স্মরণ চিহ্ন এ মিনার কালের পাহারা"

শহীদগণের প্রতি তাঁর এ অনুরাগ মাতৃভাষা প্রেমেরই অনুরাগ। পরবর্তীতেও তিনি অন্য একটি সনেটে শহীদগণের আত্মত্যাগকে মুক্তির পয়গাম রূপে পঙ্‌ক্তিবদ্ধ করেছেন। তাঁর 'শহীদ স্মরণে' কবিতায় সে চেতনাই ফুটে উঠেছে।

**শহীদ স্মরণে**

মৃত্যু আসে পা'য় পা'য় মৃত্যু আসে নিভৃত গোপনে,
মৃত্যু আসে অলক্ষিতে, মৃত্যু আসে হিমেল প্রশ্বাসে,
ক্লেদ কীর্ণ জীবনের রুদ্ধদ্বার কক্ষে মৃত্যু আসে;
মৃত্যু আসে তিলে তিলে শ্রান্তি-ম্লান সুপ্তির বন্ধনে।

আর এক মৃত্যু আসে এ জীবনে মুক্তির স্পন্দনে,
শুষ্ক সমাধির বুকে প্রাণবন্ত বহ্নির আভাসে,

শহীদের তাজা রক্তে অন্তহীন মাটিতে, আকাশে
দুর্গমের অভিযাত্রী লক্ষ কোটি আত্মার ক্রন্দনে।

মৃত্যু তবু মৃত্যু নয়! নিল যা'রা শহীদী শপথ,
মৃত্যু-বিভীষিকা মাঝে পেল যারা প্রাণের সঞ্চয়,
মৃত্যুর পরিখা প্রান্তে ওঠে আজ তাহাদেরি জয়;
অমর্ত্য, মহিমা-দীপ্ত প্রোজ্জ্বল প্রাণে শাহাদত;
ক্ষুদ্র পরিধির বুকে আনে নিত্য নতুন বিস্ময়
মরণের অন্ধকারে করে মুক্ত জীবনের পথ॥

বাংলা ভাষা নিয়ে গত শতাব্দীতেও পশ্চিমবঙ্গের পণ্ডিতগণ ষড়যন্ত্র করেছেন। তারা 'ইসলামী বাংলা' বা 'মুসলমানী বাংলা' নামে আমাদের বাংলাদেশের ভাষাকে আলাদা করার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছেন। ড. সুকুমার সেনের মতো লেখকও ভাষার এ বিভাজনে– বই লিখেছেন। আবার তারাই যখন বাংলা ভাষার অভিন্নতার প্রশ্ন তোলেন তখন এর জবাব গদ্যের ভাষায় দেয়াটাই স্বাভাবিক। আমাদের লেখকগণ-এর জবাবও দিয়েছেন। কিন্তু কবি তাঁর কবিতার মাধ্যমে ভাষার স্বকীয়তার ও ভিন্নতার এ বিষয়টি যে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা লক্ষ্য করি তাঁর 'হাল্কা লেখা' শিরোনামের কবিতায়।

বাংলা ভাষা এক যদি 'মুসলমানি বাংলা' কেন কও?
হিন্দু রূপ দিতে তাকে সংস্কৃতের; বোঝা কেন বও?
"বাঙালীর একভাষা' কিভাবে এ গুরুবাক্য মানি?
ব্রাহ্মণ্যবাদীর 'জল' কি কারণে হয় নাই পানি॥

ফররুখ আহমদের সমগ্র সাহিত্যকর্মের মধ্যে মাতৃভাষা বাংলা ভাষার পক্ষে বলিষ্ঠ অবস্থান তাঁকে একজন মাতৃভাষা প্রেমিক এবং খাঁটি দেশপ্রেমের অতন্দ্র প্রহরীরূপেই আমরা দেখতে পাই। স্বজাতি এবং মাতৃভাষার সপক্ষে তাঁর এ অবস্থান যুগ যুগ ধরে এ জাতিকে প্রেরণা যুগিয়ে যাবে।

---

[ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ৫ম সংখ্যা, জুন, ২০০২]

# ফররুখের অনুবাদ প্রতিভা ও কোরআনের কাব্যানুবাদ

**মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ্**

।।১।।

ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) বাংলা কাব্যসাহিত্যে চিরউজ্জ্বল ধ্রুবতারা হয়ে অনন্তকাল জোছনা বিলিয়ে যাবে সে কথা প্রমাণিত হয়ে গেছে। সাহিত্যের বিচিত্র ক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্টির কলেবর খাটো হলেও প্রত্যেকটি সৃষ্টি কিন্তু বিস্ময়কর। তিনি বিপুলপ্রাজ না হলেও বিরলপ্রজ নিশ্চয়ই। গাছের পরিচয় যেমন ফলের সংখ্যাধিক্যে নয়, বরং ফলের রস-গন্ধ-স্বাদে, তেমনি প্রতিভার প্রকৃত পরিচয়ও সৃষ্টির বহুলতায় নয়, নৈপুণ্যে ও বিরলতায়; স্বাতন্ত্রিক মহিমায়। বিশ্বাসের দার্ঢ্য, শিল্পের নৈপুণ্য ও শৈল্পিক স্বাতন্ত্র্য তাঁকে অনন্য সাধারণ কবির মর্যাদা দান করেছে। সুর-ছন্দ, শব্দের অপরূপ ব্যবহার, আধুনিক কাব্যরীতি, অলঙ্কার-প্রতীক-উপমা-রূপক-রূপকল্প ও চিত্রকল্প, ভিন ভাষার শব্দের প্রয়োগনৈপুণ্য ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি বাংলা কাব্যকে অভাবিতপূর্ব ঔজ্জ্বল্য দান করেছেন। চেতনালোকের বিরাটত্বে, বিষয়ের বৈচিত্র্যে, অনুভবের গভীরতায়, বোধের ব্যাপকতায়, ভঙ্গির বহুধা বিকাশে, আঙ্গিক স্বাতন্ত্র্যে তাঁর কবিতা স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল।

।।২।।

ফররুখ-প্রতিভার একটি উজ্জ্বল দিক, যা আজও উপেক্ষিত ও অনালোচিত রয়ে গেছে, তা হলো ফররুখের অনুবাদ-প্রতিভা। এ-দিকটি কেন বা কিভাবে উজ্জ্বল? নিচের আলোচনার দ্বারা তার কিঞ্চিৎ পরিমাণে হলেও ধারণা পাওয়া যাবে। তার আগে একটি প্রশ্নবাক্য লিখে দিতে চাই। তা হলো, ফররুখ-অনুরাগী সমালোচক ও গবেষকরা কেন এ-দিকটি নির্মমভাবে এড়িয়ে গেলেন? 'নির্মমভাবে' বলছি এজন্য যে, 'ফররুখ একাডেমী' কর্তৃক প্রকাশিত মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্ রচিত 'বাংলাকাব্যে ফররুখ আহমদ : তাঁর শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ গ্রন্থে অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান বিরচিত 'ফররুখচর্চা : সেকালে ও একালে' শিরোনামে ফররুখ আহমদকে নিয়ে রচিত গ্রন্থ ও তাঁকে নিয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার একটি জরিপ দিয়েছেন। সেখানে মৌলিক ও স্বতন্ত্র ১০টি গ্রন্থ, ১৯টি বিশেষ সংখ্যা এবং ৪৮টি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের কথা সন্নিবেশিত হয়েছে এবং লেখক প্রত্যেকটি গ্রন্থ ও পত্রিকার সূচিও লিপিবদ্ধ করেছেন। এত দীর্ঘ ফিরিস্তিতেও ফররুখের অনুবাদ সম্পর্কে কোনো লেখা দেখা যায়নি।

সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা হলো, আবদুল মান্নান সৈয়দের মতো কৃতবিদ্য গবেষক, যিনি আবার ফররুখ-অনুরাগী সমালোচক ও গবেষকদের অন্যতমও, তিনিও ফররুখের অনুবাদ সম্পর্কে তেমন কোনো আলোচনা করেননি। ফররুখকে নিয়ে তাঁর গভীরাশ্রয়ী গবেষণাগ্রন্থ 'ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য'-এ ফররুখের গ্রন্থপঞ্জির

তালিকায় 'কুরআন-মঞ্জুষা' ও 'ইকবালের নির্বাচিত কবিতা'র নামটুকু শুধু উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁর অনুবাদ-প্রতিভা, শক্তি ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে কোনো আলোচনাই করেননি। সেই সঙ্গে তাঁর গ্রন্থে সন্নিবেশিত ফররুখকে নিয়ে লিখিত গ্রন্থ ও পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাগুলোতেও (১২ পৃষ্ঠাব্যাপী) কোথাও এ-বিষয়ে কোনো রচনার সাক্ষাৎ মেলেনি। ব্যতিক্রম শুধু মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্। তিনি 'বাংলাকাব্যে ফররুখ আহমদ : তাঁর শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ' গ্রন্থে ফররুখের অনুবাদ নিয়ে দীর্ঘ দু'টি প্রবন্ধ লিখেছেন : 'আল-কুরআনের অনুবাদে ফররুখ আহমদের অবদান' (পৃ. ২৮১-২৯২) এবং 'ইকবাল-কাব্যের অনুবাদক ফররুখ' (পৃ.২৯৩-৩০৩)। এছাড়াও তিনি ফররুখ-অনূদিত 'ইকবালের নির্বাচিত কবিতা'র ১৬ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ ভূমিকায় (যা মূলত উপরিউক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধের পরিমার্জিত রূপ) ফররুখের অনুবাদ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছেন। আমার অনুসন্ধান ও ঘাঁটাঘাঁটির বাইরেও ফররুখকে নিয়ে রচিত অনেক কিছু থাকতে পারে; থাকাটা স্বাভাবিক। তবে তাঁকে নিয়ে রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাগুলোতে তাঁর অনুবাদ নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা হয়নি। তার প্রকৃত কারণ ও রহস্য ডুবুরি গবেষকরাই বেশি বলতে পারবেন।

একটি কারণ এও হতে পারে, ফররুখের অনূদিত কবিতাগুলোর প্রতি পাঠক ও গবেষকদের অনাগ্রহ ও অকৌতূহল। কারণ, তাঁর অনূদিত কবিতাগুলোর মধ্যে মৌলিকভাবে দু'ধরনের কবিতা রয়েছে: কোরআন কারিমের অংশবিশেষ এবং ইকবালের কিছু কবিতা। কোরআন কারিমকে পাঠকরা যত না পাঠ করে একটি ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে, তার চেয়ে খুব কমই পাঠ করে কাব্যিক রস উপভোগের জন্যে। সুতরাং কোরআনের কাব্যানুবাদের প্রতি পাঠক-গবেষকদের আগ্রহ থাকার কথা নয়। অপরদিকে ইকবালের কবিতার প্রতি পুরো বাংলাদেশে বিভাগপূর্বকালে যে উপচেপড়া আগ্রহ ছিল, তা বিভাগ-উত্তরকালে শোচনীয়ভাবে কমে যায়। এমনকি একপর্যায়ে নিভেও যায়। ফলে ইকবালের অনূদিত কবিতার প্রতি পাঠক-গবেষকদের হৃদয়ভরা আগ্রহ ও আন্তরিকতা না থাকাই স্বাভাবিক। ফররুখ-অনূদিত কবিতার প্রতি আগ্রহ না থাকার আরেকটি কারণ হতে পারে অনূদিত কবিতার সংখ্যাল্পতা। তাঁর অনূদিত কবিতা সংখ্যায় খুবই কম। তাছাড়াও তাঁর অনূদিত কবিতাগুলো গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে বহু পরে। এমনকি তাঁর অনূদিত কোরআনের অংশবিশেষ এখনও গ্রন্থভুক্ত হয়নি। এসব কারণ সাধারণ সমালোচক ও গবেষকদের বেলায় হয়তো প্রযোজ্য, কিন্তু সিরিয়াস সমালোচক ও গবেষকদের বেলায় কিছুতেই প্রযোজ্য নয়। সংখ্যাল্পতা কোনো কারণই হতে পারে না। কারণ, শিল্পসফলতা সংখ্যাধিক্যে নয়, শিল্পের নৈপুণ্যে,সৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যে।

ফররুখের অনুবাদ গুণে-নৈপুণ্যে, মূলানুগতায়-বিশ্বস্ততায়, বিদেশী রূপকল্পের দেশি রূপায়ণে, ভিনভাষী চিত্রকল্পের নিজভাষিক চিত্রায়ণে মৌলিক সৃষ্টির মহিমায় মণ্ডিত। শিল্পের উৎস তো শিল্পীর চিন্ময় ও মৃন্ময় ভূগোল। ফররুখের সে ভূগোল ব্যাপ্ত-ব্যাপৃত। সে ভূগোলের পরিবেশ-পেলবতা তাঁর শিল্প-আবহে প্রভূত প্রভাব ফেলেছে। সে প্রভাব যেমনি মৌলিক রচনায়, তেমনি তাঁর তর্জমায়, তর্জমার

শিল্পোত্তীর্ণতায়। শিল্পীর সৃজনধর্মী প্রতিভা স্থবির নয়, সৃজনে অস্থির, একচারী নয়, বহুচারী। সে সৃজনপ্রতিভার প্রভাব একইভাবে মূলশিল্পেও, 'প্রতিশিল্পে'ও। শব্দে-ছন্দে, মূলের মর্ম-মেজাজ রূপায়ণে, বলার ভঙ্গিতে-সঙ্গীতে, উপমা-রূপকের স্বদেশীকরণে, চিত্রকল্পের নিজপরিবেশীয় পরিবেশনে তাঁর অনূদিত কবিতা যেন তাঁরই রচিত কবিতা। অনুবাদপনার ফেনায়িত জলাশয়ে পরিণত হয়নি তাঁর অনূদিত কবিতাগুচ্ছ। এ-কথা তাঁর কোরআনের অনুবাদের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য ইকবালের কবিতা-অনুবাদের ক্ষেত্রে। ইকবাল কাব্যের অনূদিত কিছু চরণ দেখা যাক–

দেখ এই ঘনঘটা বর্ষণমুখর মেঘ
দেখ এই অবিশ্রান্ত শ্রাবণী বাদল,
আকাশের এ গম্বুজ শব্দহীন আবহমণ্ডল,
এ পাহাড়, এ সমুদ্র, বালিয়াড়ি এ মরুতল,
নিয়ন্ত্রিত হবে এরা তোমারি শাসনে।

**(ইকবালের নির্বাচিত কবিতা, পৃ. ১)**

গোধূলি-মগ্ন মেঘ ছুঁয়ে যায় খাড়া পাহাড়ের উঁচু কপাল,
সূর্যাস্তের রক্তাভা যেন বাদাখশানের হীরক লাল।
সহজ সরল কৃষাণ কুমারী গেয়ে যায় এক আতশী গান,
হৃদয় তরীর পথে যৌবন যেন উচ্ছল বিপুল বাণ।

**(ইকবালের নির্বাচিত কবিতা, পৃ. ১৮)**

এ কবিতাগুলো উচ্চারণ করলে কী মনে হয়, বিদেশি ও ভিনভাষী কবির কবিতার অনুবাদ? বরং মনে হয়, বাংলার প্রেম-পেলব নিসর্গ-প্রকৃতি দেখে দেখে যেন একজন শিল্পী কাগজের সাদা জমিনে কালি ও তুলির টানে অনুভূতিপ্রবণ মনের গ্রাফ পরিস্ফুটিত করেছেন।

।।৩।।

এবার মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি, আগেই বলে এসেছি যে, ফররুখের অনূদিত কবিতা মৌলিকভাবে দু'ধরনের: কোরআন কারীমের অংশবিশেষ এবং ইকবালের কিছু নির্বাচিত কবিতা। এছাড়াও রুমী, শেখ সাদী, হাফিজ, শাহ আবদুল লতিফ ভিটাই, মওলানা লিয়াকত আলী এলাহাবাদী প্রমুখের দু'একটি কবিতাও তিনি অনুবাদ করেছেন। কিন্তু ইকবাল থেকে অনুবাদ করেছেন সবচেয়ে বেশি। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে (১৯৮৭-এ) প্রকাশিত তাঁর 'মাহফিল' কাব্যগ্রন্থ-এ শেখ সাদীর ২টি, খৈয়ামের ১টি এবং আল্লামা জামীর ২টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

নজরুল-গোলাম মোস্তফাসহ অন্যদের মতো ফররুখও কোরআন কারীমের অংশবিশেষ অনুবাদ করেছেন। ফররুখ সব অনুবাদে কাব্যরীতি অনুসরণ করেননি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গদ্যছন্দ ও গদ্যরীতিও অনুসরণ করেছেন। ফররুখ অনুবাদ করেছেন পুরো 'আমপারা' এবং সূরা বাকারা, ইয়াসিন, দাহার (আরবদের মতে

ইন্সান), মুনাফিকুন, তাগাবুন, কলম, মুলুক, নূহ, মুজ্জাম্মিল' ইত্যাদি। বিভাগ-পূর্বকালে 'মোহাম্মদী-সওগাত' প্রভৃতি পত্রিকায় ফররুখ-অনূদিত কিছু কিছু সূরা ও আয়াত প্রকাশিত হয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে তাঁর অবলম্বন ছিল মাওলানা মোহাম্মদ আলীকৃত কোরআন কারীমের ইংরেজি অনুবাদ।

উল্লেখ্য যে, কোরআন একটি ধর্মগ্রন্থ ও বিধি-নিষেধের সমষ্টিমাত্র নয়। কোরআন সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একজন ফরাসি দার্শনিক বলেছেন, 'কোরআন ভাষাবিদদের জন্য একটি শব্দকোষ, কবিদের জন্য একটি কাব্যগ্রন্থ।' অতুলনীয় সাহিত্যগুণে কোরআন পরিপূর্ণ। কোরআন কাব্যময়, গদ্যশৈলী, উপমা, রূপক, উচ্চ ভাষার সাহিত্যমূল্য ও বর্ণনায় অপরিসীম সমৃদ্ধ। কোরআন শুধু সত্য দর্শন নয়, সাহিত্যও বটে। ইসলাম-পূর্বকালের 'অন্ধকার যুগ' ইতিহাসের এক কালিমা-কালো অধ্যায় হলেও সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার দিক দিয়ে সে-যুগ ছিল শৌর্যে-কৌমার্যে উপচেপড়া। আরবদের মাঝে ভাষা-সাহিত্যের চর্চা হতো পুরোদমে, পূর্ণোদ্যমে। কবিতারচনা, পাঠের আসর ও মেলা ছিল তাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। সে সময় নবী (সা.)-এর মুখনিঃসৃত আসমানি বার্তা শুনে থমকে দাঁড়াল আরববাসী। অমিয় ঐশী বাণীর সাবলীল শব্দ ও চমৎকার ছন্দাকর্ষণে আন্দোলিত হলো তাদের হৃদয়। সমকালীন সুবিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকরা বিমোহিত নয় শুধু, পরাভূতও হলেন। আর এ মুগ্ধ-পরাভূত হওয়ার কারণ ছিল তার অলৌকিক-বিস্ময়কর ভাষাগুণ। কারণ, কোরআনের ভাষার কাব্যধর্মিতা, ছন্দ-মহিমা ও অন্ত্যমিল অতুলনীয় ও মানুষের পক্ষে অসৃজনীয়। অপরদিকে বহুদিক বিবেচনায় আরবি ভাষা বাংলা ভাষা থেকে প্রণালীগতভাবে সম্পূর্ণ বিপরীত। ফলে বাংলা ভাষায় কোরআনের সরল অনুবাদও কঠিন এবং কাব্যানুবাদ, বিশেষত ছন্দোবদ্ধ রীতিতে, আরও কঠিনতর। ফলে বাংলায় কোরআনের অনুবাদ করতে হলে আরবি-বাংলা উভয় ভাষায় পরিপূর্ণ জ্ঞান ও সম্যক দক্ষতা অপরিহার্য। আর কাব্যানুবাদের ক্ষেত্রে গভীর ছন্দবোধ, ছন্দজ্ঞান ও কাব্যরচনায় অসাধারণ দক্ষতা জরুরি। বাংলা ভাষার জ্ঞান-অভিজ্ঞতা-দক্ষতার অধিকারী একজন শক্তিমান, প্রতিভাধর ও ছন্দদক্ষ কবির পক্ষেই শুধু সম্ভব কোরআনের যথাযথ অনুবাদ। এই দুরূহতার কারণেই কবি গোলাম মোস্ত ফা আরবি-বাংলা উভয় ভাষার পর্যাপ্ত-গভীর ছন্দজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কোরআনের অনুবাদ করেছেন গদ্যছন্দে।

উপরিউক্ত তত্ত্বালোচনার আলোকে ফররুখের অনুবাদকে বলতে হয় তাঁর প্রতিভার আরেকটি বিস্ময়। ভীষণ বিস্ময় জাগে যে, তিনি আরবি ভাষায় দক্ষতা দূরের কথা, ভালো জ্ঞান পর্যন্ত না রেখেও মূল ইংরেজি অনুবাদের অনুসরণে সুন্দর, চমৎকার ও মূলানুগ অনুবাদ করেছেন এবং তাতে তিনি শিল্পোত্তীর্ণ ও শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধিও লাভ করেছেন। যেহেতু ফররুখের অনুবাদ সম্পর্কে তেমন কেউ আলোচনা করেননি, তাই আমি এই মুহূর্তে অন্য কারও পর্যালোচনার উদ্ধৃতি দিতে পারছি না। উদ্ধৃতি দিতে পারছি শুধু একজন ব্যক্তি ফররুখ-চর্চার কিংবদন্তি-পুরুষ মোহাম্মদ

মাহ্ফুজউল্লাহ্। তিনি প্রাগুক্ত গ্রন্থে গোলাম মোস্তফা, নজরুল, ফররুখ প্রমুখের অনূদিত কোরআনের বিভিন্ন অংশের উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং ফররুখ সম্পর্কে শুধু এতটুকু বলেছেন, 'ফররুখ আহমদের অনুবাদে তাঁর নিজের কবিতার মতোই উচ্চারণের বলিষ্ঠতা ও উদগত কণ্ঠ ধ্বনিত। ...বিভাগ-পূর্বকালে ফররুখ আহমদ 'কোরআন' শরীফ থেকে যেসব সূরার কাব্যানুবাদ করেছেন, সেগুলো যে অধিকতর আকর্ষণীয় ও বলিষ্ঠ ব্যঞ্জনাধর্মী তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।' কিন্তু তিনি তাঁদের অনুবাদের সার্থকতা, শিল্পোত্তীর্ণতা ও মূলানুগতার তুলনামূলক আলোচনা থেকে বিরত থেকেছেন এবং এ ব্যাপারে তিনি আরবি ভাষা ও কোরআন অনুবাদে নিজের অনভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন, "গোলাম মোস্তফা, নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমদ প্রমুখের অনূদিত কোরআন শরীফের বিভিন্ন সূরার যে অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হলো, তাতে কে কতখানি মূলানুগ এবং অনুবাদে কতটুকু সার্থক এবং কার অনুবাদ সবচেয়ে উত্তীর্ণ, তা আমার পক্ষে যাচাই ও নির্ণয় করা কঠিন। কেননা, আমি আরবি ভাষায় অনভিজ্ঞ এবং কোরআন শরীফের অনুবাদের কোনো অভিজ্ঞতাও আমার নেই। আরবি ভাষায় অভিজ্ঞ ও দক্ষতার অধিকারী এবং কোরআন শরীফ মূল আরবিতে পাঠ করে বুঝতে সক্ষম ব্যক্তিরাই উপরিউক্ত বিভিন্ন জনের অনুবাদের মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবেন।' (বাংলাকাব্যে ফররুখ আহমদ : তাঁর শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ, পৃ. ২৮৯।)

এখানে মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্র আলোচনার ওপর আমি কিছু সংযোজন করতে চাই। যেহেতু আরবি ভাষা ও সাহিত্যচর্চার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের গূঢ়-গভীর সম্পর্ক, তাই আমি মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্র রেখে দেয়া দায়িত্বটি, কিঞ্চিৎ হলেও, পূরণ করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারছি বলে, পরম আনন্দিত। ফররুখকৃত কোরআনের অনুবাদগুলো থেকে আমি কিছু উদ্ধৃতি দেখাচ্ছি।

রবীন্দ্র-যুগের মুসলিম কৃতী-ছান্দসিক কবি গোলাম মোস্তফা, যিনি কোরআনের অতুলনীয় কাব্যসৌন্দর্য, ছন্দধ্বনির মাধুর্য ও অন্ত্যমিলের মোহনীয়তা বজায় রাখা দুরূহ বলে গদ্যছন্দে কোরআনের অনুবাদ করেছেন, তাঁর কৃত সূরা বাকারার প্রথম কয়েকটি আয়াত ফররুখও অনুবাদ করেছেন। উভয়ের অনুবাদ মিলিয়ে দেখলে বিজ্ঞ পাঠকরা বুঝতে পারবেন, কার কত কীর্তি ও গতি, সার্থকতা ও মূলানুগতা।

কবি গোলাম মোস্তফাকৃত অনুবাদ–

> "আলিফ্...লাম...মীম্
> এই সেই কিতাব
> শুবা নাই কিছু এতে
> খুদাভীরুদের এই পথের আলোকে
> যারা ঈমান রাখে বিল গায়িবে
> আর কায়েম করে সালোক
> আর দান করে তা থেকে

আমরা যা দিয়েছি তাদের..."

ঠিক একই আয়াতের অনুবাদ ফররুখ করেছেন এভাবে–

"আলিফ, লাম, মীম
মহাপ্রজ্ঞার পূর্ণ আধার আল্লাহ মহামহিম
অবতীর্ণ এ গ্রন্থ কোরআন সব সংশয়হীন
চালকবন্ধু তাহাদের, যারা সংযমী নিশিদিন
বিশ্বাস যারা রাখে আড়ালেও প্রতারণা নাহি জানে
প্রার্থনা যারা করে নিয়মিত প্রতিষ্ঠা সবখানে
আমাদের দেয়া সম্পদ হতে ব্যয় করে যারা আর
বিশ্বাস করে তোমাদের প্রেরিত মম বাণী সম্ভার"

উভয় অনুবাদে, সন্দেহ নেই, ফররুখের অনুবাদ কাব্যময়তায় বহু এগিয়ে। কিন্তু গোলাম মোস্তফার অনুবাদ একটু বেশি মূলানুগ। এছাড়াও 'সালাত কায়েম', 'ঈমান বিল গায়িব' ও 'খোদাভীরু' ইত্যাদি শব্দসমষ্টির কারণে তাঁর অনুবাদ কোরআনি ভাষা ও ভাষ্যের সঙ্গে বেশি সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে। তারপরও কথা থাকে, অনুবাদ তো অনুবাদই। তাতে মূলানুগতা যেমন থাকতে হয়, তেমনি অনুবাদপনা থেকে দূরে সরে তাকে মৌলিক রচনার কাছাকাছি পৌঁছুতে হয়। সেই হিসেবে ফররুখের অনুবাদ উতরে গিয়েছে বহুগুণে।

যে কোনো পাঠকের, আশা করি, সূরা ফাতেহা মুখস্থ আছে। এখানে উক্ত কবিত্রয়ের কৃত সূরায়ে ফাতেহার অনুবাদ পেশ করছি, যাতে পাঠকদের বিবেচনা করতে সুবিধে হয়।

গোলাম মোস্তফার অনুবাদ–

"সকল তারীফ্ সেই আল্লাহ্ তালার
নিখিলের রব্ যিনি পরোয়ার দেগার।
যিনি চিরপ্রেমময় চির-মেহেরবান
বিচারদিনের যিনি মালিক মহান।
তোমারই মোরা করি ইবাদত
তোমারি কাছেতে চাই শকতি মদদ।
দেখাও সরল পথ তাদের সে পথ
যাদের উপরে ঝরে তব নিয়ামত
নয় তাহাদের পথ অভিশপ্ত যারা
কিংবা যারা পথ পেয়ে হল পথহারা।"

নজরুল ইসলামের অনুবাদ–

"(শুরু করিলাম লয়ে নাম আল্লাহর)
করুণা কৃপার যাঁর নাই অপার
সকলি বিশ্বের স্বামী আল্লাহর মহিমা

করুণা কৃপার যাঁর নাই নাই সীমা।
বিচার দিনের বিভু। কেবলি তোমারি
আরাধনা করি আর শক্তি ভিক্ষা করি।
সরল সহজ পথে মোদেরে চালাও
যাদেরে বিলাও দয়া সেপথ দেখাও।
অভিশপ্ত আর পথভ্রষ্ট যারা, প্রভু
তাহাদের পথে যেন চালায়ো না কভু।

ফররুখ আহমদের অনুবাদ–

"শুরু করি নিয়ে আল্লাহর নাম মহামহিম
প্রভু সুমহান, যিনি রহমান, যিনি রহিম।
সব প্রশংসা আল্লার, যিনি রাব্বুল আলামিন
যিনি রাহমান, করুণা নিধান, পরম কৃপালু যিনি,
মহাবিচারক; যাঁর অধিকারে শেষ বিচারের দিন।
তোমারি দাস্য, তব ইবাদত করি শুধু মোরা প্রভু
তোমারি সমীপে যাচি মোরা শুধু সহায়তা শেষহীন।
চালাও মোদের সরল ও দৃঢ় তাদের সঠিক পথে
যারা পেল তব দান অফুরান, করুণা অপরিসীম।
চালায়োনা তুমি মোদেরকে প্রভু তাদের ভ্রান্ত পথে
অভিশপ্ত বা যাহারা ভ্রান্তি লীন।

এখন দেখা যাক, গুণে-মানে কার অনুবাদ কতটুকু উতরেছে। গোলাম মোস্তফার অনুবাদ অনেক বেশি মূলানুগ হলেও কাব্য-গুণে ম্লান। তাঁর শব্দচয়ন ও বাক্যের গাঁথুনি ঢিলেঢালা-অসুঠাম। নজরুল ও ফররুখের অনুবাদ কাব্যগুণে মোটামুটি কাছাকাছি। তবে আমার বিবেচনায় ফররুখের অনুবাদ বেশি উত্তীর্ণ। কারণ, ফররুখের শব্দচয়ন ও ক্রিয়ার কালনির্বাচন কোরআনের শান-মানের বেশি উপযোগী হয়েছে। ফররুখ 'রহমান', 'রাব্বুল আলামিন' ও 'ইবাদত' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা কোরআনের সঙ্গে বেশি সঙ্গতিপূর্ণ। প্রথমত এ কারণে যে, সেগুলো মৌলিকভাবে আরবি শব্দ এবং সেগুলোর অর্থও বাঙালি পাঠকরা সহজে বোঝে। দ্বিতীয়ত, সেগুলো এমন শব্দ, যার মূলভাব ও ব্যঞ্জনা বাংলায় কোনো একক শব্দ দ্বারা ধারণ করা যায় না। 'আরাধনা' আর 'ইবাদত', 'রাব্বুল আলামিন' আর 'বিশ্বের স্বামী'তে ভাবগত ও ব্যঞ্জনাগত যে পার্থক্য আছে, তা অবশ্য স্বীকার্য।

তবে ফররুখের অনুবাদ দীর্ঘ ছন্দে রচিত হওয়ার কারণে কোথাও কোথাও কোরআনের একটি শব্দের অর্থে বাংলা কয়েকটি প্রতিশব্দ ব্যবহার করতে হয়েছে এবং একটি বাক্যকে দু'টি বাক্যে ভাগ করতে হয়েছে। এটা কাব্যানুবাদের ক্ষেত্রে দোষণীয় নয়। কালনির্বাচনের কথা যে বলেছি, সেটা হলো এভাবে, নজরুলের অনুবাদে আছে 'যাদেরে বিলাও দয়া' বর্তমান কালজ্ঞাপক বাক্য, আর ফররুখের অনুবাদে আছে 'যারা পেল তব দান অফুরান' অতীত কালজ্ঞাপক বাক্য। কোরআনের

মূলে আছে অতীত কালজ্ঞাপক বাক্য। ওই বাক্য থেকে উদ্দেশ্য রাসূলের সাহাবিরা, যাঁদেরকে দান করা হয়েছে। 'যাঁদেরকে (এখনও) তুমি বিলাও দয়া', তাদের পথে আমাদের চালাও সে কথা এখানে উদ্দেশ্য নয়।

ফররুখের কোরআন অনুবাদের আরও দু'টি বিস্ময় 'আয়াতুল কুরসি' ও সূরা বাকারার সর্বশেষ (১৮৬ নং) আয়াতের অনুবাদ। যথাক্রমে–

**আয়াতুল কুরসি**

'তিনি আল্লাহ চির জীবন্ত, শাশ্বত প্রাণবান
তিনি অতন্দ্র, চির উপাস্য, একক অধীশ্বর
পৃথিবী নীলের মধ্যবর্তী সম্পদ, সুমহান
সবই শুধু তাঁর, সবই করে তাঁর করুণায় নির্ভর।
তাঁর অনুমতি বিনা কে করিতে পারে বলো আবেদন?
তিনি যে প্রাজ্ঞ যারা সম্মুখে, যা পিছে সঙ্গোপন
তাহার অসীম করুণা ব্যতীত পারে না মানব মন
বুঝিতে তাহার বিপুল জ্ঞানের বিন্দু নিদর্শন।

শোন রাব্বানা

**(সূরায়ে বাকারার ১৮৬ আয়াতের ভাবাবলম্বনে)**

শোন রাব্বানা, হে মহাপালক এ বিশ্ব চরাচরে
যদি ভুলে যাই, ভ্রমে পড়ি যদি ধরিয়ো না কৃপাভরে।
শোন রাব্বানা, সেই গুরুভার আমাদের শিরে দিয়ো না আবার,
যে বিপুল ভার দিলে তুমি প্রভু অতীতের নারী নরে।
শোন রাব্বানা, দিয়ো না যে বোঝা বওয়ার শক্তি নাই,
সাধ্যের অতিরিক্ত যা প্রভু তা থেকে মুক্তি চাই।
করো আমাদের পাপ মার্জনা, ঢাকো দোষ-ত্রুটি, বিলাও করুণা,
হে আলমপনা, মালিক মহান তুমি আমাদের তরে,
পূর্ণ বিজয় দাও আমাদের কাফির জাতির 'পরে।

**(মাহফিল, পৃ. ৯৭)**

সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া এ অনুবাদদ্বয় মূলানুগতার নিক্তিতে পরিপূর্ণভাবে উত্তীর্ণ। কাব্যছন্দের জন্য এখানে অতিরিক্ত শব্দ-বাক্যের ভারও বহন করতে হয়নি। মানতে হবে, এ অনুবাদে কাব্যগুণ গৌণ। কারণ, তিনি ঐশী গ্রন্থের অনুবাদে বাড়তি স্বাধীনতা নেয়া এবং কাব্য-সৌন্দর্য পুরোপুরি রক্ষা করার বিষয়টিকে প্রাধান্য দেননি। সূরা বাকারার শেষ আয়াতে একটি শব্দ আছে 'রাব্বানা' যার সরল অর্থ, 'হে আমাদের প্রভু'। ফররুখের অনুবাদের 'শোন রাব্বানা' এবং তার পুনরুক্তি এক অসাধারণ সাঙ্গিতিক আবহ সৃষ্টি করেছে। ■

---

(ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, তেইশতম সংখ্যা, জুন-২০১২)

# ফররুখ আহমদের হামদ ও নাত

## মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ

।।১।।

'হামদ' ও 'নাত' আরবি শব্দ। এ দুটি পরিভাষা হিসাবেও গণ্য। পরিভাষা আবার কাব্য-শাখার। হামদ মানে আল্লাহ্-প্রশস্তি, নাত মানে রাসুল-প্রশস্তি। প্রাচীনতম কাব্যের বেশির ভাগই ব্যক্তিবন্দনায় আকীর্ণ। বিশেষ করে রাজা-রাজড়া, উজির-আমলা ও বীর-যোদ্ধাদের বন্দনা। আবার কিছু-কিছু কাব্যে পাওয়া যায় দেব-দেবীর বন্দনা। অনুরূপভাবে মুসলিম রচিত সাহিত্যে আল্লাহ ও রাসুল বন্দনা এসেছে স্বাভিকভাবেই। হামদ তথা আল্লাহ-প্রশস্তির ধারা অবশ্যই প্রাচীন থেকে প্রাচীনতম কাল বেয়ে চলে আসছে-যখন থেকে কাব্যসাহিত্য অস্তিত্ব লাভ করেছে পৃথিবীর বুকে। এ ধারায় আল্লাহবিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলেই অংশগ্রহণ করেছে। কারণ, এ মহাবিশ্বমণ্ডল যিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁর বন্দনা সকলেই গাইবেন-সেটাই স্বাভাবিক।

নাত তথা রাসুল-প্রশস্তির ধারাটিও রাসুলের জীবদ্দশায়ই চালু হয়। তবে সাহাবায়ে কেরাম ইসলামের প্রচার-প্রসার ও কাফিরদের প্রতিরোধে খুব বেশি ব্যস্ত থাকায় তাঁর জীবদ্দশায় ধারাটি তেমন বিকাশ লাভ করেনি। রাসুলের জীবনে সর্বপ্রথম নাতকার কাব বিন যুহাইর। তিনি সর্বপ্রথম রাসুলের শানে সুদীর্ঘ কবিতা লেখেন 'বানত সু'আদ' নামে। আর নবী সা. খুশি হয়ে তাঁর পেছনের সব অপরাধ ক্ষমা করে দেয়ার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করেন এবং নিজের ডোরাকাটা মূল্যবান চাদরটি তাকে উপঢৌকন হিসাবে প্রদান করে নিজ হাতে সেটা তাঁর গলায় পরিয়ে দেন। এ স্বর্ণসূত্র ধরে হামদ-নাত আজ সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে, বিশেষ করে আরবি-ফার্সি-উর্দু-বাংলা প্রভৃতি মুসলিম ভাবধারাপুষ্ট ভাষাসমূহে, এক স্বতন্ত্র কাব্যধারার মর্যাদা পেয়েছে। উক্ত ভাষাচতুষ্টয় ছাড়াও ইংরাজি, ফারসি, তুর্কি, জার্মান, লাতিন, হিন্দি ইত্যাদি ভাষায়ও রাসুল-প্রশস্তিমূলক কবিতা রচিত হয়েছে প্রচুর পরিমাণে। বিশ্বসাহিত্যের বিভিন্ন ভাষায় হামদ-নাত লিখে যারা খ্যাত হয়েছেন, তাঁদের কয়েকজন হলেন : মুহাম্মদ শরফুদ্দীন বুসীরী (১২১২-১২৯৬), ফেরদৌসী (৯৩৫/৩৭/৪১-১০২০), ফরীদুদ্দীন আত্তার (১১১৯-১২২৯), মাওলানা রুমী (১২০৭-১২৭৩), হাফিজ সিরাজী (১৩২৫-১৩৯০), শেখ সাদী (১১৮৪-১২৯১), আবদুর রহমান জামী (১৪১৪-১৪৯২), আমীর খসরু হেলভী (১২৫৩-১৩২৫), ফৈজী, ইকবাল (১৮৭৫-১৯৩৮) প্রমুখ। মহাকবি গ্যাটেও (১৭৪৯-১৮৩২) নাত রচনা করেছেন জার্মান ভাষায়।

।।২।।

বাংলা সাহিত্যে হামদ-নাত ধারাটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। নাত ধারাটি সমৃদ্ধতর। বাংলা কাব্য-সাহিত্যের মধ্যযুগ থেকে হামদ ও নাত রচিত হতে শুরু করে নিখাদ আন্তরিকতার সঙ্গে। এ যুগে নাত রচনা করেন : সৈয়দ সুলতান, শেষ চান্দ, শাহ মোহাম্মদ সগীর, আলাওল, মোহাম্মদ খান, দৌলত কাজী, সৈয়দ মর্তুজা, হায়াত মামুদ, সৈয়দ হামজা, মুনশী জান মোহাম্মদ, শাহ গরীবুল্লাহ, মোহাম্মদ দানেশ, মোহাম্মদ খাতের, মালে মোহাম্মদ প্রমুখ। আধুনিক যুগে হামদ ও নাত রচনার ধারাটি বিদ্যমান রয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কবি। নজরুলের সমসাময়িক ও পরবর্তীদের মধ্যে যাঁরা নাত লিখে খ্যাত হয়েছেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন শাহাদৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, জসীমউদ্‌দীন, বে-নজীর আহমদ, বন্দে আলী মিয়া, কাজী কাদের নেওয়াজ, রওশন ইয়াজদানী, আ. ন. ম বজলুর রশীদ, আজিজুর রহমান, ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন, আবদুর রশীদ খান, আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, আবদুস সত্তার, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, ফজল শাহাবুদ্দীন, আবদুল হাই মাশরেকী, আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দীন, আল মাহমুদ, আফজাল চৌধুরী, ওমর আলী, আব্দুল মান্নান সৈয়দ, মুহম্মদ নুরুল হুদা, সৈয়দ শামসুল হুদা, আবদুল মুকীত চৌধুরী, আসাদ চৌধুরী, রুহুল আমীন খান, সাজজাদ হোসাইন খান, আবদুল হালীম খাঁ, মতিউর রহমান মল্লিক, মুকুল চৌধুরী, মোশাররফ হোসেন খান, আবদুল হাই শিকদার, জহুর-উশ শহীদ, মসউদ-উশ শহীদ, হোসেন মাহমুদ, আসাদ বিন হাফিজ, হাসান আলীম, রিফাত চৌধুরী, সায়ীদ আবু বকর, আহমদ মতিউর রহমান, তমিজ উদদীন লোদী, বুলবুল সরওয়ার, শেখ তোফাজ্জল হোসেন, নুরুল ইসলাম মানিক প্রমুখ। সমসাময়িককালে আরো অনেকেই হামদ-নাত রচনা করেছেন। (কৌতূহলী পাঠকের জন্য মুকুল চৌধুরী-সম্পাদিত ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন-প্রকাশিত 'মহানবী (সা)-কে নিবেদিত কবিতা' সংকলন দ্রষ্টব্য)।

উল্লেখ্য যে, ফররুখের পর এ পর্যন্ত হামদ-নাত কবিতার ক্ষেত্রে একজন কবি ও একটি কবিতা গ্রন্থকে কেউ অতিক্রম করতে পারেনি এবং আমি মনে করি- এটি তাবৎ বাংলাকাব্যে হামদ-নাতের এক অমর-অনতিক্রম্য গ্রন্থ হিসেবে সগৌরবে বেঁচে থাকবে- সেটি হলো আবদুল মান্নান সৈয়দের (১৯৪৩-২০১০) 'সকল প্রশংসা তাঁর'। প্রকাশের (১৯৯৩) মাত্র দু'দশকে গ্রন্থটির বহু সংস্করণ বের হয়েছে এবং গ্রন্থটির ওপর প্রকাশিত হয়েছে প্রায় দশটির মতো স্বতন্ত্র আলোচনা।

।। ৩ ।।

ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) বাংলা সাহিত্যের একজন মৌলিক প্রতিভাধর শক্তিমান কবি হিসাবে তাঁর সৃষ্টির বিভিন্ন দিক নিয়ে সন্তোষজনক আলোচনা হলেও তাঁর কবিকীর্তির একটি উজ্জ্বল দিক নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা হয়নি। সে উজ্জ্বলতম দিকটি হলো তাঁর হামদ-নাতকাব্য। অন্যান্য সমালোচক ও গবেষকরা তো

বটেই, ফররুখ-অনুরাগী সমালোচক ও গবেষকগণও এ-দিকটি নির্মমভাবে এড়িয়ে গেছেন! 'নির্মমভাবে' বলছি এজন্য যে, মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্ রচিত 'বাংলা কাব্যে ফররুখ আহ্মদ : তাঁর শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ' গ্রন্থে 'ফররুখ-চর্চা : সেকালে ও একালে শিরোনামে ফররুখ আহ্মদকে নিয়ে রচিত গ্রন্থ ও তাঁকে নিয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার (অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান প্রণীত) একটি দীর্ঘ তালিকা প্রদত্ত হয়েছে। সেখানে মৌলিক ও স্বতন্ত্র ১০টি গ্রন্থ, ১৯টি বিশেষ সংখ্যা এবং ৪৮টি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের কথা সন্নিবেশিত হয়েছে এবং লেখক প্রত্যেকটি গ্রন্থ ও পত্রিকার সূচিও লিপিবদ্ধ করেছেন। এতো দীর্ঘ ফিরিস্তিতেও ফররুখের হামদ-নাত কাব্য সম্পর্কে কোনো লেখা দেখা যায়নি। সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা হলো, আবদুল মান্নান সৈয়দের মতো কৃতবিদ্য গবেষক, যিনি আবার ফররুখ-অনুরাগী সমালোচক ও গবেষকদের মধ্যেও অন্যতম, তিনিও ফররুখের হামদ-নাত সম্পর্কে তেমন কোনো আলোচনা করেননি। ফররুখকে নিয়ে তাঁর গভীরাশ্রয়ী গবেষণাগ্রন্থ 'ফররুখ আহ্মদ : জীবন ও সাহিত্য'-এ ফররুখের পাণ্ডুলিপির পরিচায়ন পরিচ্ছেদে 'মাহ্ফিল' গ্রন্থের নামটুকু শুধু উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁর হামদ-নাত ও তাতে তাঁর শক্তি ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে কোনো আলোচনাই করেননি। সেই সঙ্গে তাঁর গ্রন্থে সন্নিবেশিত ফররুখকে নিয়ে লেখা গ্রন্থ ও পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাগুলোতেও (১২ পৃষ্ঠাব্যাপী) কোথাও এ-বিষয়ে কোনো রচনার সাক্ষাৎ মেলে নি। এমনকি ফররুখ একাডেমী পত্রিকার একুশটি সংকলনেও এ বিষয়ে কোনো স্বতন্ত্র প্রবন্ধ দেখা যায় নি। কোনো কোনো প্রবন্ধে আংশিকভাবে ও প্রসঙ্গক্রমে তাঁর ইসলামি গান-গজলের কথা এসেছে মাত্র। তবে কিছুদিন আগে মুকুল চৌধুরী 'ফররুখ আহমদের ইসলামি গান-গজল' নামে মাহ্ফিল গ্রন্থের একটি আলোচনা লেখেন, সেটাও হামদ-নাত নিয়ে, স্বতন্ত্র-মৌলিক কোনো আলোচনা নয়। তাই বলা যায়, ফররুখ আহ্মদের কবিকীর্তির এ একটি উপেক্ষিত ও অবহেলিত দিক।

কেন-কিভাবে এ দিকটি অনালোচিত থেকে গেছে, তার প্রকৃত কারণ ও রহস্য ডুবুরি গবেষকরাই বেশি বলতে পারবেন। ফররুখের হামদ-নাত নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা না হওয়ার একটি কারণ হতে পারে সংখ্যাল্পতা। তাঁর হামদ-নাত কবিতা সংখ্যায় খুবই অল্প। 'মাহ্ফিল' কাব্যগ্রন্থে মাত্র একত্রিশটি হামদ ও বারোটি নাত সন্নিবেশিত হয়েছে। তাছাড়া তাঁর হামদ-নাতসহ অন্যান্য ইসলামি গান-গজল গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে কবির মৃত্যুর তেরো বছর পর। এমনকি, তাঁর হামদ-নাতধর্মী বহু কবিতা ও গান এখনো গ্রন্থভুক্ত হয় নি। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তাঁর বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে, বেতারকেন্দ্রের আর্কাইভে। এসব কারণ সাধারণ সমালোচক ও গবেষকদের বেলায় হয়তো প্রযোজ্য, কিন্তু সিরিয়াস সমালোচক ও গবেষকদের বেলায় তা প্রযোজ্য নয়। সংখ্যাস্বল্পতা কোনো কারণই হতে পারে না। কারণ, শিল্পসফলতা সংখ্যাধিক্যে নয়, শিল্পের নৈপূণ্যে, সৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যে। ফররুখ আহ্মদের অন্যান্য কবিতার মতো হামদ-নাতও স্বমহিমায় ও স্বদর্পে দাঁড়িয়ে আছে কবিতার বহুকৌণিক গুণে ও মানে :

কাব্যগুণে, শিল্পনৈপুণ্যে, শব্দের কুশলী ব্যবহারে, ছন্দের মোহিনী মায়ায়, রূপক-উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্পের চাতুর্যে, সর্বজনপাঠ্যতায় ও আবৃত্তিযোগ্যতায়। তাঁর হামদ থেকে কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত হলো :

আসমান আর জমিনে যা আছে সকলি প্রভু তোমার
ধূলিতল থেকে দূর নীহারিকা, গ্রহ, তারা বেশুমার।
পুষ্পিত বন, গহীন কানন লতা পল্লব দল
পৃথ্বি ললাট-ধূ ধূ মরু মাঠ, সমুদ্র উচ্ছল
নিপূণ আর প্রাণবন্ত যে সৃষ্টির সম্ভার।
অনুকণা থেকে বিপুল বিশ্ব-ক্ষুদ্র, বৃহৎ যত
সৃষ্টি তোমার নির্দেশে তব আছে প্রভু অনুগত
অদৃষ্ট বা দৃষ্টিগোচর রওশন 'নূর' 'নার'।

**(হামদ : দুই, মাহফিল, পৃ.১)**

মুখর অথবা মৌন সকলে প্রশংসা গাহে তব
প্রাচীন বনানী অথবা সবুজ তৃণদল অভিনব
ঝর্ণার ধারা, সাগর, সাহারা-প্রসারিত বিয়াবান।
অঝোর বর্ষা বারি-বর্ষণে তব বন্দনা গায়,
অতল গভীর সুর ওঠে জেগে প্রশান্ত দরিয়ায়,
তারার মিছিলে তোমার তারিফ গাহে যে সারা জাহান।

**(হামদ : তিন, মাহফিল, পৃ.২)**

।। ৪ ।।

ফররুখ আহমদের হামদ-নাত মূলত সংকলিত হয়েছে 'মাহফিল' গ্রন্থে যা প্রকাশিত হয় কবির মৃত্যুর তেরো বছর পর ১৯৮৭-এ। প্রকাশ করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। গ্রন্থে কবি হামদ ও নাত বলে চিহ্নিত করেছেন কিছু-কিছু কবিতাকে। হামদ নামে চিহ্নিত করেছেন ৩১টি এবং নাত নামে চিহ্নিত করেছেন ১২টি। মোট ৪৩টি কবিতা। এছাড়া, হামদ-নাত নামে উল্লেখ না করলেও উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আরো কিছু হামদ-নাত পাওয়া যায়। হামদ যেমন : 'তাসমিয়া', 'আল কুরআন', 'হে মালেকু মুল্ক', 'ভয় কর তুই আল্লাহকে', 'যার অন্তরে ভাই আছে শুধু', 'আল্লাহ ছাড়া কারুর কাছে' ইত্যাদি। নাত যেমন : 'রবিউল আউয়াল' ১-৩, 'ঈদে মিলাদুন্নবী' ১-২, 'সে এলো, সে এলো', 'নবী মুহাম্মদ (সাঃ)' ইত্যাদি। উক্ত গ্রন্থে কবি খৈয়াম, সাদী ও জামীর কিছু নাতও অনুবাদ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, হামদ মানে শুধুই প্রশংসা বর্ণনা করা নয়। হামদের আরো ব্যাপক অর্থও রয়েছে। দোয়া, মোনাজাত, আল্লাহর সঙ্গে মিলনের আকুতি, দেশ-ধর্ম-জাতির সংকট মুহূর্তের সদরদ বর্ণনা ইত্যাদিও হামদের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচনা করেন কেউ কেউ। সে হিসাবে ফররুখের হামদ সংখ্যায় অনেক বেড়ে যায়। কারণ, উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে দোওয়া ও মোনাজাত নামে ৩৫টি কবিতা রয়েছে। তেমনিভাবে নাতের

পরিধিও সুবিস্তৃত। রাসূলের জীবনী, তাঁর চরিত্রের বর্ণনা, মদীনা থেকে দূরে অবস্থানের জন্য দুঃখ প্রকাশ, অপরাধের জন্য অনুশোচনা, সুপারিশ প্রার্থনা, রাসুলের কৃতিত্ব ও অবদান, দরুদ-সালামের আলোচনা ইত্যাকার বিষয়ও নাতের অন্তর্ভুক্ত।

হামদ-নাতের উক্ত ব্যাপক অর্থ ধরলে ফররুখ আহমদের হামদ-নাত সংখ্যায় আর অল্প থাকে না। তখন 'সাত সাগরের মাঝি' (১৯৪৪), 'সিরাজাম মুনীরা' (১৯৫২) ও 'কাফেলার' (১৯৮০) অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলো কবিতাকে হামদ-নাত বলে বিবেচনা করা যায়। বিশেষ করে সিরাজাম মুনীরা-কে তো পুরোপুরিই নাত বলা যায়। কোনো কবিতাকে বা কবিতাগ্রন্থকে হামদ বা নাতের অন্তর্ভুক্ত বললে তাতে সে সৃষ্টির জাত ও মান যায় না, বরং বাড়ে। মান যায় বলে যা আজ মনে করা হচ্ছে, সে ধারণা মূলত সাহিত্যে সাম্রাজ্যবাদী মন-মানসিকতারই বিষফসল। আসল দেখার বিষয়টা হলো কবিতাটি যথার্থ কবিতা হয়েছে কিনা। বিষয়, ধর্ম-নীতিকথা-হামদ-নাত, যাই হোক কবিতাকে প্রকৃত কবিতা করে তুলতে পারার কারণেই তো আজ খৈয়াম, হাফিজ, রুমী, সাদী, জামী ও ইকবাল অমর বিশ্বকবি হিসেবে শিরোপা ও স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাই ফররুখের সিরাজাম মুনীরাকে নাতকবিতা বললে তার মানকে ম্লান করা হয় না বলে আমি বিশ্বাস করি।

৫

ফররুখের হাম-নাত এবং অন্যান্য ইসলামি গান ও গজলের বক্তব্য- কোথাও বা পুরোপুরি কোথাও বা আংশিকভাবে- কুরআন ও হাদিসভিত্তিক। তাঁর লেখা হামদ ও নাতের পরতে পরতে ছড়ানো রয়েছে কুরআন ও হাদিসের বক্তব্যের নির্যাস। রয়েছে কোথাও বা শাব্দিক অনুবাদের মতো, আবার কোথাও বা ভাবার্থে বা বিশ্লেষণমূলকভাবে। যেখানে তিনি কোনো আয়াত বা হাদিসের সরাসরি তর্জমা করেছেন, সে ক্ষেত্রে তিনি ব্রাকেটে তা চিহ্নিত করে দিয়েছেন। যেমন,

হামদ : ষোল

(সূরা ত্বীনের ভাবানুসরণে)
গড়েছ মানুষ সেরা উপাদানে/রাববুল আলামীন
পরিবর্তনে করেছ তাকেই/আসফালা সাফেলীন।
তার বিশ্বাস, তার আচরণ/হয় কলুষিত, ক্লিণ্ন যখন
পাশবিকতার নিম্নে সে নামে/ক্লেদাক্ত, ধূলি-লীন।
মানুষ তখন অধম সবার/বিশ্বে মেলে না তুলনা যে তার
নিকৃষ্ট এ সৃষ্ট জগতে/জানি সবচেয়ে দীন।
নীচ কর্মের এই পরিণতি/তোমার বিচারে পায় দুর্গতি
বিশ্বাসী যারা করে সৎ কাজ/ফল পায় অমলিন।
দেয় তোমার বিচারে অপবাদ যারা/মিথ্যাবাদী ও ভ্রষ্ট যে তারা
অপক্ষপাত তোমার বিচার/জানি যে তুলনাহীন।

এ হামদটি কুরআন করীমের ৯৫নং সূরা ত্বীনের ভাবানুসারে রচিত। এভাবে তাঁর 'মাহফিল' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত একত্রিশটি হামদের মধ্যে তিনটি হামদ কুরআনের ভাবানুবাদস্বরূপ রচিত। যেমন হামদ : এক সূরা ফাতেহার ভাবানুসারে রচিত, হামদ: ষোল সূরা ত্বীনের ভাবানুসারে রচিত এবং হামদ : চব্বিশ আয়াতুল কুরসীর ভাবানুসারে রচিত। এছাড়াও উক্ত কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য ইসলামি গানে কুরআন করীমের ১০৭ নং সূরা মাউনের ভাবানুসারে রচিত একটি গজল এবং সূরা বাকারার ১৮৬ নং আয়াতের ভাবানুসরণে রচিত একটি মোনাজাত রয়েছে। এসব হচ্ছে যেখানে কবি নিজেই ভাবানুসরণে তর্জমা বলে চিহ্নিত করেছেন। কবির চিহ্নিত হামদ-নাত ছাড়াও আরো বহু হামদ-নাতে সরাসরি কুরআনের কোনো আয়াতের অনুবাদ বা কোনো প্রসিদ্ধ হাদিসের অনুবাদ পাওয়া যায়। উদাহরণ এন্তার রয়েছে। শুধু একটি হামদ দেখা যাক,

হামদ : কুড়ি

হে মালেকুল-মুলক-প্রভু!/কুল আলেমের সম্রাট মহান/
তোমার বিপুল বিশ্ব থেকে/ইচ্ছামত রাজ্য করো দান।
মালিক যখন ইচ্ছা তোমার/নাও, কেড়ে সে রাজ্য আবার/
ইচ্ছামত দাও সম্মান/ইচ্ছামত দাও অপমান/
ইচ্ছামত দাও তুমি কল্যাণ/সুনিশ্চিত সবার পরে/
প্রভু তুমি সর্বশক্তিমান।
দিনকে মেলাও রাতের মাঝে/রাতকে মিশাও দিনের মাঝে/
জীবন থেকে আনো মরণ/মরণ থেকে আনো জীবন/
তোমার মহান ইচ্ছামত/দাও জীবিকা;- রিজিক অফুরান।

উক্ত হামদটিতে কুরআন করীমের ৩নং সূরা (আল ইমরান)-এর ২৫-২৬ নং আয়াতের মূল বক্তব্যটাই প্রতিলিপিত হয়েছে। তবে আয়াতদ্বয়ের সরাসরি অনুবাদ নয়। সরাসরি অনুবাদ না হওয়াটা ভালোই হয়েছে। কারণ, আরবি ভাষা, উপরন্তু 'না গদ্য না কবিতা'র মতো কুরআনী ভাষাকে বাঙলায়িত করার যে অনিতক্রম্য জটিলতা, তা থেকে সহজে উত্তরণ হয়েছে। ফলে এসব হামদের বয়ন ও বুনন কবির স্বরচিত কবিতার মতোই সুস্থ, গতিময় ও টসটসে প্রাণবান হয়েছে। এখানেই ফররুখ আহমদের শক্তি ও স্বাতন্ত্র্য নিহিত।

ফররুখের হামদকবিতার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি 'আসমাউল হুসনা' তথা কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর গুণবাচক নিরানব্বইটি নাম কবিতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন- ভাবানুবাদের মাধ্যমে। এমনকি তিনি ৪৬টি নাম সরাসরি আরবিকে বাংলায় প্রতিবর্ণিকরণ করে ব্যবহার করেছেন। যেমন, 'রাববুন', 'নূর', 'আলেম' (আলিমুন), 'ইলাহ', 'যুলজালালি ওয়াল ইকরাম', 'মালিক', 'আউয়াল', 'আখের', 'ওয়াহেদ', 'আহাদ', 'লতিফু', 'খবীর', 'খালিকু', 'বারি', 'মুসাব্বির', 'হাইয়ু', 'কাইয়ুমু', 'হাদী', 'মুনয়িমু', 'মুনতাকিম', 'মুয়িজ্জু', 'মুযিল্লু', 'জব্বার', 'কহ্হার', 'কাদির', 'মুকতাদির',

'সামীয়ু', 'বাসীর', 'রাজ্জাক', 'মতীন', 'গাফফার', 'গফুর', 'সাত্তার', 'সবুর', 'আলিয়ু', 'আজিম', 'মাবুদ', 'মাকসুদ', 'মাওলা', 'ওয়ালি', 'ওয়াদুদ', 'জাহের', 'বাতেন', 'হাজের', 'নাজের' 'মওজুদ', ইত্যাদি।

যে পঙক্তিতে তিনি আল্লাহর গুণবাচক আরবি নাম, যার অর্থ তুলনামূলকভাবে একটু কঠিন, ব্যবহার করেছেন, সে পঙক্তির আগে বা পরে তার অর্থ ও ব্যাখ্যা করে দিয়েছে আশ্চর্য এক কুশলী ভাষায়। কয়েকটি উদাহরণ দেখা যাক–

আল্লাহ 'হাদী' কর তুমি সুপথ প্রদর্শন
হিদায়াতের আলোকে দিল কর যে রওশন।
হে 'মুয়িজ্জুল মুযিল্লু' হক মাওলা মহিয়ান
বান্দাকে দাও সম্মান আর দাও যে অসম্মান।
সর্বশক্তিমান হে মহান মালিক বিশ্ব ধরিত্রীর
সবার পরে শক্তি হে 'কাদিরুল মুকতাদির'।
হে 'সামীয়ুল-বাসীর''- প্রভু শোন তুমি সকল কথা
সকল কিছু দেখো তুমি, রাখো তুমি সব মতা।
তুমি 'আলিয়ুল আজিম' হে প্রভু! মহিমা যে অতুলন,
তব উন্নত মহিমা যে অতুলন।

কিছু কিছু কবিতায় আল্লাহর নামসমূহের কুশলী ব্যবহার লক্ষ্য করার মতো। পঙক্তির শেষ শব্দ হিসাবে ব্যবহার করেছেন আরবি নামগুলো। তাতে পূর্বাপরের ছন্দমিল ও অন্ত্যমিলের এক মনমাতানো সুরতাল সৃষ্টি হয়েছে। আর এখানেই ফররুখের শক্তি ও স্বাতন্ত্র্য সবিশেষ চিহ্নিত হওয়ার মতো। যেমন–

তোমাদের দেওয়া রূপ আলোকে ফুলের হাসি, রোশনি, রবির
জ্যোতিষ্কদের আলোর মিছিল;-'ইয়া লতিফুল খবীর।'
সর্বশক্তিমান হে মহান মালিক বিশ্ব ধরিত্রীর
সবার পরে শক্তি হে 'কাদিরুল মুকতাদির'।
অটল হে দ্বিধা-দ্বন্দ্বহীন
তুমি রাজ্জাক, তুমি মতীন।
পায় সান্ত্বনা, শান্তি-নূর
তুমি গাফফার, তুমি গফুর।
পায় নবরূপ পাহাড় তুর
তুমি সাত্তার, তুমি সবুর।

তাঁর নাতকবিতার ক্ষেত্রেও উপরিউক্ত বক্তব্যগুলো প্রযোজ্য। সেখানেও কবি রাসুলের গুণাবলি, রাসুলের প্রতি ভালোবাসা ও প্রেমনিবেদন কুরআন-হাদিসসম্মত পদ্ধতিতে করেছেন। কুরআন-হাদিসের আলোকে রাসুলের যেসব গুণ সর্বাগ্রে উল্লেখ্য, কবি সেগুলোর কথাই বেশি আলোচনা করেছেন। যেমন, কালিমা তাইয়িবার শেষাংশ 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ', কালিমায়ে শাহাদতে বর্ণিত, 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু',

কুরআনবর্ণিত 'উসওয়াতুল হাসান', 'রাহমাতুল্লিল আলামীন', 'খাতামুন নবীয়ীন', বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত 'শাফিউল মুজনাবিন', 'সাইয়েদুল মুরসালীন', ইত্যাদি। এমনকি কোনো কোনো কবিতায় কবি কুরআনের এক টুকরো আয়াত এবং উত্তরসূরী কোনো কবির কিংবদন্তিতুল্য কোনো পঙক্তিও জুড়ে দিয়েছেন নিজের কবিতার সঙ্গে। যেমন,

তোমায় জেনে অর্থ বুঝি, "অ-রাফায়ানা-লাকা-জিকরাক"
পাও যে আসন উর্ধ্বে সবার- রাহমাতুল্লিল আলামীন।
'জাহাঁ রওশনাস্ত আজ জামালে মুহাম্মদ'
হে অপরূপ সৃষ্টি খোদার
জাহান তোমার জামালে রওশন
খোদার রহম বিলিয়ে দিতে
ধূলির ধরায় তোমার আগমন।

প্রথমোক্ত কবিতায় কুরআনের ৯৪ নং সূরার ৪ নং আয়াতটি হুবহু উদ্ধৃত হয়েছে। আয়াতের অর্থ : 'আমি তোমার মর্যাদা উঁচু করে দিয়েছি।' দ্বিতীয় কবিতায় একজন ফারসি কবির একটি ফারসি পঙক্তি সরাসরি উদ্ধৃত করা হয়েছে। মহৎ ও উন্নত কবিতার ক্ষেত্রে এ ধরনের উদ্ধৃতি দোষের কিছু নয়, বরং সম্মানের। প্রায় সব মহৎ কবির কবিতায় এ ধরনের উদ্ধৃতি আছে, অন্য বড় কবির কোনো পঙক্তির অনুবাদ আছে, আছে অন্যভাষার বিখ্যাত কবির কবিতার ভাবানুবাদ।

হামদ-নাতে কবির শব্দচয়নও ঐতিহ্যানুসারী- তাঁর অন্যান্য কবিতার মতো। ফররুখের পূর্বে আধুনিক বাঙালি কবিদের মধ্যে অনেক কবি আরবি-ফারসি শব্দ সংযোজন করে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ ও তাতে নতুন রূপ সৃষ্টি করার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু নজরুল ছাড়া বিষয় ও ভাবের সঙ্গে ভাষার স্বতঃস্ফূর্ত গতি ও সঠিক সঙ্গতি রক্ষা করতে কেউ সক্ষম হননি। নজরুলের পরে ফররুখ আহমদই আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দের আশ্চর্য কুশলী ব্যবহারের মাধ্যমে বাঙালি মুসলিম মানসের সুপরিচিত সাংস্কৃতিক পরিবেশকে সার্থকভাবে রূপায়িত করেছেন। তাঁর এ দক্ষতা কবিতায় যেমন, তেমনি তাঁর হামদ-নাত ও অন্যান্য ইসলামি গানেও আশ্চর্য এক শিল্পসুষমায় মণ্ডিত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে।

ফররুখ আহমদের হামদ-নাতধর্মী কবিতা ও গানসমূহ গভীরভাবে পাঠ করে গবেষকরা তাঁর শক্তি, স্বাতন্ত্র্য এবং পুরো বাংলা কাব্যে তাঁর প্রভাবের কথা পাঠকের সামনে উপস্থাপন করতে পারেন। আমি শুধু বিষয়টির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি সামান্য ইঙ্গিত করলাম। এক্ষেত্রে ফররুখের অনুরাগী সমঝদার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ▭

# টেনিসনের ‘ইউলিসিস’ এবং ফররুখ আহমদের ‘সিন্দবাদ’ কবিতার তুলনামূলক পর্যালোচনা

মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন

আলফ্রেড লর্ড, টেনিসন জন্মগ্রহণ করেন যখন ইংরাজি সাহিত্যে রোমান্টিক যুগের জয়জয়কার চারদিকে। কিন্তু তাঁর কাব্য প্রতিভা প্রতিষ্ঠা পায় ১৮৩০ সালে যখন রোমান্টিক যুগের হঠাৎ অপমৃত্যু ঘটে। রাণী ভিক্টোরিয়ার সময়কালে যখন বৃটেনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কৃষি থেকে শিল্পের দিকে ধাবিত হয়। অর্থাৎ শিল্প বিপ্লবের ফলে কৃষি-নির্ভর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শিল্প-নির্ভর হতে থাকে। এছাড়া, রাজদরবারের নেশা ছিল পূর্ব ও পশ্চিমে নতুন নতুন ভূমি দখল করে নিজেদের সীমানা বাড়িয়ে অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করা। ফলে সভ্যতার প্রলেপে মানবতা দিনের পর দিন নিষ্পেষিত হয়েছে সে সমস্ত দেশগুলিতে। উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে ইংরাজগণ ঔপনিবেশিক দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি-ইতিহাস-ঐতিহ্য ও ধর্মকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দাসত্বের শিকলে সবাইকে বন্দি করে। এতকিছু করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের পরেও মানবিক বিপর্যয় তাদের গ্রাস করেছে। ফলে তাদের মধ্যে নানা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। বাস্তবতা পরিহার করে অজানায় পলায়নের নেশা পেয়ে বসে তাদের। এমন চিত্র খুব স্বাভাবিকভাবেই ফুটে উঠেছে রোমান্টিক ও ভিক্টোরিয়ান যুগে কবি-সাহিত্যিকদের লেখনীতে।

কিন্তু ফররুখ আহমদের জন্ম (১৯১৮) ঔপনিবেশিক শাসনে ভারতীয় উপমহাদেশ যখন তার পুরো ইতিহাস-ঐতিহ্য-গৌরব-সংস্কৃতি হারিয়ে এক পরগাছা জাতিতে পরিণত হয়েছে এবং নবজাগরণের মাধ্যমে কেউ কেউ যখন সভ্যতার নামে বৃটিশরা যে দাসত্বের শিকল তৈরি করেছে তা ভেঙ্গে সত্যিকারের সভ্যতার বিজয় পতাকা উড়াতে চেয়েছেন তখন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৭) তাণ্ডব থেমে গেলে তাঁর জন্ম হয়। তিনি যখন যৌবনে পদার্পণ করেন, কাব্যজগতে প্রবেশ করে কবিতার ভুবনে রঙ ছড়াবার কাজে ব্যস্ত (তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে খুলনা জেলা স্কুল ম্যাগাজিনে), তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি ও ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে মানবিকতার যে বিপর্যয় ঘটে, তা তাঁকে বেশ নাড়া দেয়। তিনি তাঁর সে অনুভূতির প্রকাশ ঘটাতে থাকেন তাঁর কবিতায়। কবিতায় খুঁজে ফেরেন মুক্তির উপায়। পেয়েও যান অবশেষে। ইসলামের ঐতিহ্য ও মূল্যবোধই পারে চরম অমানবিকতার শিকল ভেঙ্গে বিপন্ন পৃথিবীতে নতুন মানবিক সভ্যতার পতাকা উড়াতে। তাঁর এ উপলব্ধি কোন ব্যক্তি, অঞ্চল বা জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা।

তিনি বিশ্ব-মানবতার মুক্তির কথা বলেছেন। যেখানে টেনিসন ব্যক্তি-কেন্দ্রিক সব চিন্তার কথা বলেছেন তাঁর কবিতায়।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে দু'জন দু'মেরুর কবি হবার পরও কেন দু'জনের কবিতার তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হচ্ছে। এ কারণে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হচ্ছে যে টেনিসন আত্মকেন্দ্রিক প্রতিভা বিকাশের জন্য গ্রিক মিথ্‌কে ব্যবহার করেছেন সমুদ্র যাত্রার মাধ্যমে এবং ফররুখ আহমদ মুসলিম ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বমানবতাকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসে সমুদ্র যাত্রাকে ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া, টেনিসন যুগের প্রতিনিধি হিসাবে পরিচিত এবং সবার কাছে শ্রদ্ধেয় যদিও তিনি ঔপনিবেশিক শাসনের একজন সমর্থক ছিলেন। পক্ষান্তরে ফররুখ মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করার আহ্বান জানানোর পরও তাঁকে একটি গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। তাই এ দু'জনের উল্লেখিত কবিতা দু'টি পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রকৃত সত্য প্রতিষ্ঠাই এ প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

শুরুতেই উল্লেখ করেছি দু'জনের এ দু'টি কবিতায় বেশ মিল যেমন আছে তেমনি অমিলও রয়েছে। দু'টি কবিতাই বেশ আকস্মিকভাবেই শুরু হয়েছে এবং দু'টিতেই হতাশাব্যঞ্জক সুর পাওয়া যায়। 'ইউলিসিস' শুরু হয় "It Little profits that an idle king" দিয়ে এবং সিন্দবাদ শুরু হয় "কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ" দিয়ে। 'ইউলিসিস'-এ বলা হয়েছে দেশের রাজ্য পরিচালনা করছেন একজন অলস রাজা। ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন ঘটেনি। অন্যদিকে, 'সিন্দবাদ'-এ নির্দিষ্ট কোন দেশের কথা বলা হয়নি। বুঝানো হয়েছে পুরো মুসলিম জাতিকে। যে জাতি অলস এবং অতীত অর্জনের উপর ভর করে কেবল দিনের পর দিন 'রঙিন মখমলে' ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে। ফলে তারা সমৃদ্ধির পথ থেকে ভঙ্গুর ও ক্ষয়িষ্ণু অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে ধাবিত হচ্ছে।

তাই টেনিসন এবং ফররুখ দু'জনেই অলস জীবনকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন। এবং অলসতা ঝেড়ে ফেলে সামনে এগিয়ে যাবার আহ্বান জানিয়েছেন। টেনিসনের ভাষায় **"That hoard, and sleep, and feed, and know not me,/ I cannot rest from travel"** এবং ফররুখ আহমদের ভাষায় –

"কেটেছে রঙিন মখমল দিন ওজুদে চিকনা সরে,
তবু দূরচারী সফরের ঢেউ ভেসে এল বন্দরে,
হাতীর হাওদা ওঠাও মাহুত কিংখাব কর শেষ;
আজ নিতে হবে জংগী সাঁজেয়া মাল্লার নীল বেশ।"

দু'জন নাবিকের এটি প্রথম সমুদ্র যাত্রা নয়। উভয়ের অভিজ্ঞতা থাকায় অজানা বা অন্ধকার থেকে জানার আগ্রহ যেমন তীব্র তেমনি তিক্ত অভিজ্ঞতাও মনে করে

নিজেদের দমানোর চিন্তা বা চেষ্টা করেননি; ইউলিসিস উল্লেখ করেন তার অভিজ্ঞতাকে ঠিক এভাবে:

**"...All times I have enjoy'd**
**Greatly, have suffer'd greatly, both with those**
**That loved me, and alone"**

কিন্তু 'সিন্দবাদ'-এর বক্তা তার অতীত অভিজ্ঞতাকে বর্ণনা করেছেন এভাবে "নতুন পানিতে সফর এবার, হে মাঝি সিন্দবাদ!" এবং

"জানি না এবার কেবল স্রোতে মোরা হব ফিরে গুমরাহা
কোথায় খুলবে নওল ঊষার রশ্মিধারা সফেদ;
কোথায় জাহাজ হবে ফিরে বানচাল।"

এ দু'নাবিকের কারোই সমুদ্র যাত্রা খুব স্বাভাবিক ছিল না। দু'জনেই বেশ বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হন বার বার। ইউলিসিস বলেছেন, **"... have enjoy'd/ Greatly, have suffr'd greatly"**। অন্যদিকে, 'সিন্দবাদে'র বক্তা বলেছেন–

"আহা, সে নিকষ আকেক বিছানো কতদিন পরে ফিরে
ডেকেছে আমাকে নীল আকাশের তীরে,
ডেকেছে আমাকে জিন্দেগী আর মওতের মাঝখানে
এবার সফর টান্‌বে আমাকে কোন্ স্রোতে কেবা জানে!"

তাছাড়া, বক্তা দাবী করেছেন সমুদ্র যাত্রার ফলে ঝড়ের কবলে পড়ে জাহাজ লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতে পারে, দিনের পর দিন তক্তায় তাদের ভেসে কাটিয়ে দিতে হবে। কিন্তু এত ভয়ানক পরিস্থিতির পরও দু'জনের কেউ মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়তে রাজী নয়। ইউলিসিস যেমন বলেছেন–

**"–you and I are old;**
**Old age hath yet his honor and his toil.**
**Death closes all; but something are the end,**
**Some work of noble note, may yet be done."**

বৃদ্ধ হলেও ইউলিসিস তার সমুদ্র যাত্রা থামাতে চাননা। এখনো অনেক অজানা রয়েছে যেগুলি তার জানতে হবে। তাছাড়া জীবন অতি ক্ষুদ্র। তাই সময় নষ্ট করা মোটেও যাবে না। বৃদ্ধ ইউলিসিস তার সহনাবিকদের ডেকে বলছেন–

**"Come, my friends,**
**It's not too late to seek a newer world."**

তাই নাবিকদের আহবান জানাচ্ছেন **"Push off, and sitting well in order smite"**. আবার কখনো বলছেন–

**"My mariners,**
**Souls that have toil'd, and wrought, and thought will me."**

ইউলিসিস যেমন স্থির, দৃঢ় এবং সিদ্ধান্তে অটল তেমনি 'সিন্দবাদ'ও। সমুদ্রে যাত্রার ডাক শুনে বক্তা বললেন–

"সে কথা জানি না, মানি না সে কথা দরিয়া ডেকেছে নীল!
খুলি জাহাজের বানে উদ্দাম দিগন্ত ঝিলমিল,
জংগী জোয়ন দাঁড় ফেলে করি দরিয়ার পানি চাষ"

আরো উজ্জীবিত হয়ে বক্তা বলছেন, "মোরা নির্ভীক সমুদ্রস্রোতে দাঁড় ফেলি বারো মাস।"এবং "নতুন পানিতে হাল খুলে দাও, হে মাঝি সিন্দবাদ!"

পূর্বেই উল্লেখ করেছি দু'জন নাবিকই অজানাকে জানার বিষয়ে অভিন্ন চিন্তার অধিকারী। তবে এ অজানা ইউলিসিসের ক্ষেত্রে একেবারে অন্ধকার থেকে আলোতে যাওয়া। তাঁর ভাষায়, **"To seek a newer world."** তাই তিনি জ্ঞান অর্জন করতে চান এভাবে– **"I will drink/ Life to the lees."** ও **"To sail beyond the sunset, and the baths/ Of all the western stars, until I die."** অন্যদিকে, ফররুখ আহমদের 'সিন্দবাদ'-এর বক্তা বলেছেন–

"চলো সন্দল বন-সন্ধানে অজানা দ্বীপের তীরে,
হালের আঘাতে নোনা পানি ছুড়ে রাহা খোঁজো-গুমরাহা,
পার হয়ে যাও আয়েসী রাতের ফাঁদ"।

তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে এ বক্তা যদিও দ্বীপের সন্ধানে যেতে চান তথাপি এ যাত্রা সম্পূর্ণ অন্ধকার থেকে আলোতে নয়। এ যাত্রা হারিয়ে যাওয়া তথা নিজেদের আয়েসী ও খামখেয়ালী এবং অনাবাদের কারণে হারিয়ে যাওয়া গৌরবকে ফিরে পাওয়ার যাত্রা। এক্ষেত্রে বক্তা এ অবক্ষয়ের জন্য অন্য কাউকে দায়ী করেন নি। তিনি এ কবিতায় যে জাতির কথা বলছেন সে জাতির কর্মকাণ্ডকেই দায়ী করে তাদের সতর্ক করে তুলছেন। তিনি মুসলিম জাতির আলস্যে দিন কাটানোকেই দায়ী করেন। অন্যদিকে, ইউলিসিস একটি বর্বর জাতির কথা বলেছেন। তিনি সে বর্বর জাতিকে সভ্য করার চেষ্টা করছেন। সে বর্বর জাতি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য এরূপ, **"Unequal laws unto a savage race,/ That hoard, and sleep, and feed."** আর 'সিন্দবাদ'-এর বক্তা বেশ ক'বার বলেছেন 'রঙিন মখমল,' 'হাঁতির দাঁত', 'পাঙ্কি নরম আরাল' এর কথা। তিনি এও দাবি করেছেন এগুলোই এখন মরিচা ধরে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে।

কবিতা দু'টির সেটিং **(Setting)** বা স্থান ও সময়ের উল্লেখ প্রায় অভিন্ন। 'ইউলিসিস' কবিতার স্থান হচ্ছে ইথাকা রাজ্যের রাজধানীর নিকটবর্তী কোন এক নদীর তীরে। দীর্ঘ বিশ বছর পর সমুদ্র যাত্রা করে তিনি নিজ রাজ্যে ফিরে এসেছেন। এখন ইচ্ছা পরিবার-পরিজন ও রেখে যাওয়া রাজ্যের দায়িত্ব ফিরে পাওয়া। তার সে অপেক্ষা কোন এক পড়ন্ত বিকালে। অন্যদিকে, 'সিন্দবাদ' কবিতাটিও সমুদ্র তীরে

এবং এক বিকালের কথা। যেখানে বক্তা সিন্দবাদকে নিয়ে এসেছেন সমুদ্র যাত্রা করার জন্য। তবে এক্ষেত্রে বক্তা নিজ ইচ্ছায় সমুদ্র যাত্রা করতে আসেন নি। তিনি বলেছেন, "শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক।" অর্থাৎ দরিয়া ডাক দিচ্ছে হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করার এবং নিষ্পেষিত মানবতাকে বাঁচাতে। এর বক্তা নিজে সে ডাকে সাড়া দিয়ে বিপদসঙ্কুল সমুদ্র যাত্রায় এসেছেন। এ কবিতা দু'টির আরো একটি বিশেষ মিল আছে। তা হল এ দু'টি কবিতা **Dramatic monologue.** **Dramatic monologue** বলতে **J.A. Cuddon** এর ভাষায় বুঝায়, **"A poem in which there is one imaginary speaker addressing an imaginary audience. In most dramatic monologues, some attempt is made to imitate natural speech."** **(The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory: 1991).**

সুতরাং 'ইউলিসিস'-এ ইউলিসিস নিজে বক্তা এবং এ কবিতায় একাধিক নীরব শ্রোতা রয়েছে। কেননা, তিনি কখনো বলছেন **friends** আবার কখানো বলছেন **mariners**। অপরদিকে, 'সিন্দবাদ' কবিতায় একজন নীরব শ্রোতা আছে। আর সে স্রোতা মাঝি সিন্দবাদ নিজেই। কেননা, এক্ষেত্রে বক্তা কিছুক্ষণ পর পর সিন্দবাদকে ডাকছেন এবং আদেশ দিচ্ছেন জাহাজ খুলে যাত্রা শুরু করতে। আবার কখনো ইসলামের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা বলছেন।

এত মিলের পরও কবিতা দু'টির মধ্যে বেশ অমিলও রয়েছে, যা আলোচনার দাবী রাখে। 'ইউলিসিস'-এ নৈরাশ্যবাদের **(pessimism)** কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, পলায়নের **(escape)** কথা। বাস্তবতাকে অস্বীকারও করা হয়েছে। ইউলিসিস বিশ বছর পর ইথাকা শহরের উপত্যকায় নোঙর করেও দ্বিধায় পড়েন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করা তাঁর সমীচীন হবে কিনা। কেননা এ বিশ বছরে বেশ পরিবর্তন হয়েছে সবকিছুতে। এমনকি, নিজের সন্তান টেলিমেকাস তাঁকে গ্রহণ করবে না বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন ঠিক এভাবে–

> **"In offices of tenderness, and pay**
> **Meet adoration to my household gods,**
> **When I am gone. He works his work, I mine."**

কেবল এখানেই শেষ নয়। তিনি নিজেও তাঁর স্ত্রীকে গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন, কেননা তাঁর স্ত্রী ইতোমধ্যে অনেক বয়স্কা হয়ে গেছেন। সুতরাং বিগত যৌবনা কোন নারীকে গ্রহণের কোন মানে হয় না। তাঁর ভাষায়, **"Match'd with aged."** এমন পরিস্থিতিতে তিনি পলায়নী মনোবৃত্তি থেকেই আবার সমুদ্রে যাত্রা করতে চান এই বলে–

> **"How dull it is to pause, to make an end;**
> **To rust unfurnish'd, not to shine in use!"**

ইউলিসিস-এর সার্বিক কর্মকাণ্ড আমাদের ভাবিয়ে তোলে। কেন তিনি দেশ-বিদেশ ঘুরে এতো জ্ঞানসমৃদ্ধ হবার পরও পুত্র টেলিমেকাসের মুখোমুখি হতে ভয় পান। তিনি টেলিমেকাস সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তিনি নিজে জ্ঞান আহরণ করে যদি নিজের জাতিকে পরিবর্তন করতে না পারেন, বা জাতিকে সভ্যতার আলোয় আলোকিত করতে না পারেন তবে সে শিক্ষা অর্জনের কোন মানে হয়না। তিনি টেলিমেকাস সম্পর্কে বলেন–

**"Most blameless is he, centred in the sphere**
**Of common duties, decent not to fail."**

কিন্তু এর আগে ইথাকা সম্পর্কে বলেন–

**"A rugged people, and thro' soft degrees**
**Subdue them to the useful and the good."**

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠবে রাজা দক্ষ, সৎ এবং সভ্য হলে জাতি কেন পরিবর্তিত হবে না? ইউলিসিসের এ পলায়নী মানসিকতা দেখে জন কিটস্ এর **Ode to a Nightingale** কবিতার কথা মনে পড়ে যায়। যেখানে বক্তা বাস্তবতাকে মেনে নিতে পারেননি সাহসিকতার সাথে। বরং সমস্যা সমাধান না করে **Nightingale** হয়ে দূর আকাশে পালিয়ে গিয়ে বেঁচে যেতে চান সমস্যাসঙ্কুল এ পৃথিবী থেকে। **Nightingale** কবিতার বক্তার ইচ্ছা ঠিক এরকম –

**The weariness, the fever, and the fret**
**Here, where men sit and hear each other groan;**
**Where palsy shakes a few, sad, last gray hairs,**
**Where youth grows pale, and spectre-thin, and dies;**
**Where but to think is to be full of sorrow**
**And leaden-eyed despairs,**
**Where Beauty cannot keep her lustrous eyes,**
**Or new Love pine at them beyond to-morrow.**

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো 'ইউলিসিস' কবিতায় সর্বজনীন কোন আবেদন নেই। এখানে বক্তা সম্পূর্ণই ব্যক্তি-কেন্দ্রিক। অর্থাৎ স্বার্থপরতার স্তুতি এখানে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। ক্ষণে ক্ষণে ইউলিসিস বলছেন, "I am become a name," এবং **"Old age hath yet his honor."** এ ব্যক্তি-কেন্দ্রিক স্বার্থ থেকে ঔপনিবেশিক চিন্তার জন্ম।

উল্লেখিত কথাগুলোর ভিত্তি আছে। জনৈক সাহিত্য-সমালোচক ও ঐতিহাসিক টেনিসনের যুগকে দেখেন এভাবে, **"It was an era of prosperity, an era of aggressive nationalism, an era of rising imperialism, . . . Emphasis was on faith, faith in one's religion, faith in the queen and those in**

**authority, and faith in continuous progress."** এ কথাগুলোর মধ্যেই ইউলিসিসের মানসিকতার পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়।

কিন্তু ফররুখ আহমদের কবিতা 'সিন্দবাদ'-এ সর্বজনীন আবেদন রয়েছে। এখানে মুসলিম ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে পুরো মানবজাতিকে বুঝানো হয়েছে। এখানে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক কোন ভাব বা বিষয় নেই। তাছাড়া, এখানে বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে পালিয়ে বেড়ানোর কোন ইচ্ছা বক্তার নেই। বক্তার মনে মাঝে মধ্যে হতাশা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব উঁকি-ঝুকি মেরেছে। কিন্তু কোন নৈরাশ্যের কথা নেই। এখানে বক্তা ক্ষয়িষ্ণু ঐতিহ্যের জন্য কোন ব্যক্তি বিশেষকে দায়ী করেননি। তিনি এ অবস্থার জন্য দায়ী করেন অলসতাকে। তাঁর ভাষায়, "পার হয়ে যাও আয়েসী রাতের ফাঁদ।" কিন্তু ফাঁদ পার হতে হলে কেমন বাধার সম্মুখীন হবেন তাও তুলে ধরে বলেন–

> "পাকে পাকে ঘুরে তীরবেগে ছুটে আবর্তে দিশাহারা
> ক্ষুধার ধমকে ঘাস ছিঁড়ে খেয়ে আকাশে জাগায়ে সাড়া
> জালিমের চেয়ে আগুনে পোড়ায়ে গুড়াঁয়ে পাপের মাথা;
> দেখেছি সবুজ ফরিয়া জাজিমে স্বপ্ন রয়েছে পাতা।'

এখানে নৈরাশ্যবাদের চেয়ে আশাবাদের কথাই বেশি বলা হযেছে। আশাবাদের কথা নিম্নোক্ত পঙ্ক্তিমালায়ও ব্যক্ত হয়েছে–

> আমরা মরি না, সুখা মাটি শুধু তাকায় শংকাকুল,
> দরিয়ার ডাকে এক লহমায় ভাঙ্গে আমাদের ভুল,
> প্রকাশিত নীল দিন;
> দেখে সফরের প্রসারিত পথ দিগন্ত-স্রোতলীন।

---

**লেখক পরিচিতি : প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ, নর্দান বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ, ঢাকা।**

**ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, ছাব্বিশতম সংকলন, জুন-২০১৪**

# শিশু-সাহিত্যের প্রিয় কবি ফররুখ আহমদ

**আশরাফ জামান**

**এক.** শিশু-কিশোরদের যদি জিজ্ঞেস করি কাজী নজরুল ইসলামের পরে তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় কবি কে? তবে নিশ্চয়ই বলবে ফররুখ আহ্মেদ। ছোটদের প্রিয় কবি ফররুখ আহমদের কথাই আজ বলবো।

মুসলমান জাতিকে অনুপ্রেরণা জোগানোর উদ্দেশ্যে এই কবি জাতির ঐতিহ্য, ইতিহাস, তাহজীব ও তমদ্দুনের উপর ভিত্তি করে লিখতে শুরু করলেন। ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হলো তাঁর প্রথম কাব্য 'সাত সাগরের মাঝি'। মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত এক নতুন জীবনধর্মী অনুপ্রেরণামূলক কবিতা লিখলেন ফররুখ আহমদ। সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে তিনি জাতীয় আদর্শের পতাকা সমুন্নত করলেন। তাঁর আদর্শ হলেন স্বর্ণযুগের শ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)। আল্লাহর দ্বীন ও রসূলের আদর্শ হলো তাঁর কবিতার উৎসস্থল ও অনুপ্রেরণা। আর এ পথে যদি বাধা আসে মৃত্যু ভয় আসে তবু ভীত হয় না বীর। তাঁর ভাষায় :

জীবনের চেয়ে দীপ্ত মৃত্যু তখনি জানি
শহীদী রক্ত হেসে উঠে যবে জিন্দিগানি।

শিশু-কিশোরদের জন্য কবি ফররুখ আহমদ লিখেছেন অজস্র কবিতা, ছড়া, কাহিনী কাব্য, স্কুলপাঠ্যসহ মোট পঁচিশটি গ্রন্থ। তাঁর জীবনকালে চারটি শিশু-কিশোর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এছাড়া নয়াজামাত নামে চারটি খণ্ডে স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ প্রকাশ পায়। কবির মৃত্যুর পর ৩টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

'পাখীর বাসা' কবি ফররুখ আহমদের প্রথম প্রকাশিত শিশু-কিশোর কাব্য। ১৯৬৫ সালে বাংলা একাডেমী গ্রন্থটি প্রকাশ করে। এ গ্রন্থে ৪১টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। এতে পাখীর বাসা, ঘুঘুর বাসা, বকের বাসা, প্যাঁচার বাসা, টুনটুনী, ফিঙে পাখী উল্লেখযোগ্য ছড়া। কবি লিখেছেন-

আয়গো তোরা ঝিমিয়ে পড়া
দিনটাতে
পাখীর বাসা খুঁজতে যাবো
একসাথে ॥

**(পাখীর বাসা : পাখীর বাসা।)**

'পাখীর বাসা' গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা ও ছড়া পাখীদের নিয়ে। এ পাখী আমাদের দেশের সাধারণ পাখী যাদের আমরা প্রতিদিন দেখে থাকি। পাখীরা কোন বাসায় থাকে, কি বিচিত্র তাদের জীবন-প্রণালী কবি তা সহজ ভাষায় শিশুদের উপভোগ্য করে রচনা করেছেন। পাখীর বাসা কবিতাতে প্রথমেই শিশু কিশোরদের পাখীর বাসা খোঁজার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এতে শিশুরা মুগ্ধ হয়ে পড়ে :

বাংলার পাখ-পাখালি এবং বন-বনানীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার উদ্যোগ যেন। কবিতাগুলোতে ভাষা ও ছন্দ সহজ-সরল এবং অন্ত্যমিলযুক্ত যা অনায়াসে শিশু-কিশোরদের আকৃষ্ট করে। এর কোন কোন কবিতায় আছে হালকা হাস্যরস ও কৌতুকের আবহ। কবি আরও লিখেছেন :

মেলায় যাওয়ার ফ্যাঁকড়া এই
ক্যাবলা বোঝে সেই সাঁঝেই
দেয় সে তখন মাথায় হাত;
মেলায় যাওয়ার এ বরাত ॥
**(মেলায় যাওয়ার ফ্যাঁকড়া : ঐ।)**

কবির প্রকাশিত দ্বিতীয় ছড়ার বই 'হরফের ছড়া' ১৯৬৮ সালে বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে। এখানে প্রত্যেকটি বাংলা বর্ণ নিয়ে এক একটি ছড়া কবি রচনা করেছেন। এগুলো এতই সুন্দর ও আকর্ষণীয় যে শিশুরা এসব ছড়া পড়ে সহজেই বাংলা বর্ণমালা লিখতে পারে। যেমন–

ক-য়ের কাছে কলমি লতা
কলমি লতা কয়না কথা
কোকিল ফিঙে দূর থেকে
কলমি ফুলের রঙ দেখে।

১৯৬৯ সালে কবি ফররুখ আহমদের 'নতুন লেখা' প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশ করে আহমদ পাবলিশিং হাউজ। গ্রন্থটিতে ৬৮টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবিতাগুলোর শিরোনাম যথাক্রমে মেঘের ছড়া, বৃষ্টির ছড়া, ইলশে গুঁড়ি, ইলিশ, রুই-কাতলা, সবাই রাজা, হোঁদুল কুৎকুৎ, ঈদের কবিতা, মাছি, মশা, ছাগল, ষাঁড়, বাঘের মাসী, নৌফেল ও বাদশা হাতেম তায়ীর কিসসা, রাসূলে খোদা, মদীনায় নূরনবী শিশুদের নবী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। 'নতুন লেখা' গ্রন্থের কবিতা ও ছড়াগুলোতে কবি বিচিত্র রকমের বিষয়বস্তু তুলে এনেছেন।

বাংলা সাহিত্যে ছড়া ছন্দ অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে এসেছে। এ ছন্দ গ্রামে-গঞ্জে নারী-পুরুষ মুখে মুখে ব্যবহার করতো। গ্রাম্য মেয়েরা ধান শুকাতে, ধান ভানতে, বিয়ে শাদীতে বা বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে সুর করে ছড়া গাইতো, যা লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। এ জাতীয় ছন্দই পরবর্তীকালে কবিতা ও ছড়ায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কবি ফররুখ আহমদ তার নতুন লেখা গ্রন্থে এ ছন্দ ব্যবহার করেছেন। বিভিন্ন প্রকারের হাসির বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি লিখেছেন :

হো হো হাসি, হি হি হাসি
শুনি হাসির হর্‌রা
বাঁকা হাসি পিঠের উপর
পরে যেমন দোর্‌রা।

কাষ্ট হাসি দেখে কারো
যায় যে জ্বলে পিত্ত,
কাষ্ট হাসির মহড়াটা
চলছে তবু নিত্য!
**(হাসি : নতুন লেখা।)**

**দুই.** সে আমলে পদ্মা মেঘনায় জেলেরা ধরতো ধুম করে ইলিশ মাছ। বাংলার ঘরে ঘরে বর্ষা মরশুমে কৃষক, শ্রমিক, ধনী–গরিব সকলের বাড়িতে চলতো সে ইলিশ মাছ খাওয়ার ধুম। কবি ফররুখ আহমদ শিশুদের জন্য সহজ-সরল ছড়ার ছন্দে লিখেছেন। ছড়াটি চোখ বন্ধ করে পড়লে ভেসে ওঠে সে যুগের পদ্মায় ঝাঁক বেঁধে ইলিশ মাছ চলার দৃশ্য। ভেসে ওঠে জেলেদের মাছ ধরার ছবি। এ যেন কোন চিত্রকর কাগজে তা অংকন করেছেন :

ইলশে গুঁড়ি! ইলশে গুঁড়ি!
ইলিশ মাছের মড়কি মুড়ি
নদীর বুকে হুড়োহুড়ি
ইলশে গুঁড়ি! ইলশে গুঁড়ি!
**(ইলশে গুঁড়িঃ নতুন লেখা।)**

১৯৭০ সালে বাংলা একাডেমী প্রকাশ করেছিল কবির 'ছড়ার আসর' গ্রন্থটি। এতে মোট ১৬টি ছড়া সংকলিত হয়েছে। ছড়াগুলি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় কবি লিখেছেন যা সহজে শিশুদের মনকে আকৃষ্ট করে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছড়া হলো পেঁচার বাসা, পেঁচাটা কয়, তুই খুলিনা মুই খুলি, খেলার ছন্দ, পেঁচা ও পেঁচালি, হাঁসের গল্প, তুলতে গিয়ে, নাচন নাচন ধুম নাচন প্রভৃতি।

পাঠশালার ছুটির আনন্দ শিশু-কিশোরদের মন ভরিয়ে দেয়। একঘেয়ে ক্লাসের পর আকস্মিক ছুটি হলে শিশুরা আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠে, কবি শিশু-চিত্তের সেই অতি সাধারণ বিষয়টি উপলব্ধি করেছেন-

পাঠশালাতে ছুটি
হেসেই কুটি কুটি
খুঁজতে গিয়ে রুটি
পেলাম মটরশুঁটি
রুই কাতলা পুঁটি
চিংড়ি মাছের কুটি
তাইতো লুটোপুটি
পাঠশালাতে ছুটি
ও ভাই পাঠশালাতে ছুটি।
**(তুলতে গিয়েঃ ছড়ার আসর)**

উপরোক্ত ছড়াটি পড়ার সময় রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' নামক ছড়াটি মনে পড়া স্বাভাবিক–

আজ আমাদের ছুটি ও ভাই
আজ আমাদের ছুটি
কি করি আজ ভেবে না পাই
পথ হারিয়ে কোন বনে যাই
সকল ছেলে জুটি।

ফররুখ আহমদের মৃত্যুর পর চিড়িয়াখানা, ফুলের জলসা, কিস্সা কাহিনী গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়।

'চিড়িয়াখানা' গ্রন্থে ৩২টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। এতে চিড়িয়াখানায় যে সকল পশু-পাখী ও জলচর প্রাণী থাকে তাদের নিয়ে সুন্দর কবিতা লিখেছেন কবি। কবিতাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবিতা হচ্ছে চিড়িয়াখানা, কাঠবিড়ালি, হরিণ, বাঘ, ভল্লুক, অজগর, ঈগল, জলহস্তী, কুমীর ইত্যাদি। যেমন–

দেখতে যাবো কাজের ফাঁকে
প্রাণীর বাসা জগৎটাকে
খোদার গড়া এই দুনিয়ায়
কেউ পানিতে কেউবা ডাঙায়
কেউ ঘোরে শূন্য হাওয়ায়
দেখি আজ চিড়িয়াখানায়।
**(চিড়িয়াখানা : চিড়িয়াখানা।)**
মুর্গী নিয়ে পাতিশিয়াল যায় যে পালিয়ে
চুরি স্বভাব শিয়ালগুলো খায়রে জ্বালিয়ে।
**(শিয়ালের চিড়িয়াখানা।)**

'ফুলের জলসা' ছড়া গ্রন্থে মোট ২৭টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমী গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে ডিসেম্বর ১৯৮৫তে। ফররুখ আহমদ ছিলেন প্রকৃতি-প্রেমিক কবি। দেশের শহরে-গ্রামে, বনে-বাদাড়ে ফোটে শতশত ফুল। কবি সেসব ফুল নিয়ে ছড়া লিখেছেন। ছড়াগুলির মধ্যে কদম-কেয়া, ফুলের জলসা, শাপলা, গোলাব হাস্নাহেনা, রজনীগন্ধা, চম্পা, সূর্যমুখী ইত্যাদি।

কবির মৃত্যুর পর কিসসা কাহিনী গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে ৩টি কবিতা সংকলিত হয়েছে এগুলো যথাক্রমে আলী বাবার কিসসা, আলাউদ্দীনের কিসসা ও সাত মঞ্জিলের কাহিনী কবিতা। আরব্য উপন্যাসের গল্প থেকে তিনি কাহিনী গ্রহণ করেছেন।

**তিন.** ফররুখ আহমদের শিশু-কিশোর গ্রন্থের সংখ্যা মোট ২৫টি তন্মধ্যে ৪টি কবিতা গ্রন্থ ও ৪টি পাঠ্য স্কুল কাব্য বই তাঁর জীবিত কালে এবং মৃত্যুর পর ৩টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বাকী ১৪টি গ্রন্থই অপ্রকাশিত রয়েছে।

কবির জীবনকালে নয়াজামাত নামে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ প্রকাশিত হয়। বইগুলো পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে টেক্সট বুক কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত স্কুল পাঠ্য ছিল। এগুলা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।

কবির অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে আলোকলতা নামের একটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে। এতে ২০টি কবিতা সংকলিত হয়। এর মধ্যে আলোকলতা, কোলাব্যাঙ, খাজাভাজা, চানাচুর, ঠাট্টা, শিয়াল পণ্ডিত, মেঘের ছড়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। 'খুশীর ছড়' গ্রন্থে ৭৬টি কবিতা সংকলিত হয়েছে।

'পোকামাকড়' নামক আরেকটি গ্রন্থে মোট ২৪টি কবিতা আছে। এতে সাধারণ পোকামাকড় নিয়ে কবিতা লিখেছেন। কবির অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় এতে মেলে। আমাদের চারদিকে যে সকল পোকা-মাকড় চলাফেরা করে সেসব তুচ্ছ প্রাণী নিয়েই কবি অসাধারণ কবিতা রচনা করেছেন। যেমন পোকামাকড়, পিঁপড়ে, পিঁপড়ের নেতা, মাকড়সা, মশা, মাছি মৌমাছি, প্রজাপতি ইত্যাদি।

'মজার ছড়া' গ্রন্থে ১৪টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবিতাগুলোর মধ্যে মজার ছড়া, মাছের ছড়া, হানাদার বাহিনীর ছড়া, মীর জাফরের ছড়া, গোলামের ছড়া উল্লেখযোগ্য।

কবির লেখা অপ্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে 'পাখীর ছড়া' নামক গ্রন্থে ২৫টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবিতাগুলোর মধ্যে বুলবুলি, মোরগ, হাঁস, কবুতর, টুনটুনি, মাছরাঙ্গা, আবাবিল পাখী, পানকৌড়ি, বক, পেঙ্গুইন উল্লেখযোগ্য।

'সাঁঝ সকালের কিস্‌সা' নামক একটি অপ্রকাশিত গ্রন্থ কবি পুঁথির কাহিনী নিয়ে গদ্য এবং পদ্যে লিখেছেন। দুষ্ট জ্বিনের কিস্‌সা, হিন্দবাদের কথা, সিন্দাবাদের পয়লা সফর, নৌফেল ও হাতেম তায়ী'র কাহিনী নিয়ে মোট ৭টি কবিতা এতে রয়েছে।

'ছড়াছবি' নামে একটি শিরোনামহীন ছড়া সংকলন রয়েছে। এছাড়া কবির দাদুর কিস্‌সা নামে একটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়।

**চার.** কবি ফররুখ আহমদের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত শিশু-কিশোর সাহিত্য রচনার যে তালিকা পাওয়া যায় তা বিশাল কলেবরের। শিশু-মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে কবি ছিলেন অতিশয় সচেতন। শিশুদের মন-মানস, চিন্তা-বুদ্ধি-কল্পনা সম্পর্কে কবির অসাধারণ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর লেখায়। যে কবি বিখ্যাত কবিতা পাঞ্জেরী, সিন্দবাদ, সাত সাগরের মাঝি, ডাহুক, লাশ, মুহূর্তের কবিতা প্রভৃতি অসংখ্য কবিতায় আরবি–ফারসি, সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছেন। কখনো বা প্রয়োজনে যুক্তাক্ষর বিশিষ্ট শব্দ ব্যবহার করেছেন সেই কবিই আবার শিশু-কিশোরদের জন্য যখন লিখেছেন তখন সেগুলো পরিহার করেছেন। সহজ সরল ভাষা, সহজ উচ্চারণের মাধ্যমে শব্দের ব্যবহার করেছেন। এ প্রসঙ্গে ফররুখ– গবেষক অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান লিখেছেন : "ফররুখ আহমদের শিশুতোষ কাব্য-কবিতায় ব্যবহৃত শব্দরাজি বিচার করলে এটা স্পষ্ট হয় যে, এতে তিনি অত্যন্ত সহজ সরল শব্দ ব্যবহর করেছেন। যুক্তাক্ষর যুক্ত কোন শব্দ তিনি যথাসম্ভব পরিহার করেছেন। ফলে এসব শব্দের উচ্চারণ পঠন-পাঠন অর্থ অনুধাবন শিশু-কিশোরদের জন্য খুবই সহজ।"

সুসাহিত্যিক মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ তাঁর বাংলা কাব্যে ফররুখ আহমদ গ্রন্থে ফররুখ আহমদের শিশু-কিশোর কবিতা প্রবন্ধে লিখেছেন–"স্বদেশ প্রেমিক, স্বজাতি প্রেমিক ও মাতৃভাষা প্রেমিক ফররুখ আহমদ চেয়েছিলেন জাতির ভবিষ্যত শিশু-কিশোররা নিজ মাতৃভাষা ভালো করে শিখুক নিজের দেশ, মাটি, মানুষকে জানুক

এবং ইসলামের মানবতাবাদী আদর্শ ও শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত হোক। মহানবীর (সাঃ) আবির্ভাবের ইতিহাসের সঙ্গে শিশু–কিশোরদের পরিচয় ঘটুক।"

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

সহজ কথা লিখতে আমায় কহ যে
সহজ কথা যায়না লেখা সহজে।

ফররুখ আহমদ শিশু-কিশোরদের জন্য সহজ ভাষা ও ছন্দে সাহিত্য রচনা করেছেন। এ জন্যই তা শিশু-কিশোরদের কাছে এত প্রিয়।

রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ শিশুতোষ কবি। অন্যদের মধ্যে গোলাম মোস্তফা, জসীমউদ্‌দীন, আহসান হাবীব, সৈয়দ আলী আহসান, হাবীবুর রহমান, আতোয়ার রহমান, আশরাফ সিদ্দিকী, সানাউল্লাহ নবী, শামসুর রাহমান, সুকুমার বড়ুয়া প্রমুখ অনেকেই সার্থক শিশু সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত।

কবি ফররুখ আহমদ শিশু-সাহিত্যিক হিসেবে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। শিশু-কিশোরদের অনুপ্রেরণার উৎস কবি ১৯৭৪ সালের ১৯ অক্টোবর ঢাকায় নিউ ইস্কাটনের বাসায় বিনা চিকিৎসায় অর্থকষ্ট নিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। অভিমানী আত্মপ্রত্যয়ী আপোষহীন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কবি কারো কাছে নতি স্বীকার করেননি এক আল্লাহ ছাড়া। তাঁর লেখা অসংখ্য শিশু গ্রন্থ এখনো অপ্রকাশিত রয়েছে। এগুলো দ্রুত প্রকাশের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাহলে বাংলা সাহিত্য বিশেষত শিশু-কিশোর সাহিত্য অতিশয় সমৃদ্ধ হবে এবং শিশু কিশোররা বিশেষভাবে উপকৃত হবে।

**তথ্যপঞ্জি :**
১. বাংলা কাব্যে ফররুখ আহমদ : মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ :
২. ফররুখ প্রতিভাঃ অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান
৩. পুনর্লেখন : ১২ই সেপ্টেম্বর ২০১২ :
৪. শাহীন শিবির/দৈনিক সংগ্রাম, ১ নভেম্বর, ১৯৭১
৫. সোনালী আসর/২৬শে অক্টোবর, ১৯৯২

---

**ফররুখ একাডেমী পত্রিকা, চব্বিশতম সংকলন, অক্টোবর-২০১২**

# বিশিষ্ট কথা-সাহিত্যিক নাজমুল আলমের সাক্ষাৎকার

**"কবি ফররুখ আহ্‌মদ ছিলেন অত্যন্ত উদার, অন্তরঙ্গ ও অতিথিপরায়ণ একজন দুর্লভ ব্যক্তি"**
**– নাজমুল আলম**

[বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক নাজমুল আলমের জন্ম ৮ মার্চ, ১৯২৭ কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালি থানার অন্তর্গত বানিয়াকান্দি গ্রামে। তিনি একজন জীবনধর্মী লেখক। ছোটগল্প উপন্যাস, কিশোর উপন্যাস, মঞ্চ নাটক, বেতার নাটক, টিভি নাটক, চলচ্চিত্র কাহিনী ইত্যাদি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প সংকলন হলো ঃ 'একটি অচল আনি' (A Counterfeit Coin) (১৯৬৬), উপস্থিত সুধীমণ্ডলী (১৯৭৮), স্বনির্বাচিত গল্প (১৯৭৮), পাণ্ডুলিপি ও গয়নার বাক্স (১৯৭০), বুনোবৃষ্টি (১৯৮৪), নিজের বাড়ি (১৯৮৮)। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে : ফুলমতি (১৯৭৮), অলৌকিক (১৯৯১), অথচ পবিত্র, উপরে ওঠার সিঁড়ি, নায়ক মুনিয়া, বাঁধন, সারা জীবন, হাতিয়ার, কাচের ঘর, কেয়ার স্বপ্ন ইত্যাদি। 'রক্তমণি (১৯৭৯) তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য কিশোর উপন্যাস। এছাড়া তিনি ২টি মঞ্চ নাটক, ১৬টি বেতার নাটক, ৩১টি টিভি নাটক ও ৩টি চলচ্চিত্র কাহিনী রচনা করেন।

'অথচ পবিত্র' নাটকের জন্য শ্রেষ্ঠ টিভি নাট্যকার হিসাবে তিনি ১৯৭৬ সালে জাতীয় টেলিভিশন পুরস্কার পান। ১৯৭৮ সালে তিনি তাঁর ছোটগল্পের জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮৩ সালে লালন সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৮৬ সালে হুমায়ুন কাদির স্মৃতি পুরস্কার ও ১৯৮৯ সালে টেলিভিশন নাটকের অবদানের জন্য তিনি টেনাশিনাস পুরস্কার পান। এছাড়া তিনি তাঁর 'একটি অচল আনি' (A Counterfeit Coin) গল্পের জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন। 'এশিয়া উইক' ম্যাগাজিন কর্তৃক তিনি ১৯৮৩ সালে এশিয়ার একজন শ্রেষ্ঠ গল্পকারের সম্মানে ভূষিত হন। আবহমান গ্রাম বাংলার নিসর্গে, শহরের জটিল জীবন যাত্রায় তিনি খুঁজে বের করেছেন যন্ত্রণা, হতাশা, ক্ষোভ ও লাঞ্ছনার পাশাপাশি আশা ও বিশ্বাসের বিশ্বস্ত রূপ। চল্লিশের দশকের বাঙালি লেখকেরা, যাঁরা গল্পে আধুনিকতার স্পষ্ট ও উজ্জ্বল পরিধি রচনার দীক্ষা-দাতা, তিনি তাঁদেরই একজন অগ্রবর্তী প্রাণবন্ত লেখক।

বাস্তববাদী নাজমুল আলম একাধারে জীবনধর্মী ও শিল্পধর্মী লেখক। মনস্তত্ত্ব, প্রতীকধর্মিতা, আদর্শবাদিতা, বা স্যাটায়ার তাঁর অনেক গল্প, উপন্যাস, নাটকে উপস্থিত, কিন্তু তা কখনোই কাহিনী বা চরিত্র চিত্রণের মূল রসকে ক্ষুণ্ন করেনি। তিনি দীর্ঘকাল ঢাকা বেতারে কর্মরত থেকে ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কবি ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) তাঁর সহকর্মী ছিলেন। কবির সাথে তাঁর যেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, কবির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাও ছিল তেমনি অপরিসীম। কবির সাথে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্কের স্মৃতিচারণমূলক সাক্ষাৎকার দিতে তিনি সাগ্রহে রাজি হন। ১৯১০ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

'ফররুখ একাডেমী পত্রিকা'র পক্ষ থেকে আমি একটি প্রশ্নমালা তৈরি করে তাঁর সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য তরুণ কবি মৃধা আলাউদ্দিনকে তাঁর নিকট প্রেরণ করি। ক্যাসেটে ধারণকৃত সাক্ষাৎকারটি এখানে পত্রস্থ করা হলো। এখানে কবি ফররুখ আহমদের ব্যক্তিগত ও সাহিত্য জীবন সম্পর্কে তিনি অনেক অজানা ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেছেন। সাক্ষাৎকারটি নিচে পত্রস্থ হলো।
– সম্পাদক]

**ফররুখ একাডেমী পত্রিকা (ফ.এ.প.)** : কবি ফররুখ আহমদ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান মৌলিক প্রতিভাধর কবি। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। তিনি একদিকে গীতি কবিতা, কাব্য-নাট্য, মহাকাব্য, সনেট, ব্যঙ্গকাব্য, গান, শিশুতোষ কাব্য ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে কাজ করেছেন। তাঁর রচিত গানের সংখ্যাও কম নয়। এক সময় ঢাকা বেতারে নিয়মিত তাঁর গান প্রচারিত হতো এবং তা বেশ জনপ্রিয় ছিল। আপনি দীর্ঘকাল তাঁর সাথে একই সঙ্গে ঢাকা রেডিওতে কাজ করেছেন। রেডিওতে ঐ সময় কবি ফররুখ আহমদের গান সাধারণত কারা গেয়েছেন এবং তখন ঐ সব গানের জনপ্রিয়তাই বা কেমন ছিলো ? আপনার ধারণা ও অভিজ্ঞতা থেকে সে সম্পর্কে আমাদেরকে কিছুটা অবহিত করুন।

**নাজমুল আলম** : মরহুম আব্দুল হালিম চৌধুরী ও মরহুম আব্দুল আহাদ ছিলেন খুব নামকরা সুরশিল্পী। ফররুখ আহমদের গান ও কবিতার জনপ্রিয়তার পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান ছিল শিল্পী আব্দুল হালিম চৌধুরীর। আব্দুল হালিম চৌধুরী বলেছেন, আমি ফররুখ আহমদের কাছ থেকে চেয়ে চেয়ে গান-কবিতা সংগ্রহ করতাম এবং তা রেডিওতে প্রচার করতাম। তাছাড়া, শিল্পী আব্দুল আহাদও ফররুখ আহমদের অনেক গানে সুর দিয়েছেন। এ দু'জন বিশিষ্ট সুরকারের সাথে কবি ফররুখ আহমদের যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা ছিল এবং তাঁরা পরস্পরের প্রতি ছিলেন যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। এর ফলে গীতিকার ফররুখ আহমদকে আমরা পেলাম বাংলাদেশের দু'জন বিশিষ্ট সুরকার অর্থাৎ আব্দুল হালিম চৌধুরী ও আব্দুল আহাদের মাধ্যমে।

**ফ.এ.প.** : কবি ফররুখ আহমদ বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশকের প্রারম্ভে যখন কাব্য-কবিতা রচনা শুরু করেন তখনই তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তা সৃষ্টি হয় এবং এ তরুণ কবি সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় ও কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বিশিষ্ট সুধীজন আলোচনা-সমালোচনা লেখেন ও প্রচার করেন। ঐ সময়ই তাঁর বিশিষ্ট কাব্য-প্রতিভার জন্য তিনি সকলের সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অথচ বর্তমানে তাঁর সম্পর্কে অনেকেই অনেক নেতিবাচক মন্তব্য করে থাকেন– এ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য জানতে চাই।

**নাজমুল আলম** : যারা এ ধরনের মন্তব্য করেন, তারা এ কথা স্পষ্ট করেই জানেন যে, 'সাত সাগরের মাঝি', 'সিরাজাম মুনীরা' 'নৌফেল ও হাতেম', 'মুহূর্তের কবিতা', 'হাতেম তা'য়ী' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ লেখা একজন বিরল প্রতিভাসম্পন্ন কবির পক্ষেই সম্ভব। 'Litarary Personality' নামে একটি বই আছে যেখানে জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী কবি ফররুখ আহমদকে নিয়ে আলাদা একটি প্যারায় কবি ফররুখ আহমদকে নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন। কিন্তু সমকালীন অন্য কবিদের শুধু নাম উল্লেখ করেছেন– তাঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু লেখেন নি। সেখানে কবীর চৌধুরী ফররুখ আহমদকে ভিন্ন স্বাদের বড় মাপের কবি বলে উল্লেখ করেছেন।

কবি শামসুর রাহমানও তাঁর এক নিবন্ধে লিখেছেন, আমাদের মধ্যে মতাদর্শের একটা ফারাক ছিল বটে– কিন্তু তিনি বড় মাপের কবি ছিলেন। তাঁর কাব্যের প্রতি

আমাদের একটা আলাদা শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা আছে। তাঁর কবিতায় ভিন্ন মাত্রার এক বাংলাদেশকে পাই। তিনি আমাদের একজন বড় কবি। শামসুর রাহমান আরো বলেন, কবি ফররুখ আহমদ কোন ব্যাংক-ব্যালান্স রেখে যাননি। রেখে যান নি কোনো জমিজমা। তাঁর চিরনিদ্রার এতটুকু ঠাঁইয়ের জন্য জমি খুঁজতে গিয়েও বিড়ম্বিত হতে হয়েছে তাঁর অনুরাগীদের। শেষ পর্যন্ত উজ্জ্বল উদ্ধার হয়ে এলেন কবি বেনজীর আহমদ। তিনি বললেন, আমি আমার ফররুখ ভাইকে নিয়ে যাবো আমার ডেরায়। একজন কবিকে কবরস্থ করা হলো অন্য এক কবির বসত-বাড়ির সীমানায়। তাঁর কবরের জমি নিয়ে যত ঝামেলাই হোক, তাঁর সন্তানেরা যত বঞ্চিতই হোক পার্থিব জমিজমা থেকে, তিনি রেখে গেছেন অন্যরকম বিঘা বিঘা জমি– যে জমির ফসল দেখে চোখ জুড়াবে সাহিত্য-পথযাত্রীদের। এটা কবি শামসুর রাহমানের বক্তব্য। এখন আমাদের বুঝতে হবে কবি ফররুখ আহমদ কত বড় মাপের কবি ছিলেন, মানুষ ছিলেন। আমাদের কাজ কবিকে খুঁজে বের করা। আমি আবারো বলবো এ কাজ বাংলা একাডেমীর, দেশের ও দেশের সরকারের। আপনারা বড় কবিকে বড় করে দেখবেন; ফররুখ একাডেমীরও কাজ হবে এটাই– এ প্রত্যাশা আমার থাকল। তবে কবির মৃত্যুটা বড় করুণ ছিল। এত করুণ মৃত্যু বাংলাদেশের আর কোনো কবির হয়নি।

**ফ.এ.প.** : কবি ফররুখ আহমদের সাথে আপনার কবে, কোন্ সালে, কোথায়, কিভাবে পরিচয় ঘটে ?

**নাজমুল আলম** : কবি ফররুখ আহমদের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৫১ সালে অক্টোবর মাসে। মাসটা আমার মনে গভীরভাবে গেঁথে আছে এ জন্য যে, ঐ মাসটাতেই আমি 'রেডিও পাকিস্তানে' প্রোগ্রাম প্রডিউসার হিসাবে চাকরী নেই। আর ঐ মাসেই কবি ফররুখ আহমদের সাথে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। তখন রেডিও অফিস ছিল নাজিমউদ্দীন রোডে। ফররুখ আহমদ ছিলেন দীর্ঘদেহী-সৌম কান্তি– পায়জামা-পাঞ্জাবী ছিল তাঁর একমাত্র পোশাক। কথা বলতেন প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। তিনি তখন ছিলেন রেডিওর স্টাফ আর্টিস্ট। অবসর গ্রহণ করেন স্টাফ আর্টিস্ট হিসাবেই। আমাদের পারস্পরিক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। কবি ফররুখ আহমদ তাঁর পুরো জীবনটা সুফীবাদের মধ্যে কাটাতে চেয়েছিলেন। আমি অন্তত তাই দেখেছি– ১৯৫১ থেকে ১৯৭৪ সাল। দীর্ঘ ২৩ বছর। এ তেইশ বছরের দেখা থেকে আমি এ কথাগুলো বললাম। আমি তাঁকে বন্ধুর মতো দেখেছি, সুহৃদের মতো দেখেছি। আমাদের মধ্যে একটা চমৎকার বিশ্বাসের সেতু-বন্ধ ছিল।

ফররুখ আহমদের সাথে ১৯৫১ সালের আগে আমার দেখা হয়েছিল। আমি তখন কলকাতায় লেখাপড়া করতাম। কবিও সেখানে লেখাপড়া করতেন। কবি 'আজাদ' পত্রিকা অফিসে যেতেন– আমিও 'আজাদ' অফিসে যেতাম। তবে সেখানে আমাদের দেখা হয়নি। আমাদের প্রথম দেখা হয়েছিল কলকাতায় একদিন ট্রামে বসে। আমার সাথী বললেন, এই তো, উনিই কবি ফররুখ আহমদ। আমি তাঁর সাথে কথা বললাম– দেখলাম উনি আমার চেয়ে প্রায় দশ/বারো বছরের বড়। এটা ছিল

আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ এবং সে সাক্ষাৎ হয় একটি চলন্ত ট্রামে। তারপর তো আপনারা জানেন– ১৯৫১ সালে আমাদের আবার দেখা হলো রেডিও পাকিস্তান ঢাকায়।

**ফ.এ.প. : সহকর্মী হিসাবে আপনি তাঁকে কেমন দেখেছেন ?**

**নাজমুল আলম** ঃ আমি যখন রেডিও পাকিস্তান ঢাকায় যোগদান করি তখন ফররুখ আহমদ কিশোরদের একটা অনুষ্ঠান 'বিদ্যার্থীদের আসর' পরিচালনা করতেন। এটা খুব একটা ভালো অনুষ্ঠান ছিল তখনকার দিনের মানুষের জন্য এবং এতে কবি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি মাঝে মধ্যে কথিকা লিখতেন, জীবনী লিখতেন। আমাদের অনুরোধে রেডিওর জন্য প্রবন্ধ-নিবন্ধও লিখতেন। সব মিলিয়ে তিনি আমার একজন ভালো বন্ধু ও সহকর্মী ছিলেন। তাঁর মতো এতো উদার, অন্তরঙ্গ ও অতিথিপরায়ণ সজ্জন ব্যক্তি অতি দুর্লভ।

**ফ.এ.প. : কবি হিসাবে ফররুখ আহমদের মূল্যায়ন করুন– বাংলা সাহিত্যে ফররুখ আহমদের স্থান আপনি কিভাবে নিরূপণ করার পক্ষপাতী।**

**নাজমুল আলম** : কবি ফররুখ আহমদের মূল্যায়ন আমি করতে পারবো কিনা, জানিনা। উনি ছিলেন একজন বড় মাপের কবি। উঁচুদরের কবি। উনি আমাকে কবিতা শোনাতেন ও দেখাতেন। আমি যে লিখতাম তা উনি জানতেন এবং জেনেই একজন লেখক আরেকজন লেখককে তার লেখা পড়ে শোনাতেন। আমি তাঁর একজন সমজদার পাঠক ছিলাম। আবৃত্তিকার হিসাবেও তিনি ছিলেন অসাধারণ। তাঁর আবৃত্তি শুনে কখনো ক্লান্তিবোধ হতো না। কবি ফররুখ আহমদ তাঁর কবিতায় প্রচুর আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করেছেন। মুসলিম ঐতিহ্য ও ভাবধারা তাঁর কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন এবং তিনি তাঁর লেখার মূল উপাদানগুলো অর্থাৎ কাহিনী ও বিষয় ইত্যাদি নিয়েছিলেন পুঁথি সাহিত্য থেকে। মুসলমানদের কথা অন্য কবি-সাহিত্যিক তেমন বলেননি– যেমনটি বলেছেন কবি ফররুখ আহমদ। কাজী নজরুল ইসলামের পরে আমাদের শ্রেষ্ঠ কবি ফররুখ আহমদ। আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের একজন বলিষ্ঠ রূপকার কবি ফররুখ আহমদ।

একটা মজার গল্প আছে– আমার একটা গল্পে আমি 'জিয়াফত' শব্দটি ব্যবহার করেছিলাম বলে উনি খুব খুশি হয়েছিলেন। আমাকে দোয়া করেছিলেন– আরো বলেছিলেন 'জিয়াফত', 'দাওয়াত' এ ধরনের শব্দ আরও বেশী করে লিখুন। আমাদের নিজস্ব শব্দে সাহিত্য-চর্চা করুন। নিজের ভাষা, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি কতটা দরদ থাকলে কেউ এ ধরনের কথা বলতে পারে তা চিন্তা করে দেখার বিষয়।

কবি ফররুখ আহমদ ছিলেন মুসলিম মানবতাবাদী কবি। ইসলামী আদর্শ ও ভাবচেতনা তাঁকে তাঁর কাব্য-চর্চায় সর্বদা অনুপ্রাণিত করেছে। বাংলা সাহিত্যে তিনি নতুন প্রাণ-সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি এক ও অনন্য। তিনি তৌহিদবাদী ছিলেন, মানবতাবাদী ছিলেন। প্রতীকীভাবে ইসলামের মূল্যবোধ শিল্প-সুন্দরভাবে সাহিত্যে ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে ফররুখ আহমদের কোন জুড়ি নেই। তাঁর

বিখ্যাত 'সিন্দবাদ', 'পাঞ্জেরী', 'সাত সাগরের মাঝি' ইত্যাদি কবিতায় তা স্পষ্ট। আমি মনে করি 'ডাহুক' ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা।

বাংলা সাহিত্যে ফররুখ আহমদই খাঁটি তৌহিদবাদী, মানবতাবাদী কবি ছিলেন। তাঁর স্বতন্ত্র কবি-ভাষা ছিল, এটা তাঁর মৌলিকতারই পরিচয় বহন করে। তাঁর ভাষা দুর্বোধ্য নয়; সাবলীল, প্রাণবন্ত।

আপনি কবি ফররুখ আহমদের মূল্যায়ন করতে বলেছেন। কিন্তু আমি তো কবির মূল্যায়ন করতে পারবো না। আমি আমার কিছু অনুভূতি প্রকাশ করলাম মাত্র। আমি আরো বলবো, এ পর্যন্ত কবি ফররুখ আহমদের যথার্থ মূল্যায়ন বাংলাদেশে হয়নি। ডক্টর সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌, আব্দুল মান্নান সৈয়দ, শাহাবুদ্দীন আহমদ এঁরা কিছু কাজ করেছেন– কিন্তু আসল কাজ এখনো বাকি। এক্ষেত্রে আপনাদের মতো তরুণদের এগিয়ে আসা উচিত। ফররুখ একাডেমীকে আমি বলবো, আপনারা তরুণদের এ কাজে উদ্বুদ্ধ করুন।

ফররুখ আহমদকে যারা অবহেলা করেন, অবজ্ঞা করার প্রয়াস পান তাদের বুঝতে হবে, রবীন্দ্র-নজরুলের পরেই কবি ফররুখ আহমদের স্থান। দিন যত যাবে, তাঁর কাব্যের চর্চা ও মূল্যায়ন যত বাড়বে, এ উপলব্ধি আমাদের মধ্যে তত গভীর হবে।

**ফ.এ.প.** : কবি ফররুখ আহমদের মূল্যায়ন সম্পর্কে আপনি কিছু বললেন, এবার মানুষ ফররুখ আহমদ সম্পর্কে কিছু বলুন।

**নাজমুল আলম** : বাংলা একাডেমী পত্রিকার একটা বিশেষ সংখ্যায় আমি কবি ফররুখ নয়; মানুষ ফররুখ আহমদ সম্পর্কে কিছু বলবার চেষ্টা করেছিলাম– আজ আবার সে কথার পুনরুক্তি করতে চাই। ফররুখ আহমদ তখন কমলাপুরের একটা ছোট্ট কুঁড়েঘরের মতোন একটা ঘরে থাকতেন। বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে খুবই কষ্টে সেখানে তিনি দিন-যাপন করতেন। চাকরীর বেতনের সামান্য টাকাতেই তাঁর বিরাট সংসারের দায়ভার অতি কষ্টে তিনি বহন করতেন। কিন্তু তিনি কখনো তাঁর দুঃখ-কষ্টের কথা কাউকে বলতেন না কিংবা কারো কাছে কখনো কোন সাহায্য প্রার্থনা করতেন না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত আত্মমর্যাদাশীল সম্ভ্রান্ত মানুষ। এ অবস্থায়ও উদার মেহমান-নেওয়াজ ব্যক্তি হিসাবে তিনি সকল মহলে পরিচিত ছিলেন।

**ফ.এ.প.** : আপনি কি তাঁর সেই কুঁড়েঘরে কখনো গিয়েছেন?

**নাজমুল আলম** : হ্যাঁ, আমি গিয়েছি। বহুবার গিয়েছি। গল্প করেছি, চা খেয়েছি। আমরা ছিলাম বন্ধুর মতো এবং বন্ধুর মতো ছিলাম বলেই আমি তাঁর কষ্ট দেখেছি, বুঝেছি। এবং শুধু আমি নই, আমার মতো ও আমার চেয়ে অনেক বড় জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরাও সে কুঁড়েঘরে গিয়েছেন তাঁর সান্নিধ্য লাভের আশায়।

তাঁর এ কষ্ট দেখে আমি তাঁকে পরামর্শ দিলাম সরকারি কোয়ার্টারের জন্য দরখাস্ত দিতে। ইস্কাটনে স্টাফ আর্টিস্টদের খুব ভালো কোয়ার্টারের ব্যবস্থা ছিল। রেডিও অফিসও কাছে : শাহবাগে। তখন আমি একদিন তাঁকে বললাম, আমার কাছে

একটা ফরম আছে– ফরমটা আপনি পূরণ করে দিন। ফরমটা পূরণ করলে অফিসে একটু তদবির-টদবির করলে আপনি একটি কোয়ার্টার পেয়ে যাবেন। বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে আপনি অত দূরে ছোট্ট একটি ঘরে বেশ কষ্টে আছেন– নিন ফরমটা পূরণ করে দিন।

তিনি ফরমটা পড়ে বললেন, না, আমি এ ফরম পূরণ করবো না। আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, কেন ? উনি বললেন, এর মধ্যে যে কথাগুলো আছে তা সব সত্য নয়।

**ফ.এ.প.** : সে কথাগুলো কী ছিল ? আপনার কী মনে আছে ? মনে থাকলে বলুন– যার জন্য কবি ফররুখ আহমদ এক বাক্যে বললেন, 'না'।

**নাজমুল আলম** : কথাগুলো ছিল, আপনি ক'দিন ঢাকায় আছেন। ঢাকায় বেশি দিন না থাকলে কোয়ার্টার পাওয়া যাবে না। কোয়ার্টারের জন্য বছর খুবই ইমপরট্যান্ট ছিল। বছর না মিললে কোয়ার্টার পাওয়া যেত না। অর্থাৎ সবাই ঐ বছরটাকে বাড়িয়ে লিখতেন। কবি লিখতে রাজি হলেন না। তারপর মায়নার (বেতন) স্কেলটাও বাড়িয়ে লিখতে হতো– তাও তিনি লিখতে রাজি হলেন না। উনি বললেন, আমার যা স্কেল আমি তাই লিখবো। বাড়িয়ে কিছুই লিখবো না। অর্থাৎ আমি এখন যে মায়না পাচ্ছি, লিখলে শুধু তাই লিখতে আমি রাজি আছি। অন্য কিছু না।

ফলে কোয়ার্টারও পেলেন না। অর্থাৎ মানুষ ফররুখ আহমদ তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হলেন না। তখন আমি আশ্চর্য হলাম, কত বড় মাপের মানুষ ছিলেন তিনি। বড় মানুষ না হলে বড় কাজ করতে পারে না। কবি ফররুখ আহমদ বড় কাজ করতে পেরেছেন শুধু এজন্য যে, তিনি নিজেই ছিলেন একজন বড় মাপের মানুষ। বড় মাপের শিল্পী। আপনারা চিন্তা করে দেখুন, এ রকম উঁচু মূল্যবোধসম্পন্ন বড় মাপের মানুষ কি এখন আর চোখে পড়ে ? পড়ে না।

**ফ.এ.প.** : এ ধরনের মানুষের আজ বড়ই অভাব। এক রকম দুর্লভ বললেই চলে।

**নাজমুল আলম** : বুঝলেন তো, ফররুখ আহমদ কত বড় মাপের আদর্শ মানুষ ছিলেন। তিনি তাঁর বিশ্বাস ও আদর্শের কথা শুধু মুখে ও তাঁর কাব্যেই প্রকাশ করেননি, বাস্তব জীবনেও তা অনুসরণ করেছেন।

**ফ.এ.প.** : আপনি অত্যন্ত কষ্ট করে যে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দিলেন সেজন্য ফররুখ একাডেমীর পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

**নাজমুল আলম** : আপনাদেরকেও ধন্যবাদ।

---

**(ফররুখ একাডেমী পত্রিকা ১১তম সংখ্যা- জুন-২০০৫)**

# নিবেদিত কবিতা

**[কবি ফররুখ আহমদের প্রতি নিবেদিত কবিতা লিখেছেন অনেকেই। এখনও লিখছেন। এসব কবিতা সংগ্রহ করে একটি বিশাল সংকলন গ্রন্থ হতে পারে। এখানে মাত্র কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হলো। কবির প্রতি অন্য কবিদের যে গভীর শ্রদ্ধাবোধ ও অনুরাগ তার নিদর্শন এসব কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে। এরদ্বারা কবি যে কতটা জনপ্রিয় এবং কালজয়ী সে সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা করা যেতে পারে।- সম্পাদক]**

## সুফিয়া কামাল

### ঈগল জেগেছে

ঈগল জেগেছে, স্বর্ণ ঈগল জেগেছে
পাখনায় তার গতির আবেগ লেগেছে।
স্বর্ণ ঈগল রাতের তিমির দূর করি পাখা ঝাপ্‌টি
আলোকে বক্ষে সাপটি
মেলিয়াছে ডানা, রাঙে দিগন্ত আলোর ঝলকে ফলকে,
ঈগল পাখায় গতিবেগ বাড়ে পলকে
সূর্য্য উজল প্রভাত আলোকে মেলিয়া দীর্ঘ ডানা
দিকে দিকে দেয় হানা।
তীক্ষ্ণ সুদূর প্রসারি আঁখির দৃষ্টি
হেরে নভঃ হতে মাটির মায়ার সৃষ্টি—
তরু তৃর্ণ ফুল, ফল ভারানত শাখা,
কীট পতঙ্গ, সর্পিল পথ বাঁকা,
শ্যাম প্রান্তর, ঊষার মরুর ওয়েসিস কতদূর,
ভ্রান্ত পান্থ কোনখানে তৃষাতুর,
পূর্বালী হাওয়ায় কোথায় লেগেছে দোলা,
কোথা বিভ্রমে এখনও রয়েছে ভোলা
উদাসীন আনমনা !
জীবন প্রবাহে আসে নাই দ্যোতনা।
পাখার ঝাপটে ঈগল নামিয়া এসেছে,
মাটির ধরারে চিরদিন ভালোবেসেছে,
ভুবন রাঙানো জাগানোর গান গেয়েছে
'নব চেতনায় ভরুক ধরণী' চেয়েছে,
মানবাত্মার মুক্তি স্বপ্ন জীবন কাব্যে এনেছে,

জীবন যে শুধু স্বপ্ন নয় তা জেনেছে।
সংগ্রামময় জীবন বহন শক্তি সাধনা এনেছে,
ঈগল জেগেছে ! স্বর্গ ঈগল জেগেছে!

## আব্দুর রশীদ খান

### নিঃসঙ্গ ডাহুক

রাতজাগা যেন এক নিঃসঙ্গ ডাহুক
ডেকে গেলো তোমার অন্তর;
কেউ ডাক শুনেছিলো, কেউ ঘুমঘোরে
পাশ ফিরে কাটালো প্রহর।

আপাত-সুখের তুচ্ছ হীনমন্যতায়
যে বেদনা পড়ে যায় ঢাকা,
তুমি তাকে ভোলোনি তো, বাতাসের গায়
অশনির চিহ্ন দেখো আঁকা।

ডাকার মতন লোক তাই চিরকাল
দুঃসময়ে থাকে একজন;
গড্ডলিকা-স্রোতে ভাসে সবাই যখন
প্রতিবাদী তবু সে তখন।

দুর্বার জোয়ারে ভেসে চলে সিন্দবাদ
সাত সাগরের পারে পারে;
কেউ ভাবে কতো দেরী রাত পোহাবার,
কারো সুখ রাতের আঁধার।

সৃষ্টির অপার দান বিশাল জগতে
রয়েছে ছড়ায়ে পায় পায়;
কেউ তবু হাতে পাতে, কেউ ঘৃণাভরে
করুণার দুহাত সরায়।

কেউ আলো খুঁজে মরে আলেয়ার কাছে,
কারো চোখে তোরণ হেরার,
ফুরায় না কোনদিন যাঁহার ভাণ্ডার,
তুমি তাঁর শোকর গোজার।

কতো না লবঙ্গ দ্বীপে আত্মার ডাহুক,
মিছে খোঁজে শান্তির আলয়;
অবশেষে চিরন্তন কাবার তোরণ
রেখে গেলো শেষ পরিচয় ॥

## শামসুর রাহমান

### একজন কবি : তার মৃত্যু

সে নয় ঘরের কেউ তবুও ঘরেই ঘুমন্ত। অতিশয় শীর্ণ
অবয়ব এলোমেলো দীর্ঘ চুল গালে দু'দিনের না-কামানো দাড়ি
এবং শরীর তার নিঃস্পন্দ নিঃসাড় যেন তারহীন বীণা
বাজবে না কোনোদিন আর।
দেয়ালের গোয়েন্দা খানিক দেখে তাকে সুদর্শনা পতঙ্গের দিকে
ধীরে-সুস্থে অগ্রসর হয়। অকস্মাৎ জানালায় ছায়াচ্ছন্ন
বকুলতলার এক সঙ্গীতপ্রবণ পাখি এসে বলে গেলো নেই নেই নেই
পুড়ছে আগরবাতি, বিবাগী লোবান। ঘরে নড়ে নানা লোক,
প্রবীণ, নবীন ছায়া পাঁংশুটে দেয়ালে।
অনুরাগী কেউ আসে কেউ যায় দেখে তার সমস্ত শরীরে
উচ্চারিত মৃত্যুর অব্যয় মাতৃভাষা।
আসেন সমালোচক, পেশাদার; বন্ধু কেউ কেউ জুটে যায়
**বেজায় ফেরেববাজ প্রকাশক। অনুরক্ত পাঠক নোয়ায় মাথা আর বারান্দায় ভিড়ে**
**বলপয়েন্টে ক্ষিপ্র নিচ্ছে টুকে জীবনীর ভগ্নাংশ নিপুণ নৈর্ব্যক্তিক ষ্টাফ রিপোর্টার।**
কোন সালে জন্ম তার কী কী গ্রন্থের প্রণেতা কজনই বা পুষ্যি রইলো
পড়ে ঘোর অবেলায়, না কি সে অবিবাহিত ইত্যাদি সংবাদ দ্রুত প্যাডে জমা
হয়, তবু জীবনের আড়ালে জীবন খুব অন্ধকারাচ্ছন্ন থেকে যায়।
এইদিন আর নয় এই রাত্রিও তো নয়, এখন সে শোকাশ্রুর
কেউ নয়, লোবানের নয়, বকুল তলার সেই মুখ্য
সুরেলা পাখিরও কেউ নয়। স্বপ্নময় সোনালী রূপালী মাছ
ফিরে যাবে না পেয়ে সংকেত; এখনতো ভাঙাচোরা
তৈজসপত্রের মতো ইতস্তত রয়েছে ছড়ানো তার সাধ বিফলতা।
প্রজাপতি কোথায় কোথায় বলে বার বার উড়ে যায় দূরে।
**ক'জন রমণী আসে উদ্বেলিত বুক আর কান্না নিয়ে চোখে, কেউ কেউ গোপন প্রেমিকা**
হয়তো বা কারো হাতে ফুল তরতাজা, রাখবে কি দ্বিধাহীন নিরালা শিয়রে?
কতো বুকে শূন্যতার স্বেচ্ছাচারিতা প্রবল হয়, কারো ভীরু
সত্তা সে জেগে রয় একটি অব্যক্ত ধ্বনিঃ হে শিল্প হে কাল পাইনি পাইনি।
কেউ আসে কেউ যায় যথারীতি দ্যাখে ঝুঁকে, কি যেন বিহ্বল
খোঁজে তার চোখে-মুখে নিথর আঙুলে, টেনে নেয় কী উদাস
ধূপের সুগন্ধ বুকে। শূন্যে ঝলসিত পাখসাট,

কখন হঠাৎ এক ঝাঁক হাঁস নামে ঘরে, পুশিদা সাফেদ;
যারা কাননের শোভা প্রস্ফুটিত চারি দিকে, যে আছে ঘুমিয়ে
তাকে ক্রমাগত স্নেহে করাচ্ছে কোমল স্নান সমুদ্রের নীল জল,
পায়ের পাতার কাছে একটি প্রবালদ্বীপ শালবন, দীর্ঘ
তরুময় পথরেখা, ঝোপঝাড় সমেত খরগোশ জেগে ওঠে কেউ দেখলো না।
হাতে ফোটে পদ্মকলি, রাশি রাশি বুকে ঝরে পাপড়ি গোলাপের,
চকিতে হরিণ আনে ডেকে দূরে স্মৃতি দিগন্তের ঠোকে খুর
**ঘরের মেঝেতে, নাচে, ঝিরিঝিরি ঝরণা তার কানে বন্দনামুখর কেউ দেখলো না।**
পদাবলী উজাড় পথের মতো ঠোঁটে একে একে দ্যায় এঁকে বিদায়ী চুম্বন।
দৃষ্টির প্রখর দীপ্তি, আনন্দ বিষাদ কিংবা উচ্ছল কৌতুক,
ঈর্ষা, ক্রোধ অথবা বস্তুর জন্যে কাতরতা, কলহ, বিলাপ
এবং দুর্মর ইচ্ছা আমৃত্যু কবিতা রচনার রৌদ্র আর
জ্যোৎস্নার ঈষৎ কম্পনের সঙ্গে কথোপকথনে মাঝে মাঝে
গভীর মেতে থাকার অভ্যাস, নিভৃত হৃৎস্পন্দন সবইতো
ছেড়ে গেছে তাকে একযোগে। শুধু আত্মা তার একটি অদৃশ্য
মালা হয়ে দোলে সারা ঘরে অগোচরে; বকুলতলার পাখি
**আবার বসলো এসে জানালায় একা, গানে গানে বলে গেলো নেই নেই নেই।**
ভিড় কৃশ হলে থেমে গেলে পাঁচমিশেলী গুঞ্জন, সুনসান
নীলিমার থেকে এলো নারী কেমন আলাদা। অলক্ষ্যে সবার খুব নিরিবিলি
দাঁড়ালো শয্যার পাশে কী সঙ্গীতময় অস্তিত্বের তেজে ঋজু,
একাকিনী; অদৃশ্য সে মালা তার গলায় এখন। কিছুক্ষণ
**রাখে চোখ শেষ দৃশ্যে অনন্তর নিলো সে বিদায়; শব্দহীন পদধ্বনী কোথায় মিলায়।**
একটি অনাবশ্যক, স্মৃতিহীন, স্বপ্নহীন, নিঃসঙ্গ শরীর পড়ে থাকে
অনেক চোখের নীচে। মনোভূমিপ্লাবী অলৌকিক জ্যোৎস্না বলে যাই।

## জাহানারা আরজু

### সম্রাটের শিরোপায় ভূষিত

### (কবি ফররুখ আহমদের মৃত্যুদিন স্মরণে)

আমরা ক'জন শুধু ঘিরেছিলাম তখন তাঁকে
চোখে চোখে বরফ-গলা হৃদয়ের নদী বহমান
অসহায় সহস্র প্রশ্ন বিদ্ধ করেছিল পাঁজরের
ভেতর; নীরব-বিবেক-পীড়িত দংশনে রক্তাক্ত
চেতনার পাখী আহত মূহ্যমান, ডানা ঝাপটালো

বারবার! পাশের ঘরে সদ্য-বৈধব্যের শিকার
ঝড়-ক্লান্ত কবি-স্ত্রী-সন্তান, পরিজন;
সহস্র প্রশ্নের তীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে গিয়েছিল সেদিনের আকাশ!

আমরা যেন ছায়া ছায়া দুঃস্বপ্নের ঘোর-লাগা
সবাই, এ ওকে দেখছি অচেনার মত, সবারই
চোখে মুখে ঘুরে ঘুরে ছায়া ফেলছে একটি প্রশ্নের
শকুনি-আমরা যেন চমকে ফিরে আসছি,
সে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে কি পেরেছি তখন?

অতি পরিচিত যে ছিল, ছিলো আমাদের কাছের
একজন, সবার প্রিয় পরিচিত কবি; যে তাঁর
শব্দের আখরে আখরে বেঁধে নিয়ে গেছে অচেনা
দ্বীপের সন্ধানে বারদরিয়ার পাল তুলে দিতে,
অসীম সাহসী সে নাবিক, ঝড়ের ভ্রুকটি হেলায়
উপেক্ষা করে বার বার দিয়ে গেছে ডাক।

সেদিনও দেখছি তাঁকে,
সেই প্রদীপ্ত প্রখর সুন্দর অবয়ব, মৃত্যুর মহিমায়
আরে বুঝি সুন্দর-সম্রাটের শিরোপায় ভূষিত
যেন বহ্নি দীপ।
একলা চলার সে নির্ভীক সৈনিক মোম হয়ে
গ'লে গ'লে নির্বাপিত জীবনের সব
পঙ্কিল আবর্ত থেকে, ঘাঁটাঘাঁটি, কাড়াকাড়ি
ছেঁড়া খোঁড়া এ জীবনের মর্তলোক উপেক্ষায় ঠেলে
সে পবিত্র শাহীন-আত্মা বন্ধনহীন উডডীন
ধরাছোঁয়ার সীমানা ছাড়িয়ে দূর হতে দূরতম
দেশে; তখন বুঝি পালে লেগেছে তাঁর সাত-সাগরের
হাওয়া, নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা-
দুঃসাহসী সে সিন্দবাদ তুলেছে পাল তাঁর
বারদয়িরার উদ্দেশে।
কাফনের তলে তখনো যেন বুকে তাঁর জিজ্ঞাসারা
কথা বলে, রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী?
উত্তর দিতে পারিনিত কেউ রাত পোহাবার
কত দেরী আর?

আমরা ক'জন শুধু: হৃদয়ের উত্তাপ অর্ঘ্যের
পুষ্পে রেখেছি স্বাক্ষর, বোবা বেদনায় মৌন নিথর
আমাদের সব ভাষা বুঝি; কিন্তু সরব তাঁর
কবিতার ভাষা; তাঁর সেই অজেয় সৃষ্টি 'লাশ'
যেন আবার কবিতার পঙ্ক্তি থেকে উঠে এসে
স্ফীতোদর বর্বর সভ্যতার মুখে লাথি মেরে গেছে
এবং তাঁর সে মায়াবী-'ডাহুকের অবিশ্রান্ত সুরে,
বুকের সেতারে আজো যে কান্নার শাশ্বত ঝড়
ওঠে, আমরা ত বাজাতে পারিনি সে সুর তেমন করে।

অথচ তিনিত চেয়েছিলেন বিশ্বাসে, আশ্বাসে,
স্নেহে জড়িয়ে রাখতে সর্বক্ষণ আমাদের, তাঁর
কবিতার শরীরে ও অন্তরে যে বুলন্দ সঙ্গীত বেজেছিল,
যে তাঁর ঐতিহ্যের আমেজে, শব্দের ঘ্রাণে এক
সুবিশাল সাম্রাজ্য গড়েছিলো, আমরা ত কেউ
বাজাতে পারিনি সে সুর তেমন করে।

বারবার তাই সে গুণীর গান অবাক হয়ে শুনে
যাই প্রাণ ভরে; সরবে, শপথে বিশ্বাসীর
পবিত্রতায় যে তাঁর কবিতার প্রতিবিন্দু নিজের
জীবনেই করেছেন সত্যে-পরিণত! চির সমুন্নত
তাই তাঁর দ্বিধাহীন কণ্ঠধ্বনী,-
"মুজাহিদ, বিশ্বাসী যে হয়না সে আনত কখনো
যদি সে প্রলুব্ধ হয় ধ্বংস করে সত্তা নিজের
অসত্যের ভারবাহী মরে সেই গুমরাহ্ প্রাণ
অবরুদ্ধ হয় খ্যাতি, অর্থ স্বার্থের পিঞ্জরে'
বলেছেন আরো, সৃষ্টির সেরা মানুষের জন্যে
প্রীতি-প্রেম শ্রদ্ধায় বিগলিত চির কবিকণ্ঠ তাঁর,
"কাব্য নয়, শিল্প শুধু সে মানুষ নিঃস্বার্থ,
ত্যাগী ও সেবাব্রতী পারবে যে জাগাতে সমস্ত
ঘুমন্ত প্রাণ, ঘুম ঘোরে যখন বেঁহুশ
জ্বালাতে পারে যে আলো, ঝড় ক্ষুব্ধ অন্ধকার রাতে
যার সাথে পথচলা শুরু হয় জাগ্রত যাত্রীর।"

তাঁর সে অমোঘ চেতনার অংশ নিতে ডেকে গেছেন
সবাইকে, শিশুর মত বিশ্বাসে, আশ্বাসে, অভয়ে
আমাদের! আমাদের কৈশোর কল্পনা সবুজ
বাগানে বসাতে চেয়েছেন ফুলের জলসা,
কোন অচেনা দুর থেকে যেন ভেসে এসেছে  এলাচ,
লবঙ্গ দারুচিনির ঘ্রাণে মাতাল হাওয়া; চেয়েছেন
নিয়ে যেতে কায়রা পরী, গুলেবকৌলির অপূর্ব
সে সম্মোহনীর দেশে; এ্যামনের রাজদরবারে আর
শাহেরজাদারী হিরণ্য প্রাসাদে চেয়েছেন বারবার
নিয়ে যেতে! হাতীম তাই-ই-র দারাজ দিলের
আলো নিয়ে খোলাতে চেয়েছেন রুদ্ধ মনের দুয়ার।
অক্ষমতা আমাদের পারিনি খুলতে সে হীরণ্য
প্রাসাদের দ্বার-পারিনি খুঁজে নিতে তাঁর
সে প্রদীপ্ত আলোর বন্দর!

একক পথিক যাত্রী সে একক,
নির্ভীক যে সত্যের সৈনিক একক চলাতে তাঁর
ভয় নেই! অটল বিশ্বাসে সে একক নক্ষত্রের
মতো আকাশে তাঁর; তুলনা সে তাঁর নিজের,
নিজেকেই নব নব চেতনায় অতিক্রম করে যাবার
আশ্চার্য প্রতিভা সে একক!

আমরা ক'জন যখন তাঁকে ঘিরেছিলাম,
নশ্বর দেহ তাঁর অন্তিম যাত্রার জন্যে প্রস্তুত
তখন; ইস্কাটনের ওই প্রাণহীন ফ্ল্যাটটা যেন
মুহূর্তে পেয়েছিল বারদরিয়ার ঘ্রাণ, সফেদ
তাজী আসছিল ঢেউএর মাথায় মাথায়;
চোখে চোখে বরফ-গলা হৃদয়ের নদী, চারদিক
থেকে নীরব জিজ্ঞাসায় যেন ভেসে আসছিল
তারই সে দুর্লভ কণ্ঠ উৎসারিত জিজ্ঞাসা:
'রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী?' আমরা
যেন নিরুক্ত উচ্চারণে বলেছিলাম-রাত
পোহাবার আর নেই দেরী, এবার তোমার
পালে লেগেছে হাওয়া, এবার তোমার কিস্তি

ভাসাও জোরে।

আমরা যে ক'জন ঘিরেছিলাম তাঁকে, তারা
যেন নিঃস্ব হয়ে ফিরে এলাম, পূর্ণতায় সে
চলে গেল, দূরে বহুদুরে; মৃত্যুর শিরোপায়
ভূষিত সে সম্রাট যেন, আমরা যেন দুঃস্বপ্নের
ঘোর লাগা অশরীরীর মতো ফিরে এলাম-
সহস্র প্রশ্নের দংশন পীড়িত বড় শ্রান্ত তখন?

## ফজল শাহাবুদ্দীন-এর দুটি কবিতা

(কবি ফররুখ আহমদ আমার প্রিয়, তাঁর স্মৃতিকে)

### সন্ত্রাসিত আমার কঙ্কাল

নিঃসঙ্গ কষ্টের মধ্যে ডুবে যাই কখনো কখনো
আমার অস্তিত্বে যেন সন্ত্রাসিত সমুদ্রের পাখি
কম্পিত আঁধারে ভরা ছিন্ন ভিন্ন শ্রাবণ সঘন
আমাকে বিপন্ন করে সেই কষ্ট ভীষণ একাকী

সকাল সন্ধ্যার মতো মিশে আছে অস্থির বন্ধনে
আমার বাসনা জুড়ে কষ্ট সেই আছে চিরকাল
আমাকে বাঁচিয়ে রাখে চৈতন্যের গভীর ক্রন্দনে
মন্থিত আর্তির মধ্যে স্বপ্ন দেখে আমার কঙ্কাল

### বিশাল কোরাস

কী আশ্চর্য কী অদ্ভুত কী সুন্দর কী অচিন্ত্যনীয়
পৃথিবী নক্ষত্র আর চন্দ্র সূর্য শূন্যতা বিশাল
বৃক্ষলতা পুষ্প পশুপাখি আমি এবং তুমিও
অমোঘ নির্দেশে এক বেঁচে আছি থাকি চিরকাল

আমরা প্রকৃতির এক ক্রমাগত বিশাল কোরাস
যূথবদ্ধ শব্দাবলী বিন্দুমাত্র নেই কোনো যতি
লুপ্ত সব নক্ষত্রেরা ফিরে এসে ভরায় আকাশ
নিশ্চলের মধ্যে বাঁচে গাণিতিক জীবনের গতি।

## আল মাহমুদ

### ফররুখের কবরে কালো শেয়াল

কাল শেষ রাতে চাঁদ নৌকোর মত আলো ছড়িয়ে
নিজের জোছনার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে
আমি ফররুখ আহমদের কবর দেখতে গিয়াছিলাম।
আমার পরনে ছিল দু' টুকরো শাদা কাফন, হাতে সোনালী কাবিন'।
আমি জেলে যাবার আগে তিনি আমাকে টেলিফোন করেছিলেন,
আসিস তোর কবিতা নিয়ে কথা বলবো
আমি যাইনি।
যাইনি, কারণ ছন্দের আড়ালে আমি যে ছদ্মবেশ ধারণ করি,
সে আলখাল্লার বোতাম খুলে ফেলবেন আমি জানতাম।
আমি নদীর সাথে নাদীর,
শাকম্ভরী বাংলাদেশের সাথে আমার মায়ের
যে উপমা স্থাপন করেছিলাম,
তিনি তহবীহ ঘোরাতে ঘোরাতে তাতে ফুঁ দিলে
মিকাইলের মুখ হয়ে যাবে। ভয়ে
আমি যাইনি।
আজ যখন তাঁর কবর দেখতে যাবার সময় যোগ্য পোশাক
খুঁজছিলাম হঠাৎ মনে হলো, চিত্রিত শার্ট, সবুজ পাতলুন আর
আমার বাহারে জুতোয় তিনি পানের পিক ছিটিয়ে দেবেন।
ফররুখের সামনে দাঁড়াবার মত কোনো পোশাক
আমার আলমারিতে ছিলনা। আলনার জামা-কাপড়
শ্মশান থেকে কুড়িয়ে আনা মড়ার আধপোড়া আচ্ছাদনের মত
দুর্গন্ধ ছড়াতে লাগলো।

একবার ভাবলাম, আমি নেংটা হয়েই সেখানে যাইনা কেন?
ফররুখ ভাইতো আমাকে একটা লেংটা শিশু' বলেই জানতেন।
আবার ভাবলাম, নিঃস্তব্ধ কবরগাহে নিমজ্জমান চাঁদকে
তিনি যদি আমার নয়তা দেখিয়ে দেন, আমি কোথায় পালাবো?
আমি নিয়ম-কানুন মানিনা, কিন্তু বেশরা কবিতার জন্যে
তিনি যদি আমাকে নিসর্গরাজির সামনে বেয়াদব বলে গালি দেন,
আমি সইতে পারবো না
শেষে আমি কাফনই পরে নিলাম।

১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের যে সব লোক
ঘরে কবরের কাপড় কিনে রেখেছেন; আমি তাদেরই একজন।

আমি যখন তার কবরে আমার উপস্থিতি ঘোষণা করে
লাব্বায়েক লাব্বায়েক বলে উঠে দাঁড়ালাম,
ঠিক তখুনি তার কবর থেকে একটা মস্তবড়ো শেয়াল
লাফিয়ে সরে গেল। কবি বেনজীরের বাড়ীর পাশ দিয়ে শেয়ালটা পালিয়ে যাচ্ছে।

মনে হলো শেয়ালটাকে আমি চিনি আগে কোথাও দেখে থাকবো।
একবার বিদ্যাপতির কবরে অনেকগুলো শেয়াল দেখেছিলাম,
এ শেয়ালাট সেখানে ছিলনা।
আমি লালশাহের মাজারে এক মারফতির উৎসব শেষে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম,
ঘুমের মধ্যে দু' টি শেয়াল আমার দেহ শুঁকছিল,
এ শেয়ালটা সেখানেও ছিল না।
তবে শেয়ালটাকে আমি কোথায় দেখেছি?
কিছুতেই মনে পড়ছে না।

কবরের কাছে একটা কালো গাছের দিকে চোখ পড়তেই
আমার স্মৃতির উপর বিদ্যুৎ বইল।
হাঁ, পঁচাত্তুরের চিত্র প্রদর্শনীতে এই শেয়ালটাকে আমি দেখেছিলাম,
কামরুলের কালোশিল্পের মধ্যে এই ধূর্ত লেজ উঁচিয়ে ছিল;
সেই কুটিল চোখ আর লোভাতুর মুখচ্ছবি আমার চেনা।
আমি ফররুখের কবর পেছনে রেখে,
একটা কালো শেয়ালকে তাড়াতে তাড়াতে
বাংলাদেশের মানচিত্রের উপর দিয়ে
আমার কাফন নিয়ে দৌড়াতে লাগলাম।

## বদরুল হাসান

### তবু তুমি জাগলে না?

লাশের কবিতা আজ লাশ হয়ে
ঘুচিয়েছে কবিতার বিলাস!
শব্দের বিলাসীরা তাই নিয়ে
অর্থার্জনের পুরায় অভিলাষ
জীবনের অচিন পুরে মরণের
অভিজ্ঞান লভি

হে কবি কিসের কবিতা লিখিবে আর?
সমস্ত হলাহল অমৃত হয়ে ওঠে নাকো আর?
কেবলি গরল এবার হয়ে জ্বালাময়
কণ্ঠে তোলে নীলকাষ্ঠ করে
তোলে ফির বিদ্রোহীকে!
শিরে তার কণ্টক মুকুট শোভা!
নৌফেল হাতেমের কবি হাতেম!
তাই এলো নাকো মরণ শিয়রে।
সিন্দবাদের মানিক্যের জহুরের
লোভে যারা ছুটেছে পশ্চাতে
সন্ধারাতে কিশতী ডোরা দিনে
পলাতক ভীরু লোভী সে মেষের দল।
আবার কোলাহল করে এলো
সব ডঙ্কা পেটাতে!
পড়ে আছে শতাব্দীর শব
তবুও নীরব কেন কবি
পদাঘাত হানো পদাঘাত হানো
বলে নির্মম কণ্ঠে;
ধ্বংস হও ধ্বংস হও ধ্বংস হও!!!

## আব্দুল মান্নান সৈয়দ

### ফররুখ আহমদ

ইস্কাটন গার্ডেনে এসে একদিন ভেঙ্গে পড়েছিল সমুদ্রের ঢেউ,
সারারাত বয়েছিল সমুদ্রের বাতাস উদ্দাম,
ঝাউগাছে দীর্ঘশ্বাস শ্বসিত হয়েছে অবিশ্রাম
শুধু একজন জেনেছিল, জানেনি তো আর কেউ।

জমিনের হৃদয় অবধি ভিজিয়ে সে নিয়েছে বিদায়,
বাতাসে উড়েছে তার সী-মোরোগ,
বিশ্বাসে জ্বলন্ত দুটি চোখ,
আজ তার প্রতিধ্বনি শুধু পড়ে আছে কবিতায়-কবিতায়।

ধ্বনি থেমে গেছে, ঢেউ নেমে গেছে, বাতাস উড়িয়ে নিয়ে গেছে তাকে,
যে নাবিক দীপ্ত দিয়েছিল আমাদের গহন সত্তাকে।

মাটির বাক্সে বন্দী সমুদ্রের ঢেউয়ের সওয়ার,
পূর্ণিমায়-পূর্ণিমায় এসে-এসে ফিরে গেছে সমুদ্র জোয়ার।
সী-মোরোগ ভেসে গেছে দারুচিনি-দ্বীপের সকাশে
ফররুখ-নক্ষত্র তাকে আঁধারে চিনিয়ে দ্যায় পথ হেমন্তের রাত্রির আকাশে।

## আবদুল মুকীত চৌধুরী

### ঋজু মেরুদণ্ড ও ভাষণ

[কবি ফররুখ আহমদ]
আশ্চর্য ঋজুভাষীঃ টানটান মেরুদণ্ড, তাই
ভিন্নমতী লোকালয়ে প্রত্যায়ন উপস্থাপনাই
মোক্ষম ভাষণ হবে–ঈর্ষনীয় সে চরিত্রখানা
কর্তার ইচ্ছায় কর্ম বা কীর্তন নেই তার জানা।
মানুষ তো দাস নয়, প্রভুও সে কারো নয় ঠিক
তবে হ্যাঁ, মালিক আর বান্দা সে সৃষ্টি মাফিক,
সেখানে আনত শির-বিনত সে সুশীল আহ্বান
আমৃত্যু  গেয়ে গেলো কল্যাণী নান্দনিক গান।
বলা ও করার মধ্যে কবিদের বিস্তর ফারাক
দর্শন ও  কর্মক্ষেত্রে এ দৃষ্টান্ত প্রায় যে বেবাক
প্রচুর কাহিনী-কাব্য সমকালে, নিকট অতীতে
ব্যতিক্রমী চালচিত্র তোমার এ জীবন আর্শিতে।
সৃজন অন্বেষা আর চরিত্রের সোনা-সোহাগায়
করায়ত্ত অমরত্ব। সে কবরে কোন সন্ধ্যায়
কবি বে-নজীর সহ প্রান্তিকে জানাই সালাম
নজরুল অশ্রুধৌত সেই মুখ ফের আঁকলাম।

মননের ক্যান্‌ভাসে ফররুখ উজ্জ্বল অম্লান
উত্তরকালের জন্য অনিবার্য সে প্রদীপ্ত গান
'হেরার  তোরণ' পথে অজস্র চড়াই-উৎরাই
দুর্গম বন্ধুর আর জানি তার বিকল্প নাই।

## ফজল মাহমুদ

### দুর্ভিক্ষ

(কবি ফররুখ আহমদ শ্রদ্ধাস্পদেষু)
এখন রাত্রি শুধু রাত্রি নয় রাত্রির গর্ভ হতে
জন্ম নেয় পাতকী সকাল। রক্তের ভেতরে নেই
হিরন্ময় ভালবাসা শোভন প্লাবন, ফুলের
মহিমা তুলে প্রিয় আজ সাপের খেলা ।
এখন শব্দ শুধু শব্দ নয়, শব্দে এখন
যাবতীয় নষ্টামী আঁকা। চরাচরে মাতাল মৃত্যু
হাঁটে কসাই স্বভাব। বুক পকেটে
সেঁটে থাকে প্রতীতিহীন ঘাতক শবক।

এখন সময় শুধু সময় নয় সময় হলো
স্বস্তি থেকে সবটুকু মাংস কেটে ফেলা,
নষ্ট ফুসফুস নিয়ে বিব্রত জীবন যাপন।
এখন বাগানে আর ফুটফুটে জ্যোৎস্না আসে না
গ্লানির স্পর্শ তাকে পায়ে পায়ে ভয়
এইসব দিনরাত্রি শুধ দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞানময়!

## মতিউর রহমান মল্লিকের দু'টি কবিতা

### ফররুখ আহমদ

তাঁরে তো পেয়েছি নায়কের মতো বিকশিত স্বপ্নতে
মহাপুরুষ আর মহাকাব্যের মিলিত বিপুল স্রোতে
ভেতরেই তাঁর খুদী পেয়েছিল শাহীনের প্রিয় গান
আকাশের পরে আকাশে ওড়ার প্রাবল্য অম্লান।
যে-হাত কাব্য বিশ্বাসী এক আলোকিত পরিণামে
এবং কবিতা যেন বিদ্রোহী নিত্যনিগূঢ় দামে
গভীর নিশীথ-সাধনা-সঙ্গী ডাহুকের মগ্নতা
অথবা সে এক ফুল্ল মনন; জাগরিত মানবতা।
নৈতিকতার দীপ্ত উপমা উজ্জ্বল ধ্রুব তারা
যাঁর গতি হতে খুঁজে পেল অগণিত গতিহারা
বিভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে রওশন সত্তার

বেরিয়ে পড়ার মতো তিনি এক দূরগামী রাহবার।
অমর শিল্পী বিশশতকের কবিতার সম্পদ–
অনাগত কবি, কবি-বিস্ময় ফররুখ আহমদ।

## আমি কখনো সমুদ্র দেখিনি

একবার মিন্টু ভাই বলেছিলেন, কক্সবাজার গেলে
তোমাকে দু'টো আন্তর্জাতিক চোখ দেবো
তারপর নাফ নদীর একবুক জলে নামিয়ে দিয়ে
বাংলাদেশের শ্বেতপত্র পড়ে নিও
একবার ফররুখ স্মৃতি সংসদে গিয়ে মাহফুজউল্লাহকে
কাঁদতে দেখলাম
ব্যক্তিগত পড়তে গিয়ে তিনি যখন অন্য রকম হলেন
আমি তখন পৃথিবীর গোটা মানচিত্র
খামচে ধরে কাঁপতে লাগলাম
এবং শ্রদ্ধেয় সৈয়দ আলী আহসান
বুকের বোতাম খুলতে লাগলেন
স্কেচে দুটো চোখ দারুণভাবে জ্বলতে দেখে
ভীষণ ভয় পেয়ে আল মাহমুদের কাছে যেতেই বললেন
ফররুখ আমাদের পথিকৃৎ
আমি কখনো সমুদ্র দেখিনি
কেবল ফররুখের অনেকগুলো কবিতা পড়েছি।

## মোশাররফ হোসেন খান

## ফররুখ আহমদ

সমুদ্রের নাভি থেকে উত্থিত প্রচণ্ড দীর্ঘ শ্বাসে
কমে যেতে পারে পৃথিবীর আয়ু
সহসা ফিরে দাঁড়ান সামুদ্রিক নাবিক
হাতের মুঠোয় তাঁর সামুদ্রিক রূপোলী ঝিনুক
ঝিনুকের পেটে অপেক্ষমাণ অদৃশ্য এক সাহসী ঈগল
সাতটি সাগর -----
চলমান পৃথিবীর সর্বকালের ইতিহাস
মাস্তুলে দাঁড়িয়ে 'সাত সাগরের মাঝি'

পাটাতনে ঘাই মাসে আরণ্যক ভয়
কেউ যেন ডাকে :
থামো মাঝি, দেখ ঝড়ের উল্লাস
ঝড়! ঝড়তো উজ্জ্বল সাহসের প্রতীক, সমুদ্র-সভাব
নাবিক ফিরে দাঁড়ান উন্মত্ত ঝড়ের মুখোমুখি
বিস্মৃতির সীমানা পেরিয়ে অসীমের দিকে
নাবিকের চাহনিতে ফাঁক হয়ে যায় দরিয়ার নোনা পানি
পানির গভীর থেকে উঠে আসে উজ্জ্বল পাথর
বস্তুত কবি তিনি –
অনন্তের শুদ্ধতম কবি

## তাহমীদুল ইসলাম

### বিধ্বস্ত শিল্পগ্যালারি

(কবি ফররুখ আহমদকে নিবেদিত)
লালা গোলাপের অন্দরমহলে সুরভিত আনন্দ জমে;
এই বিশ্ব সুন্দর শিল্প-গ্যালারি এক,
এখানে মানুষ মহত্তম শিল্প,
এই শিল্প যদি নষ্টদের দখলে চলে যায়
তাহলে আমরা কেউ সুখে থাকতে পারবো না।
হাজার বছর ধরে সূর্য ও চাঁদ কক্ষ পথ পিরক্রমায় ব্যস্ত আছে,
আমাদের খাঁচার সবুজ পাখি একদিন উড়ে যাবে,
যতই মায়ার বাঁধনে তাকে বাঁধোনা কেন,
সে তার নীড়ে ফিরে যাবেই যাবে।
বুকের গভীরে তুমি হাত দিয়ে দেখ, তুমি কি সুখে আছো?
সভ্যতায় সভ্যতায় রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেছে?
ভুল থিওরি দিয়ে বিশ্বকে বিভ্রান্ত করো কেন?
বেবিলনের সভ্যতা তছনছ হয়ে গেছে,
রমণীদের উপর ধর্ষণের রক্তক্ষরণে সময় এবার লজ্জা পেয়েছে,
ভুখা নাঙ্গা কংকালসার আত্মাগুলো
গভীর নিশীথে সমুদ্রের মতো কাঁদে।
আমরা এসেছি এক জটিল সময়ের নষ্টস্বপ্ন প্রান্তরে;
হে আত্মা, তুমি ঘুম থেকে জাগো,
প্রতিবাদী হও,
অন্যকে জাগাও।

## মহিউদ্দিন আকবরের দু'টি কবিতা

### আলোর পথে যাবো

চিড়িয়াখানা, পাখির বাসা,
নতুন লেখা'য় তিনি
গেঁথে গেছেন ছন্দমালা
সুঁই-সুতাটি বিনি।
সাত সাগরের সফল মাঝি
সিন্দবাদের কবি
কাব্য গাথায় এঁকে গেছেন
হাতেম তাইয়ের ছবি।
দীপ্ত ছিলেন বিশ্বাসে আর
নিষ্ঠ ছিলেন কাজে
তার দখলই রেখে গেছেন
কথার ভাঁজে ভাঁজে।
সে আমাদের প্রাণের কবি
ফররুখ আহমদ
এই আমাদের দিয়ে গেছেন
আলোক মতির পথ!
আজকে তারই পথকে যদি
কেউবা আপন ভাবো
তার সাথে কেউ যাক বা না যাক
আমিই না হয় যাবো।

### ঝলমলে দিনের আশায়

(কবি ফররুখ আহমদ দিশারী ভাজনেষু)

একটা অনেক বড় তাণ্ডব এসে সাত-সাতটি জীবন প্রদীপ
নিভিয়ে যাবার পর, তমশাচ্ছন্ন বিভীষিকাময় ঘোর
আমাদের কাঁধে ভর করেছিলো। একটা সুন্দর সকাল দেখবো বলে
সুতীব্র বাসনায়, দুরুদুরু বুকে, প্রহর গুনছিলাম। অবশেষে—
অরুণোদয়ের রক্তাভ রোদ স্বর্ণালী দীপ্তি ছড়িয়ে
ঝলমলিয়ে হাসলো। একটা উজ্জ্বলতম দিন আসলো বলে
আমাদের হাসি হাসি মুখ, আশা সঞ্চার করেছিলো বুকের ভেতর।

আহা ! স্বপ্ন-রঙিন সোনালী দিন, মখমলে সুখ নিয়ে এলো দরজায়।
অথচ কি লজ্জা ! দুপুরটা গড়াতে না গড়াতেই কৃষ্ণ মেঘের ভয়াল চাদর
ছিনিয়ে নিলো রোদেলা প্রহর, দ্বিপ্রহরেই সূর্য হরণ !!
ঘন কালো মেঘ ফেড়ে মুখোশের আড়াল থেকে প্রকাশ্যে বেরিয়ে এলো
এগারো দানব। যেন একপাল হায়েনা !
আমাদের স্বপ্ন আশা ভালোবাসা সব কিছু—
সব কিছু ছিঁড়ে খুঁড়ে ভেঙেচুরে তচনচ। এগার দাঁতাল !
কালবোশেখের তাণ্ডব জুড়ে করে কুর্দন, লুটেপুটে খায় ঝলমলে দিন ;
ফিকে হয়ে যায় আমাদের সুখ, আমাদের আশা, আমাদের ভাষা হলো
আশাহত বুদবুদ। হতাশার কালো মেঘে ছেয়ে গেলো দেশ......
কাণ্ডারী ! কোথায় তোমার সিন্দবাদ ?
কোথায় ঘুমিয়ে আছে পাঞ্জেরী ?
ওদের জাগিয়ে দাও আরেকটি বার। আর না জাগে তো চাবুক চালাও,
চাবুকে তুফান তুলে শুয়োর তাড়াও, পোশাকী শুয়োরের আজ বড় উৎপাত।
কাণ্ডারী ! তুমি রেনেসাঁ জাগাও......
আমরা তো চেয়ে আছি আরেকটি ঝলমলে দিনের আশায়।

## লিলি হক

### শত পুষ্প গন্ধে

'সাত সাগরের মাঝি' হয়ে উড়িয়ে দিলে রঙীন পাল
'বার দরিয়ায়' বৈঠা হাতে ধরলে তুমি শক্ত হাল
স্বপ্ন জয়ী তরুণ তুমি ভাঙলে মনের অন্ধ কারা
মগ্ন পথিক ডাহুক পাখির কলতানে দেয় সাড়া
'সিন্দবাদ' এর যাত্রা পথে লড়াই করে বাঁচতে শেখা
নোনা দরিয়ার ডাক শুনে ঝড়ের রাতে জীবন দেখা
'পাঞ্জেরী' আজ সকাল দুপুর নতুন আলোর রঙীন পথ
জীবন জুড়ে শক্তি সাহস কাগজ কলম চলার রথ
'সিরাজাম মুনীরা'র কবি তুমি তোমার দানে
যত সঞ্চয়, তোমার প্রাণে, সবই তো ভালোবাসায়
পূর্ণ পাত্র অক্ষয়, শত পুষ্প গন্ধে ভরে দিলে
কবিতার সুধায়, লক্ষ নিযুত ঝর্ণাধারায়।
বাংলা ভাষার সৌকর্য সাধনায় সঁপে ছিলে দিনমান
হে প্রিয় কবি ফররুখ আহমদ, তোমাকে

বিনম্র ভালোবাসায় জানাই সম্মান।

## সৈয়দ ওয়াহিদুজ্জামান (কবিপুত্র)

## তুমি এসো ফিরে

আর একবার যদি আসতে ফিরে
আমাদের এ্ শূন্য আঙিনায়–
লতানো গাছ থেকে উঠোনের সিঁড়ি
সব যেন নিথর বেদনায চুপ হয়ে গেছে।
তুমি হারিয়ে যাবার পর থেকেই
সব বদলে গেছে সহসাই।
যেন একরাশ আলো ছড়ানো দীপটাকে
এক ফুৎকারে নিবিয়ে দিলো কেউ।
তোমার একদা প্রিয় ঘর আজ তাই
পরিণত শ্মশানে।
এ্ শূন্যতা, একে ভরে দিতে নেই কেউ।
যদিও জানি, রয়েছো পাশে পাশে
লতানো পাতার পরশে পরশে,
তবুও, ভাবনার আকাশে মেঘ করে
শূন্য উঠোনে বসে থাকি।

## নূর আল ইসলাম

## মানুষটা মানুষের

কতোদিন আকাশটা মেঘবতী জানালার পাশে
কতোকাল দরিয়ার দুঃখটা নীল উচ্ছ্বাসে
কিছু কথা রেখে যায় রাত পোহাবার কিছু আগে
পাখিদের কোলাহল বন জুড়ে মন অনুরাগে?
জানালার শিক ধরে বন্দরে কিশ্‌তীটা রাখলে না,
সবুজ পাতার মাঝে ঘুম রেখে কেনো তুমি জাগলে না?
আমাদের চারপাশ অন্ধকার বিপনির মেলা
আত্মার বিনিময়ে এ কেমন নির্মম খেলা!

মৌটুসি তোমাদের ঘুম;
শ্রাবণের মাসগুলো চৈত্রের দাবানল দেখে

ফর্সা আকাশ খোঁজে ফর্দের ভাঁজপাতা রেখে
ছুঁড়ে দেয় পাথরের চুম
আমার শরীর বেয়ে সাপ হাঁটে, আমি হাঁটি একা নির্ঘুম।

ওয়ারিশের ঔরসে ঐ সব আদমেরা চলে
সৈয়দী লেজ কেটে মিশে যায় সাম্যের দলে
অভিশাপ মুড়ে দিয়ে মিশে যায় সাম্যের দলে
অভিলাষ জুড়ে আছে পৃথিবীর দুরন্ত ডানা,
কোনোখানে পৌঁছাবো? কোন মরু বৈঠকখানা
ফরাশ বিছানো আছে আশেপাশে আর কিছু জানলে না,
সবুজ পাতার মাঝে ঘুম রেখে কেনো তুমি জাগলে না?
মানুষটা মানুষের মনপুরা জানালায় বসে
হিসাবের অংকটা নির্বাক চলে যায় কষে।

## নাসির হেলাল-এর দু'টি কবিতা

### ইশারা

উটের কুঁজের মত চোখ দু'টো হে সমুদ্রচারী
খুঁজে ফেরে আসমুদ্র হিমাচল শ্বেত কবুতর
সফেদ পোশাকে পরে তালি তবু থাকেন কঠোর
ফুঁসে ওঠা মধুমতি দিনান্তে সমুদ্রে ঢালে বারি।
কবিতার খাতা হয় রিমলিন থামে না কলম
প্রত্যয়ীর তুলি এঁকে চলে হেরার রাজতোরণ
মেঘ কেটে ওঠে চাঁদ কাঁচা কাঁচা সোনার বরণ
কবি তাই খুঁজে ফেরে অনাবিল শান্তির মলম।
হেঁকে ওঠেন নকীব দূরে দেখো আশার মাস্তুল
প্রতিটি প্রহর কাটে ভেসে ওঠে স্বপ্নের দালান
কানে আসে ডাহুকের ডাক ভোরে মধুর আজান
ফুল পাখি হেসে ওঠে হাসে কিশোরী দুল।
মৃত্যুর গহীনে তুমি দিকে দিকে পড়ে গেছে সাড়া
মাস্তুলে মাস্তুলে আজ দেখা যায় তারই ইশারা।

### সবার প্রিয় কবি

একটি পাখি ডাহুক পাখি গলা ছেড়ে ডাকে

সেই পাখিটি বাস করতো মধূমতির বাঁকে।
মধুমতির মতই পাখি লক্ষ্য পানে চলে
হেঁরার পথের পথিক পাখি সত্য কথা বলে।
সাগর পানে ছুটে চলা মধুমতির মত
শক্ত পায়ে চলতো পাখি চলতো অবিরত।
একটি পাখ ডাহুক পাখি সাত সাগরের মাঝি
ডাক দিয়ে যায় রাজ তোরণের জীবন মরণ বাজি।
চিল শকুনের ভয় পেত না ভয় পেত না রাজের
ফুলে ফুলে দেশটি ভরুক খাটতো বারো মাস।
সেই পাখিটি আর ডাকে না আর আঁকে না ছবি
ফররুখ নামের সেই পাখিটি সবার প্রিয় কবি।

## মৃধা আলাউদ্দিন

### একটা কষ্টের দেহ

এবং ওরা মাটিতে শুইয়ে দিল একজন কবিকে
বাতাসে ছেয়ে গেল ফুল-পাপড়ি
প্রজাপতি রঙের মতো দিন;
যেনো নূহ নাও, নদী–সন্ধ্যার সুন্দর বীণ–
অথচ বড়ো কষ্টের ছিলো কবির দেহ-ঘর অন্তরে।

## গোলাম নবী পান্না

### লেখেন দরদ ঢেলে

'সাত সাগরের মাঝি' লিখে
রঙ্গীন পাল উড়ান,
সেই পালেরই হাওয়ায় পাঠক
জ্ঞানের আলো কুড়ান।
শক্ত হাতের হালের ধারা
পালের হাওয়ায় মেশে,
মনটা কবির দোলায় কেবল
ভাবনা সাগর ঘেঁষে।
তাইতো কবির লেখায় ভাসে
নতুন পথের দিশা,

সেই লেখারই আলোক রশ্মি
ঘোচায় অমানিশা।
কোন্ সে কবির হাতের ছোঁয়ায়
এমন পরশ মেলে,
'ফররুখ' হলেন সেই সে কবি
লেখেন দরদ ঢেলে।

## সিদ্দিকুর রহমান

## মৃত্যুহীন হাত

(কবি ফররুখ আহমদ স্মরণে)

শিল্পী তবু পথ চলে।
খণ্ডখণ্ড চিত্রগুলো পাশাপাশি রেখে
জীবনের প্রতিবিম্ব খোঁজে ফিরে!
আবার কখনো
প্রদীপের সলতেটা টেনে টেনে
আলোর শিখাটাকে বাড়িয়ে
রাস্তায় নেমে আসে–
হয়তোবা ভরা দুপুরে, হয়তোবা ভোর বেলায়
অস্থির চিত্তে, আর চেয়ে অস্থির চোখে
পথের রেখা ভুলে যায়
ভুলে যায় গাড়ি–ঘোড়া, দালান, বাড়ি
বনানী প্রান্তর
ভুলেনা শুধু হৃদয়ের একটি বার্তা:
শিল্পী কার জন্যে উতলা তুমি?
কার জন্যে নিঁদহীন জেগে থাকা তোমার?
মানুষের জন্যে? কেবলি মানুষের জন্যে/
তাহলে আমাকে দেখাও, তোমার মানুষ কোথায়?
শিল্পী অশ্রুজল মুছে এক হাতে
আরেক হাতে প্রদীপ নিয়ে পথ চলে।
হায়রে পথচলা।
দিন যায় সন্ধ্যা নামে, তৈল ফুরিয়ে যায়
সলতেখানি জ্বলে জ্বলে শেষ
শিল্পী ঘরে ফিরে আসে।

মানুষ তার হলোনা দেখা
জনারণ্যে শিল্পী একাকী কেবলি একা
নিজেরই নিশ্বাসে নিজে সচকিত।
হায়রে হৃদয়।
কেনো এই চুনি চুনি কথা বলা!
শিল্পী মরে না কখনো
মৃত্যু তার তলোয়ারের বোঝা বয় শুধু–
শিল্পীর মৃত্যুহীন হাতে মৃত্যুকে পিছু রেখে
অন্ধকারের টুঁটিতে শুধু আঘাত করে
আঘাত করে কেবলি আঘাত করে।।

## রেজা সারোয়ার

## যে কবির কবিতা জ্বলে

এক বিস্ময় শক্তি এক প্রলয়ের নাম ফররুখ
ইসলামী জাগরণের নাম ফররুখ
এক দৃঢ় বিশ্বাসের নাম ফররুখ
চোখ দু'টি যার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মুখ অগ্নিগিরি
তাঁর চশমার ফ্রেমে বিদ্যুৎ জ্বলে
দৃষ্টিতে লাভা গলে
এক মহা বিপ্লব শোষণের বিরুদ্ধে বিস্ফোরণ
এক কালের ইতিহাস
আমি এক লৌহ মানবের কথা বলছি
একটি শপথের কথা বলছি
বলছি এক সংগ্রামের কথা
অন্ধকার হতে আলোর পথে
অন্যায়ের হতে ন্যায়ের পথে
একটি স্বপ্ন ও স্বর্গরাজ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ে
লিখেছিলেন সিরাজাম মুনীরা
যা সত্য ও পুণ্য পথের উজ্জ্বল নক্ষত্র
সাত সাগরের মাঝি হয়ে অনন্ত পারাপারের
বৈঠা বেয়েছেন
মুহূর্তের কবিতায়
লাশ হয়ে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ-উপদেশ দিয়েছেন

বিশ্ব বিবেককে
কাঁপিয়ে দিয়েছেন সাম্রাজ্যবাদের ভিত
নড়েছিল তখত তাউস অত্যাচারীর
এ এক মহান বীর ইসলামের তরবারি
জ্বলে উঠেছিল সোনালী দিন
ত্যাগের মহিমায় মানুষের জন্য কাজ করেছিল এ মহান পুরুষ
প্রতিটি অন্তরে জাগিয়েছিল উদ্ভাবনী সুর
উঠেছিল আলো অন্ধকার হয়েছিল দূর–

## শিবুকান্তি দাশ
### জাগরণের কবি

'ফুলের জলসা', 'ছড়ার আসর' এবং 'পাখির বাসা'
বইগুলো সব মিষ্টি ভারি জাগায় মনে আশা
কে লিখেছেন এসব বই এত্তো সোহাগ ভরে
এমন দিনে আজকে তাঁকে খুব যে মনে পড়ে।
'সাত সাগরের মাঝি' কিংবা পড়ো 'দিলরুবা'
পড়ে পড়ে উঠছে জেগে দেশের তরুণ যুবা
রেনেসাঁরই কবি তিনি এ দেশটা তাঁর বুক
মানবতার মূর্ত প্রতীক প্রিয় ফররুখ।
বায়ান্নতে ভাষার লড়াই গর্জে উঠেন তিনি
'সাওগাত' এ তার ক্ষুব্ধ কলম কাঁপছে পাকিস্তানী
বাংলাদেশের কবি তিনি জাগরণের ভোর
'পাঞ্জেরী'টা ডাক দিয়ে যায় খোলো বন্ধ দোর।
কবি হয়েও শিল্পী তিনি সাম্যের গেয়ে গান
সৃষ্টিকে তাঁর কাব্য-জ্ঞানে ছুঁয়েছে আসমান।
স্বাধীনতা পদক এবং একুশ পদক তাঁর
গুণের কদর হলো বলে মোদের অংহকার।
ফররুখ আহমদ সবার প্রিয়, গৌরবে মহান–
নেই তিনি আজ, তাঁর কবিতা করছে আলো দান।

## মুনীরুল ইসলাম
### ছন্দের কারুকাজে

টানা টানা চোখ ছিল চশমার ফ্রেম

মনে ছিল এদেশের ভালোবাসা প্রেম
লিখেছেন ছোট বড় সকলের জন্য
বাংলা এভাষাকে করেছেন ধন্য।
'চিড়িয়াখানা' কিবা 'হরফের ছড়া'
'নতুন লেখা'ও যে তার হাতে গড়া
ঘুমন্ত নাবিকেরে জাগাতেই মত্ত
'সাত সাগরের মাঝি' এইরূপ তথ্য।
প্রকৃতির সাথে ছিল কী যে তার সখ্য
ছন্দের কারুকাজে তিনি পরিপক্ব
অন্তরে গাঁথা ছিল ইসলামের-ই চেতন
রেখেছেন উড্ডীন সত্যের-ই কেতন।
অসহায় মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতেন
অন্যায় প্রতিরোধে দুই হাত বাড়াতেন
লিখেছেন ছড়া-গান-গল্প ও কাব্য
চিরদিন আমরাও তার কথা ভাববো।
বলতেন জাতিকে- 'সব বাধা ঝড় রুখ'
আমাদের প্রিয় কবি রেনেসাঁর ফররুখ।

**ফরিদুল হক রেন্টু**

## ফররুখ তুমি জিন্দাবাদ

ফররুখ তুমি মানবতাবাদী
সত্য, ন্যায় আর সাম্যের কবি
তোমার মাঝেই খুঁজে পাই আমি
ভিন্ন এক নজরুলেরই ছবি।
বাংলা সাহিত্যের আকাশে ছিল
যখন নিকষ কালো ঘোর অমানিশা
'সাত সাগরের মাঝি' 'পাঞ্জেরী'
নিয়ে এলে তুমি, দেখালে পথের দিশা।
সাহিত্যের নানান শাখায়
তোমার ছিল অবাধ বিচরণ
আলোকিত হয়েছে সবাই
হৃদয়ে জেগেছে অজানা শিহরণ।

সমাজ সংসার সাহিত্য সর্বত্রই এখন
দুর্দিন আর অবক্ষয় চলছে ফররুখ
তোমার কালজয়ী সব্যসাচী রেনেসাঁ লেখা
আজও পাঠকের হৃদয় চির জাগরুক।
ফররুখ তুমি ফিরে এসো নতুন করে
নিয়ে অন্য কোন সিন্দবাদ
তোমার লেখনী অবক্ষয় রবে চিরদিন
তুমি অমর তুমি জিন্দাবাদ।

## মোমিন মেহেদী

### জমে ওঠে কার্বণ রাগ

তুমি বলেছিলে–
'কালো আকিকের মত এ নিকষ দরিয়ার বুক ছিঁড়ে
চলো সন্দল-বন সন্ধানে অজানা দ্বীপের তীরে'
উদার আকাশ ক্লান্ত সময় পার করে করে
জীবনের গতিবিধি পথ ধরে ধরে
তুমি চেয়েছিলে– নিকষ মনের দুয়ার খুলে
হারিয়ে যেতে গভীর বনে স্বপ্নে দুলে দুলে
কিন্তু না একটা বাধা একটা বিপদ আসলো ধেয়ে
অজগর দেহ থেকে নেমে দুঃখ বেয়ে বেয়ে
আর তখনই একটা উচ্চারণ একটা শব্দ 'ভাগ'
কুপির কালো ধোঁয়াতে জমে ওঠে কার্বন রাগ
তুমি সেই কার্বন রাগ ঘিরে দিলে
মেলে দিলে পার্বণ
কপি রাইট হচ্ছে তো হচ্ছে
দিয়ে গেলে গচ্ছে জীবনের বহু বহু উপোস সময়।

-০-

## পরিশিষ্ট–১

# ফররুখ আহমদের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি

**মুহম্মদ মতিউর রহমান**

১৯১৮- জন্ম : ১০ই জুন পবিত্র রমজান মাস; গ্রাম ঃ মাঝআইল, মাগুরা, যশোর। পিতা-মাতার দ্বিতীয় পুত্র। বাবা-মায়ের দেয়া নাম সৈয়দ ফররুখ আহমদ। কবি পরে নিজের নাম থেকে 'সৈয়দ' শব্দটি বাদ দেন। রমজান মাসে জন্ম বলে দাদি কবিকে 'রমজান' বলে ডাকতেন। পিতাঃ পুলিশ-অফিসার খান সাহেব সৈয়দ হাতেম আলী। মাতা : রওশন আখতার।

১৯৩৬ - খুলনা জেলা স্কুল ম্যাগাজিনে প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন স্কুলের শিক্ষক খ্যাতনামা কবি আবুল হাশেম।

১৯৩৭- 'রাত্রি' শীর্ষক কবিতা প্রকাশিত হয় মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ (বাহার) সম্পাদিত 'বুলবুল' পত্রিকায় (শ্রাবণ, ১৩৪৪)। এ-মাসেই 'পাপ-জন্ম' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় (আষাঢ়, ১৩৪৪)। অন্যান্য প্রকাশিত গল্প 'বিবর্ণ', 'মৃত বসুধা', 'যে পুতুল ডলির মা', 'প্রচ্ছন্ন নায়িকা' লেখেন ১৩৪৪-৪৬ সময় পরিসরে। প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা নিজ গ্রামের পাঠশালায়। পরবর্তীতে কলকাতা মডেল এম.ই. স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। স্কুল-জীবনে শিক্ষক ছিলেন কবি গোলাম মোস্ত ফা, কথা-সাহিত্যিক আবুল ফজল, কবি আবুল হাশিম প্রমুখ। সাহিত্য-ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপিত হয় কবি আহসান হাবীব, কথাশিল্পী আবু রুশ্‌দ, কবি আবুল হোসেন, কবি সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখের সঙ্গে। কলকাতা রিপন কলেজে পড়াকালে কবি শিক্ষক হিসাবে পান কবি বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, প্রমথনাথ বিশী-এঁদেরকে। এ-সময় বুদ্ধদেব বসু-সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় কবির গুচ্ছ-কবিতা।

১৯৩৮ - প্রথম জীবনে কবি 'এফ. আহমদ' নামে লিখতেন। এ নামে তাঁর কিছু রচনা প্রকাশিত হয় মাসিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকায়। ১৯৩৮ সনে প্রখ্যাত কবি দার্শনিক আল্লামা ইকবাল-এর ইন্তেকালের পর কবি ইকবালকে নিবেদিত কবিতা 'স্মরণী' লেখেন। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন সম্পাদিত মাসিক সাহিত্যপত্র 'সওগাতে' প্রথম কবিতা 'আঁধারের স্বপ্ন' ছাপা হয় (পৌষ, ১৩৪৪)। ১৯৪৭ (বাংলা ১৩৫৪) পর্যন্ত কলকাতা থেকে প্রকাশিত সওগাতে এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখেছেন।

১৯৩৯ - আই.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলকাতা, দর্শনে অনার্স নিয়ে বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হন। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ফতেহ লোহানীকে পান সহপাঠী হিসেবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়।

১৯৪০ - স্কটিশ চার্চ কলেজ ছেড়ে ইংরাজি সাহিত্যে অনার্স নিয়ে বি.এ. ক্লাসে কলকাতা সিটি কলেজে ভর্তি হন। 'কাব্যে কোরআন' শিরোনামে 'মোহাম্মদী' ও 'সওগাতে' বেশ কিছু সূরা-র স্বচ্ছন্দ অনুবাদ প্রকাশ করেন। উক্ত একই সনে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ সম্মেলনে গৃহীত ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাবে'র প্রেক্ষিতে কবির মতাদর্শগত পরিবর্তন ঘটে। কবি তাঁর মুরশিদ বিশিষ্ট আলেম অধ্যাপক আব্দুল খালেকের সংস্পর্শ লাভ করেন। কবি তাঁর মুরশিদের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন। বাম মতাদর্শ থেকে ক্রমান্বয়ে ইসলামী চিন্তা-চেতনায় পুরাপুরি উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন।

১৯৪২ - বিয়ে হয় খালাতো বোন সৈয়দা তৈয়বা খাতুনের (লিলি) সঙ্গে। বিয়ে উপলক্ষে কবি, লিখলেন 'উপহার' শীর্ষক একটি কবিতা। কবিতাটি প্রকাশিত হয় 'সওগাত' (অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯) পত্রিকায়।

১৯৪৩ - কলকাতা আই.জি. প্রিজন অফিসে চাকরিতে যোগদান করেন। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে'র সপ্তম অধিবেশনে কবি আবৃত্তি করেন, 'দল-বাঁধা বুলবুলি' ও 'বিদায় শীর্ষক কবিতা। 'সাত সাগরের মাঝি', 'সিরাজাম্ মুনীরা', 'কাফেলা' প্রভৃতি কাব্যের অন্তর্গত কবিতা রচনার শুরু হয় এ সময়। ফররুখ এ-সময় রচনা করেন ১৩৫০-এর মন্বন্তর বিষয়ক কবিতাগুচ্ছ – বাংলা সাহিত্যে যা তাঁর অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর হয়ে আছে।

১৯৪৪ - কবির প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' প্রকাশিত হয়। সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'আকাল'-এ সংকলিত ফররুখের 'লাশ' শীর্ষক কবিতা ছাপা হয়। কবির পিতা সৈয়দ হাতেম আলী ইন্তেকাল করেন ১০ নভেম্বর ১৯৪৪।

১৯৪৫ - পি.ই.এন. আয়োজিত রাইটার্স কনফারেন্স-এ বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ কাজী আবদুল ওদুদ ফররুখ-কাব্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে আশ্বাবাদ ব্যক্ত করেন। কবি আব্দুল কাদির ও রেজাউল করীম-সম্পাদিত কাব্য-মালঞ্চে সংকলিত হয় কবিতাত্রয় 'শিকার', 'হে নিশানবাহী' ও 'সাত সাগরের মাঝি'। সংকলনের ভূমিকায় গুরুত্ব লাভ করে ফররুখ কাব্য-প্রসঙ্গ। 'মোহাম্মদী' পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগে যোগদান করেন। একটি অপ্রীতিকর ঘটনার দরুন পত্রিকার মালিক মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর সাথে তাঁর মনোমালিন্য ঘটায় প্রায় বছরখানেক পর তিনি 'মোহাম্মদী' অফিসের চাকরিতে ইস্তফা দেন।

১৯৪৬ - 'আজাদ করো পাকিস্তান' কাব্য-পুস্তিকা প্রকাশিত। সর্বভারতীয় দাঙ্গার প্রেক্ষিতে লেখেন দাঙ্গা-বিরোধী গুচ্ছকবিতা। কলকাতা বেতারে আবৃত্তি করেন, 'নিজের রক্ত' শীর্ষক দাঙ্গা-বিরোধী কবিতা। আকাশবাণীর গল্পদাদুর আসরেও কবি অংশগ্রহণ করতেন। এ সময় জলপাইগুড়িতে একটি প্রাইভেট ফার্মে অল্প কয়েক দিন চাকরি করেন।

১৯৪৭ - 'মোহাম্মদী' অফিসের চাকরিতে ইস্তফা দানের পর থেকে কবি বেকার জীবন-যাপন করেছেন। এ বছরেই কবি আব্দুল কাদির-রচিত 'নবীন কবি ফররুখ আহমদ' নিবন্ধটি কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত হয়। কলকাতা ছেড়ে চলে

আসেন শ্বশুরবাড়ি দুর্গাপর, যশোরে। 'পাকিস্তান : রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় (সওগাত, আশ্বিন, ১৩৫৪)। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান। অর্জিত হলো ৪৭-এর স্বাধীনতা। ১ সেপ্টেম্বর ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের সূচনাকারী প্রতিষ্ঠান 'তমদ্দুন মজলিশে'র জন্ম। ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত। এ সময় ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা করেন।

১৯৪৮ - কলকাতা থেকে সপরিবারে ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকা বেতারে অনিয়মিত শিল্পী হিসাবে যোগদান। বেতারের প্রয়োজনে কবি এখান থেকে নিয়মিত গান রচনা করেন। আধুনিক, দেশাত্মবোধক, হাম্‌দ-নাত প্রভৃতি গানের পাশাপাশি কথিকা, নাটিকা, গীতিনাট্য, গীতিনক্‌শা– এসবও রচনা করেন। পঞ্চাশের দশক থেকে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান 'কিশোর মজলিশ' পরিচালনা শুরু। গদ্যনাটিকা 'রাজরাজড়া' প্রকাশিত (পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিনীত– মুনীর চৌধুরী প্রমুখ এ নাটকে অভিনয় করেন)।

১৯৪৯ - কার্জন হলে অনুষ্ঠিত ইকবাল-জয়ন্তী অনুষ্ঠান বর্জন করেন, তরুণ লেখকদের আমন্ত্রণ না করার প্রতিবাদে।

১৯৫১ - ফররুখ আহমদকে (পনেরো জন শিল্পীসহ) ছাঁটাই করা হয়। বেতারশিল্পীদের সতেরো দিনব্যাপী ধর্মঘটের প্রেক্ষিতে ফররুখ আহমদকে (অন্যান্য শিল্পীসহ) চাকরিতে পুনর্বহাল করা হয়।

১৯৫২ - 'সিরাজাম মুনীরা' প্রকাশিত। ঢাকা রেডিওর নিজস্ব শিল্পী হিসাবে বহাল হন। রাষ্ট্রভাষার দাবিতে সালাম, জব্বার, রফিক, শফিকের শাহাদতের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বাইরে, ঢাকা বেতারেই প্রথম প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। সোচ্চার হন ফররুখ। এ সময় ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সিপাহী বিপ্লব শতবার্ষিকী সংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এ-উপলক্ষে কবিতা ও গান রচনা করেন।

১৯৫৩ - ঢাকা বেতার থেকে 'নৌফেল ও হাতেম' কাব্যনাট্য প্রচারিত হয়। এ নাটক প্রযোজনা করেন ও নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেন খান আতাউর রহমান।

১৯৬০ - প্রেসিডেন্ট পুরস্কার 'প্রাইড অব পারফরমেন্স' লাভ করেন। এ বছরই বাংলা একাডেমীর পুরস্কার প্রাপ্তি (কবিতা) ও একাডেমীর ফেলো নির্বাচিত হন। বাংলা একাডেমী উদ্‌যাপিত নাট্য-সপ্তাহে 'নৌফেল ও হাতেম' মঞ্চস্থ হয়।

১৯৬১ - কাব্য নাট্য 'নৌফেল ও হাতেম' প্রকাশিত হয়। এ সময়ে সরকারি সফরে উত্তর ও দক্ষিণ বাংলা ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করেন। অধ্যাপক মুহম্মদ আব্দুল হাই-এর সভাপতিত্বে ঢাকা হলে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা-বাসরে প্রাণঢালা সংবর্ধনা পেলেন কবি। এ অনুষ্ঠানে ফররুখ সাহিত্য-প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেন সৈয়দ আলী আহসান, মুনীর চৌধুরী, আহসান হাবীব, আবুল হোসেন, শামসুল হুদা চৌধুরী প্রমুখ। মানপত্র পাঠ করেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। ফররুখের কবিতা আবৃত্তি করেন কবি শামসুর রাহমান,

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, বদরুল হাসান, সালমা চৌধুরী ও শবনম মুশতারী। আব্দুল আহাদের পরিচালনায় ফররুখ-সঙ্গীত পরিবেশন করেন ফরিদা ইয়াসমীন, আব্দুল লতিফ, আফসারী খানম, বিলকিস নাসিরুদ্দীন, রওশন আরা বেগম, ফজলে নিজামী প্রমুখ।

১৯৬৩ - 'মুহূর্তের কবিতা' প্রকাশিত হয়। এ বছরই ফারুক মাহমুদের সম্পাদনায় ছদ্মনামে লেখা কবির ব্যঙ্গ-কবিতার সংকলন 'ধোলাই কাব্য' প্রকাশিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক লাইব্রেরিতে 'সাহিত্য সপ্তাহ' উদ্‌যাপিত হয়। এ উপলক্ষে চর্যাপদ থেকে ফররুখ আহমদের কবিতা পর্যন্ত আবৃত্তির আয়োজন করা হয়। আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ। এতে কবির 'ডাহুক' কবিতাটি আবৃত্তি করেন অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম।

১৯৬৫ - শিশু-কিশোর কবিতা সংকলন 'পাখির বাসা' প্রকাশিত হয়। পাক-ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষিতে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কবি রচনা করেন 'জঙ্গী জোয়ান চল বীর', 'শহীদের খুনরাঙা কাশ্মীর', 'জেহাদের ময়দানে চল যাই' প্রভৃতি অসংখ্য উদ্দীপনামূলক গান।

১৯৬৬ - 'হাতেম তা'য়ী' প্রকাশিত হয়। এ বছর কবি তাঁর 'পাখির বাসা' কাব্যের জন্য 'ইউনেস্কো পুরস্কার' ও হাতেম তা'য়ী কাব্যের জন্য 'আদমজী পুরস্কার' পান। শেষবারের মতো ঢাকার বাইরে, অগ্রজ সৈয়দ সিদ্দিকী আহমদের সঙ্গে দেখা করতে ফরিদপুরে যান। ফিরে এসে লিখলেন 'বৈশাখ', 'পদ্মা', 'আরিচা-পারঘাটে' প্রভৃতি সাড়া-জাগানো কবিতা। স্বৈরাচারী আইয়ুবী শাসনের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার-প্রদত্ত 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' খেতাব প্রত্যাখ্যান করেন।

১৯৬৮ - শিশুতোষ ছড়াগ্রন্থ 'হরফের ছড়া' প্রকাশিত হয়।

১৯৬৯ - শিশু-কিশোর কাব্যগ্রন্থ 'নতুন লেখা' প্রকাশিত হয়। ডক্টর সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত গবেষণা গ্রন্থ 'কবি ফররুখ আহমদ' প্রকাশিত হয়। ফররুখ আহমদের উপর রচিত এটাই প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। প্রখ্যাত শিল্পী মোস্তফা আজীজ এ বছর (২৯ জুলাই) কবির একটি পোর্ট্রেট আঁকেন। দেশব্যাপী শুরু হয় উনসত্তরের গণআন্দোলন।

১৯৭০ - ছড়াগ্রন্থ 'ছড়ার আসর' (প্রথম ভাগ) প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ দুই দশকেরও অধিক কালব্যাপী কবি ঢাকা বেতারের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। এ বছরই ঢাকা বেতারের মুখপত্র পাক্ষিক 'এলানে'র (বর্তমান বেতার বাংলা) নভেম্বর (১ম পক্ষ) ১৯৭০ সংখ্যার প্রচ্ছদ ও প্রসঙ্গ কবি ফররুখ আহমদ প্রসঙ্গ গুরুত্ব লাভ করে।

১৯৭১-কবি ঢাকা বেতারে শেষবারের মতো কবিতা আবৃত্তি করেন। রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

১৯৭৩-স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে চাকরির ক্ষেত্রে কবি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। এ সময়ে 'ফররুখ আহমদের কি অপরাধ' (গণকণ্ঠ, ১ আষাঢ় ১৩৮০) শীর্ষক তীব্র, তীক্ষ্ণ প্রতিবেদন লেখেন আহমদ ছফা। এ প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা কেন্দ্রের বাণিজ্যিক কার্যক্রমে কবির চাকরি পুনর্বহাল হয়।

১৯৭৪ -কবির স্নেহভাজন অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমানের অনুরোধে শেষবারের মত স্বকণ্ঠে 'সিরাজাম মুনীরা' কবিতা আবৃত্তি করেন। কবির বাসায় মাওলানা আলাউদ্দীন আল্-আযহারীর উপস্থিতিতে মুহম্মদ মতিউর রহমান আবৃত্তিটি টেপ করেন এবং সে বছর সীরাতুন্নবী অনুষ্ঠানে তা প্রচারের ব্যবস্থা করেন। এ সময় সামাজিক ও দৈনন্দিন নানাবিধ কারণে কবির মন ও শরীর ভেঙে যায়। এ বছর জুন মাসে (আষাঢ় ১৩১৮) কবি তাঁর সর্বশেষ কবিতা ঃ দুর্ভিক্ষ বিষয়ক কবিতা '১৯৭৪ (একটি আলেখ্য)' লেখেন। এ ছাড়া লেখেন হাম্‌দ-নাত, গাদ্দাফী প্রাসঙ্গিক একগুচ্ছ কবিতা, তরজমা করেন আল-কোরআনের কিছু নির্বাচিত সূরা ও আয়াত এবং মাওলানা শফিউদ্দিন (দাদাজী)-কে নিবেদিত একটি দীর্ঘ উর্দু ক্বাসিদা। ১৯ অক্টোবর, শনিবার, সন্ধ্যেবেলা (রমজান মাস) ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকায় ইন্তেকাল। শাহজাহানপুরে কবি বেনজীর আহমদের বাসস্থান ও মসজিদ সংলগ্ন আমবাগানে মরহুমের লাশ দাফন করা হয়। পরবর্তীকালে বেনজীর আহমদের মৃত্যুর পর তাঁর লাশও পাশাপাশি দাফন করা হয়। তাঁদের পাশে শুয়ে আছেন আরেক বিখ্যাত ব্যক্তি কবি বেনজির আহমদের একান্ত সুহৃদ ফজলুল হক শেলবর্ষী।

১৯৭৬ - 'ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা' প্রকাশিত হয়।

## মরণোত্তর পুরস্কার

১৯৭৫- আব্দুল মান্নান সৈয়দের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা'।

১৯৭৭- একুশে পদক।

১৯৭৮- স্বাধীনতা পুরস্কার।

১৯৭৯- ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার।

১৯৮০- জুন মাসে বাংলা একাডেমী কর্তৃক মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ও আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত 'ফররুখ আহমদ রচনাবলি', ১ম খণ্ড প্রকাশিত।

১৯৮১- জুন মাসে বাংলা একাডেমী কর্তৃক মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ও আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত 'ফররুখ আহমদ রচনাবলি', ২য় খণ্ড প্রকাশিত।

১৯৯৫- জুন মাসে বাংলা একাডেমি কর্তৃক আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত 'ফররুখ রচনাবলী', প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়।

১৯৯৬- জুন মাসে বাংলা একাডেমী কর্তৃক আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত 'ফররুখ রচনাবলী', দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়।

১৯৯৮- ঢাকায় অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান তাঁর কতিপয় সুহৃদ সহযোগে 'ফররুখ একাডেমী' প্রতিষ্ঠা করেন। তখন থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ফররুখ চর্চার শুরু। ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে এটি 'ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন' নামে রেজিস্ট্রিকৃত। ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে মুহম্মদ মতিউর রহমানের সম্পাদনায় প্রতি বছর 'ফররুখ একাডেমী পত্রিকা'র দু'টি করে সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ২০০৮ সাল থেকে 'ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন পুরস্কার' প্রবর্তণ করা হয়। এ যাবৎ এ পুরস্কার লাভ করেছেন ফররুখ-গবেষক মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্-২০০৮, শাহবুদ্দীন আহমদ-২০০৯, ডক্টর সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়-২০১০, আব্দুল মান্নান সৈয়দ-২০১১, কবি আব্দুর রশিদ খান-২০১২, ভাষা সৈনিক অধ্যাপক আবদুল গফুর-২০১৩ ও প্রফেসর ডক্টর সদরুদ্দিন আহম্মেদ-২০১৪।

১৯৮৩- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা উদ্‌যাপন কমিটি কর্তৃক অন্য নয়জন বিশিষ্ট ভাষা-সৈনিকের সাথে 'ভাষা-সৈনিক সংবর্ধনা ও পুরস্কার (মরণোত্তর)' প্রদান। ২০০০-২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে মুহম্মদ মতিউর রহমান সম্পাদিত 'ভাষাসৈনিক সংবর্ধনা স্মারক'-এ ফররুখ আহমদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে নিবন্ধ প্রকাশিত।

(বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত ও সংগ্রথিত)

## পরিশিষ্ট– ২

# ফররুখ চর্চাঃ একালে ও সেকালে

### মুহম্মদ মতিউর রহমান

**[ফররুখ আহমদ বাংলা সাহিত্যের একজন অসাধারণ মৌলিক প্রতিভাধর কবি (১৯১৮-৭৪)। বিগত শতাব্দীর তিরিশের দশকের মধ্য ভাগে তাঁর কাব্য-ক্ষেত্রে আবির্ভাব। চল্লিশের দশকের শুরু থেকে তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকভাবে লেখালেখি শুরু করেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে। ঐ সময় থেকেই তাঁর উপর পত্র-পত্রিকায় আলোচনা-সমালোচনা প্রকাশিত হতে থাকে। এমনকি, কলকাতা বেতার-কেন্দ্রেও তাঁর উপর আলোচনা সম্প্রচারিত হয়। আর কোন তরুণ মুসলিম কবির উপর ঐ সময় অনুরূপ কোন আলোচনা-সমালোচনা কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়নি। এটা কবি ফররুখ আহমদের অসাধারণ প্রতিভার এক বিরল স্বীকৃতি। এরপর থেকে ফররুখ আহমদের উপর আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। নিচে কবি ফররুখ আহমদ সম্পর্কিত এ যাবৎ যেসব গ্রন্থাদি রচিত হয়েছে বা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর উপর যেসব উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী পেশ করা হলো। বলাবাহুল্য, এ তথ্য-বিবরণী সম্পূর্ণ নয়, আন্তরিক প্রয়াস সত্ত্বেও অনেক তথ্য আমাদের অগোচরে রয়ে গেছে।-সম্পাদক]**

**<u>ফররুখ-বিষয়ক গ্রন্থ</u>**

১. **কবি ফররুখ আহমদ** : সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রথম প্রকাশ : জুন, ১৯৬৯। প্রচ্ছদ কালাম মাহমুদ। পৃষ্ঠা : ৩০৪। মূল্য : নয় টাকা। প্রকাশক : নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা। সূচিপত্র : ১. আধুনিক বাংলা সাহিত্য : স্বাতন্ত্র্যকামী সাহিত্য-চেতনা ও ফররুখ আহমদ; ২. ফররুখ প্রতিভার রূপ ও রঙ; ৩. ফররুখ আহমদের সাহিত্যকর্ম : বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন (ক) সাত সাগরের মাঝি (খ) সিরাজাম মুনীরা (সাঃ) কাব্যনাট্যের নতুন দিগন্ত : নৌফেল ও হাতেম (ঘ) মুহূর্তের কবিতা (ঙ) হাতেম তা'য়ী (চ) পাখীর বাসা (ছ) হরফের ছড়া; ৪. ফররুখ আহমদ : কবিভাষা।

২. **ফররুখ আহমদ** : আনোয়ার পাশা (প্রবন্ধ)। প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৪।

৩. **ফররুখ আহমদ : ঐতিহ্যের নবরূপায়ণ** : গোলাম মঈনুদ্দিন। প্রথম প্রকাশ : ১৯৮০। দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৮৫। প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা। পৃষ্ঠা : ১০৮। মূল্য : আঠারো টাকা। সূচিপত্র : প্রথম অধ্যায় : ইংরেজ শাসনাধীনে উপমহাদেশের মুসলমানদের অবস্থা : রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট; দ্বিতীয় অধ্যায়; জীবনী ও কাব্য-পরিচিতি।

৪. ফররুখ আহমদ : আবদুল মান্নান সৈয়দ। প্রথম প্রকাশ : ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮। প্রচ্ছদ : সমর মজুমদার। পৃষ্ঠা : ১০৮। মূল্য : পনের টাকা। প্রকাশক : বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রসঙ্গ-কথা : আবু হেনা মোস্তফা কামাল। সূচপিত্র : ১. জন্ম ও বংশ পরিচয়; ২. শিক্ষাজীবন, সংসারজীবন; ৩. কর্মজীবন; ৪. সাহিত্যজীবন; ৫. শেষজীবন ও মৃত্যু; ৬. রচনা-পরিচিতি; ৭. সমকালীন প্রতিক্রিয়া; ৮. জীবনদর্শন ও সাহিত্য বৈশিষ্ট্য; ৯. রচনার নির্দশন।

৫. **জীবনের কবি ফররুখ আহমদ** : অনীক মাহমুদ। প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৯। ছোটদের উপযোগী জীবনী গ্রন্থ।

৬. **ফররুখ প্রতিভা** : মুহম্মদ মতিউর রহমান। প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৯১। প্রচ্ছদ : হামিদুল ইসলাম। পৃষ্ঠা : ১৫৪। মূল্য : পঞ্চাশ টাকা। প্রকাশক : বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা। সূচিপত্র : ১. প্রকাশকের কথা; ২. ভূমিকা; ৩. ফররুখ আহমদের কাব্য-স্বরূপ; ৪. ব্যক্তি পরিচয়; ৫. কাব্য-কৃতি; ৬. হে বন্য স্বপ্নেরা; ৭. কাফেলা; ৮. সাত সাগরের মাঝি; ৯. সিরাজাম মুনীরা; ১০. ফররুখ-কাব্যে ঐতিহ্যানুসারিতা; ১১. ফররুখ -কাব্যে রোমান্টিকতা।

৭. **ফররুখ আহমদ : নির্বাচিত কবিতা** : আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত। প্রকাশক : বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২।

৮. **চিরসংগ্রামী কবি ফররুখ** : আহমদ জাফরউল্লাহ। মূল্য : কুড়ি টাকা। প্রকাশক : নাবীলা প্রকাশনী, চট্টগ্রাম।

৯. **ছোটদের ফররুখ আহমদ** : অনীক মাহমুদ। প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। ঢাকা।

১০.**ছোটদের ফররুখ আহমদ** : আলী ইমাম। প্রকাশক : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

১১. **কবি ফররুখ : তাঁর মানস ও মনীষা** : শাহাবুদ্দীন আহমদ। প্রথম প্রকাশ : মে, ১৯৯৪। প্রচ্ছদ : মোমিন উদ্দীন খালেদ। পৃষ্ঠা : ৯৮। মূল্য : পঞ্চাশ টাকা। প্রকাশক : বাংলা সাহিত্য পরিষদ। সূচীপত্র : ১. ভূমিকা ২. কবি ফররুখ : তাঁর মানস ৩. কবি ফররুখ : তাঁর মনীষা ৪. ফররুখ-কাব্যে শব্দ ৫. ফররুখ কাব্যে ছন্দ ৬. ফররুখ-কাব্যে উপমা ৭. ফররুখ-কাব্যে চিত্রকল্প।

১২. **ছোটদের ফররুখ** : শরীফ আব্দুল গোফরান। প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬। প্রকাশক : প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স, বড় মগবাজার, ঢাকা। প্রচ্ছদ : প্রফেসর'স ডিজাইন সেন্টার। মূল্য : ৪০ টাকা। পৃষ্ঠা : ৬৪। সূচি : ১) হাতেম আলীর সোনার ছেলে, ২) বাল্য জীবনে কবি, ৩) শিক্ষা জীবনে কবি, ৪) শুরু হলো কবিতা চর্চা, ৫) গানের জগতে কবি, ৬) কর্ম জীবনে পা বাড়ালেন, ৭) আদর্শ জীবনের সন্ধানে, ৮)

পারিবারিক জীবনে কবি, ৯) মানুষের কবি, ১০) ইতিহাসে বড় মানুষ, ১১) স্নেহময় কবি ও দেশ-বিদেশের স্বীকৃতি, ১২) জীবনের শেষ মুহূর্তে কবি, ১৩) ঘুমিয়ে আছেন কবি, ১৪) জীবনপঞ্জী, ১৫) গ্রন্থপঞ্জী।

১৩. **উপমাশোভিত ফররুখ** : শাহাবুদ্দীন আহমদ। প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০০১। প্রচ্ছদ : রফিকুল্লাহ গাযালী। প্রকাশক : ফররুখ একাডেমী, ঢাকা। পৃষ্ঠা : ৯৫, মূল্য : ষাট টাকা। সূচিপত্র : ১. প্রারম্ভ কথা ২. ভূমিকা ৩. উপমাশোভিত ফররুখ।

১৪. **ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য** ঃ আব্দুল মান্নান সৈয়দ, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর, ২০০২। প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী। পৃষ্ঠা ৩৬৮। মূল্য : একশত পঁচাত্তর টাকা। প্রকাশক : বাংলা একাডেমী, ঢাকা। সূচীপত্র : ১. প্রসঙ্গ কথা ২. প্রবেশক ৩. জীবন ৪. সাহিত্য ৫. পরিবেশ ৬. তথ্য নির্দেশিকা।

১৫. **মুসলিম রেনেসাঁসের কবি ফররুখ আহমদ** : শাহাবুদ্দীন আহমদ। প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০০২। প্রচ্ছদ : হরফ ক্রিয়েশন, ঢাকা। পৃষ্ঠা : ২০৮। মূল্য : ষাট টাকা। প্রকাশক : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, কাঁটাবন, ঢাকা। সূচিপত্র : মুসলিম রেনেসাঁসের কবি ফররুখ, ফররুখ ও ইকবাল, ফররুখ ও মধুসূদন, ফররুখ আহমদ ও নজরুল ইসলাম, ফররুখ-কাব্যে গণতন্ত্রের স্বরূপ, ফররুখ -কাব্যের ঐতিহাসিক পটভূমি, আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে ফররুখ, ফররুখের জীবনাদর্শ, আত্মস্বরূপে ফররুখ, ফররুখ -কাব্যে তের শ' পঞ্চাশ, ফররুখ-কাব্যে মানুষ ও শয়তান, ফররুখ আহমদ : তাঁর জীবন ও কবিতা, ফররুখ ও তিন কবির ঝড় ও বৈশাখ, ফররুখের কবিতায় ঝড় ও বৈশাখ, বৈশাখ ও ফররুখ, ফররুখের শিল্প-মানস ও সাত সাগরের মাঝি, রঙীন চিত্রকল্প ও ফররুখ, গতির কবি ফররুখ, ফররুখের আধুনিকতা, সিরাজাম মুনীরার ফররুখ, রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী?, কান পেতে শোনো আজ ডাহুকের ডাক।

১৬. নাম তাঁর ফররুখ ঃ আসাদ বিন হাফিজ। প্রকাশক : প্রীতি প্রকাশন, মগবাজার, ঢাকা।

১৭. **বাংলা কাব্যে ফররুখ আহমদ : তাঁর শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ** : মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ। প্রকাশক : মুহম্মদ মতিউর রহমান, সভাপতি, ফররুখ একাডেমী, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০০৩। প্রচ্ছদ : রফিকুল্লাহ গাযালী। পৃষ্ঠা ৩৭৬। মূল্য : তিনশত টাকা মাত্র। সূচিপত্র : প্রসঙ্গ-কথা, নিবেদন, প্রারম্ভিক কথা, ফররুখ আহমদ কবি ও ব্যক্তি, ফররুখ আহমদের কবি-প্রতিভা : তাঁর শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ, ফররুখ আহমদের কবি-প্রতিভা : তাঁর রচনা, ভাষা, বিষয় ও আঙ্গিকের স্বাতন্ত্র্য, ফররুখ-কাব্যের স্বাতন্ত্র্য ও তার প্রকৃতি, চল্লিশের দশকের পঞ্চ-প্রধান কবি : ফররুখের স্বাতন্ত্র্য, ফররুখ আহমদের কাব্য-

সাধনার 'পথ', ফররুখের কবিতা : তার শিল্প বৈশিষ্ট্য, ফররুখ কাব্য : স্বকীয়তার সন্ধানে, সাত সাগরের মাঝি : কাব্য-বিবর্তনের ধারা, ফররুখ আহমদের কবিতা, ফররুখ আহমদ ও 'সাত সাগরের মাঝি', ফররুখ আহমদের 'ডাহুক', ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি' ও 'ডাহুক' : কবির শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ, ফররুখ আহমদের 'লাশ' ও অন্যান্য কবিতা, ফররুখ আহমদের 'হে বন্য স্বপ্নেরা', ফররুখ আহমদের 'কাফেলা', ফররুখ আহমদের 'মুহূর্তের কবিতা', ফররুখ আহমদের 'দিলরুবা', রবীন্দ্রনাথ ও ফররুখ আহমদের 'বৈশাখ' কবিতা : শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ, ফররুখ আহমদ ও রেনেসাঁ-আন্দোলন, ফররুখ-কাব্যে 'ইসলামী রেনেসাঁর বাণী', মনীষীদের জীবন-ভিত্তিক ও নিবেদিত কবিতা, বাংলা মহাকাব্যের ধারায় ফররুখের 'হাতেম তা'য়ী', বাংলা কাব্য-নাটকের ধারায় ফররুখ আহমদের 'নৌফেল ও হাতেম', ফররুখ আহমদের শিশু-কিশোর কবিতা, ফররুখ আহমদের ব্যঙ্গ-কবিতা : ঐতিহাসিক ও সমকালীন প্রেক্ষাপট, বাংলা কাব্যগীতির ধারায় ফররুখ আহমদ, ফররুখ আহমদের কাব্যভাষা ও ভাষাভিত্তিক কবিতা, ফররুখ-কাব্যে স্বাদেশিক পটভূমি, আল-কুরআন-এর অনুবাদে ফররুখ আহমদের অবদান, ইকবাল-কাব্যের অনুবাদক ফররুখ, ফররুখ-কাব্যে আঙ্গিক-বৈচিত্র্য, ফররুখ-কাব্যে রূপক ও প্রতীক, ফররুখ আহমদের কাব্য-কৌশল, ফররুখ কাব্য ত্রিকালদর্শী, ফররুখ আহমদের প্রভাব, পরিশিষ্ট : ১- ফররুখ প্রতিভার স্বীকৃতি ও সম্মাননা : একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠান, ২- ফররুখ-চর্চা : সেকাল ও একাল, ৩- ফররুখ আহমদের সংক্ষিপ্ত জীবন-পঞ্জি।

১৮. **ফররুখের নির্বাচিত কবিতার নিগূঢ় পাঠ** : সদরুদ্দিন আহমেদ। প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ২০০৬। প্রকাশক : আখতারা প্রকাশনী। পৃষ্ঠা : ১২০। মূল্য : ১১০ টাকা। সূচিপত্র : ১. সিন্দবাদ, ২. বা'র দরিয়ায়, ৩. দরিয়ার শেষ রাত্রি, ৪. পাঞ্জেরী, ৫. সাত সাগরের মাঝি, ৬. ডাহুক, ৭. লাশ, ৮. আউলাদ, ৯. সিরাজাম মুনীরা, ১০. অনুস্বার।

১৯. **ফররুখ প্রতিভা** (পরিবর্ধিত, পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ) : মুহম্মদ মতিউর রহমান। প্রকাশক : মুহম্মদ মিজানুর রহমান, হেরা পাবলিকেসন্স, প্রচ্ছদ- মুশফিকুর রহমান, জুন ২০০৮, পৃ. ৪৩২, মূল্য- ৩০০ টাকা।

**সম্পাদিত গ্রন্থ**

১. **ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা** : আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, ১৯৭৫. সহযোগিতায় : মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ, ফজল শাহাবুদ্দীন, ফজল মাহমুদ।

২. **ফররুখ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)**: মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ ও আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত। প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর ১৯৭৯। প্রকাশক- বাংলা একাডেমীর পক্ষে মহিউদ্দীন আহমদ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৭, জিন্দাবাহার (প্রথম লেন), ঢাকা। প্রচ্ছদ- কাইয়ুম চৌধুরী। পৃষ্ঠা-৩৮৮। মূল্য-পঁয়ত্রিশ টাকা। সূচিপত্রঃ ভূমিকা- মোহাম্মদ

মাহ্‌ফুজউল্লাহ ও আবদুল মান্নান সৈয়দ, সাত সাগরের মাঝি, সিরাজম মুনীরা, হে বন্য স্বপ্নেরা, ইকবালের কবিতা, প্রবন্ধ, সংযোজন, পরিশিষ্ট।

৩. **ফররুখ আহমদ : ব্যক্তি ও কবি** : শাহাবুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত। প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ১৯৮৪। প্রচ্ছদ : হাশেম খান। পৃষ্ঠা : ৬৭২। মূল্য : একশ' টাকা। প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা। সূচিপত্র : ক. **ব্যক্তি** : তাঁর নাম ফররুখ আহ্‌মদ : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন, আমার ছাত্র ফররুখ : আবুল হাশেম, অনমনীয় ফররুখ : মোহাম্মদ আজরফ, আমার ভাই ফররুখ : সৈয়দ সিদ্দীক আহমদ, অপরাজেয় ফররুখ : আবু জাফর শামসুদ্দীন, ফররুখ আহমদ : আবদুল হক, আমার বন্ধু ফররুখ : আবু রুশদ, প্রেমিক ফররুখ : আবদুল আহাদ, সংসারে ফররুখ আহমদ : সৈয়দা তৈয়বা খাতুন, ফররুখ ভাই : কামরুল হাসান, এক বিস্ময়কর মানুষ : আখতার ফররুখ, আপোষহীন ফররুখঃ শামসুল হুদা চৌধুরী, এমন একটা মানুষ দেখি না : আবদুল লতিফ, ফররুখের গান : আবদুল হালিম চৌধুরী, সাহিত্যপ্রেমিক ফররুখ : আশরাফ সিদ্দিকী, ব্যক্তি ফররুখ : আবদুর রশীদ খান, আমাদের ফররুখ ভাই : সরদার জয়েন উদ্দীন, অন্তরঙ্গ আলোকে ফররুখ : তৈয়েবুর রহমান, ফররুখ স্মরণে : মুফাখ্‌খারুল ইসলাম, ফররুখের আশা ও স্বপ্ন : মুহম্মদ আবু তালেব, আতিথ্যে উদার আদর্শে নিরাপোষ : অধ্যাপক আবদুল গফুর, ফররুখ ভাইয়ের কথা : জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, একটি আদর্শ একটি ব্যক্তিত্ব : কাজী গোলাম আহমদ, আমার অনুভব একান্ত আমারই : সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, অভ্রভেদী চোখ : আবদুস সাত্তার, অন্ত রঙ্গ আলাপন : মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ, অনন্য পুরস্কার : রফিকুল ইসলাম, শতাব্দীর অন্যতম সেরা মানুষ : শামসুল আলম, এক বিস্ময়কর নায়ক : মুস্তফা নূরউল ইসলাম, স্বপ্নরাজ্যের দুঃসাহসী সিন্দবাদ : মুহিউদ্দীন খান, মর্যাদাবোধের প্রতীক ফররুখঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, অন্তরঙ্গ আলোকে : মীর নূরুল ইসলাম, প্রথম ও শেষ আলাপ : শাহাবুদ্দীন আহমদ, তিনি অসাধারণ : গোলাম সাকলায়েন, যুগ-প্রবর্তক কবি : আখতার-উল-আলম, মেজমামা : সুলতান আহমদ, অমর ডাহুক : মোবারক হোসেন খান, তাঁর তুলনা তিনি নিজেই : ফজল-এ-খোদা, আকাশের শাহীন তিনি : ফখ্‌রুজ্জামান চৌধুরী, শেষ মুহূর্তে : মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, কিছু কথা কিছু স্মৃতি : তিতাশ চৌধুরী, অশেষ স্মৃতি : হাসি সিদ্দিকী, সমুদ্র-নাবিক ফররুখ : শেখ তোফাজ্জল হোসেন, আব্বাকে যেমন দেখেছি : সাইয়েদা ইয়াসমিন বানু। খ. **কবি** : এক অমূল্য সম্পদ : মোহাম্মদ বরকতল্লাহ, ফররুখের হাতেম তা'য়ী : আবুল কালাম শামসুদ্দীন, কবি ফররুখ : দুই সমীক্ষা : আবদুল কাদির, বাংলা কাব্যে কবি ফররুখ আহমদ : মোহাম্মদ আজরফ, তাঁর বিশ্বাস অকৃত্রিম : আবুল ফজল, নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা : মুজীবুর রহমান খাঁ, ফররুখ আহমদ : সৈয়দ আলী আহসান, ঐতিহ্যের রূপকার ফররুখ : মনিরউদ্দিন ইউসুফ, আর এক অগ্নিবীণা : আশরাফ সিদ্দিকী, ফররুখ-মানস

: তাঁর কবিতা : অধ্যাপক আবদুল গফুর, ফররুখের কাব্য-নাটক : আবদুল হাফিজ, কাব্যনাট্যের নতুন দিগন্ত : সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, ফররুখ আহমদের কবিতা : জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, আধুনিক কবিতা ও ফররুখ আহমদ : হাসান হাফিজুর রহমান, চলে গেছেন অপরাজেয় : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ফররুখের কবিতা : তার শিল্পরূপ : মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ, ব্যতিক্রমী শিল্পী : আবু হেনা মোস্তফা কামাল, বিষয় ও ছন্দ-সমীক্ষায় হাতেম তা'য়ী : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ফররুখের আকাঙ্ক্ষা : রফিকুল ইসলাম, ফররুখের অভিনবত্ব : শাহাবুদ্দীন আহমদ, দরিয়ায় শেষ রাত্রি : প্রতিভূ কবিতা : আবদুল মান্নান সৈয়দ, কাফেলার ফররুখ : আফজাল চৌধুরী, আমাদের চেতনার উচ্চারণে ফররুখ : হাসান আবদুল কাইয়ুম, একজন স্ববিরোধহীন কবি : মুহম্মদ নূরুল হুদা, তাঁর স্বপ্নরাজ্যে তিনি একা : সৈয়দ আবুল মকসুদ, কাল-সচেতন ফররুখ : সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, ফররুখ-মানস পরিক্রমা : মুকুল চৌধুরী, ফররুখ মানস : তাঁর কবিকৃতি : ফাইজুস সালেহীন। গ. কবি অমর : কবি ফররুখ আহমদের কি অপরাধ : আহমদ ছফা, একটি মৃত্যু : একটি জিজ্ঞাসা : ইবনে খালদুন, নতুন পানিতে সফর এবার : শামসুর রাহমান, জাতীয় চৈতন্যে ফররুখের প্রভাব : সানাউল্লাহ্ নূরী। ঘ. জীবনপঞ্জী ও গ্রন্থপঞ্জী : জীবনপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী। ঙ. লেখক ও লেখা পরিচিতি : লেখক-পরিচিতি, লেখা-পরিচিতি। চ. এ্যালবাম : ২৮৬ক-২৮৭ত আলোকচিত্রে কবি।

৪. ১৯৮১-জুন মাসে বাংলা একাডেমী কর্তৃক মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ও আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত 'ফররুখ আহমদ রচনাবলি', ২য় খণ্ড প্রকাশিত।

৫. **ফররুখ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড** : আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত। প্রথম প্রকাশ : জুন, ১৯৯৫। প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী। পৃষ্ঠা ৬০৫। মূল্য : দুইশত পঞ্চাশ টাকা। প্রকাশক : বাংলা একাডেমী। সূচিপত্র : ১. ভূমিকা ২. সাত সাগরের মাঝি ৩. সিরাজাম মুনীরা ৪. নৌফেল ও হাতেম ৫. মুহূর্তের কবিতা ৬. হাতেম তা'য়ী ৭. আজাদ করো পাকিস্তান ৮. অনুস্বার ৯. পরিবেশ : জীবনপঞ্জী, প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ-পরিচয়।

৬. **ফররুখ আহমদ রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড** : আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত। প্রথম প্রকাশ : জুন, ১৯৯৬। প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী। পৃষ্ঠা : ৫০৪। মূল্য দুইশত টাকা মাত্র। প্রকাশক : বাংলা একাডেমী। সূচিপত্র : ১. ভূমিকা ২. হে বন্য স্বপ্নেরা ৩. কাফেলা ৪. হাবেদা মরুর কাহিনী ৫. দিলরুবা ৬. ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য ৭. তসবিরনামা ৮. ইকবালের নির্বাচিত কবিতা ৯. হাল্কা লেখা ১০. প্রবন্ধ ১১. নাটক ১২. গল্প ১৩. উপন্যাস ১৪. পরিবেশ : জীবনপঞ্জি, গ্রন্থপঞ্জি, সাক্ষাৎকার, প্রাসঙ্গিক গ্রন্থপরিচয়।

৭. ফররুখ আহমদ : ব্যক্তি ও কবি (দ্বিতীয় সংস্করণ) : শাহাবুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত। প্রকাশক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। সূচিপত্র : প্রথম সংস্করণের অনুরূপ।

৮. কবিতাসমগ্র : আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত। প্রকাশক : অনন্যা ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০০৯। প্রচ্ছদঃ ধ্রুব এষ। পৃষ্ঠাঃ ৪৮০। মূল্যঃ চারশত টাকা। সূচিপত্র : প্রবেশক, সাত সাগরের মাঝি, আজাদ করো পাকিস্তান, সিরাজাম মুনীরা, নৌফেল ও হাতেম, মুহূর্তের কবিতা, হাতেম তা'য়ী, পরিশেষ, জীবনপঞ্জি, গ্রন্থপঞ্জি।

## ফররুখ আহমদের কবিতার ইংরাজি অনুবাদ

**1. Four poets from Bangladesh : Translated by Abu Rushd, 1984 Bangla Academy, Dhaka. Content : 1. Ghousul Ajam; 2. Tiredness; 3. Night At Kanchrapara; 4. A Winter Morning at Sylhet Railaway Station; 5. From Naufel and Hatem (1-2); 6. Extract from Hatem Tai; 7. The last Night at sea.**

**2. SIRAJAM MUNIRA : Translated by Syed Sajjad Hussain.**

**3. The English Translation of Some Selected Poems of Farrukh Ahmad: Translated by Abdur Rashid Khan. Published Muhammad Rahman, President Farrukh Gabeshana Foundation (Farrukh Reseach Foundation), 62/21, Purana Paltan Dhaka-1000, 1st Edition June 2008, page-96, Price- Tk. 100 ($ 5)**

**4. The English Translation of Some Selected Poems of Farrukh Ahmad: Translated by Abdur Rashid Khan. Published Muhammad Rahman, President Farrukh Gabeshana Foundation (Farrukh Reseach Foundation), 62/21, Purana Paltan Dhaka-1000, 2nd Edition June 2012, Cover design- Muhammad Shahinur Islam. Page-120, Price- Tk. 100 ($ 5)**

**5. ACCOLADES by FARRUKH AHMAD, Translated from the Bangla 'SIRAJAM MUNIRA' by Yasmin Faruque, Publisher : Trafford Publishing, North America & International, USA, May 20, 2013.**

**6. THE SAILOR OF THE SEVEN SEAS by FARRUKH AHMAD, Translated from the Bangla 'SAT SAGORER MAJHI' by Yasmin Faruque, Publisher : Trafford Publishing, North America & International, USA, 2013.**

## পত্র-পত্রিকা

১. **'সওগাত'**। ফররুখ-সংখ্যা। সম্পাদক : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন। প্রকাশ : আশ্বিন-কার্তিক ১৩৮১। ৫৬ : ১১-১২। সূচিপত্র : ১. কবি ফররুখ আহ্‌মদ : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন ২. 'সওগাতে' প্রকাশিত ফররুখ আহমদের ৬০টি কবিতা ধারাবাহিকভাবে পুনর্মুদ্রিত ৩. পাকিস্তান : রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য : ফররুখ আহমদ ৪. ফররুখ আহ্‌মদের কবিতা : বৈশিষ্ট্য ও পটভূমি : মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্ ৫. ফররুখ আহমদ প্রসঙ্গে : মুস্ত ফা নূরউল ইসলাম ৬. ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য।

২. **'মিছিল'**। ফররুখ-সংখ্যা। সম্পাদক : মোহাম্মদ ইদ্‌রিস আলী। প্রকাশ : নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৭৪। ১:৭। যশোর। প্রাসঙ্গিক সূচিপত্র : ১. 'মিছিল'-এর কথা (সম্পাদকীয়) ২. 'লাশ' (কবিতা) : ফররুখ আহ্‌মদ ৩. বড় অসময়ে চলে গেলে (নিবেদিত কবিতা) : মোহাম্মদ ইদ্‌রিস আলী ৪. কবি ফররুখ আহমদ : শাহাদাত আলী আনসারী ৫. অভিমানী কবি ফররুখ আহ্‌মদ : আনোয়ারুল ইসলাম।

৩. **'সূর্য সারথি'**। ফররুখ-সংখ্যা। সম্পাদক : মারুফী খান রকসী। প্রকাশ : ১০ জুন, ১৯৭৫, ঢাকা। সূচিপত্র : ১. সম্পাদকীয় ২. লাশ (কবিতা) : ফররুখ আহ্‌মদ ৩. তুমি এসো ফিরে (কবিতা) : ওয়াহিদুজ্জামান (কবিপুত্র) ৪. কবি ফররুখ আহ্‌মদ (স্মৃতি) : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন ৫. একজন কবি : তার মৃত্যু (কবিতা) শামসুর রাহমান ৬. সময়ের দক্ষিণা, তাঁর কবিতা : মো. মাস্তফী খান রকসী ৭. ফররুখ আহমদ, তাঁর কবিতা (প্রবন্ধ) : মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্ ৮. কবি ফররুখ এবং আমরা (কবিতা) : মো. আলমাসুর রহমান বাদশাহ ৯. দুর্ভিক্ষ-১৯৭৪ (কবিতা) : ফজল মাহমুদ ১০. কবি প্রতিভা (প্রবন্ধ) : মুহম্মদ মতিউর রহমান ১১. তবু, তুমি জাগলে না? (কবিতা) : বদরুল হাসান ১২. মৃত্যুহীন হাত (কবিতা) : সিদ্দিকুর রহমান ১৩. ফররুখের কবরে কালো শিয়াল (কবিতা) : আল মাহমুদ ১৪. আউলাদ (কবিতা) : ফররুখ আহমদ।

৪. **'পাঞ্জেরী'**। সম্পাদক : জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। প্রকাশ : ১৯ অক্টোবর, ১৯৭৬। প্রকাশক : ফররুখ আহমদ কেন্দ্রীয় স্মৃতি সংসদ। প্রচ্ছদ : কালাম মাহমুদ। সুচিপত্র : ১. ভূমিকা : জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ২. ফররুখ আহ্‌মদের পরিকল্পিত 'হে বন্য স্বপ্নেরা' কবিতাগ্রন্থের ৪৯টি কবিতা ৩. ফররুখ আহমদের কবিতা : সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম।

৫. **ঢাকা ডাইজেস্ট,** অক্টোবর-নভেম্বর '৭৯ : কয়েকজন বিশিষ্ট কবির দৃষ্টিতে কবি ফররুখ আহমদ ও তাঁর কবিতা (সাক্ষাৎকার)। ক. আল মাহমুদ, খ. হাসান হাফিজুর রহমান, গ. মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্, ঘ. আবদুল মান্নান সৈয়দ, ঙ. আসাদ চৌধুরী, চ. শিশুর বন্ধু : হরফের ছড়া : সরদার ফজলুল করিম, ছ. বুদ্ধিদীপ্ত একটি জীবনীগ্রন্থ : কায়সুল হক।

৬. **'বিবর্তন'**। ফররুখ-স্মরণ সংখ্যা। সম্পাদক : বদরুল ইসলাম মুনীর। প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৮৫। প্রকাশক : বিবর্তন সংঘ, ঢাকা। সূচিপত্র : ১. সম্পাদকীয় ২. অপরাজিত ফররুখ : আবু জাফর শামসুদ্দীন ৩. ফররুখ-কাব্যে রূপক-প্রতীক : মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্ ৪. চল্লিশ দশকের সেরা কবি ফররুখ : আবদুল মান্নান সৈয়দ ৫. আমাদের ফররুখ ভাই : সরদার জয়েনউদ্দীন ৬. ফররুখ-কাব্য : রাজনৈতিক মূল্যায়ন : সাঈদ-উর-রহমান ৭. ফররুখ আহমদের 'পাখীর বাসা' : আতোয়ার রহমান ৮. নাট্যকার ও গীতিকার ফররুখ আহমদ : ড. এস. এম. লুৎফর রহমান ৯. ফররুখ আহমদ, স্বপ্নের কবি : নূরউল করিম খসরু ১০. কবি ফররুখকে যেমন দেখেছি : জুলফিকার আলী কিসমতী ১১. মুহূর্তের স্মৃতি : এম.এ. হোসেন পাটোয়ারী ১২. ফররুখ-কাব্যের নায়ক ও ভিলেন চরিত্র : বুলবুল সরওয়ার ১৩. সাক্ষাৎকার : ড. আশরাফ সিদ্দিকী, আল মাহমুদ, আফজাল চৌধুরী ১৪. ফররুখ আহমদ : তাঁর কবিতা (বিভিন্ন লেখকের মন্তব্য) ১৫. জীবন চিত্র (ফররুখ আহমদের)।

৭. 'বিবর্তন'। ফররুখ স্মরণ-সংখ্যা : মোহাম্মদ বদরুল ইসলাম মুনীর। প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৮৬। প্রকাশক : বিবর্তন সংঘ, ঢাকা। সূচিপত্র : ১. সম্পাদকীয় ২. ফররুখ আহমদ : কবি ও আদর্শ : তালিম হোসেন ৩. আমার ফররুখ ভাই : কামরুল হাসান ৪. আমার বন্ধু ফররুখ : সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৫. ফররুখ আহমদ : এক বিরল কবি-ব্যক্তিত্ব : মুন্সী আবদুল মান্নান ৮. রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী : আলী রিয়াজ ৯. জীবন-চিত্র (ফররুখ আহমদ) ১০. সাক্ষাৎকার : আশরাফ সিদ্দিকী, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আজাদ রহমান।

৮. অগ্রপথিক। ফররুখ স্মরণ সংখ্যা, সম্পাদক : অধ্যাপক আব্দুল গফুর। ১৬ অক্টোবর, ১৯৮৬। ১:২১। প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা। প্রাসঙ্গিক। সূচিপত্র : ১. সম্পাদকের কথা ২. ফররুখ-কাব্যে আঙ্গিক-বৈচিত্র্য : মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্ ৩. ফররুখ আহমদ : স্বকালের পটভূমিকায় : আব্দুল মান্নান সৈয়দ ৪. নিবেদিত কবিতা : নূরুল আলম রইসী, শাহাদাত বুলবুল, মাহবুব বারী, ফজল মাহমুদ, ইকবাল আজিজ, রেজাউদ্দিন স্ট্যালিন, হাসান আলীম, নূরুল মোস্তফা রইসী ৫. আমার বন্ধু ফররুখ আহমদ : লুতফর রহমান জুলফিকার ৬. অন্তরঙ্গ আলোকে ফররুখ : তৈয়েবুর রহমান।

৯. **ফররুখ আহমদ** : একজন সুফী : অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম, ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য, ফররুখ সম্বন্ধে বেনজীরের শেষ কথা : আবদুল হাই শিকদার, ফররুখ কাব্যে ঐতিহ্যানুসারিতা : মুহম্মদ মতিউর রহমান, অভিন্ন কবি-ব্যক্তিত্ব ফররুখ আহমদ : এস.এম. শাহাজান তালুকদার, সাকী-নামা (গীতিবিচিত্রা) : ফররুখ আহমদ, ফররুখ আহমদের জীবন ও গ্রন্থপঞ্জি, যাঁর লেখা পড়ে চমকে উঠেছিলাম : ইবনে ইমাম।

১০. **'ফররুখ আহমদ'**। প্রকাশ : ১৫ এপ্রিল, ১৯৮৭। প্রকাশক : সেবা, পুরানা পল্টন, ঢাকা। সূচিপত্র : ১. ফররুখ আহমদের কাব্য নাটিকা ও সনেট-কাব্য : আবদুল কাদির ২. কবি ফররুখ আহমদ : মুজীবুর রহমান খাঁ ৩. ফররুখ আহমদের কবিতা : আবু জাফর শামসুদ্দীন ৪. কবি ফররুখ আহমদ : সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় ৫. ফররুখ আহমদের প্রভাব : মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্ ৬. মানবতার কবি ফররুখ: শাহাবুদ্দীন আহমদ ৭. ফররুখের স্বোপার্জিত মুদ্রা 'হাবেদা মরুর কাহিনী' : আফজাল চৌধুরী ৮. ফররুখ আহমদের কিংবদন্তী : 'হাতেম তা'য়ী : সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ৯. ফররুখ আহমদের কবিতায় বাকপ্রতিমা : বিপ্রদাস বড়ুয়া ১০. আমার বন্ধু ফররুখ : সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১১. ফররুখ আহমদ : ব্যক্তি মানুষ : আশরাফ ফারুকী ১২. আমার ফররুখ ভাই : ফারুক মাহমুদ ১৩. কবি ফররুখ আহমদকে সাহায্য করুন : নাছিম ১৪. ফররুখ আহমদ : কবি মহাদেব সাহা ১৫. রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরী : আলী রিয়াজ ১৬. ফররুখ ফররুখ : কবির প্রতিকৃতি : আতা সরকার ১৭. কোলাহলের বাইরে দাঁড়াতে বলি : আবদুল হাই শিকদার ১৮. সংবর্ধনা ১৯. শেষ অভিবাদন ২০. সাক্ষাৎকার (ফররুখ আহমদের সঙ্গে) ২১. উজীরজাদার প্রতি হাতেম তা'য়ী : ফররুখ আহমদ ২২. ব্যঙ্গকবিতা : ফররুখ আহমদ ২৩. আনারকলি (গীতিনাট্য) : ফররুখ আহমদ ২৪. নিবেদিত কবিতা : আবুল হাশেম, তালিম হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, আবদুস সাত্তার, মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্, আতাউর রহমান, আল মাহমুদ, হেমায়েত হোসেন, দিলওয়ার, আফজাল চৌধুরী, আবদুল মান্নান সৈয়দ, সিকদার আমিনুল হক, নূরুল আলম রইসী, মুহম্মদ নুরুল হুদা, আল মুজাহেদী, শাহাদাত বুলবুল, কাজী সালাহউদ্দীন, ফজল মাহমুদ, মাহবুব বারী, নিজামউদ্দীন সালেহ, ইকবাল আজিজ, রেজাউদ্দীন স্ট্যালিন, মুকুল চৌধুরী। ২৫. জীবনপঞ্জি ২৬. গ্রন্থপঞ্জি।

১১. **'শিল্পতরু'**। সম্পাদক : আবিদ আজাদ। প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৮৮। ১:৮। প্রাসঙ্গিক সূচিপত্র : ১. সম্পাদকীয় ২. অপ্রকাশিত ফররুখ : আহমদ আখতার ৩. অপ্রকাশিত কবিতাগুচ্ছ (দূর বন্দরের স্বপ্নে, বিনোদপুর স্টিমার স্টেশনে, মধুমতী, তিক্ত তীব্র বেদনায়, লোকসাহিত্যের নায়িকা : ২. ময়নামতীর মাঠে : ২ক, ময়নামতীর মাঠে : ২খ (শিরোনামহীন), কাব্যগীতি– লুৎফর রহমান, ১৯৭৪– একটি আলেখ্য : ফররুখ আহমদ ৪. অপ্রকাশিত 'সম্পাদকীয়' নিবন্ধ : ফররুখ আহমদ ৫. গ্রন্থকারের নিজস্ব ভূমিকা : ফররুখ আহমদ।

১২. 'উষালোক'। ফররুখ-সংখ্যা। সম্পাদক : মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ। প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৮৯। ৭:১-৪। প্রকাশক : নির্ঝর সাহিত্যগোষ্ঠী, ঢাকা। সূচিপত্র : ১. সম্পাদকীয় ২. ফররুখ আহমদের জীবনপঞ্জি ৩. মুক্তি (কবিতা) : ফররুখ আহমদ ৪. সিন্ধু-তরঙ্গ (গীতিকা) : ফররুখ আহমদ ৫. ফররুখ আহমদ (নিবেদিত কবিতা) : আবুল হোসেন ৬.

ফররুখ আহমদ ও আমি : তালিম হোসেন ৭. ফররুখ আহমদ : নব মূল্যায়ন : আবু রুশদ ৮. আমার বন্ধু ফররুখ আহমদ : লুৎফর রহমান জুলফিকার ৯. একজন শনাক্তকারী কবি : মুহম্মদ নূরুল হুদা ১০. ফররুখ আহমদের কবিতার ভাষা : সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ১১. ফররুখ-কাব্য : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ : মহীবুল আজিজ ১২. ফররুখ আহমদ : উত্তরপ্রজ চেতনাসূত্রে : মুজতাহিদা ফারুকী ১৩. একটি কাব্যনাট্য : দুই লেখন : আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৪. ফররুখ আহমদের কবিতা (সাক্ষাৎকার) : হাসান হাফিজুর রহমান ১৫. শেষ লেখা : সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় ১৬. প্রচ্ছন্ন নায়িকা (গল্প) : ফররুখ আহমদ ১৭. প্রসঙ্গত (এলান নভেম্বর ১৯৭০ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রণ) ১৯. কাল-সমকাল (গদ্য) : ফররুখ আহমদ ২০. ইব্রাহিম আকন্দকে লেখা চিঠি : ফররুখ আহমদ ২১. ফররুখ আহমদকে লেখা চিঠি : শাহাবুদ্দীন আহমদ ২২. ফররুখ-প্রাসঙ্গিক চিঠি : আবদুল কাদির ২৩. আশাবাদের রূপকার : আবদুল কাদির ২৪. ফররুখ আহমদ : সুশীলকুমার গুপ্ত ২৫. 'ঝড়ের ইশারা ওরা জানে' (স্বরলিপি) : কথা : ফররুখ আহমদ, সুর : আবদুল আহাদ, স্বরলিপি, লায়লা আর্জুমন্দ বানু।

১৩. **প্রেক্ষণ (ফররুখ স্মরণে-সাহিত্য সাময়িকী)**। সম্পাদক : খন্দকার আব্দুল মোমেন। প্রকাশ : ১১ মার্চ, ১৯৯৪। সূচি : নিবেদিত প্রবন্ধসমূহ-বিদ্রোহী কবি : কাজী নজরুল ইসলাম ও ফররুখ আহমদ : ড. কাজী দীন মুহম্মদ, কবি ফররুখ আহমদ ও তাঁর কবিতা : ড. গোলাম সাকলায়েন, জাতীয় চৈতন্যে ফররুখের প্রভাব : সানাউল্লাহ নূরী, ফররুখ কাব্যের ঐতিহাসিক পটভূমি : শাহাবুদ্দীন আহমদ, ফররুখ আহমদ : আবদুল মান্নান সৈয়দ, ফররুখ আহমদের অন্তিম দিনগুলো : মুকুল চৌধুরী, সব মানুষের কবি ফররুখ আহমদ : শরীফ আব্দুল গোফরান, ফররুখের কবিতায় প্রতীকী আমেজ : খন্দকার আব্দুল মোমেন। নিবেদিত গল্প ও স্মৃতিচারণ- কলকাতায় ফররুখ ও আমি : সৈয়দ আলী আহসান, স্মৃতিচারণ : আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন, এক প্রভাতে সোনার আলোয় : নয়ন রহমান, একান্ত অনুভবে ফররুখ আহমদ : মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল তিনি : সাহানা বেগম। নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ- আবুল হাশেম, আব্দুস সাত্তার, জাহাঙ্গীর হাবীব উল্লাহ, সোলায়মান আহসান, মোশাররফ হোসেন খান, তমিজ উদ্দীন লোদী, হাসান আলীম, চৌধুরী গোলাম মাওলা, গোলাম মোহাম্মদ, নাসীর মাহমুদ, নূরুর রহমান বাচ্চু, হাশিম মিলন। ফররুখ জীবনপঞ্জি ও গ্রন্থসমালোচনা- জীবনপঞ্জি, গ্রন্থালোচনা : মতিউর রহমান মল্লিক।

১৪. **ফররুখ একাডেমী পত্রিকা**। সম্পাদক : মুহম্মদ মতিউর রহমান। প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুন- ২০০০। সূচি : প্রসঙ্গ কথা : মুহম্মদ মতিউর রহমান, ফররুখ আহমদের কবিতায় অমিত্রাক্ষর ও গদ্যছন্দের ব্যবহার : স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ : মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্, আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে ফররুখ আহমদ : শাহাবুদ্দীন আহমদ, ফররুখ আহমদ : মুহম্মদ মতিউর রহমান, ফররুখ আহমদের জীবন-পঞ্জি, পাখির বাসা : ফররুখ আহমদ : সুর ও স্বরলিপি : সৈয়দ শামসুল হুদা।

১৫. **ফররুখ একাডেমী পত্রিকা**। সম্পাদক : ঐ। প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, অক্টোবর-২০০০, কার্তিক, ১৪০৭, রজব, ১৪২১। সূচি : প্রসঙ্গ কথা : মুহম্মদ মতিউর রহমান, ফররুখ আহমদ : সাত সাগরের মাঝি : সৈয়দ আলী আহসান, ফররুখ আহমদের কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য : ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ, ফররুখ আহমদের সাত সাগরের মাঝি ও ডাহুক : কবির শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ : মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌, বিষয় ও ছন্দ-সমীক্ষায় হাতেম তা'য়ী : ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, উপমা-শোভিত ফররুখঃ শাহাবুদ্দীন আহমদ, দিলরুবাঃ ফররুখের প্রেমের জ্যোতিষ্কলোক : হাসান আলীম, গানের সুরে সাত সাগরের মাঝি : সুর-সুরলিপি : সৈয়দ শামসুল হুদা, ফররুখ একাডেমী পরিচিতি, একাডেমী প্রতিবেদন, সচিত্র প্রতিবেদন।

১৬. **ফররুখ একাডেমী পত্রিকা**। সম্পাদক : ঐ। তৃতীয় সংখ্যা, জুন- ২০০১, জ্যৈষ্ঠ, ১০৮, রবিউল আউয়াল, ১৪২২। সূচি : প্রসঙ্গ কথা, ফররুখ আহমদের 'হাতেম তা'য়ী' : সৈয়দ আলী আহসান, কবি ফররুখ আহমদ : ড. আশরাফ সিদ্দিকী, ফররুখ আহমদের কাব্যনাট্য : নৌফেল ও হাতেম : ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ব্যক্তি ও কাব্য-শিল্পী ফররুখ : সানাউল্লাহ্‌ নূরী, ফররুখ আহমদ : জীবন ও কাব্য সাধনা : হাসান ইকবাল, ফররুখ আহমদের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত রচনাবলী : মুহম্মদ মতিউর রহমান, উপমা-শোভিত ফররুখ : শাহাবুদ্দীন আহমদ, সিন্দবাদ : ফররুখ আহমদ : সুর ও স্বরলিপি : সৈয়দ শামসুল হুদা, ফররুখ একাডেমী পরিচিতি, একাডেমী প্রতিবেদন।

১৭. **ফররুখ একাডেমী পত্রিকা**। সম্পাদক : ঐ। চতুর্থ সংখ্যা, অক্টোবর- ২০০১, কার্তিক ১৪০৮, শাবান ১৮২২। সূচি : প্রসঙ্গ কথা, ফররুখ আহমদের 'দিলরুবা' : সৈয়দ আলী আহসান, ফররুখ আহমদের 'মুহূর্তের কবিতা' : ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'সাত সাগরের মাঝি'-একটি নিগূঢ় পাঠ : ডক্টর সদরুদ্দিন আহমেদ, ফররুখ আহমদের কবি-প্রতিভা তাঁর রচনার ভাষা, বিষয় ও আঙ্গিকের স্বাতন্ত্র্য : মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌, ফররুখ আহমদের কাব্য-ভাষা : মুহম্মদ মতিউর রহমান, ফররুখ আহমদের 'বৈশাখ' : অধ্যাপক সিরাজুল হক, ফররুখ আহমদ ও তাঁর ভাষা বীক্ষণ : মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, স্মৃতিচারণ : আমার চোখে ফররুখ ভাই : মুস্তাফা জামান আব্বাসী, উপমাশোভিত ফররুখ : শাহাবুদ্দীন আহমদ, শবে বরাত : ফররুখ আহমদ, সুর-স্বরলিপি : সৈয়দ শামসুল হুদা, ফররুখ একাডেমী পরিচিতি, একাডেমী প্রতিবেদন।

১৮. **ফররুখ একাডেমী পত্রিকা**। সম্পাদক : ঐ। পঞ্চম সংখ্যা, জুন- ২০০২, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯, রবিউল আউয়াল ১৪২৩। সূচি : একাডেমী প্রতিবেদন, ফররুখ আহমদের মুহূর্তের কবিতা : সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা কাব্য-গীতির ধারায় ফররুখ আহমদ :

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌, ফররুখ আহমদের 'ডাহুক' : ডক্টর সদরুদ্দিন আহমেদ, শেলী রবীন্দ্র নজরুল ও ফররুখের 'বৈশাখ' ও 'ঝড়' : শাহাবুদ্দীন আহমদ, ফররুখ আহমদ : ঐতিহ্যের রূপকার : মুহম্মদ মতিউর রহমান, ফররুখের দৃষ্টিতে 'নদী' : মোশাররফ হোসেন খান, ফররুখ আহমদ, সুর ও স্বরলিপি : সৈয়দ শামসুল হুদা।

১৯. **ফররুখ একাডেমী পত্রিকা**। সম্পাদক : ঐ। ষষ্ঠ সংখ্যা, অক্টোবর- ২০০২, কার্তিক ১৪০৯, শাবান ১৪২৩। সূচি : প্রসঙ্গ কথা, কলকাতায় ফররুখ এবং আমি : সৈয়দ আলী আহসান, ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি' : ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, চল্লিশের দশকের পঞ্চ-প্রধান কবি ও ফররুখের স্বাতন্ত্র্য : মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌, মুসলিম রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদ : শাহাবুদ্দীন আহমদ, ফররুখ আহমদের সময়, স্বভাব ও তাঁর আদর্শ : মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ফররুখ কাব্যে ঐতিহ্য : মুকুল চৌধুরী, আমার স্মৃতিতে ফররুখ : মুহম্মদ মতিউর রহমান।

২০. **ফররুখ একাডেমী পত্রিকা**। সম্পাদক : ঐ। সপ্তম সংখ্যা, জুন- ২০০৩, জ্যৈষ্ঠ ১৪১০, রবিউস সানী ১৪২৪। সূচি : প্রসঙ্গ কথা, ফররুখ আহমদের ব্যঙ্গ কবিতা : ঐতিহাসিক ও সমকালীন প্রেক্ষাপট : মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌, ফররুখ -কাব্যে সাগর জাহাজ নাবিক নৌবহর : শাহাবুদ্দীন আহমদ, ফররুখ আহমদের 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্য : ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ফররুখ আহমদের 'সিরাজাম মুনীরা' কবিতা : ডক্টর সদরুদ্দিন আহমেদ, ফররুখ আহমদের 'বৈশাখ' : মুহম্মদ মতিউর রহমান, ফররুখ কাব্যে বিবর্তন : ম. মিজানুর রহমান, তরুণ গবেষকদের লেখা : স্বতন্ত্র ধারার কবি ফররুখ আহমদ : এম এ সবুর, ফররুখ আহমদের গান : শরীফ আবদুল গোফরান, ব্যক্তি ফররুখ : শতাব্দীর অন্যতম সেরা মানুষ : এ.জেড.এম. শামসুল আলম, আজ সংগ্রাম এই সংগ্রাম, রচনা : কবি ফররুখ আহমদ, সুর ও স্বরলিপি : সৈয়দ শামসুল হুদা, একাডেমী প্রতিবেদন, একাডেমী পরিচিতি।

২১. **ফররুখ একাডেমী পত্রিকা**। সম্পাদক : ঐ। অষ্টম সংখ্যা, অক্টোবর- ২০০৩, কার্তিক ১৪১০, শাবান ১৪২৪। সূচি : প্রসঙ্গ কথা, ফররুখ আহমদের 'হাতেম তা'য়ী' : আবুল কালাম শামসুদ্দীন (সংকলিত), ফররুখ আহমদের শিশু-কিশোর কবিতা : মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌, ফররুখ আহমদের 'হরফের ছড়া' : ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ফররুখ আহমদের ব্যঙ্গ কবিতা : ডক্টর সদরুদ্দীন আহমেদ, গীতিকার ফররুখ আহমদ : শাহাবুদ্দীন আহমদ, ফররুখ কাব্যে রোমান্টিকতা : মুহম্মদ মতিউর রহমান, স্মৃতিচারণ : আমার স্মৃতিতে অম্লান কবি ফররুখ আহমদ : জাহানারা আরজু, আমার স্মৃতিতে ফররুখ ভাই : আখতার ফারুক, ফররুখ কাব্যের অনুবাদ : **The Sailor of the Seven Seas : M. Mizanur Rahman,** সাক্ষাৎকার : ফররুখ ভাই একজন দরবেশ ছিলেন : সুরশিল্পী আব্দুল লতিফ, গানের সুরে ফররুখ আহমদের 'আলী হায়দর' : স্বরলিপি : সৈয়দ শামসুল হুদা, অম্লান স্মৃতি

: ফজল মাহমুদকে একটি ঠিকানাবিহীন চিঠি : আব্দুল মান্নান সৈয়দ, ফররুখ-চর্চা : নতুন বই : বেগম খালেদা রহমান, মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, একাডেমী প্রতিবেদন, ফররুখ একাডেমী পরিচিতি, ফররুখ একাডেমী : উপদেষ্টা ও সদস্য তালিকা।

২২. **ফররুখ একাডেমী পত্রিকা**। সম্পাদক : ঐ। নবম সংখ্যা, জুন- ২০০৪, আষাঢ় ১৪১১, জমাদিউল আউয়াল ১৪২৫। সূচি : প্রসঙ্গ কথা, ফররুখ আহমদের হাতেম তা'য়ী : মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (সংকলিত), ফররুখ আহমদের বৈশিষ্ট্য : সৈয়দ আলী আহসান, কবি ফররুখ আহমদ ও প্রসঙ্গ কথা : জাহানারা আরজু, পাকিস্তান-আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠার পূর্বাপর : ফররুখ আহমদের 'আজাদ করো পাকিস্তান' : মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌, ফররুখ আহমদের 'সিন্দবাদ' : ডক্টর সদরুদ্দীন আহমেদ, ফররুখের কবিতার মূল সুর মানবতা : শাহাবুদ্দীন আহমদ, ফররুখ আহমদ : তিনি কেমন কবি : ডক্টর মাহবুব হাসান, অমর কবি ফররুখ আহমদ : মাসুদ মজুমদার, ফররুখ আহমদের ছন্দ : সাত সাগরের মাঝি : হাসান আলীম, স্মৃতিচারণ : একান্ত অনুভবে ফররুখ আহমদ : মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, ফররুখ -প্রতিভার মূল্যায়নে এক অনবদ্য গ্রন্থ : ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, **Corpse : Farrukh Ahamad, Translated by M. Mizanur Rahman,** স্বরলিপি : সৈয়দ শামসুল হুদা, নিবেদিত কবিতা : সৈয়দ শামসুল হুদা, মাহবুবুল হক, আমিন আল আসাদ, সৈয়দ আবুল হোসেন, মৃধা আলাউদ্দিন, একাডেমী প্রতিবেদন : মুহম্মদ আবিদুর রহমান, মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র ' ফররুখ স্মৃতি পুরস্কার' লাভ, ফররুখ একাডেমীর হাত শক্তিশালী করুন।

২৩. **ফররুখ একাডেমী পত্রিকা**। সম্পাদক : ঐ। দশম সংখ্যা, অক্টোবর- ২০০৪, কার্তিক ১৪১১, রমযান ১৪২৫। সূচি : প্রসঙ্গ কথা, তাঁর নাম ফররুখ আহমদ : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন (সংকলিত), ফররুখ -কাব্যে বাংলাদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশ : মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌, ফররুখের স্বোপার্জিত ভুবন : 'হাবেদা মরুর কাহিনী' : আফজাল চৌধুরী, ফররুখ আহমদের 'লাশ' কবিতা : ডক্টর সদরুদ্দন আহমেদ, ফররুখ আহমদ : ব্যক্তি : মুহম্মদ মতিউর রহমান, দিলরুবা : ফররুখ কাব্যের এক নতুন দিগন্ত : রেয়াজুল হক মিঠু, ফররুখ আহমদের কবিতা : বাংলাদেশের প্রকৃতি ও ঐতিহ্য : হাসান আলিম, সিরাজাম মুনীরা কাব্যে ফররুখের ইতিহাস চেতনা ও আত্মবোধন : মোহাম্মদ রফিকুল হক আখন্দ, কবি ফররুখ আহমদ : হাসান রাউফুন, নিবেদিত কবিতা : জাহানারা আরজু, আবদুল কুদ্দুস ফরিদী, আল হাফিজ, সাইফ বরকতুল্লাহ, হাসান রাউফুন, মোমেন মেহেদী, স্বরলিপি : সৈয়দ শামসুল হুদা, প্রধানমন্ত্রীর বাণী, গ্রন্থালোচনা : ফররুখ আহমদের 'মাহফিল' : মুকুল চৌধুরী, বাংলা কাব্যে ফররুখ আহমদ : তাঁর শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ : মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, একাডেমী প্রতিবেদন।

২৪. **ফররুখ একাডেমী পত্রিকা**। সম্পাদক : ঐ। একাদশ সংখ্যা, জুন- ২০০৫, জ্যৈষ্ঠ ১৪১২, জমাদিউল আউয়াল ১৪২৬। সূচি : প্রসঙ্গ কথা, আমার ছাত্র ফররুখ : আবুল হাশেম (সংকলিত), ফররুখ আহমদের কবিতায় মানবতাবাদী আদর্শের রূপায়ণ : মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌, ফররুখ আহমদের 'পাঞ্জেরী' কবিতা : ডক্টর সদরুদ্দিন আহমেদ, ফররুখ আহমদের 'কাফেলা' : আফজাল চৌধুরী, ফররুখ আহমদের মানবতা ও শিল্প-শৈলী : শাহাবুদ্দীন আহমদ, ফররুখ প্রতিভার স্বরূপ : মুহম্মদ মতিউর রহমান, ফররুখ আহমদকে নিয়ে কথকতা : মুহাম্মদ মুজীবুল হক, ফররুখ এক অনমনীয় কবি-ব্যক্তিত্ব : খন্দকার আবদুল মোমেন, ইসলামী রেনেসাঁর তূর্যবাদক ফররুখ : গাউসুর রহমান, ফররুখ আহমদের শিশুতোষ রচনা : হাসান আলীম, নিবেদিত কবিতা : জাহানারা আরজু, তাহমীদুল ইসলাম, শফিকুর রহমান রঞ্জু, মৃধা আলাউদ্দিন, মোমিন মেহেদী, রানা হামিদ, পাভেল ইমরান, ফেরারী কৌশিক, ফররুখ আহমদের গানের স্বরলিপি : সৈয়দ শামসুল হুদা, গ্রন্থালোচনা : তিতাশ চৌধুরী, কবি ফররুখ আহমদের মাজারে : কে. এম. আশরাফ উদ্দিন, কবির স্মৃতি রক্ষার উদ্যোগ নেই : সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, ফররুখ একাডেমী পরিচিতি, ফররুখ একাডেমী প্রতিবেদন।

২৫. **ফররুখ একাডেমী পত্রিকা**। সম্পাদক : ঐ। দ্বাদশ সংখ্যা, অক্টোবর- ২০০৫, কার্তিক ১৪১২, শাওয়াল ১৪২৬। সূচি : প্রসঙ্গ কথা। অনমনীয় ফররুখঃ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ফররুখ আহমদ- এক নিঃসঙ্গ ডাহুক : আবদুর রশীদ খান, ফররুখ আহমদের গল্পঃ তাঁর সৃজন সক্ষমতার স্বরূপ : মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌, ফররুখ আহমদের 'বার দরিয়ায়' : ডক্টর সদরুদ্দিন আহমেদ, ফররুখ আহমদের কাব্য-নাট্য 'নৌফেল ও হাতেম' মুহম্মদ মতিউর রহমান। সাক্ষাৎকার : নাজমুল আলম, ফররুখ কাব্যে নান্দনিকতা : হাসান আলীম, ফররুখ আহমদের দুর্ভিক্ষের কবিতা : মোশাররফ হোসেন খান, ফররুখ আহমদের 'ডাক-গাড়ী' প্রসঙ্গে : মোহাম্মদ রফিকুল হক আখন্দ, বাংলা কাব্যে ফররুখ আহমদ ও প্রাসঙ্গিক কথা : মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, নিবেদিত কবিতা : আব্দুর রশীদ খান, ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী। গ্রন্থালোচনা : মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ফররুখ আহমদের গানের স্বরলিপি : সৈয়দ শামসুল হুদা, ফররুখ একাডেমী পরিচিতি, ফররুখ একাডেমী প্রতিবেদন।

২৬. **ফররুখ একাডেমী পত্রিকা**। সম্পাদক : ঐ। ত্রয়োদশ সংখ্যা, জুন- ২০০৬, জ্যৈষ্ঠ ১৪১২, জমাদিউল আউয়াল ১৪২৬। সূচি : প্রসঙ্গ-কথা, অনমনীয় ফররুখঃ দেওান মোহাম্মদ আজরফ, ফররুখ আহমদ ঃ এক নিঃসঙ্গ ডাহুক : আবদুর রশীদ খান, ফররুখ আহমদের গল্প ঃ তাঁর সৃজনক্ষমতার স্বরূপ : মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌, ফররুখ আহমদের 'বার দরিয়ায়': ডক্টর সদরুদ্দিন আহমেদ, ফররুখ আহমদের কাব্য-নাট্য

'নৌফেল ও হাতেম' : মুহম্মদ মতিউর রহমান, সাক্ষাৎকার : নাজমুল আলম, ফররুখ কাব্যে নান্দনিকতা : হাসান আলীম, ফররুখ আহমদের দুর্ভিক্ষের কবিতা : মোশাররফ হোসেন খান, ফররুখ আহমদের 'ডাক-গাড়ী' প্রসঙ্গে : মোহাম্মদ রফিকুল হক আখন্দ বাংলা কাব্যে ফররুখ আহমদ ও প্রাসঙ্গিক কথা : মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, নিবেদিত কবিতা : আব্দুর রশীদ খান ও ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, গ্রন্থালোচনা : মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ফররুখ আহমদের গানের স্বরলিপি : সৈয়দ শামসুল হুদা, ফররুখ একাডেমী পরিচিতি, ফররুখ একাডেমী প্রতিবেদন : এম.এ. হাসান ভূঁইয়া।

২৭. **ফররুখ একাডেমী পত্রিকা**। সম্পাদক : ঐ। চতুর্দশ সংখ্যা, অক্টোবর- ২০০৬ – জুন-২০০৭। সূচি : প্রসঙ্গ-কথা। কবি ফররুখ আহমদের দু'টি অপ্রকাশিত কবিতা : ১. "-কৃষ্টি" কোলাহল, ২. এক কৃষ্টির কান্না, কবি ফররুখ আহমদের একটি অগ্রন্থিত কবিতা, কবি ফররুখ : তাঁর মানস : শাহাবুদ্দীন আহমদ, ফররুখের কবিতার নিগূঢ় পাঠ : আউলাদ : ডক্টর সদরুদ্দিন আহমেদ, ফররুখ আহমদের 'সিরাজাম মুনীরা' : মুহম্মদ মতিউর রহমান, ফররুখ আহমদের গল্প : ডক্টর ফজলুল হক সৈকত, ডাহুক ও ডাহুকীর কথা : হাসান রাউফুন, শিশুদের ফররুখ : ফররুখের শিশু-সাহিত্য : নাসিরুদ্দীন তুসী, নিবেদিত কবিতা : সহস্রাব্দীর সিন্দবাদ– নাসিম হামিদা বানু, ফররুখ আহমদের সনেটের ইংরেজি অনুবাদ : আবদুর রশীদ খান অনূদিত : **১. A MOMENT'S POEM, ২. TO MY POEM, ৩. THE RAIN, ৪. DEJECTION, ৫. ACQUAINTANCE, ৬. IN THE MEADOW OF MAINAMOTI : 3, ৭. AN ATHEIST'S PRAYER : HIS CONFESSION, ৮. TO THE POET, ৯. I SHALL WAKE YOU UP, ১০. FROM 'DILRUBA' 5TH CANTO, NO 6, ১১. I CALLED HER IN THAT NAME, ১২. NIGHT AT KANCHRA PARA,** গ্রন্থালোচনা ঃ 'ফররুখের নির্বাচিত কবিতার নিগূঢ় পাঠ' : অধ্যাপক রুহুল আমীন ও ম. মীজানুর রহমান, ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন প্রতিবেদন।

২৮. **ফররুখ একাডেমী পত্রিকা**। সম্পাদক : ঐ। পঞ্চদশ সংখ্যা। অক্টোবর-২০০৭। সূচি : প্রসঙ্গ-কথা। সূচি : প্রসঙ্গ-কথা। ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি নির্বাচিত কবিতার অনুবাদ : ডাহুক, পাঞ্জেরী, লাশ, সাত সাগরের মাঝি : আবদুর রশীদ খান অনূদিত, ফররুখ আহমদ সংকলিত 'চৈত্রের এই দিন' : আবদুল মান্নান সৈয়দ, ফররুখ আহমদ-এর ব্যঙ্গ : তিতাশ চৌধুরী, ফররুখ আহমদের শিশু-কিশোর কবিতা : মুহম্মদ মতিউর রহমান, আমাদের জাতীয় সাহিত্য এবং ফররুখ-সাহিত্যে ইতিবাচকতা : ডক্টর ফজলুল হক সৈকত, মানবতার কবি ফররুখ আহমদ : মোমেনুন্নেছা, ফররুখ : জাতিসত্তা বিনির্মাণের কবি : শাহ সিদ্দিক, মানুষ

ফররুখঃ নূরুল আমিন চৌধুরী, ফররুখের প্রথম ও শেষ কবিতা : হাসান রাউফুন, ফররুখ -চর্চার বাস্তবতা, সমস্যা ও উত্তরণ-প্রস্তাব : মোহাম্মদ রফিকুল হক আখন্দ, নিবেদিত কবিতা : লেখেন দরদ ঢেলে : গোলাম নবী পান্না, **The Heralding Voice: M.A. Taher,** ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন প্রতিবেদন।

২৯. **ফররুখ একাডেমী পত্রিকা**। সম্পাদক : ঐ। ষোড়শ সংখ্যা। জুন ও অক্টোবর-২০০৮। সূচি : প্রসঙ্গ-কথা। ফররুখ আহমদের কয়েকটি নির্বাচিত কবিতার ইংরাজি অনুবাদ : আবদুর রশীদ খান, ঐতিহ্যের রূপকার ফররুখ : মনিরউদ্দীন ইউসুফ, ফররুখ আহমদের কবিতার প্রতি অনুরাগের গোড়ার কথাঃ মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌, নজরুল ইসলাম ও ফররুখ আহমদ : ডক্টর সদরুদ্দিন আহমেদ, ফররুখ আহমদের 'অনুস্বার' কাব্য : মুহম্মদ মতিউর রহমান, সাহিত্যে প্রতীকী আমেজ এবং সাত সাগরের মাঝি প্রসঙ্গঃ নাসীমুল বারী, ফররুখ আহমদ : স্বপ্ন-বাস্তবতার কবি : মনিরুজ্জামান পলাশ, বাংলা কাব্যের অমর প্রতিভা ফররুখ আহমদ : মানসুর মুজাম্মিল, রূপকাশ্রিত কবিতা : রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও ফররুখ : হাসান রাউফুন, গ্রন্থালোচনা : তিতাশ চৌধুরী/চৌধুরী দুদায়েভ/হাসান আলীম, ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন প্রতিবেদন : মোহম্মদ আশরাফুল ইসলাম/রফিকুল ইসলাম আখন্দ।

৩০. **ফররুখ একাডেমী পত্রিকা**। সম্পাদক : ঐ। সপ্তদশ সংখ্যা। জুন-২০০৯। সূচিঃ প্রসঙ্গ-কথা,ফররুখ আহমদের কবিতা। ডক্টর সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় : আমার অনুভব একান্ত আমারই, ফজল শাহাবুদ্দীন : একাকী সিন্দবাদ, আল মুজাহিদী 'সাত সাগরের মাঝি' ফররুখ, মুহম্মদ মতিউর রহমান ফররুখ আহমদ ব্যক্তি, মো. রফিকুল হক আখন্দ : ফররুখ আহমদের গল্প-'বিবর্ণ, মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম : কবি ফররুখ আহমদ ও তাঁর ভাষাবীক্ষণ, মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসাইন খান : ফররুখ আহমদের কবিতায় ইসলামি ভাব, চোকদার মোঃ আবদুস সাত্তার : ফররুখ আহমদের 'ডাহুক' কবিতার ইংরাজি অনুবাদ, নিবেদিত কবিতা-মোশাররফ হোসেন খান, মহিউদ্দিন আকবর, মুহম্মদ মিজানুর রহমান : গ্রন্থালোচনা, ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন প্রতিবেদন

৩১. ফররুখ একাডেমী পত্রিকা। সম্পাদক : ঐ। অষ্টাদশ সংখ্যা। অক্টোবর-২০০৯। সূচি : প্রসঙ্গ-কথা, কবি ফররুখ আহমদের কয়েকটি নির্বাচিত কবিতার ইংরাজি অনুবাদ : আবদুর রশীদ খান, নতুন পানিতে সফর এবার : শামসুর রাহমান, ফররুখ আহমদের কবিতায় ঐতিহ্য চেতনা : তিতাশ চৌধুরী, কবি ফররুখ আহমদ : মুহম্মদ মতিউর রহমান, ফররুখ আহমদঃ তাঁর ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ : খন্দকার আবদুল মোমেন, ফররুখ আহমদের গল্প-'প্রচ্ছন্ন নায়িকা' : মোহাম্মদ রফিকুল হক আখন্দ, ভাষা আন্দোলনে ফররুখ আহমদঃ কে. এম.আশরাফ, ফররুখের শ্রেষ্ঠত্ব : হাসান আলীম,

ফররুখ আহমদঃ কাব্যগতি পথঃ ওমর বিশ্বাস, নিবেদিত কবিতা : ফজল শাহাবুদ্দীন-এর দুটি কবিতা, ফররুখ গবেষণা ফাউণ্ডেশন প্রতিবেদন।

৩২. ফররুখ একাডেমী পত্রিকা। সম্পাদক : ঐ। ঊনবিংশ সংখ্যা। জুন-২০১০। সূচি প্রসঙ্গ-কথা, ফররুখ আহমদের কবিতা। ফররুখ আহমদের গান। 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতার ইংরেজি অনুবাদঃ ডক্টর সদরুদ্দিন আহমেদ। অনন্য পুরস্কারঃ ডক্টর রফিকুল ইসলাম, কবি ফররুখ আহমদ এবং কমলাপুরের গল্পঃ ফজল শাহাবুদ্দীন, আব্বাকে যেমন দেখেছিঃ সৈয়দ আব্দুল্লাহিল মাহমুদ, ফররুখ আহমদে মানবতাবাদের রূপায়ণ : মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্, ফররুখ কাব্যে ক্ষুধিত মানুষ : ডক্টর সদরুদ্দিন আহমেদ, ফররুখ আহমদের ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক কাব্য : মুহম্মদ মতিউর রহমান, ফররুখ আহমদের গল্প 'মৃত বসুধা' : মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম আখন্দ, ফররুখ আহমদের কাহিনী : শাহ্ সিদ্দিক, ফররুখ আহমদের আদর্শ : মনিরুজ্জামান পলাশ, ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন প্রতিবেদন।

**৩৩. ফররুখ একাডেমী পত্রিকা**। সম্পাদক : ঐ। বিংশ সংখ্যা। অক্টোবর-২০১০-জুন ২০১১। সূচি প্রসঙ্গ-কথা, কাব্য-গীতি : ফররুখ আহমদ : ফুলের ছড়াঃ ফররুখ আহমদ, আমার বন্ধু ফররুখ আহমদঃ লুৎফর রহমান জুলফিকারঃ ফররুখ সম্পর্কেঃ সৈয়দ আলী আহসান, ফররুখের স্বাতন্ত্র্য ও বিষয়বৈচিত্র্য ঃ মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্, একজন শনাক্তকারী কবিঃ মুহম্মদ নূরুল হুদাঃ ফররুখ আহমদঃ মুহম্মদ মতিউর রহমান, আব্বার কথাঃ আহমদ আখতারঃ ফররুখ আহমদের প্রথম ও শেষ কবিতাঃ হাসান রাউফুন, ফররুখের মুহূর্তের কবিতাঃ আধুনিক-উত্তরাধুনিকের এক মিশেল ছবিঃ মনিরুজ্জামান পলাশঃ অসামান্য আধুনিক কবি ফররুখ আহমদ : কামরুজ্জামান, ব্যক্তি জীবনে কবি ফররুখ আহমদ : কে. এম. আশরাফ উদ্দিন, স্বপ্ন-কল্পনা ও সৌন্দর্য চেতনার কবি ফররুখ আহমদঃ কাজী রহিম শাহরিয়ার, ফররুখ আহমদের 'পাঞ্জেরী' কবিতার ইংরাজি অনুবাদ, **The Navigator: Dr. Sadruddin Ahmed, Farrukh Ahmad : Poet of Islamic Humanism: Abdul Muqit Chowdhury,** ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন প্রতিবেদন।

**৩৪. ফররুখ একাডেমী পত্রিকা**। সম্পাদক : ঐ। একুশ সংখ্যা। অক্টোবর-২০১১। সূচি : প্রসঙ্গ-কথা, কবি ফররুখ আহমদের কিছু স্মৃতি, ফররুখ আহমদের গান, হাবেদা মরুর কাহিনীঃ মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্, শিশু-কিশোরদের কবি ঃ ফররুখ আহমদ ও প্রাসঙ্গিক স্মৃতিঃ আহমদ-উজ- জামান, কবিকীর্তিঃ সাযযাদ কাদির, রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রতিভা : রাহুগ্রস্ত চাঁদ :মুকুল চৌধুরী, কাল ও কালোত্তরে–ফররুখ বিবেচনা : মোশাররফ হোসেন খান, ফাররুখ আহমদ : ইসলামী ঐতিহ্যের কবিঃ নাসির হেলাল, নৌফেল ও

হাতেম : মহত্তম মানবতার উজ্জীবন : মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ, ফররুখ কাব্যে বিদ্রোহী চেতনাঃ আতিক হেলাল, ফররুখ আহমদের কাব্যে অধ্যাত্মবাদ : নূর আল ইসলাম, 'এখানে মাটির বুকে সর্বশেষ জয় মানুষেরি'ঃ আহমদ বাসির, কবিদের পথের দিশারী কবি ফররুখ : মানসুর মুজাম্মিল, নিবেদিত কবিতাঃ আবদুল মুকীত চৌধুরী, তাহমীদুল ইসলাম, নাসির হেলাল, নূর আল ইসলাম, ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন প্রতিবেদনঃ মহিউদ্দিন আকবর, **FARRUKH AHMAD: By Suraiya Khanam, SINDBAD-THE SAILOR/ Farrukh Ahmed: Translated by Suraiya Khanam, HOW LONG MORE FOR THE NIGHT TO BE OVER: Farrukh Ahmad, Translated by Suraiya Khanam, HUMANIST POET FARRUKH AHMAD: By Prof. Muhammad Matiur Rahman, Is poet Farrukh Ahmed banned?/Shahriar Noori**

**৩৫. ফররুখ একাডেমী পত্রিকা**। সম্পাদক : ঐ। বাইশ সংখ্যা। ফেব্রুয়ারি-২০১২। সূচি : প্রসঙ্গ-কথা, যাদের বুকের রক্তে মাতৃভাষা পেয়েছে সম্মানঃ ফররুখ আহমদ। পাকিস্তানঃ রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্যঃ ফররুখ আহমদ, ফররুখ আহমদের বাংলা ভাষা বিষয়ক কতিপয় গান ও কবিতা। তাঁর নাম ফররুখ আহমদঃ মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন, ভাষা আন্দোলনে কবি ফররুখ আহমদঃ মুহম্মদ মতিউর রহমান, বঙ্গভবনে পাঁচ বছরঃ মাহবুব তালুকদার, ফররুখ আহমদকে মনে করতেই হবে ঃ মুস্তাফা জামান আব্বাসী, ফররুখ আহমদের ইসলামী গান-গজলঃ মুকুল চৌধুরী, তিনি আমাদের কবিঃ শাহ্ সিদ্দিক, প্রসঙ্গঃ কবি ফররুখ আহমদ-আহমাদ কাফিল, ফররুখ কাব্যে বিদ্রোহী চেতনা : আতিক হেলালঃ ফররুখ আহমদের প্রতি নিবেদিত কবিতা : শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, বদরুল হাসান, সিদ্দিকুর রহমান, ফজল মাহমুদ, সৈয়দ ওয়াহিদুজ্জামান (কবিপুত্র), মারুফী খান রক্সী, মোঃ আলমাসুর রহমান বাদশাহ্, **SINDABAD-Tr. by Abdur Rashid Khan: Through The Window- Tr. by Abdur Rashid Khan.**

**৩৬. ফররুখ একাডেমী পত্রিকা**। সম্পাদক : ঐ। তেইশ সংখ্যা। জুন-২০১২। সূচি : প্রসঙ্গ-কথা, ফররুখ আহমদের অগ্রন্থিত কবিতা ঃ আসল ও মেকী, বাঘের বাচ্চা হবেই বাঘ। **Farrukh Ahmad's Poem, Translated by: Dr. Syed Sajjad Hossain,** জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী : ফররুখ আহমদের কবিতা, মুহম্মদ মতিউর রহমান : অনন্য ফররুখ, মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহঃ ফররুখের অনুবাদ প্রতিভা ও কোরআনের কাব্যানুবাদ, শাহানারা স্বপ্নাঃ ঐতিহ্যের রূপকার-কবি ফররুখ আহমদ, ওমর বিশ্বাসঃ ফররুখ আহমদের ব্যঙ্গ কবিতা, মানসুর আজিজঃ ফররুখ আহমদের অনুস্বার কাব্য, আহমদ বাসির : ফররুখ আহমদের গান, কামরুজ্জামান : মানবতাবাদী কবি ফররুখ আহমদ, সুবর্ণ আহসানঃ ফররুখ আহমদ-মানবতা ও দৃঢ়তার অনন্য

মেলবন্ধন, নিবেদিত কবিতা : জাহানারা আরজু, আব্দুল মান্নান সৈয়দ, ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন প্রতিবেদন।

৩৭. **ফররুখ একাডেমী পত্রিকা**। সম্পাদক : ঐ।, চব্বিশতম সংখ্যা। অক্টোবর-২০১২। সূচি : প্রসঙ্গ কথা, ফররুখের হাতেম তা'য়ী- আবুল কালাম শামসুদ্দীন, প্রেমিক ফররুখ-আবদুল আহাদ, অভিভাষণ-প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, ফররুখ কাব্যপাঠঃ কিছু সমস্যা-ডক্টর সদরুদ্দিন আহমেদ, কবি ফররুখ আহমদ : এক ব্যতিক্রমী কবি-জুবাইদা গুলশান আরা, ফররুখ আহমদের গীতিনাট্যঃ আনারকলি-মুহম্মদ মতিউর রহমান, শিশু-সাহিত্যের প্রিয় কবি ফররুখ আহমদ-আশরাফ জামান, ফররুখ আহমদের হামদ ও নাত- মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ হাস্‌সান, 'পাঞ্জেরী' কবিতায় ক্রান্তিকালের মুসলিম সমাজ-শাহ্ সিদ্‌দিক, গণমানুষের কবি ফররুখ আহমদ-ডক্টর মাহফুজুর রহমান আখন্দ, নিবেদিত কবিতা : রেনেসাঁর কবি- জালাল খান ইউসুফী, **ENGLISH SECTIONঃ In an Ancient Shrine By Farrukh Ahmad tr. Sayeed Abubakar,** অভিভাষণ- ডক্টর আনিসুজ্জামান, ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন প্রতিবেদন।

৩৮. **ফররুখ একাডেমী পত্রিকা**। সম্পাদক : ঐ। পঁচিশতম সংখ্যা। জুন-অক্টোবর-২০১৩। সূচি ঃ ফররুখ আহমদের গানের স্বরলিপি **সুর ঃ আব্দুল আহাদ, কবি ফররুখ আহমদের অগ্রন্থিত কবিতা, ফররুখ আহমদের গীতি আলেখ্য ঃ সিন্ধু-তরঙ্গ,** এক ঃ নদীর গান, দুই ঃ পাহাড়ের গান, তিন ঃ পূর্ণিমা চাঁদের গান, চার ঃ সমুদ্রের গান, পাঁচ ঃ চাঁদের গান, ছয় ঃ নদীর গান, আট ঃ শেষ গান, ফররুখ-প্রাসঙ্গিক চিঠি ঃ **ডক্টর সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের** নিকট কবি আব্দুল কাদিরের লেখা চিঠি, **Accolades by Farrukh Ahmad Translated by Yasmin Faruque,** ফররুখ আহমদ ঃ **আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ,** 'ফররুখের 'অশ্রুবিন্দু' : একটি নিগূঢ় পাঠ ঃ **ডক্টর সদরুদ্দিন আহমেদ,** রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী? : **মুস্তফা জামান আব্বাসী, জাতীয় জাগরণের কবি ফররুখ আহমদ : মুহম্মদ মতিউর রহমান,** ফররুখ আহমদ ঃ 'মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ' ঃ **ডক্টর মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, ফররুখ আহমদের বৈশাখ ঃ বহুমাত্রিক চিত্রোপমা, মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ হাসসান, শিশু সাহিত্যে ফররুখ আহমদ ঃ নাসির হেলাল,** ফররুখ আহমদের অভিমান ঃ **আশরাফ জামান,** সত্য ও সুন্দরের কবি ফররুখ ঃ **গাজী মোহাম্মদ আবু সাঈদ, নিবেদিত কবিতা ঃ Farrukh Ahmad : M. Mizanur Rahman,** কবি ফররুখ স্মরণে গান ঃ **সাঈদ জোবায়ের,** ওগো পাঞ্জেরীর কবি ঃ **মীর্যা সিকান্দার, কবি ফররুখ আহমদের ৩৯তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত।**

৩৯. **ফররুখ একাডেমী পত্রিকা**। সম্পাদক : ঐ। ছাব্বিশতম সংখ্যা। জুন-২০১৪। সূচিঃ **প্রসঙ্গ কথা, ফররুখ আহমদের অগ্রন্থিত দু'টি সনেট, ফররুখ আহমদের শিশু কাব্যনাট্য : বাদুড়ের কীর্তি, Abu Bakr Siddiq (R) Translaed by Yasmin Faruque, Omar the Magnanimous by Yasmin Faruque,** মর্যাদাবোধের

প্রতীক ফররুখ : ডক্টর **আবু হেনা মোস্তফা কামাল,** নজরুলের 'উমর ফারুক' ও ফররুখের 'উমর দরাজ দিল'–একটি তুলনামূলক আলোচনা : **ডক্টর সদরুদ্দিন আহমেদ,** ফররুখ আহমদের পাখির বাসা ঃ **মুহম্মদ মতিউর রহমান,** ফররুখের কবিতা 'লাশ'-নয়া ইতিহাসবাদী পাঠ ঃ **কে আহমেদ আলম,** অজানা ফররুখ ঃ **আহমদ আখতার,** ফররুখ কাব্যে ইসলামী ঐতিহ্য ঃ **মুহাম্মদ বিনী আমীন ফেরদৌস,** ফররুখ কাব্যে ইসলামী ঐতিহ্য ঃ **মুহাম্মদ বিনী আমীন ফেরদৌস, ফররুখ-কাব্যে প্রেম : কবিতায় পরিচ্ছন্নতা পলেস্তারা ঃ মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ্ হাসসান,** সাহিত্যের অনুষঙ্গে ঃ **মোশাররফ হোসেন খান,** টেনিসনের 'ইউলিসিস' এবং ফররুখ আহমদের 'সিন্দবাদ' কবিতার, তুলনামূলক পর্যালোচনা ঃ **মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন,** কালজয়ী কবি ফররুখ ঃ **লিলি হক,** সাহিত্যশিল্পী ফররুখ আহমদ ঃ **সুদর্শন, নিবেদিত কবিতাঃ মতিউর রহমান মল্লিকের দু'টি কবিতা /লিলি হক/মহিউদ্দিন আকবর/রেজা সারোয়ার /শিবুকান্তি দাশ/মুনীরুল ইসলাম/ফরিদুল হক রেন্টু/সাদী/ওয়াহিদ আল হাসান/মোহাম্মদ রবিউল /সুমন রায়হান/লিটন হাবিব, "ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন পুরস্কার-২০১৪" প্রাপ্ত প্রফেসর ডক্টর সদরুদ্দিন আহমেদ-এর সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি, ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন পুরস্কার-২০১৪ পেলেন ডক্টর সদরুদ্দিন আহমেদ**

৪০. **নতুন কলম** : সম্পাদক : মোশাররফ হোসেন খান। জুন ২০০১। সূচি : গতির কবি ফররুখ আহমদ : শাহাবুদ্দীন আহমদ, উদ্বোধন : ফররুখ আহমদ।

৪১. **নতুন কলম** : সম্পাদক : ঐ। অক্টোবর ২০০১। সূচি : অতন্দ্র : ফররুখ আহমদ, ফররুখ খ আহমদ ঃ পর্বতচূড়ায় যাঁর নীড় সমুদ্র যাঁর হাম্মামখানা : শাহেদ আলী, অপ্রকাশিত ফররুখ: আহমদ আখতার, ফররুখের দৃষ্টিতে 'নদী' : আরিফ হাসান।

৪২. **নতুন কলম** : সম্পাদক : ঐ। অক্টোবর ২০০২। সূচি : অপ্রকাশিত ফররুখ, কবি ফররুখ আহমদ সংবর্ধনা : মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্।

৪৩. **নতুন কলম** : সম্পাদক : ঐ। জুন ২০০৩। সূচি : কবি ফররুখ আহমদ : অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান, গানে কবি ফররুখের অবদান : সৈয়দ শামসুল হুদা, 'বৈশাখ' কবিতায় ফররুখের শ্রেষ্ঠত্ব : সাদী রায়হান, ফররুখ আহমদ ঃ এক সমুদ্র-ঈগল কবি : জাকির আবু জাফর, পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে ফররুখের কবিতা : ওমর বিশ্বাস।

৪৪. **নতুন কলম** : সম্পাদক : ঐ। অক্টোবর ২০০৩। সূচি : কবি ফররুখ আহমদের অপ্রকাশিত কবিতা, ফররুখ আহমদের 'সিরাজাম মুনীরা' কবিতা : ডক্টর সদরুদ্দিন আহমেদ, ফররুখ কাব্যে ঐতিহ্য : অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান, ফররুখের 'সিরাজাম মুনীরা' ঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা : শফি চাকলাদার, কবি ফররুখ আহমদ ঃ জীবন ও সাহিত্য : আলতাফ হোসাইন রানা, ফররুখের কবিতায় মৃত্যু-ভাবনা : আহমদ ইহসানুল কবীর।

৪৫. **নতুন কলম** : সম্পাদক : ঐ। জুন ২০০৪। সূচি : ফররুখ আহমদের অগ্রন্থিত কবিতা।

৪৬. **নতুন কলম** : সম্পাদক : ঐ। জুন ২০০৫। সূচি : ফররুখ কাব্যে বাংলাদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশ : মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌, ফররুখের সাথে আমার পরিচয়ের স্মৃতি : শাহাবুদ্দীন আহমদ, বৈচিত্র্য-প্রয়াসী ফররুখ : অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান, সাংবাদিক-কবি ফররুখ আহমদ : হাসান ইবনে শাহাদাত।

৪৭. **নতুন কলম** : সম্পাদক : ঐ। জুন ২০০৬। সূচি : একজন অঙ্গীকারবদ্ধ কবি ফজল শাহাবুদ্দীন, একজন শনাক্তকারী কবি : মুহম্মদ নূরুল হুদা।

এছাড়া, বাংলাদেশের বিভিন্ন দৈনিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা ফররুখ আহমদের জন্ম ও মৃত্যু দিবস উপলক্ষে এবং অন্যান্য সময়েও কবির উপর বিভিন্ন লেখা প্রকাশ করে থাকে। এগুলোর নির্ঘণ্ট তৈরি করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। ফলে উপরোক্ত তথ্যপঞ্জি সংগত কারণেই অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। তবে উপরোক্ত তালিকা থেকে কবির জনপ্রিয়তা সম্পর্কে সহজেই ধারণা করা চলে। বাংলা সাহিত্যে নোবেল-বিজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের পরেই ফররুখ আহমদ সর্বাধিক আলোচিত কবি বলে আমার ধারণা।

## আরো কিছু তথ্য :

বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্য-সমালোচক মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌-কৃত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ফররুখ-বিষয়ক লেখার একটি অপূর্ণ তালিকা (যেহেতু পূর্ণাঙ্গ তালিকা করা দুরূহ) তাঁর-প্রণীত 'বাংলা কাব্যে ফররুখ আহমদ ঃ তাঁর শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ' গ্রন্থের পরিশিষ্ট থেকে পুনর্মুদ্রিত হল।

১. আধুনিক কবিতা ও মুসলিম কবিগণ : আবু রুশদ। 'সওগাত', ভাদ্র ১৩৪৮।
২. 'সাত সাগরের মাঝি' (গ্রন্থালোচনা) : বসুধা চক্রবর্তী। 'সওগাত' বৈশাখ ১৩৫২।
৩. নবীন কবি ফররুখ আহমদ : আবদুল কাদির। 'সওগাত' বৈশাখ ১৩৫৪।
৪. বাংলা কাব্যে কবি ফররুখ আহমদ : দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। 'দ্যুতি' ২:১, ১৯৫২।
৫. একজন আধুনিক কবি প্রসঙ্গে : শামসুর রাহমান। দৈনিক 'মিল্লাত' ১৯৫৩।
৬. ফররুখ আহমদের 'নৌফেল ও হাতেম' : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। 'পূবালী' ১৯৬৩।
৭. **Farrukh Ahmed : The Representative Poet of East Pakistan: Mohammad Azraf, 'Pakistan Review', Karachi, 1963.**
৮. 'হাতেম তা'য়ী : ঐতিহ্যের নবরূপায়ণ : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। 'মাহে-নও', ১৯৬৬।
৯. নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা : মুজীবর রহমান খাঁ। 'পাকিস্তানী খবর' ১৯৬৭।
১০. ফররুখের কাব্যনাটক 'নৌফেল ও হাতেম' : আবদুল হাফিজ। 'পূর্বমেঘ', রাজশাহী।

১১. 'পাখীর বাসা' (গ্রন্থালোচনা) : আনিসুজ্জামান। 'এলান'। বেতারে পঠিত।
১২. 'পাখীর বাসা' (গ্রন্থালোচনা) : অধ্যাপক আবদুল গফুর। দৈনিক 'আজাদ'।
১৩. 'পাখীর বাসা' (গ্রন্থালোচনা) : হাবীবুর রহমান। 'পূবালী'।
১৪. পূর্ব পাকিস্তানের কাব্যসাহিত্য : কবিমানস ও ভূমিকা বিচার (দ্বিতীয় পর্যায়) : হাসান হাফিজুর রহমান। 'আধুনিক কবি ও কবিতা' (১৯৬৫, বাংলা একাডেমী), পৃষ্ঠা ১৯৪-২০৯।
১৫. কবি ফররুখ আহমদ : শাহাবুদ্দীন আহমদ। 'বেতার বাংলা', নভেম্বর ১৯৭৪।
১৬. ফররুখ আহমদের কবিতা : সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। 'পাঞ্জেরী', অক্টোবর ১৯৭৬।
১৭. কবি ফররুখ আহমদের কবিতায় নাট্যগুণ : মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্। দৈনিক 'ইত্তেফাক', অক্টোবর ১৯৭৮।
১৮. ফররুখ আহমদ (স্মৃতিকথা) : আবু হেনা মোস্তফা কামাল। 'আবু হেনা মোনস্তফা কামাল স্মারকগ্রন্থ' আব্দুল মান্নান সৈয়দ-সম্পাদিত। সেপ্টেম্বর ১৯৯১। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
১৯. 'হে বন্য স্বপ্নেরা' (গ্রন্থালোচনা) : কবীর চৌধুরী। 'বেতার বাংলা'।
২০. 'হে বন্য স্বপ্নেরা' (গ্রন্থালোচনা) : সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়। সাপ্তাহিক 'সচিত্র স্বদেশ'।
২১. ফররুখ আহমদ : জাতীয় চৈতন্যে তাঁর প্রভাব : সানাউল্লাহ্ নূরী। দৈনিক 'দেশ', ১৯ অক্টোবর ১৯৯৭।
২২. ফররুখ আহমদ : সংগ্রামী সত্তা : মনসুর মূসা। 'বেতার বাংলা'।
২৩. আমার বন্ধু ফররুখ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সাপ্তাহিক 'প্রতিক্ষণ'।
২৪. মানুষের কবি ফররুখ : চৌধুরী আমিন আহমদ। ঐতিহ্য, মে ১৯৮৫।
২৫. ফররুখ আহমদ : তালিম হোসেন। 'কিছুধ্বনি'।
২৬. 'ফররুখ-রচনাবলী' (প্রথম খণ্ড-) (গ্রন্থালোচনা) : তালিম হোসেন। নজরুল একাডেমী পত্রিকা'। 'ফররুখ-রচনাবলী' (প্রথম খণ্ড-) : (মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্ ও আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত) : তালিম হোসেন, দৈনিক আজাদ। ' ফররুখ-রচনাবলী' (প্রথম খণ্ড-) (মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্ ও আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত) : সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, দৈনিক ইত্তেফাক।
২৭. ফররুখ আহমদ (স্মৃতিকথা) : বেগম সুফিয়া কামাল। 'ঐতিহ্য', ভাদ্র, অক্টোবর - নভেম্বর ১৯৮৬।
২৮. ফররুখ আহমদের কবিতা : আবদুল মান্নান সৈয়দ। 'কলম' ডিসেম্বর ১৯৮৮।

২৯. ফররুখ আহমদের কবিতা : গাউসুর রহমান। 'ঐতিহ্য', আশ্বিন-কার্তিক ১৩৯৬।
৩০. অন্তরঙ্গ আলোকে ফররুখ আহমদ : মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম। 'অগ্রপথিক', ফররুখ জন্মবার্ষিকী-সংখ্যা ৮ জুন, ১৯৮৯।
৩১. ফররুখ আহমদ : তাঁর ব্যক্তিসত্তা ও কাব্যসত্তা : দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। ঐ।
৩২. ফররুখ আহমদ : স্মৃতি থেকে : মোহাম্মদ আলমগীর। দৈনিক 'সংগ্রাম', ১৯ অক্টোবর, ১৯৯০।
৩৩. **Farrukh Ahmed : Zillur Rahman Siddiqui, 'Bangla Academy Journal', July-December 1984.**
৩৪. স্মৃতিকথা : ফজল শাহাবুদ্দীন। 'অগ্রপথিক'।
৩৫. ফররুখ আহমদ ও আমি : তালিম হোসেন। দৈনিক 'ইনকিলাব'।
৩৬. ফররুখ আহমদের কবিতায় বাংলাদেশের নিসর্গ :অধ্যাপক আবদুল গফুর। 'পূর্বাচল'।
৩৭. কবি ফররুখ: জীবন ও শিল্প : কাজী আযিমউদ্দীন আহমদ। 'নোঙর', নভেম্বর ১৯৯১ চট্টগ্রাম।
৩৮. ফররুখ আহমদ : সমকালীন প্রতিক্রিয়া : আবদুল মান্নান সৈয়দ। 'কিছুধ্বনি', ১৯৮৮।
৩৯. অগ্রন্থিত ফররুখ আহমদ : শহীদুল্লাহ্ কায়সার। 'দৈনিক বাংলা' ১২ ডিসেম্বর ১৯৮৩।
৪০. **Farrukh Ahmed : Abul Fazal, 'Bangladesh Times',** ১৯ অক্টোবর ১৯৭৫।
৪১. **Farrukh Ahmed : A Bird's eye view on his work and Poet : Syed A. Masud. Observer Saturday Supplement, 'The Bangladesh Observer', 15 October 1983.**
৪২. **Farrukh Rachanabali. (vol-1) (Book-Review) : S.N.Q. Zulfiqar Ali. 'The Bangladesh Observer', 25 May 1980.**
৪৩. 'হাতেম তা'য়ী' (গ্রন্থালোচনা) : আবদুস সাত্তার। 'সওগাত', শ্রাবণ ১৩৭৩।
৪৪. ফররুখ আহমদ : রূপকল্প ও ছন্দ : আবদুল মান্নান সৈয়দ। 'নোঙর', জুন ১৯৯৩।
ফররুখ আহমদের প্রথম পর্বের কবিতা : সনেট : মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্। ইত্তেফাক, জুন ১৯৭৮ সাত সাগরের মাঝি : মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্, ইত্তেফাক, ১৯৬ সনে ফররুখ আহমদের 'লাশ' : আশরাফ জামান, দৈনিক আজাদ, ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫ সনে স্বর্ণ ঈগল : পাখা মেলো, পাখা মেলো ঃ মর্দে মুমীন, আজাদ, ১৫ জুন, ১৯৭৭ সনে সাত সাগরের মাঝি : আবুল হোসেন মিঞা, আজাদ ৪ আষাঢ়, ১৩৮৪ সন **Farruhk Ahmed : Abdur Sattar, Betar Bangla, October 1974.**

১৯৫৭ সালে রেডিওর সাহিত্য অনুষ্ঠানে কবি আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, আবুল হোসেন, সুফিয়া কামাল, শামসুর রহমান ও আবদুল কাদির
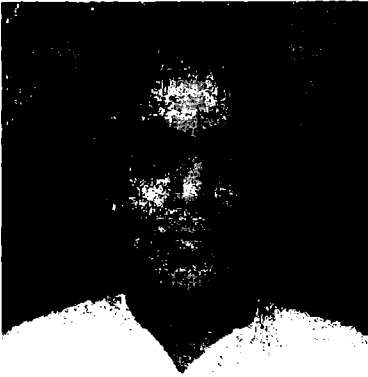
কথা : ফররুখ আহমদ। সুর : আবদুল আহাদ।
স্বরলিপি : লায়লা আর্জুমান্দ বানু

ঝড়ের ইশারা ওরা জানে।
নীড় ছেড়ে উঠে আসে
প্রদীপ্ত উল্লাসে
মরণের ভয় নাহি মানে।।

ক্ষীণ যারা আঁধারে লুকায়
ওরা শুধু সংঘাত চায়
বজ্র বিদ্যুতের মুখে
ফেরে নির্ভীক বুকে
নিভৃতে ওরা পাখা হানে।।

ভেঙে পড়ে আকাশ বিমান
তবু তোলে যৌবন গান
ধরি মৃত্যুর টুটি
প্রাণধারা আনে লুটি
জীবনের নব অভিযানে।।

।। মজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা । সা ঋা সা দা । ঋা -া সা -া । -া -া -া -া ।
ঝ ড়ে র ই শা রা ও রা জা ০ নে ০ ০ ০ ০ ০

। র্সা -া র্সদা দা । মা মা মা মা । সা -া র্সদা দা । মা মা মা মা ।
নী ড় ছে ড়ে উ ঠে আ সে প্র দী প্ ত উ ল্ লা সে

। মা মা মা মা । -া -া -া -া । মা পা দা পা । সা ঋা র্সা র্সা ।
ম র ণে ০ ০ ০ ০ র্ ম র ণে র ভ য় না হি

। র্সর্ঋা ঋা সা -া । -া -া -া -া ।।
মা ০ নে ০ ০ ০ ০ ০

## সম্পাদক পরিচিতি

মুহম্মদ মতিউর রহমানের জন্ম ৩রা পৌষ, সোমবার ১৩৪৪ (১৮ ডিসেম্বর, ১৯৩৭) সিরাজগঞ্জ জেলার অন্তর্গত শাহজাদপুর থানার চর বেলতৈল গ্রামে। পিতার নাম আবু মুহম্মদ গোলাম রব্বানী, মাতা- মোছাম্মৎ আম্বুদা খাতুন।

কর্ম-জীবন (১৯৬২-২০০৯) ঃ অধ্যাপক, উপাধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ- সিদ্ধেশ্বরী কলেজ, ঢাকা। সহকারী সম্পাদক, নিয়মিত বিভাগ ও প্রথম বাংলা বিশ্বকোষ প্রকল্পের অন্যতম সম্পাদক, ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রামস, ঢাকা। অধ্যাপক সা'দৎ কলেজ করোটিয়া, টাঙ্গাইল। সাহিত্য সম্পাদক, দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা। সম্পাদক, প্রকাশনা বিভাগ, দুবাই চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাসট্রি, দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত। প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা।

রচিত গ্রন্থাদি ঃ ১. 'সাহিত্য কথা' (১৯৭০), ২. 'ভাষা ও সাহিত্য' (১৯৭০), ৩. 'সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি' (১৯৭১), ৪. 'মহৎ যাদের জীবন কথা' (১৯৮৯), ৫. 'ইবাদতের মূলভিত্তি ও তার তাৎপর্য' (১৯৯০), ৬. 'ফররুখ প্রতিভা' (১৯৯১), ৭. 'বাংলা সাহিত্যের ধারা' (১৯৯১), ৮. 'বাংলা ভাষা ও ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন' (১৯৯২), ৯. 'ইবাদত' (১৯৯৩), ১০. 'মহানবী (সাঃ)' (১৯৯৪), ১১. 'ইসলামের দৃষ্টিতে ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি' (১৯৯৫), ১২. 'মহানবীর (সাঃ) আদর্শ সমাজ' (১৯৯৭), ১৩. 'ছোটদের গল্প' (১৯৯৭), ১৪. 'Freedom of Writer' (১৯৯৭), ১৫. 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য' (২০০২), ১৬. 'মানবাধিকার ও ইসলাম' (২০০২), ১৭. 'ইসলামে নারীর মর্যাদা' (২০০৪), ১৮. 'রবীন্দ্রনাথ' (২০০৪), ১৯. 'স্মৃতির সৈকতে' (২০০৪), ২০. 'মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ মহানবী (সাঃ)' (২০০৫), ২১. 'ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার' (২০০৫), ২২. 'মাতা-পিতা ও সন্তানের হক' (২০০৬), ২৩. বাংলাদেশের সাহিত্য (২০০৬), ২৪. ফররুখ প্রতিভা (পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৮), ২৫. ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার (২০০৮), ২৬. সংস্কৃতি (২০০৮), ২৭. বাংলাদেশের সাহিত্য (২০০৮), ২৮. 'সাহিত্যচিন্তা' (২০০৯), ২৯. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম (২০১০), ৩০. ইউরোপ আমেরিকার পথে জনপদে (২০১০), ৩১. হাজার বছরের বাংলা কবিতা (২০১০), ৩২. ঐতিহ্য বাংলা সন বাংলা নববর্ষ (২০১১), ৩৩. ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, (২০১১), ৩৪. কিশোর গল্প (২০১১)। ৩৫. The Freedom of a Writer and Other Essays (২০১২), ৩৬, নিভৃতে অলিন্দে (২০১২) ৩৭.রবীন্দ্রনাথ ও আমাদের সংস্কৃতি (২০১২),৩৮. বাঙালী নবজাগরনে সাহিত্য-সংস্কৃতি সংগঠনের ভূমিকা (২০১২) ৩৯. বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ (২০১৩), ৪০. বাংলা ভাষা ও ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন (২০১৩)।

**কবির ৯৭তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত**

## ফররুখ আহমদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

ফররুখ আহমদ বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক প্রতিভাধর শক্তিমান কবি-প্রতিভা। তাঁর ভাষা, বাক-বিন্যাস, উপমা-অলংকার ব্যবহার ও শিল্প-নৈপুণ্য স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল। তাঁর সৃষ্টি-বৈচিত্র্য, নির্মাণ-কৌশল ও শিল্প-চৈতণ্যের অভিনব প্রকাশ সকলকে যুগপৎ মুগ্ধ ও এক অনাস্বাদিত আনন্দে পুলকিত-উজ্জীবিত করে। স্বর্ণ-ঈগলের বর্ণাঢ্য উজ্জ্বলতায় ফররুখ বাংলা কাব্যের দিগন্ত-রেখাকে সমুদ্ভাসিত করে জাতীয় জাগরণের উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছেন।

বহুভাবে বহুজন বহুমাত্রিকতায় ফররুখের মূল্যায়ন করার প্রয়াস পেয়েছেন। সে অসংখ্য গুণীজনের বাছাইকৃত কিছু লেখা নিয়ে এ গ্রন্থের সংকলন। একত্রে ফররুখ মূল্যায়ন সম্পর্কিত এ সংকলন গ্রন্থটি আগ্রহী পাঠকের রস-পিপাসা নিবৃত্ত করতে সহায়ক হবে বলে আশা রাখি।

এতে যাঁদের লেখা সংকলিত হয়েছে, তাঁরা হলেন–আবুল কালাম শামসুদ্দীন, কবি আবুল হাশেম, আবুল ফজল, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, কবি আব্দুল কাদির, কবি সুফিয়া কামাল, আব্দুল আহাদ, মনিরউদ্দীন ইউসুফ, সৈয়দ আলী আহসান, ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ, আবদুর রশীদ খান, ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, শামসুর রাহমান, লুৎফর রহমান জুলফিকার, সানাউল্লাহ্ নূরী, ডক্টর সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, ডক্টর রফিকুল ইসলাম, জাহানারা আরজু, মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্, ফজল শাহবুদ্দীন, হাসান ইকবাল, ডক্টর সদরুদ্দিন আহমেদ, ডক্টর আনিসুজ্জামান, ডক্টর আবু হেনা মোস্তফা কামাল, ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, শাহাবুদ্দীন আহমদ, নাজমুল আলম, আল মাহমুদ, আহমদ-উজ- জামান, জুবাইদা গুলশান আরা, মুহম্মদ মতিউর রহমান, মাহবুব তালুকদার, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, আব্দুল মান্নান সৈয়দ, নূরুল আলম রইসী, তিতাশ চৌধুরী, আফজাল চৌধুরী, আল মুজাহিদী, মুহম্মদ নূরুল হুদা, বদরুল হাসান, ডক্টর মাহবুব হাসান, মুস্তাফা জামান আব্বাসী, আবদুল মুকীত চৌধুরী, মাহবুবুল হক, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, সৈয়দ আব্দুল্লাহিল মাহমুদ, আহমদ আখতার, মুকুল চৌধুরী, মোশাররফ হোসেন খান, হাসান আলীম, কে. আহমেদ আলম, মুহাম্মদ বিনী আমীন ফেরদৌস, মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, ডক্টর ফজলুল হক সৈকত, মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ, ফজল মাহমুদ, সৈয়দ ওয়াহিদুজ্জামান, মহিউদ্দিন আকবর, নাসির হেলাল প্রমুখ।

**বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ**